নিজেরে
হারায়ে
খুঁজি

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

[প্রথম পর্ব]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই কার্ত্তিক,
১৮৮৪ শকাব্দ

কুড়ি
টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীকাতিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী,
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পিতৃদেব

৺চন্দ্রভূষণ চৌধুরী

শ্রীচরণকমলেষু

"মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে।
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে॥
আঁধার-আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে,
নিজেরে হারায়ে খুঁজি—
দুলি সেই দোলে দোলে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

পিতৃদেব : ৺চন্দ্রভূষণ চৌধুরী
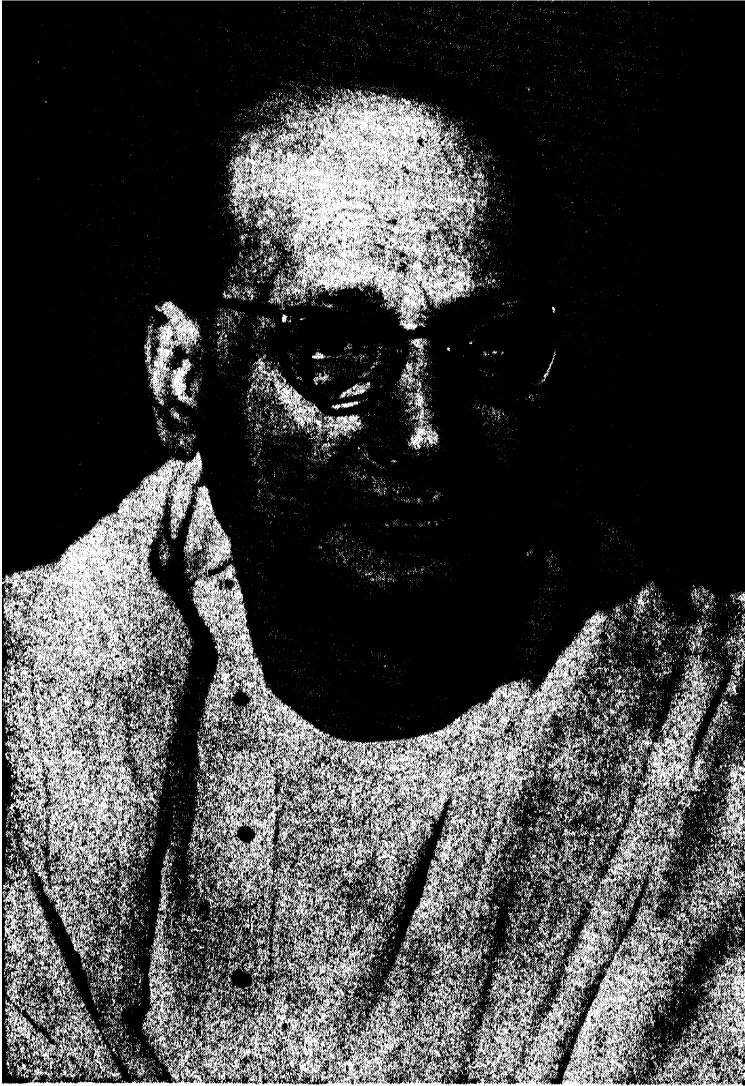
অহীন্দ্রভূষণ চৌধুরী (১৯৫৭-৫৮ সালে তোলা ছবি)

ভূমিকা

সন্ধ্যাবেলা বাতি-জ্বালাবার আগে 'সল্‌তে-পাকানো'র একটা পর্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন। আমার যা' বলবার, তা' গ্রন্থেই বলে যাবার প্রয়াস করেছি,—এখন যা বলছি, সে ঐ সল্‌তে-পাকানোর পর্ব।

আজ, জীবনের সায়াহ্ন-বেলায় পৌঁছে, বলতে গেলাম কেন নিজের কথা? এই প্রশ্ন বার বার নিজেকে করছি।

খ্যাতি? অর্থ? যখন জীবনের সবকিছু হিসাব চুকিয়ে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে আছি, তখন খ্যাতিরই বা মূল্য কী? অর্থেরই বা মূল্য কী? আমি সাহিত্যিক নই, যে তাগিদে সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকে রচনা করেন, সে তাগিদ আমার থাকবার কথা নয়। আমি নাট্যশিল্পী, আমার আত্মপ্রকাশ—নাট্যমঞ্চে, অথবা ছায়াছবির পর্দায়, অথবা রেকর্ড-রেডিওর মাইকের সামনে,—কাগজ-কলম নিয়ে রসের জগতে অবতরণ করার কথাও আমার নয়। তবে?

তথাপি মনে হলো, বলার কথা অনেক জমে আছে। নাট্যমঞ্চ বা ছায়াছবির কর্মশালায় বা নাট্য আকাদমির দেব-দেউলেই সব অঞ্জলি আমার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এলাম, সেদিনও ভাবিনি, আমার শিল্পী-জীবনের শেষ যবনিকাখানি পড়ে যেতে এখনো অনেক বাকী আছে। শিল্পী-জীবনের যবনিকা টেনে দিয়ে মর-জীবনের যবনিকা পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবো পঠন-পাঠন নিয়ে, এই তো অভিলাষ ছিলো! কিন্তু, দেখা গেল, আমার শিল্পী-জীবনের নিয়ন্তা আমি নই, সেখানে আরও এক অমোঘ শক্তির প্রচণ্ড অভিলাষ অনুক্ষণ তার লীলা-সঞ্চালন করে চলেছে!

পাদপ্রদীপের আলো থেকে আত্মগোপনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে গিয়েও দেখতে পেলাম, আরেক আলো এখানে জ্বলে উঠেছে! পাদপ্রদীপ এখানে এসে স্মৃতির প্রদীপ হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে। দিনের পর দিন সেই কম্পমান স্মৃতি-শিখার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হলো,—আমিও যে মিশে আছি স্মৃতির রাজ্যে—স্মৃতির মানুষগুলির সঙ্গে! মনে হলো,—আমি নিজেও তো এক স্মৃতি! এবং সেই স্মৃতির ছায়াছবিরা আর ত কোনোদিন ফিরে আসবে না।

রঙ্গমঞ্চ আজও আছে, ছায়াছবি আজও আছে, রেকর্ড-রেডিও আজও আছে, দিনে দিনে এদের শ্রীবৃদ্ধিই হবে, কিন্তু এদের জড়িয়ে সেদিন আমরা যারা ভাগ্যচক্রে আবর্তিত হচ্ছিলাম, তাদের সঙ্গে আজকের যুগের তফাৎ এত বেশী হয়ে গেছে যে, এক জগতের লোক বলে বুঝি আর চেনাই যায় না। সেদিন আমাদের সুখ্যাতি ছিল বেশী, কুখ্যাতিও ছিল

বেশী ; লোকের মুখে মুখে নানান গল্প রচিত হতো আমাদের নিয়ে। মানুষের অনুমান আর বাস্তব,—এই দুই বস্তুতে মিশে সেদিন আমরা এক বিশিষ্ট জগতের মধ্যে বাস করতাম। এ জগৎ ছিল শিল্পীর জগৎ। আমাদের গুণ আর দোষ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর আমরা ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত ছিলাম। সাধারণ সামাজিক জগৎ থেকে আমরা ছিলাম একপ্রকার নির্বাসিত। আজ সে অবস্থাটা নেই, আজ সাধারণ সমাজ-জীবনে সবাই একাকার হয়ে মিশে গেছেন। এটা সুলক্ষণ সন্দেহ নেই, তবু মনে হয়, শিল্পীরা সাধারণভাবে একটা সমাজকে—একটা সংস্কারকে—একটা স্বাতন্ত্র্যকে যেন হারিয়ে ফেলছেন। সেদিন নির্বাসিত একদল যাযাবরের মতো আমরা সমাজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিচরণ করতাম ; এবং যেহেতু আমরা ছিলাম নির্বাসিত, সেই হেতু পরস্পরের মধ্যে একটা আন্তরিক টান ছিল, পরস্পরের সুখ দুঃখের সঙ্গে পরস্পর বিশেষরূপে বিজড়িত ছিলাম। ঈর্ষা-দ্বেষ পরস্পরের মধ্যে ছিল বই কী, আবার টানও ছিল প্রচণ্ড।

ভাবলাম,—এ বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর কোথাও থাকবে না ? অন্তরে এক অস্থিরতাও অনুভব করতে লাগলাম। আকাদমিতে ছাত্রদের শেখাতে বা পড়াতে পড়াতে এ-ও লক্ষ্য করলাম, আমাদের যুগের ইতিহাস-চিহ্নিত কোনো অন্তরঙ্গ বিবরণীও সম্যক্ লিপিবদ্ধ নেই। প্রতিমার কাঠামোর মতো সাল-তারিখ-নাম আছে রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও অভিনেতার ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে উপস্থিত কোনো মূর্তি নেই, যা থেকে ভবিষ্যৎ পাঠকেরা আমাদের যুগের নাট্য জগতের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারেন। মূর্তি যে আমিই তৈরি করতে পারবো, এমন দুরাশা পোষণ করিনি, তবে, কিছু কাজ যে এগিয়ে দিয়ে যেতে পারবো, এ প্রত্যয় আমার ছিল। আর, ছিল বলেই, আমার স্মৃতি এবং অন্যান্য উপকরণ নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলাম মনে মনে।

শরীর আমার সুস্থ নয়, বেশীক্ষণ এক ভাবে বসে থাকলে পর্যন্ত কষ্ট হয়। এ-অবস্থায় কলম ধরে ধরে লেখার কথা ভাববই বা কী করে ? অথচ অন্তরে নিরন্তর এক অস্বস্তি গুমরে মরে। তার ওপরে নাট্যজীবন ও নাট্যশালা নিয়ে অধুনা এমন দু একখানা গ্রন্থ নজরে পড়লো, যা পড়ে মনে হলো, অনুমানের ওপর নির্ভর করেই এঁরা যুগটাকে স্পর্শ করতে চাইছেন, যার ফলে, কোথাও অতিরঞ্জন, কোথাও অসত্য-কথন, কোথাও বা কোনো প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশিতই হয়নি। ফলে, স্মৃতির সঞ্চয় উজাড় করে দেবার তাগিদ আরও প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো মনে। কিন্তু, লিখবে কে ? আমার আছে উপকরণ, কিন্তু তা যথাযথ ভাব ও ভাষা-বিন্যাসে লিপিবদ্ধ করবে, এমন কাকে পাই কাছেপিঠে ? ঘটনাচক্রে তাও পেলাম। সু-সাহিত্যিক শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীর সাহায্য না পেলে এ গ্রন্থ রচিত হতো কিনা সন্দেহ !

দেশ পত্রিকায় ২৭শে কার্তিক, ১৩৬৬ সাল (১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৯) তারিখ থেকে ১৩ই ফাল্গুন ১৩৬৭ সাল (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১) তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, এ-মাত্র প্রথম পর্ব। এ' পর্ব সপ্তাহে-সপ্তাহে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন বহু পাঠক-পাঠিকা পত্রযোগে আমায় অভিনন্দন জানিয়েছেন, জানিয়েছেন তাঁদের ভালো-লাগার বার্তা ; অনেকে কিছু কিছু ভুলও ধরে দিয়েছেন। আমি ত বলেছি, বহুলাংশে আমি স্মৃতিনির্ভর ছিলাম ; সেইজন্য কোথাও কোথাও বর্ণনায় কিছু ভুলও থাকা অসম্ভব ছিল না। আমি যথাযথভাবে তা সংশোধন করে নিয়েছি এবং এই সুযোগে তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

একটি ভুল অনবধানবশতঃ ছাপা হয়ে গেছে। সেইজন্য ভূমিকায় সে-বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক বোধ করছি। পাঠক গ্রন্থের একস্থানে (৭২ পৃষ্ঠায়) লর্ড সিংহের কথা পাবেন। সেখানে আছে ১৯১২ সালে তিনি বিহার-উড়িষ্যার গভর্নর ছিলেন। কথাটা ঠিক নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ সংস্কারের বিধিবলে প্রদেশগুলি বিভিন্ন গভর্নরের অধীনে শাসিত হবে বলে স্থিরীকৃত হলো, (তার আগে 'বিহার-উড়িষ্যা' লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গভর্নরের অধীনে ছিল) তখন, লর্ড সিংহ 'বিহার-উড়িষ্যা'র গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আমার জীবনে আমি দেশের এক রূপান্তরের সাক্ষী। সেই সাক্ষ্য যদি আমি আন্তরিকভাবে দিয়ে যেতে পেরে থাকি, তাহলেই সার্থক মনে করবো নিজেকে। রূপান্তর শুধু নাট্য বা চিত্রজগতের নয়,—রূপান্তর সমগ্র দেশের। দেশের রূপান্তরণের পটভূমিকায় নাট্যমঞ্চ তার আপন কাজ করে গেছে। সেই পটভূমিকা না বুঝলে নাট্যমঞ্চ বা শিল্পী-জীবনের ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ না-ও হতে পারে। সেইজন্যই, বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে নাট্যমঞ্চ বা শিল্পী-জীবনকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস পেয়েছি।

শিল্পীর দুটি জীবন আছে। এক, তার সৃষ্টির জীবন ; দ্বিতীয়, তার ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবন। এই দুই জীবনের সামঞ্জস্যবিধান না ঘটলে শিল্পী-জীবন সহজগতি প্রাপ্ত হয় না। আমার পরম সৌভাগ্য, জীবনের প্রারম্ভ থেকে শুরু ক'রে আজও পর্যন্ত, আমার শিল্পী-জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক কোনো বিঘ্ন ছিল না। বিঘ্ন ছিল না, দায়ও ছিল না। আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব সংসারের সমস্ত দায়ভার নিঃশব্দে নিজে বহন ক'রে চলেছিলেন, পুত্রকে তার আভাষও কোনোদিন জানতে দেননি। পুত্রবধূর প্রতি তাঁর আদেশই ছিল,—'তোমার যখন যা' দরকার, আমার কাছে চাইবে,—ওকে কখনো জানতে দেবে না।'

আ-মৃত্যু পিতৃদেব সেই দায়ভার বহন ক'রে গেছেন। আমার বৃদ্ধা মা, যিনি আজও বিদ্যমান থেকে পুত্রের সৌভাগ্যকে রক্ষা ক'রে চলেছেন, তিনিও কোনোদিন কোনো দায় চাপান নি পুত্রের ওপরে। আমার স্ত্রীও হয়েছেন তাই। আমার পুত্রকন্যাও তাই। আমি

আয় করেছি, এই পর্যন্ত। সেই আয় দিয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ, সেই আয় দিয়ে বসত-বাটী নির্মাণ, এ-সব ব্যাপারে আমি নিজে মাথা ঘামিয়েছি কতটুকু? এই যে স্মৃতিচারণ করতে বসেছি, এর যা উপকরণ একদিন সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলাম, তা পর্যন্ত হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধীরা চৌধুরী।

পরিশেষে, কৃতজ্ঞতা জানাই 'আনন্দবাজার'-এর কর্ণধার শ্রীঅশোককুমার সরকারকে, যিনি প্রথম আমাকে এ-গ্রন্থ রচনা করবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। আর কৃতজ্ঞতা জানাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ-এর শ্রীত্রিদিবেশ বসু ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এবং 'দেশ'-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষকে।

৩৯।১।এ, গোপালনগর রোড,
কলিকাতা-২৭

বিনীত
অহীন্দ্র চৌধুরী
ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অব ড্রামা,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের গিরীশ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;
মেম্বার, বোর্ড অফ স্টাডিজ ইন থিয়েটার আর্টস, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়।

এক

১৯০২—১৯১১

শিশুটি পড়ল পাঁচ বছরে, লোকে বললে,—ওর জ্ঞান হলো।

কথাটা আমরা খুব শুনি ; কথাটা খুব স্বাভাবিক। এতোটা স্বাভাবিক যে ওর ভিতরে যে-একটা আশ্চর্য অনুভূতির স্পর্শ জড়িয়ে আছে, সে-কথা আমরা ভুলে যাই।

আজ জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে, নিজের শৈশবের কথাটা ভাবতে গিয়ে, সেই অনুভূতিরই আশ্চর্য মহিমাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছি। বিংশ শতকের একেবারে গোড়াকার বছরটি থেকেই সব কথা স্মরণ করতে পারি। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স। কিন্তু তার আগেকার পাঁচটি বছর একেবারে ঘোর তমসায় আবৃত—কিছুই মনে পড়ে না।

তাই বলছিলাম, জ্ঞানোন্মেষ বোধহয় একেই বলে। হঠাৎ যেন নাটকীয়ভাবে সমগ্র চেতনার একদিন ঘুম ভাঙে, তাকিয়ে দেখি,—বিশেষ একটা ঘর, বিশেষ একটা বাড়ি, বিশেষ একটা রাস্তা, বিশেষ একটা পরিবেশ, বিশেষ কয়েকটি লোক। এদের চিনে ফেলি। রূপ, রস আর গন্ধে বিশেষ একটা জগৎ গড়ে ওঠে শিশুর চারপাশে।

আজ সেই জগৎ হয়েছে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। কতো মানুষ দেখেছি, কতো দেশ দেখেছি, দেখেছি কতো বিচিত্র ভাব ও চরিত্রধারার আবর্তন। তারা আর আমি যেন প্রবল এক স্রোতের ঘূর্ণিতে ঘুরে মরছি। আমার স্মৃতিপথে তারাও আছে, আমিও আছি—যে 'আমি'কে আমার আজকের এই পরিণত বিস্তৃত জগতের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু, আজ যা পরিণত, তারও তো একটা শুরু ছিল ?

জীবনের সেই শুরুর কথাই তো ভাবছি। ভাবতে ভাবতে আজ মনে হচ্ছে কিসের থেকে কি হলো? কিভাবে শুরু হয়েছিল, কিভাবে হবে এর শেষ? হয়ত এর একটা ছন্দ আছে, হয়ত এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, হয়ত এর সমস্ত ফুলের মধ্যে একটা লুকনো সুতোও আছে, নইলে এই জীবন-মন-মাল্য গাঁথা হয়ে উঠেছিল কেমন করে?

খুঁজছি সেই সূত্রকে, সন্ধান করছি সেই পথিক আত্মার,—বহুদিন থেকে যে চলা করেছে শুরু। তার চলায়-চলায় কাল বদলেছে, পোশাক বদলেছে, চেহারা বদলেছে—যা বদলায়নি, সেটা হচ্ছে মন।

এই মনটা করেছে কী? ক্রমাগত আত্মসন্ধান করেছে। প্রতিটি শিল্পীর মনই তো আত্মসন্ধান করে, অভিনেতারও করে। নানান মেক্-আপ আর নানান সংলাপের মধ্য দিয়ে বারবার আমরা নিজেকে দেখি—আর সেই দেখা যদি নিজের মনোমত হয়, যদি নিজেকে নিজের কাছে মুহূর্তকালের

জন্যও সুন্দর বলে মনে হয়, তো, সে আনন্দের তুলনা নেই, মুগ্ধ ভক্তের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়।

কিন্তু, নিজের কাছে নিজেকে সুন্দর লাগা কি অতই সহজ? তাই মঞ্চে সহস্র দর্শকের করতালিও এক-একদিন অভিনেতার কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়, মনে হয়—এত করেও তৃপ্তি পাচ্ছি না কেন?

জীবন সম্বন্ধেও সেই কথা। সমস্তটা জানতে পারছি না কেন? অনেকটা মনে পড়লেও, সবটা মনে পড়ছে না কেন? চার বছরের শিশু, আর পাঁচ বছরের শিশু—মনের দিক থেকে তফাত কতটুকু? অথচ চার বছর বয়সের কথা কিছু মনে নেই, মনে আছে পাঁচ বছর বয়সের কথা। এ এক অদ্ভুত রহস্যের অনুভূতি নয়? পাঁচের আগে জ্ঞান মানুষের হয়, কিন্তু বোধহয় উন্মেষ হয় না। তাই তার স্মৃতিতে সব ধরে রাখতে পারে না। সুখাদ্য অখাদ্য আছে টের পাচ্ছি, মা-বাবা আদর করছে, বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কোন্‌টা কি, কোন্ খাদ্যের কী বিশেষ স্বাদ পেয়েছিলাম, অনুভূতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আজ আর তার কোন রেখাপাত নেই।

শিশু বয়স, প্রথম যেটা মনকে আকর্ষণ করেছিল সে হচ্ছে, উৎসব। আর বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব, পুজো। এখনকার পুজোর সঙ্গে তখনকার পুজোর চেহারার তফাত ছিল অনেক। জাঁকজমক তখনও ছিল, কিন্তু তার প্রকাশটা ছিল অন্যরকম। জন-উদ্দীপনার একটা শোভনতার ভঙ্গিও বোধহয় ছিল। শিশুবয়সে আমাদের সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল, বেড়াতে যাব, প্রতিমা দেখতে যাব, নতুন নতুন জামা-কাপড় পরব, যা আজকে শিশুদের আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শিশুরা চিরকালই এক। সামান্যতেই তারা খুশি হয়, নতুন-কিছু পেলে বা দেখলে তাদের আনন্দের আর অবধি থাকে না।

কেনা-কাটার পর্যায়ে ছিল জুতো কেনা। বড়োদের সঙ্গে যেতাম। প্রথমেই ঘোড়ার গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে গাড়োয়ান আমাদের নিয়ে যেতো চাঁদনীর বাজারে। ডসনের বিলিতী জুতোর তখন খুব আদর ছিল। পাম্পশু বা টাই শু। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট তখন সরু একটা রাস্তা, দুপাশে চীনাদের দোকান। চীনে-বাড়ির জুতোরও নামডাক কম ছিল না। লাল চামড়ার গ্রীশিয়ান স্লিপার—কালো চামড়ার বর্ডার দেওয়া—সে আমাদের সেদিনকার কম ভালো-লাগার বস্তু ছিল না।

ধুতির নামডাক ছিল ফরাসডাঙার, সিমলের আর শান্তিপুরীর। বিলিতী কাপড়ের আমদানী হয়েছে, কোরা-ই বেশী দেখা যেতো, ধোয়াও ছিল। তবে ব্যবহারের দিক থেকে খানদানী ছিল ঐ ফরাসডাঙা—সিমলে আর শান্তিপুরী। ধুতির ক্ষেত্রে রুচির দিক থেকে আজকের দিনে ততোটা পরিবর্তন লক্ষ্য পড়ে না, যতোটা পড়ে জামার দিক থেকে। তখন আমরা পরতাম রামধনু রঙের পাঞ্জাবি। আজকের পুজোর দিনে সাজগোজ-করা বালকদল ঘুরছে দেখি, কিন্তু সে বিশেষ রঙের, বিশেষ ধরনের ঝিনুক-বোতাম-লাগানো পাঞ্জাবি গেলো কোথায়? আর সেই জাপানী সিল্কের রুমাল, কখনো আসমানী রঙের, কখনো সোনালী রঙের! মেয়েদের জন্য শাড়ির পাড় জুড়ে দেওয়া। সঙ্গে

সলমা-চুমকির কাজ-করা বা সাঁচ্চা জরি-বসানো ভেলভেটের জামা। ভেলভেটের জরির কাজ করা—ফ্যাশান ছিল বেনারসীর, আজো আছে। কিন্তু, যা তেমন নেই, সেটি হচ্ছে—পার্শী শাড়ি—সিন্ধীদের কাজ করা। আলাদা জরির কোট-পরা আমার একটি ছবি ছিল মায়ের সঙ্গে তোলা। সেই কবেকার ছবি! ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেল। কোথায় যে বাঁধাতে দিলুম, হারিয়ে গেল। অবশ্য, ছবিটি মনে আছে। নেকারবোকার প্যান্টের ওপর কোট আর মাথায় টুপি,—টুপিটা বাঁকা—ন্যাজ ঝুলত—তখনকার সোলজারদের জমকালো পোশাকের টুপির মতো।

সময় বদলায়, রুচিও বদলায়। সেই নিয়মে আজও বদলেছে। কিন্তু সেই ছোট বয়সের প্রথম চোখে-দেখা সেইসব ঝলমলে পোশাকের রঙ আজো যেন মন নিজের অলক্ষ্যেই খুঁজে বেড়াতে চায়। দেখতে পেলে খুশী হয়। একটু রঙের মধ্যেই সে যেন তার কৈশোরের সমস্ত রঙটাকেই খুজে পায়। তাই, সেদিনকার শৈশবের সেই ভেলভেটের কোটের সেই জমকালো রঙটাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে, বড়োদের বহরমপুরী গরদের কথা, মায়েদের লালপেড়ে গরদের শাড়ির কথা।

পুজো এতো সার্বজনীন ছিল না তখন। পুজোর আনন্দ সমস্ত দেশটা জুড়ে সমানেই হতো, প্রতিটি ঘরেই হতো। কিন্তু, প্রতিমা তখন আজকের মত পথের আনাচে-কানাচে শামিয়ানা আর তিনদিক-ঘেরা কাপড়ের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যথা-তথা শোভমানা হতেন না। বড়ো বড়ো বর্ধিষ্ণু লোকের বাড়িতে পুজো হতো। পদ্মপুকুরের মিত্তির বাড়ির পুজোর কথা মনে আছে। ডাকের সাজের প্রতিমার কথা মনে আছে।

বড়োরা শৌখিন ছিলেন, হয়ত আজকের তুলনায় একটু-বা বেশী শৌখিন। তা'বলে (এখনকার ছেলেদের মতো স্নো বা পাউডার তাঁরা মাখতেন না। সে যুগে ওটা মেয়েদেরই প্রসাধন সামগ্রী ছিল) আর যাই হোক, তাঁদের মধ্যে আতর, গোলাপজল আর ভালো সেণ্টের ব্যবহারের প্রাচুর্য ছিল, কেওড়া-দেওয়া বরফ দেওয়া জল প্রীতির বস্তু ছিল। কিন্তু আসল কথা পুজোর ব্যাপারে একটা নিষ্ঠার ভাব প্রকাশ পেতো। নিষ্ঠাও বটে, শোভনতাও বটে।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে রসুয়ে বামুনরা আসত পুজোর ভোগ রান্নার ব্যাপারে। বিরাট বিরাট কড়াই, হাঁড়ি আর হাতা-খুন্তি। পিঁড়ি আর বারকোশ। আর মাটি খুঁড়ে তৈরী-করা বড়ো বড়ো উনুন। আজও অবশ্য তা-ই দেখা যায় কিন্তু রসুয়েরা বিষ্ণুপুরী ব্রাহ্মণ কি-না জানি না।

পুজোর প্রধান প্রমোদ ছিল তখন যাত্রার পালাগান। থিয়েটারও যে হতো না তা নয়। পাবলিক থিয়েটার হতো কলকাতায়। বড়োরা দেখতে যেতেন মাঝে-মাঝে। কিন্তু পুজোর সময় পুজোবাড়ির প্রাঙ্গণে কখনও-সখনও থিয়েটার হলেও যাত্রারই সমাদর ছিল সর্বাধিক। সেই তখনকার দিনে মেয়ে-পুরুষ মিলেই কিছু-কিছু শখের থিয়েটার দল করেছিল, প্রাইভেট থিয়েটার ছিল সেগুলির নাম। পাবলিক থিয়েটারের শো ভাঙলে অধিক রাত্রে শুরু হতো তাদের অভিনয়। পাবলিক থিয়েটারের শো দেখে উত্তর কলকাতার বহু দর্শক ওখানে গিয়ে ভিড় করত।

আমাদের ভবানীপুর কিন্তু ঠিক তেমনটি ছিল না। দক্ষিণ কলকাতায় তখন কোন পাবলিক থিয়েটার ছিল না, অতএব অধিক রাত্রে শখের থিয়েটারের পালা শুরু হবারও কোন কারণ ছিল না। এই শখের থিয়েটার ছাড়া যেটা সর্বাধিক প্রচলিত ছিল, সে হচ্ছে যাত্রা।

তখনকার পুজোর সময় এই যাত্রার ধুম ছিল খুব। বাড়ির কর্তারা পুজোর উৎসবে থিয়েটারের আয়োজনের থেকে যাত্রার আসর গড়ে তোলবার দিকেই মনোযোগ দিতেন বেশী। বাঙালীর সাধারণ জীবনে প্রমোদ হিসাবে এই যাত্রার স্থান যে তখন কোথায় ছিল, তা আজকের দিনে ঠিক বোঝা যাবে না।

পুজোর সময় বাড়িতে থিয়েটার দিলে অভ্যাগত দর্শকবৃন্দের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত করতে হতো, লোকও বেশী ধরত না। পাড়ার লোক সবাইকে বলা যেতো না, অথচ, মাত্র বিশিষ্ট কয়েকজন বন্ধু ও পরিচিত মহল এবং বাড়ির লোক নিয়ে থিয়েটার দেখা তখনকার আমলের কর্তাদের পছন্দসই ছিল না। তখনকার কর্তাদের এই মানসিক ঔদার্যের কথাটা বোঝা দরকার। আমার বাড়িতে যে উৎসব, তাতে পাড়াপড়শী, অতিথি, অভ্যাগত—সবারই অংশ থাক, সবাই মিলে আনন্দ করুক এসে আমার আঙিনায়—এইরকম একটা উদার মনোভাব প্রকাশ পেতো তাঁদের আচরণে। আজকের দিনে, যেখানে অনুষ্ঠান আর উৎসব নিয়ন্ত্রিত হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী-গঠিত পূজা কমিটির মেম্বারদের দিয়ে, সেখানে সেদিনকার একক গৃহস্বামীর কর্তৃত্বের ব্যাপারটাকে কেউ যদি অহঙ্কার আখ্যা দেন তো আমি সেকথা অস্বীকার করব না—কিন্তু এও বলব, যদি অহঙ্কারই হয় তো তার প্রকাশে সচরাচর উগ্রতা ছিল না—কোনো অশোভনতা ছিল না।

যাই হোক, এইসব বিবেচনা করেই বাড়ির কর্তা যাত্রার দিকে ঝোঁকটা দিতেন বেশী। যাত্রায় দর্শকবৃন্দের মাঝখানে হয় আসর, তার চারপাশে শতরঞ্জি বিছানো থাকত ঢালাও করে—দরজা থাকত খোলা, সবারই জন্য সেদিন অবারিত দ্বার। যার খুশী এসো, স্থান থাকে বসো, শুনে যাও যাত্রার পালাগান। টিকিটের কোনো প্রয়োজন নেই। থিয়েটার হলে অবশ্য টিকিট দরকার, নইলে দর্শনার্থী জনসাধারণের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কী করে?

শৈশবে শখের ও পেশাদারী, উভয় দলেরই যাত্রা দেখেছি, তবে, সে দেখাটা ছিল শিশুর চোখ-দিয়ে-দেখা। সেদিনকার সেইসব জমকালো-পোশাক-পরা রাজা-মন্ত্রী আর সেনাপতিরা আজ হয়ত চোখের সামনে তেমন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারবে না, যেমনটি ঠিক সেদিন তারা করেছিল! কোথায় গেল সেদিনকার সেইসব রাজা-উজিরের দল—কিন্তু শৈশবের চোখ-দিয়ে-দেখা তাদের সেই গাম্ভীর্যপূর্ণ চলাফেরা আর জমকালো পোশাকের ছবি আমার এই পরিণত মন তো আজও ধরে রেখেছে!

তখনকার যাত্রা অনেকসময় মধ্যরাত্রি থেকে হতো না, ভোর থেকে আরম্ভ হতো—তা প্রায় তিন-প্রহর বেলা পর্যন্ত চলত। পেশাদারী দলের লোকেরা অবশ্য সাধারণত শুরু করত রাত ন'টা-দশটা থেকে, চালাত একেবারে সেই ভোর হওয়া পর্যন্ত। আবার পালা বড়ো হলে কখনো-কখনো সকালেও

তার জের চলত। শখের দলেরা ভোর থেকে শুরু করে একেবারে বেলা একটা-দুটো, এমন কি তিনটে পর্যন্ত পালা চালাত। দর্শকদল এতো বেলা পর্যন্ত কিন্তু সমান আগ্রহে যাত্রা শুনে চলেছে, সে এক লক্ষ্য করবার মতো বিষয়! যাত্রা শুনতে-শুনতে কেউ-কেউ উঠে দাঁড়াল, চলে গেলো বাইরে, তার পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে তার জায়গা রাখতে বলে। বাইরে গিয়ে হয়ত কিছু খেয়ে নিলো, তারপরে আবার এলো স্বস্থানে—এবার বাইরে গেলো হয়ত তার বন্ধু। এইরকম 'যাচ্ছে-আর-আসছে'-র ব্যাপার অনুক্ষণ চলছে দর্শকদের মধ্যে। কিন্তু, তাতে কোনো সোরগোল হতো না, অভিনয়ের পক্ষে কোনো বাধাও ঘটত না।

আর-একটা লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল সাজানো আসরটা। চারপাশে মান্যগণ্য ব্যক্তিরা বসেছেন আসরটাকে ঘিরে গোলাকারে। চাকর-বাকর আর বেয়ারারা বাঁধানো হুঁকো আর গড়গড়ায় তামাক দিয়ে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে বদল করে দিচ্ছে তামাক, কখনো-বা থালায় করে দিয়ে যাচ্ছে তবক-দেওয়া পান। যাত্রাও চলেছে, বেয়ারা-চাকরদেরও আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কিন্তু, তাতেও কোনো সোরগোল নেই, অভিনয়ের কোনো ব্যাঘাতও নেই। বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা ঠিক আসরে এসে বসতেন না, হয়ত বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে দু-তিন ঘণ্টা পালা শুনতেন, তারপরে চলে যেতেন ভিতরে। ঐ দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে পালা শোনাও বটে, অভ্যাগত দর্শকদের বসবার কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি-না, কিংবা আরও যে সব দর্শক বাইরে ভিড় করছে, তাদের কোনোপ্রকারে ভিতরে এনে কোথাও বসানো যায় কি-না,—এসব তদারকি করতেও ভুলতেন না কখনো।

যাত্রা হবে, সন্ধ্যে-হবো-হবো-র মুখে আসর-সাজানোর পালা শুরু হতো। আমাদের শৈশবে সে-এক মহাসমারোহের ব্যাপার। বিস্ময়ের ব্যাপারও বটে, আনন্দের ব্যাপারও বটে। শিশু-মন যাত্রার দিকে কেন ঝুঁকত বেশী, তার কয়েকটা কারণ ছিল। প্রধান কারণটাই ছিল এই যে, থিয়েটার যদিও-বা স্থানীয় শৌখিন দল কখনো-সখনো করত, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই শোনা হতো না, কারণ, তা এত রাত্রে আরম্ভ হতো যে, আমরা ঘুমিয়ে পড়তাম।

তাই, যাত্রা আর যাত্রার আসরের সঙ্গেই আমাদের শৈশবের যোগটা ছিল অধিক বিজড়িত। আসর সাজানো হচ্ছে, আমাদের হৈ-হৈ-র আর সীমা নেই! একটি-একটি করে কাজ এগুচ্ছে, আর আমাদের আগ্রহ বাড়ছে সমানে। বড়ো বড়ো ছবি চারিদিকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঝুলছে আলোর ঝলমল-করা ঝাড়লণ্ঠন, তারই আলোয় অদ্ভুত মোহময় হয়ে উঠেছে সমস্তটা পরিবেশ। লোকজন তখনো এসে জোটেনি, শতরঞ্জি আর বড়ো বড়ো ফরাশ পাতা হয়েছে, তার ওপর মধ্যিখানে জাজিম আর তাকিয়া শোভা পেতো।

আমাদের কিন্তু বড়ো ভালো লাগত এই ফরাশের ওপরে গড়াগড়ি খেতে। ফরাশের ওপরে সমবয়সী কয়েকজন মিলে গড়াগড়ি দিয়ে আমরা সেদিন যে আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি, তা আজও ভুলবার নয়!

সেসব দিন কেটে গেছে। শৈশবের সেই তন্ময় হয়ে যাত্রা দেখার দিনও আজ নেই। দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘুমে ঢুলে আসত চোখ, এক সময় ঘুমিয়েই পড়তাম। হঠাৎ এক সময় পেতাম অপেক্ষাকৃত বড়োদের কারুর করস্পর্শ—'এই যুদ্ধ হচ্ছে, দেখ দেখ।'

ধড়মড় করে উঠে বসতাম তাড়াতাড়ি। ঘন-ঘন ঢোলের আওয়াজ হচ্ছে—তার মানে যুদ্ধের বাজনা। আর ঝলমলে পোশাক-পরা দুটি লোক ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝল্‌সে-ওঠা দুটি তরবারি হাতে তুলে নিয়ে আস্ফালন করছে পরস্পরের প্রতি। দেখতে কেমন আতঙ্ক হতো, আবার ভালোও লাগত। ভালো লাগত যাত্রার একক গানগুলি, আর ভালো লাগত পাত্র-পাত্রীদের সলমা-চুমকি-দেওয়া বিচিত্র পোশাক! তাদের বক্তৃতার মানে বুঝতাম না। কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গী ও শব্দবিন্যাসে যে একটা মোহ সৃষ্টি হতো—শিশু-মনকে তা-ও আকর্ষণ করত কম নয়!

আজকে নিজেকে সন্ধান করতে করতে মনে হয় যে, সেদিন সবাই আমরা যাত্রার ফরাশে গড়াগড়ি দিয়ে যে আনন্দ পেতাম, পরবর্তীকালে আমার জীবনের সঙ্গে যাত্রার যে একটা নিবিড় সংযোগ গড়ে উঠবে—সে বুঝি তারই পূর্বাভাস।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে পড়ছে। বেলেঘাটা-মাণিকতলার ওপারে ছিল শুঁড়ো-নারকেলডাঙ্গা। সেই শুঁড়োয় ছিল আমার মামাবাড়ি। এই মামাবাড়িতে প্রায়ই তো যেতাম, সেইজন্য মামাবাড়ির পরিবেশ আমার মনে বিশেষভাবে গাঁথা হয়ে আছে। মামাবাড়ির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঐ যাত্রা। বারোয়ারি হতো। মামাবাড়ি থেকে একশো হাতের মধ্যে—প্রকাণ্ড চালার নীচে যাত্রা বসত। মামাবাড়িতে যাত্রা দেওয়া হচ্ছে, এ খবর ভবানীপুরে আমাদের বাড়িতে পৌঁছানোমাত্রই আর দ্বিরুক্তি নয়—মামাবাড়ি আমরা যাবই। মা-ও যাবেন। যাত্রার প্রসঙ্গে মামাবাড়ির কথাটা এসে যখন পড়লোই, তখন কথার ফাঁকে জানিয়ে রাখি—মামাবাড়ির প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল নানা কারণে। একটা হচ্ছে ভবানীপুরের বাড়িতে আমার বয়সী আমি একা, আর মামাবাড়িতে অনেক ছেলে —হৈ হৈ-এর সুবিধা ছিল। মামাবাড়ির সামনে পুকুর—চারিধারে দিব্যি বনজঙ্গল,— এর আকর্ষণ কম নয়! সেই সব জঙ্গলে খুব জোনাকি হতো সন্ধ্যের সময় থেকে। আমাদের প্রধান আমোদ ছিল ঐ জোনাকি ধরা। তখনকার দিনে তো আজকের মতো হাফপ্যাণ্ট পরার রেওয়াজ ছিল না, ছোট থেকেই কাপড় পরতুম। কোঁচা ফুলিয়ে জোনাকি ধরে সেই কোঁচাটা কায়দা করে শক্ত করে ধরে রাখতুম হাতে, সেই ফোলানো-ফাঁপানো কোঁচার মধ্যে থেকে পিট পিট করে জলত সেই বন্দী জোনাকিগুলো। সে বড়ো আমাদের প্রিয় জিনিস ছিল। এই জোনাকি-ধরার ব্যাপার নিয়ে কি সে সময় কম বকুনি খেয়েছি!

মামাবাড়িতে যাত্রা শুধু সেই বারোয়ারী-তলাতেই হতো না—বাড়ির একেবারে উঠোনে—ঠাকুরদালানে যাত্রা হতো জগদ্ধাত্রীপুজোর সময়। প্রসঙ্গত এ-ও বলে রাখি, মামাবাড়িতে হাতে-আঁকা একটি অপূর্ব পট ছিল জগদ্ধাত্রী-মূর্তির। সে পট বহু পুরনো। দিদিমাও বলতে পারতেন না—

করেকার। বলতেন, এটা দেখেই আসছি ছোট থেকে। পটটি এতো সুন্দর আঁকা যে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাছাড়া, ঠিক ও ধরনের পট আর কোথাও কখনো দেখিনি। অতি প্রাচীন কোন শিল্পীর আঁকা। মামাবাড়ির পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই দেবী জগদ্ধাত্রীর ভক্ত ছিলেন, নইলে অমন যত্ন করে পটটিকে রক্ষা করতেন না। মামাবাড়ি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেলেও পুরনো দিনের স্মৃতি—খানদানী জিনিস—ঐ একটিই আছে, সে হচ্ছে ঐ পট—দেড়শো বছর, কি তারও বেশী পুরনো। পট গেছে জার্ণ হয়ে—তার রঙ গেছে বিবর্ণ হয়ে—তবু তার যেটুকু আছে, বেঁচে আছে যে রেখাঙ্কন, তার শিল্পমূল্য কম নয় বলে আমার ধারণা। বড়ো লোভ ছিল ঐ পটটির ওপরে—বড়ো ইচ্ছা হতো ঐটিকে এ বাড়িতে আনবার, কিন্তু মুখ ফুটে কোন দিন কারুর কাছে তা চাইতে পারিনি—সাহসও হয়নি। কারণ, বোধ-হয় ওটি ওঁদের কুলের ভক্তদের বস্তু। সেকালের ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি আজও আছে কি-না জানি না, কিন্তু মার্বেল পাথরের বড়ো বড়ো মূর্তিগুলি আছে। তবে আজকের যে পরিবেশ, তাতে ঐ মূর্তিগুলি আর মানায় না।

তখন মানাতো, পরিবেশ ছিল অন্যরকম। একদিকে পুকুর, ঝোপ-জঙ্গল। অন্যদিকে রাস্তায় তখন জ্বলত শুধু তেলের আলো। অবশ্য খাস কলকাতার ছোট ছোট রাস্তাতেও ছিল তেলের আলো, একটু বড় রাস্তায়—গ্যাসের আলো। এই গ্যাসের আলোর সাপ্লাই ছিল ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানির। কী প্রতিষ্ঠা তখন তাদের! বহু বাঙালী এর থেকে চাকরি করে খেতো। সাধারণ লোকের সন্তুষ্টি ছিল ঐ তেলের আলোতেই। শুধু পদমর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বড়োলোকদের মধ্যে কেউ-কেউ বাড়িতে বিদ্যুৎ নিয়েছেন। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে তখনকার মানুষের মধ্যে অযথা কোন বিলাসিতা ছিল না। বিদ্যুতের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে গেল বটে, বিদ্যুৎ তখন রাস্তায় ছিল না। হগ্ সাহেবের বাজারের আশেপাশে ইংরাজ-পল্লীর দোকানে, অফিসে, অথবা বড়ো বড়ো সাহেবের বাড়িতে বিদ্যুৎ দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সাধারণ বড়োলোক বাঙালী তো বটেই, ছোট ছোট সাহেবরাও মোমবাতি জ্বালাতো। আমাদের বাড়িতেও কি তখনকার দিনে কম মোমবাতি জ্বেলেছি আমরা! কিন্তু থাক্ সে কথা।

পূর্বেই বলেছি, শৈশবের বড় আকর্ষণ হচ্ছে উৎসব। আমাদের জাতীয় উৎসব, পুজো ছাড়া, সেদিনকার কলকাতার 'বাবু-সমাজ' যে-উৎসবে উৎসাহ বোধ করতেন, অথবা জনসাধারণ যার বিচিত্র সমারোহ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতো—তা হচ্ছে বড়োদিনের উৎসব। আমরা বলতাম, বড়োদিন। কিন্তু চৌরঙ্গী অঞ্চলের কোচওয়ান, মুটে কিংবা খানসামা-চাপরাসির দল বলত—'কিসমিস'!

ক্রিসমাসকে বলত—'বড়ো কিস্‌মিস্' আর নিউ ইয়ার্স ইভকে বলত—'ছোট কিসমিস!'

এই 'কিসমিস' উপলক্ষ্যে সেদিনকার মহানগরী যে বিচিত্র উৎসব-সজ্জা ধারণ করত, অর্থাৎ যা আমরা শিশুবয়সে দেখেছি, তা আজকের দিনের শিশুরা কল্পনাও করতে পারবে না। সে তুলনায় আজকের বড়োদিনের উৎসব যা দেখা যায়, তা তো কিছুই নয়।

সাহেবপাড়ার বড়োদিনের উৎসব দেখবার সুযোগ পেতাম মামাদের দোকানে বসে। মামাদের দোকান—"শম্ভু অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স",—রাধাবাজার থেকে উঠে এসেছে লীণ্ডসে স্ট্রীটে। সেকালের লীণ্ডসে স্ট্রীটের সমারোহের সঙ্গে আজকের দিন মেলে না। ইহুদী আরমানীদের সাজানো-গোছানো সব দোকান, আর দেশীদের মধ্যে সিন্ধী দোকানদার ছিল অনেক, কিছু-কিছু বাঙালীও। বড়োদিনের সময় গাঁদাফুল দিয়ে সুন্দর করে দোকান সাজানো, আলোর মেলা, আর সাহেব-মেমদের ভিড়! অবশ্য আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্তই দেখা যেতো ভদ্র সাহেব আর মেমদের, তারপরে দলে-দলে আসত গোরা-সোলজার আর জাহাজের সেলাররা।

এদের মধ্যে উন্মত্ততা দেখা যেতো বটে সেদিন, কিন্তু কখনো কারুর সম্পত্তির ওপর হামলা করতো না। কুলিরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সেলাম করছে—খুশী হয়ে হয়ত এক টাকা পর্যন্ত বকশিশই করে দিলে।

বড়ো বড়ো সাহেবরা কেউ কেউ যেতো হোটেলে, মাথায় নানারকম বিচিত্র ক্লাউনের টুপি—হাতে নানারকম বেলুন, ক্রেপ কাগজের লতা-জড়ানো। তাদের বাড়িতেও বড়োদিন উপলক্ষে নাচ-গান হতো—সমগ্র সাহেব-পল্লী সেজে উঠত অপূর্ব এক সাজে। কিন্তু, একথা বলতে হবে, চৌরঙ্গী অঞ্চলের যে সমবেত উৎসব-সমারোহ দেখা যেতো—তার তুলনায় সে সাজ বা সে আলোকসজ্জা অনেক ম্রিয়মান।

গোরা সোলজার আর সেলাররা সমবেত গান ধরেছে রাস্তায়—চারিদিকে ভিড় আর ভিড়—সব মিলিয়ে একটা বিশৃঙ্খলার চিত্রই বটে, তবু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা সৌন্দর্য ছিল। যদি তাদের উন্মত্ততার কথাই বলতে হয় তো এতো উন্মাদনা জেগে উঠত যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা জাপানী বারনারীরা পর্যন্ত বেরুত দলবদ্ধ হয়ে। কিন্তু তবু বলব, সে-উন্মাদনারও একটা মাত্রা ছিল, একটা সীমারেখা ছিল। আর ছিল বলেই সেই সমবেত উৎসব-সমারোহে সোলজার-সেলারদের ভিড় করে দাঁড়ানোও একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত, যা আমার কিশোরমনকে মুগ্ধ না করে পারেনি।

বড়োদিন উৎসবের এই যে বিপুল জন-সমাবেশ লক্ষ্য করেছিলাম সেই বয়সে—আজকের কোন উৎসবে—সার্বজনীন পূজামণ্ডপে বা বিজয়ার ভাসানে—তার তুলনায় কিছুই ভিড় হয় না—তবু তা অনেক সময় পুলিস বা স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু সেদিনকার সমারোহ এভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নই তখন ওঠেনি। তারা ছিল স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত দল,—সারি-সারি রাস্তার ওপর আসছে, গান গাইছে আর চলে যাচ্ছে। মেতে উঠত তারা, প্রবল ছিল তাদের উন্মাদনা,—কিন্তু তা' ছিল যতোটা মানসিক, ততোটা দৈহিক নয়। মনটা মেতে উঠেছে, হাত-পা নয়।

যাই হোক যা বলছিলাম। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বড়োদিনের এই উন্মাদনার লীলা দেখেছি। ১৯১৪-তে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে পেশাদারী গোরার দল সব গেলো চলে। সে জায়গায় এলো "Territorial Force.", তারা অধিকাংশ ছাত্র। তারা ছিল আরও সংযত—অতো মাতনও তাদের

ছিল না। আরও একটা জিনিস তাদের মধ্যে আমরা সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম যে সৈনিকই হোক বা সাধারণ কর্মচারীই হোক—ইংরেজ মাত্রেরই মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ ছিল। জাতি যে বিপদে পড়েছে—এ বোধ ছিল তাদের সর্বক্ষণ, সেইজন্য সেদিন তাদের সবকিছুর মধ্যেও একটা গাম্ভীর্য ছিল বিরাজমান। বাঙালীর দোকানগুলিও সেদিন নানানভাবে সাজানো হতো ফুল-লতা-পাতা দিয়ে, তার মধ্যে শোভা পেতো ইংলণ্ডের রাজারানীর ছবি। এই রাজারানীর ছবি যেন তাদের আরও আকর্ষণ করত দোকানে উঠে আসতে—এটা-ওটা-নেড়ে-চেড়ে জিনিসপত্র কিনতে।

সেইসব দিনের কথা ভাবতে ভাবতে এই কথাই আজ মনে হয়, ছোটবেলার সেই বড়োদিনের সমারোহ দেখার আশ্চর্য চমক,—সেই যে সব চোখধাঁধানো দৃশ্যাবলী—তার আবেদন সেদিনকার কিশোর-মনে যে অপূর্ব আলোকরেখা ফেলেছিল, তা কি কখনো ভুলবার? আরও ভুলবার নয় আর-একটি দিনের কথা। সমারোহের দিক থেকে আমাদের কাছে তা প্রকৃত বড়োদিন বলেই মনে হয়েছিল।

মহারানী ভিক্টোরিয়া মারা যাবার পর, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন-প্রাপ্তির উৎসবও সমাপ্ত হয়ে গেছে। রাজবংশীয় কোন এক পুরুষ—নামটা ঠিক আজ মনে পড়ছে না—বোধহয় ডিউক অব কনট্ (সম্ভবত সম্রাট এডোয়ার্ডেরই ভাই) তিনি এসেছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। সে উপলক্ষ্যে অভূতপূর্ব আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল মহানগরী, হয়েছিল বিচিত্র ও বিপুল আতসবাজীর ব্যবস্থা। অন্যান্য আমোদপ্রমোদও ছিল।

রাজপুরুষ সেদিন রাত্রে 'বেঙ্গল ক্লাব' থেকে ভোজ শেষ করে আবার ফিরে আসবেন রাজভবনে। সেই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ উপলক্ষ্য করেই আলোকমালায় সাজানো হলো সমগ্র চৌরঙ্গী, ডালহাউসী স্কোয়ার এবং হাইকোর্টের সুউচ্চ সৌধশিখর। আলো, আলো আর আলো। যেন ইন্দ্রপুরী। ভট্টিকাব্যের সেই উপমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, প্রাসাদাবলীর আলোকসজ্জায় অযোধ্যাপুরী যেন স্বর্গের অলকাপুরীকেও লজ্জা দিচ্ছে। ভট্টিকাব্যের উপমা সেই বয়সে মনে পড়ার কথা নয়, কিন্তু আজকের চোখ দিয়ে সেদিনকার সেই হারানো দৃশ্যকে পুনর্দর্শন করতে গিয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গির কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায়। সারা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ভিতরটা, ধর্মতলা, লিণ্ডসে স্ট্রীট অঞ্চলের বিভিন্ন-জাতীয় আলোকসজ্জা, সারা বাঙালীটোলার আলোকসজ্জা, সে এক আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি করেছিল সেদিনকার কলকাতাবাসীর মনে। সত্যিই সে এক বিচিত্র উন্মাদনা জাগিয়ে তোলার মতো দীপান্বিতার রাত্রি! কতো লোক যে সেদিন সেই আলো দেখবার জন্য পথে-পথে বেরিয়ে এসেছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই। সেই অভাবিত লোকারণ্যকে সে যুগের এক মনে রাখবার মতো বিশালকায় শোভাযাত্রা বলা যেতে পারে। কেউ হেঁটে গেছে, কেউ ফেটিংগাড়ি করে গেছে, কেউ পাল্কীগাড়ি চড়ে গেছে।

আমরাও গেছি। আমরা বসেছি গাড়ির মাথায় কম্বল বিছিয়ে, মেয়েরা ভিতরে। এইরকম লাইন বেঁধে ঘোড়ার গাড়ির সার চলেছে ত চলেছেই। একের পর আর।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে সব লালমুখো সার্জেন্ট। লোয়ার সার্কুলার হয়ে চৌরঙ্গী ঘুরে এসপ্ল্যানেড। তারপরে হাইকোর্ট। হেস্টিংসের ভিতরের দিকে—স্ট্র্যাণ্ডে সার-বাঁধা জাহাজগুলির আলোকমালা দেখে ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশ দিয়ে দিয়ে তারপরে ফিরে এসেছিলাম ভবানীপুরে। সেই সন্ধ্যায় বেরিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাত একটা হলো। আমি ততোক্ষণে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

এক এক মোড়ে গাড়িকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হতো পাশের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য। যদি কোন গাড়োয়ান এগিয়ে যাবার অতি আগ্রহে লাইন ভাঙার চেষ্টা করত তাহলে সার্জেন্টরা ঘোড়ারগাড়ির গাড়োয়ানের কাছ থেকে ছপ্‌টি কেড়ে নিয়ে বেদম মার মারত তার পিঠে। গাড়ির ছাদের অন্য আরোহীদের ওপরও পড়ত ছপ্‌টির বাড়ি। কিন্তু তাতে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ থাকত না। যেমন মনে পড়ে, মোহনবাগান শীল্ড নেবার পর থেকে ফুটবল মাঠে যখন দুর্দান্ত ভিড় হতে লাগল, তখন মাউন্টেড পুলিস ভিড় সামলাতে না পেরে এলোপাথাড়ি চাবুক চালাত। এ-ও অনেকটা সেইরকম ব্যাপার আর কী! তবু আলো দেখতে হবে, পিঠে চাবুক পড়লেও দেখতে হবে।

আলো দিয়ে বাড়ি সাজাবার যে পদ্ধতি ছিল তখনকার তা-ও কম চিত্তাকর্ষক নয়। যেগুলি সরকারী বাড়ি—যাদুঘর থেকে রাইটার্স বিল্ডিং, কাউন্সিল হাউস, হাইকোর্ট, মনুমেণ্ট প্রভৃতি সব সেদিন সাজানো হতো ফুঁকো শিশি দিয়ে। সেগুলি কিন্তু শিশি আদৌ নয়, অনেকটা ফুলদানির মতো, মোটা কাঁচের, রঙীন। তাতে তার বেঁধে বাড়ির দেওয়ালে পেরেক ঠুকে সেগুলি টানিয়ে দিতো। এতে দিতো রেড়ির তেল, সলতেও দেওয়া থাকত। আলো জ্বাললে চার-পাঁচ ঘণ্টা জ্বলত, হাওয়ায় নিভত না।

তখন ফ্লাড লাইটিং বা ইলেকট্রিসিটির প্রচলন ততো ছিল না। দু-একটি দোকান, যেমন কুক কেলভির বা হ্যামিল্টনের বাড়ি ইলেকট্রিক আলো দিয়ে সাজাত মাত্র। আর অন্যত্র ছিল ঝাড়ের কলস, ক্রিস্টাল ড্রপস্ কলস বা তারা। তাতে তার দিয়ে দিয়ে এক একটি চমৎকার ডিজাইন হতো। বিশেষ করে রাজবংশের এমব্লেম তৈরী করে দিতো—"Ich-Dien"-এর ভিতরে আলো দিয়ে জ্বালানো হতো। মনে হতো যেন অসংখ্য রত্নরাজি আশ্চর্য বিভায় ঝলমল করছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এইরকম জিনিসেরই তৈরী বড়ো একটা তারা, তার ব্যাস হবে পাঁচ থেকে আট ফুট,—তারার ফলকগুলি বেঁকানো বেঁকানো, পুরানো স্টার থিয়েটারের মাথায় জ্বলত! পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন তা একটা দেখবারই বস্তু ছিল বটে।

ফুঁকো শিশিরও বাহার বড়ো কম ছিল না। ইলেকট্রিকের ঔজ্জ্বল্য তাতে ছিল না বটে, কিন্তু স্নিগ্ধতা ছিল।

এইসব জাঁকজমকের পাশাপাশি আরও একটি উৎসবের ছবি আবছা মনে পড়ে। এতো সমারোহের উৎসব সেটা অবশ্য নয়, কিন্তু সেই বালকবয়সে আমাদের চোখে সেটাই লাগত বড়ো হয়ে।

এ উৎসব হচ্ছে একেবারে দেশী উৎসব, চড়কের আগে নীল-উৎসব ও চড়কপুজো। এই নীল-উৎসব

হতো চড়কের আগের দিন। এক মাস ধরে যারা শিবের 'সন্ন্যাস' ধারণ করত তারা যোগ দিতো এই দিন গাজনে। বিচিত্র মুখোশ পরেছে কেউ, কেউ করেছে অদ্ভুত সাজসজ্জা, কোনও দলের সঙ্গে ঢাক-ঢোল, কোন দলের সঙ্গে বা বিলিতী বাজনা। রাস্তার ওপর দিয়ে সে এক রীতিমত মিছিল। দেখতাম, দলের পর দল চলেছে উত্তর কলকাতা থেকে হেঁটে—হাতে তাদের তালপাখা—কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিবের পুজো দিতে। শিবের মাথায় জল দিয়ে পুজো শেষ করে কালীঘাটেরই পোটোপাড়ায় এসে ঢুকত সং সাজতে।

ভবানীপুরের রসা রোড তখন ছিল চন্দ্রনাথ চাটুজ্যের গলির সামনে। এখনও আছে। কিন্তু তখন রসা রোড এখনকার মতো এতো চওড়া ছিল না। তখনকার গলির মাথা বলতে যে জায়গাটা আমি বোঝাতে চাই, সেটির অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত হয়ে মিশে গেছে বিস্তৃত রসা রোডের গর্ভে। এই যে গলির মাথা, এখানকার এক স্বর্ণকারের দোকানে বসে আছি, বাইরে যাওয়া বারণ। দেখছি, উত্তর কলকাতার দিকে—এখন যেমন সার্বজনীন পুজোর বিভিন্ন দল রাস্তা দিয়ে সমারোহসহকারে দল বেঁধে হেঁটে যায়,—ঠিক তেমনি বিভিন্ন সন্ন্যাসীর দল আসছে আর চলে যাচ্ছে কালীঘাটের দিকে। হাতে অনেকের আবার লাল সালুতে লেখা তাদের নাম, যেমন—আহিরীটোলা, চোরবাগান ইত্যাদি। পোটোরা তাদের মুখে-গায়ে রঙ মাখিয়ে দিতো, কেউ কেউ পরত মুখোশ। কেউ কেউ আবার সাজত সাহেব আর বিবি,—সেজে, পথের ওপর দিয়ে নির্বাক অভিনয় করতে করতে চলেছে,—কতো রকমের ব্যঙ্গ-কৌতুক যে আসত তখন। ঠিক এই ধরনের সব ব্যঙ্গ-কৌতুক বা রঙ্গতামাশা উত্তর কলকাতার বিখ্যাত জেলেপাড়ার সংএ প্রাচীনেরা হয়ত অনেকে দেখে থাকবেন।

এইরকম ভিড় চলত সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত। আমরা অবশ্য দুটো পর্যন্ত দেখতে পেতাম না, বারোটা কি বড়ো জোর একটা পর্যন্ত এসব দেখা চলত। ততোক্ষণে বাড়ি থেকে বহুবার ঘন ঘন ডাক এসে গেছে, ওরে বাড়ি আয়।

কে কার কথা শোনে! শেষে চাকর এসে জোর করে বাড়ি নিয়ে যেতো।

আর ছিল নীল-উৎসব। চড়কের মেলা। চড়ক গাছ ঘোরা। তার পরের দিনই আবার পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ—হালখাতার সমারোহ। দোকানে দোকানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি আর গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। তার পরে হাতে দিচ্ছে এক-একখানি করে খাবারভর্তি সরা। সকালবেলা কালীঘাটের মন্দিরে ভয়ানক ভিড়, আজকের মতোই অবশ্য।

নীল-উৎসবের সং সে বয়সে আমার মনে অদ্ভুত ছাপ ফেলেছিল। এই সং-দের যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করতাম তা যেন আবার আমার স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সকালে ছিল, ঐ যা বললাম, নানান ধরনের সাজ আর ব্যঙ্গ-কৌতুক। সন্ধ্যায় ছিল শিব-পার্বতী সাজবার পালা। শিব-পার্বতী সেজে গান গাইত তারা, ছড়া কাটত। আর থাকত কনসার্ট বাজনা। ভবানীপুরে তখন ছিল তিন-চারটে কনসার্ট পার্টি। তারা ঐ শিব-পার্বতীর পিছনে পিছনে খোলামাথা ঘোড়ার গাড়িতে বসে কনসার্ট বাজাতে বাজাতে যেতো। শিব-বিবাহের গানও চলত সঙ্গে সঙ্গে।

আড়গড়াতে তখনকার দিনে কনসার্ট যাবার জন্য দু-ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতো। তার মাথাটা খোলা, ভিতরে আট-দশ জন পর্যন্ত বসত। বড়ো বড়ো বিবাহ-উৎসবে 'লোবো'র ব্যাণ্ড যেতো, অন্য সব উপলক্ষ্যে ছোট ছোট কনসার্টও ছিল। এইসব ঘোড়ার গাড়িকে বলত ক্যারাভ্যান; ধর্মতলাতে 'আড়গড়া' ছিল ঐসব ভাড়াটে গাড়ির আড্ডা। কুক্, হার্ট, মিল্টন এই ছিল সেই সব কোম্পানীগুলির নাম যারা ক্যারাভ্যান ভাড়া দিতো।

তখনকার দিনে সবের মধ্যেই 'সং-রং-ঢং' যে-রকমটি দেখা যেতো আজ তা নেই। আরও একটি জিনিস তখন ছিল যার অপভ্রংশ এখনও হয়ত কলকাতার আশেপাশে কোথাও কোথাও কেউ দেখে থাকবেন। জিনিসটা হচ্ছে, পুতুলখেলার অভিনয় বা চলতি কথায় যাকে বলে পুতুল-নাচ। রথের সময় যেমন সমবেত সঙ্গীত দেখা যেতো, রাসের সময় তেমনি ছিল ঐ পুতুল-নাচ বা বলা ভালো, পুতুল-নাট্য। পুতুল নিয়ে নাচিয়েরা এক একটি কাহিনীকেই ব্যক্ত করত, পৌরাণিকই বেশি, কখনও-বা সামাজিক।

গাজনের উৎসব আমার ভবিষ্যতের শিল্পী-জীবন গড়ে ওঠার মূলে কাজ করেছে অনেকখানি। এই যে নীলোৎসব, এর সঙ্গে বাঙলার আদিকালের শিবের গাজন উৎসবের একটা ঐতিহ্যগত পরম্পরা ছিল। পল্লীতে পল্লীতে 'সন্ন্যাসী'দের দ্বারা এই উৎসব বিচিত্র এক প্রাণোচ্ছল রূপ ধারণ করত। তার সঙ্গে ছিল গান, ছড়া আর অভিনয়। এ চলে আসছে বাঙলার সেই কোন্ অতীত যুগ থেকে। আমি তার অনেক টুকরো টুকরো জীবন্ত চিত্র শৈশবে দেখেছি বলে গর্ব অনুভব করি। সেযুগে যেমন প্রাচীন বাঙালীরা নানা দেবদেবীর গাজনে, নৃত্য-গীতে মেতে উঠতেন তেমনি আমাদের যুগেও দেখেছি শিশু বা কিশোররাই শুধু নয়, যুবক ও প্রৌঢ়রাও সমান আনন্দে মেতে উঠতেন। বর্ধমানে বোড়ো গ্রামে আঠারো হাত বলরামের মূর্তি আছে, চাষী গ্রাম আছে, হলধরের গাজন হয়। শক্তিগড়ে নেমে দামোদর পার হয়ে যেতে হয়। ওই বোড়ো গ্রামের গাজন-উৎসব ছিল সুবিখ্যাত। এই গ্রামেরই লোক, তারাপদ কোঙার তার নাম, সে ছিল আমাদের গৃহভৃত্য। তার কথা পরে আরও আসবে। সে ছিল যাত্রাদলের প্রাক্তন ব্যক্তি। তার মুখে মুখে এই গাজন-উৎসবের কতো বর্ণনা যে সেই বয়সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

এই সময়ে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বোধহয় সেটা ১৯০২ সাল। ঘোড়ার ট্রাম উঠে গিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ইলেকট্রিকের ট্রাম হয়! ঐ যে আগে স্বর্ণকারের দোকানের কথা বলেছি, সেই দোকানের সামনে টুল পেতে বসে আছি ট্রাম দেখতে। নতুন ট্রাম আসবে তাই দেখব।

বাড়ি থেকে ঘন ঘন ডাক আসছে, ওরে খেতে আয়, খেতে আয়।

—না, যাব না। ঐ ট্রাম আসছে।

মোটা 'তার, তামার। একেবারে ঝকঝক করছে। কখনো ওপর দিকে তাকিয়ে সেই তার

দেখছি, কখনো নীচে লাইন দেখছি। ভাবছি কোথা দিয়ে ট্রাম যাবে? ঐ ওপরের তার দিয়ে, না নীচের লাইন দিয়ে?

সমবয়সীরা বসে-বসে তর্ক করছে, ওপর দিয়ে যাবে না নীচে দিয়ে যাবে?

রাস্তার দুপাশে তখন কাতারে কাতারে লোক।

হঠাৎ এক সময় শোনা গেল সেই উন্মুখ জনারণ্যের মধ্যে এক বিপুল উল্লাসধ্বনি।

দূর থেকে দেখলাম, দুখানা গাড়ি ঢং-ঢং করতে করতে কাছাকাছি এলো, এসে, সামনে দিয়েই চালিয়ে নিয়ে গেল। সে দেখে কী যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম সেদিন, তা আজও অনুভব করতে পারি। চিন্তার অবসান হয়েছিল, ওপর দিয়ে নয়, নীচের লাইন ধরেই ট্রাম গিয়েছিল বটে!

দেখবার আরও একটা জিনিস ছিল। সে হচ্ছে, সেকালের 'বর-বউ'। 'বর-বউ' নিয়ে শোভাযাত্রার সমারোহ। 'মহাপায়া' বলে এক ধরনের পালকি ছিল, নৌকোর মতন, হাঙরমুখী। বাহকেরা রীতিমত পোশাকপরা। 'মহাপায়া' কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে সার দিয়ে আর বউ বসে আছে ভিতরে। তখন বউ যেতেন আলাদা, বর থাকত অন্য পালকিতে। 'মহাপায়া'য় বউ বসে আছে, টকটকে লাল বেনারসী পরে, পাতলা চাদর বা ওড়নায় ঢাকা তার আনত মুখখানি, মাথায় সিঁথিমৌর। পালকির দুপাশ খোলা, তাতে ঝালর দেওয়া। বউয়ের দুদিকে দুই ঝি হেঁটে চলেছে পাখার বাতাস করতে করতে। বউয়ের বয়স দশ, কি বারো বছর। বউ শ্বশুরবাড়ি যেতো সাধারণত দিনের বেলা, অতএব, আলোর প্রশ্ন আসে না। এই বউ-দেখার আগ্রহ ছিল মানুষের প্রচুর। কারণ, এই বউ-দেখাও ত একমাত্র একটি দিনের জন্য। এই যে সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করছে, এর পরেই ত সে চলে যাবে একেবারে চিক্-এর অন্তরালে, তারপরে আর কেউ ত তাকে দেখতে পাবে না!

—কাদের বউ যাচ্ছে গা! —হয়ত বর্ষীয়সী কেউ উন্মুখ হয়ে চলমান ঝি-টিকে প্রশ্ন করল।

—অমুক বাড়ির বউ। উত্তর আসছে।

—আহা, বেঁচে থাক মা, সাবিত্রী-সমান হও।

বালিকা-বধূর আনত মুখখানি কিন্তু স্থির হয়ে আছে, যেন পুতুলের প্রতিমা, প্রাণস্পন্দন আছে কি নেই!

আর, বর যেতো শোভাযাত্রা করে সন্ধ্যেবেলা। বউ আসছে শোভাযাত্রা করে, সে ত বিয়ের পর। আর 'বর'দের বেলা শোভাযাত্রার আধিক্য ছিল বিয়ে করতে যাবার সময়। বিরাট আলোকসজ্জা হতো। বরেরা পরতও তখন অদ্ভুত জমকালো পোশাক, ভেলভেটের সাচ্চা পোশাক—মাথায় তাজ, চতুর্দোলার ওপরে বসে আছে যেন ঝলোমলো সিংহাসনের ওপরে রাজপুত্তুরটি! সেই সিংহাসন বয়ে নিয়ে চলেছে বাহকেরা। বরের দুপাশে দাঁড়িয়ে সুবেশা ইহুদী মেয়েরা চামর

দোলাচ্ছে, সে এক দেখবার মতই দৃশ্য ছিল বটে। তখন ঐরকম শোভাযাত্রায় চামর দোলাবার জন্য ইহুদী মেয়ে ভাড়া পাওয়া যেতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কেউ কেউ ইহুদী মেয়ে ভাড়া করার বদলে যাত্রাদলের ছোঁড়া ধরে সখি সাজিয়ে বরের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এ-ও দেখা যেতো।

এই আলো আর সিংহাসন, তার সঙ্গে ছিল আবার বাজনার সমারোহ। আগে যে গাজনের কথা বললাম, তাতেও বাজনার প্রাচুর্য ছিল, কোনো কোনো দলের সঙ্গে গোরাবাজনা থাকত। গাজনের মতো বিবাহের শোভাযাত্রাতেও গোরাবাজনা আনা হতো, বরং আরও বেশী সমারোহের সঙ্গে বলা যেতে পারে। এই গোরাবাজনা ছিল প্রকৃতপক্ষে মিলিটারী ব্যাণ্ড, ফোর্ট থেকে ভাড়া করে আনা যেতো। তবে উৎসব বলে কথা, ঠিক নিয়ম না থাকলেও বাজিয়ে-সাহেবদের মদ্যপান করতে দিতে হতো। কিন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যেতে লাগল, তারা ক্রমশ বেসামাল হয়ে পড়ছে। তাই একদিন ফোর্টের কর্তৃপক্ষ এটা বন্ধ করে দিলেন। গোরাসাহেবদের বদলে আসতে লাগল ইণ্ডিয়ান ইনফেনট্রি ব্যাণ্ড —রাজপুত জাঠ মারাঠা শিখ—এই সব সৈনিকদের সম্মিলিত ব্যাণ্ড-বাদ্য।

বিবাহ উপলক্ষে মাত্র শোভাযাত্রা বাবদ যে কী বিরাট আড়ম্বর ছিল, আর কী বিপুল যে ছিল তার ব্যয়বাহুল্য তা আজকের দিনে ঠিক বোঝা যাবে না। তখনকার দিনে লক্ষ টাকা খরচা হতো এক-একটা সমারোহে, আজকের দিনে সেই লক্ষ টাকারই বা মূল্য কতো! কথায় বলত,—'বাঁধা রোশনাই।' বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত 'বাঁধা রোশনাই'—পর পর লোক দাঁড়িয়ে যেতো আলোর মালা হাতে নিয়ে। তবে, দূরে-দূরে বিয়ে হলে এটা অবশ্য সম্ভব হতো না। পরবর্তী কালে কলকাতার 'ট্রাফিক রুলস'-এর সম্প্রসারণের ফলে 'বাঁধা রোশনাই'-এর চলন উঠে গিয়েছিল। 'বাঁধা রোশনাই' আমিও চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি। এসিটিলিন-এর গ্যাসের আলোর 'চলমান রোশনাই' অবশ্য প্রচুর দেখেছি। আলো-দেওয়া চলমান বড়ো গেট ছোট গেট হতো—পাঁচ-ছ'টি ঘোড়সওয়ার সামনে যেতো। 'আড়গড়া' থেকে ঘোড়সওয়ার ভাড়া পাওয়া যেতো, তারা যেতো শোভাযাত্রার আগে আগে। তারপর ফিটনগাড়ি, ল্যাণ্ডোগাড়ি। কখনো-বা চার কিংবা ছ'ঘোড়ায় টানা ল্যাণ্ডোগাড়িও দেখা যেতো। মাঝে মাঝে তুবড়ি জ্বালানো হচ্ছে, দীপক তারাবাজি লাল আলো নীল আলো— হয়ত-বা এক সময় একটা হাউই হুশ করে আকাশে উঠে গেলো। আর ছিল শোভাযাত্রার মধ্যে বিরাটকায় নকল হাতি, নকল উট, কৈলাস পাহাড়। আরও কিছু ছিল। ছিল চলতি পুতুলনাচ। পিছনের দিকে থাকত বরযাত্রীর দল, ঘরের জুড়িগাড়ি বা পালকিগাড়ি চড়ে। একেবারে শেষের দিকে থাকত ভাড়া-করা গাড়িগুলো।

এই যে সব বিবাহকালীন বিপুল সমারোহের শোভাযাত্রা, এ দেখতে মানুষের পক্ষে আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'বর আসছে' 'বর আসছে' শুনলেই যে লোক ছুটে গিয়ে রাস্তার দু'পাশে কাতারে কাতারে ভিড় জমাবে, এ আর বিচিত্র কী! বাড়িতে বাড়িতে চিকের আড়াল, সেখানে মেয়েদের ভিড়!

জয়পুরে দেখেছি, হাতিতে বর যাচ্ছে, সামনে রাস্তায় চলেছে বাঈনাচ খেমটানাচ। এটা অবশ্য কলকাতায় কখনো চোখে পড়েনি।

যাই হোক, অনুরূপভাবে রাজপুত্তুরের বেশে শোভাযাত্রা করে বিবাহ করতে যাওয়া ক্রমশ নতুন বরেদের পক্ষে অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল বোধহয়। তাই বরেরা একদিন বেঁকে বসল। প্রথমেই বিদ্রোহ করল তারা এই রাজপুত্তুরের থিয়েটারি পোশাক নিয়ে। পরে ঐভাবে 'বাহিত' হওয়া নিয়ে। ফলে বরেদের দেখা যেতে লাগল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে জুড়িগাড়ি করে প্রথমে আগের মতোই একা একা, পরে খরচ কমাবার জন্য বউ নিয়ে বাড়ি ফিরত। আজ দেখি, জুড়ির জায়গায় হয়েছে মোটরগাড়ি। সেদিনকার জুড়িগাড়িকে যেমন সাজানো হতো, তেমনি ফুল দিয়ে সাজানো আজকালও হচ্ছে অনেক মোটরগাড়িকে। কিন্তু ব্যতিক্রমও দেখছি। সম্ভবত ফুল দিয়ে-সাজানোর ব্যাপারটা আর দেখতে পাব না বলে মনে হচ্ছে।

এবার আবার নিজের কথায় আসি। যখন পাঁচ বছরে পড়লাম, সেই সময়কার কথা। স্কুলে ভর্তি হবার আগে হাতে-খড়ি হবে। সে-ও এক অনুষ্ঠানের পর্ব।

খবর গেল পুরোহিত-বাড়িতে। পুরোহিত এসে পাঁজি দেখে দিন স্থির করে ফর্দ করে দিয়ে গেলেন। সাধারণত সরস্বতীপুজোর দিনই ছিল হাতে-খড়ি দেবার প্রশস্ত দিন। অবশ্য পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে যায়-যায়, অথচ সামনে সরস্বতীপুজোর দিন নয়—সেক্ষেত্রে পুরোহিতই স্থির করে দিতেন বিদ্যারম্ভের দিন। অবশ্য আমি পেয়েছিলাম সরস্বতীপুজোর দিন। পুজোর নানা উপচার পঞ্চগুঁড়ির আসনে ঘটস্থাপনা করে মা সরস্বতীর পুজোর ব্যবস্থা হল, ধূপধুনো মালাচন্দন নৈবেদ্য ইত্যাদি।

ঘুম থেকে ওঠামাত্রই মা বললেন, কিছু খাবে না, আজ তোমার হাতে-খড়ি।

আমাকে নিয়ে স্নান করিয়ে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দিলেন। কপালে দিলেন চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা। এইভাবে সেজে পুরুতঠাকুরের পাশের আসনে গিয়ে বসলাম।

পুরোহিতমশায় নিজের পুজো-অনুষ্ঠান শেষ করে আমাকে স্তব পাঠ করালেন, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ালেন। তারপরে শ্লেটে রামখড়ি দিয়ে 'অ-আ-ক-খ' সমস্ত লেখালেন, হাত ধরে সেটা মুঠো করে ধরে আবার খড়ি দিয়ে কয়েকবার বুলোলুম। সেই হলো আমার বিদ্যারম্ভ। ছেলে তখন হয় উলঙ্গ থাকবে আর নয়ত কাপড় পরবে, হাফ-প্যান্ট পরত না। তবে, স্কুলে যাবার সময় ধনী ঘরের ছেলেরা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট পরত।

তারপরে ভর্তি হলাম স্কুলে,—'চক্রবেড়িয়া শিশু-বিদ্যালয়'। সেটা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দশ মিনিটের পথ। জগুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে চক্রবেড়ের মোড়ে, যেখানে নফরচন্দ্র কুণ্ডুর স্মৃতিস্তম্ভটি আছে সেইখানটায় ছিল ঐ শিশু-বিদ্যালয়ের ভবন।

নফরচন্দ্র কুণ্ডুর কাহিনী হয়ত অনেকেরই জানা। রাস্তার ড্রেনের ম্যানহোল খুলে নীচে নেমে কুলিরা ময়লা সাফ করত। তেমনি একদিন একটি কুলি নেমেছে, কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনে তখন জমা

ময়লার দরুন তৈরী হয়েছে বিষাক্ত গ্যাস। সেই গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে গেছে অসহায় লোকটি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে পারছে না। ওপর থেকে গোঁ-গোঁ একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। নফরচন্দ্র ঠিক সেই সময় যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। তিনি শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন, তারপরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে নিজেই নেমে পড়লেন ড্রেনের মধ্যে লোকটিকে তুলে আনবার জন্য। লোকটিকে কোনক্রমে তুললেন বটে, কিন্তু নিজে পড়লেন সেই বিষাক্ত গ্যাসের কবলে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ করে দিয়েছিল কর্পোরেশন।

এই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের কাছে আরও এক স্মৃতি বহন করে। কারণ, এর কাছেই ছিল আমাদের স্কুল-বাড়িটা। একতলা বাড়ি—উঁচু ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। রাংচিস্তিরের বেড়া-দেওয়া সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, ছেলেদের সেটা খেলাধুলা করার স্থান।

সেই স্কুলে যাওয়াই হলো আমার বাইরের রাস্তাঘাট ভালোভাবে দেখা। প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্যি। এর আগে বাইরে বেরুবার সুযোগ ছিল না। মায়ের সঙ্গে যাচ্ছি মামাবাড়ি, কি সার্কাসে, কি থিয়েটারে, সব সময়ই ঘোড়ার গাড়ি করে জানালার সব পাখি বন্ধ করে।

কিছু আগে তারাপদ কোঙারের নাম করেছি। সে প্রথমে ছিল মামাবাড়ির বিশ্বস্ত এক ভৃত্য। সে শুধু আমাকেই যে কাঁধে করে স্কুলে নিয়ে গেছে তা নয়। আমার মার ছোটবেলায় মাকে নিয়ে গেছে স্কুলে, মাসিমাদের নিয়ে গেছে, মামাদেরও নিয়ে গেছে। পূর্বেই বলেছি, তার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রামে, দামোদরের তীরে। তার ভীষণ শখ ছিল যাত্রাগানের। তার ছোটোবেলা থেকে গ্রামের যাত্রাদলে ঢুকে সে করত যাত্রাগান। কিন্তু সেখানেই তার সেই দুর্দান্ত শখ সীমারেখা মানেনি। এখন হয়েছে কী, কী-এক যাত্রা-দল তখন কলকাতা থেকে গেছে তাদের গ্রামে পালাগান করতে। তাদের অভিনয় আর জাঁকজমক দেখে তারাপদ গেলো একেবারে মুগ্ধ হয়ে। সে করল কী, এই যাত্রাদলের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে একেবারে পালিয়ে এলো কলকাতায় তাদের সঙ্গে। আমার মামাবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো হতো এবং সেই উপলক্ষ্যে হতো যাত্রাথিয়েটার প্রভৃতি। এ ছাড়া, মামাবাড়ির একশো গজের মধ্যে ছিল বারোয়ারীতলা, সেখানেও যাত্রা হতো। তারাপদদের দল ওখানে একবার এসেছিল যাত্রা করতে। কিন্তু, যাত্রার দলে ঢুকে তারাপদর খাওয়া-দাওয়ার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এবং হওয়াটা অন্তত তখনকার দিনে অস্বাভাবিক ছিল না। একটা প্রচলিত ছড়াই ছিল :

> 'তেল মাখবে থাবা থাবা,
> পাশ ফিরে শোবে বাবা।
> খোঁদল দেখে পাতবে পাত,
> তবে খাবে নীলকমলের ভাত।'

'নীলকমল' হলো যাত্রার যিনি অধিকারী। 'নীলকমল' নামটা বিখ্যাত প্রাচীন ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'স্বর্ণলতা', যার নাট্যরূপ 'সরলা' একদা বাঙলার নাট্যমঞ্চে প্রভূত সাফল্য এনে দিয়েছিল, সেই বইয়ের বিশিষ্ট চরিত্র। 'নীলকমল' নাম থেকে প্রেরণাসম্ভূত কি-না, কে বলতে পারে! এখন, এই যে 'নীলকমল', অর্থাৎ যাত্রার অধিকারী, তিনি দলের ছেলে-ছোকরাদের শিক্ষা দিতেন এই বলে যে, যখন দলের পাচকঠাকুর স্নানের জন্য সরা করে সবাইয়ের জন্য তেল দিয়ে যাবে, তখন সেই তেল ধীরেসুস্থে হাতে-পায়ে-গায়ে মাখতে গেলে আর পিঠে-মাথায় কুলোবে না। কারণ সবাই একসঙ্গে সরাতে হাত ডোবাবে সব তেল ফুরিয়ে যাবে; অতএব থাবা থাবা করে আগে গায়ে-মাথায় তেল লাগিয়ে নিয়ে পরে ঘষে ঘষে গায়ে-পিঠে মাখো। আর পাশ ফিরে শোওয়া মানে একটা গোয়ালঘরের একপাশে বা একটা চালার নীচে যাত্রাদলের অতোগুলো লোককে হয়ত শুতে হবে, চিত হয়ে আয়েস করে শুতে গেলেই পাশের লোক গুঁতো মেরে আবার দেবে পাশ ফিরিয়ে। এবং ফের পাশ ফিরতে গেলে, প্রায় দাঁড়িয়ে তবে পাশ ফিরতে পারা যাবে এমন সঙ্কীর্ণ জায়গা। অতএব নীলকমল বলছেন—'বাবাসকল পাশ ফিরে একভাবে শুয়ে থাকার অভ্যেসটা কর। এবার 'খোঁদল দেখে পাতবে পাত!' খোঁদল মানে গর্ত। অর্থাৎ খাবার জন্য মাটির ওপর পাতা পেতে দিয়ে গেলে সেই পাতা মাটিতে গর্ত বা নীচু মতন দেখে তার ওপরে পাতবে—তা হলে সেই খোঁদলে তবু একটু ডাল-ঝোল জমা হবে, কারণ গর্তের ভিতর পাতাটা নেমে গেলেই বাটির মত হবে জায়গাটা।

এর থেকে অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে, তখনকার দিনে যাত্রাদলের লোকদের কী কষ্টই না করতে হতো 'যাত্রা' করার জন্য!

তারাপদ মামাবাড়িতে যাত্রা করতে এসে একদিন কথায় কথায় কী করে যেন আমার দাদামশাইয়ের কাছে তার দুঃখের কথাটা জানিয়েছে। শুনে দাদামশাইয়ের মনে খুব দয়া হল। ছেলেমানুষ ও, দলে মিশে বড় কষ্ট পাচ্ছে ত?

—কাজ করবি? বাড়ির কাজ? দাদামশাই প্রশ্ন করেন।

—করব।

সেই থেকে তারাপদ স্থান পেয়েছিল মামাবাড়িতে। বয়সে ছেলেমানুষ, কী আর করবে, তামাক সাজত, আর বাড়ির ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেতো, স্কুল থেকে নিয়ে আসত।

আমি যখন হলাম, মা যখন মামাবাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে এলেন বাড়ি, দাদামশাই বিশ্বাসী আর ভালো লোক দেখে তারাপদকে দিলেন আমাদের সঙ্গে, মায়ের সুবিধার জন্য, ছেলে মানুষ করার জন্য।

এই তারাপদ আমার শৈশবকালের স্মৃতিতে এক মোহময় স্থান অধিকার করে আছে, তাকে আমি কেমন করে ভুলব?

আমাকে সে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে বলা চলে। ছোটবেলায় বাবা-মা আমাকে ডাকতেন খোকা, সেও দেখাদেখি বলত খোকাসাহেব।

খাটত সে খুব, এমন কি ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, এসবও সে করেছে।

আমি তার পিঠে গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, তাতে সে বিরক্ত হওয়া ত দূরের কথা বরং খুশীই হত।

এত ভালবাসা তার ছিল। আমার ছেলেমেয়েকেও সে ঐভাবে মানুষ করেছে।

'চক্রবেড়ে শিশু-বিদ্যালয়'-এ ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে আমাকে। তারাপদর ওপরে ছিল আমাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার ভার। কিন্তু অতটা পথ কি খোকা সাহেব হেঁটে যাবে? কখনই তা হবে না তারাপদ বেঁচে থাকতে; অতএব সে আমাকে কাঁধে করে স্কুলে যাওয়া-আসা করত। স্কুলে যাবার পথে পড়ত জগুবাবুর বাজার। সেটা আগে ছিল একতলা, নীচু ছাদওয়ালা। আর ফুটপাতের থেকেও নীচু জমিতে ছিল বাজারের ভিতরটা। এই বাজারের দেয়ালে যেখানে ফাঁক পাওয়া যেতো, সেখানেই থাকত সেকালের থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড। শুধু বাজারের দেওয়ালেই বা কেন? মোড়ের সব দেওয়ালগুলিরই এক অবস্থা। সাদা কাগজের ওপরে লাল-নীল হলদে হরফে সব অভিনেতাদের নাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃত মিত্র, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ইত্যাদি। তাছাড়া থিয়েটারের নাম 'ক্ল্যাসিক' 'মিনার্ভা' 'স্টার' ইত্যাদি। রঙচঙে লেখা ত খুবই আকর্ষণীয় মনে হতো। অক্ষর পরিচয়ও হয়েছে। তারাপদর কাঁধে চড়ে যাচ্ছি, তাই উঁচু থেকে বেশ বানান করে পড়ে যেতুম। সবই নতুন লাগত, কিন্তু মনে যে খুব একটি রেখাপাত করত তা নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, তখন সারা কলকাতা আর হাওড়ার অঞ্চল জুড়ে সবশুদ্ধ মোড় ছিল দুশোটি, দুশো পোস্টার-প্ল্যাকার্ডের হিসেব ছিল তখনকার থিয়েটারের। পরে আমরা যখন থিয়েটারে ঢুকলাম তখনও ছিল সেই দুশো মোড়ের হিসাব। আমাদের থিয়েটারে প্রায় দশ বছর কাটবার পর সেই মোড় হল আড়াই শো।

বাড়িতে হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে আসত থিয়েটারের ঝিয়েরা মেয়েদের কাছে, কিন্তু সেই হ্যাণ্ডবিল যদি বাড়িতে কোথাও কিংবা আমার হাতে বাবা দেখতে পেতেন ত তাঁর রাগের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না। হ্যাণ্ডবিল ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতেনই, তদুপরি প্রশ্ন করতেন, কোত্থেকে এলো এসব?

মা হয়ত উত্তর দিতেন, থিয়েটারের ঝিয়েরা এসে বাড়ি বাড়ি বিলিয়ে গেছে।

—ঐসব ঝি মেয়েদের কখনো বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

এমনি ছিল থিয়েটারের প্রতি বাবার বিরাগ।

কিন্তু ঝিয়েদের বাড়িতে ঢুকতে না দিলেই বা কি হবে? তারা করত কী, খোলা জানালা দিয়ে বৈঠকখানা ঘরে হ্যাণ্ডবিলের কাগজগুলি ফেলে দিয়ে যেতো। সেগুলি সংগ্রহ ক'রে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলতাম। মা চাকরদের হুকুম দিলেন, ঘর ঝেঁটিয়ে কাগজগুলি রাস্তায় ফেলে দিবি।

থিয়েটারের ঝিয়েদের মধ্যে বন্দোবস্ত ছিল, এক-একদিকে এক-একজন হ্যাণ্ডবিল বিলি করে আসবে। পরে দেখছি ব্যাপারটি শুধু কি তাই? মায়েরা যখন ছেলেপুলে নিয়ে থিয়েটারে গেলো, তখন সেই ছেলেপুলেরা ঘুমিয়ে পড়লে তাদের শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা করার ভার ছিল ঐ ঝিদের ওপরে। তাছাড়া, বাবুরা নীচে থেকে ডাকলে মায়েদের ডেকে দিতোও তারা। মায়েদের জন্য পান এনে দেওয়া, খাবার এনে দেওয়া, অন্যান্য সুখ-সুবিধা দেখা, এসবও ছিল ঝিয়েদের কাজ। মায়েরা অবশ্য যাবার সময় ঝিদের বকশিশও দিয়ে যেতো। সেই বকশিশের টাকা-পয়সা যে যা পাবে, সব একসঙ্গে করে ঝি-দের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। আঁচল পেতে সবাই গোল হয়ে বসেছে, আর দলের মধ্যে যিনি প্রধানা, (তার পাওনা একটু বেশী, আর সবাই পাবে সমান) পয়সা গুণে গুণে সবাইকে ন্যায্যমতো ভাগ করে দিচ্ছে, এ-ও এক দেখবার মতো দৃশ্য ছিল।

আমাদের সময়ও আমরা ঐটা দেখেছি। হয়ত থিয়েটারের অভিনয়ের কাজের পর পালা ভাঙবার আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে আসছি, তাকিয়ে দেখি বাইরের চত্বরে ঝিয়ের দল গোল হয়ে বসে তাদের পয়সা ভাগ করছে এক মনে।

থিয়েটারে উঁচুতলায় মেয়েদের দেখবার জায়গা থেকে নীচে পর্যন্ত যে থাক থাক সিঁড়ি ছিল তার প্রতিটি চত্বরে বসে থাকত একটি করে ঝি। হয়ত নীচে কোন বাড়ির বাবু এসে সর্বনিম্ন চত্বরের ঝি-টিকে বললেন, অমুক বাড়ির মেয়েদের ডেকে দাও ত?

তখন সেই নিম্নতম চত্বরের ঝি-টি ওপরের চত্বরের ঝিকে চেঁচিয়ে বললে, অমুক বাড়ির মেয়েদের বাবু ডাকছেন। সে আবার ওপরের ঝি-টি অনুরূপভাবে তার ওপরের ঝিটিকে বলবে।

এমনি করে ওপর থেকে ওপর। উঠে দাঁড়ালেন সেই অমুক বাড়ির মেয়েরা। ঝি তাঁদের সঙ্গে করে নীচে নিয়ে এসে 'বাবুর' হাতে সঁপে দিলে। এই ডেকে দেওয়া ছিল তাদের কার্যতালিকার অন্যতম সূচী।

যাই হোক, ক্রমশ ঐ থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল-প্লাকার্ড আমাকে একটু একটু করে যেন আকর্ষণ করতে লাগল। হয়ত মনের অবচেতন-স্তরের প্রতিক্রিয়া, কে বলতে পারে?

তখন মনে প্রশ্ন জাগত, থিয়েটার-থিয়েটার কানে আসছে বটে, কিন্তু থিয়েটার ব্যাপারটা কী? স্টার, মিনার্ভা সব নাম পড়ছি প্লাকার্ডে, এগুলি কি? যাত্রা সম্বন্ধে অবশ্য আবছা একটা ধারণা ছিল। আশে-পাশে কোথাও যাত্রা হচ্ছে। তা সকাল পর্যন্ত ত তখন যাত্রা চলত, তাই বায়না ধরলে তারাপদ কাঁধে চড়িয়ে তার খোকাসাহেবকে একটু যাত্রা শুনিয়ে আসত। কিন্তু সে আর কতটুকু? জমকালো পোশাক, আর তরবারির ঝক্‌ঝকানি কী যে ভালো লাগত তা বলার নয়। সবটা দেখতে পেতাম না বলে মনটা ভার হয়ে থাকত বটে, তবে যাত্রার গল্প খুব শুনতাম তারাপদর কাছে। রাত নটায় শুরু হতো যাত্রা। আটটার মধ্যে আসর থেকে ফিরে এসেছি আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত শুনছি কন্‌সার্টের বাজনা, কিংবা দূরাগত গানের সুরধ্বনি, হয়ত বা রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতিদের বক্তৃতারও

ছাড়া ছাড়া দুটো একটা কথার রেশ! তখন ত এতো মোটরগাড়ি, হৈ-চৈ-গোলমাল ছিল না রাস্তায়, তাই রাত নিঃঝুম নিশুতি হয়ে আসতে দেরি হতো না। এখন যেটা আশুতোষ মুখার্জী রোডের ডি. এন. মিত্র স্কোয়ার; ওটাকে বলত কোম্পানীর বাগান। চারদিকে বাগান, মাঝখানে পুকুর। তার সামনের পাড়াটাকে বলত—সরকারপাড়া। এই সরকারপাড়া, তারপর ওদিককার কাঁসারীপাড়া। এসব জায়গায় ছিল বহু শখের যাত্রার দল, তাদের কনসার্টের বাজনা প্রায়ই বাড়ি থেকে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম।

কিন্তু যাত্রা ত বুঝলাম, থিয়েটার বস্তুটা কী? একদিন শুনলাম কাছেই থিয়েটার হবে। সারাদিন ধরে তার তোড়জোড় চলছে। বিস্ফারিত চোখে সব দেখছি, আর ভিতরে ভিতরে কী যে উত্তেজনা হচ্ছে, তা আর কী বলব? এই বাঁশ আসছে, তক্তপোশ আসছে, দড়ি আসছে, শাবল আসছে, কাটারি আসছে। থিয়েটার ক্লাবের লোকেরাই বাঁশ বাঁধছে, তক্তপোশ বসাচ্ছে, আর পাড়ার ছেলেরা ফাইফরমাশ খাটছে। আমাদের কেউ হয়ত বললে, ঐ যে উঠোনে শাবল দিয়ে গর্ত করছে, ঐ বোধ হয় রাম সাজবে!

—রাম!

দুটি চোখ বড়ো বড়ো করে রামকে দেখতাম। কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত গুটানো, খালি গা, সারা গায়ে ঘাম আর ধুলো, রাম হয়ত গলদঘর্ম হয়ে বাঁশ পোঁতার জন্য গর্ত করছে। পরে যখন নিজেরা থিয়েটার করতাম, তখন বুঝতে পেরেছিলাম, থিয়েটারের জন্য এই বাঁশের কাঠামো গড়ে তোলা কম পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল না। আর বাঁশই কি লাগত কম? প্রসেনিয়াম বা একেবারে সামনের দিককার অংশের জন্য লাগত ওপরে-নীচে আটখানা মোটা মোটা বাঁশ। ওপরে দু'খানা, নীচে দুখানা; আর দু'পাশের জন্য দুটো দুটো চারটে। ছোটবেলার চোখে এই প্রসেনিয়াম বাঁধার ব্যাপারটা দেখতে মন্দ লাগত না, যেন একটা উৎসবের আমেজ এনে দিতো ঐ বাঁশের চৌকা কাঠামোটা। যেন থিয়েটারের মহিমার সূচনা করছে ঐ আটখানা বাঁশের কঙ্কাল। অনুরূপভাবে পিছনের জন্যেও লাগত মোটা বাঁশ দুখানা দুখানা এবং তারও ওপরে দুটো, হল ছ'খানা। আবার সামনে-পিছনে বাঁধন দেবার জন্য লাগত দুখানা এড়ো বাঁশ। তাছাড়া পাশে সিন বাধবার জন্য একমানুষ কি দেড়মানুষ উঁচুতে সিফটাররা বেঁধে রাখত এপাশে একখানা ওপাশে একখানা, এই দুখানা বাঁশ। তদুপরি আছে মঞ্চ প্রস্তুত করবার জন্য খানকতক তক্তপোশ। তা-ও শক্ত করে লাগাবার জন্য ছোটো ছোটো বাঁশ দিয়ে খুঁটি করতে হতো। সেই তক্তপোশের মঞ্চ যখন তৈরী হল, তখন দেখতুম, তার ওপরে বেশ করে বিচুলি বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিচুলি বিছানোর পর সারা মঞ্চ জুড়ে শতরঞ্জি টানটান করে পেতে পেরেক দিয়ে পুঁতে দিতো, সখীদের নৃত্যের সময় যাতে না শতরঞ্জি গুটিয়ে যায়। এই বিচুলি দেওয়ার রহস্য ছিল এই যে, এতে করে যুদ্ধের মৃত্যুর সময় ধপাস করে পড়লেও তেমন গায়ে লাগবে না, অথবা 'পতন ও মূর্ছা'রও অনেক সুবিধা হতে পারে।

কথা যখন শুরু হলো, তখন আর একটু বলি। কাঠামো তৈরী হলেই থিয়েটারের সব আয়োজন শেষ হলো না, এর পরে আছে সিন-সিনারীর ব্যাপার, ড্রপ খাটানোর ব্যাপার। অনেক ক্লাবের নিজস্ব সিন ছিল না, তারা ভাড়া করে আনত। আবার অনেকের নিজস্ব সিন ছিল, এমন কি পোশাকও ছিল। ঠাকুরদালানের ওপরে চালি বেঁধে সিনটিনগুলিকে রেখে দিয়েছে, প্লের সময় সেগুলি নামাও, দেখ কী অবস্থায় আছে তারা? দেখা গেল বিরাট বনস্পতির হয়ত সবুজ পাতা আর ডালপালা ঠিক আছে, কিন্তু গুঁড়িটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের অলিন্দ ঠিক আছে, কিন্তু থামগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর কী! তখন জনকয়েক নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে গেল রঙ আর তুলি নিয়ে। দেখতে দেখতে আবার বনানী হয়ে উঠল উজ্জ্বল, রাজপ্রাসাদ পূর্ব গরিমায় আবার হয়ে উঠল গরীয়ান।

সিন্‌ও খাটানো হলো, তারপরে আলোকের ব্যবস্থা। এসিটিলিন গ্যাস-এর ফুট-লাইট দিত সাধারণত। যারা একটু খয়রাতি করতে পারত, অর্থাৎ মুষ্টিমেয় যে কয়টি ছিল ধনীজনপোষিত ক্লাব, তারা ভাড়া করত লাইম-লাইট, কী কায়দায় করত জানি না, কিন্তু হয়ে যেতো যেন দিনের মতো ফর্সা, তীব্র সাদা আলো, পরবর্তীকালের ফোকাসের এফেক্ট আর কী!

কিন্তু এসব ধারণা ত হয়েছিল পরে, তার আগের কথাটা কী? আমাদের বাড়ি তখন ছিল চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটে, রসা রোড থেকে একখানা বাড়ি পরে। সেখান থেকে থিয়েটারের নাচের বাজনা বা গানের সুর শুনছি, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, দেখার ত উপায় নেই! সারা সকাল আর বিকেল যেখানে 'বাঁশ-তক্তপোশ সিন্‌-ড্রপ' দেখে কাটালুম। থিয়েটার হবার আগেই বাড়িতে সেই যে বন্দী হয়েছি, সেখানে কী যে আলো-টলোমল ব্যাপার চলেছে, তা আর দেখতে পাচ্ছি না! বাবাকে জিজ্ঞাসা করবার সাহসই হতো না, মাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে ধমক খেতুম। তখন অগত্যা অগতির গতি সেই তারাপদ। সে বলত, কলকাতার বড় থিয়েটার দেখিনি, তবে বাড়ির থিয়েটার দেখেছি। উঁচু মাচার ওপর হয়।

—সে ত দেখলুম, তক্তপোশ সাজিয়ে উঁচু করছে।

—তাতে আঁকা পট লাগায়।

তা-ও ত বিকেলে গিয়ে দেখলুম, লাগাচ্ছে।

তারাপদ তখন বিব্রত হয়ে উত্তর দিতো,—ওটা এক রকমের যাত্রাই। বুঝলে না? আসরে যাত্রা গায়, থেটারে গায় না, তারা বক্তৃতা করে।

তারাপদ নিরক্ষর ছিল। অ্যাক্টিংকে সে বলত, বক্তৃতা। আর 'কলকাতা' বলতে সে বোঝাত, উত্তর কলকাতা। সে কেন, তখন সবাই তাই বলত।

ধরুন ভবানীপুরের হয়ত দুই প্রতিবেশী কথা হচ্ছে, : 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'···উত্তর এলো 'এই একটু কলকাতার দিকে যাত্রা মনস্থ করেছি।'

ভবানীপুর, কালিঘাট, চেতলা, খিদিরপুর, এসব হচ্ছে উপকণ্ঠ। শহর তখন লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে শুরু হ'য়ে উত্তর দিকে ছড়ানো।

যাই হোক, বাবা কখনও তেমন বকতেন না বা মারতেন না, কিন্তু ভয় করতুম বাবাকে ভীষণ। আর ভয় করতুম মা'র ধমককে। মা আমাকে শৈশবে এমন এক মুখভঙ্গি করে ভয় দেখাত যে ভীষণ ভয় হতো আমার। বলত, ঘুমুবি না, ঘুমো শীগ্‌গির। ঐ দেখ্।

মার মুখভঙ্গি দেখে দু'চোখ বুজে ফেলতাম তাড়াতাড়ি। তার কারণ, মায়ের এই মুখভঙ্গি দেখে আমার মনে আরেক বিকট মুখভঙ্গির স্মৃতি জাগরূক হয়ে উঠত।

মুখে মুখোশ আঁটা, সারা গায়ে টকটকে লাল আলখাল্লা, মাথায় বিরাট জটা, বিরাট বড়ো বড়ো দুটো টিনের হাত, শ্যামা পাগলী সন্ধ্যে হলেই পাড়ায় বেরিয়ে পড়ত। নাকীসুরে অদ্ভুত একটি আওয়াজ আর মুখভঙ্গী করে তার টিনের লম্বা হাতটা পাততে, কখনও বা ঘুরে ঘুরে নাচত আর "খ্যাঁক" "খ্যাঁক" করে আওয়াজ তুলে গানও গাইত। তার টিনের হাতে একটা কি দুটো পয়সা দিলেই হাতটা উঁচু করত সে, আর পয়সাগুলি সেই টিনের হাতের ফুটো দিয়ে সরসর করে নীচে নেমে তার নিজের হাতের মুঠোয় গিয়ে পৌঁছত। সেই পয়সা তার আলখাল্লার ঝোলা পকেটে রেখে, আবার বাড়াত তার সেই পেল্লায় টিনের হাত। এই শ্যামা পাগলী শৈশবে আমাদের কাছে কি কম আতঙ্কের ছিল। শ্যামা পাগলী আসছে—একথা কানে আসামাত্রই রাস্তার বা রক্-এর সব ছেলের দল একবারে ফর্সা—তার 'হোজ-হোজ' চীৎকার কানে আসতে-না-আসতে যে যতো তাড়াতাড়ি পারছে বাড়ির ভিতরে দে-ছুট!

অতি শৈশবে আমার হয়েছিল কী, একদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় কুঞ্জবাবু মাস্টার মশাইয়ের কাছে বসে প্রথম ভাগ পড়ছি, এমন সময় ঠিক পাশের জানলার কাছেই নাকিসুরে শব্দ হ'ল, 'খ্যাঁঘো-খ্যাঁঘো!' চমকে জানলার দিকে তাকাতেই, বিকট মুখভঙ্গী!—ও, কে রে?

নিদারুণ ভয়ে চীৎকার করে একেবারে কুঞ্জবাবুর কোলে মাথা গুঁজে দিলাম। এবং সেই যে দিলাম, আর ওঠাই না।

উনি যতো বলেন 'ওরে ওঠ্-ওঠ্! শ্যামা পাগলী চলে গেছে?' ততো চোখ বন্ধ করে কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি! বুকের ঢিপঢিপানি যেন আর কমতেই চায় না।

এইভাবে দিন যায়। বছরও বাড়ে, বয়সও বাড়ে। যাত্রা-থিয়েটার-কন্‌সার্টের আকর্ষণ থাকতেও লেখাপড়ার চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকল। তখন আমার ৮।৯ বছর বয়স, 'চক্রবেড়ে শিশু-বিদ্যালয়' ছেড়ে ভর্তি হলুম গিয়ে মিশনারী সোসাইটি স্কুলে, সেভেন্থ্ ক্লাসে অর্থাৎ এখনকার ক্লাস ফোর্ এ। কিন্তু, এই বিদ্যালয়-পরিবর্তনের পিছনেও আমার এক চিত্তাকর্ষক স্মৃতি বিজড়িত আছে, তা এখানে বলে নিই।

একবার গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ির মেয়েরা যাবেন দেশে, বিশেষ করে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে। গ্রামের নাম,—"বাগআঁচড়া।" নামের যথার্থ অর্থ বলতে পারব না। যদি ব-এ

আকারের সঙ্গে "ঘ" থাকত, তাহলে "বাঘ"-এর সঙ্গে আঁচড়ের একটা সংযোগ করে নেওয়া যেতো। কিন্তু "বাঘ" নয়, "বাগ্"। ব-এ আকারের সঙ্গে "গ" এর সংযোগটা আরও স্বাভাবিক এইজন্য যে, গাঁয়ে আছে বাগদেবীর পীঠস্থান। মন্দির আছে, কিন্তু মূর্তি নেই, আছে ঘট। একটা পাঠ বা বেদী মতন করা আছে মন্দিরের ভিতরে। সম্ভবত কোনো মহাপুরুষ এ পীঠে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁর সাধনায়। তাঁরই স্মৃতির ক্ষীণ সূত্র ধরে এখানে এক সময় একটা মেলা হয়। এক সময় ওটা ছিল ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান। গ্রামের কোলে বড়ো একটা বিল আছে, তাকে লোকে বলে বাগ্দেবীর বিল। এই বিল কিন্তু স্বয়ংসম্ভূত। অর্থাৎ যাকে বলে, ন্যাচারাল স্প্রিং। এ বিলের সে-ই হচ্ছে উৎস। এ-বিল বয়ে গিয়ে পড়েছে গঙ্গায়।

গ্রামটা গঙ্গা থেকে মাইলখানেক দূরে হবে। শান্তিপুর থেকে চার-পাঁচ মাইল উত্তরে। রাণাঘাটে নেমে বড়ো রেলের সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে বড়ো লাইনেরই এক শাখাপথ ধরে দু'মাইল যেতে হতো চূর্ণীঘাট পর্যন্ত। চূর্ণীঘাটে খেয়া পার হয়ে পরপারের আঁশতলাঘাট থেকে লাইট রেলওয়ের ছোটগাড়ি ধরে শান্তিপুর, দিগনগর হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যেতে পারা যেত। এই ছোট গাড়ি মার্টিন লাইনের ছোট গাড়ির মতো অতো সভ্য ছিল না। গাড়ির ফার্স্টক্লাস ছিল না বললেই চলে, হয়ত বা একটিমাত্র থাকত, ঠিক মনে নেই। কামরাগুলির মাথায় অবশ্য টিনের চাল থাকত, কিন্তু দুপাশে দেওয়াল ছিল না, দুটি পাশই ফাঁকা। ভিতরে বেঞ্চি পাতা থাকত, অবশ্য ঠেস দিয়ে বসা যেত সে-সব বেঞ্চিতে, আর ফুট-বোর্ডের ওপর দিয়ে দিয়ে চলাফেরা করা যেত। আর ও-দুপাশে থাকত ক্যাম্বিশের পর্দা, বৃষ্টি আটকাবার জন্য। সেগুলি অর্ধেক ছিঁড়ে গেছে, পুরানো হয়ে গেছে, আর রেলগাড়ি যতো যাচ্ছে 'পোঁ-ঘ্যাস-ঘ্যাস' করে, ঐ পর্দাও দুদিকে দুই ডানার মতো হাওয়ায় ঝটপট করছে।

হয় শান্তিপুর না গোবিন্দপুরে (এটা আরও কাছে হয়) নেমে গরুরগাড়ি করে দেশে যেতে হতো। "বাগ্আঁচড়া" আমাদের গাঁ বললুম বটে, তবে ওটা আমাদের পৈতৃকবাড়ি ছিল না। বাবার ওটা মামারবাড়ি। অর্থাৎ আমার পিতামহ এই গ্রামের বসুবাটীতে বিবাহ করেছিলেন। স্থানীয় বসুবাটী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন বংশের ছিল। তখনকার মতো জঙ্গল এখন আর নেই, আর সেকালের ম্যালেরিয়াও নেই। তখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে লোকজন ওগাঁয়ে ছিল কম।

প্রসঙ্গত বলে রাখি আমাদের পৈতৃক বাস ছিল, কৃষ্ণনগর থেকে হাঁসখালির পথে তেঘরিয়া বা তেঘরে গ্রামে। সে ভিটে আমি কখনো চোখে দেখিনি, তবে, শ্বশুরের ভিটে একবার চর্মচক্ষে দর্শন করতে হয় বলে আমার মা একবার গিয়েছিলেন। খানিকটা ইঁটের ঢিপি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরবর্তী কালের কথা বলছি। আমি মাকে নিয়ে কৃষ্ণনগর পৌঁছলাম। সারাদিন শহর ঘুরে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে স্টেশনে বসে রইলাম, এক কাকা এসে মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন একটি বারের জন্য মাকে তাঁর শ্বশুরের ভিটে দর্শন করাতে। এই ভিটেতে একটা প্রাচীন বেলগাছ ছিল, খুব বড়ো বড়ো বেল হতো,

একটা বড়ো বাতাবী লেবুর থেকেও বড়ো দেখতে। যাই হোক মা ঐ ইঁটের ঢিপিকেই দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করে আবার ফিরে এসেছিলেন স্টেশনে কিছুক্ষণ পরেই।

কিন্তু বলছিলাম আমি "বাগ্‌আঁচড়ার" কথা। আমার বাবার মাতামহরা ছিলেন দুই ভাই। বড়ো ভাইয়ের একটি মাত্র সন্তান, তা-ও কন্যা-সন্তান—তিনি আমার ঠাকুমা। সেই হিসাবে বড়োতরফের সম্পত্তি পেয়েছিলেন আমার ঠাকুমা। এবং উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা আবার পেলেন বাবা।

এই "বাগ্‌আঁচড়া"তে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এক গ্রীষ্মাবকাশে যে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে পড়লুম এক সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ায়। কলকাতায় ফিরে এসেও ছ'মাস আমি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে রইলুম। পালা করে জ্বর আসত। শুকিয়ে গেলুম। দুর্বল হয়ে পড়লুম। অ্যালোপ্যাথি করে কিছুই হলো না। কী-কী সব ওষুধ আর কুইনিন খাইয়ে একেবারে হলদে করে ফেলেছিল আমাকে। শেষকালে গোপী কবিরাজ—তখনকার দিনের নামকরা কবিরাজ—তাঁর ওষুধ খেয়ে নিরাময় হয়ে উঠলুম। মনে আছে, জ্বরের পর খেতে দিয়েছিলেন পানফলের পাতলা রুটি এবং একটু মাগুর মাছের ঝোল—শুধু হলুদ দিয়ে রান্না করা।

পরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে যশিডিতে—সাঁওতাল পরগণায়। প্রায় চার মাস ছিলুম। জল হাওয়া এতোই ভালো যে, সাত দিনের মধ্যে ডাল খেতে পারলুম। দেখতে দেখতে সুস্থ হয়ে উঠলুম। এখান থেকে ফিরে, আর 'চক্রবেড়ে শিশু-বিদ্যালয়' নয়, একবারে লণ্ডন মিশনারী স্কুল। ওরা পরীক্ষা করে আমাকে সেভেন্থ্ ক্লাসে ভর্তি করে নিল।

স্কুলটা ছিল পোড়াবাজারের কাছে। এলগিন রোড ও রসা রোডের সঙ্গমস্থলের অঞ্চলকে বলে পোড়াবাজার। ওখানে এখনো সে স্কুলটির মোটা মোটা থাম দেখতে পাওয়া যায়। ওর কম্পাউণ্ড আরও বড়ো ছিল—এখন মারটিন হ্যারিসের ওষুধের দোকান হয়েছে। সামনের ট্রাম রাস্তাটা এখনকার মতো এতো বড়ো ছিল না, আরও সরু ছিল—ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বড়ো করে দিয়েছে। ভিতরে ছিল মস্ত লন্—বাগান—মিশনারী শিক্ষকদের কোয়ার্টার—বোর্ডিং ইত্যাদি। এই স্কুলে সবশুদ্ধ পড়েছিলাম সাত বছর।

এই সাত বছরের প্রথম দু-তিন বার উল্লেখ করার মতো কিছু ঘটনা নেই। ফিফ্‌থ ক্লাস পর্যন্ত ছিল মুখে মুখে পরীক্ষা। ফিফ্‌থ ক্লাসে উঠেছি যখন, তখনকার কথায় এসে পড়েছি। ইতিহাস, ভূগোল পড়ানো হতো ইংরাজীতে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটো বিষয়েই আমার প্রচুর আগ্রহ ছিল। ইতিহাসে পেতাম গল্পের আস্বাদ, আর ভূগোলে পেতাম দেশবিদেশের খবর। বিশেষ করে ভূগোলের রঙবেরঙের বড়ো বড়ো মানচিত্রগুলি কিশোর-মনকে আকর্ষণ করত সর্বাধিক। বিভিন্ন প্রদেশ বা দেশ বিভিন্ন রঙে রয়েছে বিস্তৃত মানচিত্রে ছড়িয়ে, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হতো, কী সব দেশের খবর ওতে আছে? সব কী জানা যায় না?

তার অব্যবহিত পূর্বে ছিল মুখস্থ করে কবিতা আবৃত্তি করার ঝোঁক। একটি কবিতার দুটি চরণ এখনও বোধ'হয় স্মরণ করতে পারি,—

কৈলাসপর্বত মাঝে যত ধাতু ছিল,
তার মাঝে স্বর্ণ আসি লৌহরে নিন্দিল।

কিন্তু, সমধিক আগ্রহ জাগত—ভূগোলে। ইতিহাসেও। স্মরণশক্তিটাও ছিল। এই দু'টো বিষয়ে ফুলমার্কই পেতাম। মিশনারী শিক্ষকেরা এমন সুন্দর করে পড়াতেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা শুনতাম। বলা কর্তব্য, মিশনারী শিক্ষকেরা বাঙলাও ভালো জানতেন। স্কুলে অবশ্য বাঙালী শিক্ষকও কয়েকজন ছিলেন।

এইরকমই একটি সময়ে, আমার বয়স তখন ন'দশ বছর, ১৯০৩ কি ৪ সাল হবে, সর্বপ্রথম থিয়েটার দেখবার সুযোগ হল। বাবা কিন্তু ভীষণ বিপক্ষে ছিলেন থিয়েটার দেখার। আমি ত দূরের কথা, মার পক্ষেও থিয়েটার দেখা সম্ভব ছিল না। অথচ আমার বাবা ৺চন্দ্রভূষণ চৌধুরী ছিলেন তদানীন্তন রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটারের একজন ডিরেক্টর, অবশ্য উক্ত থিয়েটারের শেষ অবস্থায়। শরৎচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা এ'কথা অনেকেই জানেন। ইনি গত হবার পর প্রখ্যাত নাট্যাচার্য ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটার চালাতেন এবং উনিই ছিলেন লেসী। এই বেঙ্গল থিয়েটারই রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার নাম নেয় ১৮৯১ সালে। ঐ সালে ঐ থিয়েটার দেখতে আসেন কুইন ভিক্টোরিয়ার নাতি—সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রথম পুত্র—প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর, পঞ্চম জর্জের বড়ভাই। প্রিন্স ভিক্টরেরই রাজা হবার কথা ছিল, ইনি হঠাৎ মারা যেতেই পঞ্চম জর্জ রাজা হয়েছিলেন। এই প্রিন্স ভিক্টরের উপস্থিতিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যই নামের আগে 'রয়্যাল' শব্দটির আমদানী হল 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর আগে। বিহারীবাবুই লেসী ও পরিচালক ছিলেন, পরে ডিরেক্টর নিয়েছিলেন আমার বাবাকে এবং গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজনকে। ১৯০১ সালে বিহারীবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার উঠে যায়। অন্য নামে থিয়েটার পরে চলতে আরম্ভ করলেও বাবা আর ওখানে যাননি।

এইভাবে থিয়েটারের সঙ্গে বাবার একটু সংযোগ থাকার জন্যই বোধহয়, তখনকার থিয়েটার জগতের কাছে বাবা সম্যক পরিচিত ছিলেন। বাবাকে ও'জগতের সবাই জানতেন "ভূষণবাবু" বলে। থিয়েটারের লোকেরা তখন নতুন পালা ধরা বা খোলা-কে উপলক্ষ্য করে কালীঘাটে আসতেন পুজো দিতে। অমনি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতে ভুলতেন না। নৃপেন্দ্রনাথ বসু আসতেন। বাঁশী বাজাতেন ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আসতেন। আসতেন হুটবিহারী বসু—তবলাবাদক।

আমার থিয়েটার দেখার সুযোগ ঘটে ছোটমামার বিবাহ উপলক্ষ্যে। তখনকার রীতি ছিল, ছেলে পাশ করল, কি নতুন বিয়ে করল, অমনি সপরিবারে একবার থিয়েটার দেখতে যাবে। অথবা, জামাই-ষষ্ঠী হল, জামাই যাবে শালীদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে। বলাবাহুল্য সপরিবারে থিয়েটার দেখাটা ছিল বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। ছোটমামা বিয়ে করলেন, অতএব নবপরিণীতা মামীমাকে নিয়ে ছোটমামাকে

থিয়েটারে যেতে হবে। মামার বাড়ির আরও সবাই যাবে। মা-ও যাবে। মার সঙ্গে আমিও গেলাম। যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটল মামার বাড়ি থেকে, অতএব বাবা জানতে পারলেন না কিছু। ক্লাসিক থিয়েটারে সেদিন "প্রফুল্ল" অভিনয়। ক্লাসিকেই আমরা গিয়েছিলুম। 'ক্লাসিক' শব্দটা আমার ইতিমধ্যে বিশেষ জানা হয়ে গিয়েছিল। প্লাকার্ড দেখে নামটাই শুধু মুখস্থ করা নয়, নামটা আরও ভালো ক'রে আমি জানতুম। আমাদের বাড়িতে তখন বেঙ্গল থিয়েটারের ছাপ-মারা বহু নামকরা বই ছিল। আজ অবশ্য সে সবের চিহ্নমাত্রও নেই। আর ছিল ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত একটি নাটকের ছবি। একবারে আসল ফটো, ব্লকে ছাপানো ছবি নয়। 'সরলা' নাটকের 'সরলা'র মৃত্যুদৃশ্য—বিধুভূষণ বেশী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর সরলা-রূপিণী কুসুমকুমারী।

আর, এই ক্লাসিকেই আমি গেলুম জীবনে প্রথম থিয়েটার দেখতে। প্রথম থিয়েটার, প্রথম 'প্রফুল্ল' আর প্রথম-দেখার আলোকে "যোগেশ" বেশী নটভৈরব গিরিশচন্দ্র।

মনে রাখতে হবে, তখন আমার ন'দশ বছর বয়েস। থিয়েটার দেখতে এসে বসলাম গিয়ে মেয়েদের সীটে। মনে হল যেন, খাঁচা। সামনের দিক, যেখানটা দিয়ে থিয়েটারের নাটক দেখব, সেটা একেবারে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। শুধুই কি জাল? তার সামনে আবার ঘন করে চিক ফেলা। থিয়েটার-হলের মাঝখানে ওপরের ডোম থেকে একটা ঝাড় ঝুলছে, তার জোরালো আলো পড়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে। কিন্তু, কতটুকু আর দেখব? সেই লৌহজাল আর চিক ভেদ করে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায়, তা থেকে বুঝতে পারছি, নীচেটা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। সামনে, সারা মঞ্চ জুড়ে মস্ত 'ড্রপ' ফেলা আছে, তাতে ছবি আঁকা। বিরাট ছবি। কী যে ছবি, আজ তা অবশ্য ঠিক মনে করতে পারছি না।

চিকের আড়াল থেকে সব-কিছু দেখবার চেষ্টা করছি, মনে জাগছে নানান কৌতূহল, কিন্তু সেই আলোকে উদ্ভাসিত বিচিত্র পরিবেশ আর জনসমাগম লক্ষ্য করে মাকে কোনো প্রশ্ন করতেও যাচ্ছি ভুলে, একেবারে বোবা হয়ে বসে আছি বলা চলে। নীচে থেকে অনবরতই একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে, 'পান-বিড়ি-সিগারেট! অ্যাই, পান-বিড়ি-সিগারেট!'

এমন সময়, যেমন করে আমাদের স্কুলের পেটাঘড়িতে ঘণ্টা বাজে, ঠিক তেমনি করে কোথা থেকে যেন একটা ঘণ্টা বেজে উঠল, ঢং-ঢং-ঢং!...'পান-বিড়ি-সিগারেট'—তখনো চলেছে কিন্তু।

আবার বাজল ঘণ্টা, ঢং-ঢং-ঢং করে। শুরু হলো কনসার্ট। এটা আমার কাছে তেমন নতুন লাগেনি, কারণ আগেই বলেছি বাড়িতে শুয়ে শুয়ে পাড়ার কনসার্ট-বাজনা শোনা আমার অভ্যাস ছিল। সুরটাও নতুন নয়, ঠিক এমনি ধরনের সুরই যেন শুনেছিলাম, মনে হল।

কনসার্ট একসময় থেমে গেল। আবার একটা ঘণ্টা পড়ল, ঢং-ঢং-ঢং!

এইবার দেখলাম, মাঝখানে যে ঝাড়টা ঝুলছিল, সেটা ক্রমশ ওপরে উঠে গেল। আর, সেটা উঠে যেতেই আলো গেল একেবারে কমে। কিন্তু, আজ চিন্তা করে এটুকু বুঝতে পারছি, তখনকার

দিনে অডিটোরিয়াম একেবারে অন্ধকার করে দিত না, মৃদু একটা আলোর আভা থেকে যেত। ঝি-রা ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে চোখের সামনেকার চিকগুলি গুটিয়ে তুলে দিল। রইল শুধু জাল। সেই জালের আড়াল থেকে সবই দেখি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে!

ওদিকে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি, তখনো লোক আসছে।

অবশেষে থামল কনসার্ট। আর, সামনেকার সেই বিরাট ছবিওয়ালা 'ড্রপ্'টি আস্তে আস্তে গুটিয়ে গুটিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। বিস্ময়াবিষ্ট দুটি চোখ মেলে দেখলাম, বড়লোকদের বাড়ির ঘরের মতই একখানি সুসজ্জিত ঘরের ছবি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেরকম উজ্জ্বল দৃশ্য ইতিপূর্বে দেখিনি। কত গাঢ় রঙ যে চোখের সামনে ঝলমল করতে লাগল তা বলার নয়। রামধনু রঙের রঙীন পোস্টার ও হ্যাণ্ডবিল্ তখন থিয়েটার থেকে ছাড়া হত, মনে হত যেন বড় বড় হরফের অক্ষরের ওপর দিয়ে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আজ যেন সেই রঙেরই প্রতিফলন দেখলাম মঞ্চের দৃশ্যে! সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল, এত আলো যাত্রাতেও দেখিনি। তখনকার দিনে সাধারণত বুধবারের অভিনয়-বিজ্ঞপ্তি সাদা কাগজে কালো অক্ষরে ছাপা হত, কিন্তু শনিবারের পোস্টার-হ্যাণ্ডবিল ছিল রঙে-রঙে-রঙ-করা!

সেই উজ্জ্বল ঘরের দিকে স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছি, আর দেখ্ছি মেয়েরা কথা কইছে, এমন সময় অন্তরাল থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রবেশ করলেন গিরীশচন্দ্র। 'গিরীশচন্দ্র ঘোষ' নামটা হ্যাণ্ডবিল-প্ল্যাকার্ড থেকেই বানান করে পড়ে পড়ে জেনে গিয়েছিলাম কিন্তু নামের মহিমাটা জানা ছিল না। মহিলা দর্শকদের মধ্য থেকে কয়েকজন একসঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন,—'গিরীশবাবু!

গিরীশবাবু! মানে, গিরীশচন্দ্র ঘোষ! মনে হল, এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন না, যেন প্রবেশ করলেন। এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেন 'প্রবেশ' শব্দটাই খাপ খায়। সেদিন এতটা বুঝবার কথা নয়, স্মৃতিপটে আঁকা সেদিনকার এই দৃশ্যটিকে আজ আবার দেখতে গিয়ে এই মহিমার ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তরের পটভূমিকায়! মনে হচ্ছে, নাট্যকাররা চরিত্রকে মঞ্চে আনবার প্রাক্কালে যে ব্র্যাকেটে অমুকের 'প্রবেশ' কথাটা লিখে রাখেন 'অমুকের ঢোকা বা অমুক ঢুকলেন'-এর বদলে, তার তাৎপর্য বোধহয় এই-ই! 'ঢোকা' বা 'ঢুকলেন'-এর মধ্যে যেন একটা হীনতা আছে, 'প্রবেশ'-এর সঙ্গে মিশে আছে একটা ম্যাজেস্টিক ভাব। এই ভাবের সঙ্গে সবসময়ই যে একটা রাজসিকতা মিলিয়ে থাকবে, এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী অনুপ্রবেশের একটা দ্যোতনা আছে।

যাই হোক, গিরিশচন্দ্রের মঞ্চ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন নিমেষে স্থির হয়ে গেল। আর ঐ স্থিরতা বোধহয় সংক্রামক। শিশুদের এসব বোঝবার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য, তারাও স্থির হয়ে যেত। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, শিশুরাও চুপ করে আছে। যদি কোনো শিশু

দৈবাৎ অসুবিধার সৃষ্টি করে কেঁদে উঠত, নীচে থেকে নানান মন্তব্য উঠত শিশু ও তাদের মায়েদের লক্ষ্য করে। বড় হয়ে পরবর্তীকালে যখন নিজে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি, তখনো লক্ষ্য করেছি দর্শকমণ্ডলীর একাংশের এই অশোভনতা। অথচ, শিশু কেঁদে উঠতেই, অথবা দৃশ্য যখন ঘনীভূত হয়েছে, তখন কাঁদবার উপক্রম করতেই, ঝি তাকে তাড়াতাড়ি কোলে করে বাইরে নিয়ে গেছে।

গিরীশবাবুর অভিনয়কে সেদিন অভিনয় বলেই মনে হয় নি। অন্য লোক যখন মঞ্চে অভিনয় করছে লোকেরা তখনো কোথাও-কোথাও মৃদু গুঞ্জন করেছে; কিন্তু উনি যেই এলেন, অমনি সব গুঞ্জন মুহূর্তে গেল স্তব্ধ হয়ে। এই স্তব্ধতার যে একটা রূপ আছে, সেটা আজ বুঝি, তখন বুঝিনি,—কিন্তু তার স্পর্শ থেকে সেদিন আমি বঞ্চিত হইনি। ঐ চলাফেরা, ঐ রাশভারী ভাব, ঐ গম্ভীর কণ্ঠস্বর,—কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার করছিল মনে। আমি মায়ের কোলের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলুম। সেই সূক্ষ্ম অভিনয় বুঝবার ক্ষমতা ঐ বয়সে আমার থাকার কথা নয়, কিন্তু শেষের দিকে যখন খালি গায়ে ছেঁড়া কাপড়ে এসে মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন, 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষতম সংলাপ,—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—তখন মনে হচ্ছিল যত সহজে কথাগুলি বলছেন উনি তত সহজ হয়ে এসে তা মানুষের মনে লাগছে না! মানুষের বুকের ভিতরটা বুঝি প্রবলভাবে গুমরে-গুমরে উঠছে! আমার বেশ মনে আছে, বাড়িতে ফিরে আসবার পর দু'তিন দিন যাবৎ কেমন যেন একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, ভালো করে খাওয়া-দাওয়াও করতে পারছি না! মনে হচ্ছিল, সেই যে 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' শুনে সমস্ত দর্শক নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে এলাম, সেই কান্না বুঝি আমার ভিতরের সবগুলি তন্ত্রীর মধ্যে তখনো ক্রমাগত বেজে চলেছে, তার আর বিরাম নেই! আজ মনে হয়, অনুভূতি ব্যাপারটাই বুঝি এই! আর্ট যেখানে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে অনুভূতির ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয়, সেখানে সে বালক-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবারই মনে জাগিয়ে তোলে সমান তরঙ্গ! আর্টের জয় বুঝি সেখানেই!

বাড়িতে কিন্তু থিয়েটার দেখার ব্যাপার নিয়ে চুপচাপ থাকবার উপায় নেই। জীবনের প্রথম থিয়েটার দেখার লগ্নে কাকে সর্বপ্রথম দেখলাম—না, গিরীশচন্দ্র। সমস্ত থিয়েটারের মর্মবিন্দুটিকে যেন প্রত্যক্ষ করে এসেছি! আর যায় কোথায়, অগ্নিতে যেন ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হল। নেশা লাগল থিয়েটারের। আরও থিয়েটার দেখা যায় না? আমার তখনকার থিয়েটার-পাগল বন্ধু ছিল জিতেন মুখোপাধ্যায় বলে একটি ছেলে। স্বর্গত অভিনেতা ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়কে আশা করি পাঠক-পাঠিকারা মনে রেখেছেন, জিতেন ছিল তাঁরই মাসতুতো ভাই।

জিতেন এসে বললে, 'কেমন দেখলি বল দেখি?'

পরম উৎসাহে তাকে সব বর্ণনা দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে-ই ত আমার একমাত্র শ্রোতা নয়, আরও একজন বিচিত্র শ্রোতা যে ছিল আমার বাড়িতেই। জিতেন থিয়েটার জিনিসটা বোঝে, কিন্তু সে ত সঠিক বোঝে না! তাকে ঠিক মনের মতো করে বোঝাই কী করে? তার যে শতেক

প্রশ্ন! আমি আমাদের সেই রস-পাগল তারাপদর কথা বলছি। আমাকে বৈঠকখানার প্রান্তে টেনে এনে চুপি চুপি প্রশ্ন করল, 'ক্যামন দেখলে গো খোকাসাহেব?'

সাধ্যমতো উত্তর দিলাম।

সে বললে, 'বক্তৃতা কেমন হলো? একটু দিয়ে দেখাও দেখি।'

একবার ভাবি 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'টা ওকে একটু দেখাই গায়ের জামা খুলে ধুতিটা সেইরকম করে প'রে। কিন্তু পরমুহূর্তে সেই ভাবগম্ভীর স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন মূর্তিটি মনে পড়তেই স্তব্ধ হয়ে যেতাম। তারাপদকে কেন, কোনদিনই কাউকে দেখাতে পারি নি। এইখানে বলে রাখি, উত্তরকালে আমি নিজে যখন অভিনেতারূপে স্বীকৃতি পেলাম, তখন বহু বন্ধু এবং বহু মঞ্চ-স্বত্বাধিকারী আমাকে 'প্রফুল্ল'র যোগেশ করতে বলেছেন, আমি অন্য ভূমিকা, যেমন—'রমেশ' করেছি, কিন্তু যোগেশ করতে গেলেই সেই প্রথম দিনের দেখা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ' মনে পড়ে যেত, তখন আমার নিজের আর অন্য যোগেশ করার সাধ হত না, চিত্তে এমনই চিরস্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছিল সেই যোগেশের।

থিয়েটার দেখার আগ্রহ কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। দিন যায়, বছর আসে। আরও থিয়েটার দেখবার সুযোগ পেলাম। মায়ের সঙ্গেই। ক্লাসিকে দেখলাম, বিল্বমঙ্গল। অমর দত্ত মশায় 'বিল্বমঙ্গল' হয়েছিলেন। স্টারে দেখলাম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের গীতিনাট্য "বেদৌরা।" ক্লাসিকে "আলিবাবা"ও দেখলাম, পরে "পাণ্ডবগৌরব"ও দেখলাম। "পাণ্ডবগৌরব"-এ অমরবাবু ভীম, কুসুমকুমারী কৃষ্ণ। কিন্তু, তারপরেই পড়ল থিয়েটার দেখার যবনিকা। পড়াশুনার চাপ বেড়েছে আর থিয়েটার দেখা নয়। তবু কি নেশার ঘোর কাটল? আমার পড়াশুনার যে ডেস্ক-টেবিলটা ছিল, তার ওপরের ডালাটা ঢালু, সেই ঢালু ডালার নীচে থাকত বই। বেশ বড়ো ছিল সেই আমার রিডিং ডেস্কটা। সেইখানে বসে বসে অবসর সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সব নাটক পড়তাম। নাটক এনে দেবার বন্ধু ছিল ঐ জিতেন। একবার, তখন বোধ হয় থার্ড ক্লাসে পড়ি। জিতেন বলল, 'এত তো পড়লি, এবার একখানা লিখে ফেল না।'

—কী লিখব?

—নাটক।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। নাটক লিখব? ও বলছে কী! নাটক লেখা কি সহজ কথা! ও ছাড়ত না, আবার এসে উত্তেজিত করত। বলত, লেখ না?

শেষ পর্যন্ত ওর প্ররোচনায় নাটক লিখেছিলাম, একখানা নয়, দু'খানা, একখানা সামাজিক, অপরখানা ঐতিহাসিক। কিন্তু সে যে কী ধরনের নাটক, কীভাবে লিখেছিলুম, কী হয়েছিল তার পরিণাম, তা এখন না বলে, বলব একটু পরে। কারণ স্মৃতির গ্রন্থি মোচন করতে করতে আনমনে এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে দেখছি, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। অনেক

কথা বলা হয় নি, অনেক ছবি আঁকাও হয় নি, যা না বললে, যা না আঁকলে কারুর কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমার মন তৃপ্ত হবে না। বার বার নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তবু বার বার খুঁজতে হয় নিজেকে !—নিজের সেই রঙীন শৈশবকে আবার তাহলে খুঁজে আনি, খুঁজে দাঁড় করাই চিত্তের সামনে।

ফিরে চলে যাই আরও বালক বয়সে। ১৯০৫ সালের কথা। আশ্বিন মাসে রাখীবন্ধন হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিবেশ। বাঙালীর ঘরে সেদিন উনুনে আগুন জ্বলে নি। অরন্ধন। রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন :—

বাঙলার বায়ু বাঙলার জল
বাঙলার মাটি বাঙলার ফল
এক হউক এক হউক এক হউক
হে ভগবান !

ছেলে-বুড়ো সবাই গান করছে—দলে দলে ভাগ হয়ে। কখনো বা বড়দের কেউ কেউ গান করছে, বন্দেমাতরম্। গান গাইছে বড়রা, কিন্তু বলবার উপায় ছিল না সহজে। যদি কেউ চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম্! অমনি আবার অনেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানীরা ঠাট্টা করে বলত,—'বাঙালীর মাথাগরম !'

সভা-টভা হলে যাবার হুকুম ছিল না ; কিন্তু হেঁটে হেঁটে গিয়ে যে দু'একবার না শুনেছি এমনও নয়। এতদূর হেঁটেছি যে, একেবারে সার্কুলার রোডের ওপরকার গ্রীয়ার পার্ক পর্যন্ত চলে গেছি। এখানে বলে রাখি, তখনকার দিনে গড়ের মাঠে কোনো সভা-টভা হত না। গড়ের মাঠে তখন গোরা সোলজাররা বেড়িয়ে বেড়াত। সন্ধ্যার দিকে একা-একা গড়ের মাঠের দিকে যাওয়া তখনকার দিনে একটা ভয়েরই কথা ছিল বলা যায়।

যাই হোক, আশ্বিন মাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চিহ্নিত দিবসে স্কুলে গেলুম শুধু পায়ে, জুতো না পরে, আর গায়ে চাদর জড়িয়ে। আমাদের মধ্যেকার প্রথম ছেলেটিকে মাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে ?'

—মাতৃবিয়োগ হয়েছে।

উত্তরের তাৎপর্য প্রথমটায় তিনি বুঝতে পারেন নি। পরে অন্যদের প্রশ্ন-ট্রশ্ন করে তবে বুঝলেন। অবশ্য কিছু বলেন নি।

টিফিনে বেরিয়ে পড়লাম সভায় যাবার জন্য সদলবলে। তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' কাগজ বেরুত প্রতি সন্ধ্যায়। সেই কাগজ ক'জনে মিলে পড়তুম আসাধারণ আগ্রহে। রাখী-বন্ধনের দিনে কী-কী করতে হবে, 'সন্ধ্যা'তেই তার নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ এই রকম : স্কুলে খালি পায়ে যেতে হবে শুধু চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে, জিজ্ঞাসিত হলে বলতে হবে, 'মাতৃবিয়োগ'

হয়েছে। একথা অন্য কেউ শেখায়নি, শিখিয়েছিল 'সন্ধ্যা'। বিলাতী কাপড় তখন বর্জনের পালা। পার্কের কোণে কোণে, কোথাও-বা গলির ধারে ধারে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, বিলাতী কাপড়-পোড়ানোর ধুম প'ড়ে গেছে।

শুধু বিলাতী কাপড় বর্জন কেন, বিলাতী জিনিস পর্যন্ত। সাহেবরা কিনত বিলাতী দেশলাই, পালতোলা জাহাজ মার্কা। আমরা কিনতুম সুইডেনের দেশলাই—দোয়ানী মার্কা, পয়সায় দুটো। দোয়ানী মানে, সিলভার দোয়ানী, গোল, ছোট।

সেটাও বয়কট করা হল। এল জাপানী দেশলাই—হাতি মার্কা, পয়সায় তিনটে। বিলাতী দেশলাই ছিল চার পয়সায় একটা। তুলনায় দামী বলতে হবে বই কি!

দেশলাই-এর মার্কাগুলির কথা এত মনে করে বলতে পারছি এই জন্য যে, সে সময় দেশলাই-এর বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করার একটা বাতিক ছিল আমাদের মধ্যে, জানি না, এখনকার ছেলেদের মধ্যে সেটা আছে কি না।

টালিগঞ্জের ব্রিজের ওপারে এখন যে-জায়গাটাকে বলে চারু অ্যাভিনিউ, ওখানে ছিল অনেক ধান-কল। সেই সব ধান-কলের একটাকে দেশলাইয়ের কারখানায় পরিণত করে স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত করলেন 'সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী'। তৈরি হতে লাগল দেশী দেশলাই। কিন্তু সে দেশলাই তেমন ভাল হল না। অবশ্য, স্বদেশী আন্দোলনের কালে তা প্রচুর লোকে কিনেছিল।

সস্তা, অথচ ভাল ছিল জাপানী জিনিস। ফলে, জাপানী জিনিসে দেশ ছেয়ে গেল বলতে পারা যায়। তা' সত্ত্বেও তেল, সাবান প্রভৃতি দেশে তৈরি হতে শুরু হল। চামড়ার বিলাতী জুতো একচেটে ছিল—চাঁদনীতে ছিল জুতোর পটি—আর ছিল চীনেবাড়ির জুতো। চীনের ক্যাম্বিশের জুতো পাওয়া যেত সস্তায়। স্বল্পবিত্তের লোকেরা কিনত সেই জুতো। কিন্তু, স্বাদেশিকতার প্রবল তরঙ্গে মানুষের রুচি তখন পরিবর্তনের মুখে। সেই সময় ঘোড়ার সাজ থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত "নর্থ ওয়েস্ট ট্যানারী" মীরাট থেকে আসত। পরে হয়েছিল কানপুর ট্যানারী। মোমবাতিও তখন প্রচুর দেশী আমদানী হতে লাগল। তখন মোমবাতির প্রচলন ছিল খুব। ঘোড়ার গাড়ির লণ্ঠনের ভিতর দেওয়া হত দুটো করে বড় বড় মোমবাতি।

এই যখন দেশের পরিবেশ, তখন একদিন শুনলাম (তখন ১৯০৫ সালেরই শীতকাল) আমাদের অঞ্চলেই 'কংগ্রেস' হবে, স্বদেশী এগজিবিশন হবে। কোথায়? না, আমাদের স্কুলেরই উত্তর-পশ্চিম দিকে—পোড়াবাজারের মাঠে—শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট রাস্তাটার সামনে। এখন যেখানটায় ক্যালকাটা ক্লাব, সেখানে ছিল ট্রাম কোম্পানীর এজেন্টের বাড়ি—আগাগোড়া আইভি লতায় ঘেরা। তার পিছনে ছিল ট্রাম কোম্পানীর ডিপো আর ঘোড়ার আস্তাবল। ঘোড়ার ট্রাম উঠে গেলে নোনাপুকুরে কারখানা হয়েছিল। ফলে ট্রাম কোম্পানী জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়ি ভেঙে দিয়েছিল। ওখানকার সমস্ত জায়গাটা হয়ে গিয়েছিল প্রকাণ্ড একটা চত্বরের মত। সেই

চত্বরের সামনে ছিল বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠে হলো এগজিবিশন। এখন যেটা পি জি হাসপাতাল, তার যে কোয়াটারগুলি আছে তার পূর্বদিকে। তাহলে জায়গাটার উত্তরে পড়ল লোয়ার সার্কুলার রোড, দক্ষিণে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, পূর্বে চৌরঙ্গী। আর পশ্চিমে খানিকটা হরিশ মুখুজ্যে রোড, খানিকটা কোয়াটার। বড়ো বড়ো গেট হয়েছিল তিনটে। পূর্বদিকের গেটটা ছিল নেতাদের জন্য নির্দিষ্ট। যেদিকটা তখন আলেজেন্দ্রা কোর্ট। দক্ষিণে ছিল বাড়্‌তি একটা গেট। আর উত্তরে ছিল প্রধান ফটক।

এই যে এত বড়ো জমি, এর মধ্যে ছিল আবার বড়ো একটা পুষ্করিণী। সমস্ত মাঠটা বেড় দিয়ে ঘেরাঘেরি হচ্ছে, আমরা টিফিনের সময় তা দেখতে যেতুম। দেড়-মানুষ সমান উঁচু টিনের দেওয়াল হচ্ছে। হচ্ছে তিনটে বড় বড় ফটক, যার কথা এইমাত্র লিখলাম। এমনি করে প্যাণ্ডেল বাঁধা হলো আমাদের চোখের সামনেই। জয়পুর স্থাপত্যরীতিকে অনুসরণ করেই তিনটি ফটক তৈরি হচ্ছে, প্রত্যেকটিরই ওপরে নহবতখানা। মোটা খুঁটি দিয়ে বাইরেটায় দরমা ঘিরে বিছিয়ে দিল পাতলা লোহার জাল। তার ওপরে মিস্ত্রীরা করে গেল বালির কাজ। সেই বালির ওপরে করল লাল রঙ। একেবারে যাকে বলে Indo-Saraseni architecture, পাশে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় নহবতখানায়। ফটকের কাঠামো, অর্থাৎ কাঠের কাজ করত চীনে মিস্ত্রীরা। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে নীল ঝোলা। সেই ঝোলা থেকে পেরেক বার করে ঠকাঠক ঠুকে যাচ্ছে, কোনো পেরেক বেঁকে গিয়ে খুলে পড়ে গেল বা কোনো পেরেক হাত থেকে ফস্কে গেল, সেগুলি আর ওরা তুলত না, কারণ তুলতে গেলে কাজের দেরি হবে। আমাদের কাছে সেই পড়ে-থাকা পেরেকগুলি ছিল মহা লোভের বস্তু। পরস্পরের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে কতো পেরেক যে জমা করেছিলাম তার আর ইয়ত্তা নেই। পেরেক কুড়োতে আমাদের কেউ বারণও করত না কিন্তু।

এমনি করে করে সব-কিছু তৈরি হয়ে গেল, এইবার প্যাণ্ডেল-এর দ্বারোদ্ঘাটন হবে। উত্তেজনা কি কম? ওদিকে দেখতাম, আমাদের বাড়ির সামনে ছিল যে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মশায়ের বাড়ি, সেই বাড়িতে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে সব ডেলিগেট। তাঁরা লুঙ্গির মতো করে কাপড় পরতেন আর নিজেরাই রান্না করতেন। খাওয়ার শেষে কলাপাতা মুড়ে যে-যার নিজের হাতে-হাতে বাইরে এসে ডাস্টবিনে ফেলে দিতেন। এটা দেখতুম, আর দেখতুম ও বাড়ির বারান্দায় বসে প্রায়ই তাঁদের জটলা করতে।

সুরেন্দ্র মল্লিক ছিলেন সিঙ্গুরের বসু-মল্লিক পরিবারের ছেলে। কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, ভালো বক্তা ছিলেন। তখন ওকালতি করতেন, পরে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং তারও পরে চেয়ারম্যান পর্যন্ত হ'য়েছিলেন। C. I. E. উপাধিও পেয়েছিলেন পরবর্তী কালে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের মেম্বার হয়ে বিলেত গিয়েছিলেন।

কে যেন আমাদের মধ্যে প্রথম বলেছিল কথাটা, 'এই, ভলান্টিয়ার হবি?'

—নেবে কেন আমাদের ? ছোট ছেলে যে !

—চল্ না।

গেলাম। প্রথমটায় ছোট ছেলে দেখে সত্যিই নিল না। কিন্তু পরে নিয়েছিল। কারণ, সাধারণভাবে প্রতিদিন স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে এগজিবিশনে গেলেও সবার মধ্যে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া তখনকার দিনে অনেকে পছন্দ করতেন না। তাই, এক-একদিন হতে লাগল মহিলা-দিবস। মহিলা-দিবসে প্রচুর ভিড়। প্রচুর মেয়ে-স্বেচ্ছাসেবিকা দরকার। অত মেয়ে-স্বেচ্ছাসেবিকা পাওয়া তখন সহজ ছিল না। তাই, আমাদের নিতে হল শেষ পর্যন্ত। আমি কোনোদিন কংগ্রেসের সভা দেখি নি, সভার শোভাও নিরীক্ষণ করা হয় নি। কারণ, যাব কী করে তখন ? তবে জনসমারোহ দেখেছি দূর থেকে। যাকে বলে, মিছিল, শোভাযাত্রা। সেবার দাদাভাই নওরোজী ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। বিরাট প্রসেশন করে তাঁকে প্যাণ্ডেলের দিকে নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্যাণ্ডেলে যেতে পারিনি, কেন না আমাদের কাজ দিয়েছিল এগজিবিশনে।

সুন্দর সুন্দর সব রাস্তা করা হয়েছিল এগজিবিশনে। আর ছিল নানা রকমের জিনিস। বেনারসী কিংখাব, আমেদাবাদের কাপড়। প্রকাণ্ড একজোড়া বুটজুতো রাখা হয়েছিল একদিকে —মানুষের সমান উঁচু—নর্থ ওয়েস্ট কোম্পানীর তৈরী দেশী জিনিস একেবারে। আর ছিল সাবান দিয়ে তৈরী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি, তৈরি করেছিল ওরিয়েণ্টাল কোম্পানী। ভারতবর্ষের তাবৎ শিল্পের নিদর্শন দেখান হয়েছিল ; ছ' ফুট লম্বা লাউ—প্রকাণ্ড কুমড়ো—এ-ও আছে, আর আছে পূর্ববঙ্গের বিচিত্র নকশা-তোলা কাঁথা, পূর্ববঙ্গের মিহি করে কাটা সুপুরী ঝুড়িতে জড়ো করা। আরেকটি মজার জিনিসের কথা মনে পড়ে। তার নাম ছিল 'লাফিং গ্যালারী'। অনেকগুলি আয়না খাটানো রয়েছে, Silvering-এর কী প্রক্রিয়া তা জানি না, কিন্তু এক-একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এখন অনেকে কার্টুন ছবি দেখে থাকেন, কিন্তু সে ছিল যেন নিজেই নিজের কার্টুন দেখা ! কোনো মুখটা লম্বা—কোনোটা থ্যাবড়া—কোনোটা পানফলের আকার—বিচিত্র সব মুখ-ভঙ্গী। লোকের ভিড়ও হতো ওখানে। সবাই এক-একবার করে নিজের নিজের কার্টুন দেখে আসতে চায়। দর্পণে নিজেকে মানুষ সুন্দরই দেখতে চায়, আজ ভাবি, নিজেকে অসুন্দরও কি দেখ্‌তে চায় ? আকার দর্শন নয়, বিকার দর্শন। মানব-মনের এ-ও এক রহস্য !

এগজিবিশন থেকে বোম্বে-আমেদাবাদের মোটা কাপড় লোকে কিনত। আমরাও কিনেছি। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই !'···দেশী সাবান আর সেন্ট্ খুব ভালো হয়েছিল অবশ্য। জুতোর প্রচলন হল—দেশী মুচির জুতো। সেই জুতোও এগজিবিশনে প্রদর্শিত হলো। তখন চীনেবাড়িতে দেশী মুচিরা জুতো সাপ্লাই করত। আমার ধারণা আজও করে।

এগজিবিবিশনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও হয়েছিল। উত্তর দিককার ফটকের কাছেই ছিল

ব্যাণ্ড বাজানোর জায়গা, যাকে বলে, 'ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড'! প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাণ্ড বাজত সেখানে। আর হয়েছিল থিয়েটার-হল। আধা-পেশাদারী দলেরাও অভিনয় করেছে অভিনেত্রী নিয়ে, আবার পাব্লিক থিয়েটারও করেছে। এখানেই একবার অমর দত্ত অভিনয় করতে এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। শুনে আমরা ত ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কটায় আরম্ভ হবে? দেখতে পাব ত? নাকি. বাপ-মার আদেশে তারাপদ এসে ধ'রে নিয়ে যাবে? কী বই হবে?

জিতেন বললে, 'জানিস কী পালা হবে?'

—কী?

—নলদময়ন্তী।

ভলান্টিয়ারী করতে করতে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম থিয়েটারের স্টেজ আর অডিটোরিয়ামটা। আগাগোড়া সব কাঠের। মঞ্চ কাঠের, অডিটোরিয়ামের দেওয়াল কাঠের, গ্যালারী-চেয়ার ত কাঠের বটেই। মেঝেটা পর্যন্ত কাঠের, ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে গেছে, মঞ্চের সামনে প্রথম দিকে খুব ভালো চেয়ার, তারপরে সাধারণ চেয়ার, তারপরে বেঞ্চি আর গ্যালারী। আগাগোড়া চীনে মিস্ত্রী দিয়ে তৈরী। টিকিটের দাম কত ছিল আজ মনে নেই। এগজিবিশনের সব স্টলের সামনেই যেমন মাটি থেকে ৮।৯ ইঞ্চি উঁচু করা ফুটপাতের মতন ছিল, থিয়েটারের প্রবেশ-পথগুলির সামনে দিয়েও তেমনি ছিল ৮।৯ ইঞ্চি উঁচু করা ফুটপাত, চওড়ায় ৬।৭ ফিট হবে, সে-ও কাঠের তৈরী গাড়িবারান্দার মতো উঁচু উঁচু থাম বসানো ওপরে বেশ ভালো আচ্ছাদন করা। আর কাঠের কথা? সারা এগজিবিশন জুড়েই যেন কাঠের কারখানা, যেন এক পলকে দেখলে মনে হয়, কাঠের বাড়ির এক নগরী। কোনো কোনো জায়গায় আবার কাঠের ওপর বাহার করার জন্য শেতল পাটির প্যানেল করা ছিল, কোথাও বা সূক্ষ্ম মাদুর। এই পাটি আর মাদুর এসেছিল বলতে গেলে সারা বাঙলাদেশ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী আরও কত এগজিবিশন দেখেছি, এত জাঁকজমক দেখি নি কোথাও।

এদিকে নলদময়ন্তী—অমরেন্দ্রনাথ-কুসুমকুমারী, এসব নামের রঙীন প্লাকার্ড দেখলাম, কাঠের সুদৃশ্য মঞ্চও দেখলাম, কিন্তু অভিনয় আর দেখা হল না। বেলাবেলি শুরু হলে হয়ত-বা একটু চেষ্টা করে দেখা যেত। শুরু হবে শুনলাম যাকে বলে সেই রাত্রে। অতএব বৃথা চেষ্টা! ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

এগজিবিশনে শুধু থিয়েটারই বা কেন, টুকরো টুকরো ফিল্মও দেখানো হয়েছিল। আর নহবতে বাজতো সানাই। আমাদের চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাড়ি থেকে রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম সেই সানাইয়ের কম্পিত সুর-বিস্তার। সেদিনকার কৈশোর মনে সে যে কী মোহ সঞ্চার করত, তা বলার নয়।

এগজিবিশনের ভিতরে পশ্চিমধার ঘেঁষে যে পুষ্করিণীটা ছিল বলেছি, তার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে সুইস ব্যাক রেলওয়ে বা অ্যালপাইন রেলওয়ে তৈরি হয়েছিল, সে-ও এক অভিনব বস্তু। ২৫।৩০ ফিট

উঁচু একটা টাওয়ার তৈরি হয়েছিল। তার থেকে ঢালু করে বরাবর দুটি লাইন পাতা নীচে পর্যন্ত। এই লাইনের ওপরে ঘড়ঘড় করে যখন গাড়ি নামছে, তখন সে এক রীতিমত দেখবার জিনিস। হুডখোলা পুরানো মোটরগাড়ির মতন দেখতে ক্ষুদে সাইজের, মোট চারজন বসতে পারে। এক-একবার এক-একটা করে ছাড়ত, নইলে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। ঐ যে টাওয়ারের কথা বললুম, ওটা ছিল ঘেরা। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। নীচেকার কোনো কোনো ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আমরা দেখতাম কী, মেঝের নীচে ৫।৬ জন কুলি ঘানির মতো করে ঘূর্ণিযন্ত্রটা ঘোরাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে গাড়ি উঠছে একেবারে প্রকাণ্ড চাকতিটার ওপরে। এক-একবার শব্দ হচ্ছে ঘড়াং করে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতুম, গাড়ি চাকতি থেকে এবার প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধ্‌ লাইনের ওপরে পড়ল। অমনি উৎসুক হয়ে উঠতাম আমরা, ঐ আসছে রে ঐ আসছে!

বড়দের সঙ্গে গাড়িতে কখনো-সখনো ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদেরও দেখতাম, খুব ছোট নয়, বালক-বালিকা বলা যেতে পারে। সাহেব-মেমও থাকত। তবে খাঁটি সাহেব খুব কম, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই বেশী। গাড়ি আসছে ওপর থেকে নীচে আঁকা-বাঁকা পথে, উঁচু-নীচু হয়ে, কোথাও বা লাফিয়ে উঠল, মনে হল, এই গেল বুঝি সবসুদ্ধ উল্টে! কিন্তু উল্টাতো না, কখনো কোনো দুর্ঘটনার কথা শুনি নি। সেই ওপর থেকে নীচে বেঁকে বেঁকে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে গাড়ি দুরন্ত গতিতে, ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচাচ্ছে ভয়েও বটে, উল্লাসেও বটে। দেখবার মতই দৃশ্য! কিন্তু চড়বার উপায় আমাদের নেই, প্রতিটি সীটের মূল্য ছিল পাঁচ টাকা করে। কোথায় পাবো তখন টাকা? তাছাড়া, ওটা আমাদের কাছে একটি ভয়েরই ব্যাপার ছিল। দূরে দাঁড়িয়ে হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিই শুধু, চড়বার সাধও হয়নি, সাধ্যও ছিল না।

এগজিবিশনে আরও মজার জিনিস ছিল। ছিল মেরী-গো-রাউণ্ড। একটা বড় কাঠের চাকতির ওপরে কাঠের ঘোড়া বসানো, হাতি বসানো, বাঘ বসানো, সিংহ বসানো, আবার খুদে মোটরগাড়িও বসানো। সবগুলিতে লোক বসিয়ে চাকতিটা ঘুরতে থাকত। সেই ঘূর্ণিতে মোটরগুলি স্থির আছে, কিন্তু ঘোড়া-হাতি-বাঘ-সিংহ যে যার জায়গায় প্যাসেঞ্জার-সুদ্ধ উঠছে আর নামছে। এতে অবশ্য বড়দের সঙ্গে ছোটদেরও ভিড় হত।

আবার, পুষ্করিণীতে হয়েছিল "ওয়াটার ট্রাইসাইকেল।" তিনটে ছোট নৌকোমতন জিনিস করেছে: কিন্তু বেশ উঁচু, সাধারণ ট্রাইসাইকেলের তুলনায় ডবল উঁচু বলা যেতে পারে। ট্রাই-সাইকেলের মতো পা দিয়ে প্যাড্‌ল করতে হত। করলেই তিনটি চাকার বদলে তিনটি ছোট নৌকো অমনি একসঙ্গে জল কেটে জল ছিটিয়ে সর সর করে চলত এগিয়ে।

আর ছিল—গামলা। গামলাতে চড়ে দাঁড় টানতে হত। এক-একজন লোক তাতে বসবে শুধু। সে-ও কম মজার নয়। মাটির গামলা। পূর্ববঙ্গে নাকি কোথাও কোথাও ঐ ধরনের গামলায় বসে দাঁড় টেনে খালবিল পার হওয়ার রীতি ছিল।

কুটির-শিল্পের ভালো ভালো নিদর্শনও সেদিনকার এগজিবিশনে দেখেছিলাম মনে আছে। মেয়েরা পাঠাতেন। মিহি করে কাটা সুপুরীর কথা আগেই বলেছি, বিরাট বিরাট লাউ-কুমড়োর কথাও বলেছি, যা বোধ হয় বলি নি, তা হচ্ছে চিঁড়ের মতো সূক্ষ্ম করে কাটা নারিকেলের কথা। নানারকম ছাঁচে-তোলা আমসত্ত্বের কথা। আর বলি নি, কাঁথার কথা। বিচিত্র ধরনের বিচিত্র নক্‌শা-তোলা কাঁথা। খেলনাই বা ছিল কতরকম! পাথরের, ধাতুর, গালার, সোলার ও মাটির। ভিড় হত প্রচুর। লোকে লোকারণ্য। আর এগজিবিশনও এত বড়ো যে, তিন-চার ঘণ্টাও ঘুরে শেষ করা যায় না। সঙ্গে যদি মেয়েদের কেনা-কাটা থাকে ত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা, তার কমে কিছুতেই হবার নয়।

এসব ছাড়া ছিল যাত্রা, ছিল তরজা আর কবি-গান। ময়ূরপঙ্খীর নাচ। পুকুরে নৌকো সাজিয়ে ভাসান। তার ওপরে গানের দল বসে গান গাইছে। বাস্তবিকই মনটাকে মাতিয়ে তোলবার মতো জিনিস।

শুনেছি, ১৮৮০ সালে হয়েছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ এগজিবিশন যাদুঘরের সামনের মাঠটায়। রাস্তার এপার-ওপার করার জন্য নাকি চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে ওভারব্রীজ পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। তারপরেই নাম করা যেতে পারে এই এগজিবিশনের—যার কথা এতক্ষণ বললাম। এত বড় এগজিবিশন তখন আর হয় নি। কলকাতায় তখন বাড়ির সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী নয়। মফস্বল থেকে প্রায় প্রতি সংসারেই আত্মীয়স্বজন এসে ভরিয়ে ফেলেছে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ আর উত্তরবঙ্গ থেকেই লোক এসেছে বেশী। কী ব্যাপার? না, স্বদেশী এগজিবিশন দেখতে হবে।

স্বদেশী যুগের সে এক অদ্ভুত উন্মাদনার দিনই গেছে বটে! বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁটে চলেছে গানের দল। কখনো তারা গাইছে অতুলপ্রসাদের গান, কখনো বা রবীন্দ্রনাথের গান। হঠাৎই বা কোথাও ধ্বনি উঠতো, 'বন্দেমাতরম্'। অমনি পুলিসের দল যেন ক্ষেপে উঠত। তখনকার দিনে 'বন্দেমাতরম্' ছিল পুলিস-ক্ষ্যাপানোর মন্ত্রও বটে। হিন্দুস্থানীরা ব্যঙ্গ করে বলত, বাঙালীর মাথা গরম,—একথা আগেই বলেছি। বহিঃপ্রদেশের সাধারণ লোকেরা এই ধ্বনিটির ব্যাপারে ততটা সমব্যথী ছিলেন না তখন। তখন বাঙালীর মত্ততাই ছিল অনুভব করবার মতো। যেন হঠাৎ একটা মহাসমুদ্র উত্তাল হয়ে চারিদিক কলকল্লোলে ভরিয়ে তুলেছে। পুলিসের লাঠিচার্জও ছিল তখন বিলক্ষণ।

এইভাবে সারা কলকাতা শহর একেবারে মেতে উঠেছে, এমন দিনে লর্ড কার্জন চলে গিয়ে এলেন লর্ড মিণ্টো। তাঁর সম্মানে Minto-Fete বলে আর একটা এগজিবিশন হলো মনুমেণ্টের নীচে, প্রধানত সাহেবদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু সেটা তেমন যেন জমল না। নতুন লাটের সম্মানে ফুটবল টুর্নামেণ্টও হয়েছিল। ডালহাউসী-ক্যালকাটার তখন কী নাম! তারা ত টুর্নামেণ্টে ছিলই, ভারতের বিভিন্ন নাম-করা মিলিটারী টিমগুলিও এসেছিল। আর ছিল আমাদের মোহনবাগান। সেদিনকার দুর্ধর্ষ ক্যালকাটাকে মোহনবাগান কিন্তু হারিয়ে দিয়েছিল। তখনকার নামকরা খেলোয়াড় প্রফুল্ল

বিশ্বাস খেলতেন ন্যাশনাল ক্লাবে। তাকে মোহনবাগান দলে নিয়েছিল বলে মোহনবাগান 'স্ক্র্যাচ' হয়ে যায়। অতএব, জয়টা আর জয়ে গিয়ে দাঁড়াল না। আমি নিজের চোখে অবশ্য দেখি নি, শুনেছি। Minto-Fete দেখি নি, ফুটবল ম্যাচও দেখি নি। তবে এটুকু বলতে পারি, সেবার এ তিনটি জিনিস—কংগ্রেসের সভা, স্বদেশী এগজিবিশন ও Minto-Fete কলকাতায় বেশ মাতনের জিনিসই হয়েছিল বটে!

তারপরে ক্রমশ দেখা গেল ঐ স্বদেশী ভাবধারা দেশে একটি রীতিমত প্লাবন এনে দিলো। দু-তিন বছরের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া যা হয়ে দাঁড়ালো, তা-ও আমাদের জাতীয় জীবনে কম আলোড়ন আনে নি। মজঃফরপুরের বোমা-কেস। মাণিকতলার বোমা-কেস। ধরপাকড়। সে-ও এক নিদারুণ উত্তেজনা। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী। তারপরে জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামীকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে কানাই দত্তের গুলি করে মেরে ফেলা।

তখন কিংসফোর্ড বলে এক কড়া ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। 'বন্দেমাতরম্' বলেছ, কি পিকেটিং করেছ ত অমনি জেল, তার আর কোনো ডিফেন্স নেই। বাঙলা কাগজে কিংসফোর্ডকে ঠাট্টা করে ছড়া বেরতো,—

মাই নেম ইজ কিং ফর্দ
আই অ্যাম এ গ্রেট মর্দ!

রাজনৈতিক আন্দোলন আর তার ফলাফলের কথা ঐতিহাসিকরা বলবেন, আমি শুধু আমার শৈশবকালীন যুগের আবহাওয়ার ইঙ্গিত দিতে প্রয়াস করছি মাত্র। ঐসব গান-গাওয়ার দল, পিকেটিং-এর দল, ওসবের মধ্যে না ভিড়ে যাই, তাই স্কুলের পর বাড়িতেই আটকা পড়তে লাগলাম বাবা-মায়ের শাসনে। বাড়িতে আছি, সঙ্গী ঐ এক তারাপদ। গুলি খেলতে জানতাম না, ঘুড়িও ওড়াতে পারতাম না। তারাপদ ঘুড়ি-লাটাই কিনে আনত মার কাছ থেকে আমার নাম করে পয়সা নিয়ে। দামী দামী সব ঘুড়ি আর লাটাই। কত তার আয়োজন আর আড়ম্বর! ধরাই দিত তারাপদ, কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর বিদ্যায় যেমন সে বিশারদ, তেমনি আমি। আমাদের ঘুড়ি আর আকাশে কোনদিন উড়লো না! আজ মনে পড়ে, তারাপদকে সেদিন কত না ত্যক্ত করেছি! পাঁচ ফুট কি ছয় ফুট উঁচু একটা টুল ছিল আমাদের। সেই টুল থেকে আচমকা ওর কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। মোটা-সোটা মানুষটি ছিল। হয়ত বেশ লাগত। সে বলে উঠত, আঃ! কিন্তু পরক্ষণেই ফেলত হেসে। বলত, ছাদে যাবে না ঘুড়ি ওড়াতে?

ও আমাদের ছিল চাকর-খানসামা—একাধারে সব। কাপড় কোঁচাতে শিখেছিল ভাল। পাড়ার লোকেদের কাপড় কুঁচিয়ে দিত। শনিবারের সপ্তাহ-শেষে নতুন জামাইদের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে, ধরল এসে তারাপদকে—ও তারাপদ?

তারাপদ অপ্রসন্ন মুখে প্রত্যুত্তর করত,—কেনে?

—দাও না ভাই ধুতিখানা একটু কুঁচিয়ে।

তারাপদর মুখভাব তখনো প্রসন্ন হয় নি। সে প্রথমটায় বিড় বিড় করে কী যেন বলে উঠত। পাড়ার ছেলেদের ওপর সে খুব প্রসন্ন ছিল না। তার কারণ, তারাপদ মোটাসোটা মানুষ ত, ওর পা দুটি স্বভাবতই একটু মোটা ছিল, ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষ্যাপাতো 'হাতিবাবু' বলে। এটা শুনলে সে ভীষণ রেগে যেত। আর সে যত রাগছে, ছেলেরা তত ক্ষ্যাপাচ্ছে—

হাতির গোদা গোদা পা,
হাতি তামাক খেয়ে যা।

তারাপদ অবশ্য তামাকও খেত। অথচ এই তারাপদকেই একটু মিষ্টি সুরে ডাকলে বা কথা বললে তারাপদ গলে একেবারে জল! তার এ স্বভাবের সঙ্গে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবিশেষ পরিচিত ছিল। তাই একটু খোসামোদের সুরে পাড়ার নতুন-জামাই-হওয়া ছেলেরা বলত, তোমার মতন সুন্দর কাপড় কোঁচাতে পারে এ তল্লাটে আর কেউ নেই, বুঝলে তারাপদ?

তারাপদর ঠোঁটের কোণে অমনি হাসির রেখা উঠত ফুটে এবং বলা বাহুল্য, শুরু হত তারাপদর বাড়তি কাজ। এ কাজ সে হাসিমুখে কত করেছে, কিন্তু সেজন্য তার হাত তুলে তাকে কেউ কখনো কিছু দিয়েছে, এমন ঘটনা ত মনে পড়ে না!

বাড়ি থেকে বেরুবার হুকুম নেই। তবু ক্রমশ বড়ো হচ্ছি, একটু একটু করে খেলতে যাবার অনুমতিও পাচ্ছি। খেলা দেখতে যাবার অনুমতিও। তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হয় নি, শুধু শুনতাম তার ভিত হচ্ছে। কতো বছর ধরে যে হবে তা বুঝতে পারতাম না। শুধুই শুনে আসছি ভিত হচ্ছে। ঠিক যেটুকু মেমোরিয়ালের শ্বেত-মর্মর প্রাসাদ, সেটুকু ঘিরে চারিদিকে টিনের বেড়া ঘন করে লাগানো, তার ভিতরে যে কী কাজ হচ্ছে, কতটুকু কাজ হচ্ছে, তা জানবার উপায় আমাদের ছিল না। অনেক কাল ওভাবে টিনের বেড়া পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। এরই পুব দিকের পুকুরটার নাম ছিল 'হাবিলদার-ট্যাঙ্ক'—বেশ শান-বাঁধানো, লোকে আসত স্নান করতে। দুপাশে ছিল দুটি ঝাঁকড়ামাথা প্রকাণ্ড বটগাছ। আর ওদিকে চার্চের সামনে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ, তাকে তখন লোকে বলত চার্চফিল্ড। এই ফিল্ডের অর্ধেকটা আজও পড়ে আছে, বাকী অর্ধেকটা চলে গেছে মেমোরিয়ালের বাগানের ঘেরের মধ্যে। এই চার্চফিল্ডে কত দৌড়ঝাঁপ করেছি, কত ফুটবল খেলেছি। ফুটবল খেলার নেশা ছিল, কিছুটা দক্ষতাও ছিল, পরবর্তীকালে ভাল দৌড়তে পারতুম বলে খ্যাতিও হয়েছিল। দু'শো কুড়ি গজ দৌড়, চারশো চল্লিশ গজ দৌড়, আরও লম্বা দৌড়, এসবে খুব প্রাইজও পেয়েছি সে সময়।

তখন মাঠের পশ্চিম দিকে—রেসকোর্সের বেড়ার পাশে রাস্তা ছিল না। ছেলেরা রেসকোর্সের ভিতরেও খেলত তখন। এখন খেলে না, মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ছোট ছোট নিশান টানিয়ে ওখানে এখন পোলো খেলা হচ্ছে।

কাছেই ছিল হরিণবাড়ির জেল। যেখানে এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মর্মর প্রাসাদ, তার দক্ষিণ দিকে তার থেকে ফিট তিরিশেক মতো মাঠ ছেড়ে দিয়ে (সেই মাঠ দিয়ে লোকে যাতায়াত করত) শুরু হয়েছে জেলখানার প্রাচীর, চার্চফিল্ডের কাছ থেকে একেবারে এখনকার মেমোরিয়ালের বাগানের মধ্য দিয়ে রেসকোর্সের ধার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। রেসকোর্সের দিকে মুখ করে ছিল জেলের প্রকাণ্ড ফটকটা। তার দুদিকে দুটো অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছ মরে গেছে—শুকিয়ে গেছে কবে! তার গুঁড়ির যেটুকু চিহ্ন দেখা যায় তাতে সিমেণ্ট দিয়ে মুখটা বুজিয়ে দেওয়া। তবু শীর্ণ একটা অশ্বত্থ গাছ এখনো নীরবে সেই অতিকায় বনস্পতির স্মৃতি বহন করে চলেছে। এখন যেখানে হরিশ মুখুজ্যে রোড সার্কুলার রোডে পড়েছে, তার পরপারে চার্চের দিকে মুখ করে যেতে গেলে বাঁ-হাতি পড়ত একটি খানা। সেই খানার ওপরকার একটা সাঁকো পার হয়ে যেতে পারা যেত জেলের দেশীয় কর্মচারীদের কোয়ার্টারে। তখন যিনি ডেপুটি জেলার ছিলেন তাঁর ছিল খুলনায় বাড়ি। আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি ছেলে, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, তার ইনি সম্পর্কে ভাগ্নে হতেন। অর্থাৎ ভাগ্নে ডেপুটি জেলার, মামা কিন্তু স্বল্পবয়স্ক স্কুলের ছাত্র, ভাগ্নের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। ব্রজেন পল্লীগ্রামের ছেলে, তার একটু লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খাবার অভ্যাস ছিল। আমরা ততদিনে অতদূরে উঠি নি, এ-গলির সে-গলির আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে একটু-আধটু সিগারেট খেতে শিখেছি মাত্র। ব্রজেন কিন্তু টিফিনের সময় এক-একদিন আমাদের ডেকে নিয়ে যেত তাদের বাড়ি। সেই সাঁকো পার হয়ে আমরা যেতুম জেল-কোয়ার্টারে ব্রজেনের অভিভাবক ভাগ্নের বাড়িতে। তিনি তখন ডিউটিতে, আমাদের নিয়ে ব্রজেন বসত একেবারে বৈঠকখানায়। তারপরে বাড়িতে-কাজ-করতে-আসা কয়েদীদের হুকুম করত—এই তামাক সাজ।

খাটো জামা আর ইজের-পরা কয়েদীদের দেখেছি জেলসংলগ্ন কাঁটা-তার-ঘেরা উদ্যানে ক্ষেতে কাজ করতে, তাদের 'মেটদের' অধীনে। সেই কয়েদীদের যারা বাড়ি-বাড়ি কাজ করতে আসত, তাদের দু'তিনজন মহাউৎসাহে লেগে যেত তামাক সাজতে। কেন না তামাক সেজে কল্কেটাকে দু'হাতে ধরে তারাও কয়েকটা টান ঐ অবসরে টেনে নিতে পারত।

তারপরে ব্রজেন নিজে টানত গড়গড়ায় বসিয়ে। আমাদের বলত—এই টান না?

—না ভাই!

—দেখ না টেনে, মজা আছে।

দিনকতক অমনি সাধাসাধির পর মজার আকর্ষণে শেষ পর্যন্ত আমরাও তামাক খাওয়া শুরু করলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। তখন আমার বয়স চোদ্দ-পনরো হবে।

এইবার খেলার কথা। ১৯০৮ সালের শীতকালে হকি-ম্যাচ দেখতে গেলাম। তার আগে হকি খেলা চোখেও দেখি নি। বাইটন কাপ বহুবার নিয়েছে রাঁচীর একটি দল, কিন্তু পর

পর তিনবার একসঙ্গে নিতে পারে নি ইতিপূর্বে। এবার নাকি এসেছে তাদের সেই সুযোগ। তাই, মাঠে আর উত্তেজনার সীমা নেই। রাঁচীর দল খেলছে জামালপুরের সঙ্গে। এই রাঁচী দলটি ছিল সম্পূর্ণ আদিবাসীদের নিয়ে গড়া। আদিবাসী খৃষ্টান। দলটি গড়েছিলেন এক মিশনারী সাহেব, তিনিই ছিলেন দলপতি, নিজেও খেলতেন সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে। তাঁর এই রাঁচীদল ছিল কলকাতার দর্শকদের কাছে ভীষণ প্রিয়। তারা খেলছে, দর্শকদলের মধ্য থেকে ধ্বনি উঠছে—বাক্ আপ রাঁচী!

অতি সুন্দর নিয়মবদ্ধ ছিল তাদের খেলা। প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি যাকে বলে। ওদের মধ্যে একজন খেলোয়াড় ছিল, তার নাম 'সাধু'। এই নামটা মনে আছে। ওরা কিন্তু কখনো আর মারধোর করে, ফাউল করে খেলত না। অথচ যাদের সঙ্গে তারা খেলছিল, সেই জামালপুর অ্যাপ্রেণ্টিস দল তাদের একেবারে মারধোর করে—যথেচ্ছ ফাউল করে তাদের সেবার দিল হারিয়ে। তারা খেলার মধ্যে একটা শোভনতার—একটা শৃঙ্খলার শিক্ষা পেয়েছিল। আদিবাসী তারা—ক্ষেপে গেলে তারাও কম দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে পারত না,—কিন্তু আশ্চর্য তাদের সংযম! ভুলেও তারা সংযম হারায় নি—হারায় নি তাদের সুন্দর শিক্ষার সীমা। কিন্তু সেই যে অন্যায়ভাবে মারধোর করে তাদের সেবার হারিয়ে দেওয়া হল, সেই থেকে মনের দুঃখে তারা কখনো কলকাতায় খেলতে আসে নি। সেইবার জামালপুর কাস্টমস-এর কাছে হেরে গেল এবং কাস্টমস নিল বাইটন কাপ। সম্ভবত ফাইনালে ক্যালকাটাকে হারিয়ে দিয়ে।

দেশীয়দের কাছে ফুটবলের মধ্যে ট্রেডস আর কুচবিহার কাপই ছিল তখনকার দিনে বড় খেলা। সেবার মোহনবাগান উপরি-উপরি তিনবার ট্রেডস কাপ নিলে। প্রেসিডেন্সী কলেজ ক্লাবও খুব ভাল খেলত ফুটবল। ইলিয়ট শিল্ডের চ্যাম্পিয়ন ছিল। ট্রেডস-এর একটা ম্যাচ খেলতে গিয়ে সুধীর চ্যাটার্জী মশায়ের পায়ে নিদারুণ আঘাত লাগে একবার। যে স্কুলে আমি পড়তাম, সেই লণ্ডন মিশনারী স্কুলেই অধ্যাপক ছিলেন সুধীর চ্যাটার্জী। স্কুলের ক্লাসেও মাঝে মাঝে পড়াতে আসতেন। ইনি খেলতেন ব্যাকে, মোহনবাগান টীমে। রবারের পারফোরেটেড করা পট্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে নিতেন হাঁটুতে ঐ আঘাতটা লাগবার পর থেকে। ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত ইনি খেলেছিলেন। দুপায়েই খেলতে পারতেন, অর্থাৎ দুপায়ের সমান 'শট' ছিল। বুট পায়ে খেলতেন। মোহনবাগানের তদানীন্তন এক মাত্র বুটেড খেলোয়াড়।

আই এফ এ শীল্ডে তখন মিলিটারী টিমগুলিই বেশী খেলত। ট্রেডস-এ, কুচবিহার-এ যত দেশীয়দের ভিড় হত, আই এফ এ-তে অত হত না। গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স প্রথম কলকাতায় এল সেবার। থাকতো ফোর্টে। কাস্টমস-এর সঙ্গে খেলে শিল্ড নিল। পর পর দুবছরই নিয়েছিল। তৃতীয় বারের বার তারা গেল বাইরে বদলি হয়ে। তবু এল খেলতে। বলা বাহুল্য, তৃতীয় বারেও তারা শিল্ড নিয়েছিল।

আই এফ এ-তে বাঙ্গালী টিম ছিল শুধু চুঁচুড়ার দল আর শোভাবাজারের দল। যখনকার কথা বলছি, মোহনবাগান তখনো আসে নি। স্থানীয় ইউরোপীয়ান দলগুলি খেলত। ক্যালকাটা, ডালহাউসী, ওয়াই-এম-সি-এ, ক্যালিডোনিয়ান, কাস্টমস, রেঞ্জার্স আর দুটো কি তিনটে মিলিটারী টিম।। এই ছিল লীগেরও খেলা। এরাই আবার খেলত শীল্ডে। কিছু কিছু বাইরের মিলিটারী দলও আসত। ফার্স্ট রাউণ্ড, সেকেণ্ড রাউণ্ড, সেমি-ফাইনাল, ফাইনাল—বাস, ২০।২২ দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেত আই এফ এ শীল্ডের টুর্ণামেণ্ট।

শীল্ডের ফাইনালের দিন একদিকে এক লাইন ফোল্ডিং চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে শুধু, কিছু আসন বুঝি বিক্রিও হয়েছে, আর সব দর্শক দেখছে বাইরে দাঁড়িয়ে। জাঁকজমকের দিক থেকে আজকের তুলনায় তা কিছুই নয়। চ্যারিটি ম্যাচও কিছু হত। ইংল্যাণ্ড-স্কটল্যাণ্ড-ওয়েলস চ্যারিটি। মিলিটারী ভার্সাস সিভিল টিমের খেলার চ্যারিটি।

১৯০৯ সালে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ডে যোগ দিতে বাঙালীর কিছুটা দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। সেবার অবশ্য মোহনবাগান হেরে গেল গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সের কাছে। সে ম্যাচটির কথা কিন্তু বেশ মনে আছে। রেঞ্জার্স মাঠে খেলা। রেঞ্জার্সের তাঁবুর সামনে সেই মাঠ। মোহনবাগান, মানে আমাদের স্কুলের অধ্যাপক-মশাই খেলছেন যে-টিমে, সেই টিমের খেলা, আমাদের উদ্দীপনা কি কম? মাঠটা ছিল পূব-পশ্চিমে লম্বা। এক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল—মাঠের কোণায় কোণায় জল—পারবে কি আমাদের টিম জিততে? পারল না। গর্ডনরা সত্যি কথা বলতে কী, বড়ো মারধোর করে খেলত। বেশ গোঁয়ার্তুমি ছিল ওদের। ক্যালকাটা টিম ছিল ভদ্র—তাদের একটা ইজ্জত ছিল। কিন্তু ওরা ছিল ভীষণ rough ; Customsও rough ছিল, কিন্তু Gordon ছিল যেন আরও বেশী। Customs-এ আর Gordon-এ যখন ম্যাচ্ হ'তো তখন ছিল দেখবার! একেবারে ঠিক যেন কাঠে-কাঠে পড়েছে! যাই হোক, মোহনবাগান সেদিন সেই ভিজে মাঠে দাঁড়াতে পারল না। ৩—১ গোলে জিতে গেল গর্ডন।

মোহনবাগান শীল্ডে আসবার পর থেকে মাঠে ভিড় হতে লাগল খুব। তখন বাইরে থেকে ম্যাচ দেখবার রীতিও দাঁড়ালো বেশ! চৌকি আনছে—টুল আনছে—পেতে-পেতে সব দেখছে। পুলিস অবশ্য আপত্তি করত না। বড়ো-বড়ো বাক্সও মাথায় করে নিয়ে আসতো লোকেরা। যারা দেখতে চাও, মাথা পিছু আট আনা, এমন কি কখনো-কখনো এক টাকাও দর উঠত, বাক্সের ওপর উঠে ভাড়া দাও সেই মাথায়-করে বাক্স-আনা লোকটাকে, আর খুশিমতো ম্যাচ্ দেখ।

১৯১০ সালে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে খেলা। এই ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড-এর কেয়ার-টেকার ছিলেন তখনকার নাম-করা রেফারী Clayton সাহেব। কী তদ্বিরই না করতেন মাঠের! বৃষ্টি হলে মালীদের দিয়ে কাঠের পাটা দিয়ে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে টেনে জল নিকেশ করতেন। গোলপোস্টের কাছে কাদা হয়েছে, saw dust ছিটিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, সেদিন খেলায় প্রচুর লোক হয়েছে। রাইফেল

ব্রিগেডের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা। ইডেন গার্ডেনের দিকে গ্যালারী ছিল, তাতে বসে দেখছিলাম। কিন্তু বাক্সে উঠে লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল, সেখানে ঘটল বিপর্যয়। মড়মড় করে বাক্স ভেঙে পড়ল যেন কোথায়। পড়ে গিয়ে জখমও হল দুচারজন। তাই দেখে পুলিস আপত্তি করতে লাগল বাক্স পাতার ব্যাপারে। এরা দেবে না পাততে, তারাও ছাড়বে না। অবশেষে মারধোর করতে শুরু করল পুলিস। খানিকটা কাজ হ'ল। কিন্তু তারপর শুরু হল সেখানে এক মজার খেলা। এরা এসে পাতছে, পুলিস এসে তাড়া করছে। তাড়া খেয়ে ওরা পালাচ্ছে, পুলিস একটু সরে যেতে আবার এসে পাতছে। আবার তাড়া, আবার পালানো। খেলা দেখবার একমাত্র আকর্ষণ ছিল কিন্তু মোহনবাগান। অথচ, মোহনবাগান হেরে গেল রাইফেল্ ব্রিগেডের কাছে। ওরা দুর্ধর্ষ মিলিটারী, তায় পায়ে বুট, এবারেও বৃষ্টি হয়ে মাঠ ছিল ভিজে। তার ওপরে গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি, মারধোর তো আছেই, তা নইলে আর মিলিটারী টিম কিসের? আর, তাদের সঙ্গে লড়ছে নগ্নপদ মোহনবাগান, বুট পায়ে একটিমাত্র লোক, তিনি ওদের ব্যাক্—সুধীর চ্যাটার্জী মশায়—আমাদের অধ্যাপক।

এই মোহনবাগান অবশেষে খেলায় জিতে শীল্ড নিলো ১৯১১ সালে। সেকেণ্ড রাউণ্ডে রাইফেল ব্রিগেডকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যেন নতুন আশার সঞ্চার হলো। সেমি-ফাইনাল খেলা মিড্‌লসেক্স-এর সঙ্গে। প্রথমদিন 'ড্র' গেল, দ্বিতীয় দিনে কী হয় কে জানে! ওদের গোলকিপার পিগট্ কপালে হঠাৎ চোট খেলে, আর সঙ্গে সঙ্গে এলো সে কী উত্তেজনা! মিলিটারী টিমটা যেন ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু জিত হল মোহনবাগানেরই। এবার ফাইনাল খেলা ইস্ট ইয়র্কের মত নামজাদা টিমের সঙ্গে। তবে, ভদ্র টিম। আমাদের যাবার উদ্যোগ সব ঠিক। কিন্তু ম্যাচ দেখতে কী আর পারব? উত্তর দিকে তখন অল্প গ্যালারী করে দিয়েছে বটে, তবে সে আর লোক-আন্দাজে কতটুকু? চেয়ারের মূল্য দু'টাকা করে। প্রচুর ভিড়। কেল্লার র‍্যামপার্টের ঢালু জমিতে কয়েক হাজার লোক। সাইকেল জড়ো ক'রে, তার ওপরেও দাঁড়িয়ে লোক। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। খেলা তখনো আরম্ভ হয়নি। কিন্তু কী সর্বনাশ, দাঁড়াবো কোথায়? অবশ্য এখনকার মতো লোক হয়নি, কিন্তু তখনকার দিন আন্দাজে লোকে লোকারণ্য বলা চলে। কেল্লার র‍্যামপার্ট আর ক্যালকাটা মাঠের মাঝে একটা খানা ছিল, সেটা এখনো আছে। তার ঢালুর ধারে দাঁড়িয়ে কোনমতে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাঠের পূর্ব দিকে বাক্সের ওপর দাঁড়ানো কম ভিড় হয়নি লোকের! দক্ষিণ দিকটা খালি—কিন্তু ৬।৭ সারি লোক। প্রথমেই গোল দিলো ইস্ট ইয়র্ক—সাহেবদের সে কী সমবেত উল্লাসধ্বনি! দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল গোরাদের গ্যালারী। ঠিক দক্ষিণে কোনো গ্যালারী ছিল না। পূর্বদিকে বাক্স সাজানো রয়েছে। খুবই উঁচু বাক্স। দু'মানুষ সমান উঁচু বাক্স বয়ে নিয়ে গেছে। দাম নিচ্ছে চার-পাঁচ টাকা করে। মোহনবাগান গোল খেয়ে গেল দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে খানার এপারে চলে এসেছি, এমনি সময় উঠল প্রচণ্ড এক চিৎকার—গোল—গোল!

কী ব্যাপার? না, মোহনবাগান গোল দিয়েছে।

আর যায় কোথায়! হাতের ছাতা, পায়ের জুতো, সব শূন্যে উঠতে লাগল। প্রচণ্ড আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে সবাই জুতো আর ছাতা ছুঁড়ছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন অনেকগুলো বাক্স এখানে ওখানে ভেঙ্গে পড়ল মড়মড় করে!

আমাদের আর যাওয়া হলো না। আমরা মানে, আমি আর আমার এক বন্ধু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখব কী করে? যেখানটায় আগে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা ত ভর্তি হয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি এবং হাঁকপাঁক করছি দেখে হঠাৎ একটা বাক্সের ওপর থেকে একজন ডাকল। চিনি না। বললে, কী দেখতে পাচ্ছেন না? আসবেন? বাক্স-ভাড়া-দেওয়া লোকটি ওদিকে কোথায় দাঁড়িয়ে পড়ে খেলা দেখছে, এইবেলা উঠে আসুন।

এবং সত্যি সত্যি আমাদের দুজনের হাত ধরে ওপরে তুলে নিল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা মোহনবাগানকে দ্বিতীয় গোলটি দিতে দেখলুম। মোহনবাগান জিতেছিল ২—১ গোলে।

বাড়ি ফিরছি সেদিন ভিড় ঠেলে ঠেলে। লোকের কী উল্লাস! কোথায় যে কার ছাতা চলে গেছে, কোথায় যে কার জুতো চলে গেছে, ভ্রূক্ষেপ নেই কারুর!

স্বদেশী এগজিবিশন হয়েছিল যেখানটায়, সেখানটা তখন কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ছিল। সবাই করত কী, তার ভিতর দিয়ে গলে যেত। তখন ভবানীপুর-কালীঘাট থেকে ট্রামে করে ডালহৌসী যেতে ভাড়া ছিল ফার্স্ট ক্লাশ—দু আনা, সেকেণ্ড ক্লাশ—পাঁচ পয়সা। লোকে অফিসে যেত ট্রামে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফিরে আসত হেঁটে। সেদিন দেখি, একটি লোক কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে পথ সর্ট-কাট করে কালিঘাটের দিকে চলেছে 'জয় মা কালী' বলতে বলতে।

আমরা তার ভাবভঙ্গী দেখে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী ব্যাপার মশাই?

মশাই বললেন, 'মোহনবাগান জিতেছে। মার কাছে পুজো দিতে চলেছি। মানত করেছিলুম যে।'

আমরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তখনো তাকিয়ে আছি দেখে, তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আরে ভাই, আমি কারখানার হেড মিস্ত্রী। আমার ফোরম্যান হচ্ছে ফিরিঙ্গী। সে বলেছিল——মোহনবাগান হেরে যাবে। তার সঙ্গে বাজী ধরেছিলাম! মা-কালী মুখ রেখেছেন, বাজী জিতেছি। তাই মানত রক্ষা করতে যাচ্ছি। ফিরিঙ্গীটা বড্ড হেনস্তা করতো, বুঝলেন!'

ভদ্রলোক সেই উত্তর কলকাতার লোক! কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফিরে যাবেন সেই উত্তর কলকাতায়! তখনকার দিন! ব্যাপারটা সহজ নয়!

ঐ ১৯১১ সালেই আমি ভালো খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছি। ভালো দৌড়তুম বলে টিমে আমাকে ফরোয়ার্ড লাইনেই খেলতে দিত, উইংসে খেলতুম সাধারণত। কিন্তু সেবার ইলিয়ট শীল্ডের খেলায় আমাদের লণ্ডন মিশনারী স্কুল-এর খেলা পড়ল দুর্ধর্ষ প্রেসিডেন্সী কলেজ টিম-এর সঙ্গে।

তখন আমার বয়স ১৬।১৭ হবে। আমাকে দিলে সেবার সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে। খেলছি মনপ্রাণ দিয়ে। এক সময় একটা বল ডান উইং থেকে সেণ্টার করেছে—দেখছি বলটা আসছে একটু উঁচু হয়েই—প্রায় বুক সমান উঁচু হবে—ওটা আমি ধরব—ধরা শক্তও হবে না, দেখি একজন প্রেসিডেন্সীর খেলোয়াড় আসছে তীরবেগে ছুটে বলটা ধরতে। এতো জোরে আসছে যে, প্রচণ্ড ধাক্কা লাগতে পারে। তাই পিছিয়ে গিয়ে পায়ে না ধ'রে বল হেড করব ঠিক করলাম। হেডও করলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, যে খেলোয়াড়টি ছুটে আসছিলেন, মুখ তাঁর খোলা ছিল, সেই খোলা মুখের দাঁত বসে গেছে আমার মাথায়—ব্রহ্মতালুর কাছটাতে। আমি প'ড়ে গেছি, তিনিও পড়েছেন আমার ওপরে। রেফারী ছিল সেণ্ট জেভিয়ার্সের একজন পাদ্রী সাহেব। তিনি হুইসেল বাজিয়ে ফাউল দিলেন। আমরাই শট করব। খেলোয়াড়টি আমার ওপর থেকে উঠে গেলেন, আমি উঠতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথায় যেন টান পড়ল, শির যেন টেনে ধরেছে। চোখ তুলে দেখি, রেফারী পাদ্রীসাহেব আমার দিকে থ হয়ে তাকিয়ে আছেন। ঘাড়টা শক্ত হয়ে আছে দেখে ঘাড়টা ধরে মাথাটা সোজা করব, ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি, গরম গরম ঠেকছে, হাত চোখের সামনে এনে দেখি, হাত একেবারে রক্তে রাঙা! কাস্টমস্-এর মাঠে খেলা হচ্ছিল। কাস্টমস্-এর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুধীরবাবু। চেঁচিয়ে বললেন,—বেরিয়ে এসো মাঠ থেকে।

আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে মোহনবাগানের তাঁবুতে। মাঠের উত্তর-পূর্ব দিকে রাস্তা পার হয়ে যেতে হত প্রেসিডেন্সী-মোহনবাগানের তাঁবুতে। সেই তাঁবু তখন ছিল প্রেসিডেন্সী আর মোহনবাগানের। তাঁবুর ভিতরে বসেছিলেন তখনকার মোহনবাগানের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিজয় ভাদুড়ী। তিনি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। আমাকে বসিয়ে ফার্স্ট এড দিলেন দুজনে মিলে, আমার মাথার ক্ষতস্থানের চারপাশটা কামিয়ে দিয়ে। তারপর সুধীরবাবু বললেন,—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে চলো।

মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম,—না-না স্যর, হাসপাতালে যাবো না!

বলে, তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মাথার মধ্যে যেন আগাগোড়া বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপরে, আর কিছু আমার মনে নেই। সমস্ত আলো যেন মুহূর্তে নিভে গেল আমার চোখের সামনে থেকে!

দুই

১৯১১-১৯১২

জ্ঞান যখন ফিরে পেলাম তখন অনেক রাত। চোখ খুলতেই দেখি, মায়ের মুখখানা। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মা।

—খোকা ?

—মা!

কাছেই কোনো চেয়ারে বোধ হয় বসেছিলেন বাবা ; তাঁর ভারী গলার স্বর শুনতে পেলাম, 'ওকে বেশী কথা বলিও না।'

কথা বলতে ভাল পারছিলামও না। মাথায় ভীষণ একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম। কিন্তু ব্যথার থেকে মানসিক উৎকণ্ঠা আরও বেশী। মাকে চুপি চুপি প্রায় ফিসফিসিয়েই প্রশ্ন করলাম, 'এ আমি কোথায়, মা ? হাসপাতালে ?'

মাও চুপি চুপি উত্তর দিলো, 'হাসপাতালে কেন হবে! বাড়িতে। বুঝতে পারছিস না ?'

মন থেকে যেন একটা পাষাণ-ভার নেমে গেল। যাক, হাসপাতালে যেতে হয়নি তাহলে শেষ পর্যন্ত!

ভাবনাটা মিথ্যে নয়, তখনকার বয়সে হাসপাতাল-বস্তুটার সঙ্গে একটা ভীতিই মিশ্রিত ছিল। কখনও তার আগে যাওয়ার আশঙ্কা ঘটেনি। পাড়ার অমুকের ভীষণ অসুখ হয়েছে, হাসপাতালে যাচ্ছে, শুনে মনে-মনে ভয়ানক ভয় হত।

মা বললে, 'হাসপাতালেই নিয়ে গেছল তোকে।'

আর্তকণ্ঠে বলে উঠলাম, 'হাসপাতালে!'

মা বললে, 'সেখানে কী-সব ওষুধ-বিষুধ-ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। দেবার পর তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে তোর বন্ধুরা। আমি সব দেখেশুনে প্রথমটায় ভয়েই মরি আর কী!'

যাই হোক, ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পুরো তিনটে দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে। অবশ্য ঘা সারতে আরও দেরি হয়েছিল। ততদিনে সে বছর খেলার মরসুমও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার শাসনে আমারও খেলার মরসুম যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে বুঝেছিলাম পরের বছরে খেলার মরসুমে খেলার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে। বাবা আদেশ দিলেন মায়ের মাধ্যমে, খেলার মাঠে গিয়ে আর যেন ও গুঁতোগুঁতি করে মাথা ফাটায় না। বারণ ক'রে দিও। একটা বল নিয়ে মারামারি, এখেলা না খেললেই বা কী ?

অতএব, ফুটবলেরও ইতি। বহু পরে একটিবার মাত্র খেলেছিলাম, সে-কথা যথাসময়ে বলা যাবে'খন। আসলে কিন্তু যে-কথাটা বলতে বলতে নিজের খেলার কথায় এসে পড়েছিলাম, সে হচ্ছে ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শীল্ড নেবার প্রসঙ্গটা। এই প্রসঙ্গে একটি অভিনব ঘটনার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ ক'রে যেতে চাই। যদিও এটা আমার শোনা কথাই। গিরীশচন্দ্র তখন মিনার্ভার কর্ণধার। মোহনবাগান শীল্ড নিয়েছে শুনে তিনি বললেন, 'ওরা দেশের মুখ রেখেছে গো। ওদের রিসেপশন দিতে হবে।'

—কিন্তু, কীভাবে ?

উনি বললেন, 'আমরা থিয়েটারের লোক। থিয়েটারেই ওদের অভ্যর্থনা করব।'

—থিয়েটারে ?

—হ্যাঁ, থিয়েটারে ! গিরীশ বললেন, 'থিয়েটার শিল্পের পীঠস্থান। আর শিল্প-জগতে কোনো ভেদাভেদ নেই, এই থিয়েটারেই আমরা ওদের অভ্যর্থনা জানাবো।'

প্রবীণেরা মনে করতে পারবেন, সে-ও এক শনিবার, অভিনয়ের দিন, অভিনয়ের পূর্বে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন গিরীশচন্দ্র মিনার্ভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে।

খেলার কথায় কত স্মৃতিই না ভেসে ওঠে চিত্তপটে ! সেই যে 10th Middlesex-এর অগ্রগামী খেলোয়াড়টি সামারসলট্ খেয়ে প্রতিপক্ষকে গোল দিচ্ছে, তাকে আজও ভুলিনি। ভুলিনি Territorial Armyর teamকে। রয়্যাল স্কট্, রয়্যাল আইরিশ, ফুশিলিয়ার, কে-এস্-এল্-আই (King's Shorpshire Light Infantry)র মতো জবরদস্ত টিম নয়, কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে তাদের শৃঙ্খলা আর মনোভাব লক্ষ্য করার মত ছিল। কী জানি, আজকাল England-এর proper-এও এদের মত টিম আছে কিনা ! আমার ঐ মাথায় চোট খাওয়ার দুর্ঘটনার পরে ম্যাচ্ খুব বেশী আর দেখা হয়নি।

কলেজের দলের হয়ে ইলিয়ট্ শীল্ডে যে খেলতাম তা বলেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি স্থানীয় ক্লাবে খেলতাম, তার নাম ছিল রয়েল ক্লাব। স্পোর্টস-এর দিক দিয়ে দৌড়ে আমার নাম ছিল তা আগেই বলেছি। আমার সহপাঠী যতীশ নাথ (জে. সি. নাথ) লং ডিস্ট্যান্স রেস-এ খ্যাতিমান ছিল। সে ছিল চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু শর্ট ডিস্ট্যান্স রেস-এ আমি তাঁকে হারিয়ে প্রাইজ পেতাম। এসব কারণে, সেদিনকার ক্রীড়াজগতে আমি একটা স্থান করে নিতে পেরেছিলাম বলা চলে। রয়্যাল ক্লাবে তাই আমার একটু আদরও ছিল। এই রয়্যাল ক্লাবে মেম্বারদের আবার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল থিয়েটার দেখার। এই থিয়েটার দেখা ও করা, আর এই রয়্যাল ক্লাব, আমার প্রথম যৌবনের এক বিশেষ অধ্যায়। এবং এ অধ্যায় পরে বিশদভাবে বলবার জন্য মনে-মনে এখানে চিহ্নিত করে রাখলুম। আপাতত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতেটা পাকিয়ে নিই।

অর্থাৎ, যা বলছিলাম, তা থেকে কিছুটা পিছিয়ে যাই। ১৯১১ সালটা ছুঁয়েছিলাম, এবার আবার

পিছু হেঁটে চলে যাই ১৯০৮ সালে। তা না হলে, বলতে-বলতে যে কথাগুলি মনে এলো তা আর আদৌ বলা হবে না। আর বলতে না পারলে আমারই বা তৃপ্তি কোথায়!

ক্রিকেটে আমাদের ঝোঁক ছিল না। মাঠে তিনটে কাঠি পুঁতে যা খেলেছি, তা আজও ছেলেরা খেলে, বলে ব্যাটবল খেলা। সে খেলা খেলেছি। কিন্তু ক্রিকেটের মতো ব্যয়সাধ্য খেলার আয়োজন আমরা করব কী করে? হকি স্টিক্ একখানা কিনেছিলাম, তবে হকি খেলতে পারিনি, আমাদের মতো টিম আর কোথায়? খেলব কাদের সঙ্গে? তাছাড়া, প্রত্যেকের হাতে চাই স্টিক, সেই-বা যোগাড় হচ্ছে কোথা থেকে?

তখন গড়ের মাঠে—অর্থাৎ ময়দানে—সার্কাস হতো। দুটো, কখনো বা তিনটে করে সার্কাসও হতো। মাঝখানে উঁচু করে বিরাট তাঁবু পড়েছে, তার আশেপাশে ছোট-ছোট তাঁবু; এইসব আবার ঘেরা রয়েছে চারিদিকে টিন দিয়ে। তার মধ্যে কোথাও সাজঘর, কোথাও জন্তুজানোয়ারদের খাঁচা।

বিলাতী সার্কাস একটি কি দুটি প্রত্যেক বছরই আসত, আর আমাদের দেশী সার্কাস—প্রফেসর বোসের সার্কাস—ফি-বছরই হতো। বিলাতীগুলি আসত ডিসেম্বরে বড়দিনের আগে—আবার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতো জানুয়ারীর মাঝামাঝি অন্য কোন শহরে। বোসের সার্কাস কিন্তু থেকে যেত সেই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। বোসের সার্কাসের মালিকও দেশী, খেলোয়াড়রাও এদেশীয়। আর একটি সার্কাস ছিল, তার নাম 'হিপ্পোড্রোম' সার্কাস, তার মালিক ছিলেন বাঙালী, নারায়ণ বসাক মশায়। তিনি নিজেও একসময় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্ ছিলেন। তার দলে কিছু বাঙালী খেলোয়াড় ছিল, আর ছিল ইংরেজ, মালয়ান, তামিল ও মহারাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়। এই নারায়ণ বসাক সম্বন্ধে দু'এক কথা আরও বলা দরকার। ইনি সার্কাস-সত্ত্বাধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু আরও একটা বিষয়ে ইনি স্মরণীয় ব্যক্তি। ১৯০০ কি ১৯০১ সালে ইনি ভ্রাম্যমাণ সিনেমা-প্রদর্শন-কোম্পানী করেছিলেন, ঘুরে ঘুরে সিনেমা দেখিয়ে বেড়াতেন, তাঁর ঐ কোম্পানীর নাম দিল—"লণ্ডন বায়োস্কোপ।"

আর দেখেছিলাম প্রফেসর রামমূর্তির সার্কাস। ইনি মাদ্রাজী এবং প্রভূত শক্তিশালী ব্যায়াম-বীর। ইনিই প্রথম বুকের উপর হাতি তোলার খেলা দেখাতেন। আর দেখাতেন, বুকের ওপর পাথর ভাঙা। চিত হয়ে শুয়ে আছেন, বুকের ওপর প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঁই। সেই চাঁই-এর ওপর ছোট-ছোট পাথরের টুকরো রেখে বড়ো বড়ো হাতুড়ি দিয়ে কয়েকটি জোয়ান লোক সেগুলি গুঁড়ো করছে, আর আমরা তা দেখছি রুদ্ধনিশ্বাসে! প্রফেসর রামমূর্তির আরও খেলা দেখেছি। মোটরগুলি চালিয়ে দিয়েছে, উনি পিছন দিক থেকে দড়ি দিয়ে তা দুহাতে ধরে রেখেছেন, গাড়ির চাকা ঘুরছে, অথচ গাড়ি নড়তে পারছে না একটুও, দেখে দেখে লোকের হাততালি দেবার আর বিরাম নেই যেন!

বিলাতী একটা সার্কাস আসত তার নাম ছিল 'হার্মস্টং' সার্কাস। এতে ছিলেন এক বাঙালী ক্রীড়াবিদ্—রমণবাবু। বিস্ময়কর ট্রিপল্ বারের খেলা দেখাতেন ইনি, আমরা তা দেখেছি। শুনেছি, ও-ধরনের ট্রিপল্ বারের খেলা কোনো সাহেবও দেখাতে পারত না! তিনটি হরাইজেন্টাল বার

একসঙ্গে খাটানো হত। এ-বার ছেড়ে ও-বারে লাফ দিয়ে দিয়ে খেলা দেখানোই শুধু নয়, তাঁর শেষ খেলা ছিল, যেটা অন্য কেউ পেরেছে বলে শুনিনি, বার-এ ঘোরার গতিটা এতো বাড়িয়ে দিতেন যে, মনে হতো কারুর দেহ ঘুরছে না, বাঁই বাঁই করে একটি বাঁশ ঘুরে চলেছে। এই ঘোরার গতিই চরম উৎকর্ষের পরিচিতি নয়, আরও আছে। জোরে ঘুরতে ঘুরতে ডিগবাজী খেয়ে ওঁর আসা উচিত প্রথম বার থেকে দ্বিতীয় বার-এ, তাতেই লোকে চমৎকৃত হত না। কিন্তু উনি সৃষ্টি করতেন আমাদের জন্যে আরও বিস্ময়! প্রথম থেকে ডিগবাজী খেয়ে ওপরে উঠে দ্বিতীয় বার-এ নয়, আসতেন একেবারে দ্বিতীয় 'বার' ডিঙিয়ে তৃতীয় 'বার'-এ। বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ শূন্যে উঠে যেতেন পনরো ফিটেরও ওপরে। এদিকে মনে করুন, প্রথম 'বার' থেকে তৃতীয় 'বার'-এর তফাৎ হচ্ছে ষোলো-সতরো কি আঠারো ফিট্। নীচে এসে ঐভাবে তৃতীয় 'বার'-এ পৌঁছতে গিয়ে যদি এক-আধ ইঞ্চিরও তফাৎ হয়, ত, অপঘাতে মৃত্যু একেবারে অনিবার্য। যাকে বলে মারাত্মক খেলা। শুনেছি রমণবাবু মাইনে পেতেন পাঁচশো টাকা। সে যুগের পাঁচশো টাকা কম কথা নয়! ওঁর এই সার্কাসের দল সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতো বললেই হয়। ফলে, রমণবাবু তাঁর ঐ খেলার জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন বলা চলে।

ভীষণ টানত আমাকে সার্কাসের খেলা। বাড়ি থেকে সার্কাস দেখতে যাবার অনুমতি মিলত, কারণ, সার্কাস ত ছোটদের দেখবার জন্যই বটে! তবে, তা-ও দেখবার জন্য দু'তিনবারের বেশী পয়সা পাওয়া যেত না বাড়ি থেকে। কিন্তু, মাত্র দু'তিনবারেই কি সাধ মেটে? গ্যালারীর টিকিট ছিল আট আনা। সেই আট আনা জোটানোই হয়ে উঠত দুষ্কর। তাই, আমরা যখন মাঠে হকি ম্যাচ দেখতে যেতাম, তখন, বড় ম্যাচ-ট্যাচের কথা স্বতন্ত্র, লীগ-এর খেলা-টেলা হলে সেদিকে আর না গিয়ে আমি চলে আসতাম সার্কাসের টিনের বেড়ার কাছাকাছি। টিন ফাঁক করে দেখতে চেষ্টা করতাম, ভিতরে কী আছে। বাঘ মশায় খাঁচার মধ্যে কী করছেন, ভালুকের জ্বর এসেছে কি না। অথবা, ক্লাউন সাজতে গিয়ে মুখে একের পর এক রঙ্ চড়াচ্ছে কী করে!

বন্ধুরা এতে যোগ দিত না, তারা ম্যাচ দেখছে। একাই টিনের ফাঁক তৈরি করছি, সঙ্গে বাইরের লোকও আছে। টিনের শব্দ হয়েছে কি, সার্কাসের লোকেরা তেড়ে আসত। সঙ্গে সঙ্গে—পালা—পালা!

খানিক পরে আবার গেলুম। আবার টিন সরিয়ে ফাঁক বার করতে গিয়ে শব্দ হলো। সার্কাসের ঘোড়ার সহিসগুলো করতো কি, শব্দ লক্ষ্য করে বালতি ভর্তি জল ছুঁড়ে দিত। অমনি পালা—পালা! যে পালাতে পারত না, সে ঐ শীতের দিনে বালতির জলে ভিজে মরতো!

এই সব সার্কাস ছাড়া লীণ্ডসে স্ট্রীটের পশ্চিমে, এখন যেখানে মনোহর দাস ট্যাঙ্কটা আছে তার পশ্চিম তীরে ফী বছরই বড়ো একটা তাঁবু পড়ত। সেটা ছিল 'কলোম্বিয়া রিংস', সার্কাস নয়। তাঁবুর মধ্যে, তাঁবুর চারদিক ঘেঁষে ডিম্বাকৃতি আকারে গ্যালারী করা থাকত। সেই গ্যালারীর ওপর বসানো

থাকত চেয়ার। দর্শক বসত চেয়ারে, গ্যালারীর ন্যাড়া কাঠে নয়। আর আসরের মাঝখানটায় ছিল ডিম্বাকৃতি কাঠের পাটাতন প্রায় ফুট-খানেক মাটি থেকে উঁচু করা। এই পাটাতনের চারদিকে একটা কাঠের কানাত দেওয়া থাকত, এ কানাতও প্রায় এক ফুট উঁচু হবে। এখন এই যে খেলা এরিনা, এতে হতো 'রোলার স্কেটিং' খেলা। জুতোর তলায় বল-বেয়ারিং-এর চাকা লাগানো। চারটে ছোট ছোট চাকা—ফিতে দিয়ে জুতোর সঙ্গে বাঁধা। তাই দু'পায়ে পরে সবাই গড়-গড় করে দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঠের পাটাতনের ওপরে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচও হোতো। ফ্যান্সি ড্রেস পরে নাচও হত সময়ে সময়ে। পা দিয়ে হকি খেলাও চলত মাঝে মাঝে। এসব আমরা বাইরে থেকে দেখতাম। বাইরে থেকে ঘড় ঘড় শব্দ শুনতাম। নইলে, পাঁচ টাকা ছিল টিকিটের দাম, সেটাকা আমরা পাচ্ছি কোথায়? খেলার সময় যে টিন ফাঁক করে একটু উঁকি দিয়ে দেখব তা-ও পারা যেত না। আর যদিও বা একটু ফাঁক করলুম, তা দিয়ে দেখতে পাবো আর কতটুকু? তবে, খেলা চলত না, শুধু ছেলেপিলেরা ভিতরে ভিড় জমিয়েছে, তখন একটু ভিতরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতাম, পাহারাদারেরা বিশেষ বাধা দিত না।

আর একটা তাঁবু পড়ত মনোহর দাস ট্যাঙ্কটার উত্তর তীরে। আকারে সেটা গোল নয়, ডিম্বাকৃতিও নয়, একেবারে লম্বাধরনের। এখানে ছিল এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ—ম্যাডান কোম্পানীদের। তখন 'সিনেমা' বলত না কেউ, বলত, বায়স্কোপ। পাকা সিনেমা হাউস কলকাতায় তখনো হয়নি। থিয়েটারে সারা রাত পালা চলবার পর, ভোরের দিকে, অথবা পার্বণের দিনে, মাঝে মাঝে, থিয়েটারগুলিতে বায়োস্কোপ দেখানো হত। ইম্পিরিয়াল বায়োস্কোপ, রয়াল বায়োস্কোপ এসব নামই শুনতাম। এর অনেক পরে হয়েছিল অরোরা বায়োস্কোপ, বর্তমানে যে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন আছে, তারই আদিপত্তন আর কী!

এই যে সব বায়োস্কোপ, এতে দেখানো হত টুকরো টুকরো সব ছবি। এই ট্রেন চলে যাচ্ছে, ঐ একজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এইসব দেখতুম। রাতে থিয়েটার দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি—ভোরের দিকে পাশের লোক ঠেলা দিয়ে তুলে দিলে—বায়োস্কোপ হচ্ছে, বায়োস্কোপ হচ্ছে।

চোখ চেয়ে দেখি একটা লোক জলে লাফিয়ে পড়ল, জল ছিটকে ওপরে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো টুপ্ করে একটা আওয়াজও বোধহয় শুনলুম। আসলে, নির্বাক ছবি, শব্দ হত না কিন্তু, আওয়াজ শুনতাম আমি আমার মনে। রেলের এঞ্জিনটা চলে যাচ্ছে ধোঁয়া উড়িয়ে, আমার মনে হ'লো, পুঁ-ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দটাও শুনলাম বুঝি!

ম্যাডানদের ঐ তাঁবুতে কিন্তু 'প্যাথে কোং'-র নিউজ দেখান হত। টুকরো টুকরো নিউজ রীল সব, এখানকার মতো অতো বড় নয়। দেখাত সব বিভিন্ন দেশের শহরের চেহারা, অথবা, প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিম্বা, উধাও সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে ঢেউ কেটে কেটে চলেছে সারি সারি সব যুদ্ধের জাহাজ।

ওখানে কখনো বা দেখাত এক রিলের কমিক ছবি। তাই বা কেন, প্যাথে কোং-র বড়ো ছবিও

দেখেছি। মনে পড়ে এমিল জোলার 'জারমিনাল' দেখেছিলুম। কথা নেই, একের পর এক ঘটনার নির্বাক চলচ্চিত্র। পরে হুগো-র 'লে মিজারেব্‌লস্' দেখেছিলুম। পরপর দু'দিন দু'খণ্ডে দেখানো হয়েছিল।

তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এসবের থেকে সার্কাসের আকর্ষণ ছিল আমার কাছে তখন বেশী। মরসুম কেটে গেলে বোসের সার্কাসে ছাত্রদের জন্য কনসেসন দিত। গ্যালারীর টিকিট হত চার আনা করে। যেদিন কনসেসন দিত, সেদিন যেতামই। আমাদের ভবানীপুরেরই লোক, ফণীবাবু, ফণী নাথ মশায়, তিনি ওখানে সাজতেন ক্লাউন। একথা নিশ্চয়ই সবার জানা, সার্কাসের প্রায় সর্বপ্রকার ক্রীড়ায় বিশারদ হতে পারলে তবেই ক্লাউন সাজা সম্ভব। ফণীবাবু আগে আগে ঘোড়ার খেলায় ছিলেন ওস্তাদ। আরও সব খেলা জানতেন। আমরা যখন তাঁর সান্নিধ্যে আসি, তখন তিনি ক্লাউন সেজেই খেলা দেখান। হরিদাসবাবু বলে এক ভদ্রলোক তখন দেখাচ্ছেন ঘোড়ার খেলা। ও-দলে আর একটি ভালো মেয়ে-খেলোয়াড় ছিল, তার নাম আজ ঠিক মনে নেই, বোধহয় মৃণ্ময়ী ছিল তার নাম, সে এক অদ্ভুত খেলা দেখাত। সার্কাসের গোল ঘেরার মধ্যে তিনটে ঘোড়া পাশাপাশি গোলাকারে ছুটে চলেছে, দুটি লোক এক পা পাশের ঘোড়ার ওপর রেখে, অপর পা-টি রেখেছে মাঝের ঘোড়ার ওপরে, একজন আছে ডাইনে, অপরজন আছে বাঁয়ে, আর তাদের কাঁধের ওপরে দু' হাত রেখে পিকক্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মৃণ্ময়ী—আর ঘোড়া তিনটে চলেছে সমানে ছুটে—সে এক অভিভূত হবার মত দৃশ্য ছিল তখন আমাদের কাছে! মৃণ্ময়ীর আরও একটি খেলা ছিল, সেটা ব্লক করে হ্যাণ্ডবিলে ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিতো। সে খেলার নাম ছিল, 'জগদ্ধাত্রী মূর্তি'। সে খেলাটা কী? সমস্ত এরিনাটা জুড়ে প্রায় বিশ ফিট উঁচু লোহার শিকের পাল্লা সাজিয়ে তার মধ্যে বাঘের খেলা দেখান হত। বোসের সার্কাসে এই বাঘের খেলা দেখানোর পর সুসজ্জিত একটা হাতি আসত, তার ওপর উঠত একটি বাঘ, আর মৃণ্ময়ী তখন মাথায় মুকুট দিয়ে সর্বাঙ্গে ডাকের সাজ পরে প্রতিমার জগদ্ধাত্রী সেজে সেই বাঘের ওপরে গিয়ে বসতেন বাঁ পায়ের ওপর ডান পা-টি রেখে। আর, হাতিটা করতো কী, এরিনার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সেই জগদ্ধাত্রী মূর্তি প্রদর্শন করাত, আর সমগ্র দর্শকমণ্ডলী একযোগে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন সমবেতভাবে প্রচণ্ড করতালি বর্ষণ করে।

দেখতে দেখতে আমারও ভীষণ ঝোঁক হল সার্কাসের কসরত করার। তখন শীতকাল, ফুটবলের আয়োজন নেই। কী করি? বাড়িতেই কসরত করা শুরু করলাম। ক্রমে ক্রমে বাড়ি থেকে একবারে ক্লাবে। ভবানীপুরে তখন যেমন বহু কনসার্টের ক্লাব ছিল, থিয়েটারের ক্লাব ছিল, তেমনি বহু জিমনাস্টিকেরও ক্লাব ছিল। আমি যে ক্লাবে বেশী যেতুম কসরত করতে, সেটা ছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে টার্ফ রোডের কাছাকাছি, গোয়ালটুলিতে। পিকক্ হতাম। প্যারালাল বার-এ খেলতাম। হরাইজেণ্টাল-এ দুলতাম। ঐ যে বোসের সার্কাসের ফণীবাবুর নাম করেছি, তিনি অবসর মতন এইরকম ২।৩টি ক্লাবে আসতেন ছেলেদের খেলা শেখাতে। সবাই খুব খাতির করত তাঁকে। আমি তাঁর কাছ থেকে

অনেক-কিছু শিখেছিলাম ক্রমে ক্রমে। রোম্যান রিং-এ ওঠা-নামা করতাম, তাতে খুব ব্যায়াম হত। রোম্যান রিং-এর অভ্যাসটা বহুদিন পর্যন্ত রেখেছিলাম। আমার এই যে চেতলার বাড়ি, তার চারতলায় ঐ রিং এখনো খাটানো আছে। দশ বার বছর আগেও ওর ব্যবহার করেছি। দেহটা ঠিক নয় মনে হচ্ছে, ঐ বার-এ চারপাঁচদিন ব্যায়াম করতাম, তাহলেই সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হয়ে উঠত শরীরটা। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ঐ বার-এর ব্যায়ামটা বজায় রেখেছিলাম, আজ জীবনের অপরাহ্নে এসে দাঁড়িয়ে ঐ রিং-এর ব্যায়াম-এর দিকে ফিরে তাকানো নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু, তবু 'রিং' এখনো সমানে ঝুলছে, তাকে অপসারিত করিনি, সে যেন অপসারিত হতেও চায় না!

আসল কথা, এই ব্যায়াম ও কসরত পরবর্তীকালে আমার অনেক কাজে লেগেছে। মঞ্চের ওপর বেশ পরিণত বয়সেও দীর্ঘদেহ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে অবলীলায় টেনে কাঁধে তুলে নিয়ে সোজা হেঁটে গেছি, দর্শকবৃন্দ দেখে বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু আমার সে সামর্থ্যের মূলে ছিল এই ব্যায়াম আর কসরত। কোন্ জিনিস কোন্ কাজে যে মানুষের লাগে তা কে বলতে পারে! তখন যে ব্যায়াম করতুম, এক মুহূর্তের জন্যও কি ভেবেছিলুম যে, এটা শেষ পর্যন্ত আমার জীবনে ফলপ্রসূ হবে অভিনেতারূপে, একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে?

আরও একটি ক্লাবে তখন ব্যায়াম অভ্যাস করতে যেতাম, সেটা ছিল রসা রোড থেকে একটা রাস্তা ভিতরে ঢুকে যেখানে এখন ইন্দিরা সিনেমা হয়েছে, সেখানে! রাস্তাটা অতো চওড়া ছিল না। সরু একটা গলি ছিল, নাম ছিল 'মল্লিক লেন' তার ভিতরে যে জিমন্যাস্টিক ক্লাবে আমি কসরত করতে যেতাম, তার মাস্টার ছিলেন ননীলাল বসু। তখনকার সর্বজনীন ননীদা। ছেলেরা জিমনাস্টিক করত, কুস্তি করত, তিনি ছিলেন ওস্তাদ লাঠি আর তলোয়ার খেলার। এই ক্লাবের সঙ্গে আমার অভিনেতা-জীবনেরও একটা বিশেষ সংশ্রব গ'ড়ে উঠেছিল, সেকথা পরে এক সময় বলা যাবে।

এমনি করে ১৯১১ সালের শীতকাল যায়-যায়, ব্যায়াম করে কাটাচ্ছি, এমন সময় ডিসেম্বরের শেষে ভারতে এলেন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ। দিল্লীতে দরবার ডেকে ঘোষণা করলেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হলো। কিন্তু সম্রাটের ভারত আগমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাও একটু পরে বলছি।

অবশ্য 'পরে-পরে' করতে গিয়ে কত কথাই না জমে যাচ্ছে। ১৯১১ ছুঁয়ে আবার ফিরে গিয়েছিলাম। আবার এসেছি ১৯১১তে। ১৯১১-র সব কথাই আমার বলা হয়েছে, শুধু পঞ্চম জর্জের বিষয়টি ছাড়া। এটা এখনও ছেড়ে আমাকে আবার একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯০৯-১০ সালের কথাটা বলে আমার বকেয়া কথাগুলি নিঃশেষ করে দিয়ে পুনর্বার আসা যাবে ১৯১১-র প্রসঙ্গে।

খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকলেও থিয়েটারের নেশা ভিতর থেকে যায়নি। সুযোগ পেলে এ-ই তখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়ত।

বাইরে তখনো সুযোগ আসেনি থিয়েটার করার, তাই বাড়িতে তারাপদর সঙ্গে দুধের স্বাদ মেটাচ্ছি ঘোল দিয়ে। ধরা যাক রবিবার কিংবা অন্য কোন ছুটির দিন, স্কুলে যেতে হয়নি।

বৈঠকখানায় নিস্তব্ধ দুপুরের দিকে বসে গল্প করছি আমি আর তারাপদ। বাবা হয়ত বাড়ি নেই। ওপরে মা হয়ত তখন ঘুমচ্ছেন। আর তারাপদ আমাকে দুরন্ত উৎসাহে হয়ত যাত্রার পালাগানের বক্তৃতা বোঝাচ্ছে। তক্তাপোশটা হয়েছে স্টেজ। তার ওপরে দাঁড়িয়ে তারাপদ, তার সামনে স্থির হয়ে বসে তার একটিমাত্র শ্রোতা—আমি। বললে, মেঘনাদ ত পুজোয় বসেছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। এক মনে পুজো করছে মেঘনাদ। এমন সময়ে বিভীষণের সঙ্গে সেইখানে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মণ। দেখতে পেয়ে চোখ রাঙ্গা করে মেঘনাদ কী বললে জানো, খোকা সাহেব? বললে, 'কাকোদর পশে যদি গরুড়ের নীড়ে, ফিরে কি যায় আপন বিবরে পামর।' এই না বলেই কোষাকুষি তুলে ছুঁড়ে মারলেন লক্ষ্মণকে, লক্ষ্মণ অমনি অজ্ঞান। তারাপদর আবৃত্তি আর মঞ্চ নির্দেশ ছিল একই সুরে, একই ভঙ্গিতে। কেমন করে মেঘনাদ কোষা ছুঁড়ে মারল, সে ভঙ্গিও দেখাতে ভুলতো না সে! আমি কিন্তু মনে মনে তখন ভয়ানক অবাক হয়ে গেছি। স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে তখন পড়ি, ঘটনাক্রমে মেঘনাদ বধ-এর ঐ অংশটুকু পড়া ছিল আমার। ভাবলুম, মাইকেলের রচনা তারাপদ এমন করে আবৃত্তি করতে পারল কেমন করে! সে ত বই পড়েনি, কার রচনা তার জানবার কথাও নয়। বললে, যাত্রা শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছি। আজ এই কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, তখনকার কোনো যাত্রায় কি তাহলে মাইকেলের মেঘনাদ বধ অভিনীত হয়েছিল? নইলে তারাপদই বা মুখস্থ করেছিল কীভাবে?

তারাপদর কাছ থেকে এরকম বহু যাত্রার বইয়ের আবৃত্তি শুনতুম। সে যখন আবৃত্তি করত, মনে হত, তার সর্বাঙ্গ যেন কথা কয়ে উঠছে! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবার জেগে উঠত অভিনয়-স্পৃহা। রয়্যাল ক্লাবের সভ্যবন্ধুদের সঙ্গে ২।১টি থিয়েটার দেখেছি ততদিনে। কিন্তু সেটুকুতেই কি সাধ মেটে? জিতেনের মারফত তখন থিয়েটারের বই পড়েছি কিছু কিছু। কিন্তু নাটক পড়িয়ে জিতেনের সুখ নেই, সে আমাকে দিয়ে নাটক লেখাবেই। তারই প্ররোচনায় অবশেষে একদিন লিখে ফেললাম এক সামাজিক নাটক। যে-সব নাটক তখন পড়তুম তারই সব সংলাপ। এধার-ওধার থেকে নিয়ে এসে একত্র জুড়ে দিয়ে খাড়া করলুম এক নাটক। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই পাণ্ডুলিপি, কিছুই তার মনে নেই। এটুকু মনে আছে, তাতে একটা কাপড় পোড়ানোর দৃশ্য ছিল। খুব করুণ। কিন্তু কী নাম দেবো নাটকের? চোখের সামনে ভাসছিল আমাদের বাড়ির দেওয়ালে শোভমান সেই থিয়েটারের ছবি—বিধুভূষণ আর সরলা। তখনো আমি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' পড়িনি, পড়িনি তার নাট্যরূপ সরলা। ওর গল্পটা কী তা-ও জানি না। শুধু ছবির সেই সরলাকে মনে করে আমার প্রথম নাটকের নাম দিলুম সরলা। এর সঙ্গে আসল সরলার কাহিনীর কিন্তু কোনো মিল ছিল না। তবে তখন (১৯০৮ সালে) ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কল্যাণী' অভিনীত হয়েছে। এক টাকা দিয়ে তার এক কপি আনিয়েছিলাম জিতেনকে দিয়ে। তার প্রভাব পড়েছিল প্রচুর।

জিতেন কিন্তু শুনে পিঠ চাপড়ে দিলে, বললে সাবাস। এবার একখানা ঐতিহাসিক নাটক

লেখ। মনে তখন প্রচুর উৎসাহ। ১৯০৭-৮ সালের কথা বলছি। তখন দেশাত্মবোধক নাটক ২।৩ খানা পড়েছি। দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতনও বোধ হয় ততদিনে বেরিয়েছিল। ঠিক মনে করতে পারছি না। আমি রাজস্থানের একটা কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক নাটকই লিখতে শুরু করলাম, নাম দিলাম অমর সিংহ। এ-ও এ নাটকের সংলাপ, সে নাটকের সংলাপ নিয়ে জুড়ে-জুড়ে দেওয়া। এর মধ্যে তারাপদর কাছ থেকে শোনা 'বক্তৃতার' মালার অংশও যে না ঢুকে গিয়েছিল, এমন নয়। তবে এবার বেশ ভালো করে ধরে ধরে একখানা বাঁধানো খাতায় বেশ পরিষ্কার করে লিখেছিলাম বলে মনে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার পড়ার ডেস্কের ওপর জ্বলছে কেরোসিনের আলো, আমি পড়ার বইগুলি সামনে খুলে রেখেছি বটে, কিন্তু পড়ছি না, সন্তর্পণে বসে লিখছি আমার নাটক 'অমর সিংহ'। বেশ ধরে ধরে পরিষ্কার করে আমার সেই বাঁধানো খাতাখানায়। হঠাৎ জুতোর মসমস শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম—বাবা। বোধ হয় কোনো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরুচ্ছিলেন। বাবা আমাকে কখনো প্রহার করেননি বা সেরকম বকুনিও খাইনি কখনো বাবার কাছে। অথচ ভিতরে ভিতরে ভয়ানক ভয় করতাম বাবাকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে লাফ দিয়ে উপস্থিত হলাম দরজার কাছে। বাবা আমাকে ওভাবে আসতে লক্ষ্য করে বোধ হয় একটু চমকেই উঠলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'কী করছিলে?' কোনক্রমে বললাম, 'পড়ছিলাম।'

বাবার কোনো সন্দেহ হত না। কিন্তু আমার ওভাবে চমকে উঠে লাফিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটাই হল কাল। আমার ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল বাবার। তিনি ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন আমার ডেস্কের কাছে।

তাড়াতাড়িতে খাতাখানাও ভাল করে লুকিয়ে রেখে যেতে পারিনি।

একবারে প্রথম দৃষ্টিই বাবার পড়ল সেই খাতাখানার ওপরে।

হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন সেখানা। পৃষ্ঠাগুলি উল্‌টে-পালটে ভালো করে দেখলেন।

তারপরে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়াশুনা ছেড়ে এইসবই হচ্ছে?'

বলতে বলতে খাতাখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে ছুঁড়ে দিলেন মেঝের ওপরে। টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আমার 'অমর সিংহ'। শুধুই কি তাই?

যা কখনো হয়নি, যা কখনো করেননি বাবা, তাই ঘটে গেল। আমার গালে ঠাস করে মারলেন একটা চড়।

তারপরেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন গটগট করে!

জীবনে বাবার হাতে প্রহার সেই প্রথম। তিনি চলে গেলেন, ঘরেও আর কেউ নেই, আমি চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে রইলাম। তীব্র অভিমান, ব্যথা, অপমানবোধও কিছুটা, সব মিলিয়ে

ভিতরটা যেন গুমরে গুমরে উঠতে লাগল খানিকক্ষণ! নীরবেই বসে বসে মুছতে লাগলুম চোখের জল, কাউকে কিছু জানতে দিলুম না।

কিন্তু অত নিষেধেও কি উদ্দীপনার সেই বহ্নিশিখা নিভে যায়? সে যে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল! পিছিয়ে গিয়ে ১৯১০ সালের কথাতে এসেছিলাম। সেই সালেরই কথা বলে চলেছি। রয়্যাল ক্লাবে যেতুম, ক্লাবের বন্ধুদের ছিল প্রচণ্ড থিয়েটার দেখার শখ। স্কুলের পর সেখানে গেলেই একটু খেলাধূলার পর সকলে গোল হয়ে বসে সেই থিয়েটারের গল্প। এঁরা বেশীর ভাগ যেতেন মিনার্ভায়— দানীবাবুর এঁরা পরম ভক্ত ছিলেন। সেই সব গল্প শুনতুম। দানীবাবু এখানটায় এরকম করে 'পোজ' দিয়েছেন, ওখানে এমনি করে 'অ্যাক্টিং' করলেন। শুনে শুনে দেখার শখ আমারও তীব্রতর হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। নাটক লেখা গেল, এবার দেখা।

কিন্তু কত আর দেখতে পেরেছি? ওদের মত অত নয়। সব মিলিয়ে দু'তিনখানা হবে। যেমন, 'মেবার পতন', 'রাণাপ্রতাপ', 'সাজাহান।' প্রতি বড়ো নাটকের পর গীতিনাট্য অথবা প্রহসন হত থিয়েটারে, সে-সব আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হত না। কারণ, আমি ত বাড়িতে না জানিয়ে লুকিয়ে গেছি—রাত শেষ করে ভোর বেলায় ফিরলে কৈফিয়ত দেব কি বাড়িতে? বলা বাহুল্য, তখন থিয়েটার ভাঙত ভোরবেলায়। মূল নাটক শেষ হয়ে ড্রপও পড়ল, আমিও সীট ছেড়ে উঠলুম—একা। তখনকার দিনে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়িতে লোকে থিয়েটার দেখতে যেত, অত বাস্-ট্রামের প্রাচুর্য তখনও হয় নি। ভোর রাত্রে থিয়েটার শেষে বন্ধুরা ঐরকম করে ফিরে আসত শেয়ারের গাড়ি ধরে— শেয়ারে আট-দশ আনা পড়ত। কিন্তু, ফেরার সময় ঐ অত রাত্রে আমি শেয়ারের গাড়ি পাবো কেমন করে? আমার মত মধ্যিখান থেকে উঠে আসছে কে? দু'একখানা দৈবাৎ পাওয়া যেত, কিন্তু বাড়তি পয়সাই বা পকেটে কই? তাই স্রেফ পায়ে হেঁটে আসতে লাগলুম সেই বিডন স্ট্রীট থেকে ভবানীপুর, চীৎপুরের পথ ধরে, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর নতুন রাস্তা তখনও হয়নি।

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি যখন ফিরলুম, তখন রাত দেড়টার কম নয়। তারাপদ দরজা খুলে দিত। মা জিজ্ঞাসা করত, এত দেরি যে?

শরীরের ক্লান্তি গোপন করে কোনক্রমে উত্তর দিতুম, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, খাওয়ার পর গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল।

মিথ্যা আরও মিথ্যা টেনে আনে। 'বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে এসেছি' বলেছি, অতএব, রীতিমত ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা-দেওয়া খাদ্য-শোভিত থালাটার দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলতে হত, খাবো না।

অবশ্য, বেশী দেখতাম না বলেই এ-ধরনের মিথ্যাভাষণে পার পেয়ে গিয়েছিলাম। মাত্র তিনবার। ঘন ঘন হলে এসব কৈফিয়তে কুলতো না!

কিন্তু থিয়েটার দেখাও ত কিছু হল, এবার থিয়েটার না করলে ত চলছে না! মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা, কিছু করা চাই!

বন্ধুরা এসে বলত, আয় না, আমরাও লুকিয়ে একটা থিয়েটারের ক্লাব করি।

স্কুলের ক্লাসের কাউকে কাউকে চুপি চুপি করলাম সে প্রস্তাব। তারা যেন সভয়ে শিউরে উঠল বললে, কাদের সঙ্গে ?

প্রস্তাবকদের নাম বললাম।

শুনে, তারা বলল : সর্বনাশ! ওরা সব খারাপ ছেলে। মিশিস নি ওদের সঙ্গে!

মনটা একটু বোধহয় থমকেও গিয়েছিল। কিন্তু কতক্ষণের জন্য ? মনে হল, ওরা স্কুল-পালানো, স্কুলে-নাম-কাটানো ছেলে হতে পারে, কিন্তু কোথায় ওরা খারাপ ? নাটকের অদৃশ্য চুম্বকশক্তি আমাকে তখন টেনে ধরেছে, আমার মন দ্রুত ধাবিত হতে লাগল সেই দিকে।

অথচ ক্লাব যে করব ঘর পাবো কোথায় ? যেখানেই আমরা যাই, ঘর নিয়ে গান-বাজনা করব শুনে সবাই একযোগে না-না করে ওঠে! শেষ পর্যন্ত অনেক গলদঘর্ম হয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, একটা বস্তিতে আস্তানা পাওয়া গেল। আমাদের অঞ্চলেরই কাছে তখন বিখ্যাত জলটুঙির বস্তি ছিল, তারই একদিকে একটা খোলার ঘর। সেই খোলার ঘরে মহা উৎসাহে নাটকের মহড়া। কোথায় অভিনয় হবে বা আদৌ অভিনয় হবে কি না, এসব চিন্তা করার দরকার নেই, অভিনয় হবে, এ দুরাশাও জন্মায়নি, শুধু নাটকের পার্ট বণ্টন করে নিয়ে নিজেরা নিজেরাই যার-যার অংশ মুখস্থ করে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে তার আবৃত্তি! সে-সব কী উদ্দীপনার দিনই না গেছে!

কিন্তু, আমাদের সেই উদাত্ত কণ্ঠ, সেই বীররস আর মধুর রস, সব একদিন হঠাৎই চাপা পড়ে গেল। মনের উৎসাহে আবৃত্তি করছি, এমন সময় দুর্দান্ত চেহারার এক মুসলমান গুণ্ডা এসে দরজার কাছে হাজির। বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করলে, ক্যা হো রহা, কৈ হ্যায় ইধর ?

আমরা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। প্রতাপ সিংহের অন্তর্জ্বালা, কিংবা সাজাহানের খেদ, কী যে ঠিক সেই সময় হচ্ছিল আজ মনে নেই, সব কে যেন মুহূর্তে টুঁটি টিপে রুদ্ধ করে দিল। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। পেল্লায় চেহারা, ইয়া কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ, হাতে পাকা লাঠি। তাকিয়েই আমাদের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললাম, হিঁয়া হোতা হ্যায় গানবাজনা।

—গান বাজনা ? সে যেন খিঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'হিঁয়া গানা বাজনা নেহী হোগা। ইয়ে হ্যায় ভদ্দরপল্লী, সম্‌ঝে ? হঠাও হিঁয়াসে। আবভি হঠাও। তুরন্ত্‌!'

উপায় নেই। বিনা মেঘে এ বজ্রপাতকে মেনে নিতেই হবে। পরে শুনেছি ও-নাকি ও-অঞ্চলের কুখ্যাত গুণ্ডা। কুখ্যাত কি সুখ্যাত সেই মুহূর্তে তা জানতে পারি নি, তবে চেহারাতেই বুঝেছিলুম, ট্যাঁ-কোঁ করলে কোমরের লুকানো ছোরাখানাই হয়ত বুকে বসিয়ে দেবে! কিন্তু, হারমনিয়ম-তবলা নিয়ে উঠে যেতে-যেতেও একটা কথা মনে না জেগে পারে নি, গুণ্ডাজী বস্তিটাকে হঠাৎ 'ভদ্দরপল্লী' ঘোষণা করলে কেন ? জলটুঙির বস্তি সে সময় এত কুখ্যাত ছিল যে, কোনো ভদ্রলোক ওর ভিতর ত

দূরের কথা, ওর ধার দিয়েও হাঁটত না! তাহলে 'গান-বাজনা' এতদূর নিচের জিনিস যে, জলটুঙির বস্তির মত বস্তির নিজস্ব 'ভদ্রতা'কেও আবিল করে তোলে!

খেদ করে আর কী হবে, চলে আসতে হল। অথচ খোঁজাখুঁজি করে স্থান পাই না! আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন রয়্যাল ক্লাবের সভ্য, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় নাম, কাঁসারীপাড়া রোডে তাঁর বাড়ি, হরিশ মুখুজ্যে রোড থেকে জগুবাবুর বাজারের মোড় পর্যন্ত এখন যে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, সেটা তখন কাঁসারীপাড়া ছিল, ওটা ঘুরে ঘুরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে ওপার পর্যন্ত। হরিশ মুখুজ্যে রোড অতিক্রম করামাত্রই বাঁ দিকে পড়ত তাঁর বাড়ি। অদ্ভুত গুণ ছিল তাঁর, একবার গান শোনামাত্রই তা তুলে নিতে পারতেন। থিয়েটারে গেছেন আর শুনে শুনে অমনি গানও তুলে এনেছেন। সব নাটকের গান হয়ত একদিনেই সব তুলতে পারতেন না, দু'তিন দিন থিয়েটারটা দেখে আসতে হত। তখনকার গীতিনাট্যে বিশ-বাইশটা পর্যন্ত গান থাকত, সেই সব গান দু'তিন দিনের মধ্যে হলেও সম্পূর্ণ শুনে শুনে তুলে নিয়ে আসা, সে কী সোজা কথা? মজা এই, স্বরলিপি তিনি জানতেন না। শ্রুতিধর। শুনে-শুনে তোলার ক্ষমতা। একটুও ভুল হত না কোথাও। থিয়েটারের বই খোলার দু'একদিনের মধ্যেই ছাপা বই বেরিয়ে যেত। সে-সব বই আনাতেন কিনে। তারপর দেখে আসতেন থিয়েটার। তাঁর বাড়িতে বসে গানগুলি বাজিয়ে-বাজিয়ে শোনাতেন। যারা থিয়েটার দেখে এসেছে তারা অবাক হয়ে দেখছে ওঁর মুখের দিকে। একেবারে অবিকল সেই সুর, কোথাও একটুও বেখাপ্পা ঠেকছে না। কিন্তু সুর শুনে-শুনেই কি মন ভরে? সঙ্গে সংলাপ কই? অথচ ওঁর বাড়ির বৈঠকখানায় দু'এক সময় বসে গান শোনা চলে, রীতিমত ক্লাব করা ত আর চলে না!

আরেকজন উৎসাহী সভ্যের নাম মনে পড়ে। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর বাড়ি তেলিপাড়ার দিকে। কিন্তু কোথায় জমায়েত হওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত—মাঠে। কোন্ মাঠে? হরিশ মুখুজ্যে রোড আর কাঁসারীপাড়ার ক্রসিং ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পানের দোকান ছিল একটি, তারপরে আস্তাবল, তারপরে মাঠ। সেই মাঠেই বসা হত। ফুটবল খেলার পর আমরা একসঙ্গে চলে আসতুম। সেই সময় আমাদের আরেক সঙ্গী জুটেছিল, তার নাম ভূতনাথ সিং—হিন্দুস্থানীই হবে—তবে বহুকাল এদেশে থেকে বাঙালীই হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। তাদের ছিল মস্ত খাবারের দোকান, এবং ঘোড়া ও ঘোড়া-গাড়ির ব্যবসাও ছিল তাদের। ভূতনাথেরও লেখাপড়া হয়নি, ও-ও স্কুলের নাম-কাটানে ছেলে, নাটকে খুব ঝোঁক হল। খাবারের দোকানের দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না। ওর বাবার মত ওর ঝোঁক ছিল বরং ঘোড়া ও ঘোড়ার ব্যবসার দিকে। পরবর্তী কালে ওর বাবা মারা যাবার পর ঘোড়ার ব্যবসাটা নিজে দেখত আর ফলাও করেছিল, নিজে ভালো ঘোড়সওয়ারও ছিল সে। এই যে ভূতনাথ সিং, এ যোগাতো আমাদের ঠাণ্ডা জল। আমরা গল্প করছি, প্রফুল্লবাবু গান গাইছেন খালি গলায় অবশ্য, আর মাঝে মাঝে ভূতনাথ তাদের খাবারের দোকান থেকে নিয়ে আসছে গেলাস আর ঘটি করে ঠাণ্ডা জল।

শুনতে শুনতে তারও থিয়েটারের নেশা জমে উঠল। সে হঠাৎ একদিন বললে, তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় রিহার্স্যাল হতে পারে। তবে, সব দিন নয়। শনিবার আর রবিবার।

—তাই সই। কিন্তু, এতদিন বলিসনি কেন?

ভূতনাথ সলজ্জ হাসল একটু মুখ নীচু করে।

আমরা আবার উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। এ একেবারে পাকা বাড়ি—বড়ো বৈঠকখানা, বস্তির খোলার সেই সব স্যাঁতসেতে ঘর নয়। তাছাড়া, তবলা-হারমনিয়ম-মাদুর নিয়ে বসতে-না-বসতেই যে উঠিয়ে দেবে, এমন মনে হচ্ছে না।

তা-ই হল। দেখলাম, ভূতনাথের বাবা লোক ভাল। অন্ধ স্নেহ তাঁর ছেলের প্রতি। আমরা ছেলের বন্ধু, আমাদের ওপরও তাঁর স্নেহ জন্মাল। ক্রমশ এমন হল, আমাদের জন্য বৈঠকখানা প্রায় ছেড়েই দিলেন বলা চলে। আমাদেরও তখন মহড়ায় এত নেশা যে, খেলাধুলা নিয়মিত আর হয়ে উঠত না, শুধু এই ছিল যে, স্কুলের নামটা আর কাটায় নি। ওটা বজায় রেখে চলেছি।

মহড়ায় আমাদের প্রম্প্‌টিং বিশেষ দরকার হত না, খুব মুখস্থ করতাম, করতে পারতামও। অভিনয় মঞ্চস্থ করার আশা ত ছিল না, ঐ মহড়া দিয়েই আমাদের আনন্দ। আমরাই অভিনেতা, আমরাই দর্শক। অ্যাক্টিংয়ের কোন্ জায়গাটায় কেমন হবে সে যারা সেই থিয়েটারের পালাটা দেখে এসেছে, তারা বলে দিত, অবশ্য যতটুকু তাদের পক্ষে মনে থাকা সম্ভব। বাকিটা আমাদের কল্পনা। রবিবার হত আমাদের ফুল রিহার্স্যাল। অর্থাৎ, হুইসিল বাজিয়ে প্রথম ড্রপ তোলা থেকে শেষ 'যবনিকা পতন' পর্যন্ত। ড্রপ ত প্রকৃতপক্ষে ছিল না, হুইসিলের শব্দটাই ছিল ড্রপের নির্দেশ। আর, সখীদের গানগুলি গেয়ে দিতেন প্রফুল্লবাবু। শুধু সখী কেন, অন্য সবার গানও। তার জন্য তাঁকে বলতে হত না। হারমনিয়াম নিয়ে তিনি একেবারে রেডী। অ্যাক্টিং-এর পরই হয়ত গান আছে, গানের পর সংলাপ, তারপরে আবার গান। দেখতে হত না, সংলাপও থেমেছে, ওঁরও গান শুরু হয়ে গেছে।

এই মহড়ার নেশা এত পেয়ে বসলো যে, স্কুলেও নিয়মিত যাওয়া হত না। বহুদিন টিফিনেরও ঘণ্টা পড়েছে, আমিও চলে এসেছি। ১৯১০ সালের কথা ত? গোপনে থিয়েটার দেখাও বেড়ে গেছে। 'তপোবল', 'শঙ্করাচার্য'ও দেখেছি। ইতিমধ্যে স্কুলে হল কী, আমি তখন সেকেণ্ড্ ক্লাসে পড়ি। আমাদের কলেজ বিভাগে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে এসে ভর্তি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র। যিনি উত্তরকালে "রিফরমড থিয়েটার" করেছিলেন "থিয়েটার রয়েল"-এ। সেটা এখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের নীচেকার 'প্রিন্সেস' নামের বিখ্যাত সরাইখানা। ধীরেন্দ্র মিত্রের ছিল প্রবল থিয়েটারের শখ। তিনি আমাদের সেই অধ্যাপক সুধীর চ্যাটার্জীকে সুপারিশ ধরে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করলেন থিয়েটার করার। স্কুলে-কলেজে একটা হৈ-হৈ পড়ে গেছে যেন। আমার মনটাও যেন মুহূর্তে তরঙ্গিত হয়ে উঠল। একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বেড়াই, কী থিয়েটার হবে?

সদুত্তর পাই না। অবশেষে, গিয়ে ধরলুম একেবারে সুধীরবাবুকে। গম্ভীর গলায় তিনি উত্তর দিলেন,—রঘুবীর।

—কবে হবে?

—পুজোর আগেই।

—স্কুলের ছেলেরাও করবে ত?

—হ্যাঁ, স্কুল, কলেজ আর এক্স-স্টুডেণ্ট সব মিলিয়ে।

প্রবল উৎসাহে মনটা যেন নেচে উঠল। কার কাছ থেকে বইটা সংগ্রহ করে যেন পড়তেও শুরু করেছি। মনের মতো পার্ট বেছে নিয়ে মুখস্থও বুঝি শুরু করেছি। এবং বলা বাহুল্য, তিন-চারটে পার্টই পছন্দ হয়ে গেছে, মন বলছে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ধরি? সব কটাই মুখস্থ করা যাক্‌। এবার আমায় পায় কে? এবার সত্যি সত্যি গায়ে উঠছে সেই ঝলমলে পোশাক, মুখে লাগছে রঙ!

কিন্তু, হা হতোস্মি! শেষ পর্যন্ত সমস্ত রঙীন আশা ফুৎকারে গেল বিলীন হয়ে! শুনলাম স্কুলের ছেলেদের না নিলে নয়, এমন তাচ্ছিল্যভাবে খুব ছোট ছোট পার্ট দিয়েছে, কোনোটার মুখে দুটো একটা মাত্র কথা আছে, কোনোটার মুখে তা-ও নেই। আর, আমাদের ভাগ্যে সেটুকুও জোটে নি। আমরা বাদই পড়লাম।

এক্স-স্টুডেণ্ট হিসাবে তিনকড়ি চক্রবর্তী মশাই এসেছেন প্লে করতে, এক্স-স্টুডেণ্ট হিসাবে এসেছেন হরিমোহন বসু। উত্তরকালে অভিনেতা হিসাবে তিনকড়িবাবু বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, হরিমোহনবাবুও নাম করেছিলেন। এক্স-স্টুডেণ্ট হিসাবে আরও একজন এসেছিলেন, তাঁর নাম লক্ষ্মীবাবু। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ইনি সুদর্শন, সুগায়ক এবং নারীচরিত্রে অভিনয় করতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উত্তরকালে নারী-চরিত্রাভিনেতা হিসাবে এত যশ অর্জন করেছিলেন যে, মফস্বল থেকে প্রচুর ডাক আসত ওঁর। ওঁর মতো উৎসাহী অভিনেতা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় আজকাল। আর ছিল আমাদের সঙ্গে পড়ত ভুপেন আচার্য বলে একটি ছেলে, তার ছোট ভাই নন্তু—ভালো নাম, বসন্ত আচার্য। স্কুলের দুটি ছেলে, সুরেশ রায়চৌধুরী, সে করেছিল 'সখার মা'র পার্ট, আর ওই বসন্ত, ও করেছিল 'পরীবাবু'র পার্ট—এই দুটিই ছিল স্কুলের ছেলে, যারা বড়ো পার্ট করেছিল। রিহার্স্যাল আমরা দেখতে যেতুম, কিন্তু হৈ-হল্লা করতুম। মাস্টাররা বিরক্ত হতেন, মুখ ফিরিয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে প্রশ্ন করতেন, কী হচ্ছে কী!

আমরা নিশ্চুপ। কয়েকটি নিপাট ভালোমানুষ যেন চুপচাপ বসে আছি পিছনের সারিতে।

কখন যেন রিহার্স্যালের সময় এক দূতের প্রয়োজন হল। কে করবে দূত? খাতায় লিস্ট দেখে আমার পার্শ্ববর্তী এক বন্ধুর নাম উচ্চারিত হল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। কে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে,—ঐ যে ওখানে বসে আছে।

মাস্টার ডাকছেন। বন্ধুবর বলে উঠলেন, 'পার্ট করবো না স্তর।'

—কেন ?

'কেন'র উত্তর তীব্র অভিমানবশতই সে দিল না। চুপ করে রইল। শিক্ষক মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে অবশেষে সে দিল সংক্ষিপ্ত, অথচ সুদৃঢ় উত্তর, 'বাড়িতে বারণ আছে।'

মোক্ষম উত্তর।

কিছুক্ষণ পরে আবার এলো এক তুচ্ছ সৈনিকের ভূমিকা। আবার রব উঠল, সৈনিক—সৈনিক!

ওদের কে বলে উঠলো আমার নাম। বলে উঠল, ও বাইরে রিহার্স্যাল দেয় স্যর, ও পারবে।

কিন্তু আমার তখন অভিমানে ঘা লেগেছে। দ্বিতীয়ত, 'বাইরে রিহার্স্যাল দেয়' এটা সুসংবাদ নয়—অভিভাবকদের কাছেও নয়, শিক্ষকদের কাছেও নয়। মনের মধ্যে হঠাৎ একটা মরিয়া ভাব এসে গেল, বললুম—'করব না'।

—তোমারও বাড়িতে বারণ আছে নাকি ?

—বারণ না থাকলেও করব না।

—কেন ?

—ওসব নির্বাক সৈনিকের পার্ট-টার্ট আমরা করব না। বলে সদলবলে গট্ গট্ করে সেদিন বেরিয়ে এলুম হল থেকে।

গেলাম আমরা ওখানে পরদিন।

—তোমরা কী জন্যে ? তোমরা ত করবে না।

আমরা রিহার্স্যাল দেখব।

শিক্ষকমশাইরা আর কিছু বললেন না। আমাদের মত আরও অনেকে বসে মহড়া দেখছে। তাদের মধ্যে বসে আমরা মাঝে মাঝে চিৎকার করে বা হল্লা করে উঠতাম।

ব্যাঘাত পড়ত মহড়ায়। রব উঠত—কে—কে ?

আমরা ভালোমানুষের মত মুখ করে চুপচাপ রইলাম।

কিন্তু ধরা পড়তে হল। কজন ছাত্রের মধ্য থেকে গোলমালকারীকে ধরা আদৌ কঠিন ছিল না। একজন শিক্ষক বললেন, 'ওরকম হল্লা করলে হল থেকে বার করে দেবো।'

তার মানে! আমরা কি স্কুলের ছাত্র নই ? বেশ করব, আমরা হল-এ থাকব।

এমনি গোলমাল দিনের পর দিন। বেড়েই চলল মনোমালিন্য। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, আমার বন্ধুরা যে-যার দিব্যি সব সরে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষক মশাইদের বিষদৃষ্টিতে পড়ে গেলাম—আমি একা!

একদিন একজন শিক্ষক আমাকে একেবারে ধরে নিয়ে গেলেন হেড মাস্টার পূর্ণচন্দ্র হালদার মশায়ের কাছে। নালিশ করলেন আমার নামে।

পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইরে ক্লাবে নাকি তুই রিহার্স্যাল দিস ? তাছাড়া স্কুলে রিহার্স্যালের সময় গোলমাল করিস ?'

এক রোখা হয়ে সেই যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম একটি কথাও আর বললাম না। বললাম না যে, একা আমিই গোলমাল করি নি। বললাম না যে, যে থিয়েটারকে আমি এত ভালবাসি, সেই থিয়েটারে আমাকে পার্টই দেওয়া হয় নি। যে থিয়েটার নিয়ে বাড়িতেও আমার গঞ্জনার অন্ত নেই, যে থিয়েটারের নেশায় বই-এর পর বই ধরে—লম্বা লম্বা সব পার্ট আমার জলের মতো মুখস্থ—সেই আমাকে দেওয়া হয়েছে নির্বাক সৈনিকের পার্ট—কেন হবে না আমার অভিমান? কিন্তু কিছুই বললাম না। ওঁর বারংবার প্রশ্ন সত্ত্বেও না।

বেত হাতে এগিয়ে এলেন পূর্ণবাবু। বললেন, হাত পাত।

প্রসারিত করলাম হাত। বেত পড়তে লাগল। সপাং সপাং—এক দুই তিন···

যন্ত্রণাকাতর হাতখানি শুধু নয়, যন্ত্রণাকাতর মন নিয়েই সেদিন ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এ মনঃক্ষোভের কথা বলার মত ছিল না সেদিন, সে শুধু নিজের মধ্যেই নিজে গুমরে মরা! মনে হচ্ছিল, অপরাধটা কিসের করলুম? কেন কেউ আমাকে সঠিক বুঝতে পারছে না? আমার মন যে কি চায়, সেটা পৃথিবীর কেউ বুঝবে না কেন? বোঝাতে পারি না, কিন্তু বুঝে নেবারও কি কেউ নেই?

ভূতনাথের বাড়ির মহড়ায় আরও জোর যেন আমাদের বেড়ে গেল। এলো ১৯১১ সাল। উঠলুম ফার্স্ট ক্লাসে। "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় দেখে এলুম একদিন, এই সালেই। তারপরে মোহন-বাগানের শীল্ড নেওয়া। ইলিয়ট শীল্ড-এ খেলতে গিয়ে আমার অ্যাকৃসিডেন্ট। বাড়িতে বেশ কিছুদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকা। তারপরে আবার পুজোর আগে স্কুলে থিয়েটারের উদ্যোগ। শুনলাম, এবার বই হবে স্থির হয়েছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঞ্জাবতী'। গতবার গোলমাল করে হেডমাস্টারের বেত খেয়েছিলুম বলে এবার আমাদের নাট্য সম্পাদক ধীরেনবাবু যাঁর কথা একটু আগেই বলেছি, তিনি আমায় ডেকে বললেন প্লে করতে।

শুনে মনে হল, উনি আমাকে করুণাই করছেন। আমি গোঁ ধরে রইলাম। থিয়েটারও করব না, গোলমালও করা চাই। দেখি, আমার কথা প্রিন্সিপাল সাহেবের কান পর্যন্তও গেছে।

সব মিলিয়ে যা দাঁড়ালো, তাতে আমাকে যেন ভিতরে ভিতরে ক্ষেপিয়েই দিলে। ওঁরাই যেন আমাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিক্ততা বাড়িয়ে দিলেন, নইলে প্রথমটায় আমি ঠাণ্ডা হয়েই ছিলাম। কয়েকবার জরিমানা পর্যন্ত করেলন তুচ্ছ অপরাধ ধরে, কয়েকবার শাস্তিও দিলেন। আমিও ছিলুম একবগ্‌গা গোছের।

'রঞ্জাবতী'তে এবার সেই-সব Ex-studentরাই এসেছেন, আমার বন্ধুরা সব গেছে, গেল আমার সহপাঠী প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ি ছিল তেলিনীপাড়ায়। যেতে পারলাম না শুধু আমি। আমার মন কেমন যেন সায় দিল না কিছুতেই। এ-নিয়ে রীতিমত স্নায়ুযুদ্ধ চলেছিল কয়েকদিন। রীতিমত বিরোধ। কয়েকবার কথা-কাটাকাটি, বাদানুবাদ। আমার মন সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে গেছে।

মনে হচ্ছিল, এরা কেউ আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন না। হয়ত করুণা করে এবার এক কাটা সৈনিকের পার্ট বড়োজোর দেবে, এর বেশী এদের কাছে আশা পর্যন্ত করতে মন চাইল না।

শেষে অশান্তি এতদুর পর্যন্ত গড়ালো যে, আমি স্থির করলুম, স্কুল ছেড়ে দেব। অথচ, সামনে ডিসেম্বর, তারপরেই বছর পেরিয়ে ১৯১২-র মার্চ মাসে পরীক্ষা। বাড়িতে কত আমাকে বোঝানো হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, আমার যে-কথা সেই কাজ। বললাম, ও স্কুলে আর পড়ব না। ট্রান্সফার নেব।

বাবা একদিক দিয়ে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়।

তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেকে কলকাতায় না রেখে বাইরে পাঠানোই ভালো। তাহলে যদি মানুষ হয়! এখানে ত বদ্‌সঙ্গে পড়ে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।

মধুপুরে স্যার আশুতোষ তখন একটা স্কুল করেছেন George V Coronation School—ঠিক হল সেইখানে আমাকে পাঠানো হবে পড়তে। অবশ্য জামতাড়া স্কুলও তখন নামকরা স্কুল ছিল।

কিন্তু ওখানে আমাকে পাঠিয়ে কোন লাভই হবে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অত দেরিতে দুটোর একটা স্কুলেও অ্যাডমিশন পাওয়া যাবে না। অতএব যাওয়া হল না বাইরে কোথাও। এদিকে ফল হল এই, আগামী মার্চ-এ পরীক্ষা দেব, সে আর বুঝি হল না। আগামী ডিসেম্বরে টেস্ট। কিন্তু কোনো স্কুলে না পড়ে টেস্ট দেওয়া যায় কি করে? প্রাইভেট? অত মনোনিবেশ করার মত মন তখন ছিল না। অভিভাবকরা চিন্তিত হলেন, আমার তত চিন্তা ছিল না। আমি যথারীতি পুজোর মুখে—স্কুল বন্ধ হবার আগের দিন—সেদিন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে থিয়েটার 'রঞ্জাবতী', সে সবের আয়োজন দেখতে গেলাম দুপুরের দিকে। স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ শান্ত হয়ে সব দেখছি। এমন সময় উদ্যোক্তাদের কে একজন যেন আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। আমার ওপর ত রাগ ছিল, তাই তীব্র স্বরে বলে উঠলেন—তুমি এখানে কেন?

—স্টেজ দেখছি।

—তুমি আর এ' স্কুলের ছাত্র নও।

শুনে আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল। হল-এর একদিকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, রীতিমত গালাগালি দিয়ে উঠলাম। ওঁরা আরও রেগে সোজা গেলেন হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করতে।

এক সময় তাকিয়ে দেখি; সত্যিই হেডমাস্টার পূর্ণবাবু আসছেন এগিয়ে হনহন করে। আমি করলাম কী, সামনের গেটের দিকে ছুটলাম। কিন্তু আমি পৌঁছবার আগেই ওরা গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় না দেখে রেলিং টপকে পালালুম, ওঁরা আর ধরতে পারলেন না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও প্রতিজ্ঞা করলাম, একখানা কার্ড যোগাড় করে যেমন করে হোক আজ-সন্ধ্যায় ওদের 'রঞ্জাবতী'-র দর্শকরূপে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবেই।

আমাদের বন্ধুদের একজন—প্রবোধ বন্দোপাধ্যায়—সেদিন প্লে করছিল—একথা আগেই বলেছি। তার বাড়িতে গেলাম ছুটে। বললাম—এই, একটা কার্ড যোগাড় করে দিতে পারিস আমাকে!

সে একটু আশ্চর্য হয়ে বললে—'তোকে দেয় নি!'

—না।

সে বললে, অন্যায়। এক্স্-স্টুডেন্ট হিসাবেও ত তোকে ওদের দেওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, দাঁড়া, আমার কার্ডখানাই তোকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখি, কে ঠেকায়।

বললাম,—বলা যায় না, এতেও ঠেকাতে পারে। আমি ত ওদের বিষ নজরে পড়ে আছি।

যথারীতি সেই কার্ড নিয়ে সন্ধ্যাবেলা গেলাম থিয়েটার দেখতে। গেট-এ আমাদেরই এক শিক্ষক মশাই দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁকে গিয়ে কার্ড দেখালাম। বললাম—কী মশায়, যেতে দেবেন?

তিনিও শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন—কার্ড যখন এনেছ, ঢুকতে পাবে বই-কি!

এভাবে হল-এ ঢুকলাম, কিন্তু আমরা বন্ধু কজন যুক্তি করে ঠিক করলাম, নীচে বসব না। বিরাট উঁচু হল আমাদের লণ্ডন মিশনারি স্কুলের। সেই হলের পিছন দিকে দোতলায় ছিল আমাদের ল্যাবরেটরী।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে—বাঁদিকে ফিরে ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে হলে—ওপরে কোণাকুণিভাবে একটা ছোট্ট বারান্দা ছিল কাঠের, যা দিয়ে ল্যাবরেটরীতে যাওয়া যেতো। ঠিক করলাম, ঐ দোতলার মত বারান্দার ছোট্ট জায়গাটিতে বসে আমরা থিয়েটার দেখব। যা ভাবা, সেই কাজ। ওখানে একটা বেঞ্চি টেনে এনে আমরা কজন পেতে বসলাম। কিন্তু আমাদের ব্যাপার লক্ষ্য করলেন কয়েকজন শিক্ষক, তাঁরা ভাবলেন, আমাদের ওখানে বসার পিছনে বুঝি কোনো অভিসন্ধি আছে। প্রফুল্লবাবু বলে একজন শিক্ষক মশাই উঠে এলেন আমাদের কাছে। আমাকে ডেকে বললেন—দেখ, তুমি আজ গেস্ট। কার্ড নিয়ে এসেছ। এমন কিছু করবে না অভদ্রতা বা গোলমাল যাতে তোমার দিকে কারুর চোখ পড়ে। আমি তোমার শিক্ষক মশাই—আমাকে কথা দাও।

আমি স্বভাবে একরোখা হলেও মিষ্টি কথার বশ ছিলাম। মনটাও নরম হল। বললাম—গোলমাল করার ইচ্ছা নেই, শক্তিও নেই। তবে নানারকম ব্যাপারে ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হয়েছি। দুঃখ পেয়েছি কম নয়, লাঞ্ছিতও হয়েছি। তবু আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা কোনো অনিষ্ট হবে না।

চুপচাপ বসে অভিনয় দেখেছি। প্রবোধের অভিনয় যে-দৃশ্যে শেষ হয়ে গেছে, আমরা উঠে এলাম। তারপরে ফিরে এলাম প্রবোধকে সঙ্গে নিয়ে।

সহপাঠীদের কথায় কত কথাই না আজ মনে হয়! কত তুচ্ছ কথা! কত বন্ধুত্বের স্মৃতি! কত সহপাঠীদের মুখই না মনে পড়ে! চারুচন্দ্র নায়েককে মনে পড়ে! বালেশ্বরে বাড়ি ছিল—হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত—ধর্মে ছিল খৃস্টান। খুব বন্ধু ছিল সে আমার! পরে সে ডাক্তার হয়েছিল, এখনো বোধ হয় বালেশ্বরে প্র্যাক্‌টিস করছে। দশ বছর আগেও তার খবর রাখতাম!

বরং, বলা যায়, সে-ই আমার খবর রাখত। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। সঙ্গে এনেছিল তার মেয়েকে। আর-এক বন্ধু ছিল—ইম্‌দাদ রসুল—পরে সরকারী কর্মচারী হয়েছিল—জেলায় জেলায় তাকে সফর করে বেড়াতে হত। কবে যেন শুনেছিলাম, সে আর ইহ-জগতে নেই। আরেক বন্ধু ছিল—পুলিন চ্যাটার্জি। আমাদের সুধীর চ্যাটার্জি মশায়ের ছোট ভাই। ইনি কাস্টমস-এ চাকরি করতেন, অধুনা অবসর-জীবন যাপন করছেন। আজও ইনি মাঝে মাঝে এসে পড়েন দেখা করতে। কখনো বা টেলিফোনও করেন।

সহপাঠীদের কথায় শিক্ষক মশাইদের কথাও মনে পড়ে যায়। বিশেষ করে হেডমাস্টার—পূর্ণচন্দ্র হালদার মশাইয়ের কথা। ইনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন, এত চমৎকার করে পড়াতেন যে, মন্ত্র-মুগ্ধের মত আমরা শুনতাম। ভূগোল বিষয়টিকে আমার নিজের কাছে ভীষণ ভাল লাগত। ক্লাসের দেওয়ালে প্রকাণ্ড মানচিত্রটা টানিয়ে দিয়ে, আমাদের ডেকে বলতেন, অমুক জায়গাটা কোথায় দেখাও। চট্ করে। দেরি করো না।

ওঁর এই ম্যাপ-দেখানোর কথায় আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনকড়ি চক্রবর্তী মশায় এক্স্-স্টুডেন্ট হিসাবে অভিনয় করতে এলেন বলেছি। ইনি ছিলেন আমাদের স্কুলের পুরাতন ছাত্র, এবং আমার অনেক সিনিয়র। পরবর্তীকালে যখন একসঙ্গে গল্পসল্প করতাম, পূর্ণবাবুর কথা উঠলেই তিনকড়িবাবু এই ঘটনার কথা উল্লেখ করতেন। বহুবার করেছেন। পূর্ণবাবু ত এসেছেন ক্লাসে ভূগোল পড়াতে, দেয়ালে মানচিত্রও টানানো হয়েছে ভারতবর্ষের। এখন, তিনকড়িবাবুর ভূগোলে ত আকর্ষণ বোধ হয় ছিল না, তিনি পিছনের বেঞ্চিতে বসে দিব্যি ফিসফাস গল্প করছেন যেন কার সঙ্গে। হঠাৎ কানে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'ইউ ?'

সভয়ে তাকিয়ে দেখলেন, পূর্ণবাবু তাকেই ইঙ্গিতে আদেশ করছেন এগিয়ে আসতে।

জড়িত পায়ে কোনক্রমে ত এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে তিনকড়িবাবু। বিরাট পুরুষ পূর্ণবাবু, বাঘের থাবার মতো হাতের মুঠো। পড়া না পারলে সেই হাতের গাট্টা যখন মাথায় এসে পড়বে, তখন চোখের সামনে একেবারে সর্ষের ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না।

তিনকড়িবাবু এহেন ব্যক্তির সামনা-সামনি হতেই হুঙ্কার শুনলেন—সিলোন কোথায়, দেখা !

মানচিত্রের দিকে কলের পুতুলের মতো এগিয়ে গিয়ে উঁচুতে খুঁজছি—তিনকড়িবাবু বলতেন—সামনে তাকিয়ে দেখি, টিবেট্। কোথায় সিলোন রে বাবা !

'আর কোথায় !' তিনকড়িবাবু বলতেন—'মাথায় এসে পড়ল সেই বিরাশী সিক্কা ওজনের গাট্টা, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে যেই চোখ মেলে তাকিয়েছি, ও হরি, সামনেই দেখি, সিলোনটা একেবারে জলজল করছে। তাড়াতাড়ি মানচিত্রে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—ওই যে স্যর। উদ্যত প্রহার ততক্ষণে আবার আমার মস্তিষ্কের কাছ বরাবর এসেছিল, কিন্তু এবার তা শিথিল হয়ে গেল। কানে শুনলাম—'গুড !'

কিন্তু, এবার ফিরে আসা যাক্ নিজের কথায়। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এটা পুজোর ঠিক আগের ঘটনা। পুজোর সময় কি পুজোর পরও হতে পারে—তারিখটা ঠিক মনে নেই—থিয়েটার দেখলাম। এই থিয়েটার দেখার কথা আগেই লিখেছি, কিন্তু বড় হবার পর প্রথম থিয়েটার দেখার অনুভূতির কথাটা বলার সুযোগ আসে নি। এইবার সে কথাটা বলি। তখন পুজোর সময়—সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—সারারাত্রি অভিনয় হত পাব্লিক থিয়েটারে—বিজয়ার দিন থাকত ছুটি। আমরা যখন পরবর্তীকালে থিয়েটারে ঢুকলুম, তখনো এটা প্রচলিত ছিল, দেখেছি। আবার, লক্ষীপুজোর দিনও হত সারারাত্রি থিয়েটার। এবং এই সব পুজোর দিনে থিয়েটারগুলিতে হত ভীষণ ভীড়। আমি দেখতে গিয়েছিলাম থিয়েটার মিনার্ভায়—রয়্যাল ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে। ছোটবেলায় যা দেখেছি, সে ত মার সঙ্গে, চিকের আড়ালে বসে। এবার একেবারে সামনাসামনি দেখব। বড়ও হয়েছি, থিয়েটার দেখে বুঝতে পারব খুঁটিনাটি, এ-বিশ্বাস জন্মেছে। সুতরাং উৎসাহের অবধি ছিল না। সেদিন নাকি ছিল, যতদূর মনে পড়ে, ডি এল রায়ের—'দুর্গাদাস।'

মিনার্ভার দরজাগুলির পাশে—মহাবীরতলার কাছে দেখি, রাশ রাশ হাতপাখা নিয়ে পাখাওয়ালা বসে আছে। এক পয়সায় একখানি সাধারণ পাখা। আর যে পাখাগুলির চারিদিকে লাল সালুর ফিতে দিয়ে মোড়া, সেগুলির দাম দুপয়সায় একখানা। তাকিয়ে দেখি, গ্যালারীর দরজা বন্ধ। তার সামনে প্রচণ্ড ভীড়। যে-যার গায়ের জামা বগলে নিয়ে, কাপড়ে মালকোছা মেরে যেন এক যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে। আমরা টিকিট নিয়ে গেট-এ ঢুকলাম। বেঞ্চি পাতা। কোনো বেঞ্চির পিছনে হেলান দেবার হাতল আছে, কোনো বেঞ্চির তা-ও নেই। আরেকটু দামী সিটে—বেঞ্চির ওপরে কার্পেটজাতীয় কাপড় কেটে বসিয়ে দেওয়া আছে। ফুটলাইটের সামনে ড্রেস-সার্কেল—কাঠের চেয়ার—ওপরে নারকেল ছোবড়া দিয়ে তার ওপরে অয়েল ক্লথ দিয়ে ভালো করে মুড়ে রাখা হয়েছে। হল-এ দু-একখানা বৈদ্যুতিক পাখা আছে বটে, কিন্তু তাতে আর কাজ হবে কতটুকু? প্রায় সবাই পয়সা দিয়ে হাতপাখা কিনে এনে বসেছে। নিজের সীটে বসে তন্ময় হয়ে ড্রপ-এ আঁকা বিরাট ছবিটা দেখছি। অ্যাণ্ড্রোমিডা আর পারসিউজ। অ্যাণ্ড্রোমিডা পাথরে বাঁধা আছে, সমুদ্রের ঢেউ এসে পড়ছে সেই পাথরে, তাঁকে জলরাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসছেন পারসিউজ। এই ছবি দেখতে দেখতে আমার বালক-বয়সের দেখা আরও একটা ড্রপসিনের ছবির কথা মনে পড়ছিল। সম্ভবত সেটা দেখেছিলাম স্টার থিয়েটারে। ড্রপে আঁকা ছিল অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজীর ছবি। আর তার চারপাশে আঁকা ফিতে দিয়ে লেখা ছিল একটি ছোট্ট ছড়া, সেটা আমরা সে বয়সে মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। 'কেশে মাখো কুন্তলীন, রুমালেতে দেলখোস, পানে খাও তাম্বুলীন, ধন্য হোক এইচ বোস।'

একমনে বসে এই সব লক্ষ্য করছি, হঠাৎ এক সময় একটা প্রচণ্ড শব্দ কানে এলো। রীতিমত

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

"সাজাহান' নাটকে নামভূমিকায় : অহীন্দ্র চৌধুরী

চমকে উঠলাম। কী ব্যাপার? না, গ্যালারী খুলে দিয়েছে। হুড়মুড় করে—পড়ি-কি-মরি করে—কীভাবে যে লোক ঢুকতে লাগল, তা অবর্ণনীয়। গ্যালারীর যে যেখানে পারে বসে পড়বার জন্য সে এক রীতিমত ধস্তাধস্তিরই দৃশ্য বটে! আর লোকেরও যেন শেষ নেই, পিলপিল করে লোক ঢুকছে ত ঢুকছেই! এর হাত ছড়ে গেল, ওর হাঁটুতে লাগল, ওর জামা ছিঁড়ল, ওর চাদর হারালো—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ঠেসাঠেসি, গাদাগাদি করেও লোক ধরে না গ্যালারীতে। সেই দিনই বুঝলাম—থিয়েটারে বাদুড়-ঝোলা বলে যে একটা কথা ছিল, সে ব্যাপারটা কী? দুপাশে ছিল সাধারণ বক্স, আর গ্যালারীর ঠিক ওপরেই ছিল রয়্যাল বক্স। সেই বক্সের ছাদ প্রায় মাথায় ঠেকে আর কী, যদি গ্যালারীর উচ্চতম থাকটাতে বসতে হয়। ও থাকে মাথা উঁচু করে বসা চলবে না, মাথা নীচু করে দেখতে হবে সর্বক্ষণ। কিন্তু তবুও ত ওটা বসবার জায়গা। যারা এত করেও এসে বসবার জায়গা পেল না, তারা? ঐ যে বক্সের কথা বললাম, তার সাপোর্ট ছিল কয়েকটা লোহার সরু সরু থামের ওপর, থামগুলি যদিও গ্যালারীর দুটি পাশ দিয়ে। লোকে করত কী, সেই ছাদের কড়ি দুহাতে ধরে, পা দিয়ে সেই লোহার থাম আশ্রয় করে থাকত। আর সেইভাবে আগাগোড়া থিয়েটার দেখত। বলা বাহুল্য, অস্বাভাবিক ভীড় হলেই এটা হত। একেই বলত, 'বাদুড়-ঝোলা'। কখনো বা পা লোহার থাম থেকে সরিয়ে হয়ত বা একটু গ্যালারীর কাঠের কিনারে কেউ রেখেছে, অমনি গ্যালারীর লোক উঠত তিরস্কার করে—করছেন কী মশাই, গায়ে পা দেবেন নাকি? অগত্যা, পা আবার চলে যেত লোহার থামে। এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থিয়েটার দেখা! সাংঘাতিক কথা! নয় কী?

সে রাত্রে 'দুর্গাদাস' হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), সমরদাস—নগেনবাবু, ঔরংজীব—প্রিয়নাথ ঘোষ।

কিন্তু যাঁর অভিনয় আমাকে সেদিন অভিভূত করেছিল, তিনি দানীবাবু। প্রথম দিকেই, ঔরংজেবের রাজসভা ছেড়ে দুর্গাদাস যখন বেরিয়ে যান, তখনই এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হত। যাবার আগে দুর্গাদাস বলছেন—তবে আসি জাঁহাপনা। আদাব।

ঔরংজীব উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললেন—দাঁড়াও।

তারপরে, আরও কিছু বক্তব্যের পর ঔরংজীব বললেন,—তাহবর খাঁ—বন্দী কর।

সঙ্গে সঙ্গে তরবারি খুললেন দুর্গাদাস, বললেন—খবরদার! এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি সম্রাট—বলে, তুরী বাজালেন। পাঁচজন সৈনিক খোলা তরবারি হাতে প্রবেশ করল তখ্‌খুনি। দুর্গাদাস বললেন,—এই পাঁচজন দেখছেন সম্রাট। আর এক তুরীধ্বনিতে পাঁচশ' সৈনিক দরবার-কক্ষে প্রবেশ করবে—বুঝে কাজ করবেন।

উত্তরে ঔরংজীব বললেন—যাও।

এর পরে বইতে লেখা আছে, 'সসৈন্যে দুর্গাদাসের প্রস্থান'। কিন্তু এই প্রস্থান-দৃশ্যটি নির্বাকভাবে যা দেখাতেন দানীবাবু তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনো ভুলবেন না। ঔরংজীব 'যাও' বলামাত্র

তরবারি বন্ধ করে দানীবাবু একবার ফিরে তাকাতেন রোষকষায়িত দৃষ্টিতে। তারপরে দুরন্ত গতিতে বিপরীত দিকে মুখ ফেরাতেন তিনি। সোঁটাওয়ালা বাবরি কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে, আর জোব্বার মতো পোশাক হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলছে। যেই উনি বিদ্যুৎগতিতে মুখ ফেরাতেন, অমনি সেই বাবরির চুলগুলি গালের ওপর এসে পড়ত, আর পোশাকের বেড়গুলিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেতো। সে যে কী অপূর্ব টাইমিংএর জ্ঞান ; বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া এটা হয় না,—আজ তা বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করে হাততালি পড়ত। তারপরে উনি মধ্যম গতিতে অথচ দৃপ্তভঙ্গীতে, মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেন—খুব দ্রুতও না, খুব ধীরেও না।

চতুর্থ অঙ্কের শেষ দিককার সেই কারাগারের দৃশ্যটিও মনে আছে। দুর্গাদাস এখানে বন্দী। শম্ভুজী ওঁকে বন্দী করে ঔরংজীবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার প্রেম নিবেদন করতে এলেন, দুর্গাদাস প্রত্যাখ্যান করলেন। গুলনেয়ার যেন রোষে ফুলে উঠলেন, বললেন—তুমি আমায় উপেক্ষা করছ ? বেছে নাও, বেগম গুলনেয়ার অথবা মৃত্যু।

দর্পভরে দুর্গাদাস উত্তর দিলেন—বেছে নিলাম—মৃত্যু।

এই 'মৃত্যু' কথার সঙ্গে সঙ্গে বীর রাজপুতের যে দর্প প্রকাশ পেত, তাঁর সেই অভিব্যক্তি আর দাঁড়াবার ভঙ্গী হত সুন্দর একটা ছবির মতো। মনে হত, কোন এক চিত্রশিল্পী মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে একটা সুন্দর ছবি এঁকে দিয়েছেন।

এর পরে আছে, গুলনেয়ারের আদেশে কামবক্স তরবারি বার করে দুর্গাদাসকে হত্যা করতে যায়, আকস্মিকভাবে পিস্তল হাতে মঞ্চে প্রবেশ করে তাকে নিরস্ত করেন—দিলীর খাঁ। এই সময়কার বর্ণনা পরে দিলীর করেছেন ঔরংজীবের সামনে—সে রাত্রে কামবক্স যখন তার মাথার ওপর তরবারি উঠিয়েছিল, তখন দুর্গাদাস যে কী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনাব সে দৃশ্য ভুলব না। হঠাৎ তার মাথা যেন শৈলশিখরের মতো সোজা হল, তার বক্ষ আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হল, তাকে এত উচ্চ, এত আয়ত-বক্ষ আর কখনো দেখিনি, জনাব !'

দানীবাবুর ভঙ্গীতে ঠিক এই বর্ণনাই যেন তখন সত্যি সত্যি মূর্ত হয়ে উঠেছিল ! প্রতিটি অঙ্গচালনা যেন ছবির মতো। সারা মঞ্চ জুড়ে যেন এক যুদ্ধের অশ্ব চনমন করে বেড়াচ্ছে। সেই গতি, সেই পদক্ষেপ, সেই দৃপ্ত ভঙ্গী, আমার মনে চির-জাগরূক হয়ে আছে। দুর্গাদাস-এ আরও ত অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু দানীবাবু সেদিন যে ছাপ ফেললেন, তা কখনই মুছে যাবার নয়।

বাড়িতে এলাম, যথারীতি আমাদের আস্তানায় নাটকের মহড়া দেই, কিন্তু মন যেন আর ভরে না। একটা কী যেন মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কী এক নূতনত্বের বিকাশ। দানীবাবুর 'দুর্গাদাস' একটা নূতনত্বের আভাষ এনে দিল, কিন্তু আরও একটা বিশেষ সামগ্রিক রূপ বুঝি দেখবার জন্য আমার মন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, মহড়ার নামে যে ধরনের অভিনয় ধারাকে অনুসরণ করছি, এই কি ঠিক ? এতে মন ভরে উঠছে কই !

এই সময় হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, আমার নাট্যপ্রয়াস এবং নাট্যধারণা যেন মুহূর্তে নূতন এক ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করল। ১৯১১ সালেরই কথা। হঠাৎ কলকাতায় এলেন Matheson Lang-এর বিলেতী থিয়েটার। ইনি এরও আগে এসেছিলেন শুনেছি। তখন এঁর অভিনয় দেখার সুযোগ পাই নি। এবার পেলাম। গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতেন। পায়চারি করতেন, আমরা দেখেছি। দীর্ঘ দেহ—আর বেশ বলবান চেহারা—সুদৃঢ় চোয়াল—ভরাট মুখ। আমি ওঁর অভিনয় দেখলাম; "Hamlet" অভিনয় দেখলাম, কিন্তু তার ভাষা একটি বর্ণও বুঝতে পারলাম না। আর সেই গ্যালারী থেকে দেখা ত! তবে ঐ দীর্ঘদেহ—অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব—ঐ সাবলীল চলাফেরার ভঙ্গী—সে যেন নূতন এক জিনিস দেখলাম। দানীবাবুর ব্যক্তিগত অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু অভিনয়ের যে একটা সামগ্রিক ফলশ্রুতি আছে, তা ওঁদের অভিনয় না দেখলে সম্যক উপলব্ধি করতে পারতাম না। তাছাড়া Langএর নিজস্ব অভিনয়ের বুঝি তুলনা হয় না। সেক্সপীয়ার তখনো পড়ি নি, ল্যাম্বস টেলস ফ্রম সেক্সপীয়ার পড়া ছিল শুধু। ফলত গল্প জানা ছিল, সংলাপ অবশ্য বুঝি নি, কিন্তু চরিত্রের চলাফেরা, অভিব্যক্তি, মঞ্চসজ্জা,—এসব মিলিয়ে যা দেখলাম, তাতে অদ্ভুত এক প্রেরণা পেলাম ভিতরে ভিতরে। ভাবলাম—এ রকম কী করা যায় না? অদ্ভুত শ্রদ্ধা এলো Lang-এর প্রতি। শুনলাম সবার সঙ্গে তিনি দেখা করছেন। কিন্তু আমার বয়সই বা কত? আর সাহেব যা বলবে, তা হয়ত বুঝতেই পারবো না। তাই অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও ওঁর কাছে আর যাওয়া হল না—ঐ দূর থেকেই যা তাঁকে দেখেছি।

সাক্ষাৎকার ঘটে নি বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে ওঁর অভিনয়দৃপ্ত যে কোনো সাইলেণ্ট ফিল্ম এসেছে শুনেছি, অমনি গেছি দেখতে। ওঁর 'কারনিভাল' দেখেছি। দেখেছি, 'দি ওয়্যারহাউস', দেখেছি ওঁর 'মিস্টার উ'। এতে একজন চাইনীজ ম্যাণ্ডারিন বা নোবলম্যান-এর অভিনয় করেছিলেন Lang। সে যে কী অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর চলাফেরা—তাঁর আভিজাত্য—তাঁর চলন-বলনের grandeur—সে এক দেখবার বস্তু। সেক্সপীয়ার-এ দেখেছিলাম একরকম ভঙ্গী, 'কার্নিভাল' বা 'ওয়্যারহাউস'-এ অন্যরকম, এবার চাইনীজ সেজে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিনয় দেখালেন Matheson Lang। একটা দৃশ্যের বর্ণনা দেই। চীনদেশে যখন প্রথম ইংরেজ যেতে শুরু করে, সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল কাহিনী-স্থাপনা। ওঁর মেয়ের প্রণয় হয়েছিল এক ইংরেজ ছেলের সঙ্গে। কোনো দূষণীয় সম্পর্ক নয়। যুবক ছেলেটি আর যুবতী মেয়েটি ছুটোছুটি করে খেলা করতো ফুলবাগানে—যদি একে প্রেমই বলতে হয়ত এ প্রেম স্বর্গীয়। কিন্তু একদিন দূর থেকে ছেলেটি আর মেয়েটিকে একসঙ্গে দেখে ওঁর মনে জেগে উঠল তীব্র আভিজাত্যের অভিমান। পুরুষানুক্রমে পাওয়া ওঁর একটা তরবারি ছিল। পুরুষানুক্রমে এই নির্দেশ ছিল, যে কেউ তাঁদের বংশে কলঙ্কলেপন করবে, তাকে হত্যা করতে হবে ঐ তরবারি দিয়ে। সেই পবিত্র তরবারি কক্ষের এক স্থানে রক্ষিত ছিল এবং প্রতিদিন ধূপধুনো দিয়ে তার পূজা হত। ওঁর মনে হল, ওঁর কন্যা ওঁর অভিজাত বংশে কলঙ্কলেপন করেছে। আর উপায় নেই, মানতেই হবে পিতৃপুরুষের নির্দেশ।

ছেলেটিকে রাখলেন বন্দী করে। আর নিজে বসলেন প্রার্থনায়। সে যে কী অদ্ভুত শান্ত ভাব, তা বলার নয়। ডেকে পাঠালেন মেয়েটিকে, এলো মেয়ে। উনি বসে আছেন নিথর প্রস্তরমূর্তির মতো —যেন কী এক অন্তর্লীন ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন—আবেগের লেশমাত্র নেই। আর কোলে রয়েছে সেই তরবারিখানা। কন্যা পিতাকে ওভাবে নিশ্চল থমথমে মূর্তিতে বসে থাকতে দেখে ওঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসল, আপন মনে যেন প্রার্থনা করলে সে, চোখ দুটি ছল ছল করছে, জলে ভরে গেছে। Lang কিন্তু কন্যার দিকে দৃক্‌পাতও করেন নি, তেমনি শূন্যে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি, শুধু যেন বললেন,—তুমি মাথা নত করো।

তাই করল কন্যা। আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখলাম, তাঁর হাতের তরবারি ওপরে উঠে গেল। আমাদের চোখের সামনে ঝলমল করে উঠল সেই নগ্ন তীক্ষ্ণ তরবারির একটা ক্লোজ-আপ। দৃশ্যটি শেষ হল ওখানেই। বুঝতে পারলাম আমরা, কন্যাকে নিজের হাতে বলি দিলেন তিনি।

কিন্তু প্রক্রিয়ারও প্রতিক্রিয়া আছে। জেগে উঠল ওঁর মধ্যে এক উদগ্র প্রতিহিংসা-বৃত্তি। প্রতিজ্ঞা করলেন, যে আমার বংশ কলঙ্কিত করেছে, আমিও তার বংশ করব কলঙ্কিত। এই সঙ্কল্প মনে রেখে ছেলেটির মাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন নিজের প্রাসাদে। হারানো ছেলের খোঁজ পাওয়া যাবে, এই আশায় ব্যাকুল জননীও এল ওঁর কাছে। হলও তাই। Lang বললেন, তোমার ছেলে আছে আমার কাছে। তাকে বন্দী করে রেখেছি। যদি তার মুক্তি চাও, আজ আমার আতিথ্য গ্রহণ কর তুমি। আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে পান-ভোজন কর।

মহিলাটি কোন কথা বলতে পারলেন না, তাঁর মন তখন পুত্রের জন্য ব্যাকুল। এদিকে হয়েছে কী, Lang-এর প্রাসাদের এক ঝি, একদা ঐ মহিলাটির কাছ থেকে হয়েছিল উপকৃত। সেই উপকার স্মরণ করে, সে ওঁর সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করে বলে দিল গৃহকর্তার সব অভিসন্ধির কথা। বললে—তোমার অমর্যাদা করতে চায় ও।

শুনে, শিউরে উঠলেন মহিলা। কিন্তু, এখন উপায়? ঝি-টি ওঁর হাতে লুকিয়ে এনে দিলে বিষের মোড়ক। বললে—যদি সম্ভ্রম রাখতে চাও ত বিষপান করে আত্মহত্যা কর।

তারপরে, Lang তাঁর প্রশস্ত কক্ষে আহ্বান করলেন মহিলাটিকে। এখানে দেখলাম, ওঁর অত্যাশ্চর্য অভিনয়-শক্তির বিকাশ!

টেবিলে বসেছেন মেয়েটিকে সামনে রেখে। পানপাত্র সাজান। মেয়েটি বললে—ফিরিয়ে দিন আমার ছেলেকে?

—দেব।

ঘরে ছিল বিরাট এক ঘণ্টা। (এই ধরনের ঘণ্টা পরে আমি দেখেছিলাম বম্বেতে। Church gate-এর এক চীনের দোকানে Chinese Curio হিসাবে সাজান ছিল—এক মানুষের থেকেও বেশী উঁচু হবে।) ছবির এই ঘণ্টাটাও ছিল তেমনি উঁচু এবং প্রকাণ্ড। ভৃত্যকে ডেকে বললেন—বন্ধ করে

দাও চারিদিকের দরজা। ঘণ্টা বাজালে দোর খুলে দেবে, তার আগে নয়। দরজা খুললে পরে ঐ ইংরেজ মহিলাটি বেরিয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ছেলেকেও ছেড়ে দেবে। এই আমার আদেশ রইল।

ভৃত্য চলে গেল। বন্ধও হয়ে গেল সব দরজা। চাকরকে আদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে মেয়েটি একটা অভয় পেল বটে, তবু তার আতঙ্ক যায় না, কারণ ঝি'র কাছ থেকে সে যা শুনেছিল, তা ত সহজে মন থেকে মুছে যাবার নয়। Lang বাইরে অদ্ভুত শান্ত হয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝে পানপাত্র মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছেন—খাও।

মেয়েটি খেতে চাইছে না। উনি বলছেন—নিমন্ত্রিত অতিথি তুমি। প্রত্যাখ্যান করে গৃহস্বামীর অপমান করো না। এই দেখ, আমিও খাচ্ছি।

বলে চুমুক দিচ্ছেন পানপাত্রে, সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ঠোঁটও যাচ্ছে একটু বেঁকে।

বাইরে ওঁর অসাধারণ শান্ত ভাব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে কী অস্থির হয়ে উঠেছেন, তা বলার নয়, মাঝে মাঝে চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠছে একটা চিন্তার দ্যুতি, আর তারপরেই, উঠে চলে যাচ্ছেন ভিতরে, বদল করে আসছেন বহুমূল্য পোশাক। মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠছে, তারই প্রকাশ ঘটছে ঐ পোশাক বদল করার মধ্যে।

মেয়েটি করল কী, ওঁর এই ভিতরে যাওয়া-আসার অবসরে ওঁর পানপাত্রে পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিল বিষ। উনি বুঝতে পারেন নি, পান করলেন সেই বিষ। পান করেই স্বাদ পেলেন ভিন্নতর। সন্দেহে ধক্ করে জ্বলে উঠল দুটি চোখ। বুঝতে পারলেন, কিছু একটা করেছে ঐ মেয়েটি! তরবারিটা হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েটিও বিদ্যুৎগতিতে উঠে সরে গেল অন্যদিকে। কিন্তু কোথায় পালাবে, চারিদিকের দরজা বন্ধ।

Lang উন্মুক্ত তরবারি হাতে ওঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। বিষের ক্রিয়া হয়েছে শুরু, মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, দাঁড়াতে পারছেন না, টলছেন রীতিমত। তবু এগিয়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করতে চান মেয়েটিকে দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায়। মেয়েটি ছুটে থামের আড়ালে যাচ্ছে, উনি গিয়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করছেন সেই থামে। মেয়েটি পালিয়ে যাচ্ছে আরেকটি থামের আড়ালে, উনি যাচ্ছেন সেই থামের দিকে, আবার তরবারির আঘাত সেই থামের ওপরে। ঢিলে-ঢালা চাইনীজ আলখাল্লা তাঁর পরনে, ঐ দীর্ঘদেহ মানুষ, হাত উঠিয়ে এগিয়ে আসছেন, মনে হচ্ছে এক অতিকায় দানব যেন চলাফেরা করছে জীঘাংসার মূর্তিতে। মেয়েটি পালাতে পালাতে এক সময় এলো ঘণ্টাটির আড়ালে। উনি এসে ঘণ্টায় করলেন আঘাত। ঘণ্টাটি দুলে উঠল। উনি পড়ে গেলেন ঘণ্টার ওপরে। হাত থেকে তরবারি খসে গেল, উনিও গড়িয়ে পড়ে গেলেন মেঝের ওপরে। নিস্পন্দ হয়ে গেল ওঁর দেহ। আর সেই গড়িয়ে পড়ে যাবার ফলে ঘণ্টা নড়ে উঠেছিল প্রবলভাবে, তাই ধ্বনিত হতে লাগল সজোরে—ঢং-ঢং-ঢং! ঢং-ঢং-ঢং!

পূর্বেকার নির্দেশ অনুসারে খুলে গেল দরজা। মেয়েটি ছুটে পালিয়ে গেল। অদূরে দেখা গেল

বন্দী-দশা থেকে মুক্ত ওঁর পুত্রকে। দুজনে পাশাপাশি এসে, তারপরে বাগানের পথ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

বলা বাহুল্য, Lang-এর অভিনয় আমাকে শুধু অভিভূতই যে করল তা নয়, আমাকে একেবারে মাতিয়ে তুলল। মনে হল, আমরা থিয়েটারের মহড়ার নামে যা করছিলাম, তা ছেলেখেলা। নতুন কিছু করতে হবে। ততদিনে আমার লেখাপড়ায় ইতি পড়ে গেছে। মা-বাবা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন আমার জন্য।

এমন দিনে শোনা গেল, সম্রাট আসছেন। মত্ত হবার মতো এ আরেক বিষয় পেলাম হাতে। সম্রাট মানে, পঞ্চম জর্জ। ইনিই ১৯০৫ সালে এসেছিলেন Prince of Wales হিসাবে। কিন্তু সে আসার সঙ্গে এ-আসার তফাত প্রচুর। দিল্লীর দরবার সেরে—দিল্লী থেকে সরাসরি এসেছিলেন, না কি, নেপালে শিকার সেরে কলকাতায় এসেছিলেন, ঠিক মনে করতে পারছি না। Special Train এসে লাগল হাওড়া স্টেশনে। তখন হাওড়ায়-কলকাতায় যাতায়াতের জন্য একটা Pontoon bridge ছিল। সম্রাট ও-ব্রীজ দিয়ে এলেন না। স্টেশন থেকে ওপারের ফেরীঘাট পর্যন্ত একটা কার্পেট পাতা হল, তাতে পা দিয়ে দিয়ে উঠলেন এসে ফেরী স্টীমারে। সেই বিশেষ স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে এসে নামলেন প্রিন্সেপ ঘাটে। প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে বহু স্তম্ভ শোভিত একটি মণ্ডপ বা চাঁদনী ছিল; এখনো আছে, তবে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন ওর মর্যাদা ছিল অনেক। সেখানে বিশেষ জাঁকজমক সহকারে বসানো হয়েছিল সিংহাসন। সেই সিংহাসনে বসে নাগরিক সম্বর্ধনা লাভ করে উঠলেন একটা ছয়ঘোড়ার সুসজ্জিত গাড়িতে। সামনে চলল ঘোড়ায়-চড়া জমকালো পোশাক-পরা অশ্বারোহী রক্ষীদল। সেই বিরাট শোভাযাত্রা কেল্লার দক্ষিণপার্শ্ব দিয়ে এসে পড়ল এলেনবরো কোর্স দিয়ে, রেসকোর্স-এর পাশে। তারপরে রেড রোড-এর সামনে Duffrin-এর মূর্তিটিকে ঘুরে রেড রোডে পড়ল। রেড রোডের দুপাশে করা হয়েছিল গ্যালারী। স্কুলের ছাত্ররাও ছিল সেই গ্যালারীতে। তারা সবাই পেয়েছিল সম্রাটের মূর্তি খোদিত এক একখানা করে নিকেলের গোলাকার স্মারকচিহ্ন। কিছু জলখাবারও পেয়েছিল। সমস্ত রেড রোডটাই যেন সেদিন এম্পি-থিয়েটার-এ পরিণত হয়ে গেছে। বড়দিন সামনে বলে আমি তখন ছিলাম মামাদের লীণ্ডসে স্ট্রীটের দোকানে, সেখান থেকে দৌড়ে এসে এখন যেখানে মৃত সৈনিকদের স্মরণার্থে স্তম্ভটি রয়েছে, তার পূর্বদিকে, রেড রোডের রেলিংএর পিছন দিককার একটা ঝাঁকড়া মাথা গাছের মাথায় উঠে সবকিছু দেখছিলাম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে মহারানী ভিক্টোরিয়ার যে মর্মর মূর্তিটি রয়েছে, ওটি তখন ছিল ঐ মৃত সৈনিকদের স্মরণস্তম্ভটির জায়গায়। মূর্তিটি পরিষ্কার করে তার ওপরে সুন্দর করে চন্দ্রাতপ খাটানো হয়েছিল। রাজাকে নিয়ে সেই বিপুল শোভাযাত্রা সেই মূর্তিটির পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দরজা দিয়ে গভর্নর-হাউসে ঢুকলো। দক্ষিণের দরজাটি ইতিপূর্বে ছিল না। যখনই কোন রাজপুরুষ এসেছেন, প্রবেশ করেছেন সাধারণত পশ্চিমের দরজা দিয়ে। এবার স্বয়ং সম্রাট আসছেন, তাই তাঁর সম্মানে তৈরি হয়েছিল ঐ দক্ষিণের

ফটকটি। সে কী শোভাষাত্রা! দিল্লী দরবারেরই অনুরূপ বলা যায়, শুধু ছিল না জমকালো সাজে সাজানো হাতির দল আর বিকানীরের বিখ্যাত ক্যামেল-প্রসেশন। তবে হাওদা দিয়ে সাজানো হাতি ও উটের গাড়ির মেলা সম্রাটকে দেখানো হয়েছিল "টর্চ লাইট টাটু"তে। সঙ্গে অবশ্য আরও নানারকম খেলা, যেমন, ময়ুরভঞ্জের বিখ্যাত পাইক-নৃত্য প্রভৃতি সম্রাটকে দেখানো হয়েছিল। কেল্লা থেকে করা হল ঘন ঘন তোপধ্বনি। কটা তোপ পড়েছিল, সেদিন সাগ্রহে গুনেছিলাম, আজ তা মনে নেই। মনে আছে রাজা-রানীর সেই সাদা ছ'ঘোড়ার গাড়ি—সাম্‌নে সারি সারি বডিগার্ডের দল। তারপর ভাইসরয়—দেশীয় রাজন্যবর্গ—তারপরে স্বয়ং রাজা ও রানী হাত নেড়ে নেড়ে সেলাম গ্রহণ করছেন। তাঁর আগে-পিছনে ঘোড়সওয়ারের দল—কম করে হাজার—দেড় হাজার ঘোড়া হবে—বিপুলকায় ক্যাভালরী রেজিমেণ্ট। এছাড়া অজস্র পদাতিক, নানারকম মিলিটারী ব্যাণ্ড। আর রেড রোডের দুপাশে—বিশ ফিট অন্তর অন্তর—বন্দুক-হাতে দাঁড়ানো—গোরা পাহারাদার—সে এক দৃশ্য! শুনেছিলাম রাজ-পরিবারের যাঁরা আসতেন, তাঁদের এইভাবেই নাকি শোভাযাত্রা করে অভ্যর্থনা জানাবার রীতি ছিল। তবে, এবার এসেছেন স্বয়ং সম্রাট, সর্ববিষয়ে জাঁকজমক স্বভাবতই একটু বেশী হয়ে থাকবে। আরও একটা কথা, যে-পথ দিয়ে তিনি এসেছিলেন সেই পথের দুধারে ছিল সুদৃশ্য স্তম্ভের সারি, আর মাঝে মাঝে সুসজ্জিত, অভিনব সব তোরণ-মণ্ডপ।

যাই হোক, রাজা ও রানী বড়দিনটা কলকাতায় কাটিয়ে ফিরে গেলেন স্বদেশে। রাজা গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর বাঙালীর জীবনে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশের দিক দিয়ে সে-এক স্মরণীয় বৎসর। যে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে এত আন্দোলন, যে বঙ্গভঙ্গ বাঙালী আদৌ চায় নি, সম্রাটের দিল্লী-দরবারে ঘোষিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ-রোধ। বঙ্গ আর ভঙ্গ হল না, বাঙালীর ইচ্ছাই পূর্ণ হল। কিন্তু এটা পেতে গিয়ে বাঙালীকে দিতে হল অন্য-কিছু। উড়িষ্যা ও বিহার গেল বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। তদুপরি রাজধানীরও হল পরিবর্তন। ছিল কলকাতা, হল দিল্লী। এর ফলে বাঙলা দেশের পক্ষে যে ক্ষতি হয়েছিল বাঙালী তাই নিয়ে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সেদিন করতে পারেনি অর্থাৎ দৃপ্তকণ্ঠে কোন সমবেত প্রতিবাদ জানাতে পারেনি, যেমন জানিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন?

বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটা সেদিন বাঙালীর কাছে ছিল বিভীষিকাস্বরূপ। তার ঘর যে এভাবে ভেঙে যাবে, তা সে সহ্য করতে পারে নি। দেশব্যাপী একটা বিরাট ক্ষোভের অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন। বিলিতী দ্রব্য বর্জন, আর তার পাশাপাশি গোপন সন্ত্রাসবাদও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বাঙলায়, যখন দিল্লীর দরবারে সম্রাটের ঐতিহাসিক ঘোষণা পাঠ করা হল, তাতে উল্লসিত হবারই কারণ ঘটল বাঙালীর এইজন্য যে, বঙ্গভঙ্গ রোধ হল। ইংরেজ পূর্ববঙ্গ ভাগ করে, তাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিল এই উদ্দেশ্যে যে, বাঙালী হিন্দুরা কোনদিন কোনমতেই যেন সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ না করতে পারে। এবারে, দরবারের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রোধ হল বটে, কিন্তু বিহার-

উড়িষ্যা বাঙলা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হয়ে উঠল আলাদা একটা প্রদেশ। আসাম আগে যেমন ছিল, তেমনি স্বতন্ত্র প্রদেশই হ'য়ে রইল। স্যর এস পি সিনা 'লর্ড' হলেন। হলেন ব্যারন অব রায়পুর। তিনি নিযুক্ত হলেন নবগঠিত প্রদেশ বিহার-উড়িষ্যার গভর্নর। এর পিছনে ইংরাজ-রাজের বাঙালীকে একটু খুশী করার স্পৃহা ছিল কি না, তা বিচার করবেন রাজনীতিবিদ্। কিন্তু, সেদিন বাঙালীর কাছে যেটা সমূহ ক্ষতি হয়ে দেখা দিল, সেটা হল এই যে, ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে উঠে চলে গেল দিল্লীতে। ফলে, রাজধানীরূপে কলকাতার যে গৌরব আর আধিপত্য ছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এর জন্য কাগজে কিছু নরম-গরম লেখাও হল, কেউ লিখলে—বাঙালীকে কি এইভাবে শাস্তি দিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ?

সভা-টভাও কিছু হল এধার-ওধারে, কিন্তু গণ-আন্দোলন কিছু হল না। নতুন একটা উত্তেজনাও সৃষ্টি হল না। কারণ এমন একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে, নতুন আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করতে পারেও না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন সবে হয়ে গেছে, তাতে বঙ্গভঙ্গ রোধও করা গেল, —কিন্তু, ঠিক অনতিপরেই অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় না, বিশেষ করে ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে গেছে যখন।

ইংরেজ বণিক-সভা কিন্তু লড়েছিল। সভা করে তারা প্রতিবাদও জানিয়েছিল। স্টেটসম্যান আর ইংলিশম্যান পত্রে লেখালেখিও হয়েছিল প্রচুর। এবং কলকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের হেডকোয়ার্টার বিলেতে এ-নিয়ে পত্রাঘাতও করেছিল বিশেষভাবে। রাজধানী দিল্লীতে গেলে তাদের ব্যবসার যে ক্ষতি হবে তাদের প্রতিও তারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল। সাহেব দোকানদারদের যে ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ছিল, হ্যামিল্টন, হোয়াইটওয়েজ প্রভৃতির মতো কোম্পানী ছিল যার সক্রিয় সভ্য, তারা বলল, বড়দিনের সময় যে সওদা বিক্রির মরসুম পড়ত, বড়লাটের দরবার উপলক্ষে, রাজা-রাজড়াদের আগমনকে কেন্দ্র করে যে বেসাতির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যেত তাও আর থাকবে না। ফলে, অর্থনৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসা গুটিয়ে স্বদেশে প্রস্থানই করতে হবে বহু ব্যবসায়ীকে। বড়লাটের দরবার, তা ছাড়া, ইংরাজ রাজপুরুষদের যে উৎসবাদি, লেভী, ডিনার, টি-পার্টি, গার্ডেন-পার্টি এসবকে উপলক্ষ করে সাহেব দোকানদারদের কম লাভ হত না!

তাঁদের আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদসভা ইত্যাদির ফলে সম্রাটের ঘোষণায় লর্ড হার্ডিঞ্জ এই ব্যবস্থার কথা শোনালেন যে, বড়লাট প্রতিবছর বড়দিনের সময় কলকাতায় আসবেন। বাংলা প্রদেশের জন্য যিনি গবর্নর হবেন, তিনি থাকবেন গভর্নর হাউসে, আর বড়লাট থাকবেন এসে বেলভেডিয়ারে। সেখানে যথারীতি বসবে তাঁর দরবার। সেই দরবার-উপলক্ষে রাজন্যবর্গও আসবেন নানাদিক থেকে, অতএব কলকাতার ব্যবসা চলতে থাকবে পূর্ববৎ।

মন্দের ভালো। ইংরেজ বণিক-সমাজ তখন বুঝে নিয়েছেন যে, রাজধানী আর পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তখন তাঁরা মনকে প্রবোধ দিলেন এই সংকল্প করে যে,

যাক্ রাজধানী দিল্লার উষর মরুতে,—কলকাতাকে করবেন তাঁরা ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী, কলকাতা শ্রেষ্ঠ বন্দর, কলকাতার বাণিজ্যিক মহিমাকে তাঁরা অম্লান রাখবেনই।

এ ত গেল ইংরেজ বণিক-সমাজের কথা, বাঙালীর অর্থনৈতিক ক্ষতির পূরণ হবে কী করে? বড়লাট বড়দিনের সময় কলকাতায় আসবেন বটে, কিন্তু তাঁর দপ্তর তো আসবে না, অতএব বাঙালী বাবুদের আর কলকাতা-সিমলা করা হবে না, যেটা হবে, সেটা হচ্ছে দিল্লী-সিমলা করা। ফলে বাঙালী বাবুদের ঘটল প্রবাস-বাস। এবং ক্রমে ক্রমে চাকরির ক্ষেত্রেও বাঙালীর প্রাধান্য কমে আসতে লাগল। এক কথায়, রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাকরিজীবী বাঙ্গালীর ভাগ্য গেল। কলকাতার ছেলে তখন অনেকেই চাকরি পেত সরকারী দপ্তরে। সে-সব দিন আর রইল না। তখন কলকাতার সাধারণ লোক অল্পবিত্ত হলেও, প্রচণ্ড অভাবটা তাদের ছিল না, পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যার শোচনীয় ফল। বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জনকে লোকে নিন্দা করেছিল, কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ যা কৌশল করে গেলেন, তার চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছু বোধ হয় নেই। ক্রমে ক্রমে কী যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল বাঙালী, তা আমরা সেদিনকার লোক সবাই অনুভব করেছিলাম।

ইংরেজ রাজশক্তির সেদিনকার সেই কুটনৈতিক চাল বাঙালী যে না বুঝেছিল এমন নয়, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবল আন্দোলন করার অনুকূল মুহূর্ত সেটি ছিল না। তবে, তার অন্তর যে ক্ষোভে গুমরে গুমরে উঠেছিল তাতে আর ভুল নেই। বাঙলার সন্ত্রাসবাদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এক অভিব্যক্তির সংবাদ আমরা পেলাম হার্ডিঞ্জের উপর বোমা-ক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীতে প্রবেশ করছিলেন রাজধানী প্রবেশের দ্যোতক হিসাবে, তখন তিনি চড়েছিলেন একাই সুসজ্জিত হাতির ওপর—রূপোর হাওদায়। সেই হাতি যখন রাজধানীতে প্রবেশ করছে, তখন কে যেন হঠাৎ নিক্ষেপ করল তাঁর ওপর বোমা। লক্ষ্য একটু ভ্রষ্ট হয়েছিল, বোমাটা পড়েছিল হাওদার পিছনের অংশে। ফলে, রূপোর হাওদা ভেঙে হার্ডিঞ্জের পিঠের ভিতরে নাকি ঢুকে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পড়েছিলেন মূর্ছিত হয়ে। হাতিটিও বেশ আহত হয়েছিল, সেটি পরে মারা গিয়েছিল বলে শুনেছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জের যা হয়েছিল তাতে তাঁর নাকি বাঁচবার কথা নয়! শুনেছিলাম, হাওদায় প্রথম মূর্ছিত হবার সময়, কাছেরই একটা বাঙালী ডাক্তারখানা থেকে ওঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এবং সেটা হয়েছিল খুবই সময়মতো। যা হোক চিকিৎসার জোর আর বিশেষ করে ভাগ্যের জোরে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। ভগবৎ কৃপায়ও বলা যেতে পারে।

অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সংযোগ ছিল না, তবে দেশ-জুড়ে যে ঘটনা বা সংবাদ আলোড়ন তুলত, তা আমাদের মনকেও স্পর্শ করত বই কী। রাজধানী পরিবর্তনের পর প্রথম গভর্নর হয়ে এসেছিলেন লর্ড কারমাইকেল, ১৯১২-র এপ্রিলে। এদিকে, রাজা যখন এসেছিলেন, তখন

কলকাতার রঙ্গমঞ্চগুলি কিন্তু একদিনও না থেমে একাদিক্রমে অভিনয় করে গেছে। আজকাল থিয়েটারের যে ম্যাটিনী শো হয়, বলা যেতে পারে, তার প্রবর্তনা হয়েছিল তখন। রাজা এসেছেন, মফস্বল থেকে কলকাতায় লোকও তখন এসেছে অনেক, অভিনয়-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি স্বভাবতই সুপ্রচুর। তাই তখন অভিনয়কালের দৈর্ঘ্য-অনুযায়ী কেউ বেলা বারোটা, কেউ বেলা দুটোর সময় একটা বাড়তি শো করতে লাগলেন। আমরাও সেই ফাঁকে কিছু কিছু থিয়েটার দেখে নিয়েছি। থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়েও থাকতাম অনেক সময়, অভিনেতাদের দেখতাম। স্টার থিয়েটারে তখন খুব কড়াকড়ি ছিল। অমর দত্ত মশাই তখন স্টারে অভিনয় করছেন, তাঁর অভিনয় দেখবার অভিলাষও হল প্রবল। লুকিয়ে-চুরিয়ে কোনক্রমে অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখবার সাধও একদিন মিটেছিল।

বিডন স্ট্রীটের মিনার্ভা থিয়েটার-এর সামনেটা এখন যেমন আছে তখন ঠিক তেমনটি ছিল না। ফুটপাতের ধারে ছিল লোহার রেলিং, দুপাশে দুটি ফটক। সামনে গাড়ি বারান্দা—সেটা দিয়ে ভিতরে লব্বীতে ঢুকেই তখন টিকিটঘর। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম ঐ রেলিং ধরে। অভিনয়ের দিন ছাড়াও অনেক অভিনেতা ওখানে আসতেন গল্পগুজব করতে। আমরা অনতিদূর থেকে দেখতাম তাঁদের। আজও মনে আছে, পশ্চিম ফটকের গায়ে কয়েকটি মনিহারী দোকান ছিল, তাতে থাকত সব থিয়েটারের বই সাজানো। এক টাকা করে দাম! দর্শকরা থিয়েটার দেখে ঐসব দোকান থেকে বই কিনে নিয়ে যেত ভিড় করে। দোকানেও সব সময় লোক থাকত বই বিক্রি করার জন্য। দর্শক ছাড়া, অন্য ক্রেতারাও এইসব বই এখান থেকে কিনে নিয়ে যেত, গুরুদাসবাবুর দোকান পর্যন্ত না গিয়ে। ঐ যে মনিহারী দোকান, ওখানে মাঝে মাঝে হীরালাল চট্টোপাধ্যায় মশায় এসে বসতেন গল্পগুজব করতে। বসে বসে তিনি তামাক খেতেন। হীরালালবাবুর সঙ্গে অনেক পরে আমিও একদিন পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করেছি—তিনি তখনকার খুব নামকরা অভিনেতা ছিলেন—খুব হাল্‌কা রসের অভিনয় করতেন। আমরা তখন অবাক হয়ে হীরালালবাবুকে দেখতাম। ভাবতাম, এই যে এত গম্ভীর হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোকটি ইনিই আবার কেমন মঞ্চে অবতরণ করে হাস্যরসের স্রোত বইয়ে দেন, হাসতে হাসতে আনন্দে গড়িয়ে পড়ে দর্শক!

কোহিনুর থিয়েটার তখনো ছিল। এইসব থিয়েটারের আশেপাশে আমরা ঘুরঘুর করতাম। এঁকে দেখছি, তাঁকে দেখছি, এঁর কথা শুনছি. তাঁর কথা শুনছি। যেন এক রহস্যময় জগতের বার্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিনয়ের মঞ্চগুলি।

এইভাবে ঘুরঘুর করতে করতে একদিন শুনলাম, গিরীশবাবু আর থিয়েটারে আসছেন না—তিনি খুব অসুস্থ। নাম রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে, অথচ আসতে পারছেন না তিনি! শুনে ভাবতাম, অসুখ সেরে গেলে আবার আসবেন। আবার দেখব তাঁর অভিনয়। কিন্তু, হঠাৎ-ই একদিন শুনলাম দুঃসংবাদ। বেলা তখন দশটা হবে। ১৯১২ সালের প্রথম দিকেই। শীতের প্রায় শেষ সময়। সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাস। শুনলাম, গিরীশবাবু আর ইহজগতে নেই।

মনে একটা ধাক্কা পেলাম। মনে হল, আর দেখতে পাবো না তাঁর অভিনয়! যাই হোক, কীসের টানে যেন আমরা কজন বেরিয়ে পড়লাম পথে। তিন-চারজন মিলে বিডন স্ট্রীটে হেঁটে গিয়ে শুনলাম, শবদেহ কাশী মিত্রের ঘাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরাও ছুটলাম। কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে যাবে কার সাধ্যি? লোকে লোকারণ্য। ভাবলাম, বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গলি ঘুঁজি দিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। ভাগ্য অপ্রসন্ন, গলিঘুঁজি দিয়েও অগ্রসর হওয়া গেল না, সেখানেও প্রচুর ভীড়। এ'ত ভীড় যে, ঠেলে যাওয়া সম্ভব নয়। এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কাশী মিত্রের ঘাট পর্যন্ত আমরা পারলাম না পৌঁছতে, ফিরে এলাম।

ওঁর মহাপ্রয়াণের ছুই-একদিনের মধ্যেই দেখলাম, ছবির দোকানে বা বহু মনিহারী দোকানে, ওঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে। গিরীশবাবুর আটরকম ভাব-অভিব্যক্তির প্রতিরূপ ব্লক করে আর্ট পেপারে ছাপা হয়েছে চারিদিকে কালো বর্ডার দিয়ে। নীচে, অভিব্যক্তির প্রতিশব্দ ছাপানো। এই ছবি ছাড়া আরও একখানা ছবি বিক্রি হচ্ছিল। ওঁর শবযাত্রার ছবি—পত্রপুষ্পে শোভিত—সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দানীবাবু ও তাঁর আত্মীয়স্বজন। এইসব ছবি ক্রমে উত্তর-দক্ষিণ কলকাতার সর্বত্র এমনকি আয়না-চিরুনি বিক্রি করত যে-সব স্টেশনারী দোকান—তারাও বিক্রি করতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, ছবিগুলির চাহিদা হয়েছিল খুব আর বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর। আমি ছুখানি ছবিই কিনে আনলাম, এনে টানিয়ে দিলাম আমাদের ক্লাবঘরে, অর্থাৎ ভুতোদের বৈঠকখানায়।

এদিকে বাবা দেখছেন, লেখাপড়ায় আমার আর গা নেই। বললেন, এবার ভর্তি হও। ভর্তি হবার দিকে আমার তখন মন নেই, বাবার তখন ভীষণ কাজের চাপ, কাজেই উনি নিজে সময় পান না, আমাকে বলেন কোনো স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে।

বললেন—কী হল, স্কুলে-টুলে খোঁজ নিচ্ছ?

বলতাম, ওটাতে গিয়েছিলাম, ওটা তেমন স্থবিধার নয়।

অন্যদিন।

—গিয়েছিলে?

বলতাম—ও'স্কুলটায় ভালো পড়ায় না, এবার অন্যটায় খোঁজ নেবো।

এই করে সব কাটিয়ে দিচ্ছি। আর করছি কী? সেই আমাদের ক্লাবঘরে গিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছি—খাওয়া-দাওয়ার পর—ছুপুরবেলা। তারপরে, কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যাবেলাও। কিন্তু, শুধুই কি মহড়া দিয়ে যাবো? অভিনয় হবে না? হিসাব করে দেখা গেল, একখানা বই একটু ভালোভাবে অভিনয় করতে গেলে কম করে শ'খানেক টাকা লাগে। কাটছাঁট করে সত্তর পঁচাত্তর-তো-বটেই। সামাজিক বই ধরলে অবশ্য আরও কমে হয়, পঞ্চাশ-পঞ্চান্নতে হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু, সামাজিক বই করতে তেমন মন সায় দেয় না। ওতে সাজসজ্জা তেমন নেই, তদুপরি—অল্প বয়স—কাঁচা মুখে কর্তাব্যক্তি সাজলে মানাবে না। পোশাকওয়ালা ঐতিহাসিক ধরনের বইতে দাঁড়ি-গোঁফ লাগাবার

যে সুযোগের প্রতুলতা আছে, সামাজিক বইতে তা কই? তা ছাড়া, পঞ্চাশ টাকাই বা পাচ্ছি কোথায়? পাঁচটি টাকারও তো সম্বল নেই! অতএব থিয়েটার করার আশা আর দেখছি না।

বাড়িতে—বাবা বলছেন—ভালো মাস্টারই না হয় দেখ। বাড়িতে মাস্টার রেখেই না হয় পড়।

আমি এ-ও কাটিয়ে দিতাম। নির্বিকার বলা যেতে পারে। অভিনয় যে করতে পারব না, এই নিরাশাই তখন মনটাকে অধিকার করে আছে, অন্য কথা সেখানে অনুপ্রবেশ করবে কী করে?

তার ওপরে, আরও এক হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা ঘটল। ভূতনাথ তাদের ব্যবসা-ট্যবসা দেখে না, বাড়িতেও থাকে না সব সময়। সারাদিন কী যে করে, কোথায় যে যায়, আমরাও জানতাম না। একদিন সকালের দিকে হঠাৎ ধরেছি তাকে। বললাম,—ক্লাবে যাচ্ছিস না কেন?

বললে, একটু কাজে আটকে গেছি।

কী কাজ কে জানে! আমরা করতাম কী, বাড়ি থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে বৈঠকখানা খুলে বসতাম, চলত আমাদের মহড়া, ভূতনাথের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও।

ওদের বাড়ির সামনে একটা সাঁকো ছিল, সিমেণ্ট-করা, তাতে বসবারও জায়গা ছিল। সেখানে বসে থাকতেন ওর বাবা। বৈঠকখানার চাবি অনেক সময় ওঁর কাছ থেকেও নিতাম। উনিও বলতেন,—তোমরা আস, বাড়িতে আমার চাঁদের হাট বসে যায়, কিন্তু যার জন্য ওই হাট, সেই ভূতো থাকে না বাড়িতে, এটা কীরকম লাগে বল ত?

আমরা উত্তর দিতে পারতাম না।

উনি একদিন অবশেষে স্পষ্টই বলে বসলেন ওঁর মনের কথাটা। বললেন,—দেখ বাবা, তোমরা আসছ, তার বন্ধু, অথচ সে আসছে না। এটা তো ভাল দেখায় না! দিনের পর দিন—ছেলে নেই—শুধু তোমরা আসছ—লোকে ভাববে, আমি বুঝি কোন থিয়েটারের আখড়াকে ঘরভাড়া দিয়েছি। সুতরাং, তোমাদের আর এখানে না আসাই শ্রেয়।

বিনামেঘে যেন বজ্রাঘাত হল। ভূতনাথের বাবাকে বলারও কিছু নেই। কিন্তু, আমরা যে আবার ঘরছাড়া হলাম! এবার যাই কোথায়? খেলাধুলোও তখন ভাল লাগে না, অভিনয়ের নেশা তখন আমাদের পেয়ে বসেছে।

কী করি? তখন বিকেলের দিকে আমরা যেতে শুরু করলাম হাজরা পার্কে। রিহার্স্যাল তো বন্ধ, কিন্তু একত্র ব'সে যে আলোচনা করব, তারও তো জায়গা চাই? হাজরা পার্ক তখন যেখানে ছিল, এখনো সেখানেই আছে, তবে ওটা হাজরা রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। যেখানে এখন আশুতোষ কলেজ, সেটার কিছু অংশত ছিল পার্কের এলাকার মধ্যে। তার পরে ছিল বড় একটা চৌকো আকারের পুষ্করিণী। তার চারধারে ছিল বাগান। পূর্বদিকে একটিমাত্র ফটক। সেই ফটকের উলটো দিকে—রাস্তার পূর্বগায়ে ছিল আমাদের পরিচিত দুটি বাড়ি। একটি সরকারদের অপরটি বাঁড়ুজ্যেদের। এই বাড়িরই কেতকী বন্দ্যোপাধ্যায়—দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত পালোয়ান

সে-যুগের—তাঁর ছিল আখড়া তাঁর বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিতে। সেখানে কুস্তি হত, মেহনত হত। এই কেতকীবাবুর ভাইপো ছিল আশু। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। সে আজ বেঁচে নেই। তাকে আমরা ডাকতাম 'রাবণ' বলে। কেন ডাকতাম আজ তা স্মরণ করতে পারছি না। আমাদের ক্লাবের সে ছিল একজন উৎসাহী সভ্য। সে-ই প্রথম বললে কথা। বললে—হাজরায় এসো। সেই থেকে আমাদের হাজরা পার্কের আনাগোনা হ'ল শুরু। পিপাসা পেলে আশু নিয়ে আসত বাড়ি থেকে জল।

মনে আছে, পূর্ব ফটকের ওপরে ছিল একটা বড় ছাতিম গাছ। আর, পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছিল একটা ঘাট। ও ঘাটটায় বেশী লোক বসত না, তাই ওই ঘাটটা বেছে নিয়ে ওখানে আমরা বসতে শুরু করলাম। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ গান ধরেছে, কেউ অ্যাক্টিং‌ও করছে। বিকেলের দিকে ওদিকটা জনশূন্য হয়ে যেত। পার্কে সকালে বা বিকেলের দিকে লোক বেড়াত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর পার্ক একেবারে জনহীন জায়গা বললেই চলে। পশ্চিম পাড়ে ছিল মেথর বস্তী, আর, দক্ষিণে ছিল বেশ্যালয়। আর খানিকটা খোলা মাঠ—একেবারে হাজরা রোড পর্যন্ত—ওখানে একবার আটচালা বেঁধে পণ্ডিত মশাইয়ের কী একটা সভা হয়েছিল মনে আছে, কী বিষয়ে, তা মনে নেই।

এইভাবে হাজরায় বিকেলটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরি রাত আটটায়। ফুটবলও নেই, জিমনাস্টিকও নেই, রিহার্স্যালও বন্ধ। দেখতে দেখতে একদিন এল বর্ষাকাল। বসে গল্প করছি, হঠাৎ এল বৃষ্টি। অমনি ছুট্-ছুট্। ছুটতে ছুটতে আমরা গিয়ে উঠতাম উত্তর-পশ্চিম কোণে মালীর একটা টিনের ঘর ছিল—লতাপাতায় ঢাকা—সেই ঘরে। বৃষ্টি থামত। আমরাও চলে আসতাম।

বকুলবাগানের রাস্তা যেখানে এসে রসা রোডে মিশেছে, তার বিপরীত দিকে চালাঘর ছিল একটা। ওখানে থাকত কয়েকজন উৎকলবাসী। তাদের মধ্যে ঘনশ্যাম বলে একজন ছিল যে ওখানে একটা দোকান করেছিল। সকালে ফুলুরি-টুলুরি ভাজত, আবার মুড়ি, মোয়া, তিলপাটালীও তৈরি করত। আবার পান-বিড়ি-সিগারেটও রাখত। তার দোকানটি তখন বেশ চলত। ওর দোকানের পিছন দিকে একটা ঘরে বেঞ্চি সে পেতে রাখত—আমরা গিয়ে ওখানে বসতাম—বেগুনী ফুলুরিও খেতাম—বিড়িও খেতাম বসে বসে। ওর ওই ঘরের সামনে দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল একটা ডোবার মধ্যে। ডোবাটা ছিল অদ্ভুত। তার শ্যাওলা দেখা যেত না, কিন্তু জলটা দেখাত সবুজ। এই সময় আমাদের আর এক বন্ধুর কথাও বলা দরকার। খেলার ব্যাপারে আমার আলাপ হয়েছিল প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে—এর ওপরের ভাই সতীশ ঘোষ পড়ত আমাদের সঙ্গে। এই প্রফুল্ল তখন চাকরি নিয়েছিল ওরিয়েন্টাল গ্যাস্ কোম্পানিতে। কর্পোরেশনের পরিদর্শক যেমন ছিল, কোম্পানির পক্ষ থেকেও পরিদর্শক ছিল, যারা বাতির অবস্থা, ঠিক ঠিক চলছে কিনা—কোথায় দোষ হচ্ছে—এসব দেখে বেড়াত। তাদের কর্মক্ষেত্র জোন্-এ ভাগ করা ছিল। কখনো এ-জোনে ডিউটি পড়ছে, কখনো ও-জোনে। প্রফুল্ল ছিল এমনি এক পরিদর্শক। তাই বিকেলে বা সন্ধ্যাতে তাকে আমরা

পেতাম না। তারও তখন ডিউটি পড়ত। এই প্রফুল্লর দেখা মিললে আমরা ভীষণ খুশী হয়ে উঠতাম। কোহিনুর থিয়েটার ১৯১২-তে উঠে যায় অবশ্য, কিন্তু ১৯১০ সাল নাগাত—ঐ প্রফুল্ল গ্যাস-কোম্পানির চাকরি ব্যপদেশে থিয়েটারগুলির এলাকায় ডিউটি দিতে দিতে কী করে যেন কার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কোহিনুরে ঢুকে পড়েছিল। সৈন্য-সামন্তই সে সাজত। কিন্তু, তার ওপরেও তার অন্য একটা বিষয়ে পারদর্শিতা জন্মেছিল। বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন কোহিনুরে তখন ভেলুবাবু বলে এক ভদ্রলোক—নৃত্যশিক্ষক। সে তার কাছ থেকে সুবিধা করে নাচ শিখে নিয়েছিল। তাই নাটকে, বিশেষ করে অপেরায়, যে-সব সমবেত নৃত্য থাকত, যেমন জেলে-জেলেনীদের নৃত্য, ব্যাধ-ব্যাধপত্নীদের নৃত্য, তাতে সে নাচত দলের সঙ্গে। সেইজন্য, থিয়েটার-জগতের বহু কথা আমরা শুনতে পেতাম ঐ প্রফুল্লর কাছ থেকে। যখনই সে আসত আমাদের মধ্যে, আমরা তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসতাম, উন্মুখ হয়ে শুনতাম তার কাছ থেকে থিয়েটারের গল্প। এই প্রফুল্ল ঘোষই উত্তরকালে বাঙলা ও বম্বের ফিল্মজগতের বিখ্যাত পরিচালক হয়েছিলেন, সেকথা অবশ্য যথাসময়ে বিস্তারিত বলব।

যা বলছিলাম। আস্তানা নেই, মহড়াও না, অভিনয়ের আশা নেই, এমন সময় ঘটল একটা ঘটনা। আগেই এক জায়গায় বলেছি, ভবানীপুরের মল্লিক লেনের কথাটা। যেখানে আমি এক সময় জিম্‌ন্যাস্টিক করতে যেতাম ননীলালবাবুর আখড়ায়। ঐ অঞ্চলে থাকত আমাদের রয়্যাল ক্লাবের দুজন বন্ধু—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুরের বিশিষ্ট নাগরিক অবসরপ্রাপ্ত জজ—কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের একজন পৌত্র, একজন দৌহিত্র। রূপচাঁদ মুখার্জি লেনের গায়ে এখন যেখানে ভবানীপুর থানা, তার উল্টোদিকে—একেবারে সামনেই—অর্থাৎ রূপচাঁদ মুখার্জি লেনের মুখ বরাবর বিপরীত ফুটপাতের পূর্ব গায়ে ছিল তাঁর বাড়ি। এই বাড়িরই ঐ প্রবোধ আর বিভূতি একদিন আমাকে এসে বললে,—এই, ননীদা তোকে ডেকেছে। একদিন যাস।

—ননীদা! কেন?

—গেলেই বুঝবি।

গেলাম ননীদার কাছে। ননীদা আমাকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন,—থিয়েটার করবে?

আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম,—কোথায়? কী করে হবে? টাকা কোথায়?

ননীদা বললেন,—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। করবে কি না, বলো?

—করবো তো বটেই। কিন্তু—

বাধা দিয়ে বললেন,—কিন্তুর কিছু নেই। পয়সাকড়ির ভাবনা তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা শুধু রিহার্স্যাল দাও। বীরাষ্টমী উপলক্ষে বীরাষ্টমী উৎসব হবে সেই উৎসবে থিয়েটার হবে। করবে তো?

—নিশ্চয়ই।

কিন্তু, থিয়েটার করতে গেলাম প্রবোধ ও বিভূতির সঙ্গে একা আমিই শেষ পর্যন্ত। আমাদের কাঁসারীপাড়ার গ্রুপ, কিংবা হাজরার গ্রুপ্ ওরা কেউ এল না।

অথচ, অদম্য স্পৃহা অভিনয়ের। না গিয়েও পারলাম না। কিন্তু, কী বই হবে? এযাবৎ নিজেদের ঘরে মহড়া দিয়েছি মাত্র। মহড়া এক, আর অভিনয় আর এক, ভাবনাও হল যথেষ্ট। যেমন উৎসাহ, তেমনি ভয়। ননীদাকে বললাম,—শেখাবে কে?

বললেন,—কেন, ভুজঙ্গদা, কিংবা তিনকড়িদাকে বলব। তাঁরা শেখাবেন?

অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভেবেই পাচ্ছি না, ওঁরা শেষ পর্যন্ত কি সত্যিই সময় করে আমাদের শেখাবেন?

ননীদা বললেন,—না হয়, দেবকে বলবো।

দেব, মানে দেবেশ্বর ভট্টাচার্য। শৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনেতা হিসাবে ভবানীপুরে তখন তাঁর খুবই নামডাক।

এলেন তিনি। তাঁকে দেখলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হল। উনি দেখলাম, আমার খুবই চেনা। আমাদের পুরোহিত মশাইয়ের জ্ঞাতিভাই। মনে হল, বাড়িতে যদি উনি বলে দেন? যদি বলে দেন যে, আমি অভিনয় করছি? যদি বাবা টের পেয়ে যান তাহলে কী হবে?

আমার অন্তরের আতঙ্ক বোধহয় মুখের ভাবে ফুটে উঠে থাকবে। দেবেশ্বরবাবু তা লক্ষ্য করেই সস্নেহে আমাকে কাছে ডেকে নিলেন, বললেন—ভয় পাচ্ছ নাকি?

মৃদুকণ্ঠে বললাম—বাড়িতে যদি জানতে পারে?

উনি একটু হাসলেন, বললেন—না।

অর্থাৎ ভাবভঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন—আমার দিক থেকে কেউ কিছু জানতে পারবে না।

আমি অভয় পেলাম। উনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—কোনো ভয় নেই। লেগে যাও মহড়ায়। দববল নিয়ে এসো।

আগেই বলেছি, কাঁসারীপাড়ার দলও এল না, হাজরার দলও না।

আমার কাঁসারীপাড়ার বন্ধুরা একজোট হয়ে বললে—অতো দূরে যাব না।

হাজরার বন্ধুদের সে ওজর খাটে না। তারা গাঁইগুঁই করে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেল তেমন গা করল না।

আমাদের তিনজনের হল কিন্তু বিপদ। দেবেশ্বরবাবু দলবল নিয়ে আসতে বলেছেন অথচ আমরা তিনজন, অর্থাৎ আমি, বিভূতি আর প্রবোধ ছাড়া লোক কই? দলবল না দেখে, যদি ননীদা বা দেবেশ্বরবাবু থিয়েটার বন্ধ করে দেন? ছোট পার্ট পাই ক্ষতি নেই, কিন্তু থিয়েটারটা

হওয়াই চাই, এই ছিল আমাদের মনোগত অভিপ্রায়। সেইজন্য দলের বন্ধুরা যে আসতে চাইছে না, সে কথাটা বেমালুম চেপে গেলাম, ওঁদের আর তা বললাম না।

তিনজনে রিহার্স্যালে ঠিক যাচ্ছি। কিন্তু 'রাণা প্রতাপ' বই ঠিক হয়েছে, বহুলোক দরকার, কোথায় এত লোক? ওঁরা একদিন ডেকে বললেন—কই হে, তোমাদের দল কই?

'রাণা প্রতাপ'-এ আমাকে দিয়েছিলেন ওঁরা 'ঝালাপতি মানা'র পার্ট, হলদিঘাটের যুদ্ধের আগের একটি ছোট দৃশ্য, তাতে আমার ২।১ বার প্রবেশ ও প্রস্থান ছিল। তাই খুব আগ্রহের সঙ্গে তৈরি করছিলাম পার্টটা। দিনে দু'তিনবার করে আসতাম। সকালে আসতাম, দুপুরে আসতাম খাওয়া-দাওয়ার পরে, আবার সন্ধেবেলায় যতটুকু হয়, ততটুকুর জন্যই। কারণ সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলেই বাড়ি ফিরতে হবে।

কিন্তু 'ঝালাপতি মানা'ই ত 'রাণা প্রতাপ'-এর সব নয়। প্রচুর ভূমিকা। ওঁদের প্রশ্নের উত্তরে অগত্যা বলতেই হলো সত্যি কথাটা। বললাম—ওরা কেউ আসবে না।

ওঁরা কী বুঝে চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ননীদা বললেন, বেশ, ওরা না আসে না আসবে। তোমরাই লেগে যাও।

দেবেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—এরা ত তিনজন রইল, এছাড়া যাকে-যাকে দরকার তুমিই খবর দিয়ে আনাও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, যা ভেবেছিলাম, তাই হল। লোকবলের অভাব দেখে দেববাবু বইটা পাল্টে দিলেন। বললেন—'রিজিয়া' হবে।

—রাণা প্রতাপ হবে না?

—না।

বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমার অতো যত্নের 'ঝালাপতি মানা' শূন্যে মিলিয়ে যাবে!

দেববাবু পিঠ চাপড়ে বললেন—দমে যেও না। 'রিজিয়া'য় তোমাকে ভালো পার্ট দেবো।

দেববাবুর নিজের তৈরি ছিল 'বক্তিয়ার'-এর ভূমিকা। আরও দুচারজনকে নিয়ে এলেন। পুরানোদের মধ্যে ছিলেন ডায়না প্রেসের ম্যানেজার তারকবাবু। তারকচন্দ্র দাস। তাঁকে দেওয়া হল 'পান্নালাল'-এর ভূমিকা। আমি হলাম 'সমরেন্দ্র', প্রবোধ 'বীরেন্দ্র সিংহ', বিভূতি 'বাইরাম খাঁ'।

শুরু হলো রিহার্স্যাল। সারা দুপুর ধরে রীতিমত রিহার্স্যাল চলতে লাগল। তিন-চারখানা 'রিজিয়া' বই কিনে ফেলা হল। দেববাবু প্রথমেই নিজে বইটা আমাদের কাছে পড়ে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ননীদার ক্লাবের ঘরে বসে আমাদের যার যা পার্ট সব টুকে নিতে লাগলাম সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় অবসর বুঝে। অবারিত দ্বার ছিল ননীদার ক্লাবের। তামাক খেতেন প্রায় সকলেই। ক্লাবের ঘরখানায় থেলো হুঁকো-কল্‌কে-গড়গড়া—সব সাজানো থাকত। খেতাম আমরাও। তবে আর লুকিয়ে-লুকিয়ে নয়। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বলতেন,—খাও, খাও, লজ্জা কী?

আমরা তবু একটু সমীহ করতাম। কিন্তু ওঁরা সে ভাবটা রাখতে দিলেন না। বোধহয় গোঁফের রেখা দেখা দিলেই জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের অন্তরঙ্গ করে নিতেন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে' আর কী!

এরপরে, যখন তিনকড়িবাবুর সঙ্গে রিহার্স্যাল দিয়েছি, তখনো বাইরে এসে ধূমপান করেছি, কিন্তু রিহার্স্যালে ডাকবার জন্য বাইরে এসে তিনি যদি দেখতেন আমরা লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছি, অমনি ধমকে উঠতেন, বলতেন—সিগারেট খাস তো, ঘরে বসে খেতে পারিস না? এখন বড়ো হয়েছিস, লজ্জা কিসের? খেতে যখন শিখেইছিস ত, ঘরে বসেই খাবি।

যাই হোক, 'রাণা প্রতাপ' ছিল গদ্য, কিন্তু 'রিজিয়া' পদ্যে, তাই আমাদের নিয়ে দেববাবুকে পরিশ্রম করতে হত ভয়ানক। সকালে দু'তিন ঘণ্টা। দুপুরে তিনি খেতে যেতেন আমরাও যেতাম। কিন্তু খাওয়ার পর তিনি একটু না ঘুমিয়ে নিয়ে আসতে পারতেন না, আমরা কিন্তু খাওয়ার পরই চলে আসতাম। এসে, নিজেরাই শুরু করে দিতাম। আমাদের পক্ষে 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' বলাটা খুবই কঠিন হচ্ছিল, তবে তাঁর যা নির্দেশ, সব আমরা যথাযথ তুলে নিচ্ছিলাম। কোথায় কোন্ ভঙ্গি, কোথায় প্রবেশ, কোথায় প্রস্থান, কীভাবে প্রবেশ, কীভাবে প্রস্থান,—সব নিয়ে খুবই কসরত করছি। আমার স্মরণশক্তি তখন খুবই ছিল, আর অভিনয় নিয়ে ত লেগেই পড়েছি, তাই সব কিছু আয়ত্ত করা, কঠিন হচ্ছিল না আমার পক্ষে। তবে, গলার স্বরটা আমার একটু নরম ছিল। তাই দেববাবু একদিন আমায় বললেন—রোজ সকালে উঠে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে খুব জোরে—গলা ছেড়ে প্র্যাকটিশ করো দেখি!

কথাটা মনে লাগল, কিন্তু কোথায় যাই? শেষে করতাম কী, অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়তাম গড়ের মাঠের দিকে। বাবা একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অত ভোরে উঠে খোকা যায় কোথায়?

মা বললে—ভোরে উঠে বেড়ায়।

ওঁরা জানেন শরীর-চর্চায় আমি খুব মন দিয়েছি। বাবার নিজেরও ভোরে উঠে বেড়ানোর অভ্যাস ছিল, তিনি কথাটায় সেদিন খুশীই হয়েছিলেন সম্ভবত, তাই আর কিছু বলেন নি।

আমি গড়ের মাঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করা শুরু করলাম। ভোরে উঠে বেড়াতে বেড়াতে এই এতদূরে এসে গলা ছেড়ে আবৃত্তি করা, এতে মনটা অদ্ভুতরকম খুশী হয়ে উঠত। এমন কি, শরীরটাও ভালো হয়ে উঠেছিল। শুধু যে আবৃত্তির আনন্দ তা-ই নয় উষাকালের সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর একটা প্রভাব অন্তরটাকে যে এক অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়ে তুলত, সে কথাটাই বা আজ অস্বীকার করি কী করে? উত্তরকালে অভিনেতা হয়েছি, মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের মেলামেশা, প্রতিদিনের কারবার, তবুও প্রকৃতির রূপ—নৈসর্গিক শোভা আমাকে চিরকাল সবার অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, তাই দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে যখনি অবকাশ পেয়েছি, ছুটে

ছুটে বাইরে চলে গেছি। কিন্তু, অন্তরের সেই বিচিত্র অনুভূতির লিপিগুলি এখনো রেখান্বিত করবার সময় আসে নি।

মাঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে করতে এক-এক সময় হঠাৎ থেমে যেতাম। একা—একেবারে একা আমি—অদূরের কুটীরে মেমোরিয়ালের পাহারাদারের দল উঠেছে কি ওঠেনি জানি না, কিন্তু কথাটা তা নয়—ঐ যে একা দাঁড়িয়ে আছি, একাকীত্বের অনুভূতিই আমাকে বুঝি মাঝে মাঝে এমন মূক করে তুলত। সামনে বিস্তৃত গড়ের মাঠ—কেমন কুয়াশা-কুয়াশা দেখাচ্ছে—তার মধ্য থেকে দূরের গাছপালা বাড়িঘরগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে—দেখতে দেখতে মনটা এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরে উঠত। আমার আবৃত্তি শুনে পাছে লোক জড়ো হয়ে যায়, তাই লোকজনের চলাফেরা শুরু হওয়ার আগেই আমার আবৃত্তির পালা শেষ করে ফেলতাম। রাত থাকতে থাকতে গিয়ে পড়তাম মাঠে, বাড়ি যখন ফিরছি তখন নবোদিত সূর্যের রাঙা আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যাই হোক, কিছুদিন এভাবে চলবার পর, দেবেশ্বরবাবু একদিন আমার রিহার্স্যাল শুনে বলে উঠলেন—বাঃ! গলা অনেক পরিষ্কার হয়েছে ত। তিনি নিজে যে কী পরিশ্রম করেছিলেন তা বলার নয়! বেশ কিছুদিন ধরে অবিরাম অবিশ্রান্ত মহড়ার খাটুনি। ফল এই হয়েছিল যে, অভিনয়ের দিন—তাঁর বক্তিয়ারের ভূমিকা—অথচ, তাঁরই গলা ধরে গেল। অবশ্য সেদিকে তত ক্ষোভ নেই, আমার পার্টটা যে তৈরি হয়েছে, এতেই তিনি খুশী। তিনি খুশী হওয়ায় আমিও একটু ভরসা পেলাম, মনে হল স্টেজে ঠিক উতরে যাব, ভাবনার কিছু নেই।

এদিকে স্টেজের ব্যবস্থা সবই হয়ে গেছে। ননীদার ক্লাবের উত্তর সীমানার দিকে হবে স্টেজ। অর্থাৎ যেদিকটায় ছিল ক্লাবের প্যারালাল বার, রোমান রিং, ট্রাপিজ, হোরাইজেন্টাল বার ইত্যাদি। তাই ওসবই ফেলা হলো সরিয়ে। উঁচু পোতা-ওয়ালা দুখানা মাটির ঘর ছিল, ওপরে গোলপাতার ছাউনী, সামনে বারান্দার মতো চওড়া দাওয়া। ঘর দুখানাই ছিল বেশ বড়-বড়। ঠিক হল, দাওয়ার সামনের দিকে চিক ফেলে দেওয়া হবে, তার আড়াল থেকে দাওয়ায় বসে মেয়েরা দেখবেন থিয়েটার। দক্ষিণের দিকে পাঁচিলের ভিতরে কুস্তির আখড়া—লাঠিখেলার জায়গা। অষ্টমীর দিন এখানে লাঠিখেলা, কুস্তি এসব হবে, তার আগের দিন হবে আমাদের 'রিজিয়া'। নবমীর দিন আবার থিয়েটার—অন্যদলের রঘুবীর।

নিজেরাই মিলেমিশে স্টেজের বাঁশ খাটানো, প্লাটফরম তৈরি—এসব করেছিলাম। তারকবাবু সিন-সিনারী নয়, পোশাকের ব্যবস্থা, চুল, সখীর দল, সব—দেখেশুনে কোথায় থেকে যেন ভাড়া করে আনালেন। মোটকথা অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

তারকবাবু আমাকে বললেন—তোমার যে একজোড়া লাল ফুল মোজা চাই।

—লালমোজা!

—হ্যাঁ। তুমি হিন্দু সাজবে, তোমার দরকার হবে লাল ফুল মোজা। আর যারা মুসলমান সাজবে, তাদের দরকার হবে কালো ফুল মোজা।

সেদিন এটাই রেওয়াজ ছিল। রয়্যাল ড্রেস্ ত পরতে হবেই রাজা-রাজড়া-সেনাপতিদের, হাঁটুর নীচে পাজামা চাই, আর সেই পাজামাকে আবার নীচে থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে মোজা দিয়ে। হিন্দুর লাল—মুসলমানের কালো।

অতএব, লুকিয়ে-লুকিয়ে জমানো পয়সা দিয়ে লাল মোজা কিনে এনে রাখলাম বাড়িতে।

থিয়েটারের দিন সকাল থেকে ত স্টেজেই খাটছি। দেববাবুর গলা ধরা। তিনি কখনো নুনজলে কুলি করছেন, কখনো গরম্ জলের ভাপ নিচ্ছেন, বক্তিয়ারের গলা ধরা থাকলে 'রিজিয়া'র সমূহ বিপদ!

বেলা দুপুরের দিকে গড়াতেই আমায় বললেন,—যাও স্নানটান করে খাওয়াদাওয়া সারোগে যাও। একটু বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পর এসো। প্লে সেই যার নাম রাত দশটা। আর এদিকে স্টেজও কম্‌প্লিট্!

চলে এলাম বাড়ি। কিন্তু চান খাওয়া-দাওয়া সারার পর কিছুতেই আর ভালো লাগছিল না বাড়িতে থাকতে। কতক্ষণে যে যাব? কতক্ষণে যে সন্ধ্যা হবে? সে এক নিদারুণ অস্থিরতা!

অবশেষে সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় মা বললেন—একি রে! চুপচাপ বসে আছিস যে বড়? খেলতে যাবি না? বেড়াতে যাবি না?

বললাম—সন্ধ্যের পর বেরুব। ক্লাবে আজ লাঠিখেলা, কুস্তি, এসব আছে। ওখানে নেমন্তন্ন আছে রাত্রে। ওখানেই খাব।

মা বললেন—কিন্তু রাত করবে না বলে দিচ্ছি। বাবু শুনলে বকাবকি করবেন।

উত্তর দিলাম—রাত একটু হবে বই কি আজ!

—সে কী রে!

—বারে, হবে না!—বললাম—খেলা আরম্ভ হতেই ত কত দেরি হবে। তারপরে আছে খাওয়াদাওয়া। রাত একটু হবে। তুমি ভেবো না। মা কিছু আর বললেন না বটে, কিন্তু আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না চুপচাপ বসে থাকতে। যেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাস্তার গ্যাসগুলো একে একে যেই জ্বলে উঠ্‌ছে, আমি আর থাকতে পারলাম না, মোজাজোড়া বগলদাবা করে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

গিয়ে দেখি, চারদিকে সবই তৈরী, লোকজনের বসারও ব্যবস্থা হচ্ছে, সাজঘরে সাজো-সাজো রবও উঠে গেছে। বসবার আয়োজন একটু লক্ষ্য করে, স্টেজের ব্যবস্থা-ট্যবস্থাগুলো একবার একটু দেখে নিয়ে সত্বরই গেলাম সাজঘরে সাজতে। দেববাবুর ধরাগলার জন্য তখনো সমানে তদ্বির চলেছে।

তারকবাবু বললেন—এসেছ? যাও-যাও, রঙ করে নাও।

তখনকার দিনে 'মেক-আপ করা' কেউ বলত না, বলত—রঙ-করা।

তারকবাবু আমার দিকে আরও একবার ভালো করে দৃষ্টিপাত করে বলে উঠলেন—একজন নাপিত বসে আছে, যাও তার কাছে, আগে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে এসো। তারপরে রঙ্ করো। পেশাদারী কি অপেশাদারী, সর্বদলেই তখন নিয়ম ছিল, নাপিত একজন আসবে, সাজবার আগে ক্ষৌরকর্মটা সেরে নিতে হবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—গোঁফ কামাবো না, বাড়িতে টের পাবে গোঁফ কামালে।

গোঁফের কথা অত করে বললেও, আসলে কিন্তু তখন সবে আমার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে মাত্র।

তারকবাবু বললেন—আচ্ছা, তাই করো।

সুতরাং গোঁফটি রেখেই দাড়ি-কামানোর পর্ব শেষ করলাম। এবার রঙ-করার পালা।

যিনি রঙ করবেন, তিনি বললেন—ওখানে সাবান রাখা আছে, বেশ ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে এসো।

তথাস্তু। তাই করলাম। ক্লাব থেকে যে-সব তোয়ালে ঝাড়ন সব কেনা হয়েছিল, সেগুলি দড়িতে টানানো ছিল, তার একটিতে মুছে নিলাম মুখ-হাত। রঙকারী করলেন কী, সাদা গুঁড়ো রঙ আর লাল গুঁড়ো রঙ্ হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে—তাতে একটু জল মিশিয়ে বেশ করে গুলে নিলেন। রঙ্টা হলো ঈষৎ গোলাপী-গোলাপী। সেই গোলাপী রঙ ঘষে ঘষে আমার সারা মুখে, মায় গলা পর্যন্ত, আবার ওদিকে দুহাতে একেবারে কনুই পর্যন্ত লাগিয়ে—ভালো করে মেলাতে লাগলেন। রঙ ক্রমে শুকিয়ে উঠতে একটু জল দিয়ে আবার ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপরে রঙ যখন বেশ শুকিয়ে এল, তখন দিলেন নরম ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে। আমি ততক্ষণে চুপটি করে বসে আছি, যেন কাঠ হয়ে গেছি। যা আমাকে বলছেন, তাই করছি।

—ঘাড় তোলো।

তুল্‌ছি।

—ওদিকে ঘাড় ফেরাও।

ফেরাচ্ছি।

—চোখ বোজো।

বুজ্‌ছি।

—চোখ খোলো।

খুলছি।

চোখ বোজা আর খোলার মধ্যে যদিই বা মুহূর্তের জন্য চোখ পিটপিট করে একটু তাকিয়েছি ত অমনি ধমক।

রঙের পর রুজের বাক্স থেকে ছোট ব্রাশে করে একটু রুজ তুলে গালে কপালে নাসিকায় মিলিয়ে দিতে লাগলেন ভালো করে। কাজল দিয়ে এঁকে দিলেন দুটি চোখ আর ভ্রূ। এমনকি গোঁফের রেখাটি পর্যন্ত দিলেন আরও কালো করে। কপালে দিলেন সিঁদুরের মতো লাল রঙ দিয়ে তিলক কেটে। তার পরে মুখে গলায় হাতের খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে দিলেন পাউডারের প্রলেপ।

সব হয়ে গেলে বললেন—মুখে চোখে হাত দিও না যেন। চুলকিও না পর্যন্ত। বুঝলে ?

আমার যেন ঠিক তখ্‌খুনি গালের পাশটা চুলকাতে লাগল। রঙ্‌কারী ছোট্ট একটা পুঁটলি থেকে একটু অভ্রের গুঁড়ো নিয়ে মুখে থুবে থুবে দিয়ে বললেন—বেশ হয়েছে। যাও।

ততক্ষণে আমার ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছিল। বললাম—কী করি এখন ?

বললেন—একটা পায়রার পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দাও।

তাতে আর সুরাহা হবে কতটুকু ? কী ভেবে খপ্ করে আয়নাটা ধরলাম মুখের সামনে। নিজের মুখখানা দেখতে দেখতে সুড়সুড়ির কথাটা আর মনেই রইল না। ভাবলাম বাঃ। এত সুন্দর দেখতে লাগছে আমাকে !

বেশকারী যিনি, তিনি ততক্ষণে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চারিদিকে বড় বড় সব স্টীলের ট্রাঙ্ক ছড়ানো, কতগুলো ছোট-ছোট ছেলে সখী সেজে বসে আছে ঐ সব ট্রাঙ্কের ওপরে। কিন্তু ওদের তিনি বলছেন না কিছুই। কেননা, যাঁরা পোশাক দিচ্ছেন, তাদেরই ভাড়া করে আনা ঐ ছেলেগুলি। অর্থাৎ নিজেদেরই দলের লোক, বসতে দিতে সুতরাং আপত্তি হবে কেন ?

আমি আমার সেই লালমোজা পরে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি ত রয়েছিই। ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। অবশেষে নিজেই একটু ঢোক গিলে বলে উঠলাম—পোশাক ? আমাকে পোশাক পরিয়ে দিন ?

বেশকারী মুখ ফেরালেন আমার দিকে। বললেন—কী আপনি ?

একটু থতমত খেয়ে তারপরে বললাম—সমরেন্দ্র।

আমাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে নিয়ে বললেন—হাফ্‌প্যাণ্ট পরে আসেন নি কেন ?

বললাম—কেউ ত বলে নি ! তাই কাপড় পরে এসেছি।

বললেন—তাহলে এক কাজ করুন। বেশ করে মালকোঁচা এঁটে কাপড়টা পরুন, যেন ফুলে ফেঁপে না থাকে।

যথানির্দেশ। তাই করলাম। ভালো করে আমার পরাটা পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বললেন—ঐ পোশাকটা আছে, পরুন।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার চতুর্দিকেই মাথার ওপর আশপাশ দিয়ে দড়ি খাটানো, তাতে ঝুলছে সারি সারি সব পোশাক। যে পোশাকটা দেখিয়ে দিলেন, সেটা পেড়ে নিয়ে দেখলাম, ওটা ভেলভেটের চুমকি-দেওয়া একটা নিকারবোকার, আর লম্বা একটা চাপকানের মতো জামা। ‘নিকারবোকার’ কথাটা ব্যবহার করছি এইজন্য যে তখনকার দিনে ঐ জাতীয় যে-সব প্যাণ্ট থাকতো

ছোট ছেলেদের, সেটা থাকত হাঁটুর নীচে অবধি, তাতে বগলস দিয়ে আঁটা থাকত। সাহেবরা যে ব্রিচেস পরত তখন গলফ্ খেলার সময়, ওটা ছিল ঠিক সেই রকমটি দেখতে। যাই হোক, কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে 'নিকারবোকার'টা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। অর্ধেকটা ভেলভেট, আর কোমর থেকে নীচের খানিকটা ছিট বা টিকিনের তৈরী, যাতে বালিশের খোল তৈরি হয়। কোমরের কাছে কুঁচি দিয়ে তাকিয়ার ওয়াড়ের মতো ফিতে গলানো, তার মানে ফিতেটা ধরে টেনে কুঁচিয়ে নিয়ে ওটা কোমরে বাঁধতে হবে।

পরলাম। তারপরে, চাপকান-পরার পালা। চাপকানের হাত দুটো কোটের হাতার মতো, দু'তিন রঙের ভেলভেট, তার ওপর সল্মা চুমকির কাজ করা। কোমর থেকে কুঁচি দেওয়া ঢিলে ঘাঘরার মতো এসে হাঁটু পর্যন্ত পড়েছে। কেবল জামার ভিতরে টিকিনের আস্তর দেওয়া। গলাটা প্রায় আধ ইঞ্চি ভেলভেটেরই কলার দেওয়া। আমি জামাটা যেই পরেছি, অমনি দেখি সেই সখীর দল চাপা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। একজন বললে—দেখ ভাই, লোকটা জামা পরতে জানে না। উল্টো পরেছে।

আমি জানতাম, জামার সামনের দিকেই বোতাম হয়। সেভাবেই পরেছিলাম। পরামাত্রই অবশ্য মনে হচ্ছিল, বুকে যে-সব জরির কাজ করা ঝলমলে সব নক্শা দেখছিলাম, সেগুলি গেল কোথায়! বোতামের দিকে ত কোনো নক্শা নেই!

ওদের হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি খুলে ফেললাম জামা। ও হরি, জরির নক্শাগুলো দেখছি রয়েছে পিছনে! বুঝলাম, ঐ পিছনের দিকটাই সামনের দিক হবে। বোতাম যাবে পিঠের দিকে।

এবার আর ভুল হল না। কিন্তু জামা পরার পরও মুশকিল হয়েছে এই যে, জামার হাতার তুলনায় আমার হাত দুটো একটু বড়, তাই ছোট হয়েছে হাতাদুটো। কী করি?

বেশকারী-মশায়ের গলায় ঝুলছিল সেপ্টিপিনের মালা-গাঁথা দু' তিনটে ফেটি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কলার আর কাফ্ আনেন নি?

অবাক হয়ে তাকালাম লোকটির মুখের দিকে। কলার আর কাফ্ আবার কী?

সে বললে—গলায় পরে কলার, আর হাতের কব্জিতে কাফ্! আনেন নি?

—না!

—তাহলে কী হবে?

তারপরে, আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে—জুতো আনেন নি?

—জুতো!

—হ্যাঁ, পরবেন কী?

বললাম—কেউ ত বলেনি ওসব আনতে।

—বলবে আবার কী ! থিয়েটার করছেন আর এসব জানেন না !

তাচ্ছিল্যের স্বরে কথাটা বলে, একটু থেমে, তারপরে আরও তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বললে—ঐ ওখানে প্রিজারভার রাখা আছে গাদা করা, ওর থেকেই একটা নিয়ে আসুন। এনে ওরই একজোড়া পরুন, আর করবেন কী !

'প্রিজারভার' ব্যাপারটা হচ্ছে তখনকার দিনে সাহেবরা মোজার আয়ুরক্ষার জন্য মোজার ওপরে জিনের তৈরী জুতোর আকারেরই একটি জিনিস পায়ে দিয়ে পায়ের পাতাটা ঢাকত, যাকে বলত স্টকিং প্রিজারভার। থিয়েটারের প্রিজারভার হতো কিন্তু ভেলভেটের তৈরী। সল্মা-চুমকির কাজ করা। একটা বেছে নিয়ে পরলাম বটে, সেটা আবার দেখি গোড়ালির কাছে কাটা। বেশকারী সেপ্‌টিপিন দিয়ে ওটা আবার ঠিক করে দিলেন। মোটকথা জুতোর বদলে ঐ 'প্রিজারভার' দিয়েই সমরেন্দ্রের সেযাত্রা মান রক্ষা হয়েছিল। আর 'কলার আর কাফ্‌'-এর অভাব ? ঐ সেপ্‌টিপিন দিয়ে এঁটে নিয়ে কোনরকমে কাজ চালানো গোছের করে দিয়েছিলেন বেশকারী। তারপরে, কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে ভেলভেটের বেল্ট এঁটে দিলেন। পিছনে দিলেন ঝুলিয়ে ছোট একটি পৃষ্ঠ-বস্ত্র সেপ্‌টিপিন দিয়ে এঁটে। তখনকার দিনে ওকে বলত—হাফ টেল্। রাজাদের দেওয়া হত—ফুল টেল্—যা পায়ের নীচে পর্যন্ত লোটাত।

বেশকারী বললেন—এবার পাগড়ি পরাবো, চুলটা পরে আসুন।

ঘরের এককোণে চুলওয়ালা বসে আছেন একটি চেয়ারে—সামনে অনুরূপ একটি ট্রাঙ্কে চুল সাজিয়ে। সামনে যেতেই তিনি সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন—কী ?

—সমরেন্দ্র।

—সামনের চেয়ারটায় বসুন।

আমি বসামাত্র তিনি কালো কোঁকড়ানো একটি বাবরী চুল আমার মাথার ওপর বসিয়ে দিলেন, তারপরে কপালের ওপর নিজের খুতনিটা দিয়ে চেপে ধরে পিছনে—ঘাড়ের দুদিক থেকে টেনে এমনি করে বসিয়ে দিলেন যে, চমৎকার মাথায় আট্‌কে গেল। আমাকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিয়ে মন্তব্য করলেন—বেশ হয়েছে।

তাড়াতাড়ি আয়না টেনে নিয়ে মুখখানা দেখে মনে হল সত্যিই বেশ হয়েছে। কিন্তু চুলটাতে বড় নারকেল তেল জবজব করছে, গন্ধ বেরুচ্ছে নারকেল তেলের কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতে লাগল। অথচ, উপায় ত নেই।

বেশকারী কিন্তু পাগড়ি পরালেন না, সোলার ওপরে সিল্ক-ভেলভেট দিয়ে দিয়ে মোড়া একটা পাগড়ি—"শিরপ্যাঁচের" মতো সামনে জরির চুড়ো দেওয়া—তার ওপর পালক বসানো—সেটা আমার মাথায় দিলেন পরিয়ে। পরাবার পর বললেন—যাও, সব হয়ে গেছে।

সব হলেও আমার দৃষ্টি কিন্তু তাঁর গলায় ঝোলানো সেপ্‌টিপিনের মালার দিকে। ঐ

সেপ্‌টিপিনের কারসাজিতে কী না হচ্ছে! আমার পায়ের ব্রিজারভার-এর গোড়ালির দিকটা কাটা, এলো ঐ সেপ্‌টিপিন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কাটা কেন? উত্তর আসবে, কাটা থাকাই নিয়ম যে! একে বল্‌ত, কাটা পোশাক। রোগা-মোটা সবারই এক জিনিস। যে মোটা, তার বেলায় পোশাক করে দেবে ঢিলে, যে রোগা, তার বেলায় সেপ্‌টিপিন দিয়ে এঁটে ছোট করে দেবে। আর, ঐ যে বলেছি, প্যাণ্টের ওপরটা টিকিন দিয়ে তৈরী, ওর অর্থ হল খরচ বাঁচানো। কারণ, ও অংশটুকু ত চাপকানেই ঢাকা পড়ে যাবে! তখনকার দিনে অঢেল বাজে খরচের দিকে লোকের মন ছিল না, হিসেব-নিকেশ করে কাজ করতেন তাঁরা।

স্টেজে গিয়ে 'বীরেন্দ্র সিংহ'রূপী প্রবোধকে দেখি, গলায় ওর মুক্তার মালা, মুক্তার কণ্ঠি, জামায় কলারও আছে, বেশ জমকালোই দেখাচ্ছে ওর পোশাক! বক্তিয়ার, বয়রম, পান্নালাল, মালবরাজ— সবারই গলায় কণ্ঠি আর মালা, শুধু আমারই নেই! ছুটে গেলাম বেশকারীর কাছে। তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে বললেন—আগে বলোনি কেন! এত সখী সাজালাম, রাজা সাজালাম, সব ফুরিয়ে গেছে।

ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরে এলাম স্টেজের দিকে। ভাবছিলাম, ওরা পোশাক আশাকের ব্যাপার সব জানত, আমাকে কিছু কেউ শেখায় নি, বোধ হয় বেশকারীদের কিছু বকসিস দিলে পোশাক আর গয়না পাওয়া যেতো, কে জানে! হাতটা খালি লাগছে, গলাটা খালি লাগছে, এ যেন কেমন-কেমন হল। কী আর করি? পকেট থেকে পার্টটা বার করে একটু পড়ে নিই বরং। বার করতে যাচ্ছি, ঢং করে একটা ঘণ্টা পড়ে গেল। এইবার কনসার্ট শুরু হবে।

প্রথম অভিনয়-রাত্রির উত্তেজনা, পার্ট আর বার করা হল না। পার্ট অবশ্য সবই আমার ঝাড়া মুখস্থ, না দেখলেও চলবে।

স্টেজ ত নিজেরাই তৈরি করেছি। বাঁশের মাচার ওপরে তক্তা পাতা, তার ওপরে শতরঞ্জি বিছানো। স্টেজের আলো হচ্ছে সেই আগের দিনের কারবাইডের অ্যাসিটিলিন গ্যাস, যে আলো একবার জ্বালালে আর নিভানো মুশকিল। ফুটলাইট বা পাশের লাইটও তাই। নেবালে প্রত্যেকটিই আবার দেশলাই ধরিয়ে জ্বালাতে হবে। সে এক অসুবিধার ব্যাপার। তাই আলো সর্বক্ষণই জ্বলত পাঞ্চ্‌লাইট, সেগুলি কখনো নেভানো হত না। কারণ যে বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো বা অন্য আলো নেই, সে বাড়িতে ঐ পাঞ্চ্‌লাইটই ভরসা, অন্ধকার হলে কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে, কে জানে! আর স্টেজে, প্রম্‌টার হুইসিল দিলে যেমন সিন পাল্টাতে হত, তেমনি দ্বিতীয় হুইসিল পড়ত না আলো জ্বালাবার নির্দেশ দেবার জন্য। ঐ এক হুইসিলেই কাজ হত। সিন্‌গুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হত বাঁশের কাঠামো করে। ভিতরের দৃশ্যপটগুলি কপিকলের মধ্য দিয়ে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় গুটিয়ে-গুটিয়ে উঠত আর নামত। আর সিনগুলির পাশের উইংস্‌ বা পার্শ্ব পটগুলিতে ছিল মাঝখান দিয়ে একটা করে বাড়তি রঙ-করা কাপড় জোড়া, এই কাপড়ের দুদিকেই আঁটা থাকত দুই রকম ছবি।

বসে :
প্রবোধ গুহ ও গণদেব গাঙ্গুলী
দাঁড়িয়ে :
অহীন্দ্র চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জী
(১৯২৩ সাল)

বসে : হেম মুখার্জী ও
মিঃ ম্যাক্‌হেনরী
দাঁড়িয়ে : অহীন্দ্রবাবু ও
প্রফুল্ল ঘোষ
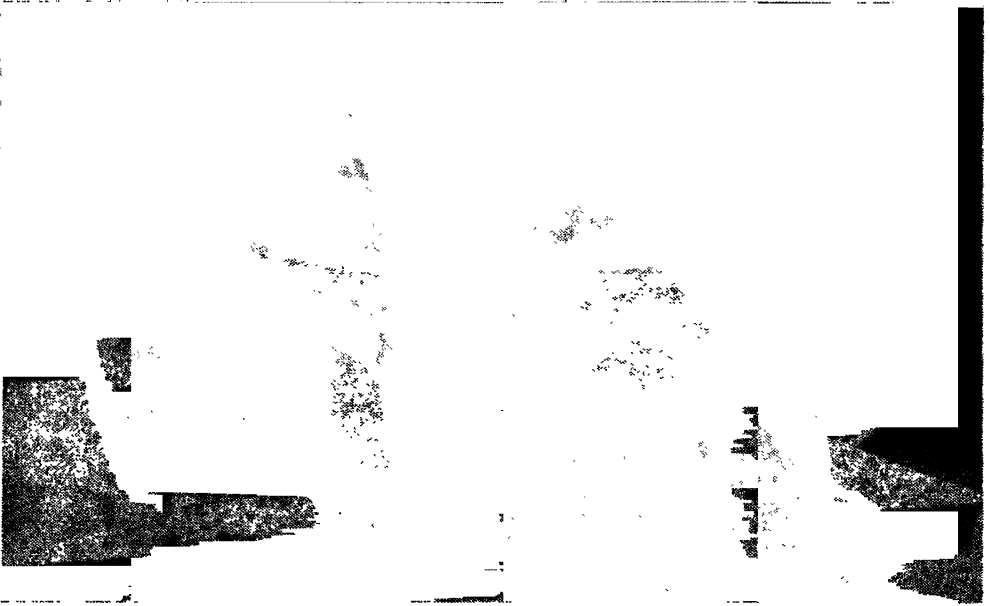
'Soul of a Slave' ছায়াচিত্রে : মিসেস্ উইলিসন্ উইর্থ ও অহীন্দ্র চৌধুরী

'ঋষির মেয়ে' নাটকে : অহীন্দ্রবাবু (তাঁর স্কন্ধে নীহারবালা),
বৃক্ষদণ্ডে রজ্জু-আবদ্ধ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিকে হয়ত প্রাসাদের থাম, অন্যদিকে অরণ্যের বনস্পতি। কাপড়টার দুই প্রান্ত আটকানো থাকত দুটো রঙিন সুতোতে। পার্শ্বপটের মাথার ওপরকার হুকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে সেই সুতোর প্রান্ত থাকত নীচের কাঠের পাশের পেরেকের সঙ্গে জড়ানো। প্রয়োজনমতো ঐ সুতোর সাহায্যে কাপড়টা ফেলে দিয়ে কখনো সেটা হয়ত প্রাসাদের স্তম্ভ হচ্ছে, কখনো বা হচ্ছে বনস্পতি। আসল উইঙ্‌স্‌টা তাহলে দেখা যাচ্ছে—দুভাগে ভাগ করা—ওপরটায় হয়ত স্তম্ভ আঁকা, নীচেরটায়—অরণ্য। মাঝখানের ঐ জোড়াটা শুধু প্রয়োজনমতো একবার স্তম্ভটিকে ঢাকছে, অন্যবার অরণ্যকে। কিন্তু রঙিন সুতোর সাহায্যে এই যে পার্শ্বপটের চেহারার পরিবর্তন, এতে কিছু সময় লাগত। প্রাসাদ শেষ হয়ে হয়ত অরণ্যের দৃশ্যপট পড়ে গেছে মঞ্চে। অভিনেতারাও মঞ্চপ্রবেশ করেছেন, অভিনয়ও শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তখনো পার্শ্বপটের দৃশ্য বদল চলেছে, প্রাসাদ-স্তম্ভ তখনও হয়ত পুরোপুরি বনস্পতিতে পর্যবসিত হয়নি। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়? 'হের এই নিবিড় বনানী' বলতে অভিনেতাদের মুখে একটুও আটকাল না।

এসব ত আগে থাকতেই দেখা ছিল, নিজেদের বেলা কী হয়, কে জানে! প্রম্পটার বললেন—স্টেজের ডানদিকে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন বলে দেবো, তখন ঢুকবে।

যথা আজ্ঞা। দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। দ্বিতীয় কনসার্ট শুরু হয়ে এক সময় শেষও হল, পড়ল প্রম্পটারের হুইসিল, ড্রপসিন গুটিয়ে ওপরে উঠে গেল। 'পান্নালাল'-বেশী তারকবাবু মঞ্চপ্রবেশ করলেন। আমি উইঙ্‌সের পাশ থেকে দেখছি, ওরে বাপ্, সব কালো কালো মাথা—কী অসম্ভব জনতার সমাবেশ! পুজোর সময়কার কথা। খোলা জায়গায় অভিনয়, খুব গরমও তখন ছিল না। তবু আমি ঘামতে আরম্ভ করলাম। জীবনের প্রথম মঞ্চপ্রবেশ, বহু দিনের আশা সার্থক হতে চলেছে, তবু কেমন যেন আনন্দে ভরে উঠছি না, কী এক নিরাশা এসে বুকে চেপে বসে গেছে। সকলের হাতে রুমাল, আমার হাতে নেই। আমাকে কেউ কিছু আনতেও বলেনি। তা ছাড়া গলাটা খালি—হাতটাও—

চমকে উঠলাম, দর্শক দলের মধ্যে একটা হাসির হল্লোড়ের শব্দ শুনে। তারকবাবু ভালো অভিনয়ই করছেন। একটু পরে প্রথম নাগরিকের প্রবেশ। তার পরে দ্বিতীয় নাগরিক। নাকী-সুরে কথা বলা। দর্শক বেশ হাসি উপভোগ করছে। আমার মনে হল, এঁরা ত বেশ অভিনয় করছেন মঞ্চে নেমে, আমার কী হবে? পারব ত?

কিছুক্ষণ পরে প্রম্পটারের হুইসিল। এবার দ্বিতীয় দৃশ্য। ইন্দিরা ও তার সখী মাধবিকা। ঐ ক্লাবেরই একটি ছেলে হয়েছিল ইন্দিরা। ছেলেটি জিমনাস্টিক, লাঠিখেলা এ সব শিখত। খুব সুন্দর দেখতে, যেমন চোখ, নাক, তেমনি গৌর গায়ের বর্ণ। নাম—মাখন। মাখনকে এমন সুন্দর সাজিয়েছে যে, ছেলে বলে চেনাই যায় না! আমি ত অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলাম—তার রূপসুধা পান করতে লাগলাম বলা যায়। দৃশ্যটি ছোট, চট্ করে শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী দৃশ্যে

সখীর দল সার বেঁধে কোমরে গাগরী নিয়ে ঢুকল, শুরু হল তাদের নাচ আর গান। এই দৃশ্যেই আমাকে প্রবেশ করতে হবে।

পার্টটা? পার্টটা কি একবার বার করে পড়ে নেবো? কিছুক্ষণ আগেও মনে মনে স্মরণ করছিলাম কথাগুলি! কিন্তু এখন, প্রবেশ করবার মুহূর্তে—এ কী হল! একটি বাক্যও মনে পড়ছে না—একটি শব্দও না—কী গিয়ে বলবার কথা আমার প্রথমে? কী সে কথা?—কী কথা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হবে আমার জিহ্বায়! সর্বনাশ! কিছুই যে মনে পড়ছে না! প্রম্পটারকে কি জিজ্ঞাসা করব পাশের উইংস্‌-এ গিয়ে? যদি তিনি রেগে গিয়ে ধমকে ওঠেন? এদিকে নীচের পকেট থেকে খুঁজে পেতে পার্ট বার করারও যে সময় নেই? কী করি!

চাপাস্বরে প্রম্পটার চীৎকার করছেন—সমরেন্দ্র! সমরেন্দ্র!

আর সমরেন্দ্র! সমরেন্দ্র ততক্ষণে বাক্যহারা—কথাহারা—বেপথুমান!

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছি। প্রম্পটার তাঁর উইংস্‌ থেকে উঠে আমার উইংসে এসে আমাকে করলেন কী, পিছন থেকে মারলেন এক ধাক্কা। মুহূর্তমাত্র! সামনে তাকিয়ে দেখি—কালো কালো অসংখ্য মাথা—যেন জনসমুদ্র! আর তার পরেই মনে হল, চারিদিকের সব আলো বুঝি নিভে যাচ্ছে—কুয়াশার মত ঝাপসা যেন দেখাচ্ছে চারিদিক! আর এক অত্যদ্ভুত বাক্যহীনতার স্রোতে আমি যেন ভেসে চলেছি—অতি ভীষণ, অতি নিষ্ঠুর, অতি দুঃসহ, সেদিনকার সেই মৌন মুহূর্তটুকু!

তিন

১৯১২—১৯১৬

পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর সামনে হতবাক দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পরমুহূর্তে কানে এলো স্মারকের চাপা কণ্ঠস্বর, "একে একে খুঁজিলাম সমগ্র ভারতে—একে একে খুঁজিলাম সমগ্র ভারতে—"

চমকে উঠল ভিতরটা, মনে হলো, কার কথা ভেসে আসছে কানে? এ ত সমরেন্দ্রর কথা! কী আশ্চর্য, আমিই ত সমরেন্দ্র! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সব! আমার মুখস্থ-করা কথাগুলি জেগে উঠল স্মরণে! দেবেশ্বরবাবু শিখিয়ে দিয়েছিলেন—খুব চিন্তিতভাবে মঞ্চ-প্রবেশ করবে।

অথচ, চিন্তিতভাবে মঞ্চ-প্রবেশ করা ত আমার হয়নি! আমি ত ধাক্কা খেয়ে মঞ্চ-প্রবেশ করেছি!

চিন্তিত ভাব প্রকাশ করার যে ভঙ্গি তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটা গালে দিয়ে ডান হাতটা বুকের কাছে রেখে বলতে লাগলাম—

একে একে খুঁজিলাম সমগ্র ভারতে
যত নগর-নগরী আছে ; ইন্দিরার
না হলো সন্ধান। অকাতরে ঢালিলাম
অর্থরাশি, সহিলাম এত ক্লেশ, সব বৃথা।

স্বগতোক্তি ছিল বেশ খানিকটা। তার মধ্যে বিরতিও ছিল, পরিক্রমণ ছিল, আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও ছিল। সবই করে গেলাম, কিন্তু মনে হলো, করে গেলাম যেন একেবারে পুতুলের মতো। নাটকীয় ক্রিয়া কী যে হলো, কী যে না হলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। মঞ্চে এসে দাঁড়ালো সহকারী সেনাপতি রণজিৎ, তার সঙ্গে কথোপকথন। তারপরে, তার প্রস্থানের পর, আবার আমার কিঞ্চিৎ স্বগতোক্তি ছিল :—

প্রায়শ্চিত্ত হলো না কি তবুও জননি ?
স্বয়ম্ভু-ঘরণি !
দেখি, দেবি ! কতো কষ্ট দিতে পারো আর !

বলে প্রস্থান করলাম। কিন্তু মনটা ভরে আছে অস্থিরতায়, কথাগুলি বলেছি সবই ঠিক ; কিন্তু মাত্র বলাটাই ত অভিনয়ের সব কথা নয়, ঠিকভাবে বলতে পেরেছি কি না, সঙ্গে সঙ্গে ভাব-ভঙ্গি ঠিক ছিল কিনা, এসবও বিচার্য। এসব কি ঠিক হয়েছে ? কে জানে !

পরবর্তী দৃশ্যে আমার উপস্থিতি নেই। আছে সখিদের নৃত্য গীত, ইন্দিরা আর বীরেন্দ্র সিংহের কথোপকথন। তার পরের দৃশ্যে আবার আমার পার্ট—রণজিতের সঙ্গে। কিন্তু, আমার তখন বুক টিপটিপ করছে, পোশাক ছেড়ে ফেলে রেখে বাড়ি পালিয়ে যাবো নাকি ? স্টেজের আশেপাশেই ত ছিলাম, প্রম্পটার দেখতে পেয়ে বললেন—সরে যেও না যেন, পরের সিনে তোমার আছে।

এলো পরের সিন। দর্শকের মুখ আর চাহনি দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি, আমার ও রণজিতের কথোপকথন ভালোই হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য, নিজে কোনো অনুভূতি পেলাম না। দৃশ্যশেষে যবনিকা পড়ে গেল। অঙ্ক-শেষের কনসার্টও বেজে উঠল। আমি আর মঞ্চে না থেকে সাজঘরে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠল যবনিকা, রিজিয়ার দরবার-দৃশ্য, বহু লোক এই দৃশ্যে। আমি গুটিগুটি প্রম্পটারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু দেখব কী ? মনের মধ্যে তখন বিশেষ তোলপাড় চলেছে। কারণ, পরের দৃশ্যটিতে আবার আমার প্রবেশ আছে, ইন্দিরার সঙ্গে আবার মিলিত হবো, খুবই আবেগপূর্ণ দৃশ্য। মনে হতে লাগল, আমার আজকের অভিনয়ে এইটাই হচ্ছে পরীক্ষার চরম স্থল, সঙ্কট মুহূর্তও বটে।

এলো সেই দৃশ্য। ইন্দিরার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র, ইন্দিরা তার সম্ভাষণ শুরু করল। তার উত্তরে আমিও বলে উঠলাম আমার কথা,—

'শোভনা ইন্দিরা ! আসি নাই ক্ষুদ্র প্রয়োজনে,
ছদ্মবেশে সুদূর সৌরাষ্ট্র হ'তে
বিপদসঙ্কুল এই রাজধানী মাঝে।' ইত্যাদি।

তারপরে হলো কী, ইন্দিরাকে কটু কথা বলে বিদায় নিচ্ছি, বলছি—

'আসিয়াছি জিজ্ঞাসিতে শুধু সৌরাষ্ট্র-তনয়া !
তোমারে কি সাজে ঘৃণিত এ কলঙ্কিনী অপবাদ !'

অমনি দর্শকদলে চড়বড় করে করতালি পড়ে গেল। একটু চমকে উঠলাম। লোকে প্রশংসাসূচক করতালি দিলো, না কোনো ত্রুটি হলো দেখে, ব্যঙ্গ করলো ? একটু বিচলিত বোধ করলাম। তার ফল হলো এই যে, ইন্দিরার বক্তৃতার পর আমার আবার যে সামান্য উত্তেজক কথাগুলি ছিল, সেগুলি বলতে গিয়ে যেন মিইয়ে গেলাম। তৃতীয় অঙ্কে আমার মঞ্চ-প্রবেশ ছিল না। দীর্ঘ সময়। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, কীরকম হলো ? ভালো, না, মন্দ ?

আমার বসে-থাকার ধরন কোনো কোনো অভিনেতার হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। দু'একজন কাছে এসে বলে গেলেন—বেশ হয়েছে হে, বেশ হয়েছে।

আমি উঠে একেবারে দেবেশ্বরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম চুপটি করে। উনি আমাকে দেখে আমার মনের ভাব বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, বললেন—বেশ হয়েছে। এমনি ভাবেই করে যাও।

তারপরে যে দুটো দৃশ্য আমার ছিল, করে গেলাম, মোটামুটি ভালোই মনে হলো। এর মধ্যে দুবার বেশ-পরিবর্তন ছিল, বেশকারী সাজিয়েও দিয়েছিলেন ভালো।

তারপরে, অভিনয় শেষ। পোশাক ছেড়ে রঙ ভালো করে তুলতে গেলাম। অনেক ভিড়, সবাই রঙ তুলতে ব্যস্ত। অল্প আলো। ভালো দেখতেও পাচ্ছি না, রঙ একেবারে উঠে গেল কিনা, শেষে তেলেও কম পড়ে গেল। মনটা কিন্তু সেই থেকে খুঁতখুঁত করছে—কিছুই ভালো লাগছে না। দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন হলো আমার ?

—বেশ হয়েছে।

একে একে প্রায় সবাই চলে গেলেন।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, উঠোনে দাঁড়িয়ে ননীদা পরের দিনের খেলাধূলোর জন্য বাঁশ খুঁটি লাগানোর ব্যবস্থা করছেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ধীর পায়ে। বললাম—আমার কেমন হলো ?

আমার দিকে মুখ ফেরালেন ননীদা, আমাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে তারপরে উৎসাহভরেই বলে উঠলেন—বেশ হয়েছে।

আমার খুসী হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু মনে হলো, উনি কর্মব্যস্ত মানুষ, সকল দিকের ভার ওঁর ওপর, উনি কি আমার অভিনয় দেখবার অবকাশ পেয়েছেন ? হয়ত আমাকে উৎসাহিত করবার জন্যই বলে উঠলেন—বেশ হয়েছে।

রাত্রি তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর। সেই নির্জন রসা রোডের ওপর পা ফেলে বাড়ির দিকে চলেছি। মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে আছে। যা-যা শিখেছিলাম তার যেন কিছুই করতে পারলাম না, কী যেন খুঁত রয়ে গেল, কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেল। অথচ কী যে সে খুঁত, কী যে সে গোলমাল তা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। খুঁত অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু কেন যে হয়েছিল সেটা আমার অস্থির মনকে আমি সেদিন কিছুতেই বোঝাতে পারিনি।

বাড়ি পৌঁছলাম এইসব ভাবতে ভাবতে। এখানে জানিয়ে রাখি, এ বাড়িটা আমাদের চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়ি নয়, সেটা ত্যাগ করেছি—এটা কেদার বসু লেনের ভাড়াটে বাড়ি। বাড়ির গেট বন্ধ। এত রাত্রে ডাকাডাকি করলে বাবা টের পেয়ে যাবেন। মাও বকবেন এত দেরি করে ফেরার জন্য। অতএব, গেটটা টপকাতে হলো। তারপরে পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠলাম। শোবার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দেখি, দালানের দরজা বন্ধ। কাজেই বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপরে পা তুলে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বইতে শুরু করল ভোরের হাওয়া। সেই ঝিরঝিরে কোমল হাওয়ায় কখন যে ঐভাবে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা নিজেরই খেয়াল নেই।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি, রোদ উঠে গেছে, বাড়ির লোকজন কাজকর্মে লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি উ ঠে, মুখচোখ ধুয়ে মার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি, মার মুখখানা থমথম করছে—গম্ভীর। আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—খোকা, কাল রাত্রে থিয়েটার করে এলি তুই?

আমি ত পড়লাম আকাশ থেকে! এর মধ্যে বাড়িতে খবর পৌঁছে গেল কী করে? কথাটা অস্বীকারও করতে পারি না। সংক্ষেপে প্রশ্ন করলাম—কে বললে?

—কে আবার! তোমার বাবা।

অ্যাঁ! রীতিমত চমকে উঠলাম এবার। বাবা কি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন নাকি? সর্বনাশ!

মার কথায় বুঝলাম, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বাবা রোজই ত প্রাতর্ভ্রমণে যান। আজও বেরুবার সময় আমাকে ওভাবে ঘুমুতে দেখে চমকে গিয়েছিলেন। খোকা ভোরে উঠে বেড়াতে যায়, এখনো ওভাবে ঘুমুচ্ছে কেন? কাছে এসে দেখতে পেলেন, আমার মুখে-হাতে জায়গায় জায়গায় তখনো রঙ লেগে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন সমস্ত ব্যাপারটা।

মা বললেন—উনি বলেছেন তোমাকে বলতে যে, যদি ঐসব থিয়েটার-ফিয়েটার করো, ত তোমার বাড়িতে থাকা হবে না। তোমাকে আজ থেকে লেখাপড়া করতে হবে। এবং আজ থেকে তোমার বিকেলে বাইরে যাওয়া নিষেধ।

বকা-ঝকা করে মা ত চলে গেলেন নিজের কাজে। আমার মনটা খুব দমে গেল। সারারাত্রির পরিশ্রম, অনাহার, তার ওপর মনের উদ্বেগ ত আছেই। এর ওপরে 'বিকেলে বাইরে যাওয়া নিষেধ'! আঘাতও পেলাম মনে। কিন্তু, কিছু বললাম না, চুপচাপ যে-চেয়ারটায় বসেছিলাম, সেই চেয়ারটিতে এসে বসলাম।

অবশ্য বাড়ির অবাধ্য হইনি। যথানির্দেশে চলতে লাগলাম। প্রাতর্ভ্রমণের বাধা ছিল না, কিন্তু মনের ঐ শোচনীয় অবস্থার জন্য কয়েকদিন যাবৎ আমি বাড়ির বাইরে একেবারেই বার হলাম না। অথচ, লেখাপড়া শুরু করবার আয়োজনও করলাম না। চুপচাপ বাড়িতে বসে বন্দী হয়ে রইলাম।

ক্রমে ক্রমে খবরটা কী করে যেন আমার মাতামহের কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি বলে পাঠালেন—এরকম জেলখানার মতো ছেলে বন্দী করে ছেলে শাসন হয় না। আমি যাচ্ছি।

দিন কয়েকের মধ্যে সত্যি সত্যি তিনি এসে উপস্থিত হলেন। বললেন—আমি ওকে ফুলের বাগান করা শেখাবো।

দেখতে-দেখতে এসে গেল বাগান তৈরির সব সাজ-সরঞ্জাম। দু'চার গাড়ি ইঁট এসে গেল। বাড়ির সামনে গেটের ভিতরে অনেক খালি জায়গা ছিল। ইঁটগুলো সব কেটে কেটে কোণা বার করে চারিদিকে বসিয়ে বসিয়ে ফুলের বেড তৈরি হলো। মাটি কুপিয়ে মাটি তৈরি হলো, সার মেশানো হলো, তার সঙ্গে ফুলের গাছও লাগানো হলো নানাবিধ। এ সমস্তই আমরা করলাম নিজের হাতে। চাকর দিয়ে গাছে জল দেওয়াটুকুও দাদামশাই পছন্দ করতেন না, সুতরাং ওকাজটা পর্যন্ত আমরা করলাম দাদু-নাতিতে মিলে। ধীরে ধীরে ফুল ফুটছে দেখে মনটা খুশীও হচ্ছে। দাদুর কাছে শিখছি, কোন্ গাছে কোন্ সার লাগে, কীরকম জল দেওয়ার নিয়ম, এইসব। একজন কিশোর, অপরজন বৃদ্ধ, সময় মন্দ কাটছে না দুজনের।

একদিন, বাগানে কাজ করছি, হঠাৎ আমার এক বন্ধু এসে গেটের বাইরে থেকে ডাক দিলো। ছুটে গেলাম। সে গেটের বাইরে, আমি ভিতরে। একটুক্ষণ কথা বলার পর সে চলে গেল, আমিও ফিরে এলাম। দাদামশাই তখন বাগানে ছিলেন, সব লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন—ছেলেটি কে?

—বন্ধু।

—তা বন্ধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে? বাড়িতে এনে বসাও?

বললাম—বাবা যদি রাগ করেন?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দাদামশাই বাবাকে বললেন—অহীন্দ্রর বন্ধুরা এসে নীচের ঘরে বসবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা আবার কী?

দাদামশাই বললেন—ছেলে ছেলে চায়, তার কি বুড়োর সঙ্গে সর্বদা মেলে?

তাই হলো। আমাদের পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটির একটু মাথা খারাপ ছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বাগান করা দেখতো। দাদামশাই করলেন কী, তার সঙ্গে আমার 'বন্ধু' পাতিয়ে দিলেন।

ছেলেটি একটু পাগল, কিন্তু বেশ সরল সাদাসিদে প্রকৃতির ছিল। তবে মুশকিল হলো এই, যখন-তখন 'বন্ধু-বন্ধু' ব'লে চেঁচাতে শুরু করল। তার সেই অনবরত 'বন্ধু বন্ধু' ডাক আমাকে

পাগল করবে দেখছি! ভাবলাম, দাদামশাই এ এক আচ্ছা পাগল বন্ধু জুটিয়ে দিলেন যা হোক! একে বাড়িতে এক পাগল—তারাপদ, তার ওপরে—এই?

বাগানের সব বেড তৈরি করে দিয়ে, কিছু কিছু ফুলফোটা দেখে, দাদামশাই একদিন চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে। আমি একা বাগান নিয়ে আছি। ফুল ফুটে উঠছে, দেখলে খুশী হই, কিন্তু মন খুব যে একটা আনন্দে মেতে ওঠে, তা নয়। বাড়িতে কাটে একা-একা—তারাপদ পাগল—মাঝে মাঝে গালমন্দ করে। বন্ধুরাও কেউ কেউ আসে কখনো-সখনো। নীচের ঘরে বসে ভয়ে ভয়ে নিম্নকণ্ঠে গল্প-গাছা করতাম তাদের সঙ্গে। কারণ, থিয়েটারের কথা মা-বাবার কানে গেলেই বিপদ।

বন্ধুরাও সব ভেসে বেড়াচ্ছে বলতে গেলে। কোনো ক্লাবঘর ত তাদের নেই! কী তারা করবে! তবে শুনলাম, পুজোর পর ননীদা আমাদের সবাইকে ডেকেছিলেন, বলেছিলেন, কই, তোমরা আর আসছ না কেন? নতুন বই ধরো, রিহার্স্যাল দাও? আবার থিয়েটার হবে!

কিন্তু আমার ত যাবার উপায় নেই! সে জন্যও ওদেরও নতুন বই ধরার উদ্যোগ নেই। কিছুই অগ্রসর হচ্ছে না। আমি একলা বাড়িতে বসে বাগান করছি, আর ভাবছি, এ বন্দীদশা ঘুচবে কবে?

অবশ্য তার চেয়েও বড়ো ভাবনা, আমার করণীয় কী? অভিনয় যে করলাম, তাতে মনে খুব উদ্দীপনাও অনুভব করলাম না। অথচ মন থেকে অভিনয়ের পালা বিদায়ও দিতে পারছি না! দিনের পর দিন ধরে একা বসে ভাবতে চেষ্টা করি, কোথায় হয়েছিল আমার ত্রুটি? ওরা ত এককথায় রায় দিয়ে দিয়েছে—বেশ হয়েছে! কিন্তু, আমার মন তৃপ্তি পাচ্ছে না কেন? ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, সেদিন আমার রূপসজ্জাটা ঠিক আমার মনের মতন হয়নি, তার জন্য মনটা খুবই ক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ঐ জনসমাবেশ দেখে—একটু যাকে বলে 'হকচকিয়ে' গিয়েছিলাম—মঞ্চে যে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—তখন যেন আমার সম্পূর্ণ সম্বিৎ ছিল না—ঈষৎ চৈতন্য হতে দেখলাম—বহু লোকের মাথা আলোর স্রোতের মধ্যে ঢেউয়ের মতো ভাসছে! সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। অভ্যাসমতো মুখস্থ-করা কথাগুলি বলে যাচ্ছি বটে—কিন্তু যখনই বুঝতে পারছি—বহুলোকের দৃষ্টি আমার ওপরে নিবদ্ধ—অমনি, কেমন যেন একটা ভয় অধিকার করতে লাগল মন—আমার যা বক্তব্য তা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করে দিয়ে প্রস্থান করতে পারলে নিশ্চিন্ত হই! এখন মনে হচ্ছে, এইজন্যই সেদিন আমার মুখের কথাগুলি বেরিয়ে ছিল দ্রুত তালে—বিরতিবিহীনভাবে। এক কথায়, আমি সেদিন নিশ্চিন্ত মনে দর্শকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। আমার সঙ্গে দর্শকদের একটি সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি! দর্শকদের চোখের দৃষ্টির সামনে সহজে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনেতার পক্ষে মস্ত এক গুণ।

এটা বুঝতে পারামাত্র মনে বড়ো আফসোস হলো। স্কুলে দু' দুবার অভিনয় হলো, নির্বাক ভূমিকা আমাকে দিয়েছিল বলে কত অভিমান করেছি, কত ঝগড়া করেছি, অভিনয়ে যোগদান

করিনি। এখন মনে হচ্ছে, কী ভুলই না করেছি! হায়রে, যদি তখন ক্ষুদ্র কোনো নির্বাক ভূমিকাতে নামতাম, তাহলে অন্তত দুদিনের জন্যও দর্শকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা অর্জন করতাম! সেই অভিজ্ঞতার ফলে যে ত্রুটি ঘটেছিল, তা হয়ত ঘটত না!

যাই হোক, যে ত্রুটি হলো অভিনয়ে, তা আমাকে অবশ্যই সংশোধিত করতে হবে অচিরে। অভিনয় আর করতে পারব না, একথা ভাবতেই পারছি না। সুযোগ এলেই করব এবং সেদিন অভিনয়ে এ ত্রুটি থাকলে কিছুতেই চলবে না। ভোরবেলা রোজ যেমন ময়দানে বেড়াতে যেতাম, সেটা আবার শুরু করলাম। তবে, আর স্বর-ক্ষেপণের অভ্যাস নয়। আগে করতাম স্বর-ক্ষেপণের অভ্যাস, স্বরবর্ণের ওপর নির্ভর করে। ফাঁকা মাঠে চীৎকার করছি—অ—আ—ই—ঈ—উ! অনেকটা 'সা রে গা মা'র মতো নীচে থেকে উচ্চগ্রামে স্বর তুলে। এতে, গলায় জোরটা এসেছিল। কিন্তু আরও কিছু চাই। সমরেন্দ্রর ভূমিকায় যে কবিতাকারের সংলাপ ছিল, তাই এবার আবৃত্তি করতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধা হতে লাগল, কষ্টও হতে লাগল বেশ—শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ক্ষেপণের সময়ে। এক-একটি বাক্য শেষ করতে যতখানি দম নেওয়া বা ছাড়া দরকার, আমার দম ততখানি ঠিক পৌঁছতে পারছে না। এখন বুঝতে পারছি, এই দোষ থাকার জন্যই সেদিন সমরেন্দ্রর ভূমিকায় আমার আবৃত্তি তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারলাম, সংলাপ-বলার সঙ্গে সঙ্গে দম নেওয়া ও ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। যতক্ষণ পারি, দমটা বুকের মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে তা ছাড়বার প্রয়াস করতে হবে। যেমন, সমরেন্দ্রর ভূমিকায় আছে, "শোভনা ইন্দিরা",—এইটুকু যে-লয়ে বলা শুরু করা গেল, তারপরে—"এই রাজধানী মাঝে" পর্যন্ত উচ্চারণ করার পূর্বেই সব দম ফুরিয়ে গেল। যত দম ফুরিয়ে আসে, কথাগুলি ততই তাড়াতাড়ি বলবার চেষ্টা করে বসি। অতএব, দেখলাম, বারবার এই দমের অভ্যাসটা করতে হবে সংলাপের সঙ্গে। আরও একটা উদাহরণ দেই। যেমন, (ঐ সমরেন্দ্ররই সংলাপে)

> "আর, তুমি? হেথা মত্ত হয়ে সুখে—
> লালসায় ব্যভিচার-দুষ্ট প্রণয়ীর মুখ চাহি
> অম্লান বদনে কহিলে আমায়—
> কী করিতে পারি আমি!"

এই পর্যন্ত বলবার পর অতি অল্প বিরতি দিয়ে আবার শুরু করতে হবে, "হায় নারি! বুঝিতে নারিনু কি কঠিন বজ্র দিয়ে"—এই দুটি বাক্যের মধ্যে যে সামান্য বিরতি আছে, তার মধ্যেই নিতে হবে দম। কিন্তু এতেই উঠছি হাঁপিয়ে, দম নেবার এ কায়দা ত জানি না! শিখিয়ে দেবে কে? কেউ নেই। নিজেকেই ক্রমাগত অভ্যাস আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে শিক্ষা করে নিতে হবে।

দেখতে দেখতে শীত প্রায় শেষ হয়ে এলো। অভ্যাস করতে করতে এমন হলো, যে, আর দমের

ব্যাপারে কষ্ট হয় না। ঠিক করলাম, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরে স্বরনিক্ষেপ আর নয়, এবার চলে-ফিরে-ঘুরে অর্থাৎ নাটকীয় কার্যের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করা অভ্যাস করতে হবে।

'ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের' সমস্ত ময়দানটা সেদিন আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার নিজস্ব অতিকায় অভিনয়-মঞ্চ। কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো চলে, কখনো ফিরে ভাবাভিব্যক্তির সঙ্গে আবৃত্তি করে চলেছি, আর ধীরে ধীরে ভোরের কুয়াশা ভেদ করে চারিদিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে গাছপালা। ওরা যেন আমার আবৃত্তি শুনে হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে নির্বাক-বিস্মিত দর্শকদের মতো শুনতে লাগল আমার কথাগুলি। ওদেরই উদ্দেশ করে আমি যেন কথা বলে চলেছি। এই বিপুল মঞ্চের আমিই একমাত্র অভিনেতা—আমিই নায়ক! প্রতিদিনের মিতালী হলো ওদের সঙ্গে আমার! প্রভাতের প্রথম আলো এসে পড়ল গাছের পাতায় পাতায়। আমার মনে হতে লাগল, বিমুগ্ধ দর্শকদলের চোখ যেন আমার কথার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

এরপরে বড়ো হয়েছি, দিনের পর দিন চলে গেছে, বছরের পর বছর, ময়দানে বেড়ানোর নেশা আমার ছুটে যায়নি। এই বৃদ্ধ বয়স—তবু প্রতিদিন আমাকে উত্তর কলকাতায় যেতে হয়—যাই ট্যাক্সি নিয়ে ময়দানের ধার দিয়ে। কখনো মনে হয়, সেই যে মাঠের পশ্চিমধারের বিরাট অশ্বত্থ গাছটা ছিল, সেটা গেল কোথায়? পরক্ষণেই মনে পড়ে, সেটা ত নেই, সেদিন ঝড়ে গেছে পড়ে! ময়দানের প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি তৃণ বুঝি সেদিন হয়ে উঠেছিল আমার একান্ত আপন জন! ওরা আমার বহু প্রস্তুতির সাক্ষী, আমার বহু সংলাপের শ্রোতা, আমার বহু ভঙ্গীর দর্শক! ওদের কি আমি কখনো ভুলতে পারি?

১৯১৩ সাল এই ভাবেই চলতে লাগল। বাবা একরকম ঠিক করেই রেখেছিলেন যে এইবারেই আবার স্কুলে ভর্তি হতে হবে আমাকে। কিন্তু দিন চলে যায় নিজের মনে, সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, ভর্তি হবার তাড়া আমারও ছিল না—বাবা ভয়ানক কর্মব্যস্ত মানুষ তখন—বাবারও সময় ছিল না। ভর্তির কথা উঠলে বলতেন—দেখি ভেবে, কোন্ স্কুলে ভর্তি করা যায়।

আসল কথা, বাড়ির সবাই তখন বেশ খুশী আমার ওপর। বই নিয়ে সন্ধ্যাবেলা একটু-আধটু বসি, সকালে প্রাতর্ভ্রমণে যাই। বিকেলেও একটু-আধটু বেরুলে বাড়িতে আর কেউ আপত্তি করে না। ফলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হচ্ছে কিছু কিছু।

বন্ধুদের কে যেন একদিন বললে—এই, আবার আমাদের রিহার্স্যাল বসবে।

—কোথায়?

—ভূতনাথের সেই বৈঠকখানার ঘরে।

আমি কথাটা তেমন গায়ে মাখলাম না। বললাম—তা কি আর হবে? আমাদের সঙ্গে ভূতো না বসলে ওরা আবার আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

—না—না, ভূতো এবার থাকবে বলেছে। ভূতনাথের সামনে ওর বাবার সঙ্গে আমাদের সব কথা হয়ে গেছে।

একটু থেমে থেমে বললাম—কিন্তু, আমার ত ভাই আসা হবে না।

—কেন!

—বাড়িতে বারণ, জানই ত!

ওরা একটু ভেবে বললে—ঠিক আছে, তুমি রোববার-রোববার সময় করে দুপুরবেলা একবার এসো, তাতেই হবে। আমরা রিহার্স্যাল সেই মতো চালিয়ে যাবো।

ওদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে সেদিন চলে এলাম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না।

যাই হোক, দেখতে দেখতে কেটে গেল একটি মাস। কিছুই তেমন হলো না এই একটি মাস ধরে, শুধু আলোচনা আর পরামর্শ। শেষকালে স্থির হলো, অভিনয় হবে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—সাজাহান।

স্থির হলো বটে, কিন্তু কাজ আর বিশেষ কিছু এগুলো কিনা বুঝতে পারছি না, কারণ, আমি ত যেতে পারছি না। কিছুদিন পর এক রবিবার দেখে আমি অবশেষে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে শুনি রিহার্স্যাল অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বন্ধুরা বললে—এবার তুমি আসতে আরম্ভ করো।

কিন্তু, ততদিনে প্রায় মে-মাস এসে পড়েছে, বাবা স্কুলের সব ঠিক করে ফেলেছেন। ফেলেছেন বটে, ওদিকে ক্লাসের পড়া গেছে অনেকদূর এগিয়ে। আমি যা পিছিয়ে আছি, চট করে কি আর ক্লাসের পড়ার নাগাল ধরতে পারব?

অতএব, ফল হল এই যে, এবছরটাও চলে গেল, ভর্তি হওয়া আর হলো না। হলো না যখন, বাবাও কেমন যেন এ ব্যাপারে ঝিমিয়ে পড়লেন। আমারও তেমন চাড় ছিল না। আমি বহুদিন পরে একদিন গেলাম আমাদের ক্লাবে। রবিবার দুপুরে গেছি, সন্ধ্যা পর্যন্ত অবশ্যই থাকতে পারতুম। কিন্তু ওদের ওপর ভরসা ছিল না, ওরা আর কী-ই বা করতে পারবে? আমার আবার ততদিনে ইংরেজী ফিল্ম দেখার ঝোঁক চেপে গেছে।

তখন তৈরি হয়ে গেছে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস। মিউনিসিপ্যালিটির অফিস আর মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের মাঝখানেই ওটা ছিল। তাই, আমি বাড়ি থেকে হেঁটেই যাতায়াত করতাম। হাঁটতে অবশ্য আমি পটু ছিলাম খুব। সেখানে দেখানো হতো টুকরো টুকরো সব ছোট ছবি প্রথমে। আর বিশ্বের নানান জায়গার সংবাদ সম্বলিত প্যাথি-নিউজ—হাসির ছোট ছোট কাহিনী। ছোট ছোট গোয়েন্দা কাহিনী, যাকে বলে থ্রিলার। দেখে মনে হতো যেন থিয়েটারই দেখছি। ছবিতে তোলা ছোটোখাটো থিয়েটার বেশ লাগত। আমি সিনেমা দেখায় এত মত্ত ছিলাম যে, বহুদিন যেতে পারিনি ক্লাবে। এক রবিবার গিয়ে শুনলাম, সব ভূমিকা বণ্টন করা হয়ে গেছে। আমার জন্য কিছু আর অবশিষ্ট নেই বললেই হয়।

আজও মনে পড়ে সেই 'সাজাহান' অভিনয়-আয়োজনের কথা। যিনি করবেন দারা, আমরা তাঁকে 'নল' বলে ডাকতাম, ভালো নাম প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়—সুদীর্ঘ সুগঠিত চেহারা ছিল তাঁর। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন—অতএব শনি-রবিবার ছাড়া তাঁকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। 'রিজিয়া'য় যিনি 'বীরেন্দ্র সিংহ' করেছিলেন, সেই প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, তাঁকে আমরা ডাকতাম গোবর্ধন বলে, তিনি হবেন 'মহম্মদ'। 'রিজিয়ায়' যিনি ছিলেন 'বায়রম,' সেই বিভূতি মুখোপাধ্যায় করবেন 'সোলেমান'। আর সব ভূমিকায় থাকবেন রয়েল ক্লাবের সভ্যবৃন্দ। মোরাদ—অমর বসু, সুজা—প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়সিংহ—ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইরে থেকে আরও এসেছিলেন সব নূতন সভ্য। শুধু তখনও বাকি ছিল 'সাজাহান' আর 'আওরঙ্গজেব'-এর ভূমিকা। 'সাজাহান' একে বৃদ্ধের ভূমিকা, তার ওপরে খুব চিৎকার করতে হবে বলে কেউ তা করতে আগ্রহশীল নয়, ভয় পাচ্ছে বললেও চলে। সবাই ত ছেলে-ছোকরা, বৃদ্ধ সাজবার আগ্রহ খুব থাকবার কথাও নয়। আর আওরঙ্গজেব? ভয়ানক শক্ত পার্ট। কে করবে? কাকে দেওয়া যায়? ভেবে এখনো ওরা ঠিক করতে পারেনি। এই ত পরিস্থিতি। আমি এবার কোন্ পার্ট করি? ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারিনি, আমার পছন্দ মতো ভূমিকা ত পাবো না! তাই বললাম—যা ভালো বোঝো, দিও।

তারপরে অনেকদিন আর ক্লাবে যাইনি, মেতে আছি সিনেমা দেখার নেশায়। হঠাৎ একদিন বাড়িতে বন্ধুরা এসে হাজির। কী ব্যাপার? ওঁরা আমার হাতে দিলেন, লেখা একটা পার্ট, বললেন—সাজাহানের পার্ট তোমায় করতে হবে।

তথাস্তু। বাড়িতে বসে পার্টটা পড়ছি আর ভাবছি, সেই আগেকার দেখা 'সাজাহান-এর কতটা মনে আছে।

একদিন গিয়ে রিহার্স্যালও শুরু করে দিলাম। কিন্তু দেখা যেতে লাগল, এটা ঠিক হচ্ছে ত ওটা ঠিক হচ্ছে না। নিজেরও মনের খুঁতখুতি, বন্ধুদেরও তাই। বললাম—দেখ, তোমাদের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে। মত সবাই ঠিক করে এক করো, নইলে ধরব কোন্‌টা? তাছাড়া থিয়েটার করতে গেলে একজন শিক্ষকেরও প্রয়োজন। শিক্ষক একজন স্থির করতে হবে।

এটা ওঁদের মনে ভীষণ ধরে গেল। একজন বললে—পাবলিক থিয়েটারে গিয়ে গিয়ে দেখে এলেই চলবে। নইলে, মাস্টার পাবো কোথায়?

কিন্তু সে-ব্যবস্থাও সবার পক্ষে অনুকূল নয়। মাস্টার চাই-ই। কথা হলো, দেখা যাক্ মাস্টার পাওয়া যায় কোথায়!

এই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে স্বভাবতই এক অধিবেশনে হয় না, ক্লাবে দিনকয়েক ধরে এই সব জল্পনা-কল্পনা চলেছে, ইতিমধ্যে আমার পার্টটাও হয়ে গেছে সম্পূর্ণ মুখস্থ। প্রাত্যহিক প্রাতর্ভ্রমণের সময় পার্টটা নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে। দেখে দেখে আবৃত্তি করতাম। কিন্তু এ সেই 'রিজিয়ার' অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়, এ হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য। প্রথম পদক্ষেপেই অসুবিধা হয়েছিল।

সাজাহানের প্রথম কথা—"তাইত—এ বড়ো দুঃসংবাদ দারা—"

নিজে নিজেই এবার বিরতি বা pause দিচ্ছি, পারছিও। এসব সংলাপের মধ্যে বিরতি দেওয়া বিশেষ কথা নয়, কথা হচ্ছে, এই কথাটুকু কী দমে বললে লোকে কীভাবে শুনতে পাবে? স্বাভাবিকভাবে বললে শুনতে পাবে না, চিৎকার করে বললে—বিসদৃশ লাগবে।

তারপরের সংলাপ : "পাঠাচ্ছো—তাইত—"

ঐরকম কাটা-কাটা কথা কখনো ত বলিনি এর আগে, আর তাছাড়া, পুরো দমের সঙ্গে কী করে বলতে হয় বুঝতে পারছি না। কিন্তু বুঝতে হবে, খুঁজে বার করতে হবে।

পরবর্তী সপ্তাহে—রবিবার—ক্লাবে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করা হলো যে, ভুজঙ্গভূষণ রায় বলে এক ভদ্রলোক, তিনি তখনকার দিনে আমাদের অঞ্চলের এক বিখ্যাত শৌখীন অভিনেতা ছিলেন, তাঁকেই শিক্ষকরূপে স্থির করা হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো, তাঁকে পাওয়া যাবে কী করে? কে প্রস্তাব করবে তাঁর কাছে?

বকুলবাগানের মোড়ের কাছটায় যে পানবিড়ির দোকানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে গেছি, সেই দোকান থেকে উনি অফিস যাবার পথে বিড়ি কিনতেন এবং ওখানে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতেন। আমরা তা দেখেছি। বললাম—চলো, ঐখানে কজনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো কাল। উনি ত আসবেন বিড়ি কিনতে? তখন প্রস্তাব করা যাবে।

—কিন্তু, কে করবে প্রস্তাব?

বললাম—আমিই করব। ছেলেমানুষ বলে যদি ধমকে ওঠেন ত উঠুন।

তাই হলো। পরদিনই সেই দোকানের সামনে গিয়ে যথাসময়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। কিছুক্ষণ পরেই এলেন ভুজঙ্গবাবু। ঘন চুল, কাঁচা পাকা গোঁফ, প্যান্টলুন পরা, গলাবন্ধ কোট, সাহেবী টুপি নয়, গোলমতো দেশী টুপি মাথায়। তিনি ট্রামে উঠে চলে যাবেন দক্ষিণে—টালিগঞ্জ ক্লাবে—সেখানেই তাঁর চাকরি। সেখানে তিনি 'বড়বাবু' ছিলেন। আমরা তাঁর কাছ বরাবর গিয়ে তাঁকে নমস্কার করে দাঁড়ালাম।

আমাদের তিনি সাক্ষাৎ না চিনলেও, আমরা অনেকেই তাঁর মুখ-চেনা ছিলাম বলে মনে হয়। কারণ আগেই বলেছি, ঐ পান-বিড়ির দোকানটা ছিল আমাদেরও আড্ডার জায়গা। যেতে-আসতে তিনি কি আর আমাদের কাউকে দেখেন নি?

তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—কী ব্যাপার?

গমগম-করা গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাঁর—শুনেই ভয় করলো। অবশ্য এ-গলার স্বরের সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছিলাম। শাঁখারীপাড়ায় একবার 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হয়েছিল, তাতে—তিনকড়িবাবু ছিলেন 'নবকুমার'—আর ভুজঙ্গবাবু ছিলেন 'কাপালিক'।

বাঘছাল প'রে জটাজুটধারী কাপালিকবেশী ভুজঙ্গবাবু যখন ডেকে উঠেছিলেন, 'কপালকুণ্ডলে—' তখন ছোট ছেলেরাও ভয়ে একেবারে কঁকিয়ে উঠেছিল।

আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে আমতা আমতা ক'রে ব'লে উঠলাম—আমাদের একটা ক্লাব আছে, আপনি দয়া ক'রে যদি একটু আসেন শেখাতে—

—ক্লাব কোথায় ?

বললাম।

শুনে বললেন—তোমরা থিয়েটার করবে ? কী বই ?

—সাজাহান।

একটু থেমে বললেন—আচ্ছা, এখন ত আমার সময় হবে না, এখন আমি খুবই ব্যস্ত, নানান্ জায়গায় কাজ আছে। মাসখানেক পরে এসে আমাকে মনে করিয়ে দিও।

কালীঘাট ইউনিয়ন ক্লাব বলে একটা ক্লাব ছিল তখন, তাতে তিনি অভিনয়ও করতেন, শিক্ষাও দিতেন। শিক্ষাদানের কাজ অবশ্য তাঁকে আরও কয়েক জায়গায় করতে হতো।

নমস্কার জানিয়ে বললাম—আচ্ছা, তাই হবে।

তিনিও ট্রামে উঠে চলে গেলেন। তারপরে, রবিবার-রবিবার মহড়া অবশ্য চলতে লাগল, কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গে নয়। মাস্টার আসবে—তিনি দেখিয়ে দেবেন—এই আশাতেই ব'সে আছি আমরা। এইভাবে আশায় আশায় মাসখানেক কাল কেটে গেল। আবার তাঁকে গিয়ে ধরলাম সেই পান-বিড়ির দোকানের কাছে। তিনি বললেন—এইবার যাবো। এই সামনের রবিবারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—ক'টায় যাবেন ?

—সন্ধ্যার পরে।

একটু ইতস্তত করে বললাম—সন্ধ্যায় আমাদের আবার বাড়ি ফিরতে হয়—

—আচ্ছা, পাঁচটায় যাবো। ঠিক পাঁচটায়।

এলো রবিবার। বিপুল আগ্রহ নিয়ে ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক পাঁচটাতেই এলেন ভূজঙ্গবাবু। নূতন উদ্যমে যেন ভ'রে উঠলাম আমরা। তিনি বললেন—কে কী পার্ট করছে ? দেখাও।

বললাম সব।

শুনে-টুনে বললেন—দেখি সাজাহান ?

আমি 'সাজাহান', অতএব আমাকেই মহড়ায় উঠে দাঁড়াতে হলো আগে।—"তাইত, এ বড়ো দুঃসংবাদ দারা !"—ইত্যাদি। চলতে লাগল মহড়া। তিনি মনোযোগ দিয়ে সব দেখে আর শুনে যাচ্ছেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর পাশে ব'সে চুপিচুপি দুটো একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি, তিনিও বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

এইভাবে মহড়া চলতে লাগল। ভূজঙ্গবাবুও আসছেন, আমিও রবিবারে রবিবারে ত আসছিই, তাছাড়া মাঝে মধ্যেও এক-একদিন ছিটকে চলে আসছি। বাড়িতে বই নিয়ে নিয়মিত পড়াশুনো করছি দেখে, বাড়ির শাসন ততদিনে রীতিমত শিথিল হয়ে গেছে। এই যে বেরোই অথচ, রাত্রি ৭টা

৮টা পর্যন্ত মহড়া দিয়ে ফিরি, এতে মা বাবা কিছু বলছেনও না, অথবা এদিকে তেমন লক্ষ্যও দিচ্ছেন না।

সামনেই পুজো আসছে ; এই পুজোর সময় অভিনয় করলে কেমন হয়? উৎসাহিত হয়ে সবাই মত প্রকাশ করলে—খুবই ভালো হয়। কিন্তু অভিনয় করতে দরকার অন্তত সত্তর-পঁচাত্তর টাকা, সে-টাকা দেবে কে? এদিকে, আমাদের সেই তারকবাবু, যিনি 'রিজিয়া'য় হয়েছিলেন পান্নালাল, তাঁকে আনা হয়েছে 'দিলদার' করবার জন্য। দ্বিতীয়ত, যিনি 'রিজিয়া'য় মালবদূত ও ঘাতক করেছিলেন, সেই অমূল্যকুমার ঘোষকে আমরা নিয়ে এলাম 'আওরঙ্জেব' করবার জন্য। ভূমিকা সবই বণ্টন করা হয়ে গেছে, কিন্তু, এখন টাকা পাই কোথায়? অর্থচিন্তায় দিন গেল, পুজো এলো, পুজো চলে গেল, অভিনয় আর হলো না। পুজোর পরে মহড়া আবার শুরু হলো বটে, কিন্তু সেই একই চিন্তা, টাকা কোথায়? তাহলে এ-ও কি সেই আমাদের বই-ধরা আর শুধু মহড়া দিয়ে-যাওয়ার ব্যাপারেই পর্যবসিত হবে? সে ছিল ঘরোয়া ব্যাপার, আর এবার ক'জন ভদ্রলোককে ডাকা হয়েছে বাইরে থেকে, নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে একজন শিক্ষককে—অভিনয় না হলে বড়ই গ্লানির কথা। নানান্ জল্পনা-কল্পনার পর স্থির করলাম আমরা, সামনের বড়দিনের সময় অভিনয় করতেই হবে। টাকা চাঁদা ক'রে তোলা হোক।

তাই হলো। অচিরেই ব্যবস্থা হ'লো চাঁদা তোলার। মহড়া চলতে লাগল। আমার প্রাতঃকালীন নিজস্ব মহড়াও চলতে লাগল। ভুজঙ্গবাবুর শিখিয়ে-দেওয়া সেই ভারী গলার কাছে আমার গলার কাজ লাগছিল যেন ছেলেখেলা। সাজাহানের উন্মাদ দৃশ্যগুলি কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছি না যেন! কণ্ঠস্বর সে ভাবে কিছুতেই উঠছে না!—পরিশ্রম ক'রে ক'রে গলা ধরে আছে! কিন্তু, আমিও নাছোড়বান্দা! সেই শেষরাত্রি থেকে মাঠে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করে চলেছি,—"উত্তম, তবে তাই হোক—তাহলে তুই মা আমার সহায় হ!

আমি অগ্নির মতো ধেয়ে আসি, তুই বায়ুর মতো ধেয়ে আয়—।"

দেখতে দেখতে এসে গেল বড়দিন। কাঁসারীপাড়া ও হরিশ মুখার্জী রোডের মোড়ে প্রিয়শঙ্কর মজুমদার মশায়ের বাড়ি ছিল,—তাঁর বাড়ির গেটটা ছিল হরিশ মুখার্জী রোডের ওপর, আর বাড়ির পাশটা পড়েছে কাঁসারীপাড়ার রাস্তায়, যেটা এখন দেবেন্দ্র বসু রোড হয়েছে। প্রিয়শঙ্করবাবু ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। ওঁর ছেলে—হেমশঙ্কর ও ছোট ভাই ত্রিপুরাশঙ্কর আমার সহপাঠী ছিল। তারা অবশ্য থিয়েটার করত না। কিন্তু, সেই সুবাদেই একদিন আমরা গিয়ে প্রিয়শঙ্কর বাবুকে ধরলাম। বললাম—আপনার বাড়িতে থিয়েটার করব আমাদের পাড়ার সব ছেলেদের নিয়ে।

উনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন—তা' ত করবে, কিন্তু খুবই অসুবিধা হবে।

—অসুবিধার জন্য ভাববেন না, আমরা সব ঠিকঠাক করে নেবো। এখন আপনি মত দিন।

ছেলেদের আগ্রহে উনি অবশ্য মত না দিয়েও পারলেন না। এদিকে চাঁদা কিন্তু উঠে গেছে

চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার মতো। কিন্তু, এ' টাকায় আর কতটুকু কাজ হবে? তাই বড়দিনে কিছু করা গেল না, বড়দিন এলো আর পেরিয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল ১৯১৪ সালের নূতন বছর। মহড়া এবার সত্যিই খুব জোর চলতে লাগল। মহড়া দেখতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাব থেকে লোক আসতে লাগল। তখনকার দিনে এইটাই রেওয়াজ ছিল, এক ক্লাবের লোক গিয়ে অন্য ক্লাবের মহড়া দেখবে। তখন অতো ঈর্ষাকাতর লোক ছিল না। আমার 'সাজাহান' দেখে সকলেই বেশ প্রশংসা করে গেলেন। অচিরে অভিনয়ের দিনও ধার্য হয়ে গেল। চাঁদা ততদিনে আরও কিছু উঠেছে।

প্রিয়শঙ্করবাবুর বাড়ির দুদিকে দুটি ফটক—মাঝখানে গাড়িবারান্দা—দুদিকে দুটো বৈঠকখানা—মাঝখানে ভিতরের উঠোনে যাবার জন্য একটা দালান, তারপর প্রকাণ্ড উঠোন, তার তিনদিকেই বারান্দা, একতলায় এবং দোতলায়। উঠোনের মাঝখানে একটি শামিয়ানা খাটিয়ে নিলেই কৌটোর মতো ঢাকা হয়ে গেল। উত্তরদিকে—উঠোনের পরেই কিছুটা খালি জায়গা ছিল, সেখানে গোয়ালঘর আস্তাবল, দরওয়ান-চাকরদের থাকবার চালাঘর ইত্যাদি ছিল। গোয়ালের সামনে তৈরি করলাম সাজঘর। স্টেজ-তৈরির ব্যাপারে লেগে গেলাম আমরাই মহা আনন্দে। এক কনসার্ট পার্টিকে নিমন্ত্রণ করা হলো। তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছিল এই যে, তাঁদের দলের নাম দিতে হবে প্রোগ্রামের নীচে, আর দিতে হবে যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া, বাদ্যযন্ত্রাদি বহনের জন্য যা লাগে তাই। সারারাত্রি বাজাবেন, চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের যোগান ঠিক থাকা চাই। অতএব, সে-ব্যবস্থাও করা হলো। আমাদের বন্ধু প্রফুল্ল ঘোষও এসেছে অভিনয় করতে, তার মধ্যম ভ্রাতা সতীশচন্দ্র ঘোষ রইলেন চায়ের ব্যবস্থায়। চা-চিনি জমানো দুধ কাপ-ডিশ্-কেটলী—এসব যোগাড় করতে হয়েছিল। হাঁড়ি ক'রে জল ফুটছে ত ফুটছেই সারারাত ধ'রে, আর সতীশ যোগাচ্ছে—চা। চা কেন, নিজের হাতে পানও সেজে দিয়েছিল সে।

অভিনয় ত ভালোই হলো। বহু করতালি পড়ল, বহু সুখ্যাতিও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকা দেনা হয়ে গেল। সেটা না পেলে স্টেজ ভাড়া আর ড্রেস-ওয়ালাদের বিদায় করা যাচ্ছে না। কী করা যায়? অগত্যা গেলাম প্রিয়শঙ্করবাবুরই কাছে। তিনি ভালো লোক ছিলেন, টাকাটা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, শেষ পর্যন্ত 'সাজাহান' অভিনয় হলো। সকলেই ভালো বলছেন, প্রশংসা করছেন। আমার দিকে তাকিয়ে অনেকে বলেছেন—অতোটুকু ছেলে, কিন্তু অভিনয় করেছে চমৎকার!

মনটা আমার ভরে উঠল। অভিনয়ের জন্য বাড়িতে ছুটি নিয়েছিলাম, বন্ধুর বিয়েতে দূরে যেতে হবে, সকাল হয়ে যাবে ফিরতে। অতএব, অভিনয়ের শেষে, নিশ্চিন্ত মনে, অভিনয় সম্বন্ধে নানান্ আলোচনা সেরে—ভালো ক'রে রঙ্ তুলে—মুখ-হাত-পা ভালো ক'রে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ফিরতে-ফিরতে অবশ্য বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা-দশটা বেজে গেল। কিন্তু মুখে-

হাতে-পায়ে ত আর রঙ্ লেগে নেই, তাই কেউ কিছু দেখতেও পেলেন না। অতএব, সন্দেহও করলেন না। বন্ধুর বিয়ে থেকে ফিরছি মনে ক'রে কেউ কিছু আর বললেনও না।

নিশ্চিন্ত। এবার নিজের মনের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করবার পালা। 'রিজিয়া'র ব্যাপারের মতো, এবারে মনের গ্লানি তেমন নেই। অনেকটাই পেরেছি বলে মনে হয়, যা পারিনি, সে আমার পুরাতন ত্রুটি—দম নেবার অসুবিধা। আমার কণ্ঠস্বরের জোর হয়েছে খুবই। এত বড়ো 'সাজাহান'-এর ভূমিকা, তাতে উন্মাদের অভিনয়ের দৃশ্যগুলিতে চিৎকারও আছে, তাতে কণ্ঠস্বর আমাকে বঞ্চিত করেনি, গলাও ধ'রে আসেনি! নিজে তৃপ্তি পেয়েছিলাম আরও বেশী অঙ্গাভিনয়ের দিক থেকে। অভিনয়ের পূর্বে—প্রস্তুতির পর্বে—আমি রাস্তায় বেরিয়ে মনে মনে অনুক্ষণ খুঁজে বেড়াতাম এক বৃদ্ধকে—যাঁর হাবভাব আর অঙ্গ-সঞ্চালন দেখে আমি তা 'সাজাহানে' ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু, কোথায় পাবো সাজাহানের মতো বৃদ্ধ? আগ্রা-দিল্লিতে কোনও আমীর-ওমরাহ খুঁজলে হয়ত পেতে পারতাম, কিন্তু ভবানীপুরে আমীর-ওমরাহ কোথায় পাবো? তবে, পথে-যেতে-আসতে কোনো পছন্দমতো বৃদ্ধকে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়তাম। সব বৃদ্ধেরই হাবভাবই যে পছন্দ হতো তা নয়। যাদের পছন্দ হতো, তাদের চালচলন একত্র সংমিশ্রিত করে সাজাহানের একটা রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, তাঁদের সেই সব ভাবভঙ্গি বা অঙ্গসঞ্চালনকে ঐ বয়সে আমার পক্ষে আয়ত্ত করা কম কঠিন ছিল না! পথ চলছি, আর আপনমনে মাথা নাড়ছি অথবা হাত নাড়ছি, ভাবছি—এইভাবেই ত হাতটা নেড়েছিল, না? এইভাবেই মাথা ঝুঁকিয়ে কথা বলছিল, না? ভঙ্গিগুলি করছি, আবার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে-ওদিকে ফিরে তাকাচ্ছি—কেউ দেখছে না ত? দেখে ফেললে কী মনে করবে! ভাববে—পাগল!

অভিনয়ের পর ক্লাবে আর অন্য কথা নেই, কে কীরকম করেছে, তারই আলোচনা। কিন্তু এ আলোচনার জোয়ারই বা থাকতে পারে কতদিন? অচিরেই ভাঁটা পড়ল। প্রশ্ন উঠল—নূতন নাটক ধরলে হয় না? কিন্তু, খরচ দেবে কে অভিনয়ের? অতএব, নূতন বইও ধরা হলো না, চলল শুধু জটলা আর জটলা। আমার ত রবিবার ছাড়া ক্লাবে যাওয়ার উপায় নেই। সকাল-বিকেল নিয়মিত বই নিয়ে বসছি, অভ্যাস মতো ময়দানে প্রাতর্ভ্রমণটা চলেছে শুধু।

রোজ সকালেই বাড়িতে আসত 'স্টেট্‌সম্যান' কাগজ। খেলার খবর জানবার জন্য রোজই সেটা উলটে-পালটে দেখতাম। বাবা সেটা লক্ষ্য করতেন। একদিন বললেন—কাগজ ত পড়ো, ইংরেজী বুঝতে পার?

বললাম—কিছু কিছু পারি। কঠিন জায়গাগুলি পারি না।

বললেন—ডিক্সনারী দেখবে। আর তোমার গ্রামার আছে কোথায়?

আমাদের গ্রামার ছিল জে. সি. নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার—পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তবে একই ভল্যুমে। সেই গ্রামারটি বাবার সামনে এনে দিয়ে বললাম—এই গ্রামার আছে।

বাবা বললেন—যেখানটায় অসুবিধা লাগবে, এই গ্রামার দেখে বুঝে নেবে।

তাই করতাম। দেখছি, সত্যিই খুব সুবিধা হচ্ছে কাগজ পড়বার। এই গ্রামার আমার ছোট ভাই পঞ্চুও পড়েছে, আমার ছেলেমেয়েও পড়েছে। এইখানে বলে রাখি, আমার ভাইয়ের নাম পঞ্চু ছিল না, এ ঐ তারাপদর কীর্তি। বাবা-মা তাকে 'পঞ্চু' বলে ডাকতেন বটে বাড়িতে, তার আসল নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী। রবিবারে জন্মেছিল বলে তার এই নাম দিয়েছিলেন বড় মামা। তার পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি হবার সময়, আমাদের বাড়ির কাছেই একটা পাঠশালা ছিল, সেখানে সে ভর্তি হ'তে গেল তারাপদর কাঁধে চড়ে। বাবার নামধাম সব ঠিক-ঠাক লেখা হলো, কিন্তু ছাত্রের নামের বেলাতেই তারাপদ গোলমাল করে ফেললে। পণ্ডিত মশাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন —ছেলের নাম কী? তারাপদ ডাকত তাকে 'পঞ্চুসাহেব' বলে। সে ত আর অন্য নাম মনে রাখত না? সে বললে—পঞ্চুসাহেব। পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, 'পঞ্চু' যখন ডাকনাম, তখন ভালো নাম নিশ্চয়ই হবে—পঞ্চানন। সেই থেকে সে 'পঞ্চুই' রয়ে গেল, 'রবি' আর হতে পারল না। বড় হয়ে যখন সে ট্রান্সফার নিয়ে স্কুল-কলেজে গেল, তখনো সে হ'য়ে রইল তারাপদর সেই 'পঞ্চু', অর্থাৎ 'পঞ্চানন চৌধুরী।'

যাই হোক, সেই নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার আজও আমার বইয়ের র‍্যাকে সাজানো আছে, কত স্মৃতির চিহ্ন বহন ক'রে।

বাবা একদিন বললেন—এবার তোমার একজন মাস্টার দরকার।

পুরানো মাস্টারে হলো না। স্টেটস্‌ম্যান কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন মাস্টার মশাইকে সংগ্রহ করা হলো। খ্যাতনামা শিক্ষক, অতি সৌম্যমূর্তি, আর পড়ানোর গুণে নাকি গাধাকেও ঘোড়া করতে পারেন। অনেক গাধাকে ঘোড়া করার সুখ্যাতি তাঁর ছিল, এবারে ঘোড়া করবেন তিনি আমাকে।

পড়ার জায়গা, বইপত্র, টেবিল-চেয়ার সব ঠিক করে, পূর্ণ আয়োজনে পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল। এইভাবে কেটে গেল জুন মাস পর্যন্ত। বাবা বললেন—দেখেশুনে এবার একটা স্কুল ঠিক করা হোক।

মাস্টারমশাই বললেন—বেশ দেরি হয়ে গেছে. এখন কি কোনো স্কুলে ছেলে নেবে? নতুন কোনো স্কুলে ত হবেই না, ওর পুরোনো স্কুলে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, পুরোনো ছাত্র বলে যদি কৃপাপরবশ হয়ে নিয়ে নেয়।

নিজেই গেলাম পুরোনো স্কুলে—অর্থাৎ লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। তাঁরা বললেন—ক্লাসের পড়া অনেকদূর এগিয়ে গেছে, এখন ভর্তি হয়ে পড়বে কবে, আর পরীক্ষা দেবেই বা কী করে? তার থেকে এ বছরটা বাড়িতে প'ড়ে, সামনের বছর এসে স্কুলে ভর্তি হ'য়ো।

অগত্যা তাই করতে হলো। বাড়িতেই পড়তে লাগলাম মাস্টারমশাইয়ের কাছে। মাস্টারমশাই ইংরেজী সত্যিই খুব ভালো পড়াতেন। আমিও দৈনন্দিন কাগজ পড়তে সক্ষম হয়ে উঠলাম।

বোধহয় সেটা জুন মাসের শেষ। হঠাৎ কাগজে একটা সাংঘাতিক খবর বেরুলো। যা নিয়ে বেশ একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তখন। সব কথা আজ মনে পড়ে না, তবে সংক্ষেপে ঘটনাটা বোধহয় এই। সার্বিয়ার অধীনে বস্‌নিয়া বলে একটি রাজ্য ছিল, অস্ট্রিয়া সেটিকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ তাঁর পত্নীকে নিয়ে এই বস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজেভো শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে যথারীতি নাগরিক সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়। তিনি যখন মোটরে করে সভামণ্ডপের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে কে একটি লোক তাঁর দিকে বোমা ছুঁড়ে দিয়েছিল। যুবরাজ দেখতে পেয়ে সেটাকে হাত দিয়ে আট্‌কে দিতেই সেটা মাটিতে পড়ে গেল। তাঁর গাড়িটা এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু পিছনের গাড়িটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোমাটা ফেটে গিয়েছিল, ফলে দ্বিতীয় গাড়িটির একটি লোক নিহত হলেন, একটি লোক আহত হলেন। খুব হৈ-চৈ হলো, তবু তারই মধ্য দিয়ে যুবরাজ পৌঁছলেন সম্বর্ধনা-সভায়। ফেরার সময়, রাজপুরুষেরা নিরাপত্তার জন্য স্থির করলেন যে, পুরানো পথ দিয়ে না নিয়ে গিয়ে যুবরাজকে কোনো নূতন পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে! তাই, গাড়ির চালক নূতন ও পুরাতন পথের সংযোগস্থলে আসামাত্র, বস্‌নিয়ার শাসনকর্তা নির্দেশ দিলেন—এ-পথ নয়, ঐ নূতন পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাও।

তাই যাচ্ছিল গাড়ি। এ পথ দিয়ে ত যাবার কথা নয়, তাই জনারণ্যও নেই। তবুও কোথা থেকে এই পথেই ছুটে এসে এক অল্পবয়স্ক ছাত্র তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়লো হঠাৎ। যুবরাজের স্ত্রী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করতে গেলেন যুবরাজকে, সুতরাং দ্বিতীয় গুলিটি এসে বিদ্ধ করলো তাঁকেও। সেই অবস্থায়, পথ থেকেই গাড়ি ছুটল হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে পৌঁছবার সামান্য কিছুক্ষণ পরেই স্ত্রী মারা গেলেন, মিনিট দশেক পরে গেলেন—স্বামী।

এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডই জ্বালিয়ে দিলে যুদ্ধের আগুন। চারিদিকে পড়ে গেল 'সাজ-সাজ' রব। কাগজে তখন আমরা উন্মুখ হয়ে পড়তাম পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের কথা। সব ঠিক আজ মনে নেই। আসল কথা, দুটি দেশই এক-একটি দল বাঁধতে লাগল, শক্তি গঠন করতে লাগল। সার্বিয়া আর অস্ট্রিয়া—দু' পক্ষই তাদের মিত্ররাজ্যগুলির সঙ্গে দেখতে দেখতে জোট বেঁধে ফেললে। যুদ্ধের জন্য জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড—সবাই প্রস্তুত হ'তে লাগল। শুধু বেলজিয়ম নিরপেক্ষ জাতি, তাঁরা বরাবরই নিরপেক্ষ থাকতেন। কিন্তু তাঁদেরও এবার আশঙ্কা হলো, জার্মানী যখন ফ্রান্স আক্রমণ করবে, তখন বোধহয় তারা বেলজিয়মের মধ্য দিয়ে সৈন্যচালনা করবে। তাঁরা ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জকে লিখলেন—এবার বোধহয় আমাদের নিরপেক্ষতা আর টি'কল না। ইংরেজ লিখলে—যে-কেউ আপনার দেশের সীমানা লঙ্ঘন করবে, আমরা গিয়ে বাধা দেবো আপনাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কিন্তু, বেলজিয়ম যা ভেবেছিল, তাই হলো। জার্মানী পত্র দিয়ে বেলজিয়মকে জানালো যে, তার রাজ্যের ভিতর দিয়ে সে ফ্রান্স আক্রমণ করবে। ইংরেজরা জার্মানীকে জানালেন—আশা করি এমন কাজ আপনারা করবেন না, আর আপনাদের মতামত আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে জানিয়ে দেবেন।

এলো না উত্তর। অতএব, যুদ্ধ বেধে গেল। আমার মনে আছে, কোনো এক ইংরেজী সংবাদপত্রে একটা ছবি বেরুলো—সেকেলে নাইটদের মতো লৌহবর্ম পরা—দুজন অশ্বারোহী সাঁজোয়া ঘোড়ায় চেপে দীর্ঘ বল্লম হাতে পরস্পরকে লক্ষ্য করে আক্রমণের উদ্যোগ করছে। ওপরে কালো সিলোটি দুটি মূর্তি, একজনের ঢালে লেখা—সার্বিয়া, অপরজনের ঘোড়ার গায়ে লেখা—অস্ট্রিয়া। দেখে, গা যেন কেমন ছমছম করে উঠেছিল ভয়ে।

যাই হোক, পরবর্তী সংবাদ যা পেয়েছিলাম, তা আরও আশঙ্কাজনক। সেই রাত্রের দ্বিপ্রহর পার হতে-না-হতেই জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামের মধ্যে নাকি ঢুকে পড়েছে। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা আক্রমণ করেছে লিজ দুর্গ। লিজ দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য, যেমন নাকি ছিল এণ্ট্ওয়ার্পের দুর্গ। লিজ দুর্গের কেন্দ্রীয় দুর্গটিকে ঘিরে বহুসংখ্যক দুর্গ ছিল চক্রবৎ দাঁড়িয়ে, সেগুলিকে ভেদ না করে কেন্দ্রীয় দুর্গকে দখল করা সম্ভব ছিল না। অথচ, জার্মান গোলাবর্ষণের ফলে সেই দুর্ধর্ষ লিজ দুর্গেরই ঘটল পতন। দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে সারা বেলজিয়াম দখল করে নিলো জার্মানরা। বেশ মনে আছে, তখন কাগজে কী সব উত্তেজনাপূর্ণ খবরই না আমরা পড়তাম। জায়গায়-জায়গায়, বৈঠকখানায়-বৈঠকখানায়, রকে-রকে, দোকানে-দোকানে এইসব যুদ্ধের আলোচনা। তখন সব যুদ্ধের আলাদা ম্যাপও বিক্রি হচ্ছে। সেই ম্যাপ মাঝখানে বিছিয়ে রেখে দলে দলে চলেছে তর্কযুদ্ধ। তর্ক থেকে হাতাহাতিও কোথাও কোথাও হয়ে যেতো বলে শুনেছি। যেন সবাই এক-একজন সৈন্য, কেউ জার্মানীর দলে, কেউ ইংরেজের দলে। ম্যাপ দেখে সেনাপতিদের কে কোথায় যুদ্ধ করছে, কীভাবে যুদ্ধ করছে, সেইসব আলোচনা। কেউ বলছেন,—ঈস্! এটা ও' করলে কী? আর, ওখানে থাকলে ত জার্মান-গোলা উড়িয়ে দেবেই, এ ত শিশুতেও বোঝে!

—আহা, ওখানে না থেকে সে করবে কী? না থাকলে—সোজা যে দুর্গে ঢুকে যাবে সোলজাঁর!

—আরে, রেখে দাও সোজা ঢুকে যাবে! অতো সোজা!

যেন সবাই রাতারাতি যুদ্ধবিশারদ হয়ে গেছে। এরকম যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিরূপণ যেন তখন সাংঘাতিক এক নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে সবার! অফিস থেকে ফিরে এসে বাবুরা বৈঠকখানায় ব'সে পাঁচজন মাতব্বর জুটিয়ে ম্যাপ দেখে সেই যে যুদ্ধ-বিশ্লেষণে মেতে উঠলেন, তা থেকে তাদের থামায় কার সাধ্য? আমাদের মধ্যেও চলেছে যুদ্ধের জটলা। যুদ্ধক্ষেত্র বহুদূরে, তবু ম্যাপ দেখে আমরা যুদ্ধক্ষেত্র অনুমান করে নিচ্ছি। কামানের গোলা নাকি যাচ্ছে ৭৫ মাইল পর্যন্ত, কামানের উন্নতিও হয়েছিল তখন খুব। অশ্বপৃষ্ঠে মুখোমুখি যুদ্ধও পরিচালিত হয়েছিল তখন বেশী। বাবুদের মজলিসে উত্তেজনার মুখে কেউ কেউ বলতেন, এখন ইংরেজের অধীনে আছি, না হয় এবার জার্মানের অধীনে যাবো। জার্মানরা এলে দেশের উন্নতিও একটু হতে পারে, চাই কি, ভারতবর্ষ স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে! এইভাবে, বৈঠকখানাই হয়ে যেতো যেন এক-একটি সংগ্রামক্ষেত্র। কেউ ইংরেজের দলে, কেউ

জার্মানের। জার্মানের দলেই কিন্তু সেদিন দেখা যেতো লোক বেশী। ইপ্রেস, লুভেন, রীমস্—এইসব প্রাচীন শহর জার্মানের গোলায় ধ্বংস হয়ে গেল। কতশত শিল্প-সংরক্ষণশালাও শেষ হয়ে গেল এইভাবে। রীম্‌সের সুন্দর ক্যাথিড্র্যাল গীর্জাও বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে জার্মান সৈন্য ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিসের দ্বারদেশে এসে পৌঁছলো। ইটালীও যুদ্ধে যোগ দিল, তুর্কীও যুদ্ধে দিলো যোগ। বিশ্বব্যাপী জ্বলে উঠলো বিরাট সমরানল। দীর্ঘ চার বছর চলেছিল এই বিশ্বব্যাপী মহাসমর, যার নামকরণ ঐতিহাসিকরা করে থাকেন, বিশ্বযুদ্ধ। ভারতবর্ষ থেকেও যে কতো সৈন্য যুদ্ধে চলে গেল তার আর ইয়ত্তা নেই! বড় বড় বিলাতী রেজিমেণ্ট যাদের ফুটবল খেলার মাঠে দেখেছি, তারা সব যুদ্ধে চলে গেছে। চলে গেছে গভর্ণমেণ্ট লাইট ইনফ্যানট্রি, স্রপশায়ার, মিড্‌ল্‌সেক্স, ইস্টইয়র্ক, ল্যাঙ্কাশায়ার, আর ফিউজিলিয়ার্স! তার বদলে, ভারতবর্ষ রক্ষা করবার জন্য এসেছে—টেরিটোরিয়াল সৈন্যদল। এরা সব কলেজের ছাত্র, কারখানা আর খনির সব শ্রমিক। অল্প স্বল্প যুদ্ধ শিক্ষা দিয়েই এদের পাঠানো হয়েছিল ভারতবর্ষে। এদিকে, যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই, জার্মান-অস্ট্রিয়ার যতো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতায়, তাদের সাহেবদের ধ'রে নিয়ে গেল, অফিসগুলিও তাই গেল একে একে বন্ধ হয়ে। তার মধ্যে যেটা খুব বড় জার্মান অফিস ছিল, তার নাম—স্রভার স্মিড্‌ট। আর, যেসব ইংরেজী প্রতিষ্ঠানে বড়োসাহেব-ছোটসাহেবরা ছিল, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে যোগদান করতে হলো।

আমার প্রাত্যহিক প্রাতর্ভ্রমণের সময় চোখে পড়ত, সবার আগে খুব ভোরে মাঠে এসেছেন সিভিলিয়ান সাহেবরা তাঁদের কুচকাওয়াজ সেরে নিতে। মাঠের পশ্চিমদিকে ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউর ঝাউগাছগুলির কাছে সারি সারি গাড়ি রাখা থাকত তাঁদের। কুচকাওয়াজ সেরে মাঠের ধুলো-কাদায় মাখামাখি-হওয়া জামা-কাপড় সুদ্ধই গলদঘর্ম দেহে তাঁরা গাড়িতে উঠে বসতেন। প্রাতরাশ সেরে তাঁদের আবার অফিসে যেতে হবে। তাঁরা চলে যেতে-না-যেতেই মাঠে এসে যেতো টেরিটোরিয়াল আর্মির সৈন্যদল—শুরু হতো তাদের কুচকাওয়াজ। মাঝখানে থেকে আমার গলা-সাধা আর হচ্ছে না। তবে, তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে বেশ ভালোই লাগত, বিশেষ করে, সিভিলিয়ান সাহেবদের। এদেশে অতিরিক্ত আরামে থেকে থেকে তাঁদের অনেকেই হয়ে গেছেন ভয়ানক মোটা, বেশ ভুঁড়ি হয়ে গেছে অনেকেরই। সেই অবস্থায়, এক সার্জেণ্টের নির্দেশে, দৌড়ঝাঁপ আর মার্চ ক'রে ক'রে বেচারীরা বাস্তবিকই গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যেতো। মাঠে জলনিষ্কাশনের জন্য খানামতনও ছিল, জল হয়ত সেখানে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কাদা যাবে কোথায়? সেখান দিয়ে সার দিয়ে যাবার সময়ই হয়ত সার্জেণ্ট্‌ হুকুম দিয়ে বসল—শুয়ে পড়ো।

উপায় নেই, ঐ কাদাতেই শুয়ে পড়তে হবে। আবার কিছুটা হামাগুড়িও দিতে হতো। বন্দুক উঁচু করে সোজা দৌড়তেও হতো। ঘেমে নেয়ে বেচারীদের কী যে দুরবস্থা হতো, তা বলবার নয়। সারি সারি লাইন করে মার্চ করতে করতে, কেউ বা পিছিয়ে পড়েছেন, আবার দৌড়ে গিয়ে লাইনে

মোতাবেক হচ্ছেন, লাইনের সঙ্গে আবার ঠিকমতো মিলে দাঁড়াচ্ছেন, এ দৃশ্য প্রায়ই দেখতে পেতাম। দেখতে-দেখতে হঠাৎ আমার ভয়ানক হাসি পেতো। হাসি পেতো অন্য একটি ব্যাপার মনে পড়ে যেতো ব'লে। খবরের কাগজে তখন যুদ্ধের খবর ত বেরুচ্ছেই, সঙ্গে সঙ্গে কিছু চুটকি হাস্যোদ্দীপক টিকা-টিপ্পনীও বার হতো। এইরকম একটা টিপ্পনী তখন পড়েছিলাম যে, একজন সার্জেন্ট যিনি এই সিভিলিয়ান বড়সাহেব ছোটসাহেবদের ড্রিল করাতেন, তিনি ছিলেন পাকা টমি। ছুটোছুটি-দৌড়ঝাঁপের সময় সাহেবরা কেউ কিছু ভুল করলেই—অভ্যাসবশত তিনি ভয়ানক কদর্য গালাগালি দিয়ে উঠতেন। অথচ বড়সাহেব, ছোটসাহেবদের পক্ষে প্রতিবাদ করারও উপায় নেই। নেহাতই অসহ্য হয়ে উঠতে, একদিন তাঁরা মেজর সাহেবকে নালিশ জানিয়েছেন। তদারক করতে সত্যিই একদিন এলেন মেজরসাহেব। সার্জেন্টের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে তিনি সিভিলিয়ানদের ড্রিল দেখছেন। সার্জেন্ট ত চমকে উঠলেন মেজরকে দেখে এবং যতটা সম্ভব 'ভদ্র' হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এক সময় আবার সাহেবরা ড্রিল ভুল করতেই তিনি অভ্যাসমতো রেগে উঠলেন এবং দাঁতে দাঁত চেপে কোনক্রমে বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এমত অবস্থায় আমার কী বলতে ইচ্ছা করছে। অর্থাৎ, এমত অবস্থায় কী আমি বলে থাকি, তা আপনারা বুঝতে পারছেন ত?

ওঁদের ড্রিল দেখতে দেখতে আমার এই কথা মনে পড়ত, আর আপন মনেই হেসে উঠতাম। কিন্তু আমার কণ্ঠচর্চার কী হবে? কবে থামবে ওদের কুচকাওয়াজ? থামা ত দূরের কথা, যুদ্ধ আরও বেড়ে গেল। প্যারিসের নিকটবর্তী মার্ন নদীর যুদ্ধে যুদ্ধের মোড় আবার গেল ঘুরে। মন্‌সের যুদ্ধ, ভারডুনের যুদ্ধ,—কতো লোক যে মারা গেল তার ইয়ত্তা নাই। তুর্কীকে আক্রমণ করার জন্য এদিকে ইংরেজ দুদিক থেকে যুদ্ধ চালনা করছেন। পারস্য উপসাগর থেকে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ। বস্‌রা বলে সমুদ্রতীরের এক বন্দর ছিল, সেখানে জড়ো হলো সব ভারতীয় সৈন্য। বহু বাঙালী পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের কাজ নিয়ে, রেলের কাজ নিয়ে, কমিশরিয়টের কাজ নিয়ে সেদিন বস্‌রায় গিয়েছিল চাকরি করতে। একটি বাঙালী সৈন্যদল কলকাতা থেকে করাচীতে গিয়ে শিক্ষালাভ করে "৪৯ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট" নাম নিয়ে মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিল যুদ্ধে। বিরাট ভারতীয় বাহিনী জেনারেল টাউনসেণ্ডের নেতৃত্বে বাগদাদ অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। কুট-এল-আমরোতে তারা পৌঁছেছে, এমন সময় অতর্কিতে তুর্কীবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। আবার ভূমধ্যসাগরের দিকে মূল কেন্দ্র ইজিপ্ট থেকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল পরিচালিত হতে লাগল ডার্ডনেল্‌স্ প্রণালীর ভিতর দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল বা ইস্তাম্বুল অধিকার করা। কিন্তু ডার্ডনেল্‌স্ প্রণালীর দুদিকে দুই তীরে সারি সারি ছিল কেল্লা, সেই কেল্লার মুখে প'ড়ে সেনাদল ধান-কাটার মতো কাটা পড়ে গিয়েছিল। যে-সব যুদ্ধজাহাজ প্রণালীটির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তারা আর অগ্রসর হতে পারল না। ওদিকে, ভিন্ন সৈন্যদল স্যালোনিকা হয়ে বুলগেরিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, বুলগেরিয়া তখন ছিল জার্মানীর মিত্রপক্ষ। মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে সপ্তরথীর মতো সবাই মিলে একেবারে ঘিরে ফেলা। পূর্বদিক থেকে

মেসোপটেমিয়া, রাশিয়া, সার্বিয়া। আর ইটালী মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে আল্‌পস পার হয়ে আক্রমণ চালালো অস্ট্রিয়ার দিকে। ফরাসী, বেলজিয়াম আর ইংরেজরা মিলে সম্পূর্ণ পশ্চিম দিকটা ঘিরে ফেলল জার্মানীর, যার নাম বিখ্যাত "ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট" ; আর দূরপ্রাচ্যে জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে জার্মানীর অধিকৃত স্থান ও প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের যে-সব দ্বীপ ছিল, সে-সব অধিকার করে নিলো। সুতরাং এ যুদ্ধ এমন ব্যাপকতা লাভ করল যে, কবে এর সমাপ্তি ঘটবে তা কে জানে! আমি ঐ কুচকাওয়াজ-সম্পর্কিত প্যারেড-গ্রাউণ্ডটি ছেড়ে দিয়ে "বির্জী তলাও"-এর পাশে গীর্জার দক্ষিণ পাড়ে যে জায়গাটি ছিল, সেটি আশ্রয় করলাম। পুকুরের পাড়ে দক্ষিণ দিকে সারি সারি তিনটি বৃক্ষকুঞ্জ ছিল। কয়েকটি বৃক্ষ নিয়ে এক একটি গ্রুপ, যাকে আমি কাব্য করে কুঞ্জ বলছি। যদিও এ তিনটি ছিল রাস্তার ধারে তবুও কিছুটা নিরালা। তার একটি গাছের ডাল পুকুরের জলের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল। বেশ সৌন্দর্য ছিল স্থানটির। ডাল থেকে ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নানক্রিয়া করত পোড়াবাজারের ছেলের দল। আমরা জায়গাটির নাম দিয়েছিলাম—কাশ্মীর। আমরা ওখানে কিছুটা জমি বেছে নিয়ে শীতকালে লংজাম্প হাইজাম্প খেলবার ব্যবস্থা করেছিলাম। জায়গাটিতে এখন একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সৌধ নির্মিত হয়েছে।

বাড়িতে শিক্ষকমশাই আসছেন নিয়মিত, পড়াশুনাও আমার চলছে যথারীতি। কিন্তু ক্লাবের কথাটা মন থেকে মুছে যায়নি, ক্লাবের আকর্ষণ সমানেই রয়েছে আমার। ক্লাবে যাব যাব করছি, যাচ্ছিও দু'একদিন ; কিন্তু হঠাৎ ঘটে গেল এক বিপর্যয়। যে কারণে ভূতনাথের বাবা আমাদের 'ক্লাব' বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে, ভূতনাথ বাড়িতে আবার গরহাজির হতে লাগল দেখে তিনি পুনর্বার তাঁর বাড়িতে আমাদের যাতায়াত দিলেন বন্ধ ক'রে। ক্লাব-বিহনে আবার আমরা ঘরছাড়া হয়ে গেলাম। এবার কী করি। কোথায় যাই? কোথাও ঠাঁই না পেলে অভিনয়ের কথা চিন্তা করাও যাচ্ছে না। অথচ, পাবো কোথায় ঠাঁই? আমরা আবার ভেসে বেড়াতে লাগলাম, বলা যেতে পারে।

ওঘরের দ্বার রুদ্ধ হলো বটে, কিন্তু অন্য ঘরের দ্বার খুলতেই হবে। গতবারে অভিনয় করে যে আনন্দ পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে যে বিপুল খ্যাতি, তাতে ক'রে সবারই মনে তখন এক অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে! আমরা তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে ক'রেই হোক, ক্লাব চালাতেই হবে। আমাদের "সাজাহান" অভিনয় হয়েছিল যেখানে, সেই প্রিয়শঙ্করবাবুর বাড়ির ঠিক বিপরীত দিকে, অর্থাৎ হরিশ মুখার্জী রোডের পূর্বদিকে ছিল একটা তিনতলা বাড়ি, তাকে বলা হতো,—ব্যারাক বাড়ি। বাড়িটার নীচে—দুদিকেই—রাস্তার ধারে—সারি সারি দোকান-ঘর ভাড়া। কাঁসারীপাড়া রোড দিয়ে ছিল তার প্রবেশ-পথ। সেই পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করামাত্র সামনে পড়বে একটি লম্বা ফালি উঠোন আর উঠোনের এক দিকে সব ভাড়াটে ঘর। সিঁড়ি দিয়ে উঠে—তার ওপরেও অনুরূপ ব্যবস্থা। ওপরে অনেকে তিন-চারজন মিলে এক একটি ঘর ভাড়া নিয়ে মেস্‌-বাড়ির মতো থাকতো। এখন

যেমন মফস্বলবাসীদের মধ্যে দেশ থেকে পরিবার নিয়ে এসে ঘরভাড়া করে বাস করার আধিক্য দেখা যায়, তখন ঠিক এতোটা ছিল না, তাই কলেজের ছাত্র, অফিসের কেরাণী, এইসব নানান্ ধরনের লোক থাকতো মেসবাড়িতে। এই বাড়িরই দোতলায় একটি অপেক্ষাকৃত লম্বা ধরনের ঘর আমরা খালি পেলাম, ভাড়া মাসিক আট টাকা। আরও একটি টাকা বেশী পড়বে কেরোসিন তেল, আলোর পল্‌তে ইত্যাদির জন্য।

যাক্ হলো শেষ পর্যন্ত নিজেদের ক্লাবঘর। আগের মতো সেই যে পরের বাড়িতে নিছক পরের অনুগ্রহে থাকা, তার থেকে আমরা বাঁচলাম। বসল ক্লাব। চেত্‌লার হাট থেকে লম্বা সপ্ বা মাদুর দু'চারখানা কিনে নেওয়া হলো, কেরোসিন তেল দেওয়া দেয়ালগিরিও কেনা হলো, গোটাকয়েক কালেণ্ডারও সংগ্রহ করে টাঙানো হলো দেওয়ালে। উপস্থিত এই হলো গিয়ে ক্লাবঘরের চেহারা। পরে 'সম্পত্তি' কিছু বেড়েছিল। ওপরে উঠেই আমাদের ঘরের সামনে—বারান্দায় পড়ত দুটি দরজা, তার একটি আমরা মহলার সুবিধার জন্যই সর্বক্ষণ বন্ধ রাখতাম। আর, এদুটো দরজার বিপরীতে হরিশ মুখার্জীর দিকে যে বারান্দা ছিল, তাতে পড়ত দুটি দরজা—এই তিন দরজার জন্য ক্রীত হয়েছিল তিনটি পা-পোষ। এই আমাদের 'সম্পত্তি', না, আরও একটু আছে, বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকবার যে দরজা, তার জন্য একটি পর্দাও কেনা হয়েছিল। 'অ্যাশ-ট্রে'র কাজ চল্‌ত মাটির খুরিতেই। তারপরে, তৈরী হলো চাঁদার খাতা, সভ্যদের মধ্য থেকে—সেক্রেটারী, কার্যকরী সভ্য, এসব নির্বাচনও হয়ে গেল।

এইভাবে যেদিন আমরা সর্বপ্রথম ক্লাবঘরে গুছিয়ে বসলাম, সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে! আশুবাবু, যাঁকে আমরা 'রাবণ' বলতাম, তিনি হলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। সহকারী সেক্রেটারী হলে কি হয়, আলোতে প্রতিদিন তেল ভরা, ঘর ঝাঁট দেওয়া সব করতেন তিনি নিজের হাতে, এমন কি, খাবার জলের জন্য কলসীতে পর্যন্ত জল ভ'রে গুছিয়ে রাখতেন এক পাশে।

যাই হোক, ক্লাব যখন বসল তখন আমাকেও আসতে হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই। আমাদের বন্ধু প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন মাসতুতো ভগ্নীপতি ছিলেন, খুব শৌখীন লোক, এক অফিসে চাকরি করতেন, আবার অন্য এক ক্লাবের ছিলেন তিনি অপেরা মাস্টার। তাঁর নাম, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। তিনি এসে যোগদান করলেন আমাদের আসরে। নিজেই এসে তুললেন নতুন নাটক ধরার কথা। বললেন—অমৃতলাল বসুর "তরুবালা" করলে কেমন হয়?

আমাদের মন তখন প্রবল উৎসাহে টলমল করছে, একবাক্যে সবাই বলে উঠলাম,—করা যাক্ "তরুবালা।" অচিরেই হয়ে গেল ভূমিকা-বণ্টন। এবার আর আমার ভূমিকা নিয়ে কোনো দ্বিধার ভাব নেই। বৃদ্ধ সাজাহানের রূপসজ্জায় আমার যা সুখ্যাতি হয়েছিল, তাতে করে বৃদ্ধ 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর ভূমিকার জন্য চিন্তা নেই, ওটা সহজেই এসে গেল আমার ওপরে। আর সব ভূমিকা উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে একরকম বণ্টন করে দেওয়া গেল, শুধু দুজন ভদ্রলোককে আনা হলো (ঐ বঙ্কিমবাবুদের

নিজেদের ক্লাব থেকেই। ব্যাটরার ঐদিকেই সম্ভবত ছিল তাঁদের সেই ক্লাব)। সেই ক্লাব থেকে এলেন "তরুবালা"র নায়ক—"অখিল"। আর হাস্য-রসপ্রধান ভূমিকা "হারাণ"-এর জন্য অপর এক ভদ্রলোক। ওঁরা দুজন নাকি ভালো অভিনয় করেন এবং ইতিপূর্বে ওঁদের ক্লাবে ওঁরা 'তরুবালা'য় যথাক্রমে 'অখিল' ও 'হারাণ' করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। মহলা ওঁরা দিতে লাগলেন ভালোই, প্রতি রবিবারেই নিয়ম করেই আসছেন ওঁরা। তবে, ওঁরা আমাদের অতিথি, তাই চা-জলখাবার আর ট্রামভাড়া দিতেই হতো।

দিন চল্‌ছে এভাবে। কিছুদিনের পরে আমাদের সেক্রেটারী জানালেন এর দুঃসংবাদ। বললেন,—এই যে প্রতি মাসে পাঁচ-ছ'টাকা করে বাড়তি খরচা হচ্ছে, এটা কোথেকে আসবে, ভেবে দেখেছ তোমরা?

মুখে মুখে তখুনি হিসাব করে দেখা গেল, সেক্রেটারীর আশঙ্কা অমূলক নয়। যা আমরা চাঁদা পাই বা পাওয়া সম্ভব মাসে মাসে, তার থেকে আমাদের ঘর-ভাড়াটা চালানোই কঠিন, এর ওপরে সত্যিই এই বাড়তি খরচার দায় আমরা নেবো কী করে?

অতএব, স্বাভাবিক কারণেই বন্ধ হয়ে গেল 'তরুবালা।' বন্ধ হবার পর মাসখানেক সময় একপ্রকার চুপচাপেই কেটে গেল বলতে পারা যায়। কিন্তু এভাবে চুপচাপ করে থাকাই বা কেমনতর কথা? তাই, সবাই মিলে বসে আবার ঠিক করা হলো, দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" ধরা হোক।

—হোক।

কে কী পার্ট করবে, সবই ঠিক হতে লাগল অচিরে। "চন্দ্রগুপ্ত"-এর প্রধানতম ভূমিকা চাণক্য। কে করবে? বাইরে থেকে এক ভদ্রলোককে আনা হলো, তাঁর সঙ্গে কথাও হলো ট্রামভাড়া আমরা দিতে পারব না, জলখাবারও দিতে পারব না নিয়মমাফিক। এসব কথা মেনে নিয়েই তিনি মহলায় আসতে লাগলেন। আমাকে ইনি দিয়েছিলেন 'সেলুকাস'-এর ভূমিকা। এ-ও প্রায় বৃদ্ধেরই ভূমিকা। আমি একদিন বন্ধুদের ডেকে বললাম, আচ্ছা বাইরে থেকে লোক আনবার দরকার কী?

ওরা বললে—ওরে বাবা! অতো শক্ত পার্ট। 'চাণক্য' বলে কথা! করবে কে? তাছাড়া লোকেও কুলোচ্ছে না, লোকও কম। বললাম,—তোমরা একবার যদি দেখ, আমি মহলা দিয়ে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি!

বললাম,—হ্যাঁ, দেখিই না একবার চেষ্টা ক'রে।

ওরা সবাই একটু ইতস্তত করল, আর সেটা স্বাভাবিকও। তার পরে বললে,—আচ্ছা, তা ক্ষতি কী? দেখাও আমাদের একদিন।

আমি বললাম—পনরো দিন সময় লাগবে কিন্তু।

ওরা বললে—বেশ, তাই হোক।

"চন্দ্রগুপ্ত" সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আমার দেখা ছিল ইতিপূর্বেই। এবার একখানা বই সংগ্রহ করে আনলাম। শুরু হল আমার প্রস্তুতি। সেই ময়দানে—আমার সেই 'কাশ্মীর'-এ গিয়ে প্রতি প্রভাতে আরম্ভ করলাম আমার আবৃত্তি আর পদচারণা।

নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, যেখানে প্রথম আবির্ভাব ঘটছে চাণক্যের,—"ঐ বদ্ধজলার উপরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে" ইত্যাদি,—সে অংশটা বারবার পুনরাবৃত্তি করে যথাযথ স্বরক্ষেপণটা আয়ত্তে আনবার প্রয়াস করতে লাগলাম। তারপরে, ঐ প্রথম অঙ্কেরই তৃতীয় দৃশ্যে—যেখানে নন্দর সঙ্গে বচসা চলছে চাণক্যের,—সেই অংশটিতে দানীবাবু যে-ভাবে অভিনয় করতেন, তা আমার চিত্তে এখনো জেগে আছে, তার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলির কথা আর আবৃত্তির কৌশল, সবই মনের মধ্যে ছবির মতো আঁকা হয়ে আছে। সবই মনে করে করে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু, সব থেকে কঠিন মনে হলো শেষের দিকে দুটি বক্তৃতা,—"ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা হও! ব্রাহ্মণ, জড়ের মতো খাড়া হয়ে আর দেখছ কী?" এখান থেকে শুরু করে —"আর আলোকে মুখ দেখিও না। রসাতলে যাও।" এই হচ্ছে প্রথমটি। এর মধ্যে এক জায়গায় বলছেন খুব গুরুগম্ভীরভাবে—"পারো ত ওঠো, কপিলের তেজে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে নীচের দর্প ভস্ম করে দাও!"—এই সংলাপের সর্ববিরতির পরে, আবার কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে এনে তিনি ধরতেন,—"আর তা যদি না পার, তাহলে, ওরে ক্ষুদ্র, ওরে ঘৃণিত, ওরে পদদলিত, ওরে মহত্ত্বের কঙ্কাল," এই পর্যন্ত ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে হাউই বাজির মতো উঠে "আর আলোকে মুখ দেখিও না, রসাতলে যাও," বলার সময়, যেন একটা তারাবাজির মতো ফুলে ফুলে ছড়িয়ে, নীচে নেমে যেতো তাঁর কণ্ঠস্বর। "আর আলোকে মুখ দেখিও না"—এ জায়গাটায় তাঁর উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর যেন ফেটে ধীরে ধীরে নীচে নেমে যেত। তারপর খাদে অতি গম্ভীর কণ্ঠে অল্প দাঁত চেপে বলতেন,—"রসাতলে যাও।"

আমি ওঁর মতো অত গলা চড়াবোই বা কী করে, আর খাদে নামাবোই বা কী করে? তবু ছাড়ব না, প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

এছাড়া দ্বিতীয় কঠিন জায়গাটি: একেবারে শেষের দিকে নন্দকে অভিসম্পাত দিয়ে ধীরে ধীরে চাণক্যর বেরিয়ে যাওয়া। সেই অংশটির আবার শেষ কয়েকটি লাইনের কথা বলছি। "সেইদিন দেখবে আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রতিভার বল, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জয় প্রতাপ।"

এই কথাগুলি উনি ক্রমশই উঁচু থেকে উঁচুতে একেবারে সর্ব উচ্চগ্রামে তুলে, বলতে বলতে সর্বপ্রথমের উইঙ্গসের পিছনে চলে যেতেন। আমি মনে করে করে অনুরূপভাবে আবৃত্তি আয়ত্ত করে চলেছি প্রাণপণ প্রচেষ্টায়।

রবিবারে রবিবারে ক্লাবেও যাচ্ছিলাম অবশ্য, একদিন বন্ধুদের সামনে চাণক্যের উপরি-উক্ত অংশটুকুর মহলাও দিলাম। ওঁরা সব মনোযোগ দিয়েই শুনলেন এবং দেখলেনও।

আমি থামতেই ওঁরা হেসে উঠলেন, তারপরে বললেন,—হ্যাঁ, অনেকখানি নকল করেছ দেখছি। তা' তোমার হতে পারে। আরও কয়েকজন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেদিন, বললেন—ভালই হয়েছে।

সভ্যরা বললেন—এবার যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, যেখানে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করছেন, এবং চন্দ্রগুপ্তের মা 'মুরা'কেও বলছেন, ঐ জায়গাটা ঠিক ঠিক আবৃত্তি করে বলো দেখি?

বললাম,—অতদূর এগোয়নি।

—কেন?

—ও পর্যন্ত আসতে আরও কিছু সময় লাগবে।

—বেশ।

একটু আশ্চর্য হয়েই বললাম—তাহলে, সত্যি বলছেন, আমি যেটুকু 'চাণক্য' করলাম তা পছন্দ হয়েছে আপনাদের?

—তা একটু হয়েছে বই কী!

উৎসাহিত হ'য়ে বললাম—যদি তাই হয়ে থাকে ত বলুন, আমি পরিশ্রম করি। নইলে মিছেমিছি—

ওঁরা বললেন—না না, লেগে যাও। তারপর যা থাকে বরাতে।

সত্যিই দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেলাম আমি। মহড়া চলতে লাগল চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত। আমি অবশ্য সব মহড়াগুলিতেই থাকতে পারতাম না, কারণ, আমার বাড়িতে মাস্টারমশাই পড়াতে আসতেন সন্ধ্যার সময়। যেমন করেই হোক, সন্ধ্যা হবার আগেই বাড়ি ফিরতে হতো। কারণ, বাবা যদি শুনতে পান যে, মাস্টারমশাই এসে বসে আছেন, আর আমি তখনো বাড়ি এসে পৌঁছইনি তাহলে বাবা ভীষণ বকাবকি করবেন। তাই করি কী, মহলা ফেলে রেখে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই বাড়ি ফিরছি। অথচ, মহলায় রীতিমত না থাকতে পারলে আমার 'চাণক্য'ও তৈরি হতে পারে না। তাই মাস্টারমশাই-কে অনেক মিষ্টি ক'রে—অনেক অনুনয়-বিনয় করে একদিন বললাম—স্যার, আপনি সকালে আমাকে পড়াতে পারেন না? মাস্টারমশাইয়ের বিকেলে একটি ছাত্রও বোধ হয় ছিল, তাই তিনি সকালে পড়াবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন এক কথাতেই। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলেন—সকালে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না ত?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—কোনো অসুবিধা নেই। সকালে বেড়িয়ে এসে আটটা-ন'টা পর্যন্ত পড়তে পারব।

মাস্টারমশাই বললেন—ঠিক আছে, তোমার বাবাকে বলব।

বাবাকে উনি সেইদিনই বললেন কথাটা। বললেন—আমি সকালে আসব এবার থেকে। ও-ও স্থির হয়ে পড়াশুনা করবে তখন। সন্ধ্যেয় ওর মনটা একটু চঞ্চল থাকে লক্ষ্য করেছি।

বাবা অমত করলেন না, সুতরাং সকালবেলাতেই পড়াতে আসতে শুরু করলেন মাস্টারমশাই।

আমার পক্ষেও মহড়ায় একটু বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হতে লাগল। তার ফলে, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরার ব্যাপারে ক্রমশই পড়তে লাগলাম একটু পিছিয়ে। কিন্তু, সেটা যাতে কারুর ততটা লক্ষ্যে না পড়ে, তাই এসেই অমনি তাড়াতাড়ি বই নিয়ে বসে যেতাম পড়তে। এমনি করে মহড়ার জন্য যে-টুকু সময় পাই, তাতেই আমি মন ঢেলে আমার ভূমিকা তৈরি করে চলেছি।

১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে—সরস্বতী পুজোর আগে—ঐ-সেই প্রিয়শঙ্করবাবুর বাড়িতেই আমাদের "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় হয়ে গেল। প্রতিবাসীরা খুব বেশী করেই এবার চাঁদা দিলেন, বলতে গেলে আমাদের আশাতিরিক্ত। এর মূলে ছিল আমাদের গতবারের অভিনয়ের সাফল্য—আমাদের "সাজাহান" সকলেরই খুব ভালো লেগেছিল। এবারে আর তক্তপোশ চেয়ে এনে মঞ্চ তৈরি করবার দরকার হলো না। স্টেজ-প্ল্যাটফর্ম-পোশাক ইত্যাদি সবই ভাড়া করা হলো, পোশাকের ব্যাপারে একটু বেশীই খরচ পড়ে গিয়েছিল, কারণ, গ্রীক পোশাকের ভাড়া বেশী। কী চুল, কী পোশাক আর সাজসজ্জা,—সবেতেই এবার খরচ হলো বেশী। হয়েও কোনো দেনা হলো না আমাদের এবার। আমাদের আর্থিক অবস্থা একটু সচ্ছলই হয়েছে বলতে হবে। অভিনয়ও আমাদের হয়েছিল ভালো, লোকে লোকারণ্য, ঘন ঘন হাততালিও পড়েছে। কেবল এক জায়গায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, যেখানে গুপ্তচররা চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার ষড়যন্ত্রের কথা চাণক্যকে এসে শোনাচ্ছেন। প্রথম গুপ্তচরের প্রবেশ ও প্রস্থানের পর চাণক্য আহ্বান করলেন তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবলকে।

বীরবলের বদলে প্রবেশ করল অন্য একটি লোক। তার দিকে 'চাণক্য'-রূপী আমি ফিরে তাকিয়েছি, দেখি, অন্যদিক থেকে আরেকজন এসে হাজির। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। এখানে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবল নমস্কার জানিয়ে বলবে,—"কী আজ্ঞা হয়?"—কিন্তু, দুজনের একজনও বলছে না একটি কথা। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শুধু আমাকে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে কোনো বাক্য নেই। সে-ব্যক্তিই কথা বলবে মনে করে তার দিকেই তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার পিছনের ব্যক্তিটির দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম,—'কী আজ্ঞা'—

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আমি তার দিকে ফিরে তাকানো মাত্রই দেখি, সে কথাটা শেষ না করেই সোজা চম্পট দিলে। আগে যে আসছিল, সে-ও কথা শেষ না করে পালিয়ে গেল। আমি ত ব্যাপার দেখে হক্‌চকিয়ে গেছি। কী করবো? কার সঙ্গে কথা বলবো? দর্শকরাও ত হেসেই উঠল।

উপায়ান্তরবিহীন হয়ে প্রম্প্‌টাররা এবার একেবারে চন্দ্রকেতুকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সামনে। সে এসেই বললে—"আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব?"

আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। সোৎসাহে বললাম—"হাঁ চন্দ্রকেতু। চন্দ্রগুপ্ত আজ রাত্রিকালে দাক্ষিণাত্য জয় করে ফিরে আসছেন জানো?"

শেষ করলাম আমার সংলাপ। এই দৃশ্যে চাণক্যের খুব সুন্দর আবেগময় বক্তৃতা—রহস্যময়

বাণীসম্বলিত কথোপকথন আছে। এর পরেই এক বালিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"জয় হোক বাবা, চারটি ভিক্ষা পাই।" তার পরে মঞ্চে প্রবেশ করল ভিক্ষুক বালিকা। শেষে "ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী" গান। গানের শেষে চাণক্যের ভিক্ষাদান এবং ভিক্ষুক ও বালিকার প্রস্থান। দৃশ্য সমাপ্ত হবার পর ভিতরে এসে প্রশ্ন করলাম,—কী হয়েছিল? ওরা যা বললে, তাতে ব্যাপারটা বুঝলাম এই যে, প্রম্প্‌টারের অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আসল সৈন্যাধ্যক্ষ 'বীরবল'কে হাতের কাছে না পেয়ে, বাড়তি যে লোককে সৈন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, তাকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপরে আসল 'বীরবল' মঞ্চপ্রবেশ করে অন্য আরেকজনকে দেখে কেমন যেন ভাব্যাচাকা খেয়ে গেল, তার মুখে কোনো কথা জোগালো না। সে পালালো।

যাই হোক, ওর পরের দৃশ্য থেকে আমার হলো একটু বিপদ। গলা যেতে লাগল বসে। আদা, লবঙ্গ, তালের মিছরী প্রভৃতি জিনিস তখন থিয়েটার করবার সময় প্রস্তুত রাখা হত, সেইসব নিয়ে চিবোতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই ফল হলো না। চাণক্যের কন্যা ফিরে পাওয়ার দৃশ্যটি 'চন্দ্রগুপ্ত'র গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। এ'দৃশ্যে আমার গলার স্বর আর যেন বেরোয় না। তবুও, প্রাণপণ চেষ্টায় ভালো করে চালিয়ে দিলাম মনে হয়। শেষও হলো অভিনয়। সুখ্যাতি পাওয়া গেল খুবই। ভালো করে রঙ্‌ তুলে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। চলতে চলতে ভাবছিলাম, আমার গলার যা ক্ষমতা, তার অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছে। চীৎকার করেছি বেশী, মাত্রা ঠিক রাখতে পারিনি। তারজন্য আমি কতটা দায়ী, আর আমাদের শখের দলের মহড়ার ব্যবস্থাই বা কতটা দায়ী, তা মনে মনে বিচার করেও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ক্লাবে মহড়ার সময় দু-চার পাঁচটা দৃশ্যও একসঙ্গে মহড়া দিয়েছি, গলার কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু এ'হচ্ছে স্টেজে—খোলা জায়গায়—বেশ চীৎকারের সঙ্গে অভিনয় করতে হয়েছে। এতটা আমার গলা সহ্য করতে পারেনি। তার মানে, একসঙ্গে পুরো মহড়া দেওয়ার অভ্যাস আমার যথাযথ হয়নি, বুঝে নিতে হবে।

বাড়ি ফিরে এসে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল দরজা। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাড়িতে বলাই ছিল, থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি। তাই, সে রাত্রে কোনো-কিছু হলো না। কিন্তু, পরের দিন সকালে আমার গলার আওয়াজ শুনে মা প্রশ্ন করলেন—তোর গলা অমন শোনাচ্ছে কেন?

মাকে বললাম—খোলা জায়গায় বসে থিয়েটার দেখছিলাম কিনা, তাই বোধ হয় গলা ধরে গেছে। মা কতখানি বিশ্বাস করেছিলেন আমার কথা জানি না, তবে, এ নিয়ে আর কেউ কিছু বলেননি আমায়। আমি তখন নিয়মিত পড়াশুনায় মন দিয়েছি বলেই বোধ হয় এ-ফাঁড়া আজ কেটে গেল।

এ অভিনয় হয়েছিল সরস্বতী পুজোর ঠিক আগে, তার মাসখানেক পরে মারা গেলেন আমার ঠাকুমা। ১৯১৫ সালেরই কথা। আমি ছিলাম তাঁর প্রথম পৌত্র, আমার ওপর তাঁর যে-স্নেহ ছিল,

তার স্বাদ আমার জীবনে হয়ে আছে অবিস্মরণীয়। ঐ যে আগে বলেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখতাম। তারজন্য পয়সা পেতাম এই ঠাকুমার জন্যই। চার আনা-ছ'আনা পয়সা ওঁর কাছে চাইলেই আমি পেতাম। আরও ছোটবেলায় যখন আমরা চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাড়িতে থাকি—তখন আমার আশ্রয় ছিল ঐ ঠাকুমা, আশ্রয় ছিল আমার ঐ ঠাকুমারই ঘরখানা। বোধ হয় তখন সংসারের এই একটিমাত্র মানুষ, যিনি আমার অন্তরের সব কথা বুঝতেন। শিশু অবস্থায় আমি নাকি তাঁর কোলে শুয়ে থাকতাম। যখন একটু বড়ো হলাম, কোলে আর ধরতাম না, তখন তাঁর কোলে মাথাটি দিয়ে শুয়ে থাকতাম, আর তিনি আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতেন। আরও পরে, অর্থাৎ বালক বয়সে সন্ধ্যাবেলা খেলাধূলা সেরে বাড়ি ফিরেই ঢুকতাম গিয়ে ঠাকুমার ঘরে। মার ঘরে ঢোকা নিষেধ ছিল। হাঁটু পর্যন্ত না ধুয়ে এলে ঘরে ঢুকতে দিতেন না, কিন্তু শীতকালের সন্ধ্যাবেলায় ঠাণ্ডা জলে পা-ধুয়ে-আসা! সে ছিল আমার কাছে বিভীষিকা! আমি আবার একটু শীতকাতুরেও ছিলাম। ঠাকুমা করতেন কী, আমি তাঁর ঘরে এসে শুয়ে পড়তেই, তিনি একঘটি জল গরম করে এনে, সেই জলে গামছা ভিজিয়ে ধীরে ধীরে আমার পা ধুইয়ে দিতেন। ফোমেনটেশনের মতো লাগত, আরাম হত, আর আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। রাত্রে, তারাপদ এঘরে এসে দুহাতে করে আমাকে তুলে নিত। নিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসত মায়ের ঘরে। এ ছাড়া, একাদশীর পর—দ্বাদশীর পারণের দিনে—ঠাকুমার কাছ থেকে মিছরীর জল—মুগডাল ভিজানো—এসব খেতাম। আর খেতাম ঠাকুমার সেই বড়ি দেবার ডাল-বাটা। খেতে বড় ভালো লাগত। ঠাকুমা আমার জন্য লুকিয়ে রেখে দিতেন। ছড়া তেঁতুল নুন দিয়ে, আর চাটনীও খেতাম ঠাকুমার কাছ থেকে।

একবার বুঝি পশ্চিমে গিয়েছিলেন ঠাকুমা তীর্থ করতে। আমার জন্য সেখান থেকে এনেছিলেন অনেকরকম খেলনা। তার মধ্যে 'ঢেবুয়া' বলে একটা জিনিস—খাঁটি তামার জিনিস—তেঁতুলবিচির মত দেখতে। এক পয়সায় তা তখন চারটে করে নাকি পাওয়া যেত—কাশী ও বৃন্দাবন অঞ্চলে। এই 'ঢেবুয়া' ছিল আমার ভয়ানক প্রিয়বস্তু। এই 'ঢেবুয়া' আমি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলাম আমার অফিসে!

'অফিস' আমার একটা ছিল, ছিল শৈশব থেকেই। বাবা একটা ঘরে টেবিলের ওপর কাগজপত্র সাজিয়ে কাজ করতেন, সবাই বলত, ওটা অফিসঘর। বাবা কী করছেন, না, অফিসের কাজ। এখন গোল কোরো না, বাবা অফিসের কাজ করছেন।

এই 'অফিস—অফিস' শুনতে শুনতে আমারও 'অফিস' করবার শখ হয়েছিল শৈশবে। ঠাকুমার ঘরেই একটা দেয়ালে একটা তাক করা ছিল কাঠের তক্তা দিয়ে। তাকে কিছু কিছু জিনিসপত্র ছিল। সে-সব সরিয়ে—সেই তাকে আমার নিজের জিনিসপত্র সাজালাম, তার সামনে রাখলাম একটা টুল। এই হল আমার অফিস। মানে, অফিস-অফিস-খেলা আর কী। ব্যাখারী দিয়ে তাতে কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়ে ফুলটুল সাজিয়ে একটা বাহারী জিনিস তৈরি হয়েছে মনে করে তাকে রেখে দিতাম।

আর সব টুকিটাকি জিনিস ত ছিলই। এই অফিস-খেলা খেলেছি দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত। পেটুক ছিলাম না বটে, তবু টুকটাক খেতেটেতে ভালো লাগত। এই সব আবদার রাখতো আমার ঠাকুমা। মিষ্টি-রাবড়ী—এসব খেতে তেমন পছন্দ করতাম না, যতো সব টুকিটাকি খাদ্য, তা খাওয়া চাই। যেমন, মটর ডাল-ভাতে খেতে বড় ভালোবাসতাম।

এ ত গেল শৈশবের কথা। বালক বয়সে যখন এ বাড়িতে উঠে এলাম, তখন ঠাকুমার ঘরে আর তত আড্ডা ছিল না। উনি ছিলেন পল্লীগ্রামের বধূ—পল্লীগ্রামের মেয়ে। বাবা কলকাতায় এসে চাকুরে হবার পরে যখন বউ-ছেলে নিয়ে সংসার পাতলেন, তারপরে আনালেন পল্লী থেকে ঠাকুমাকে। ঠাকুমা ঠিক গল্প বলিয়ে ছিলেন না, গল্প বলতেও পারতেন না। তবে, তখনকার দিনে গল্প করবার জন্য সব মহিলা ছিলেন, পুরুষদের কথাও শোনা যায়, বৈঠকখানায় একাদিক্রমে চার ঘণ্টা ধ'রে গল্প বলে বাবুদের আসর রাখতেন জমিয়ে। এই যে গল্প-বলিয়ে মহিলাদের কথা বললাম আমাদের বাড়িতে ঠাকুমার কাছে আসতেন ঐরকম একটি মহিলা। বিধবা ছিলেন তিনি, নাম সৌদামিনী। আমরা বলতাম—সত্নপিসী। সত্নপিসী গল্প-বলার বিনিময়ে সিদে পেতেন আমাদের বাড়ি থেকে। সিদে ছিল মাসকাবারী চালডাল—মশলাপাতি-তরিতরকারী কিছু নুন, আট আনা পয়সা—আর বছরে পুজোর সময় একখানা থান। সন্ধ্যার পর ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে সত্নপিসীর গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম কে জানে!

কিন্তু, এ বাড়িতে এসে আর তাঁর ঘরে গল্প শুনতে যাচ্ছি কই? তখন ত থিয়েটার-নিয়ে আমি মত্ত হয়ে উঠেছি বলা যেতে পারে। তবু তিনি, আমি বাড়ি এলেই ডেকে পাঠাতেন। তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় বসে তাঁকে আমি গল্প বলতাম। বয়স হয়েছিল আশীর কিছু ওপর। দীর্ঘাঙ্গিনী। পাতলা চেহারা। গায়ের রঙ ছিল খুবই গৌরবর্ণ। খুবই বৃদ্ধা ছিলেন, তবু তাঁর সৌন্দর্য যেন ম্লান হয়নি বলে মনে হত। একাহারী ছিলেন। বহু ব্রতনিয়মে নির্জলা উপবাস করতেন। এই রকমই আচরণ ছিল বিধবাদের, তা সে বৃদ্ধাই হোন আর যুবতীই হোন। কী করে যে তাঁরা অমন নির্জলা উপবাস করতেন, কে জানে। আজ মনে পড়ে, আমার বিবাহ হবার আগের বছরে আমারও একবার ইচ্ছা হয়েছিল শিবরাত্রির উপবাস করব। সমস্ত দিন উপবাসে রইলামও। কিন্তু, সন্ধ্যা হতে-না-হতেই গলা শুকুতে লাগল। মুখ-টুক শুকিয়ে গেছে দেখে মা বললে—তুই আর পারবি না, তুই খেয়ে ফেল। রাত বারোটা হোক—তখনই খাবি। উপোসে রাত কাটাতে হবে না।

বললাম—বারোটা কী, এখনি খিদে পাচ্ছে।

ন'টার সময়ই খেতে বসলাম আর থাকতে না পেরে। সেই উপবাসের অনুভূতিকে স্মৃতিতে অনুসরণ করে, একথাই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হচ্ছে, ওঁরা অমন উপবাস করতেন কী মন্ত্রবলে! পুরো দুদিন পর্যন্তও উপোস করে থাকতেন, দেখেছি। অম্বুবাচীতে ত তিনদিন, তবে নির্জলা নয়।

ঠাকুমা চলে গেলেন, আর আমার সমব্যথীও চলে গেল। তাঁরই কাছে ছিল আমার যত

আবদার, আর যত আত্মকথন। বৃদ্ধ বয়সে পেট-ভেঙে-যাওয়া, অতিসারই বলে বোধ হয়। তাতেই তিনি গেলেন। অসুখ করলে কখনো ডাক্তারী ওষুধ খেতেন না—কবিরাজী ওষুধ খেতেন। কেবল এইবারই দেখলাম কবিরাজীতে যখন পারল না, হোমিওপ্যাথী ওষুধ খেলেন। কিন্তু হায়রে, তবু রাখা গেল না।

দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। ঠাকুমার শ্রাদ্ধের কাজও হয়ে গেল। মা ত সেই সময় বসন্তরোগে অচৈতন্য। সে বছরে ভীষণ বসন্ত হচ্ছিল চারিদিকে—বসন্তের মহামারী বলা চলে। আমার বোন তখন চার-পাঁচ বছরের, তারই খুব বসন্ত হয়েছে। মারটা ক্রমশ শুকিয়ে আসছে। ছোট ভাই পঞ্চুরও দেখা দিয়েছিল, তবে খুব অল্প। আমারও জ্বর হয়েছিল, তবে দেখা দেয়নি। মা অসুস্থ, তখনো সেরে ওঠেননি, বোনের খুব অসুখ। শ্রাদ্ধের কাজকর্ম কে কী করে? উঠোনে বৃষোৎসর্গ হবে। কিন্তু, বাড়িতে এমন অসুখ-বিসুখ, প্রথামত কীর্তন দেওয়া হবে না বলে স্থির হল।

বাড়িতে এ উপলক্ষে এসেছিলেন ঠাকুমার বোন—অর্থাৎ বাবার মাসিমা, কলকাতায় যাঁর বাড়িতে এসে বাবা আশ্রয় পেয়েছিলেন। মাসিমারা জমিদার, বড়লোক। তিনি শুনে বললেন—কীর্তন হবে না কী?

তিনি বললেন—দিদি কিছু টাকা জমা রেখেছিল আমার কাছে। বলেছিলাম, এ-টাকা যদি তোমায় সময়মতো না দিতে পারি? দিদি হেসে বলতেন—আমি মরলে শ্রাদ্ধের সময় ঐ টাকায় কীর্তন দিস্। সেই টাকা রয়েছে আমার হাতে, আমিও দিদির কাছে বাক্যবদ্ধ, কীর্তন দিতেই হবে।

তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে কীর্তন হল। মেয়ে-কীর্তন। দক্ষিণ-কলকাতার নাম-করা কীর্তনওয়ালী তখন ছিল মানদাসুন্দরী। তাকেই আনা হয়েছিল।

'চাণক্য' যখন করি, তখন গোঁফের রেখা যা উঠেছিল, তা কামাইনি। কারণ, গোঁফ কামালে বাড়িতে যদি ধরে ফেলে যে, আমি থিয়েটার করেছি! তাই গোঁফের ওপরে রঙ দিয়ে তা ঢেকে দিতে হয়েছিল থিয়েটারের দিন। পরে, মানে বহু পরে, যখন সাধারণ মঞ্চে আমি অভিনয় করি, তখন একবার 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ আমি 'সেলুকাস', দানীবাবু 'চাণক্য'। তখন দেখেছিলাম গোঁফ ঢাকার কৌশলটা। দানীবাবুর গোঁফ ছিল। ওঁর ব্যক্তিগত ড্রেসার, মন্মথ ছিল তার নাম, সে রঙ দিয়ে ওঁর গোঁফ বেমালুম ঢেকে দিল একেবারে। সাদা রঙের সঙ্গে লাল রঙ মিশিয়ে লালের ভাগ একটু বেশী দিতে হবে—দিয়ে 'কপার কলার' করে গোঁফের ওপর দিলেই তা ঢাকা পড়ে যায়, সেদিন তা আমি ভাল করেই পেরেছিলাম জানতে।

এবার ঠাকুমার শ্রাদ্ধে গোঁফ আমাকে কামাতে হল। আর এই যে কামালুম আর কখনো তা রাখিনি। গোঁফ না-রাখার চলনও তখন অবশ্য হয়ে এসেছে।

শ্রাদ্ধ নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হল, কিন্তু আমি যা হারালাম, তা আর ফিরে পাবার নয়। অহেতুক, অযাচিত সেই স্নেহ ঠাকুমার, যা আমি কোথাও পাইনি। মার কাছে পেতাম শাসন, বাবাকে করতাম

ভয়। তাই, এই স্নেহের আশ্রয় যখন চলে গেল, তখন মনে হল, বুকের ভিতরটা আমার শূন্য হয়ে গেছে। ঠাকুমার চলে যাওয়া আমার জীবনের প্রথম ক্ষতি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল বটে, কিন্তু আমার মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। মা, বোন আর ভাই ধীরে ধীরে সেরে উঠছে অসুখ থেকে, আমার অসুখ ছিল না, কিন্তু মনটা কেমন যেন এক অব্যক্ত কান্নায় গুমরে উঠছে। মনের এই অবস্থাতেই ভর্তি হলাম গিয়ে আমাদের পুরানো স্কুলে, সেই লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে। পড়াশুনা রীতিমতই শুরু হয়ে গেল এবার। আমার গৃহশিক্ষক একদিন বাবাকে বললেন, অহীন্দ্র দেখছি সংস্কৃতে একটু কাঁচা আছে, একজন পণ্ডিত মশাই ওকে পড়ালে ভাল হয়।

বাবা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। অচিরেই বন্দোবস্ত হয়ে গেল এক পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে। ফলে এই হল যে, দুবেলাই পড়া চলতে লাগল, সকালে মাস্টারমশাই, বিকেলে পণ্ডিতমশাই। সকাল-বিকেল যদি এভাবে পড়াতেই আটকা থাকি ত ক্লাবে যাবো কখন? ক্লাবে যাওয়া আর হচ্ছে না একেবারেই।

এবার স্কুলে গেলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেই। এই স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষের দিকে ভাল হয়ে দাঁড়ায় নি, প্রবল একটা অভিমানও ছিল স্কুলটির প্রতি। তাই, যাচ্ছি বটে স্কুলে, কিন্তু তেমন ইচ্ছার সঙ্গেও না, উৎসাহের সঙ্গেও না। অন্য নতুন স্কুলে হলে কী হত বলা যায় না। নূতন পরিবেশে, অনুকূল আবহাওয়ায় আমার উৎসাহ কতটা বেড়ে যেত, আজ তার হিসাব না করেও বলতে পারি, সেই পরিচিত পুরাতন পরিবেশে, আমার মন যেন তেমন খাপ খেতে চাইছে না আর!

অবশ্য, এই কয়েকবছরে পুরানো স্কুলটার পরিবর্তনও হয়েছে কম নয়। কলেজটা উঠে গেছে। স্কুলে, মেঝেটা টালি বিছানো—বাঁকা বাঁকা খাদরী করা ছিল, সেটা সিমেন্ট হয়ে গেছে। সেই আমাদের প্রকাণ্ড হলঘরটা, যেখানে থিয়েটার হয়েছিল, তারও চেহারা গেছে বদলে। হলঘরের কত কথাই না মনে পড়ে! স্কুলের সামনের মোটা মোটা থাম-দেওয়া গাড়িবারান্দা। সেটা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশ করতাম আমার হলঘরে। কী স্কুল বসবার আগে, কি ছুটি হবার সময়,—হলঘরটাতে স্কুলের সমস্ত ছেলে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, আজও যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে! সেই ছিল নিয়ম। স্কুল-আরম্ভ হবার আগে এবং ছুটি হবার আগে, দুবার করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে হত, কখনো বাঙলায়, কখনো ইংরেজীতে। বাঙালী শিক্ষক থাকলে বাইবেল থেকে প্রার্থনা করানো হত বাঙলায়, ইংরেজ শিক্ষক থাকলে, হত ইংরেজী ভাষায়। প্রার্থনাই শুধু নয়, হত রোল্-কল দুবার করে, একজনমাত্র শিক্ষক উপস্থিত থেকেই এটা পরিচালনা করতেন। প্রারম্ভে ও শেষে। যাতে করে বোঝা যেত, স্কুল চলতে চলতে কোনো ক্লাসের কোনো ছেলে না ক্লাস পালিয়ে গিয়ে থাকে। বেশ মনে আছে, হল্‌এ ছেলেরা

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ছুটির সময় প্রথমে ফার্স্ট ক্লাস, তারপরে সেকেণ্ড, এমনি করে ইনফ্যাণ্ট ক্লাস পর্যন্ত। 'নাম ডাকা' হত কখনো ইনফ্যাণ্ট ক্লাস থেকে, কখনো বা ফার্স্ট ক্লাস থেকে। এইভাবে 'ক্লাস বাই ক্লাস' বা শ্রেণীর পর শ্রেণী, ধীরে ধীরে সার বেঁধে গেট পেরিয়ে যে যার পথে চলে যাচ্ছে। কখনো সর্বোচ্চ শ্রেণী থেকে, কখনো শিশুশ্রেণী থেকে। এর ফলে হুড়মুড় করে বেরুবার কোনো তাড়া নেই, হৈ হৈ হাঙ্গামা নেই, প্রবল চিৎকারও নেই!

কিন্তু সেই হলঘরও আর ঠিক তেমনি নেই। এবারে গিয়ে দেখি, হলঘরটায় পার্টিশন দেওয়া হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকেই ডানহাতে আট ফুট মতন উঁচু করে ইঁটের দেওয়ালের পার্টিশন দিয়ে তিনটি ঘর হয়েছে তৈরি, একটিতে অফিস, ক্যাশ জমা নেবার কাউণ্টার, আর অন্য দুটিতে ক্লাস বসছে। স্কুলে ছাত্র খুব বেড়ে গেছে, তাই এই ব্যবস্থা। কলেজ উঠে গেছে, শুধু স্কুল, ক্লাসের সেকশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু ছেলে ধরে না। আগে ছিল টানা পাখা, এমন সে জায়গায় ইলেকট্রিক ফ্যান হয়েছে, লাইটের ব্যবস্থাও হয়েছে জায়গায় জায়গায়। স্কুলের উত্তরদিকে এবং হোস্টেলের দক্ষিণদিকে একটা টেনিস খেলার লন্ ছিল, এখন আর তাতে দেখছি টেনিস খেলা হয় না। আমাদের প্রধান শিক্ষক পূর্ণবাবু অবসর নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হয়েছেন সুধীর চ্যাটার্জী মশায়। অন্যান্য পুরাতন শিক্ষক অবশ্য অনেকেই আছেন। আবার, আমার পুরাতন সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন নীচের ক্লাসে শিক্ষকতাও শুরু করছেন। শিক্ষকের অভাব হলে তারা যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়াতে আসত, তখন আমার হত ভয়ানক অস্বস্তি। আমি সেই ক্লাস ছেড়ে বাইরে চলে আসতাম। তারা অবশ্য সেটা বুঝত এবং কখনো আপত্তি করত না।

স্কুলে নিয়মিতই যাচ্ছি, কিন্তু মন বসছে না। আমাদের আবার 'সানডে স্কুল' হত, সকাল ছটায় বসত সেই ক্লাস, এক ঘণ্টা ধরে প্রতি রবিবার পড়ানো হত—বাইবেল। এই ক্লাসের ওপর আমাদের আকর্ষণ ছিল বিলক্ষণ। আকর্ষণের কারণ ছিল, ছবির কার্ড। ক্লাশ শেষ হয়ে যাবার পর, যেসব ছাত্র উপস্থিত থাকত, তাদের সবাইকে দেওয়া হত এক-একটা করে ছবির কার্ড। শ্রেণী ভেদে ছোট-বড় আকারের কার্ড বিলি করা হতো। আকারে এক ইঞ্চি থেকে তিনি ইঞ্চি পর্যন্ত ছিল সেইসব কার্ড। তাতে আঁকা থাকত সুন্দর সুন্দর ফুল আর পাতা, গাছ-পালা আর পাখি, পাহাড় আর ঝরনা। আর কার্ডের নীচে একটা কোণে ইংরেজীতে লেখা থাকত বাইবেল থেকে উদ্ধৃত সুন্দর সুন্দর বাণী। এইসব কার্ড সংগ্রহ করবার কী আগ্রহই না তখন ছিল আমাদের! ভোর পাঁচটা থেকে বির্জিতলাওএর গীর্জার মাঠে বেড়িয়ে ছটায় সান্‌ডে ক্লাস করে, ভবানীপুর কংগ্রীগেশন চার্চে বক্তৃতা শুনে, তারপরে ফিরে আসতাম বাড়ি।

এসব 'সানডে স্কুল'-এর ক্লাসে অনেকেই যাচ্ছে, কিন্তু আমার আর তাতে যেতে ইচ্ছা করে না, কার্ড জমানোর দুরন্ত নেশাও সেদিন ছুটে গেছে। স্কুলের ক্লাসে যেতেও মন সরে না, তবু যেতে হয়, ও-ক্লাসে না গিয়ে ত উপায় নেই! সহপাঠী বন্ধু বা নতুন সঙ্গীদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে পারছি

১৬

তেমন। তখন আমার সমবয়সী বন্ধু একজনই ছিল বলতে পারি। তার নাম সুকৃতীশ্বর ভট্টাচার্য, আমাদের পুরোহিত বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের ছোট ভাই। আমাদের সেই দেবেশ্বরবাবুর সম্পর্কে জ্ঞাতি-ভাই। আমার মতো সুকৃতীশ্বরও থিয়েটার করেছে, তার নামও হয়েছিল। পণ্ডিত বংশের ছেলে বলে বাংলা আর সংস্কৃত উচ্চারণ তার খুব ভালো ছিল। এখন তিনি সংস্কৃত টোল করেছেন, সেখানেই করেন অধ্যাপনা, এবং জেনেছি, খুব বড় জ্যোতিষী। আরও এক বন্ধু ছিল আমার তখন। তার নাম পাঁচুগোপাল দাস, বাড়ি তার খিদিরপুরে, তারও ছিল থিয়েটারে খুব ঝোঁক। পাঁচুগোপাল এখন আলিপুর কোর্টে ওকালতী করেন। এই পাঁচুগোপালেরই সেদিন বিশেষ উৎসাহ হয়েছিল অভিনয় করবার। সে সেদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, যাতে স্কুলে একটা থিয়েটার হতে পারে। বলা বাহুল্য আমিও তাতে কম উৎসাহিত ছিলাম না। কিন্তু অত উৎসাহ থাকলে কী হবে, চেষ্টাচরিত্র করেও আমরা বিফল হলাম। সেই এক সমস্যা—টাকা কোথায়? যখন কলেজ ছিল, তখন মোটা টাকা চাঁদা উঠত, এখন চাঁদাই ওঠা দায়, থিয়েটার হবে কী করে?

সুধীরবাবু বললেন,—স্কুলে এসেছ, মন দিয়ে পড়াশুনা করো, দুরন্তপনা করো না।

প্রতিবাদ করতে পারতাম, বলতে পারতাম, দুরন্তপনাটা কোথায় দেখলেন স্যার?

কিন্তু কিছুই বললাম না, অন্তরের অভিমান যেভাবে এযাবৎ অন্তরেই পুষে আসছি, তেমনি করে অভিমানী মৌনতায় সরে এলাম ওঁর কাছ থেকে।

কিছুই ভালো লাগে না। স্কুলে ঢুকতেই মন খারাপ হয়ে যায়।

স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন আনন্দ পণ্ডিতমশাই, তিনি খুবই সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর একটিও দাঁত ছিল না, ফোকলা মুখে যা বলতেন, তার একটি বর্ণও বোঝে কার সাধ্য! উল্টে, তাঁর ফোকলামুখের সেই উচ্চারণ-ধ্বনি শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় হেসে ফেলতাম, অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়েই। তিনি কিন্তু ঠিক তা ধরতে পারতেন। বলতেন—সংস্কৃত শিখছ না, অথচ থিয়েটার করতে শিখছ? কিন্তু সংস্কৃত না শিখলে রসের ঘরের চাবি কোথায় পাবি রে, অ্যাঁ?

তখন কথাটার তাৎপর্য বুঝিনি। তখন ভাবতাম, সংস্কৃতর প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করবার জন্যই বৃদ্ধ এইসব 'স্তোকবাক্য' দিচ্ছেন। কিন্তু তার পরে বুঝেছিলাম, সংস্কৃত না পড়ার দরুণ রসের চাবি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেছে। সেই রসের ঘরের দরজায় পরে অনেক ধাক্কাধাক্কি করেছি, হাত দিয়ে অনেক কিছুই হাতড়ে হাতড়ে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দরজা খোলেনি।

যাই হোক, প্রতিদিন বই-খাতা নিয়ে যথারীতি স্কুলে যাই আর আসি। পথ দিয়ে আসা আর যাওয়া, এই আমার রোজকার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসতে-যেতে পথেরই বা কত পরিবর্তন দেখতাম! সেই পরিবর্তনের চেহারা দেখতে দেখতে, তখনকার খবরের কাগজে যুদ্ধের যে-সব ছবি বেরুতো, সেই ছবির কথা মনে পড়ে যেত। জার্মান গোলা পড়ে যেমন বিরাট-বিরাট জনপদ সব ভেঙে চুরমার হয়ে মৃত শহরের মতো দেখাত সেই সব ছবিতে, তেমনি মনে হত ভবানীপুরের

ভেঙেফেলা বাড়িগুলো। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাজ আরম্ভ হওয়ায় ভবানীপুরের পথ আর কতক বাড়িঘরদোর তছনছ হচ্ছে।

প্রথম ভাঙন লক্ষ্য করলাম আমাদের স্কুলের বিপরীত দিকে রসারোডের পশ্চিম পারে, যে বিরাট বস্তি ছিল, সেখানে। জায়গাটা হল শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট আর রসারোডের সঙ্গমস্থলে। আরও একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক। রসারোডের পূর্ব পারে, এলগিন রোডের মোড়ে ছিল প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে পাদ্রীরা খৃস্টধর্ম প্রচার করতেন। আর তার ঠিক পিছনে এলগিন রোড়ের ওপরে ছিল ল মেমোরিয়াল এবং বটগাছটার ঠিক দক্ষিণে—রসা রোডের ওপরে ছিল আমাদের লণ্ডন মিশনারী স্কুল। বস্তিটা ছিল ঐ বটবৃক্ষ আর আমাদের স্কুলবাড়িটার ঠিক বিপরীত দিকে—রসারোডের পশ্চিম পারে। মোড়ের কাছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে এলগিন রোডের দিকে মুখ করলে, ডানহাতি পড়ত এই বস্তিটা। নাম ছিল পোড়াবাজারির বস্তি। এর উল্টো দিকে পড়ে গেছে পোড়াবাজারের মাঠ বা এগজিবিশন গ্রাউণ্ড। পোড়াবাজারের বস্তি ছিল বিরাট, প্রায় দশ-এগারো বিঘে জমি জুড়ে। পোড়াবাজারের বস্তির কথা স্মরণে এলেই মনে পড়ে এক আগুনলাগার ঘটনার কথা। শুনেছিলাম, এ বস্তিতে একবার সাংঘাতিক আগুন লেগে গিয়েছিল। আমার আরও ছোটবেলায় এগজিবিশন হবার আগে পোড়াবাজারের মাঠের ধারে—শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটের ওপরে এক সার কোঠা ঘর ভগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। সেই পোড়ার স্মৃতি থেকেই বোধহয় পোড়াবাজার নাম আর তার থেকেই বস্তির নাম। এই বস্তির সঙ্গে লণ্ডন মিশনারী স্কুলের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল পাদ্রী অ্যাস্টন সাহেবের নাম একসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। আমিও দেখিনি, তবে শুনেছি। একবার রাত্রির দিকে পোড়াবাজারের বস্তিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। চারিদিকে অসহায়দের করুণ আর্তনাদ। ঘুমুচ্ছিলেন অ্যাস্টন সাহেব—তাঁর কোয়ার্টারে। এই আর্তনাদ কানে যেতেই উঠে বসলেন তিনি। তারপর, ব্যাপারটা কী বুঝতে পেরে, তাড়াতাড়ি আর পোশাক না বদলে—ঐ ঘুমোনোর পা-জামা আর জামা পরিহিত অবস্থাতেই ছুটলেন বস্তি লক্ষ্য করে। এবং ঐ লেলিহান অগ্নিশিখা আর ধূমরাশির মধ্যেই একখানা দা-হাতে কখনো ওপরে উঠে, কখনো নীচে নেমে, ঘরের বাঁধনগুলি কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলতে লাগলেন তিনি। আগুন-লাগা ঘরের চালগুলি নীচে ভেঙে পড়তে লাগল, এবং এতে করে, অর্থাৎ সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলেই, আগুন আর বেশী ছড়াতে পারেনি, এক বিপুল ক্ষতি আর ধ্বংসের হাত থেকে সেবার অভাবনীয়রূপে বেঁচে গিয়েছিল পোড়াবাজারের বস্তি। আর, এর জন্য বিদেশী ইংরেজ পাদ্রী অ্যাস্টন সাহেবের সেই "প্রাণতুচ্ছ করে আগুনের মধ্যে ওভাবে এগিয়ে যাওয়া"র কথা কোনোদিন ভুলতে পারেনি ও-অঞ্চলের অধিবাসীরা।

কিন্তু যা বলছিলাম। পোড়াবাজারের বস্তি বিস্তৃত ছিল একেবারে জলটুঙ্গির এলাকা পর্যন্ত, সে বস্তি একেবারে ভেঙে গেল। কত লোক যে বাস করত ঐ বস্তিতে, তার ইয়ত্তা নেই। বস্তি ভেঙে যেতে, ওখানকার ঐ অত লোক যে কে কোথায় চলে গেল বলতে পারি না।

এইভাবে ভাঙন ক্রমশ এগিয়ে এদিকে চলল রসারোডের পশ্চিম পার ধরে, দক্ষিণ দিকে। বস্তির পর হাত পড়ল জলটুঙ্গির ওপরে। এই জলটুঙ্গি ছিল তখনকার এক বিশেষ শোভার বস্তু। কালীঘাট মন্দিরে যারা তীর্থ করতে যেত, তারা ঐ পথ দিয়েই ফিরবার পথে জলটুঙ্গির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে, জলটুঙ্গি আর তার জলাশয়ের মাছ দেখে আবার এসে উঠত গাড়িতে। যাত্রী ছাড়াও, এমনিও লোক আসত জলটুঙ্গি দেখতে দূর-দূরান্তর থেকে। রাস্তার ওপরেই গেট। সেই দরওয়াজা পার হয়ে একটু গেলেই, বড় বড় থাম-বসানো চাঁদনীওয়ালা একটি ঘাট। ঘাট ছাড়িয়ে আরও একটু গেলে পড়ত জলাশয়ের ধারের বাগানটায় ঢুকবার দরজা। বাগানটা ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ত, পুকুরের ধারে ধারে কী সুন্দর সব কেয়ারী-করা ফুলের গুচ্ছ যেন রোদ আর বাতাস পেয়ে হাসিখুশিতে ভরপুর হয়ে আছে। আর ছিল লতাগুল্ম দিয়ে তোরণ সাজানো লতাকুঞ্জ। তার নীচে সব বসবার জায়গা। কোথাও বা সাঁকো গাঁথা ছিল। জলটুঙ্গি ছিল কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা তার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি নয়। হয়ত কোনো নবাব বাদশার বংশধরেরই হবে, কে বলতে পারে! মালিক আসতেন মাঝে মাঝে বেড়াতে, তখন ভিতরকার ঐ পাঁচিল-ঘেরা বাগানের দরজাটা বন্ধ হয়ে যেত। সরোবরের পশ্চিম পাড় থেকে একটি পোল করা ছিল, সেই পোলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেত জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত জলটুঙ্গির গোল ঘরের মধ্যে। ঐ গোল ঘরের মধ্যে মালিকরা সদলবলে এসে গান-বাজনা, নৃত্যাদি করতেন, সাধারণের তাতে প্রবেশাধিকার ছিল না। বাগানের ধারে ধারে যে-সব পায়ে চলা পথ তৈরি করা ছিল, সে-সব পথ সাজানো ছিল পাশে-পাশে লাগানো সুপুরি গাছ, নারিকেল গাছ দিয়ে। ঐ যে চাঁদনী বললাম, তার সামনে বসে থাকত খইওয়ালা, মুড়িওয়ালারা। যাত্রীর দল এই মুড়ি বা খইওয়ালার কাছ থেকে মুড়ি বা খই কিনে ফেলছে জলের ওপর, আর সেই খই বা মুড়ির লোভে 'ভুস' করে ভেসে উঠছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মাছ, কী বিরাট তাদের হাঁ, গপ্ গপ্ করে গিলছে সেই মুড়ি বা খই। ভাবতে গিয়ে চোখের সামনে আজও ভেসে উঠছে সেই সব ভেসে ওঠা মাছের চেহারা! একটা মাছের নাকে আবার ছিল নথ্ পরানো, তাকে দেখবার আগ্রহই ছিল লোকের নাকি বেশী। মুড়ি ফেলছে, আর অসীম আগ্রহে লোকে লক্ষ্য করছে সেই নথ্ পরা মাছটা ভেসে উঠল কিনা?

—উঠেছে—উঠেছে—

হয়ত চাপা কণ্ঠে চিৎকার শোনা গেল একদিক থেকে, অমনি সব সেদিকে দৌড়, মুড়ি আর খইয়ের ঠোঙা হাতে নিয়ে।

—কই, কোথায়?

আবার ডুবে গেছে সে। কত লোক যে তাকে দেখবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, সেদিকে কি ভ্রূক্ষেপ আছে তার? কথায় বলে, মাছের মর্জি। তার ওপরে আবার নথ পরা মাছ! তার খেয়াল-খুশিপনা লক্ষ্য করে মনে হত, লোকে যে অত করে তাকে দেখতে

চায় সে সম্পর্কে সে বেশ সচেতন! নইলে জলে খই ফেলতে সবাই ভেসে উঠেছে, তার এত গড়িমসি কেন?

কিন্তু, কোথায় গেল সেই নথ-পরা মাছ, সেই জলটুঙ্গির গোলঘর, আর বাহারে বাগান। এই বাগান ছিল লণ্ডন মিশনারী স্কুলের ছেলেদের লুকিয়ে-লুকিয়ে বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার জায়গা। আমরাও এখানে কত খেয়েছি।

সেই জলটুঙ্গির গেট আর প্রাচীরও ভেঙে গেল, বুজে গেল সরোবর।

জলটুঙ্গির কিছু দক্ষিণেই একটা সরু রাস্তা ছিল, তার ও-পারেই—ঠিক জলটুঙ্গির বিপরীত দিকে —রসারোডের ওপরেই ছিল বরদাপ্রসন্ন চৌধুরীর বিরাট বাগান ও বাড়ি। বাড়ির সামনে আর পাশে বাগান সাজানো ছিল কী চমৎকার! বাগানের পূর্বদিকে ছিল ওদের কাছারী বাড়ি। দেখলাম, বাড়ির সামনেই ঐ বাগানও একদিন চলে গেল। সব সমারোহই গুঁড়িয়ে গেল কালস্রোতের প্রবল চক্রের নীচে পিষ্ট হয়ে!

দেখতে দেখতে ভেঙে গেল সরকারপাড়া, ভবানীপুর পোস্ট-অফিস আর তার আশ-পাশের বস্তিগুলো। পোস্ট-অফিস তখন ছিল রসা আর চন্দ্রনাথ স্ট্রীটের মোড়ের একটু আগে, অর্থাৎ একটু উত্তরে, ঐ রসারোডের পশ্চিম পারেই।

এইভাবে ভাঙনের করাল দন্তপংক্তি এগিয়ে যেতে যেতে, কাঁসারীপাড়া রোড পেরিয়ে একেবারে চাউলপট্টি রোড পর্যন্ত, সবকিছু গ্রাস করে ফেলল। রসারোড আর চাউলপট্টি রোডের মোড়ে—চাউলপট্টি রোডের দক্ষিণ পাড়ে ছিল তখন ভবানীপুর থানা, এখন যেখানে রয়েছে রাইমারের ওষুধের দোকান। চন্দ্রনাথ চাটুজ্যে স্ট্রীটের বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন বাড়ির ছাদ থেকে দেখতে পেতাম ঐ ভবানীপুর থানার ছাদের ওপরকার গম্বুজের মতো বস্তুটা। দেখবার মত জিনিসই ছিল, আজকাল তা চোখে পড়বে না। ভবানীপুরের ঐ থানার বাড়িটা ছিল বহু পুরাতন। থানার ছাদের ওপর—আরো দোতালা সমান উঁচু—অনেকটা গম্বুজের মতোই দেখতে—টিনের ছাদ—চারিদিকে রেলিং দেওয়া—বারান্দার মত করা। একটা লম্বা কাঠের সিঁড়ি ছিল একদিকে লাগানো, তাই দিয়ে উঠতে হত। এই গম্বুজে উঠে—গম্বুজ-ঘেরা বারান্দায় চক্কর দিয়ে পাহারা দিত অহোরাত্র একটি-না-একটি ফায়ার ব্রিগেডের পাহারাদার। এই পাহারাদারের বিশেষ কাজ ছিল ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা। তখন ত টেলিফোন ছিল না, ঐ ভাবে ধোঁয়া দেখেই বুঝতে হত, আগুন লেগেছে কোথাও! থানার পাশেই ফায়ার ব্রিগেড। পাহারাদারের কাছ থেকে খবর পেয়ে অমনি বেরিয়ে পড়ত দমকল। লাল গাড়ি দমকলের—ক্রমাগত ঘণ্টা বেজে চলেছে—ঢং-ঢং-ঢং-ঢং, আর সেই লাল গাড়িটাকে টেনে নিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটেছে সবল আর তেজী এক জোড়া বড়-বড় ওয়েলার ঘোড়া। হ্যাঁ, তখন দমকল ছিল ঘোড়ায়-টানা। সেই ঘোড়ার খুরে লেগে রাস্তার পাথর থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, এমনি তীব্র বেগে ছুটত ওয়েলার ঘোড়া। কোথায়—কতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টার

শব্দ—আর অমনি সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে পথচারী, সরে দাঁড়াচ্ছে অনেক আগে থাকতেই দমকলকে পথ করে দিয়ে।

যেখানে আগুন লেগেছে, সেখানে কাছাকাছি কোন পুকুরে হোস্ পাইপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই জল পাম্প করে তুলছে দুজন লোক—ঢেঁকিকলের মতো একটা যন্ত্রে, ঘটাং-ঘটাং শব্দে। কখনও আগুন এমন তীব্র আর ব্যাপক হতো যে, ক্রমাগত একদিন-কি-দুদিন ধরে পাম্প করে জল তোলা হচ্ছে ত হচ্ছেই। সেই সময় ফায়ার ব্রিগেডের লোক যদি কম পড়েছে ত যারা অদূরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আগুন নেভানো দেখছে, তাদের মধ্য থেকে দুজনকে ধরে পাম্পের কাজে জোর করে দিয়েছে লাগিয়ে! সে-ও এক দৃশ্য! ফায়ার ব্রিগেডের লালমুখো সাহেব জনতার দিকে ছুটে যাচ্ছে, আর লোকগুলো পালাচ্ছে যে-যার এদিক-ওদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে। ধরে ফেললে আর রক্ষা নেই, সে তুমি যে-ই হও, পাম্প করার কাজে জুড়ে তোমাকে দেবেই। হয়ত অফিসে চলেছেন নিরীহ কেরানীবাবু পান চিবুতে চিবুতে, হঠাৎ তিনি চমকে চেয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর আশপাশ দিয়ে লোক ছুটছে। কী ব্যাপার বুঝতে-না-বুঝতেই সেই হতভম্ব কেরানীটিকে ধরে ফেলেছে ফায়ার ব্রিগেডের সাহেব, আর যাবে কোথায়? রইল অফিস, তখন ধুতিতে মালকোঁচা মেরে গলদঘর্ম হয়ে ঢেঁকিতে পাড় দাও, জল তোলো পাম্প করে। কিংবা কোঁচা-দোলানো ভুঁড়িওয়ালা কোনো শৌখীন বাবুই হয়ত চাদর গায়ে বেরিয়েছিলেন পথে, তাড়া খেয়ে তিনি আর ছুটতে পারবেন কতদূর? ঠিক ধরে ফেলেছে 'ব্রিগেডের' গোরা, আর উপায় নেই, নিজের হাতে বাড়িতে যিনি জলটুকু পর্যন্ত গড়িয়ে খান না, তাঁকেও এবার পাম্প করে করে জল তুলতে হবে! বাড়ির চাকর বেরিয়েছে বাজার করতে, তাকেও ধরে লাগিয়ে দিয়েছে কাজে, বাড়িতে এদিকে গিন্নিমায়ের উৎকণ্ঠার আর সীমা নেই! তিনি বাড়ির এ-ছেলেটাকে ধরছেন, ও-ছেলেটাকে খোসামোদ করছেন—ওরে দেখ না, কোথায় গেল চাকরটা? বাজার করতে গিয়ে যে তার ফেরার নাম নেই।

ছেলেটা দূর থেকে উঁকি দিয়েই পালিয়ে এসেছে বাড়িতে।

—কী হলোরে?

ছেলেটি বললে—ধরেছে।

—কে ধরেছে?

—আর কে? ফায়ার ব্রিগেডের লালমুখোরা।

অবশ্য, পাড়ায় আগুন লাগলে পাড়ার ছেলেরা অনেক সময় নিজেরাই এগিয়ে যেতো আগুন নেভানোয় সাহায্য করতে। তাদের ধরতেও হতো না, বলতেও হতো না।

মজা হতো বাবুদের নিয়ে। দূর থেকে তাঁরা যখনই বুঝতেন, ওখানে দমকল এসেছে, অমনি থমকে দাঁড়িয়ে অন্য পথে শুরু করতেন চলতে। ঘুরে অন্য রাস্তা, এ-গলি সে-গলি করে চলে যেতেন গন্তব্যস্থলে। কী জানি, যদি ধরে ফেলে!

যাই হোক, কয়েক বছর ধরে চলল এই সব ভাঙাচোরার লীলা। রসারোড আর কালীঘাট রোডের মোড়ে, কালীঘাট রোড়ের দক্ষিণ ধারে ছিল একটি সুরকির কল। সেটা গেল। তার পাশে ছিল কামারের দোকান, সেটাও গেল। ওখানেই হয়েছে পূর্ণ থিয়েটার। ও-জায়গাটা ধরে এগিয়ে ভাঙন গেল একেবারে হাজরা পার্ক পর্যন্ত! হাজরার পুকুরও গেল একদিন বুজে।

হাজরার পর ভাঙন এবার ধরা হলো রসারোডের পূর্ব তীরে। আমাদের স্কুলের পাশে—দক্ষিণ দিকে ছিল দ্বারকানাথ মিত্রের বিরাট বাড়ি। বাড়ির সামনে লাল সুরকির সুদৃশ্য পথের ওপরে গাড়ি-বারান্দা। পথের দুধারে ঝাউবীথির সারি একেবারে রসারোডের ওপরকার গেট পর্যন্ত চলে এসেছে। বাড়ির সংলগ্ন একটা পুকুরও ছিল। বাড়ি আর ঘাটের মধ্যবর্তী জায়গা জুড়ে আবার মাটির ঢিবি করে সাজানো ছিল পাহাড়ের মতো। ও-বাড়ির যে সৌন্দর্য ছিল, তা মাত্র শোনা কথা, চোখে সবটা দেখিনি, তবে খালি বাড়িটা পড়ে আছে। পড়ো-বাড়ির যেটুকু ছিল, সেটুকু লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির সাহেবরা কিনে নিয়ে করেছিলেন মেয়েদের কলেজ, এখন সেটা উইমেন্স কলেজরূপে শোভা পাচ্ছে। তার পাশে ভিতর দিকে ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একতলা বাড়িটা, সেটাও দিলো ভেঙে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সরকার পাড়ার বিপরীত দিকে ছিল কোম্পানীর বাগান আর পুকুর, যার কথা আগেই উল্লেখ করা গেছে। এই বাগান ভেঙে, বাগানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো রাস্তা, আর পুকুর বুজিয়ে হলো পার্ক। পার্কের নামকরণ করা হলো জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের নাম অনুসারে "ডি. এন. মিত্র স্কোয়ার"।

আমাদের স্কুলের পূর্ব দিকটায় যেমন ছিল ক্রিশ্চানপাড়া, তেমনি ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারের পিছন থেকে শুরু করে গুপ্তবাবুর বাজারের পিছন দিক পর্যন্ত ছিল বহু বস্তি। কিন্তু কোথায় গেল সে-সব! পুরানো অঞ্চল ধরতে লাগল নতুন রূপ, পুরানো নাম একের পর এক হারিয়ে যেতে লাগল নতুন নামের আড়ালে।

সেদিনের সেই সব ভাঙাগড়ার ব্যাপারে অনেক কিছুই গেছে হারিয়ে। হাজরা পেরিয়ে আরও দক্ষিণে, এখন যেখানে রয়েছে কালিঘাটের ট্রামডিপো, তার পিছনে ছিল সাহেববাগান বস্তি, মুসলমান রাজমিস্ত্রীর দল থাকত সেখানে। সে সবও ভেঙে গেল। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে পাওয়া যেত একটি রাস্তা, এঁকেবেঁকে পূবদিকে চলে গেছে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে, লোকে বলত—ঢাকুরের রাস্তা। এখন সেখানে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, অনেকটা সেই পথেই ছিল ঢাকুরের রাস্তা, তবে অত সোজা নয়। রাস্তার দুধারে—কোথাও গৃহস্থদের বাড়ি,—মাটির ঘর, কোথাও বা নাবাল ধানের জমি। এই রাস্তার কোথাও থেকে নজরে পড়ত, আরও একটু দক্ষিণে হাজার হাজার কুলি খাটছে, মাটি কাটছে, সেই মাটি দিয়ে খানা-ডোবা বুজিয়ে দিয়ে, শুধু ঐ মাটিই বা কেন, বাড়ি ভাঙার দরুণ যে রাবিশ পাওয়া যাচ্ছে, তা-ও কাজে লাগছে খানা-খন্দ বোজাবার ব্যাপারে। এইভাবে ওখানে লেক-এর উৎপত্তি হতে লাগল।

যেসব বাড়ি ভাঙছে, তার রাবিশ যেমন এক জায়গায় স্তূপাকার করে রাখছে ঠিকাদাররা, তার কড়ি-বরগা, তার দরজা-জানালা—এসবও তারা আলাদা করে রেখে দিত বিক্রির জন্য। এই পুরানো দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা লোকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে নতুন বাড়ির জন্য। পুরানো দরজা-জানালা সুসংস্কৃত হয়ে নতুন রূপ নিতে লাগল। এই নব রূপায়ণের ছবিটা বিশেষভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেদিনকার মনে।

ঢাকুরের রাস্তার কথায় আরও এক বিশেষ ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। কালিঘাটের পোলের নিচে, পূর্বদিকে, কালীমন্দিরে যাবার চৌমাথার মোড়ে সারি সারি সব ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত, গাড়িগুলি উঁচু পোল পেরিয়ে আলিপুরের দিকে যেত না। তাই আলিপুরের কোর্ট-ফেরত জনসমষ্টি হাঁটতে হাঁটতে আসত এই গাড়ির আড্ডায়। গাড়ির গাড়োয়ানরা তখন ভীড় দেখে হাঁকছে—ঢাকুরে—ঢাকুরে!

ঠিকেগাড়ির ভাড়া শেয়ারে মাথাপিছু দু' আনা—তিন আনা—চার আনা—এমন কি, সময় বুঝে ছ আনাও দর উঠতো বলে শোনা যায়। আলিপুর কোর্টের উকিল-মোক্তার বা মামলার জন্য আসা লোকজন এই ঠিকেগাড়ি চড়ে ঢাকুরের রাস্তা দিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন ধরত। তাই হতো ভিড়। গাড়ির ছাদে, গাড়ির ভিতরে, গুড়ের নাগরীর মতো লোক বসত ঠাসাঠাসি করে। সেই বিপুল ভার নিয়ে রোগা-রোগা ঘোড়াগুলি যেন আর ছুটতে পারে না, কিন্তু তবু ছুটতে হবে, গাড়োয়ানের ছপ্‌টি আছে। গাড়ি ছুটছে ঢাকুরের রাস্তা দিয়ে, কিছুদূর থেকে ট্রেনের হুইসিল হলেই বাবুরা চেঁচিয়ে উঠবেন—জোরসে চালাও, ট্রেন ফেল করব নাকি?

গাড়োয়ান তখন কোচবাক্সে বসেই পাদানিতে পা ঘষতো জোরে জোরে, তাতে একটা ঘস্ ঘস্ শব্দ হতো। ঘোড়াগুলি তাতে একটু চমকে উঠে জোরে ছোট্‌বার চেষ্টা করত। কিন্তু তাতে আর কাজ হবে কতক্ষণ?

গাড়োয়ান তখন কোচবাক্স থেকে তার পাদানিতে এসে বসত, তারপরে ঘোড়ার পিঠে মারত ভীষণ জোরে লাথি। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ঘোড়া হয়ত ছোটবার চেষ্টা করত, কিন্তু অত ভার নিয়ে দ্রুততর যে ছুটবে, তার সাধ্য কী? লাথিও চলছে, আর বাবুরাও চেঁচাচ্ছে—আরও জোরে।

গতির দিক থেকে ঘোড়াকে মনে হতো একেবারে নির্বিকার। এমনি করে স্টেশনের কাছাকাছি হতে-না-হতেই চলন্ত গাড়ি থেকে বাবুরা দিতেন লাফ, তারপরে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতেন ট্রেন ধরতে। অভিজ্ঞ গাড়োয়ান এইজন্য গাড়ি চালানো শুরু করবার আগে থাকতেই ভাড়ার পয়সাগুলো সংগ্রহ করে রাখত। কারণ পরে এই নিদারুণ ব্যস্ততা আর ছুটোছুটির মধ্যে ভাড়া আদায়ের অবকাশ তার মিলবে কখন?

যাই হোক, এই যে ভাঙাগড়ার কথা বলছিলাম, এ চলেছিল প্রায় বিশ বছর ধরে। বিশ বছর ধরে দেখেছি এই ভাঙাগড়া। এই প্রসঙ্গে তার কিছু বলে নিলাম, আর কিছু বলা হলো না। তবে

ঐদিকে যে নতুন শহর গড়ে উঠবে, এ আন্দাজটা কিছুদিন পরেই করতে পেরেছিলেন অনেকে। তাই অপেক্ষাকৃত কিছু সস্তায় তাঁরা সব জমি কিনে রাখছিলেন।

আমার স্কুলের পড়া যথারীতি চলেছে, বাড়িতেও পড়ছি। বিকেলের দিকে একটু হাজরা অঞ্চলে বেড়াতে যাই, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাও হয়, গল্প-সল্পও হয় কিছু। শুনলাম, ক্লাব উঠে গেছে। আমি ত যেতাম না, অন্যদের মধ্যে কেউ চাকরির সন্ধানে ঘুরছে, কারুর বা বিয়ের কথা হচ্ছে, কেউ বা বিয়ে করে রীতিমত সংসারী হয়েছে, অভিনয়ের নেশায় ভাঁটা পড়ে গেছে। ওদিকে ক্লাবের চাঁদাও ওঠে না, বাড়িভাড়াও বাকী পড়ছে, সুতরাং ক্লাব উঠবে না ত কী হবে?

এদিকে দেখতে দেখতে আমার টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল, অ্যালাউ-ও হলাম টেস্টে। টেস্টের পর স্বভাবতই দু-চার দিন পড়াশুনার বিরতি থাকে। এই বিরতি পাওয়া মাত্রই হঠাৎ থিয়েটার দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। মা'র কাছে গিয়ে আবদার করে বসলাম। চাইলাম তিনটে টাকা। তখনকার দিনে এক টাকার টিকিট, যাবার সময় ট্রামভাড়া ন' পয়সা, আসবার সময় শেয়ারের ঘোড়ার গাড়িতে ভাড়া আট আনা। বাকী পয়সা জলখাবার—পান—সিগারেটের জন্য যথেষ্টই রইল বলতে হবে।

স্টার থিয়েটারে তখন অভিনয় করছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়। নাটক হচ্ছিল শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "সওদাগর"। প্রবল হলো এই 'সওদাগর' দেখবার ইচ্ছা। সাধারণত স্টার থিয়েটারে ছেলে-ছোকরারা যেতে চাইত না। তাদের ছিল—মিনার্ভা—কোহিনুর, এই সব বিডন স্ট্রীটের থিয়েটারগুলি। হৈ-হৈ করতে করতে যেত সদলবলে, থিয়েটার দেখতে দেখতে চিৎকার, হাসাহাসি করত, একদল বলছে—'এনকোর—এনকোর' আর একদল বলছে—'নো-মোর—নো-মোর', এই সব দলাদলি হতে হতে বচসাও শুরু হতো, অশ্রাব্য ভাষাও প্রযুক্ত হতো, অনেক সময় মাতাল দর্শকও উপস্থিত থাকত থিয়েটারে। কোন কোন লোক অভিনয় দেখতে দেখতে আবার নানারকম মুখভঙ্গী করত, মুখে করত নানারকম বীভৎস আওয়াজ। আর যে-সব ভদ্র দর্শক যেতেন, তাঁরা ঠিক চিনে ফেলতেন সেইসব লোকদের। বলতেন—এইরে, এসেছে সেই মার্কামারা লোক!

অবশ্য, একটা ব্যাপার হতো, বড় বড় অভিনেতাদের অভিনয় এবং বিশেষ করে সেই রাত্রের প্রথম অভিনীত নাটকটি লোকে মনোযোগ দিয়ে শুনত। তারপরে রাত্রি দ্বিপ্রহর থেকে শুরু হতো পরবর্তী নাটকের অভিনয়। এতে লোকের হৈ-হুল্লোড় হতো।

স্টারে এসব চলত না। কোনো রকম অসভ্যতা বা গোলমাল সেখানে সহ্য করা হতো না। খুব কড়াকড়ি নিয়ম ছিল তখন স্টারের। দর্শকদের বেচাল দেখলেই কর্তৃপক্ষ রীতিমত তিরস্কার করতেন। অবাঞ্ছিত কিছু দেখলেই হল থেকে তাদের বার করে দিতেন দর্শনী ফেরত দিয়ে। এতে সহায়ক হতেন ভদ্র দর্শকবৃন্দ। তাঁরা এই বের-করে-দেবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন না, বরং সায় দিতেন।

খুব প্রবীণ বনিয়াদী পরিবার বা শান্ত ভদ্রপ্রকৃতির যুবক, এঁরাই বেশীর ভাগ যেতেন স্টার থিয়েটারে। আমরা বলতাম, স্টার থিয়েটার ত থিয়েটার নয়, যেন একটা কড়া স্কুল।

বড় হওয়ার পর এই আমি প্রথম এলাম স্টারে। তবে অমরবাবু যখন এই থিয়েটারের লেসী, তখন পুরানো স্টারের কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। স্টারের চারজন স্বত্বাধিকারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিপ্রসাদ বসু। তিনি বসে আছেন তাঁর অফিস ঘরটিতে, মনে হতো যেন পুরানো স্টার থিয়েটারের হিসাব-নিকাশের খাতাপত্রের সঙ্গে পুরানো ঐতিহ্যকেও তিনি পাহারা দিচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহের দক্ষিণ দিকে যে খোলা বারান্দা ছিল, এখন সেটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তার পশ্চিম দিকে ছিল তাঁর ছোট্ট অফিস ঘরটা। বিকেলে বা অভিনয়ের দিন তাঁর চেয়ারটা বাইরে বার করে তাতে বসে থাকতেন তিনি। বারান্দার দক্ষিণে যে বিস্তৃত উঠোনটা আছে, সেখানে ডিম্বাকৃতি একটি ছোট্ট বাগান ছিল, তার চারিদিকে থাকত লোহার শেকল দিয়ে ঘেরা। এই ঘরের বাইরে ছিল কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাতে বসে দর্শকরা হাওয়া খেতেন। এই উঠোনেরও দক্ষিণে ছিল কাঁচের ঘর, তাকে বলত—'ক্রস্টাল কেবিন'। খাবার-দাবার, চা ইত্যাদি বিক্রি হতো এখান থেকে।

আরম্ভ হলো থিয়েটার। অমরবাবু অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'কুলীরক'-এর সুকঠিন ভূমিকায়। শেক্সপীয়রের নাটকে যিনি 'শাইলক্'। ভূপেনবাবু তাঁর 'সওদাগর'-এ চরিত্রগুলির নাম দিয়েছিলেন ঐ ধরনেরই সব। 'এন্টোনিও' হয়েছিল অনিলকুমার। 'ব্যাসানিও'—বসন্তকুমার। 'পোর্সিয়া'—প্রতিভা। 'যেসিকা'—যূথিকা ইত্যাদি। যতদূর মনে পড়ে এরও প্রায় বছরখানেক আগে এই স্টারেই যে বিদেশী নাটকের বঙ্গানুবাদ 'সাইন অব দি ক্রশ' অভিনীত হয়েছিল, তাতে নাট্যকার ভূপেন্দ্রবাবু বিদেশী চরিত্রের বিদেশী নাম যথাযথই রেখেছিলেন, যেমন, মার্কাস, মার্সিয়া, নেরো, পপিয়া—ইত্যাদি। এই নাটকটিও খুব জাঁকজমকের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং অমরবাবু খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন, যথেষ্ট সুখ্যাতিও লাভ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। কিন্তু দর্শকসাধারণের বোধ হয় সে নাটক তেমন মনঃপূত হয়নি। তার ওপরে, অমরবাবুর শরীরও তখন ভালো যাচ্ছে না, অভিনয় করতে কষ্ট হচ্ছে রীতিমত। সেজন্য কয়েক রজনী অভিনীত হয়েই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল 'সাইন অব দি ক্রশ'। ওঁর অসুস্থতার জন্য খোলা হয়েছিল অন্য নাটক। এসব কারণেই ভূপেন্দ্রবাবু এবার তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীর দিলেন দেশী নাম। আর নাচগান, হাস্যরস একটু বেশি ঢোকালেন। সে যুগের সাধারণ দর্শক আবার চাইতেনও এসব। আমার তখনকার বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ অনুসারে এই 'সওদাগর' নাকি যতখানি ভালো লাগার কথা, তা লেগেছিল। অবশ্য দেখবার মত জিনিস ছিল 'কুলীরক'-এর ভূমিকায় অমরবাবুর অভিনয়। এর আগে অমরবাবুর 'বিল্বমঙ্গল' দেখেছিলাম ক্লাসিকে, তবে তখন অভিনয়ের বুঝতাম না কিছুই, তাই কোনো মন্তব্য করতে পারলাম না। এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, তা হচ্ছে এই যে, ইনি নাকি খুব চেঁচিয়ে এবং সুরেলা দমক দেওয়া অভিনয় করেন। আমরাও গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর গলা শুনেছিলাম। 'পাণ্ডব-গৌরব'-এ—ভীমের একটি দৃশ্য, 'ভ্রমর'-এ

গোবিন্দলাল রোহিণীকে গুলি করে মারছে, সেই দৃশ্য। এতে স্থুর এবং দমক দিয়ে কথা বলা শুনেছিলাম বটে। এ ঘটনার বহু আগে ভুপেনবাবু নিজের নাম না দিয়ে একটি কবিতা একবার গোপনে ছাপিয়ে থিয়েটারে বিলি করেছিলেন, তাতে ওঁর অভিনয়কে ব্যঙ্গ করেছিলেন "ষাঁড়-চেঁচানো" অ্যাক্টিং বলে। আমার আজ মনে হয়, অমরবাবু শিষ্য হয়ে কোনো গুরুর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেননি, ওঁর নিজের ধারণা, পড়াশুনা আর ইংরেজী নাটক দেখার ফলস্বরূপ নিজের মনোমত নিজস্ব একটি ধারার স্বষ্টি করে নিয়েছিলেন। তখন, বিলাতী অভিনেতারা মাঝে মাঝে আসতেন এদেশে, অভিনয় করতে। আর তাছাড়া, বিলাতী ফিল্ম ত ছিলই। বিলাতী ফিল্ম দেখতে উনি খুব ভালোও বাসতেন। ফিল্ম করার বাসনাও ছিল। নির্বাচিত দৃশ্যের ফিল্ম তিনি করেওছিলেন বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে, কিন্তু লোকে তা নেয়নি বলে সে প্রয়াস আর করেন নি। 'সাইন অব দি ক্রশ'-এর যেটুকু বর্ণনা শুনেছি, এবং নিজে সেদিন 'সওদাগর'-এ ওঁর যে অভিনয় দেখেছিলাম, তাতে ইংরেজী ফিল্ম বা নাটকের অঙ্গ-ভঙ্গিমা বা ভাবপ্রকাশের অনুসরণ ছিল সুস্পষ্ট। ফলে, অভিনয় লেগেছিল সেদিন ছবির মত। কোন বিশেষ মুদ্রা বা ম্যানারিজ্‌ম্ নেই, কণ্ঠস্বরে কোনো দমক বা স্থরেলা আবৃত্তির ঝোঁক নেই, অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, সাবলীল সে অভিনয়! কোথায় তাঁর চিৎকার, কোথায় তাঁর স্থরেলা অভিনয়! 'কুলীরক'-এর ভূমিকায় তার কোনো চিহ্নই পেলাম না। তাঁর মঞ্চ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি গিয়ে তাঁর ওপরে পড়ে। সেই যে লাঠি হাতে ঢুকলেন, কোমরে থলি, মাঝে মাঝে কোমরের সেই থলিতে হাত দিচ্ছেন আর বলছেন,—"তিন লক্ষ টাকা! হুঁ।" সেই থেকে তাঁর অভিনয়ের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দর্শককে তিনি সমানভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছিলেন। সুবিখ্যাত বিচার-দৃশ্যের অভিনয়ও অদ্ভুত হতো! বিচার দৃশ্যে তাঁর সেই জুতোর তলায় ছুরি শানানো, অনিলকুমারের বুক লক্ষ্য করে হাতে তুলাদণ্ড নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, যেন বড় কোনো শিল্পীর আঁকা মূল্যবান কতগুলি ছবি দেখেছিলাম সেদিন! আজও চোখের সামনে ভাসছে। আর ভাসছে সেই দৃশ্যটি, যেখানে তিনি, তাঁর কন্যা গৃহত্যাগ করার পর খালের ওপরকার একটি সাঁকোর ওপর অন্তরাল থেকে আলো হাতে করে উঠে আসছেন। প্রথমে তাঁর মাথা, তারপরে দেখতে পেলাম তাঁর পূর্ণ অবয়ব, এক হাতে আলো, অন্য হাতে লাঠি, সাঁকোর উপরে উঠে এলেন। গৃহের অভ্যন্তরে ত প্রতিদিনই আলো জ্বলে, আজ তাঁর গৃহতল অন্ধকার কেন? বুকের ভিতরটা যেন কী এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তাঁর! নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে! সাঁকো থেকে নেমে বারান্দা, তারপরে গৃহদ্বার। সেই দ্বারের দিকে লক্ষ্য করে আর্তনাদ করে বুক-ফাটা ডাক ডেকে উঠলেন কন্যার নাম ধরে—যূথিকা—যূথিকা!

সাড়া নেই। তারপরে সবটাই হলো ওঁর নির্বাক অভিনয়। নেমে গেলেন দরজার কাছে। আবার ফিরে এলেন সাঁকোর ওপরে। দেখলেন উৎসুক দৃষ্টি মেলে, এদিক-ওদিক। তারপরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন সিঁড়ির নীচের ধাপে। ধীরে ধীরে নেমে এলো—যবনিকা। আশ্চর্য দেখলাম ওঁর 'টাইমিং'-এর জ্ঞান। নির্বাক অবস্থায় এই যে অভিনয়টুকু করলেন, তাতে যেটুকু যেখানে সময় নেবার

প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই নিলেন, কোথাও বাড়তি না, কোথাও কমও না। একটুও ফাঁক পড়েনি, একটুও সময়চ্যুতি ঘটেনি, যেন সময়ের ফুল দিয়ে গেঁথে তুললেন অনুরূপ এক মালা! মনটা ভরে গেল। এই এতক্ষণ ধরে যে নির্বাক অভিনয় হতে পারে, তদানীন্তন বাঙলা মঞ্চের, তা এর আগে কেউ দেখেছেন বলে জানি না, প্রবীণদের প্রশ্ন করেছি, তাঁরাও সাক্ষ্য দিতে পারেন নি। আমিও দেখেছিলাম সেই প্রথম।

দর্শকদের সামনে এতক্ষণ কথা না বলে থাকা, এ-ছিল তখনকার প্রচলিত বিশ্বাসেরও বিরুদ্ধে। এই বিশ্বাস ত তিনি ভেঙে দিলেনই, উপরন্তু মূকাভিনয় করে অতক্ষণ দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখা, এ-কম শক্তির পরিচয় নয়। দর্শকদের সামনে কথা না বলে বহু কথা বলা, এতে করে যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি।

ওর পরে পুরানো বইয়ের পুনরাভিনয় একবার করেছেন বটে, কিন্তু নতুন ভূমিকায় এই-ই তাঁর শেষ অভিনয়। পরে জেনেছি, ১৯১৫-র ৪ঠা ডিসেম্বর ছিল 'সওদাগর'-এর প্রথম অভিনয়-রজনী। আমি প্রথম রজনীর অভিনয় দেখিনি, দেখেছিলাম পরবর্তী সপ্তাহে ১১ই ডিসেম্বর—শনিবার। প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও তিনি নাকি ঐদিন 'কুলীরক'-এর ভূমিকা করেছিলেন। শুনেছিলাম, এর পরের দিন—রবিবার, ১২ই ডিসেম্বরই ছিল অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। 'সাজাহান'-এর 'ঔরঙ্গজেব' সেজেছিলেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, তিনি আর অভিনয় করতে পারলেন না। ৬ই জানুয়ারি, ১৯১৬ সালে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

'সওদাগর'-এর পর আর দেখা হয়নি থিয়েটার। কারণ পরীক্ষা সামনে। সেনেট হলে পড়েছিল আমার সীট। ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সেনেট হলের বড়-বড় থাম চোখে পড়েছিল বটে, কিন্তু ভিতরের চেহারাটা জানা ছিল না। পরীক্ষার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে থামের নীচে যখন গিয়ে দাঁড়ালাম, বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠল। চেয়ে দেখি, কী বিরাট হল! কত ছেলের সঙ্গে তার অভিভাবক বা মাস্টারমশাই এসেছেন, আমার সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা। চারিদিকে সব অচেনা, চেনাশুনা কাউকে দেখতে পাচ্ছি না আশেপাশে, পরিচিত সহপাঠীরা কে যে কোথায় ছড়িয়ে আছে, কে জানে! এমন কেউ নেই যে, একটু 'সীট'টা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করে। নিজে নিজেই খুঁজে খুঁজে নিজের সীট-নম্বর বার করলাম। বসলাম পরীক্ষা দিতে। কয়েকদিন যাবৎ পরীক্ষা দিতে দিতে মনে হলো, ভালোই দিচ্ছি।

বাড়িতে, মাস্টারমশাই বা পণ্ডিত মশাই, প্রশ্নপত্র থেকে প্রশ্ন করে দেখতেন, ঠিকমত পরীক্ষা দিচ্ছি কিনা। বলতেন—ভালোই হচ্ছে।

মা-বাবা কিছুই জিজ্ঞাসা করতেন না।

শেষ হলো পরীক্ষা। এবার পুরো ছুটি—যতদিন না ফল বেরুচ্ছে। এই ছুটিতে কিন্তু ক্লাবের

দিকে মন গেল না, মন গেল ফিল্ম দেখার দিকে। চার আনা—ছ'আনা মা'র কাছে চাইলে পেতাম, তা দিয়ে ফিল্ম দেখাটা চলে যেতো। পেয়ে বসল আমাকে ফিল্ম দেখার প্রচণ্ড নেশায়।

ক্রমে ক্রমে পরীক্ষার ফল বেরুনোর দিন হলো সমাগত। সারা গেজেট খুঁজে আমার নাম আর পাওয়া গেল না। পরে খবর নিয়ে জেনেছি, ফেল করেছি—সংস্কৃতে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই আমাদের আনন্দ পণ্ডিতমশাইয়ের কথা। বলতেন—সংস্কৃত শিখলি নে, রসের ঘরে যে চাবি পড়ে গেল।

পাশ না করার জন্য খুব যে আঘাত পেয়েছিলাম তা নয়। যে-একাগ্রতা, নিষ্ঠা আর সাধনা নিয়ে পড়াশুনা করা উচিত, তা আমি করিনি। স্কুলে পড়েছি, মাস্টাররা যথাসাধ্য করিয়েছেন, কিন্তু আমার মনোনিবেশ তাতে ছিল কতটুকু? অবশ্য পাশটা কোনোগতিকে করতে পারলে ভালোই হতো। হলো না, কী আর করা যায়! বাড়ির সবাই, মুখে কিছু না বললেও ভিতরে-ভিতরে আঘাত পেয়েছিলেন খুব। এবং সম্ভবত, আমার উন্নতির আর কোনো সম্ভাবনাই তাঁরা দেখতে পাননি। সুতরাং আমি হলাম মুক্ত, স্বাধীন, কোনো কাজ নেই, কোন কাজে বাধানিষেধও নেই। এর পর আমি যে কী করব, তা আমিও যেমন জানি না, আমার বাবা-মাও বোধহয় ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলেন না।

আমার বাবার ব্যবসা ছিল অন্য অন্য বাইরের জায়গাতেও। চাল, পাট, হরিতকী, জ্বালানি কাঠ, এই সব দূর-দূরান্তর থেকে কেনা-কাটার ব্যবসা। এসব দ্রব্য কিনে এনে কলকাতার আড়তে বিক্রি করা হতো। বাবা এই সব কাজে আগে-আগে আমায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে-কাজ যদি শিখতে পারতুম, তাহলে আমাকে দ্বিতীয় বার স্কুলে এসে ভর্তি হতে হতো না, পরীক্ষা দিয়ে আর ফেলও করা হতো না। ১৯১১-র শেষে পূর্ণিয়া জেলার উত্তরে নেপাল সীমান্তে 'মোরং' বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকলে মোরং থেকে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণীও চোখে পড়ত। মেয়েরা পরত লুঙ্গির মত পোশাক, নীচ থেকে বুক পর্যন্ত তুলে ঢাকা দেওয়া। এই মোরং-এর কাছে 'ঝিঙাকাটা হাট' বলে একটা জায়গায় হাট হতো, সেখানে ছিল আমাদের গুদাম। চারিদিকে প্যাঁকাটি বা পাটকাঠির বেড়া দেওয়া, মাথায় খড়ের চাল, আর মেঝের ওপরে পাটের গাঁটরি জড়ো করা। ঠাণ্ডার দিন, শীতকালে ভাবতাম, প্যাঁকাটির ফাঁক-ফাঁক বেড়া দিয়ে কতো-না ঠাণ্ডা আসবে! কিন্তু পাট যে এত গরম, তা কে জানত! পাটের গাঁটরির ওপর শুয়ে বেশ গরম হতো। এই পাট মহানন্দা নদীর ঘাট থেকে নৌকায় উঠিয়ে, নৌকা নিয়ে আসা হতো একেবারে 'দলকোলা' ঘাটে, সেখান থেকে গরুর গাড়ি করে 'দলকোলা' স্টেশনে। কিষণগঞ্জ শাখা লাইনের 'বারসাই' স্টেশনের মধ্যবর্তী হচ্ছে এই 'দলকোলা' স্টেশন। এই স্টেশন থেকে মাল উঠত রেলের ওয়াগনে, সেই ওয়াগন এসে লাগত কখনো উল্টোডাঙার সাইডিংএ, কখনো বা দক্ষিণে কালিঘাট স্টেশনে। সেখান থেকে সেই মাল আনা হতো একেবারে চেতলায়। এই কাজও করেছি। এই মাল নিয়ে অর্ডার-মাফিক যথাস্থানে ডেলিভারী দেওয়া।

এর পরে ১৯১৩ সালের শেষের দিকে, একবার বেরিয়েছিলাম। তখনো দ্বিতীয়বারের জন্য ভর্তি হই নি স্কুলে। বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন সিংভূম অঞ্চলে হরিতকী চালানের নমুনা পাঠাবার ব্যবস্থা করবার জন্য। শীতকাল তখন, ওদিকে বেশ শীত পড়ে। সঙ্গী হলেন আমার এক সম্পর্কিত মামা, যোগীন্দ্রনাথ মিত্র, আমার চাইতে বয়সে বড়, নারকেলডাঙায় বাড়ি। সেই শীতের রাত্রে আমরা দুজনে গিয়ে নেমেছিলাম 'চাকুলিয়া' স্টেশনে। সে-এক অভিজ্ঞতাই বটে!

স্টেশন অতি ছোট। একটি অফিস আর টিফিন-ঘর ছাড়া আর দেওয়াল দেওয়া ঘরই নেই। আজ সে স্টেশনের চেহারা হয়ত অন্যরকম হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন ছিল ঐরকম। যে টিকিট-ঘরের উল্লেখ করলাম, তার সামনে ছিল টিনের শেড-দেওয়া একটা জায়গা, মালপত্তর ওজন করবার জন্য। সেইখানে ঐ শীতের রাত্রে কম্বল বিছিয়ে, বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে, শুয়ে পড়লাম দুজনে অপর কম্বলটি গায়ে মুড়ি দিয়ে। শুয়েই ঘুম, নিদ্রাভঙ্গ একেবারে সেই ভোরবেলায়। ভোরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে। ঘুরে ঘুরে দর-দাম আর নমুনার হরিতকী নিয়ে ফিরে এলাম একসময়। খাবার ব্যবস্থা কিছু নেই, তবে স্টেশনমাস্টারের সহায়তায় কিছু চা-বিস্কুট সংগ্রহ করা গিয়েছিল অবশ্য। তাই খেয়েই রোদে পিঠ দিয়ে বসে দেখতে লাগলাম আশপাশের দৃশ্যাবলী—যতদূর চোখ যায়। কিছুক্ষণ পরে, আমাদের দেখে আমাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে এলেন জনকয়েক ভদ্রলোক।

টালিগঞ্জের নবাব-বংশীয় প্রিন্স বক্তিয়ার শা'র অনেক জমিদারী ছিল এ-অঞ্চলে। সেই স্টেট থেকে এঁদের ওদিকে পাঠানো হয়েছিল প্রসপেক্টিং-এর জন্য।

—কীসের প্রসপেক্টিং? যোগীনমামা জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁরা বললেন—সোনার।

চমকে উঠলাম—সোনা! এ-অঞ্চলে সোনা!

তাঁরা বললেন—আমরা শুনেছিলাম, সুবর্ণরেখা নদীর বালিতে সোনা মিশানো থাকে।

—সত্যি!

তাঁদের ব্যাগ থেকে তাঁরা বার করলেন একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি। দেখলাম, দানা-দানা বালু মেশানো সোনার গ্রেন শিশিটার প্রায় বারো আনা ভর্তি হয়ে আছে। বললেন—অনেক কষ্টে এটুকু পাওয়া গেছে। যা খোঁজাখুঁজি আর পরিশ্রম, এতে আর মজুরী পোষায় না।

স্টেশন মাস্টার এসে প্রশ্ন করলেন—সোনাটা যতই কম হোক, সোনাটা আসছে কোথা থেকে?

তাঁরা উত্তর দিলেন—সেটাই ত দেখতে হবে প্রসপেক্টিং করে।

এই প্রসপেক্টিং তাঁরা বা অন্য কেউ অতঃপর করেছিলেন কিনা, জানা নেই। যোগীনমামা বললেন—খাওয়ার সময় হয়ে এলো, চল খাওয়ার খোঁজে যাই।

— কিন্তু কোথায় যাবে ?

যোগীনমামা বললেন—কালিমাটি বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে টাটার কারখানা হচ্ছে, লোকজন খাটছে, খাবার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। চল, এখুনি ট্রেন আসবে, সেই ট্রেন ধরে কালিমাটি চলে যাই।

তাই হলো। এলো ট্রেন। রওনা দিলাম কালিমাটির দিকে—খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

কালিমাটি স্টেশনে যখন নামলাম, তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। এই কালিমাটি, যা পরে হয়েছে টাটানগর, ছিল তখন খুবই ছোট একটা স্টেশন, চারিদিকে শালগাছ আর শালগাছ, রীতিমত জঙ্গল,—আর মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে কারখানার দিকে। দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পাশাপাশি চারটে চিম্‌নী দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত।

যোগীনমামা বললেন—রাস্তাটা মাইল দুয়েকের বেশি হবে না, কী বলো ? চলো, যাই ওখানে নিশ্চয়ই খাবার মিলবে।

আমার শরীর-মন দুই-ই তখন অবসন্ন, বললাম—অতদূরে যাব ? বলছ বটে মাইল দুয়েক, বেশি'ও হতে পারে ! যেতে-আসতে চার-ছ' মাইল না-কত, কে জানে ! আমি আর হাঁটতে পারি না। তার থেকে চলো, ফিরে যাই।

যোগীনমামা আপত্তি করলেন না। স্টেশনেও খাবার কিছু পাওয়া গেল না। ঐ অবস্থায় খড়্গপুর-নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে খড়্গপুর এলাম, রাত তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সেখান থেকে ধরলাম পুরীর গাড়ি। এলাম ফিরে কলকাতায়।

শুধু এই-ই নয়, বাবা বারে বারে চেষ্টা করেছেন আমাকে তাঁর কাজে ঢুকিয়ে নিতে। সেই কাজে ঢুকে ব্যবসা শিখতে পারলে আমাকে ফিরে আবার ভর্তি হতে হতো না স্কুলে।

কিন্তু, এরপর ? স্কুলের পালা চুকে যাবার পর ? মামার এক বন্ধু, গোপালচন্দ্র নাগ মশাই, ছিলেন "ইংলিশ ক্লার্ক" এক বড় গুজরাটী প্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানের যত চিঠিপত্র লেখালেখি হতো ইংরেজীতে, সে-সব তিনিই করতেন বলে তাঁকে বলা হতো, "ইংলিশ ক্লার্ক"। এরকম "ইংলিশ ক্লার্ক" অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিতে তখন থাকতই। এই গুজরাটীদের আরও নানা অফিস ছিল। তারই এক ভাটিয়া ফার্মে এবার আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ঐ গোপালবাবুকে ধরে। রোজ সকালে খেয়ে দেয়ে এসে বসতে হবে তাদের গদীতে। গদী অবশ্য ভালোই। বড়-বড় তাকিয়া সাজানো বিছানা। নিয়মিত যাই। বেলা একটা নাগাদ বাবুরা সব বেরিয়ে যেতো, আর আমিও সেই বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে একটানা ঘুম দিতাম সেই চারটে পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাঁরা ফিরে আসছেন। তাঁরাও আসতেন, আর আমারও হতো ছুটি। কাজকর্ম কিছুই নেই, শুধু ঐভাবে গদি আগলে পড়ে থাকা। কতদিন আর ভালো লাগে ? একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেললাম—এবার আমাকে কিছু কাজ শেখান ?

—কাজ?—তাঁরা বললেন—বাবাকে বলে কিছু টাকা নিয়ে আসুন, তবে ত শেয়ার কেনা-বেচা হবে? এই শেয়ার খেলতে-খেলতেই আপনি কাজ শিখে যাবেন।

বললাম এসে বাবাকে সে-কথা। বাবা শুনে অবাক হয়ে বললেন—সে কী! তুমি ফাট্‌কাবাজারে গিয়ে শেয়ার খেলবে কী? আচ্ছা, কাল থেকে তুমি আর ওখানে যেও না, গোপালবাবুকে আমি জানিয়ে দেব'খন।

ব্যস, আমার হয়ে গেল। লেখাপড়াও হয়ে গেল, ব্যবসা শেখাও হয়ে গেল।

বাবার ব্যবসা অবশ্য যেমন ছিল তেমনি চলতে লাগল তাঁর কর্মচারীদের দ্বারা। আমি হলাম মুক্ত, হলাম স্বাধীন, পড়াও নেই, কাজও নেই। বাড়িতেই আছি, বিকেলের দিকে বেরিয়ে একটু ঘুরে আসি, আর বাড়ি বসে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে তামাক খাই। মনে-মনে ইচ্ছা জাগত, সিনেমা দেখি, অথবা থিয়েটার দেখি। কিন্তু, দেখবার মত পয়সা কোথায় হাতে? আগে আগে গিয়ে দাঁড়াতাম ঠাকুমার দরজার সামনে। হায়রে, আজ আর দাঁড়াব তেমন করে কার কাছে? এখনকার দিন নয় যে, মধ্যবিত্ত ছেলেদের মত বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে হাত-খরচ পাব। সে রেওয়াজ তখনকার দিনে ছিল না। তার ওপরে, অকর্মণ্য আমি, বেকার। কখন কী দরকার, না দরকার, কে আর চোখ রাখছে তেমন করে? কাপড়-জামা-জুতো প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিস পর্যন্ত চাইতে আমার লজ্জা করত। নেহাত যদি কারুর চোখে পড়ত যে, আমার জামাটা ছিঁড়েছে, কী জুতোটা ছিঁড়েছে, তাহলে ব্যবস্থা হতো নতুন-নতুন জিনিসের, নইলে নয়। আর কোনো অসুবিধা নেই, এসো, থাকো, খাও দাও, কেউ আপত্তি করছে না। এমনিভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলাম, এক-আধদিন নয়, তিন-চার বছর।

কিন্তু, এই কিছু-না-করারও ত একটা ক্লান্তি আছে! আর কতদিন থাকব এই 'কিছু-না-করে?' যখন আমাদের সেই 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ের মহড়া চলছিল, সেই সময় আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য ছিলেন, ললিত মুখার্জি, তাঁর বাড়ি ছিল আমাদের সেই হরিশ মুখার্জি রোডের ভাড়া-করা ক্লাবের ব্যারাকবাড়ির ঠিক উত্তরদিকে। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন—ভালোই ত অভিনয় করেছিলে। অন্নপূর্ণা থিয়েটারে কাজ করবে?

—অন্নপূর্ণা থিয়েটার!

তিনি বললেন—জানো না?

—না?

বললেন—হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট—অর্থাৎ আদিগঙ্গার পূর্ব, তীর ধরে ধরে যে রাস্তা কোটাখুঁটি থেকে কালিঘাটের ব্রীজ পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তার ধারে অনেক চুনসুরকি বালির গোলা আছে জানো ত? সেই রাস্তার পাশে কিছু কিছু স্নানের ঘাটও আছে, বোধ হয় দেখে থাকবে। কোটাখুঁটি থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে কয়ালদের একটা ঘাট আছে, তার নাম কয়ালঘাট।

—তা হবে।

—সেই ঘাটের পাশেই কয়ালদের গোলা, গোলার পাশেই হয়েছে একটা থিয়েটার—অস্থায়ী অবশ্য।

—ওরই নাম বুঝি অন্নপূর্ণা থিয়েটার? একদিন দেখে আসতে হবে ত?

—বেশ।

তখন আমার গঙ্গাস্নানের অভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমা মারা যাবার পর এক মাস যে অশৌচ পালন করেছিলাম, সেই সময় রোজই করতে হতো গঙ্গাস্নান। আমার অভ্যাসের পত্তন সেই থেকেই। বললাম—একদিন না হয় কয়ালঘাটে গিয়েই স্নান করব—হরিশ পার্কের পশ্চিম দিককার রাজাবাগানের গলি·দিয়ে·সর্টকাট্ করে চলে যাব। দেখে আসব থিয়েটারটা।

দেখলাম। তোড়জোড়ও হচ্ছে শুনলাম। মনে আছে এই থিয়েটারের কথা। অল্পদিনের জন্যই হয়েছিল। কলকাতারই প্রাইভেট দল—মাঝে মাঝে থিয়েটার করত ওখানে, তবে মেয়েছেলে নিয়ে।

বললাম—ওখানে যাব কী করে? শুনলাম, ওরা নাকি মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করবে!

—তা হলেই বা!

—তা হলেই বা? একে ত বাড়িতে মা-বাবা আমাকে থিয়েটার করা-টরার জন্য দেখতেই পারেন না বললে হয়, তার ওপর যদি শোনেন, অভিনেত্রী নিয়ে থিয়েটার করছি, তাহলে বাড়ি থেকে একেবারে গলাধাক্কা দিয়ে বেরই করে দেবেন।

ললিত আর কিছু বলেন নি। কিন্তু আমাকে ত কিছু টাকা রোজগার করতেই হবে! ললিতকে বললাম বটে 'বাড়ি থেকে বের-করে-দেবার-কথা', তার জন্য মনে মনে খুব যে ভয় ছিল তা-ও নয়। না হয় বাড়ির বাইরেই থাকব, কোনো মেস্‌টেস্ দেখে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ভদ্রভাবে ট্রাম-ভাড়া-খাওয়া-থাকা চালিয়ে মেসে থাকতে গেলে খরচা মাস-মাস পঞ্চাশ-ষাট টাকার কম নয়! এত টাকা মাইনে আমাকে দিচ্ছে কে? অন্নপূর্ণা থিয়েটার? আশা করাও বাতুলতা। কারণ, তখনকার দিনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বড় বড় অভিজ্ঞ অভিনেতারাই ঐ মাইনে পেতেন। যাওয়ামাত্র প্রথমেই তাঁরা প্রশ্ন করবেন—পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবার মত কি অভিজ্ঞতা তোমার আছে?

তাই, নিরাশায় মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অভিনয় দেখা, ক্লাব করা, বায়োস্কোপ দেখা, এসব আর হয়েই উঠছে না!

এমন সময়ে হঠাৎ সামান্য একটু আশার আলো যেন দেখতে পেলাম! আমাদের ক্লাবে অভিনয় করত চেতলার একটি ছেলে, আলিপুর কোর্টে উকিলের মুহুরীগিরির কাজ করত সে। মুখ ফুটে তাকেই একদিন চাকরির কথা বলে ফেলেছিলাম। সে বললে—কিছু কাজ না জানলে ত হবে না! তবে অল্প কিছু উপার্জনের হদিশ দিয়ে দিতে পারি।

সাগ্রহে বললাম—তাই দাও না?

সে:বললে—হাতের লেখা কীরকম তোমার?

—চলনসই।

—তাতেই হবে। দিন বারো আনা থেকে এক টাকা দেড় টাকা পর্যন্ত রোজগার হতে পারে। অবশ্য, তোমার লেখার পরিশ্রমের ওপর সেটা নির্ভর করছে।

—কাজটা কী?

—আদালতের দলিল-পত্র নকল করা।

শুনলাম ব্যাপারটা। তখন টাইপরাইটিংএর প্রচলন হয়নি এখনকার মত, মুল দলিল লেখার জন্য উপযুক্ত লোকই থাকত। সেই মূল দলিল থেকে কপি করার কাজই দেওয়া হতো এইরকম সুপারিশ-ধরা লোক খুঁজে—ঠিকেতে। একেবারে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'—যাকে বলে মাছি-মারা-কেরানী! নকল করার জন্য পাতা হিসাবে ধরা হতো সেই পরিশ্রমের মূল্য, পাতা-পিছু কত রেট্, আজ তা মনে নেই।

রাজী হলাম। সে বললে—কাল এসো কোর্টে। অফিসঘরে আমি থাকব টিফিনের পর।

গেলাম। সে আমাকে নিয়ে গেল সেই বিভাগেরই সেরেস্তাদারের কাছে। সেরেস্তাদার আমাকে একটি দলিল দিলেন, একটুখানি নকল করতে। কিছুক্ষণ লেখবার পরই তাঁর কাছে যেতে হলো। তিনি পরীক্ষা করলেন আমার হাতের লেখা। বললেন—চলবে। সকালে এসে, অফিসঘর থেকে দলিল নিয়ে, সই করে দিয়ে, নকল করতে বসতে হবে। ঐ হলঘরে। বাইরে যাবার সময় দলিল বুঝিয়ে ভিতরে ফেরত দিয়ে যেতে হবে। পুরো একটা দলিল যতদিন না নকল করা শেষ হয়, ততদিন কামাই করা চলবে না।

—ঠিক আছে। তাই হবে।

হাজির হতে লাগলাম পরদিন থেকে। হল্‌ঘরটা বেশ বড়ই। আমার মত তিরিশ-চল্লিশ জন কপি-করার লোক বসে গেছে লম্বা টেবিলের সামনে—বেঞ্চিতে বসে। টেবিলের পর আরেক লাইন টেবিল। চার-পাঁচ থাক টেবিল। হঠাৎ দেখলেই মনে হয়, পরীক্ষার্থীরা এগ্‌জামিন দিচ্ছে বুঝি। কলম নিজেদের, কালি আর কাগজ ওরা দেয়। আমিও সই দিয়ে দলিল নিয়ে নকল করতে বসে গেলাম। একটা দলিল শেষ হলে, আমি টাকা নিয়ে, আবার খুশি মত গিয়ে কাজ নিতে পারব। কাজটা মন্দ নয়। দলিলের সাইজ হিসাবে নকল করতে লাগত দুদিন থেকে চারদিন। এইভাবে, হাতে টাকা পেয়ে উৎসাহের আর অন্ত নেই। কিছু জমিয়েই ভাবলাম, আবার ক্লাব আরম্ভ করা যাক্। আমাদের সেই যে পুরানো রয়্যাল ক্লাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই ক্লাবের আশুর সঙ্গে দেখা হতে একদিন বললাম—পয়সা হাতে কিছু এসেছে, এবার আবার ক্লাব করো। না জমতে পারলে আর চলছে না।

আশু অনেক ঘুরে-টুরে শেষ পর্যন্ত বকুলবাগানে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানা যোগাড় করলে। বৈঠকখানার সামনে একটা পাকা সাঁকোমতনও ছিল, বসা-টসা যেতো। ঘরটিও লম্বা বেশ, খোলার চাল অবশ্য, তবে, সিমেণ্টের মেঝে—লাল রঙ করা। শুনলাম, এখানে একটা ক্লাবই ছিল, সেটি উঠে গেছে দিনকতক আগে। তাদেরই ফেলে-যাওয়া ঘরখানাতেই আমরা আবার আমাদের ক্লাব করে জাঁকিয়ে বসতে লাগলাম। খবরাখবরও গেল চারিদিকে, সভ্যরাও যথারীতি আসতে আরম্ভ করলেন। চলতে লাগল আলোচনা। আলোচনা আর কীসের? ঐ থিয়েটারেরই আলোচনা। কী বই ধরা হবে, সেই সিদ্ধান্তেরই সব জরুরী অধিবেশন! স্থির হলো, গিরীশচন্দ্রের "শাস্তি কি শান্তি" বই করা হবে।

এখন, করা ত হবে, কিন্তু বইটা একে খুব বড়, তার ওপর কঠিন-কঠিন সব পার্ট। রীতিমত চিন্তার বিষয় তবুও পার্ট বণ্টন করা হলো। যেটি দানীবাবুর পার্ট—প্রসন্নকুমার, সেটিই এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। বইটাতে বহু স্ত্রী-চরিত্র, পুরুষের ভূমিকাও অনেক, এবং সবগুলিই খুব কঠিন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গিয়ে এ-বই আমি থিয়েটারে একবার দেখেও এসেছিলাম। মহড়া আমরা দিতে লাগলাম অবশ্য, কিন্তু কারুরই তা মনঃপূত হচ্ছে না, এত কঠিন! আমাদের দেখা সত্ত্বেও আমরা তা আয়ত্ত করতে পারছি না। আবার গিয়ে ধরা হলো ভুজঙ্গবাবুকে। এলেন তিনি। বললেন—সব ছেলেমানুষ তোমরা, এতে সব প্রবীণ লোকের চরিত্র, এ কী তোমরা পারবে? তোমাদের উচিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বই করা, যাতে গোঁফদাড়ি পরে যা হোক করে মানাবে।

কথাটা ঠিক, তবু আমাদের ঝোঁক—এই বইটাই যাতে হয়। আমাদের মনোভাব বুঝে অবশেষে তিনি বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। আসব।

আমি ত নিয়মিত ভোরবেলায় মাঠে গিয়ে বেড়াই, আর আমাদের 'কাশ্মীর'-এ গিয়ে মহড়া দেই একা একা। কিন্তু ভূমিকাটি ধনাঢ্য ব্যক্তির, বাড়ির কর্তার। এইসব সামাজিক বইয়ের চরিত্রানুযায়ী ভাব ফোটানো, এর জন্য আরও বেশী করে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, ভাবা প্রয়োজন। চেষ্টা আমি যথাসম্ভব করতে লাগলাম, হাঁটা-চলা-কথা বলা, সব প্রায় আয়ত্তে এনেছি, কিন্তু ভাব আসছে না কিছুতেই। অভ্যাস করছি, আর বির্জীতলাও-এর গীর্জার পাশে বসে কেবলি ভাবছি। সাধারণ দৃশ্যগুলো ছেড়ে দিয়ে দানীবাবুর প্রসন্নকুমারের যে-দৃশ্যগুলি চোখের সামনে জলজল করছে, সেগুলিই প্রথমে নকল করার প্রয়াস করতে লাগলাম। প্রথম দৃশ্যটিই ত কঠিন! প্রসন্নকুমার আর তাঁর স্ত্রী পার্বতীর কথোপকথন—সদ্য তাঁদের ছেলেটি মারা গেছে, ঘরে বিধবা পুত্রবধূ, কী করা যায়?

তারপরে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন পঞ্চম দৃশ্যে। অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের শেষদৃশ্যে। তাঁর জামাই পড়ে গেছে গাড়ি থেকে, পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে ঘোড়ার গাড়ির চাকা। চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু পা কাটতে হলো। এ দৃশ্যে পার্বতী পুত্রবধূর কাছে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁদের বড় জামাই মারা গেছেন। অতি শোকাবহ সে দৃশ্য! সে করুণ রসের অভিনয় কিছুতেই আয়ত্তে আসছে

না, বিশেষ করে আমার দেখা—দানীবাবুর প্রসন্নকুমার! উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে বলছেন—ডাক্তার দেখিয়ে বাছার পা কাটলাম, রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল—সেই রক্তে বেণীকে ভাসিয়ে দিলাম। চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছি—বাবা মূর্ছাও যায়নি, মৃত্যুও হয়নি—!

এ কী করে করব! এ ত শুধু আবৃত্তি করা—গলার কাজ—বা অঙ্গভঙ্গিরও কাজ নয়—এ যে বুকের গভীর থেকে স্বর টেনে এনে করুণ ভাবের সঙ্গে নিক্ষেপ করা!

এইরকম প্রতিটি দৃশ্য! আবার, ছোট মেয়ে প্রমদা বিয়ের রাত্রেই বিধবা হলো। মনের এই অবস্থায়—আহারে রুচি নেই—আহার করবেন না তিনি কিছুতেই। বিধবা পুত্রবধূ তাঁকে জোর করে খাওয়াতে বসালেন, এমন সময় প্রমদা ঘরে ঢুকল খুব ক্লান্তভাবে। প্রসন্ন বললেন—আয় তোকে আমি খাইয়ে দেই!

মেয়ে ধপ্‌ করে বসে পড়ল। গেলাসের সরপোষ খুলে ডান হাত ধুচ্ছিলেন। বাঁদিকে বসে পড়ল মেয়ে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এত শুকিয়ে গেছিস! কিছু খাসনি মা?

মেয়ে চুপ করে বসে রইল পাথরের মত। সে উত্তর দিলে না, আর কেউই কোনো উত্তর দিলে না। তিনি কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার পর, অকস্মাৎ বুকফাটা শব্দ করে বলে উঠলেন—ও আজ একাদশী!

বলেই তিনি উঠে পড়লেন। পার্বতীও উপস্থিত ছিলেন দৃশ্যে। বললেন—না—না উঠো না—উঠো না!

প্রসন্ন বললেন—ও দুধের মেয়ে, এক ফোঁটা জল মুখে দিতে পারেনি, আমি খাব!

চোখের সামনে ভাসছে দানীবাবুর সেইসব দৃশ্য! 'ও—আজ একাদশী' বলে ঐ যে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আর ঐখানটা, যেখানে ঘুরে বললেন—'ও দুধের মেয়ে, এক ফোঁটা জল মুখে দিতে পারেনি, আমি খাব',—সে এক অপূর্ব দৃশ্য হতো!

বড় মেয়ে ভুবনমোহিনী বিধবা হবার পর স্বামীর ঘরেই রইল, বাপের বাড়ি এলো না কিছুতেই। অথচ, সেখানে সে একা—অন্য আর কেউ নেই। তার স্বামীর বিশেষ এক বন্ধুকে মৃত্যুর সময় সে হাতে ধরে অনুরোধ করে গিয়েছিল স্ত্রীকে দেখাশোনা করার জন্য। সেই 'বন্ধু' প্রকাশবাবু আসেন, এ বাড়িতে মায়ের সেটা মনোমত হচ্ছে না, তাই এবার তিনি কর্তাকেই পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁর সঙ্গে মেয়ে চলে আসে এ বাড়িতে বসবাস করবার জন্য। দৃশ্যটিতে আছে—সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে—ঘরে আলো জ্বালা হয়নি—ভুবনমোহিনী ও প্রকাশ—দুজনে বসে কথা কইছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে। কথা কইতে কইতে এক সময় প্রকাশ বলে উঠল—আমার কি ইচ্ছা হয় জানো? তোমার পায়ের তলায় বসে, আমি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি।

ভুবন বললে—ও কী ছেলেমানুষী করো!

এমন সময় পদশব্দ শোনা গেলো দরজায়। উঠে দাঁড়াল দুজনেই। প্রসন্নকুমার ঘরে ঢুকতে

ঢুকতে বললেন—ভুবন তোমার মত কী—বলেই ঘরে ঢুকে প্রকাশকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিছু কথাবার্তা হলো। ভুবন বাপের বাড়ি যেতে কিছুতেই রাজী হলো না। প্রসন্নকুমার, "তাহলে আমি চল্লুম" বলে যেতে গিয়েও, ফিরে, আবার বললেন—"আমি এখানে কেন এসেছিলুন জানো? প্রমদার আবার বিয়ে দেবো কি না তোমায় জিজ্ঞাসা করতে। আমি উত্তর পেয়েছি। চললুম।"

এরপর, তিনি স্ত্রী ও পুত্রবধূর কথা না শুনে জোর করেই ছোট মেয়ে—প্রমদার বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে-বিবাহ সুখের হয়নি। জামাইটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মেয়ের ওপর অত্যাচার করে শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা আদায় করত।

এইরকম করুণ রস প্রায় প্রতি দৃশ্যেই। এবং তার সমস্ত প্রতিক্রিয়াই ঘটেছে প্রসন্নকুমারের ওপর। অবশেষে, শেষ দৃশ্যে ভুবনমোহিনীকে হত্যা করেছিলেন তিনি। ও মেয়ের জারজ সন্তান হয়েছিল, পাড়ার ছেলেদের টিট্‌কারী—নানাবিধ শ্লেষবাক্য শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়লেন। ভুবনমোহিনীর অন্তরেও তখন আত্মগ্লানি শুরু হয়ে গেছে। এই পরিবেশে—দৃশ্যে প্রবেশ করলেন প্রসন্নকুমার, উন্মাদ অবস্থা তখন তাঁর। বলছেন—"এই যে ভুবন! কোলে ছেলে নেই—আদর করছ না?"

এলেন তিনি ধীরে ধীরে মেয়ের দিকে এগিয়ে। গঙ্গাজলের ছোট একটা ঘটি আছে হাতে। তারপরে, ডান হাতে কোমর থেকে ছুরিটা বার করে মারতে যাচ্ছেন।

মেয়ে বলছে—মেরো না বাবা, ক্ষমা করো।

তিনি বললেন—তোর জন্য তোর মা মরেছে, তোর ছোটবোন চণ্ডালের চাবুক খেয়ে রাস্তায় পড়ে ছিল।

মেয়ে বললে—বাবা, মারবে যদি মারো, একবার 'ভুবন' বলে ডাকো—মরবার সময় বলো—ক্ষমা করেছ—শুনে যাই।

—তিনি বললেন—মুখ ফিরিয়ে বোস। তোর মুখ দেখে আমি সব ভুলে যাচ্ছি!

বলে, গঙ্গাজলের ঘটিটা মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন—ভুবন, তোর মুখ দেখলে আমার কঠিন হাতও কাঁপছে! দানীবাবুর সে এক অপূর্ব ভঙ্গি। ডান হাতে ছোরাটা ধরা রয়েছে, মুখখানা ডানদিকে ফেরানো, বাঁদিক ফিরে তিনি মেয়ের মুখ দেখবেন না, ঐ অবস্থায় বলছেন—

মুখে গঙ্গাজল দে। মুখ ফিরিয়ে বোস। ভগবানের নাম কর।

ঐভাবে ডানদিকে নিজের মুখখানা ফিরিয়ে রেখেই, বাঁহাতে মেয়ের মুখখানা নিজেই দিলেন তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে, তারপরে—পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত!

এইসব নিদারুণ দৃশ্য। কী করে সম্ভব? ক্লাবে গিয়ে একদিন বললাম—এইসব কঠিন পার্ট আমাদের মত অল্পবয়সীদের দ্বারা হয়ে ওঠা অসম্ভব। অথচ, পোশাক পরিচ্ছদ পরে যে ঐতিহাসিক বই করব, তাতেও মন সরছে না!

ভুজঙ্গবাবু বললেন—তার চেয়ে বাপু, বই পালটে ফেল। পোশাক পরিয়ে তোমাদের আসল রূপ বদলে না দিলে মানাবে কী করে? প্রবীণের ভূমিকায় নবীনরা, এ কী করে চলে বলো? ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বই-ই করো তোমরা। পোশাক-আশাকে বরং অনেক দোষ চাপা পড়ে যায়, ও-সামাজিক বই-টই ছেড়ে দাও।

মন তেমন সায় দিলে না দিলেও দু একটা পৌরাণিক বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে তেমন সাড়া জাগছে না! শেষে নানারকম সামাজিক বই করবার ঠিক করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, ঐ গিরীশচন্দ্রেরই "গৃহলক্ষ্মী"। এটিও কঠিন নাটক। থিয়েটারে অভিনয় বন্ধুরা দেখেছেন, আমি দেখিনি, আমি তাদের কাছ থেকে অভিনয়ের বর্ণনা শুধু শুনে নিলাম। বলা বাহুল্য, এবারেও আমার উপর এসে পড়ল দানীবাবুরই করা পার্ট —প্রৌঢ় গৃহকর্তার ভূমিকা—উপেন্দ্র। চেষ্টা করছি, ভাষা ভঙ্গি তবু হয়, ভাব ফোটানোই হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমস্যা। নবীনের পক্ষে প্রবীণের ভূমিকার যথাযথ রূপায়ণ বাস্তবিকই কষ্টসাধ্য। আমার কণ্ঠস্বর, ভাব কিছুই সাহায্যে আসছে না। তখন মেক আপের এত উন্নতি হয় নি। উপেন্দ্রর বয়স হওয়া উচিত ৪৫ থেকে ৫০ বছর। এই বয়সের কর্তাব্যক্তি যদি সাজতে হয় ২০।২১ বছরের একটি ছেলেকে, তাহলে ব্যাপারটা কত কঠিন হয়েই না দাঁড়ায়! আমার ইচ্ছা ছিল, ভুজঙ্গবাবু ভূমিকাটি একবার অভিনয় করে দেখান। অথবা, উনি নিজেই অভিনয় করুন। তা উনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন—ও তোমাকেই করতে হবে।

—দেখিয়ে দিন।

—না। দেখালে, তুমি আমার দেখে নকল করবে। এ তুমি যা করছ বেশ ভালোই করছ। আমি বরং দেখে নিচ্ছি।

ভুজঙ্গবাবুর শিক্ষকতার ঐ ছিল ধরন। নিজে দেখাবেন না। বুঝিয়ে দেবেন। দেখে নেবেন। বলবেন—হয়েছে, কিংবা হয়নি। তুমি নিজে থেকে নিজের মত করে যতটা করতে পার। নকল করে অভিনয় করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না।

হলো 'গৃহলক্ষ্মী'। এবারই শীতকালে—সেই প্রিয়শঙ্করবাবুরই বাড়িতে। অভিনয় দেখে লোকে খুব ভালো বললে। কিন্তু আমার তেমন তৃপ্তি হলো না। মনে হলো উপেন্দ্রের ভূমিকা নাটক অনুযায়ী যা হওয়া উচিত ছিল, তা একটু বেশী বয়সের—রঙ ফলাও হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার ওপর আমার কণ্ঠস্বর প্রৌঢ় গৃহকর্তার মত না হওয়ায় মনটা শূন্যতায় ভরে আছে। তাছাড়া, ভাব প্রকাশের যত চেষ্টা করি, ঠিক যেন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসছে না, একটা কৃত্রিমতা রয়েই গেলো! অথচ, মানুষ যা হৈ-চৈ করেছিল, তাতে হকচকিয়ে যেতে হয়। এত সুখ্যাতি হলো যে, পরবর্তী বৈশাখ মাসেই আমাদের পরিচিত মহলের মধ্যে এক বিয়েবাড়িতে বিশেষ আমন্ত্রণ এলো ঐ "গৃহলক্ষ্মী" অভিনয় করার জন্য। তখনকার দিনে এ বড় কম সম্মানের নয়! সব খরচপত্র

তাঁদের, আমাদের শুধু অভিনয়টুকু করে আসার পালা! সাধারণত বিয়েবাড়ির উৎসব-টুৎসব উপলক্ষে যখন বাড়িতে 'অভিনয়' দিতো, তখন নামকরা বড় দলকেই ডাকত; সেক্ষেত্রে আমাদের আহ্বান করায় আমরা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম। প্রথম রজনীতে যে যা করেছিলাম, এ রজনীতে তাই-ই করলাম। আমি উপেন্দ্র, প্রমথ (মল) শৈলেন্দ্র, নীরোদ প্রফুল্ল, প্রবোধ মন্মথ, বিভূতি শরৎ ইত্যাদি। আর সব ভূমিকায় ক্লাবের অন্য সব সভ্যরা। ব্যবস্থাপনায়—আশু। দেখলাম, ওই দ্বিতীয়বার অভিনয়েও—আমাদের খুব সুখ্যাতি হলো।

ক্লাবে অতঃপর কিন্তু ভাঁটা পড়তে শুরু করল। নিত্য যারা যেতাম, তাদের মধ্যে নিয়মিত হাজিরা দেবার দলে মাত্র আমরা দু'তিনজনে এসে ঠেকেছি। তাতেই সই। আবার কি নাটক ধরা যাবে, সে-সব জল্পনা-কল্পনাই হয়। এমন সময় একদিন পথে দেখা হয়ে গেলো—আমাদের পঙ্কজ-দার সঙ্গে। পঙ্কজ গাঙ্গুলী এঁর নাম, থাকতেন ভবানীপুরেই—কাঁসারীপাড়ায়। পরে ইনি হাওড়া ও চব্বিশ পরগণার সরকারী উকিল হয়েছিলেন। আমাদের তিনি জানতেন। বাড়ি ছিল তাঁরও শান্তিপুর। আমার বাগআঁচড়া গ্রামে বাড়ি শুনে নিজে থেকেই পরিচয় করে নিয়েছিলেন। আমার বাবার জনৈক মামাতো ভাই—শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই সূত্রেই তিনি আমাদের পরিবারের সকলকে জানতেন, আমার সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতেন। আমিও ডাকতাম তাঁকে পঙ্কজদা বলে। ভবানীপুরে আমাদের যে-সব অভিনয় হয়েছিল, সব ইনি দেখেছিলেন। নাট্যামোদী ছিলেন, তখনকার নাম-করা অভিজাত ক্লাব 'ভার্বিনা ক্লাব'-এর অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। হরিশ মুখার্জী রোডের উত্তরপ্রান্তে শম্ভুনাথ স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি—তখন গলস্টোন বলে এক সাহেবের খানকতক বাঙলো ধরনের একতলা বাড়ি ছিল ভাড়া দেবার জন্য। তার একটি বাড়িতে ছিল 'ভার্বিনা ক্লাব'। 'ভবানীপুর ক্লাব'-এর মত এই ক্লাবে আসতেন ভবানীপুরের সব গুণী ও ধনী ভদ্রলোকেরা। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে এসে তাঁরা কেউ বিলিয়ার্ড খেলছেন, কেউ বা খেলছেন তাস, কেউ বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন, কেউ বা অর্গান বাজিয়ে গাইছেন গান। এঁদের মধ্যে পঙ্কজদার নিজের ছিল বেজায় নাটকের শখ। তিনিই এবার উদ্যোগী হয়ে 'ভার্বিনা ক্লাব' থেকে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমাকে বললেন—ওহে অহীন্দ্র, কাল একবার ভার্বিনা ক্লাবে এসো ত।

ওরে বাবা! ও যে মস্ত ক্লাব!—ওখানে আমাদের মত ছেলে ছোকরা গিয়ে কী করবে! তবু পঙ্কজদার আহ্বান ত উপেক্ষা করতে পারি না, তাই গেলাম। আমাদের ক্লাবের প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিবারের আবার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে প্রফুল্ল তাঁকে 'মামা' বলে ডাকত। প্রফুল্ল আর আমি যেতে পঙ্কজদা বললেন—অমৃতলাল বসুর "খাসদখল" অভিনয় করব আমরা। অহীন্দ্র, তুমি কিন্তু ঠাকুরদার পার্ট করবে।

ভালো কথা। নিয়মিত যাওয়া শুরু করলাম, ভিতরে ভিতরে পার্টও মুখস্থ করতে লাগলাম।

একদিন এলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। তাঁরও বাড়ি শান্তিপুর। অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে অ্যামেচার অভিনেতা হিসাবে শৌখিন নাট্যমহলে কিছু প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের থেকে দু'তিন বছরের বড়ই হবেন, চব্বিশ পঁচিশ হবে তখন তাঁর বয়স। রীতিমত সুপুরুষ চেহারা। ভাবলাম, এবার রিহার্স্যাল হবে। কিন্তু থিয়েটারের আলোচনাই হতে লাগল, রিহার্স্যাল আর হলো না। এর দশ-পনরো দিন বাদে নির্মলবাবু আবারও এলেন, কিন্তু এবারেও ঐ অবস্থা। শুধু আলোচনা আর আলোচনা। রিহার্স্যাল ওঠে কই? মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, রীতিমত মহড়া না হলে নাটক হবে কী করে?

এদিকে, আমাদের 'রয়্যাল ক্লাব' অন্ধকার হয়ে যাবার যোগাড়। খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে বসে আছে আশু। বললে—আমিই শুধু সেই সন্ধ্যে থেকে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকব, না? যদিই দু'চারজন আসছিলে, তা-ও গিয়ে মেতেছ অন্য ক্লাব নিয়ে। তাহলে বলো, এসব তুলে দি।

—না-না, সে কী কথা!

আবার আমরা ক'জন আসতে শুরু করলাম নিয়মমত। কিন্তু কোনো নাটক যে ধরব, এরকম উৎসাহ আর পাচ্ছি না ভিতরে।

কিছু দিন কেটে যাবার পর আবার এলেন একদিন পঙ্কজদা, বললেন—ওহে আমাদের ক্লাব উঠে এসেছে হরিশ পার্কের উত্তর দিককার একতলা একটা বাড়িতে। তোমাদের বাড়ির কাছেই হলো এবার। একদিন এসো না?

গেলাম। গিয়ে দেখি, নিস্তব্ধ—নিঃঝুম, ক্লাব বলে মনেই হয় না! যতদূর বুঝলাম, একটা-কিছু গণ্ডগোল হয়েছে! ক্লাবে সবই আছে—ফরাস পাতা—আলোও জ্বলছে—চাকরও রয়েছে—কিন্তু জমে বসবার মত লোকজন নেই বললেই চলে।

এর কিছুদিন বাদে আবার একদিন গিয়ে শুনলাম, 'ভার্বিনা ক্লাব' উঠেই গেছে। অতএব, হলো না ওখানে আর 'খাসদখল'—আমরা আমাদের 'রয়াল ক্লাব'কেই আঁকড়ে ধরলাম। আমি আর আশু ত থাকিই। আর কেউ কোনোদিন এলো বা এলো না। এই রকম চলছে। এমন সময় একদিন ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। ওর ডাকনাম—খাঁদু, সবাই 'খাঁদাদা' বলে ডাকে। গৌরবর্ণ, সুন্দর চেহারা, মাথায় একটু খাটো। তখন ওর গোঁফ ছিল। অ্যামেচার ক্লাবগুলিতে ফিমেল পার্ট করত, ওদের বাড়ি ছিল চন্দ্রনাথ স্ট্রীটে। সেই যে আগে জিতেনের কথা বলেছি, যে আমাকে দিয়ে লেখানোর চেষ্টা করছিল, সেই জিতেনের ও মাসতুতো ভাই। হাওড়া রেলের ডিস্ট্রিক্ট এনজিনিয়ারিং অফিসে সর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্টের চাকরি করত। আলাপ আগে থাকতেই ছিল। বললে—আমরা 'জয়দেব' প্লে করছি অমুক দিন। যেও কিন্তু।

—কোথায়?

বললে—বলরাম বসু পাড়ায়। বৃন্দাবনদের বাড়ির সামনেকার মাঠে।

বুঝলাম। ডি. এন. মিত্র স্কোয়ার এখন যেখানে, তার পূবদিকে খাটাল ছিল, আশেপাশে পুকুর ছিল, ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট সেই সব পুকুর বুজিয়েছে, খাটাল সরিয়ে দিয়েছে। সেখানে আমাদের এক পরিচিত বন্ধু বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল। তা গেলাম দেখতে 'জয়দেব'। কিন্তু ওরে বাপ, কী ভিড়! লোকে লোকারণ্য একেবারে মাঠটা। জয়দেব হয়েছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, রাজগুরু—ভূজঙ্গবাবু, লক্ষ্মণ সেন—হরিমোহন বসু (লণ্ডন মিশনারী স্কুলে যিনি প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে অভিনয় করেছিলেন), রাণী অরুণা—ইন্দু মুখার্জী, রাখাল বালক (শ্রীকৃষ্ণ)—বসন্ত আচার্য (স্কুলে সে সময় এ-ও অভিনয় করেছিল এবং আমাদের রয়েল ক্লাবেও অভিনয় করেছিল।) দেখতে লাগলাম অভিনয়। অত ভিড় দূর থেকে কিছুই শোনা যায় না, ভুজঙ্গবাবুর ভারী গলার আওয়াজই শোনা যাচ্ছে শুধু।

এরপরে, একদিন ক্লাবে বসে আছি, এলো সেই বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়। স্থূলকায় বিরাট চেহারা ছিল ওর। বললে—এই যে অহীন্দ্র, আমাদের ক্লাবে এসো ত একদিন! ভুজঙ্গবাবু তোমায় ডেকেছেন।

—তোমাদের ক্লাব কোথায়?

বললে—ঐ বলরাম বসু পাড়াতেই। যাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে-ই বলে দেবে। 'ভবানীপুর বান্ধব সমাজ'। বুঝলে? যাত্রার মহলা বসাচ্ছি, পালার বিষয় হচ্ছে অভিমন্যু-বধ।

যাত্রা! চোখের সামনে ভেসে উঠলো মুহূর্তে যাত্রার সেই খোলা আসরের চেহারা, কন্‌সার্ট আর চাপকান-পরা জুড়ির দল!

সভয়ে বললাম—যাত্রা! কখনো ত করিনি!

—করোনি, করবে!—বৃন্দাবন বললে—তাছাড়া, অভিনয়ই যে তোমাকে করতে হবে, তা-ও আমি জানি না। ভুজঙ্গবাবু তোমাকে ডেকেছেন, এই পর্যন্ত। ভুলো না। যেও কিন্তু।

গেলাম অবশ্য যথারীতি। তখন রাজেন্দ্র রোডটা ভেঙে ভেঙে বলরাম বসু পাড়ার মধ্য দিয়ে যাবে বলে তার আয়োজন হচ্ছে, পরিষ্কার করছে। রাস্তাটা যেখানে বলরাম বসু লেনে কাট্ করেছে, তারই দক্ষিণে—একতলা একটা বাড়ি, রাস্তা থেকে দশ-পনরো ফিট্ খালি একটা ছোট্ট মাঠ মতন, তার পরেই পাঁচিলের দরজা। দরজা পেরিয়ে আবার লম্বা ফালি মতন উঠোন, তার বাঁ দিকে বড় বড় ফুল গাছের সারি—মল্লিকা-জবা এই সব। আর ডানদিকে পড়ছে বাড়িটা। খোলা রক্ তার সামনে। পরেই ভিতরে ঢাকা দালান—দালান পেরিয়ে দুটি ঘর—একটি বেশ বড়—অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। বাড়ির সবটাই ক্লাব। আগে যে গৃহস্থ এখানে বাস করত, তাদের রান্না আর ভাঁড়ারের জন্য পশ্চিম দিকে দুটি টিনের চালা ছিল। তাতে এখনও থাকে ক্লাবের চাকর।

ক্লাবে বেশির ভাগ বসে থাকত—বৃন্দাবন। আমাকে আসতে দেখে বলে উঠল—এই যে বসো এসে।

রাখল বসিয়ে। হরিমোহন বসু পাড়াতেই থাকেন, এর পঞ্চাশ গজের মধ্যেই তাঁর বাড়ি। এলেন তিনি এক সময়, সম্ভবত খাওয়া-দাওয়া সেরে। বললেন—এসেছ? বসো।

ওঁর সঙ্গে আলাপ ছিল না, তবে চিনতেন আমাকে। আমার থেকে উনি বড় হবেন ন দশ বছরের। ওঁর সেজো ভাই কিশোরী পড়ত আমাদের সঙ্গে, তার পরের ভাই—ললিতও পড়েছে। ছাত্র অবস্থায় ওঁদের বাড়িতে আমার গতায়াত ছিল। তাছাড়া তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না ওঁর সঙ্গে।

এরপর এলো ইন্দু। বললে—এই যে। এসে গেছ?

—বৃন্দাবন-যে খবর দিলে!

—বসো ভুজুদা আসবে।

'ভুজুদা' অর্থাৎ ভুজঙ্গবাবু। কিন্তু সবাই যে বসে থাকতে বলছে, এ বসার পালা চলবে কতক্ষণ! রাত হতে লাগল, নটা প্রায় বাজে। কাজকর্ম কিছু করি না, বেকার বটে, তবু বাড়ি ফিরতে নটার বেশি দেরি করি না। ভিতরে-ভিতরে স্বভাবতই একটু অস্থির হয়ে পড়লাম। ওদিকে, ব্যাপারটা হলো যাত্রা, আমাদের রয়্যাল ক্লাবের থিয়েটার নয়! যার-যার কাজকর্ম সেরে, বাড়ি ফিরে, রাতের খাওয়াটা চুকিয়ে দিয়ে তবেই আসছেন সব ক্লাবে।

হরিমোহনবাবু একসময় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। ওঁর হাতে দেখলাম—যাত্রার একটা পার্ট। সেটা খুলে ধৃতরাষ্ট্র-এর ভূমিকা পড়াতে লাগলেন। বললেন—পড়ো ত একটু?

পড়লাম। শুনে বললেন—বাঃ! বেশ!

আমি বুড়োর পার্ট করে করে ততদিনে রপ্ত হয়ে গেছি, ভাষা আর ভঙ্গিতে আটকায় না। বললেন—বুড়োর পার্ট তোমার ভালোই হয়।

বললেন—বেশ হবে 'ধৃতরাষ্ট্র'। পার্টটি আমি তোমায় লিখে দেব।

এই ভাবে শুরু হলো আমার যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ।

চার

১৯১৭—১৯১৮

"ভবানীপুর বান্ধব সমাজ।" এর আগেও ছিল। প্রবীণ যাঁদের দেখলাম, তাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আগেও ছিলেন, মাঝে বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরানোদের খবর-টবর দিয়ে নতুন উৎসাহে আবার শুরু হয়েছে এর পথযাত্রা! চলতে লাগল মহলা। বলা বাহুল্য, ভার্সের বই। মুখস্থ করি, আর যথারীতি ভোরবেলায় মাঠে গিয়ে অভ্যাস করি। দিন দশ এই অভ্যাসেই কাটছে, ওখানে আর যাইনি। এর মধ্যে একদিন 'রয়্যাল ক্লাব'-এ গিয়ে আশুকে সব বললাম। গিয়ে দেখি, একা আশু বসে আছে, আর বিশেষ কেউ আসে না। একটু দূরও পড়ে সবার। প্রবোধ সবদিন আসে না, বিভূতি আসে অবশ্য প্রায়ই। আশু সব শুনে বললে—তুমিও যাও, আমিও ক্লাব তুলে দি।

বললাম—আবার জেঁকে উঠুক ক্লাব। আবার আসব।

ক্ষুণ্ণ স্বরে আশু বললে—যা ইচ্ছা করো।

আশু সচরাচর আমাকে ডাকত "চৌধুরী" বলে। একটু থেমে তারপরে বললে—চৌধুরী, যাচ্ছ অবশ্য ভাল জায়গায়, বড়-বড় সব অভিনেতারা আসবে, মিশবে তাদের সঙ্গে, মাথা তোমার ঘুলিয়ে যাবে, তুমি কি আর ফিরে আসবে এখানে?

আজ আর সে-সব বিষণ্ণতার মুহূর্তগুলি বর্ণনা করে লাভ নেই, রয়্যাল ক্লাব সেই যে উঠে গেলো, আর জোড়া লাগল না। যে-যার কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আশু পরে ঐ ভবানীপুরেই এক যাত্রার ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাঁরা অভিনয় করেছিলেন—'অহল্যা-উদ্ধার'।···মনে পড়ে আজও এই বন্ধু মহলের কথা! সেই ফুটবল, সেই থেকে মাঠে বসে আড্ডা, তারপরে থিয়েটারের গোড়াপত্তন, ১৯১০ থেকে শুরু করে, আজ ১৯১৭তে ছিন্ন হয়ে গেলো সেই যোগাযোগ। সাত বছর ধরে এই যে দিনে-রাতে বন্ধুত্ব, এই যে অধিকাংশ সময় একসঙ্গে কাটানো, কখনো ভূতনাথের বাড়ি, কখনো আমার বাড়ি, কখনো আশুর বাড়ি, কখনো হাজরা পার্ক, কখনো ক্লাবঘর—সবই দেখতে দেখতে ভেঙে গেলো। বন্ধুদের অনেকেই আজ নেই? প্রমথ, প্রবোধ, এদের সঙ্গে তারপরে কচিৎ কখনো দেখা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রায় তিরিশ-বত্রিশ বছর পর্যন্ত আর দেখা হয়নি। তারও পরে অবশ্য সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে দিনে দুবেলা দেখা না হলে মন ভালো থাকত না, তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা না হয়েই কেটে গেছে। এমনি কালের গতি। বিভূতিও আছে, তবে বহুদিন তাকে দেখি না। আর দেখা হয় নি আমাদের ক্লাবের অন্যতম বন্ধু অমর বসুর সঙ্গে। এর ডাকনাম ছিল—লখাই। এর পিতা যাদবকৃষ্ণ বসু ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, এবং সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের হিন্দু সঙ্গীত বিদ্যালয়ের

অধ্যাপক। লখাইকে মনে পড়ে, ভালো তবলা বাজাত সে। আশু, ভুবন, প্রফুল্ল—এরা কেউ আর নেই।

যাক সে-সব কথা। "বান্ধব সমাজে" ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা হলো এক রবিবারে। সব দিন ত উনি আসতেন না, তাই যে-কদিন এর আগে গেছি, দেখা হয়নি। আমি নমস্কার জানাতেই বললেন—এসেছ? ধৃতরাষ্ট্রের পার্ট তুমিই করবে। আমি বলে দিয়েছিলাম।

হরিমোহনবাবু কাছেই ছিলেন। বললেন—খুব কাজের ছেলে হে। যাত্রায় ত এর মত পরিশ্রমী ছেলেই দরকার! এ খুব কাজে লাগবে।

বেশ ত। রবিবার-রবিবার সকালবেলা আসবে। কেমন?

মাথা নেড়ে জানালাম—আসব।

রবিবার সকালে মহড়া বসে না, তবুও সকালে আসবার কথা কেন বললেন সেটা বুঝলাম পরে। পরেই বলছি সে-কথা।

সত্যি বলতে কী, ক্লাবটা আমার বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। আমার বয়সী ছেলে-ছোকরাও আছে, ২৪।২৫ থেকে ৩০।৩২ বছরের লোকও আছে। আবার পাকা-চুল-মাথা প্রবীণেরাও রয়েছেন। ছোট-বড় দুটো ঘরেই প্রায় ঘর জুড়ে শতরঞ্জি পাতা। আমাদের ক্লাবে যেমন কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিল না (অবশ্য পরে তবলা ও বক্স-হারমনিয়াম হয়েছিল), এখানে এসে দেখলাম, হরেক রকম বাদ্যযন্ত্র রয়েছে সাজানো। চাকরও একটি রাখা আছে ক্লাবে, ঘর ঝাঁট দেয়, শতরঞ্জি পরিষ্কার করে, ঘরে-দালানে আলো জ্বালিয়ে দেয়। বেশ বিধিব্যবস্থা করা রয়েছে সব।

আমাকে প্রথম কাজ দেওয়া হলো, 'সাট' কপি করা। যে-পালা অভিনীত হবে, সেটা যে-খাতায় ভালো করে প্রম্পটিং-এর জন্য লেখা থাকে, তাকে বলে 'সাট'। 'সাট' কপি শুধু আমি একাই করিনি, আরও অনেকে করেছিল, কারণ, কপি ত আর একখানা নয়, দু-তিনখানা। এই 'সাট'-এর ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো, অমূল্য সম্পদের মত রাখতে হতো এই 'সাট'। এ তো আর ছাপা বই নয়, দলের বাঁধনদারের নিজের বাঁধা পালা। দলকে অপ্রস্তুত করবার জন্য শত্রুপক্ষ 'সাট' চুরি পর্যন্ত করতে পারে, কিংবা নিয়ে গিয়ে আগাগোড়া টুকে একটু-আধটু বদলে অন্য দল 'গাওনা' করে ফেলল, এও ত হতে পারে! সেজন্য দু-তিনখানা 'সাট' ত থাকবেই, আর তা থাকবে খুব যত্নে। এ ছাড়া আরও খাতা তৈরি করতে হতো 'জুড়ি'দের গানের জন্য। জুড়িরা যখন দাঁড়িয়ে গান ধরবে, তাদের পায়ের তলায় ফেলে রাখতে হবে খাতা যাতে তারা চোখ নামিয়ে দরকার হলে গানের কলিগুলি পড়ে নিতে পারে। সোজা কথা নয় সেই সব খাতা লেখা। একখানা নয়, চারখানা পর্যন্ত কপি থাকত। তিন ইঞ্চি বড়-বড় হরফে পরিষ্কার করে লিখতে হবে খাগড়ার কলম দিয়ে। এ খাতা জুড়িদের পায়ের কাছে থাকত, দোয়ারদের চক্রের মধ্যে। বড়-বড় খবরের কাগজে মলাট দেওয়া সে-সব খাতা, নীচে যারা দলের লোক বসে আছে, তারা খাতার পাতাগুলো উল্‌টে দিত গায়কদের প্রয়োজন মত।

রোজই ত যেতাম সন্ধ্যাবেলা, ধীরে ধীরে সবার সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেলো। রোজ যে অভিনয়ের মহড়া হতো, তা কিন্তু নয়। অভিনয় যাঁরা করতেন, তাঁরা প্রায় সবাই চাকরিজীবী। পাড়ায় যাঁরা থাকতেন, তাঁরা খাওয়া-দাওয়ার পর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ক্লাবে আসতেন। দূর থেকেও লোক আসত। তাদের সবার জমায়েত হবার সুবিধা হবে বুঝে, শনি আর রবিবার অভিনয়ের মহড়া বসত। অন্য দিন সাধারণত হতো গানের মহড়া। আর হতো সখিদের নাচের অনুশীলন। এই নৃত্যকর্মের জন্য সাত-আটজন ছেলে পুষতে হতো। এগারো-বারো থেকে চৌদ্দ বছর এই সব ছেলেদের বয়স, এদের কেউ কাজ করত স্যাকরার দোকানে, কেউ টিন মিস্ত্রীর দোকানে, কেউ বা রসা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মোটর কারখানায়। সন্ধ্যাবেলা আসত ক্লাবে, সভ্যদের কাছ থেকে আদায় করত এক আনা দু' আনা রোজ। এ ছাড়া, দোলে রঙ খেলবার 'জন্য পার্বণী, রথের মেলার জন্য পার্বণী, চড়কের পার্বণী, কালীপূজার বাজির জন্য পার্বণী, চড়কের পার্বণী, এ-সব দিত ক্লাব থেকে। পুজোর সময় জামা-কাপড়-জুতো, এসবও দিতে হতো।

এদের মহড়া হতো। দোয়াররা ছিল ছোকরার দল, তাদের গানেও মহড়া হতো। জুড়িরা সব প্রবীণ, তাঁরা আসতেন শনি-রবিবারে। শনি-রবিবারে শতরঞ্জির ওপর দেওয়া হতো ধবধবে সাদা চাদর বিছিয়ে। তবে, এর ওপর তাকিয়াও পড়ত না, গড়গড়াও রাখা হতো না বড়-বড় সব ক্লাবের মত।

গেলাম রবিবার সকালে পূর্বনির্দেশ মত। কিন্তু কাজটা কী? অভিনয়ের বিশেষ তালিম, না, গানের?

হরিমোহনবাবু সেজেগুজে এসেছেন, বললেন—চল, বেরুতে হবে।

সঙ্গে কে কে? না, আমি, ইন্দু, বৃন্দাবন, আর হরিবাবুরই জনৈক প্রতিবেশী—সিদ্ধেশ্বর বসু। বেরিয়ে বিভিন্ন সভ্যদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে হবে। কেন? না, তাগাদা দিতে হবে। চাঁদার তাগাদা। হাজিরার তাগাদা।

—কেমন আছো? আজ রিহার্স্যাল, এসো ক্লাবে।

ঘুরতে ঘুরতে হাজরার কাছাকাছি বেলতলা পর্যন্ত যেতাম। যেখানেই যেতাম, গিয়ে মনে হতো তাঁরা যেন পূর্ব থেকেই জানতে পেরেছেন যে, আমরা আসব। তাই, যাওয়া মাত্রই জলখাবার এসে গেল। মুড়ি, আর সঙ্গে গরম-গরম ভাজা বেগুনী। তার পর কোথাও বা রসগোল্লা, আমের সময়—আম। এইভাবে জলখাবারের পালা সেরে বেলা বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসতাম। সকালে আর দুপুরে ক্লাব বসত না। কে আসবে তখন? বেকারের মধ্যে তখন আমি আর বৃন্দাবন চাটুজ্যে।

রাজেন্দ্র রোডটা হবার জন্য রামময় রোড পর্যন্ত ভাঙাভাঙি হচ্ছে, ডোবা-টোবা বোজানো হচ্ছে। ওখানে যে বস্তিটা ছিল, সেটা মাঠের মতন পড়ে আছে, এখন ওখানে হয়েছে নর্দার্ন পার্ক। প্রচুর নারকেল গাছ ছিল ওখানে, বাড়িগুলি সব ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে। রাত্রে ক্লাব ভাঙবার পর, ঐ পথ দিয়ে

রামময় রোড পর্যন্ত কাউকে এগিয়ে দিয়ে একা ফিরে আসছি, জনহীন পথের ওপর নিজের পদধ্বনি নিজেই শুনছি, আর ঐখানটায় এসে গা কেমন ছমছম করে উঠত। তখন বাড়ি ফিরতাম নটায়, আর আজকাল সাড়ে দশটা-এগারোটায় ত ক্লাবই ভাঙছে। তারপর বাড়ি এসে চুপিচুপি খেতে বসি।

ক্লাবে যেতে যেতে আলাপ হয়ে গেলো জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। চক্রবেড়ে রোডে ছিল এর বাড়ি। তখন ভবানীপুরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন প্রিয়নাথ মল্লিক মশাই। ইনি বৃদ্ধ। আগে আলিপুরের উকিল ছিলেন বহুদিন যাবৎ। ইনি ছিলেন তখন বিপত্নীক এবং অপুত্রক। এঁর একমাত্র দৌহিত্র বঙ্কিম ভোজে খেতে গিয়ে বুঝি ফুড পয়জনে মারা যায়! এই প্রিয়নাথবাবুর আত্মীয় ছিল জ্যোতিষ, এঁর কাজকর্ম দেখত, থাকবার জন্য একটা আলাদা ঘরও পেয়েছিল। আমরা যেতাম এই জ্যোতিষের সঙ্গেই দেখা করতে। সেই সুযোগে দেখতাম প্রিয়নাথবাবু ঘোড়ার গাড়ি চড়ে নিজের এলাকায় রাউণ্ড দিতে যাচ্ছেন, কিংবা দিয়ে আসছেন। কত লোক যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার আর ইয়ত্তা নেই। কাজে বসে প্রায়ই তিনি ডেকে উঠতেন—জ্যোতিষ, জ্যোতিষ?

জ্যোতিষ ছিল আমাদের বয়সী, সকালের দিকে এর ঘরেই আড্ডা দিতে যেতাম আমরা। এর হাতে পয়সা ছিল, একেবারে নিঃস্ব ছিল না। থিয়েটারও করেছে জ্যোতিষ, শখের দলে, কলকাতা থেকে মফঃস্বলেই বেশি হতো তাদের অভিনয়। ফুটবল-ক্লাব, ক্রিকেট, এসবে ছিল তার সমান উৎসাহ! রেসও খেলতো বোধ হয়, জিততোও। তাই, শুধু আমাদের ক্লাবের লোকেরাই নয়, আরও অনেক লোক আসত উমেদারী করতে। অন্যত্র লক্ষ্য করেছি, কে বাজী জিতবে, তার টিপ্ পাবার জন্য লোকে করে উমেদারী, আর এর কাছে যারা আসে, তারা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে যায়—টাকা। বলে— যাহোক একটা কিছু আপনি খেলে দেবেন।

এত বিশ্বাস লোকের এসে গিয়েছিল ওর ওপর। বেশি টাকা অবশ্য নিতো না জ্যোতিষ দু-একজন লোক ছাড়া। অথচ, আমি দেখেছি, কেউ বঞ্চিত হতো না কিন্তু! এটা সে কি সত্যিই জিততো, না টাকায় হার গেলেও নিজে গাঁট থেকে তা ফেরত দিতো, তা কে জানে! বলতো—ধরতে পারছি না। মনে নেই।

কখনো কখনো দু-তিন টাকা দিয়ে দিতো বেশী। আমার সন্দেহই ঠিক। খুবই চক্ষুলজ্জা ওর। অতি ভদ্রলোক ছিল। ক্লাবে আসতে অবকাশমতো। ফুটবল খেলার মরশুমে এমন মেতে থাকতো যে, ক্লাবে আসতে পারতো না। আর রেসের সময় আসতো না—শুক্র এবং শনিবারে। এই জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমার বহু অভিজ্ঞতা হয়েছিল পরবর্তী জীবনে, যথা সময়ে তা বলব।

রেস আমি কখনো খেলিনি, তবে তখনকার দিনে ভবানীপুরের অনেক লোকই রেস খেলত বলে জানি। ফলে পাড়ার যেখানেই যাওয়া যাক, রেসের সময়, রেসের আলোচনা কিছু-না-কিছু কানে যাবেই। যখনকার কথা বলছি, তার কিছু আগে বোধ হয় তখন স্কুলেই পড়ি, হঠাৎ একটা ঢেউ এল

তুলো খেলার। এই তুলো খেলার ব্যাপারটা যে কী, ঠিক জানি না, তবে হঠাৎ দেখলাম,বড় রাস্তাগুলির ধারে—দোকানের সামনে—বাজারের বাইরে—যে পেরেছে সে-ই বসে গেছে টেবিল-চেয়ার হাত-বাক্স আর একটা ব্ল্যাক বোর্ড নিয়ে—তাতে কী-সব দর লেখা। এ ছাড়া, লাল সালুর ওপরে কাগজ কেটে, কিংবা আঠা লাগিয়ে তার মধ্যে তুলো জমিয়ে বড়-বড় করে লিখে রেখেছে—"তুলো খেলা"। বাজার করতে এসে বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে চার আনা ছ' আনা দিয়ে যাচ্ছে লোকে আর 'নম্বর' কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরদিন রব শোনা গেলো—সাত নম্বর উঠেছে আজ।

কী ব্যাপার? না, যাঁরা সাত নম্বর কিনেছেন কাল, তাঁরা বাজী জিতলেন আজকে! সে কী বাজী ধরার ধুম! ছেলেবুড়ো যে-পারছে সে-ই কিনছে, বাড়ির ঝিয়েরাও বাদ যাচ্ছে না। ঠিক জানি না, কটন্ মার্কেটে তুলোর দর ওঠা-নামা করত, তার থেকে কোন রকম 'জুয়া'র উদ্ভব হয়ে থাকবে সম্ভবত।

রেসের ব্যাপারে—"বুকী"দের কথা শুনতাম। 'এনক্লোজার'-এর বাইরে থেকে ঘোড়া দৌড়ে গেছে দেখেছি আর দেখেছি গ্রাণ্ড স্ট্যাণ্ড ও গ্যালারীর বিপরীত দিকে—এনক্লোজারের মধ্যে প্রাইভেট 'বুকী'রা বসে গেছে ধ্বজা টানিয়ে, সে এক মেলার সৃষ্টি করেছে বললেই চলে। এই 'বুকী'র ব্যবসা অনেকে করতেন তখন, ক্লাবে দু-একজন আসতেন, যাঁদের 'বুকী'র ব্যবসা ছিল। কর্তা কখনো লক্ষ্ণৌর রেসে চললেন, কখনো চললেন ব্যাঙ্গালোর রেসে, এ-সব প্রায়ই শুনতাম। টেবিল আর ধ্বজদণ্ড আর নোটিস বোর্ড, এই হলো প্রাইভেট বুকীর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। নোটিস বোর্ডে লেখা আছে—টিকিটের দর—রেস নম্বর—ঘোড়ার নাম। একজন লোক আবার হেঁকে চলেছে বোর্ড থেকে পড়ে পড়ে। আর, টেবিলের সামনে বসে 'পেনসিলার' লিখে চলেছেন টাকার হিসাব। তখনকার দিনে এই 'পেনসিলার' হওয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচিতি ছিল। সে যুগে তাদের মাইনে চার শো সাড়ে চার শো'র কম ছিল না। আমাদের প্রফুল্ল ঘোষের দাদা চণ্ডীবাবু ছিলেন একজন সুবিখ্যাত পেনসিলার। পরে টার্ফ ক্লাব এই সব প্রাইভেট্ বুকিং বন্ধ করে দিয়েছিল, স্ট্যাণ্ডের এনক্লোজারের ভিতর খেলতে হবে 'রেজিস্টার্ড বুকী' হয়ে। রেস-সংক্রান্ত এই সব আলোচনা খুবই শুনতে পেতাম।

ডাক চলেছে, 'পেনসিলার' মাথা নীচু করে টাকার হিসাব করে চলেছেন, এক সময় বলে উঠলেন "ও ঘোড়া আর খেও না।" বাইরের কেউ কথাটা বুঝছে না, বুঝলেন স্বয়ং 'বুকী' মশায়। মানে হোল —ও ঘোড়ার বাজী আর ধরো না, লায়াবিলিটির দিকে যাচ্ছে। এবার ধরো অন্য ঘোড়ার বাজী। এসব ব্যালান্সের সূক্ষ্ম হিসাব-টিসাব চটা-পট করে ফেলতে পারতেন বলেই ছিল 'পেনসিলার'-এর এত দাম! অনেক সময় যে-ঘোড়ার জিতবার আশা নেই, তাকেই কৌশলে "ডাক তুলে তুলে" ফেভারিট করা হতো, ফলে দু' পয়সা আসত বুকীর হাতে। এর কৌশল কী, জানি না। শুনতাম এই সব আলোচনা।

এদিকে আমি ত প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে যাই, সব দিন মহড়া হয় না, আমি নিজে থেকেই গরজ করে দু-একজনকে ধরে নিজের পার্টটা বলে নিতাম। আর বসে বসে দেখতাম যাত্রার সব ক্রিয়াকলাপ। তার মধ্যে আমার জুড়ি-দোয়ারকীটি বড় ভালো লাগত। বড়-বড় তালের সব গান—চৌতাল ঝাঁপতাল ধামার—লম্বা লম্বা ছেদ, আর যখন তা সমবেত পরুষ-কণ্ঠে উদাত্ত স্বরে গাইত চারিদিক একেবারে গমগম করত। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, গলা তৈরির পক্ষে এমন জিনিস আর দ্বিতীয়টি নেই। গলা তৈরি করতে হলে এদের সঙ্গে মিলে সুরে গাইতে হবে। পুরুষদের জুড়িদোয়ারকীর গান শুরু হতো 'সি-সার্প' থেকে, আর অভিনয়ের শেষের দিকে, গান দাঁড়াত গিয়ে সব 'ডি'তে। আমিও ক্রমে শুরু করে দিলাম দোয়ারদের পাশে বসে গান গাওয়া। দোয়াররা আমার আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে, হাঁটুতে হাত রেখে কেমন করে গানের ছন্দ বুঝে তাল দিতে হয় তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের দেখে-দেখে তাল, ফাঁক, এসব দিতে শিখলাম। পরে, যতক্ষণ না আমি আমার ভূমিকার 'সাজ' ধরে আসরে গিয়ে নামছি, তার আগে পর্যন্ত দোয়ারদের সঙ্গে গান করতাম, তাতে যে আমার বহু উপকার হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ ক্লাবে এসে এভাবে মহড়া দিচ্ছি বটে, কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসায় ভিতরে ভিতরে হয়ে উঠেছি অস্থির। "গৃহলক্ষ্মী" অভিনয়ের পরই বুঝেছিলাম, নিজের দ্বারা যতখানি শেখা যায় শিখেছি, কিন্তু এর পর ত আর হয় না। যাঁর কাছে শিখতে যাব, তিনি শেখাবেন এমনভাবে যে, যা তিনি করবেন, তা আমাকে হুবহু কপি করতে হবে। ভুজঙ্গবাবুকে দেখেছি এর ব্যতিক্রম। তুমি তোমার মত কর, আমি শুধু দেখে নেব ঠিক হচ্ছে কি না।

এই যে নিজের মত করে করা, এটাই ত কঠিন ব্যাপার। কণ্ঠ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সবই বশে আসছে বটে, কিন্তু ভাব আসছে না, জোর করে যা করছি কৃত্রিম হচ্ছে। কার কাছে শিখব? এ বিষয়ে বই-পত্তর কিছু আছে কি না, জানতে ইচ্ছা করে। ইংরেজী বই-টই আছে কী? সিনেমা থেকে তখন বহু ভঙ্গিমা বা অঙ্গবিন্যাসাদি শিখেছিলাম। তখন যে-সব ভাল-ভাল নাম-করা বিদেশী সিনেমা আসত, তার সব সচিত্র পুস্তিকা বিক্রী হতো একটাকা করে দাম, সেগুলি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতাম। আজ, এই ১৯৬০ সালে, সে-সব পুস্তিকার আর কিছু নেই, হারিয়ে গেছে, আছে শুধু একখানা, ইটালীর 'সাইনস্' কোম্পানী যে নির্বাক 'জুলিয়াস সীজার" তুলেছিলেন, তারই এলবাম। বেশ বড়-বড় আকারের ছবি, লাল বোর্ডের ওপর বাঁধানো। একটা লালচে কভার দিয়ে পোর্টফোলিও মত করা—তাতে থাকত ছবিগুলো। এই "জুলিয়াস সীজার"খানি অনেক ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও দেখছি বেঁচে আছে! আর সংগ্রহ করতাম "পিকচার-শো" পত্রিকা। বিলাতী পত্রিকা, তখনকার নির্বাক ছবিগুলোর ভাব-বিন্যাস বোঝানো থাকত অনুরাগীদের জন্য। এর ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম, দেখে দেখে ভাব-ভঙ্গী যা ভাল লাগত, তা হৃদয়ে গেঁথে নেবার চেষ্টা করতাম। ১৯২০।২১ সালেরটা বাঁধানো আছে। রেখেছি। আর সব খোয়া গেছে।

যাই হোক, শেখবার বইয়ের খোঁজ করছি মনে মনে, কিন্তু পাবো কোথায় উপযুক্ত বই? বাংলা বই ত কিছুই নেই। অমরবাবুর "নাট্য-মন্দির" বেরুত, আমার বন্ধু ছিল ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার মামা ছিলেন 'স্টার'-এর অনুরাগী এবং অমরবাবুর ভক্ত, তিনি রাখতেন। আবার তাঁর কাছ থেকে আমাকে এনে দিত ভুবন। তাতে 'মেক-আপ' সম্পর্কে "বহুরূপী বিদ্যা" নাম দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন গিরীশচন্দ্র, তা পড়ে খুব উপকার হয়েছিল আমার। কিন্তু, এতেও মীমাংসা হতো না আমার সব প্রশ্নের। দিনের বেলা অধিকাংশ সময়ই থাকতাম বাড়িতে বসে। অবশ্য, অর্থের অভাব বোধ করলে আলিপুর কোর্টে যেতেই হত দলিল লিখতে, কোনো দিন আবার কাজের অভাবে শুধু হাতেই ফিরে আসতে হতো। এই সব বাড়ি-বসে-থাকার দিনে বড় অস্বস্তি লাগত চুপচাপ একা-একা থাকতে। তাই সাড়ে-তিনটে-চারটেয় বেরিয়ে পড়তাম। মাঠে ম্যাচের সময় ম্যাচ দেখতে যাওয়ার অভ্যাস ত ছিল, তারই সূত্র ধরে ও অঞ্চলটাতেই যেতাম ঘুরতে। আজ যেখানে হাইকোর্টের ট্রাম বেঁকে যাচ্ছে স্ট্যাণ্ড রোডের মোড়ে, ওখানেই ছিল মেটকাফ হল—বড় বড় থাম সামনে আছে দাঁড়িয়ে, সেটাই ছিল তখনকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। শুনেছি, বিরাট লাইব্রেরী, প্রচুর বই, বিখ্যাত ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে এক সময় ছিলেন এখানে গ্রন্থাগারিক। ঘুরে দেখে যাই বাইরে থেকে, ভিতরে ঢুকতে আর সাহস হয় না। শেষ পর্যন্ত একদিন সাহস করে ঢুকেই গেলাম। বড় কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে, তারই বাঁদিকে ছিল ছাতা-লাঠি রাখবার কাউণ্টার। সেই কাউণ্টারে গাদা করা 'স্লিপ' থাকত, সেটাতে নাম-ধাম লিখে ভিতরে পাঠাতে হতো সই হয়ে আসার জন্য। তারপরে, ভিতরে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা। প্রকাণ্ড বড় আর উঁচু রিডিং রুমটা। যেদিকে তাকাই, দেখি, কড়িকাঠ পর্যন্ত সব উঁচু উঁচু বইয়ের থাক। হলের মাঝখানে পড়ে আছে বিরাট টেবিল, চার পাশে চেয়ার, লোকে বসে একমনে বই পড়ছে। সেদিনটা সব দেখে-শুনে এলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা আগ্রহ জন্মে গেল এখানে এসে পছন্দমতো বই পড়বার। তাই একদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবা যে গাড়িতে কাজে বেরুবেন, সেই গাড়ির একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসে রইলাম "দেবতার গ্রাস"-এর 'রাখাল'-এর মতো। "সেথা আগে ভাগে ছুটি, রাখাল বসিয়া আছে তরী 'পরে উঠি।"

বাবা বেরুতেন সাড়ে এগারোটা-বারোটা নাগাত। তিনি এসে গাড়ির মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখে অবাকই হয়ে গেলেন। তারপরে ভিতরে বসে, আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—তুমি কোথায় যাবে?

—হাইকোর্টের দিকে যাব।

—হাইকোর্ট! হঠাৎ হাইকোর্ট কেন?

—কাছেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখানে যাচ্ছি, একটু পড়ব।

—বটে! কী পড়বে?

—নাটক সম্বন্ধে ইংরেজীতে কোনো বইটই আছে কি না, খুঁজে দেখব। সংস্কৃত নাটকগুলির ইংরেজী তর্জমা সেদিন দেখে এসেছি, সেগুলিও পড়ব।

বললেন—তা খাতা-পেনসিল নিয়ে যাচ্ছ না কেন? যা বুঝতে পারবে না, নোট্ করে নিয়ে আসবে।

সেদিন আর হল না, পরদিন থেকে নিয়ে যেতাম খাতা-পেনসিল। সত্যিই, নোট নেবার মতো বহু জিনিস পেতাম। এইভাবে দিন যায়।

রিডিং-রুমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সুরেন কুমার বলে এক ভদ্রলোক। ওঁর সঙ্গে পরে খুবই আলাপ হয়েছিল আর্ট থিয়েটারের আমলে, প্রবোধ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল,প্রায়ই যেতেন। ইনি সম্ভবত কদিন ধরে আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন! ওঁর সামনেকার বুক-সমান উঁচু টেবিলেই ত রিকুইজিশন-স্লিপ লিখে বই আনাতে হতো! একদিন বললেন—রোজ রোজ স্লিপ পাঠান কেন, কার্ড করিয়ে নিতে পারেন না? কার্ড করিয়ে নিন। এই দিন ফর্ম, ফিল-আপ করে দিন।

সেই থেকে কার্ড হল, নীল একটা কার্ড, এটা হওয়ায় রোজ ঢুকবার সময় সেই যে ছাতা-লাঠির কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে স্লিপ কেটে অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা, সেটা থেকে বাঁচলাম। কিন্তু প্রথম-প্রথম আমার দশা হয়েছিল বাঁশবনে ডোম কানার মতো। এদিকে বই—ওদিকে বই—কোন্‌টা রেখে, কোন্‌টা পড়ব। সবই যেন পড়তে ইচ্ছা করছে। সুরেনবাবুর বসবার যায়গার কাছে উঁচু টেবিলে সাজানো থাকত মোটা মোটা ক্যাটালগ, প্রথম কদিন ত ঐ ক্যাটালগে বইয়ের নাম দেখে-দেখে কাটিয়েছি! কত যে বইয়ের নাম! এটা আনাই, দু'তিন পাতা পড়ে, ফেরত পাঠিয়ে, আবার আরেকটা আনাই, সে এক অদ্ভুত অবস্থাই বটে! প্রথম আকৃষ্ট হলাম একটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদে। মৃচ্ছকটিক। এ আবার কী নাম? নীচে ইংরেজীতে লেখা, "লিটল ক্লে কার্ট।" কৌতূহল হল। বইটি আনিয়ে পড়ে ফেললাম তাড়াতাড়ি। ক্রমে-ক্রমে "শকুন্তলা" প্রভৃতি আরও নাটক। যে ইংরেজী শব্দগুলি বুঝতে পারি না, নোট করে আনি, বাড়িতে অভিধান দেখে-দেখে তার মানে শিখে রাখি। এই ক'রে ক'রে পড়ে ফেললাম 'হিন্দু থিয়েটারে'র সম্পর্কে কিছু বই, স্তর উইলিয়াম জোনস্ আর ডাঃ উইলসনের। 'নাট্যশাস্ত্র'-র নাম দেখে বইটা এনে, উলটে পালটে দেখি, আগাগোড়া ফরাসীতে লেখা। ইংরেজী তর্জমা তখন পাই নি। অভিনয় সম্পর্কে তেমন বই ইংরেজীতেও চট ক'রে খুঁজে পাচ্ছি না, পাচ্ছি নাটক-তত্ত্ব সম্বন্ধে। জার্মান লেখক "ফ্রে-ট্যাগ"-এর লেখা বইয়ের ইংরেজী তর্জমা। নাট্যশৈলী নিয়ে লেখা। বেশ শক্ত। তেমন বুঝলাম না বটে, কিন্তু নূতনত্বের আস্বাদ পেলাম। ঐ বিষয়ে আরেকটা বই ছিল ডবলিউ. টি প্রাইসের। সেটা বেশ বোধগম্য হল। অস্টিন ব্রেরেটনের লেখা স্তর হেনরী আরভিং-এর জীবন-কথাও দু'ভলুম পড়ে ফেললাম। আর একটি বই ছিল শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লেখা 'অষ্ট রস' সম্পর্কে, 'The Eight *Rasas*' বোধহয় ছিল বইটার নাম। বহু অর্থব্যয়ে তিনি নিজেই এটা প্রকাশ করেছিলেন বিক্রির জন্য নয়, বিশ্বের বুধমণ্ডলীর কাছে উপহার প্রেরণই

ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিলিতী ছাপা বিলিতী বাঁধাই ভিতরে একরঙা দু'রঙা সব ছবি, আর সবই দুই রকম কালিতে ছাপা। সংস্কৃত শ্লোক আর তাদের ইংরেজী টিকা। খুবই উপযোগী বই, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য। আর ছিল রিডিং-রুমে আলাদা বুককেসে কুড়ি-বাইশ কি চব্বিশ ভল্যুম পাশাপাশি সাজানো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের পোশাক-সম্পর্কীয় বই—লর্ড কার্জন কর্তৃক লাইব্রেরীকে প্রদত্ত উপহার। বুককেসের ওপর লেখাও রয়েছে—"Presented by Lord Curzon." বই পড়তে-পড়তে এক-এক সময় চোখে পড়ত ওয়েস্ট-কোট গায়ে মধ্যবয়সী একটি দাড়িওয়ালা সাহেব কাঠের মই বেয়ে নিজেই ওপরে উঠে মোটা মোটা বইগুলো পাড়ছেন, আর তা দেখে হন্তদন্ত হয়ে বেয়ারাগুলো ছুটে গেছে তাঁর দিকে, আর তিনি কিছু বই তাদের দিয়ে দু'একখানা বই নিজের ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এসে একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। শুনলাম, ইনিই চ্যাপম্যান সাহেব, হরিনাথ দের পরে ইনিই এসেছেন গ্রন্থাগারিক হয়ে। ঘরে বসে বেয়ারাদের দিয়ে যে বই আনিয়ে নেবেন, সে তর তাঁর সইত না, নিজেই অমন ক'রে ছুটতেন বই আনতে। পরে, যথাস্থানে তা রেখে দেবার ব্যবস্থা অবশ্য করত বেয়ারারা। প্রশস্ত ললাট, বেশ সৌম্য চেহারা ছিল চ্যাপম্যান সাহেবের।

অবাক হতাম আরও একটি ব্যাপার নিয়ে। টেবিলের চারিদিককার সাজানো চেয়ারে বসে পড়ছে কম ক'রে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক, কিন্তু কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, গাছ থেকে একটি পাতা টুপ করে পড়লেও বুঝি তার শব্দটুকু শোনা যাবে, এমন নীরব চারিদিক।

এই রকম নীরবতা দেখেছিলাম হাইকোর্টে জজের এজলাসগুলিতে। লাইব্রেরীতে যেতে-আসতে কৌতূহলী হয়ে কয়েকবার হাইকোর্টের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিলাম। বিরাট সেই দোতলাটায় সবাই কর্মব্যস্ত, কিন্তু নিস্তব্ধ! বারান্দায় সার্জেণ্টরা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বাধা দেয় না। এজলাসে বিচার হচ্ছে, টুক ক'রে ঢুকে পড়ে পিছনে গিয়ে বসলেই হল! ওপরের মঞ্চে গম্ভীর মুখে বসে আছে জজ, নীচে পেশকাররা। মেঝেতে লম্বা টেবিল পাতা, তার চার পাশে ব্যারিস্টাররা! যাদের কেস হয়ে যায়, তারা চলে যায়, আবার নতুন দল আসে। বুঝি না তেমন কিছু। কথা হচ্ছে, কিন্তু হৈ-চৈ গোলমাল নেই। তখন অদ্ভুত লাগল সেই পরিবেশ!

সারাদিনের পর সন্ধ্যায় ক্লাবে অবশ্য যেতেই হয়। ক্রমে ক্রমে সবার সঙ্গেই ভাব হয়ে গেছে। ভালোও বাসে সবাই। আমার "ধৃতরাষ্ট্র"-এর মহড়া দেখে প্রধান ব্যক্তিরা সবাই খুশী। শেষ পর্যন্ত কথা উঠল, যখন ভালো করছে, তখন ওর পার্টটা বাড়িয়ে দাও না কেন।

সত্যি-সত্যিই তাই হল। নতুন দৃশ্য লেখানো হল আমার জন্য। এই যে অভিমন্যু-বধের পালা, এটা ঠিক একজনের লেখা নয়। গিরীশচন্দ্রের "অভিমন্যু-বধ"-এর বহু দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ এতে নেওয়া হয়েছিল, বিশেষ ক'রে পার্থপ্রতিজ্ঞা দৃশ্যের শেষের দিকে, যেখানে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করছে, সেটি একেবারে হুবহু রাখা হয়েছিল। বইটার নামই ত দেওয়া হয়েছিল "পার্থ-প্রতিজ্ঞা।" তখনকার দিনে যাত্রায় এই ধরনেরই সব নাম রাখা হতো। এছাড়া, ওতে নেওয়া হয়েছিল নবীন

সেনের "কুরুক্ষেত্র" থেকে দুর্বাসা-কর্ণের দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ ও কুন্তী'। সবগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করবার জন্য যে অতিরিক্ত দৃশ্য বা সংলাপের প্রয়োজন হয়েছিল, তা লিখেছিলেন ক্লাবেরই সভ্য, হরিমোহনবাবুদের বন্ধু রমণীবাবু বলে এক ভদ্রলোক। ইনি কোনো অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং অবসর সময়ে সাহিত্যচর্চা করতেন। "ধৃতরাষ্ট্র'-এর-ভূমিকাটিও ওঁর রচনা। সংলাপ আজ কিছু স্মরণে আসে না।

শখের দলের যাত্রা-ব্যাপারটা সহজ কিছু ছিল না। নিজেদের কনসার্ট-পার্টি, নিজেদের সখীর ব্যাচ, নিজেদের জুড়ি-দোয়ার, আর অভিনেতৃমণ্ডলী এই বিপুল জনসমাবেশ নিয়ে মহড়া চালিয়ে এক সূত্রে একটি নাট্যরস গেঁথে তোলা, কম অভিনিবেশ ও পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল না। পূর্ণ মহড়া হতো ঠাকুর-দালানে লোকজনের সামনে। ওখানে বলরাম বসু পাড়ায় তখন দু'তিনটে ঠাকুর-দালান ছিল, তারই যে কোনো একটিতে সুবিধা মতো আমরা পূর্ণ মহড়া দিতাম সমস্ত আয়োজন ক'রে। অর্থাৎ কনসার্টও বাজবে, সখীরাও নাচবে, জুড়িরাও গাইবে, অভিনয়ও হবে। জুড়ির গানের মাঝে মাঝে বিরতি বুঝে ব্যায়লা আর ক্ল্যারিওনেট তান ধরে দিত, সে দক্ষতা কম ছিল না, শোনাতও চমৎকার। ক্লারিওনেট বাজাতেন বিজয় দাস, দু'তিনখানা বেহালা ছিল আমাদের। তাঁদের মুখ্যবাদক ছিলেন—অতুল দাস। এছাড়া, পিকলু ছিল, কর্নেট ছিল, ঢোল-তবলা-পাখোয়াজ ত ছিলই। তখন আবার কনসার্টে ঢোল বাজত।

এইভাবে মহড়া, পূর্ণ মহড়া ইত্যাদি হবার পর একটি বছর গেল কেটে। আমাদের অপেরা মাস্টার ছিলেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ভালো অ্যাকাউন্ট্যান্ট, এদিকে সঙ্গীতাচার্য। ভবানীপুরেরই লোক। এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন ভালো ধ্রুপদ গাইয়ে। মধ্যমপুত্র—নিপুণ হারমনিয়াম বাজিয়ে। এই 'মধ্যম পুত্রই' নাচগান শেখাবার মাস্টার ছিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে সব থেকে প্রবীণ ছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র মশাই। তাছাড়া ভুজঙ্গবাবু, তিনকড়িবাবু ত ছিলেনই দলে। পূর্ণ মহড়া দেখতে আসতেন জ্ঞানী-গুণী সব ব্যক্তিবর্গ। তখন এই ই রেওয়াজ ছিল। নাম শুনে দূর দূর থেকে আসছেন সব মহড়া শুনতে। আমাদের মহড়া শুনে তাঁরা বললেন—চমৎকার হয়েছে। গাইবার মতো হয়েছে।

আমাদের মন উৎসাহে ভরে উঠল সামনে পুজো। হয়ত কোথাও 'আসর' হলেও হতে পারে।

হল আসর। তবে পুজোতে নয়, একেবারে কালীপুজোতে। এবং সেই প্রথম 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা'র অভিনয় আসরে যে আকস্মিক ঘটনা ঘটেছিল তা কখনো ভুলবার নয় সে কথাই এবার বলব। ১৯১৮ সালের কথা।

তখনকার এইসব শখের যাত্রা, যার সঙ্গে গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা সংশ্লিষ্ট থাকতেন, এর এক বিশেষ আভিজাত্য ছিল। পেশাদারী যাত্রা ত নয়, তাই অর্থের প্রশ্নও ওঠে না। এবং যেখানে অর্থের প্রশ্ন ওঠে না সেখানে যাঁরা আহ্বান করছেন, তাঁদের দায়িত্ব, বিশেষ করে সামাজিকতার দিক থেকে, অপরিসীম্। আহ্বায়কদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁরা একদিন আসবেন ক্লাবের পাড়ায়,

কর্তাব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি যাবেন সবার প্রথমে। যেমন করে উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সমাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণাদি হতো, ঠিক তেমনি ক'রে বিনীত ভঙ্গিতে নিমন্ত্রণ জানাতেন তাঁরা, বলতেন,—অমুক দিন আমাদের বাড়িতে আপনাদের যাত্রা হবে ঠিক হয়ে আছে ত? তাই এসেছি। দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন।

প্রতিদানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরও সৌজন্যের সীমা থাকত না, বলতেন—সে কী কথা! নিশ্চয়ই যাবো! আপনারা নিজেরা এসেছেন যখন—

মোট কথা, সামাজিক অভিমান বড্ড বেশী ছিল তখনকার দিনে। কর্তাব্যক্তিদের বাড়ি সেরে, তারপরে ওঁরা আসতেন সরাসরি ক্লাবে। সভ্যদের জনে জনে বিনীত ভঙ্গিতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে যেতেন, এতে তাঁরা কোনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হয়ত স্যাকরার দোকানের সামান্য কর্মচারী, কিন্তু ক্লাবে সে দোয়ার গায়, তাকেও তাঁরা করযোড়ে সাদর আহ্বান করতে ভুলতেন না।

সামাজিক অভিমান এত বেশী ছিল যে, শুনেছি, আমাদের আগে, কর্তাব্যক্তিরা যেতেন বটে গৃহস্থবাড়িতে যাত্রা-ব্যপদেশে, সদলবলে, কিন্তু কোনো আহার্য গ্রহণ করতেন না। গাড়ির মাথায় করে ঝুড়ি ভর্তি লুচি, তরকারী, এইসব নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। পরে অবশ্য বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় এব্যবস্থা আর টেঁকেনি। তবে প্রাচীনদের মন তখনো খুঁত খুঁত করতো, তাঁরা বলতেন, আদবকায়দা আর সামাজিকতার যে স্বরূপ ছিল এতদিনে তা' নাকি কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে। তাঁরা যা দেখেছেন, তা নাকি ততটা আর নেই! তারও আগে, পানভোজনের ব্যবস্থাও তখন থাকতো বলে শুনেছি তাঁদের মুখে। এই ব্যবস্থার একটা গল্পও শুনেছিলাম তখন। পৃথক কক্ষে গৃহস্বামী বিবিধ পানীয়ের ব্যবস্থা রাখতেন। হয়ত যাত্রার এক অঙ্ক হয়ে গেল, দলের সবার অমনি ডাক পড়ল সেই কক্ষে। স্বভাবতই ছেলেছোকরার দল প্রবীণদের সমীহ করে চলতো বলে তারা তেমন এগিয়ে আসতো না। হয়ত অতিউৎসাহী দু'একজন উপস্থিত হতো সেই পানীয়-চক্রে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাকি থাকতেন প্রবীণেরা। বিলাসী গৃহস্বামী হয়ত এতে বিশেষ উৎসাহী, তিনি নানাবিধ পানীয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন, সবই সাগরপারের দ্রব্য এবং বলা বাহুল্য, অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যের। গৃহস্বামী পরিবেশনের তদারক করছেন, আর ব্যস্ত হয়ে একবার এর কাছে যাচ্ছেন আরেকবার ওর কাছে যাচ্ছেন, বলছেন—আর কী জিনিস দিতে পারি?

'জিনিস' অর্থে বিভিন্ন 'লেবেলের' জিনিস। এটা খেয়ে দেখেছেন, এবার অন্য-কিছুও দেখুন, এই আর কী! বোতলের পর বোতল নাকি সাজিয়ে দিতেন সবার সামনে, চ্যাপ্টা, লম্বা, বেঁটে, সবরকমের। বলতেন—খান, খান, কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

কেউ হয়ত ব'লে ফেলতেন—আজ্ঞে যাত্রা! টাইম ত হয়ে এলো!

গৃহস্বামী বলতেন—আরে, আপনারা কি পেশাদারী? যাত্রাই শুধু করতে এসেছেন আমার

বাড়িতে? দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, যাত্রা না হয় নাই হলো। আরও বলতেন—না হয়, যাত্রা হবে'খন—আপনারা চালিয়ে যান দেখি?

অনেক সময় নাকি এরকমও হ'তো। যাত্রার নামে যাত্রা পড়ে রইল শূন্য হয়ে আসরে, ওদিকে বিশেষ কোনো কক্ষের অভ্যন্তরে চলেছে পানীয়ের লীলা! গৃহস্বামী উঠতে দিচ্ছেন না কাউকে। হয়ত তাঁর নিজের পেটেও পড়েছে কিছু, বলছেন—যাত্রা? ও হবে'খন। ওর জন্যে কী? খান দেখি আপনারা? ফরমাশ করুন, কী আনতে হবে? আমার ঘরে না থাকে, জুড়ি তৈরি রয়েছে এখুনি ছুটবে।

কে বুঝি অভ্যস্ত ছিল বাঙলা "দ্রব্যে", ওসব বিলাতী "দ্রব্য" কখনো জিভে ছোঁয়াবার সাধ্যও তার হয়নি। গৃহস্বামীর বারবার 'ফরমাশ করুন—ফরমাশ করুন' শুনতে শুনতে, হঠাৎ সে বলে ফেললে—হুইস্কী?

—নিশ্চয়ই। কতো চান? এই ত রয়েছে। কী মার্কা চান বলুন?

তার ত ওসবের কোনো ধারণাই নেই, কার কাছে কবে যেন শুনেছিল 'হরিণ মার্কা হুইস্কী'র কথা, সে মুখ ফুটে বলে ফেললে সেই হরিণ-মার্কার কথা।

গৃহস্বামী হেসে উঠলেন সেকথা শুনে। কারণ ওটা নাকি হুইস্কীকুলের মধ্যে কুলীনজাতীয় ছিল না। বললেন—ও আর কী, এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু অন্য কিছু ফরমাশ করুন? এমন ফরমাশ করবেন, যাতে হয়রান হয়ে সারা শহর জুড়ি ঘুরে বেড়াবে, তারপরে পাওয়া যাবে সে জিনিস অতি কষ্টে, তবেই না ফরমাশ?

এই ধরনের নানারকম গল্প শুনতাম ক্লাবে বসে। শেষ পর্যন্ত ওসব ক্ষেত্রে যাত্রা আর হতো না। কারণ, কে যাত্রা করবে? যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের অবস্থা হ'তো যেমন, যাঁরা করবেন তাঁদেরও অবস্থা হ'তো তেমনি। কে কাকে সামলাবে?

যাই হোক, আমরা ত যথারীতি নিমন্ত্রিত হলাম বিডন স্ট্রীটের কালিনাথ মিত্রের বাড়িতে আমাদের 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা'র প্রথম গাওনা করতে। যেদিন 'গাওনা' হবে, তার আগের রাত্রে আমরা সবাই গিয়ে শুয়ে রইলাম ক্লাবে। সাটও যেমন সামলে রাখতে হ'তো, ছেলেদেরও তেমনি রাখতে হ'তো আটকে। অনেক সময় 'ছেলে' চুরিও হয়ে যেতো। 'ছেলে', অর্থাৎ যারা 'সখী' সাজবে, তাদের সবাইকে আনিয়ে ক্লাবে শুইয়ে রেখে দিতে হতো আগের রাত্রে, নইলে কোন প্রতিপক্ষ তাদের কাউকে হাত ক'রে নিয়ে চলে যাবে, কে জানে! এসব ছেলে আগলানোর কাজ করতো বৃন্দাবন, এসব পারতও সে ভালো।

বেশ মনে পড়ে, সে রাত্রিটির কথা। চারটে নাগাত সব উঠে পড়লাম। উঠে, দুজন-দুজন ক'রে দলে বিভক্ত হয়ে আর সবাইকে ডাকতে বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি বাড়ি। অবশ্য, পাড়াতেই, কাছে-পিঠে। দূরের যারা, তারা ক্লাবে এসে শুয়েছে। নির্জন-নিথর রাত্রি, গ্যাসের বাতিগুলি

রাস্তার ধারে-ধারে তখনো জ্বলছে। যাকে ডাকব, তার বাড়ির কাছাকাছি এসে, হয়ত বা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে, ঈষৎ চাপা স্বরে ডেকে উঠলাম—উঠে পড়ো, আর না। সময় হয়ে গেছে।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে অদ্ভুত শ্রুতিলাভ করতো আমাদের সেই কণ্ঠস্বর। নিজেদের গলা নিজেরাই বুঝি চিনতে পারছি না!—কইহে, উঠলে?

সাড়া পেতাম—এই যে উঠেছি।

দেখতে দেখতে সবাই এসে জড়ো হতো ক্লাবে। তারপরে পর-পর সাজানো গাড়িগুলিতে চার-পাঁচ-কি ছ'জন ক'রে চড়ে রওনা দিলাম আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে। যেতে-যেতে কতো না গল্প। একজন বললে—সে এক দলে একবার যাত্রা করে ফিরছে রাজার হাট-বিষ্ণুপুর স্যর রমেশ মিত্রের বাড়ি থেকে। কড়াকড়ি দলের নিয়ম। ফেরবার সময় একজন করেছে কী, আট আউন্স একটা শিশিতে 'পানীয়' ভ'রে, সেটাকে একটা কারে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছে জামার নীচে। জামার ওপরে আবার চাদর মুড়ি দেওয়া। বাইরে থেকে কিচ্ছুটি বোঝবার জো নেই! ওদিকে হলো কী, কিছুদূর পর্যন্ত গাড়ি গেছে, অমনি সে বলে উঠল—এই থামো, আমি নামব।

থেমেছে গাড়ি। সে একটু দূরে সরে গিয়ে রাস্তার ধারে বসেছে। বসেছে ত বসেইছে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এরকম বসতেই হয়। কিন্তু অতি ঘন ঘন যখন সে নামতে লাগল তখন হলো সবার সন্দেহ। তারপরে মুখে একটু গন্ধও পাওয়া গেছে। কী ক'রে হ'লো এটা? তখন সবাই খুঁজে দেখে, তার জামার নীচে গলা থেকে ঝুলছে সেই শিশিটা—ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে!

আমরা সবাই হেসে উঠলাম একযোগে গল্পটা শুনে।

শখের যাত্রার দল তখন এমনিভাবে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে গাওনা করতে যেতো। দক্ষিণ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গ্রাম—হরিনাভি, সেই সেখান থেকে দল এসেছে বরাবর ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কলকাতায়, এ-ও দেখেছি।

গাড়ি যখন মিত্তির-বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল বিডন স্ট্রীটে, তখন সেই অতো ভোরে—অভ্যর্থনার কী ঘটা! বিবাহের বরযাত্রীর মতো, আদর-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি নেই।

—আসুন—বসুন—কী অসুবিধা হচ্ছে বলুন?

এই ছিল তখনকার রেওয়াজ। দোতলা বাড়িটার মধ্যিখানে প্রকাণ্ড চত্বর, চারদিক ঘেরা—ঘর আর ঘর—ওপরে আর নীচে। মাথায় সামিয়ানা আর চাঁদোয়া টানালেই কৌটোর মত হয়ে গেল। দেখি, আসর সাজানো হয়েছে চমৎকার, সাজঘরের ব্যবস্থাতেও কোন ত্রুটি নেই। সকালে শুরু হয়ে প্রায় 'যাত্রা'র গাওনা চলবে কম করে বেলা দুটো পর্যন্ত। 'গাওনা' ভাঙবার পর খাওয়া-দাওয়ার পালা। শুনলাম, সে-ও এক এলাহি ব্যাপার হচ্ছে। চা আর হালুয়া সংযোগে প্রাতরাশও হলো ভালোরকম। এদিকে আসরে রুপোর গড়গড়া, রুপোর নল ঝালরওয়ালা কলকে, রুপো-বাঁধানো হুঁকোও আছে, তা বসিয়ে রাখবার জন্য রুপোর বৈঠক—

এসব দিব্যি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে আসরে রাখা হতো রুপোর থালায় ডিসে তবক-দেওয়া পান, এলাচ, লবঙ্গ, আদাকুচি, তালের মিছরি, বচ। এত ঘণ্টা ধরে 'গাওনা' চলবে, গলার তরিবৎ না হলে চলবে কেন? তাই এই ব্যবস্থা! সঙ্গে অবশ্য সিগারেটও আসছে। আর চলেছে আতর ও গোলাপজলের ছড়াছড়ি। এইসবের সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরে যথারীতি মেক-আপও শুরু হয়ে গেল, যাকে বলে 'রঙ্‌ করা'। কিছুক্ষণ পরে যখন দর্শকরা কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করলেন, বাড়ির দোতালার চিকের আড়ালে মেয়েদের উপস্থিতিরও আভাস বুঝি পাওয়া যায়, তখন শুরু হলো ঢোল-সহযোগে আখড়াইয়ের কনসার্ট। এই প্রারম্ভিক ঐকতান-বাদনকে 'আখড়াই-এর-কনসার্ট'ই বলতো, আর এর সময় ছিল পুরো একটি ঘণ্টা। এটা শেষ হলে, বাজলো ঘণ্টা। অবশ্য, প্রথম কনসার্ট শুনে তেমন ভিড় না জমলে আরও একটা কনসার্ট বাজাতে হতো অনেক সময়। সোজা, কথা নয়। একটি কনসার্ট—ঘণ্টাখানেক ধরে বাজাইতেই জিভ বেরিয়ে পড়ে!

প্রসঙ্গত আর একটা কথা মনে পড়ে। সেযুগের বনেদী ঘরের ছেলেদের এমনই ছিল সহবৎ শিক্ষা যে, এই যে যাত্রা করতে ৭০।৮০ জন বিভিন্ন মেজাজের লোক এসেছে, এদের মেজাজ বুঝে—এদের আপ্যায়ন করে—ধৈর্য ধরে তাঁরা ঠিক কাজ চালিয়ে নিতেন, কোনদিকে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হতো না। আজকের দিনে যে ব্যাপারটা সচরাচর চোখেই পড়ে না। তখনকার দিনে, দেখেছি ত? বিবাহ ব্যাপারে বরযাত্রীরা এসে যে কীভাবে অত্যাচার করত, তা আজকের দিনে বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। তা' সেই বরযাত্রীদেরও কন্যাপক্ষের ছেলেবুড়ো সবাইকে অসীম ধৈর্য সহকারে কীভাবে যে মানিয়ে নিয়ে চলতেন তার পরিচিতি আজকের দিনে পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

যাই হোক, 'আখড়াই-বাজনা'র পর, শুরু হলো বন্দনা-গীতি। জুড়ি গাওয়ার সাধারণ নিয়ম জুড়িরা গাইবে এক-কি দু' কলি, দোয়াররা তার প্রতিধ্বনি করবে। কিন্তু, বন্দনায় জুড়ি-দোয়াররা একসঙ্গে গাইবে। এ-ই নিয়ম। তাদের ঐ গান শেষ হলে—শুরু হলো অভিনয়। অঙ্ক শেষ হলে—আবার কনসার্ট বাজবে কিছুক্ষণ। এদিকে, সাজঘরে টুকিটাকি খাবার আসছে ত আসছেই। এই এলো হালুয়া, এই এলো কচুরী, এই সিঙাড়া। যে-যা চায়, খেয়েই চলেছে।

'জুড়ি'র পর 'বেশ-বেশ' রব উঠল দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে। কান পেতে তা শুনলাম, শুনে কী যে আনন্দ হ'লো তা বলার নয়। একটা মজা তখন দেখেছি, পেশাদারী দলে জুড়ি যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু লোকে তা চাইত না। ১৯১০-১১ সালে মথুর সা-র দল জুড়ি তৈরি করিয়েছিল ছেলেদের দিয়ে, কিন্তু তাতে ঠিক জমাট জিনিসটি পাওয়া যেতো না। শখের দলের 'জুড়ি'রা বেশ তারিফ পাচ্ছে, পেশাদারী দলের 'জুড়ি' বাহবা পায় না কেন? এ নিয়ে নানা গল্প তখন প্রচলিত ছিল। পেশাদারীর জুড়িতে দোয়াররা ছিল অধিকাংশই বুড়োর দল, দিনের পর দিন গাওনা ত, বেচারীরা অত্যধিক শ্রমে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ত। কারুর কারুর আবার 'অহিফেন' সেবনেরও অভ্যাস ছিল। জুড়ি

গাইছে—পার্বতী-সুত লম্বোদর। দোয়াররা গাইছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো।

অথচ, জুড়িদের কাজ হচ্ছে—প্রাণপণ শক্তিতে কথাগুলি পরিষ্কার উচ্চারণ করে গাওয়া। জুড়িই বলুন আর দোয়ারই বলুন একটা সুর রেখে সবাই গাইবে। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে। যাকে বলে—প্রকৃতই সমবেত গান। মনে হবে যেন এক গলাই দশগুণ হয়ে সুরধ্বনি তুলছে! এই ডিসিপ্লিনটা ভয়ানক দরকার, নইলে জুড়ির আয়োজনও ব্যর্থ, প্রয়োজনও ব্যর্থ।

আসলে, জুড়ির কাজ হচ্ছে—ওকালতি করা। তাই ওদের পোশাকও হতো উকিলের পোশাক—চোগা আর চাপকান। কালোই হতো অন্যান্য জায়গায়, আমাদের ক্লাবে হতো সাদা রঙের—গরদের। এতে ফলাফল যাই হোক না কেন, চরিত্রের হয়ে ওকালতি করাই ছিল জুড়িদের কাজ। 'অমুকের ছেলে যাত্রার মোক্তার সেজে গান ধরেছে'—ঐ তখন গ্রাম্য অঞ্চলের এক প্রচলিত বাক্যই ছিল।

ধরা যাক, প্রাচীন যাত্রার পালা—বিদ্যাসুন্দর। তাতে বোধহয় এক রাজা বীরসিংহই গান গাননি, তিনি ছাড়া গেয়েছিলেন আর সবাই, রাণী, বিদ্যা, সুন্দর ও মালিনী। এ রীতি অনুসারে প্রায় সব অভিনেতাকেই গায়ক হতে হয়। তাই, পরবর্তীকালে হলো কী না অধিকাংশ পাত্রপাত্রীরই বকলমে জুড়িরা উঠবে গান গেয়ে। যেমন, পার্থপ্রতিজ্ঞায় অভিমন্যু-বধে সুভদ্রার বিলাপ। বিলাপের শেষ পংক্তিটি হয়ত 'ওরে, কোথা গেলি রে বাছাধন!'

এটি উচ্চারিত হবার অব্যবহিত পরেই উঠে দাঁড়ালো জুড়ির দল, সুভদ্রার হয়ে তারাই গানে গানে প্রকাশ করবে সুভদ্রার মনোবেদনা—'কোথা গেলি রে বাছাধন!'

এইভাবে কথার লাইন ধ'রে গান।

আজ জুড়ির কাহিনী শুনে আপনাদের কেমন লাগছে জানি না, কিন্তু তখনকার দিনে, বিশেষ ক'রে যখন বাইরে—মফস্বলে 'গাওনা' করতে যেতাম, এইরকম চারদিক-ঢাকা আসর নয়, আসর পেতাম মাঠের মধ্যে—চারিদিকে যতদূর চোখ যায়—দেখি কাতারে কাতারে লোক, সেই সময়, লক্ষ্য করতাম, গানগুলি এমন বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর অন্তর সাজানো রয়েছে যে, গান যখন থামছে, তখন ঐ অতো লোকের আসর—একেবারে নিস্তব্ধ—নীরব! একে বলতো 'সুরজমাট'। যেন সুরে সব ছেয়ে গেছে। তখন আস্তে কথা বললেও লোকে বুঝি শুনতে পাবে! এমনি গমগম করা সুরের রেশ-ছাওয়া পরিবেশ! মনে হতো যেন পটভূমিকা তৈরি হয়ে আছে, উঠে কথা বললেই হয়—চীৎকার করতে হবে না—কিছুই না—অভিনয় আপনিই জমে যাবে। এইরকম প্রতি পালায় পনরো ষোলোখানা থাকত জুড়ির গান। ঐ সুরজমাট ভাবটা বুঝে গানগুলি সন্নিবিষ্ট হতো। সত্যি কথা বলতে কি, এই গানগুলি গাওয়ার গুণ আর উপস্থাপনার কৌশল অভিনয়কে নিদারুণ সাহায্য করতো।

অভিনয়ের মাঝে পাত্রপাত্রী এক সময় বসে পড়লো, উঠলো জুড়ি-দোয়ারেরা গান গাইতে, আবার তারা বসল, উঠল পাত্রপাত্রী তাদের বক্তৃতা শুরু করবার জন্য। যাত্রার পালায় এত গান থাকত বলেই বুঝি চলতি কথায় বলা হতো—গাওনা।

—কেমন গাওনা হলো ?

—ও দল খুব গাওনা করে গেল হে এসে !

এ ধরনের কথা প্রায়ই শুনতে পেতাম।

আরও একটি কথা। তখন কোরাস গাইতে গাইয়েদের কোনো আপত্তি সাধারণত লক্ষ্য করি নি। বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষের সময় রাস্তায় নেমে তরুণের দল হারমনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে কোরাসে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুরে, এ তো খুব শুনেছি! সে সবই হতো কোরাস। পাড়ার গাইয়ে 'কোরাস' গাইবো না বলে অভিমান ভরে দূরে সরে থাকতো না।

যাই হোক, মিত্তির বাড়িতে অভিনয় ত আমাদের চলতে লাগল। লোকও হয়েছে খুব। চত্বরটা ঠেসে বসেছে লোক। আসরও সাজানো সুন্দর, আদর-আপ্যায়নেরও ত্রুটি নেই, দেখতে-দেখতে অভিনয় মোটামুটি জমে গেল। আমার যাত্রার জীবনের প্রথম অভিনয়। এ রাত্রিটির কথা কখনই কি ভুলতে পারি ? আমাদের দলের প্রবীণতম অভিনেতা খগেন্দ্রনাথ মিত্র হয়েছিলেন—দ্রোণাচার্য। তিনকড়িবাবু—কর্ণ। ভুজঙ্গবাবু—ভীম। হরিমোহনবাবু—অর্জুন। ভুজঙ্গবাবুর ভাই পঙ্কজভূষণ রায় (পরে 'ফণী রায়' নামে যিনি অভিনয়-জগতে খ্যাতনামা হয়েছিলেন)—দুর্বাশা। যুগলকিশোর বসু—জয়দ্রথ। যতীন্দ্রমোহন সিংহ (টাবুদা)—দুর্যোধন। ইন্দু মুখোপাধ্যায়—অভিমন্যু। উত্তরা সেজেছিলেন বিধুভূষণ সরকার বলে একটি ছেলে, চৌদ্দ-পনরো বছর বয়স, সুন্দর গৌরবর্ণ চেহারা, চেতলায় ছিল বাড়ি, তবে তোতলা। অথচ আশ্চর্য, কথা মুখস্থ ক'রে যখন অভিনয় করতো, একটু আটকাতো না। আমি ছিলাম ধৃতরাষ্ট্র। আর বসন্ত আচার্য, যার কথা পূর্বে বলেছি, যে আমাদের সঙ্গে পূর্বে আরও অভিনয় করেছিল, সে সেজেছিল—রোহিণী।

অভিনয় ত আমরা সাধ্যমত করে চলেছি, হঠাৎ এক সময় কানে এলো—আগুন-আগুন ! আসরে যে-যে অভিনেতা তখন অভিনয় করছিল, তারা থ্‌মকে দাঁড়ালো, যন্ত্রীরা তাকালেন মুখ তুলে, জুড়ি-দোয়াররা হলেন উৎসুক, আমরা, যারা তখন সাজঘরে ছিলাম, ছুটে এলাম বাইরে।

ওদিকে সমস্ত চত্বর জুড়ে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেছে। হোগলা আর বাঁশ দিয়ে যে অতো বড়ো মাথার ওপরকার চালটি তৈরি করা হয়েছিল, যার নীচে আসরের শোভা পাচ্ছিল সুদৃশ্য চাঁদোয়া, দেখতে-দেখতে সর্বগ্রাসী বৈশ্বানর তাকে গ্রাস করে ফেলতে লাগল। পরে শুনেছিলাম ব্যাপারটা। কালীপুজোর সময় ত ? তাই বাজি ছোড়ার জের তখনো চলছে। কোথা থেকে একটি হাউই উড়ে এসে পড়ল ঐ চালের ওপর। সারাদিনের রোদ-খাওয়া হোগলার চাল, শুকনো খড়খড়ে, আগুন ধরামাত্র একেবারে দাউ দাউ করে উঠল। বাড়ি থেকে বেরুবার যে যেমন পথ পেয়েছে, সেই

পথেই ঠেসাঠেসি করে পালাচ্ছে। বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েদের আর্তনাদ। চীৎকার—গোলমাল হৈ-চৈ—ধোঁয়া, মুহূর্তে সে কী এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো, তা বলার নয়। বাড়ির ছেলেরা কাজে নেমে পড়েছে ততক্ষণে, তাদের গলার আওয়াজ পাচ্ছি।

—জল-জল।

—বালতি নিয়ে আয়! আরও বালতি।

—দমকলে খবর দে।

আমরা ততক্ষণে যন্ত্রাদি নিয়ে সাজঘরে এসে ঢুকে পড়েছি। সাজঘরটা বাড়িরই অংশ, বারান্দায় আর একটি ঘর, মাথার ওপরে অগ্নিদগ্ধ হোগলার চালটা নেই। আমাদের কে যেন বললে—এত ক'রে আসর সাজিয়েছিস জাজিম, গালিচা পেতে —রুপোর হুঁকো সাজিয়ে—সব নষ্ট হয়ে যাবে?

—বাড়ির ছেলেরা ত এদিকে আসতে পারছে না!

আমাদের কয়েকজন বললে—চলো, আমরাই ওসব তুলে আনিগে।

—সাবধান। মাথার ওপর জ্বলন্ত চালটা না ভেঙে পড়ে।

আমরা যথাসাধ্য করলাম। শতরঞ্জি, গালিচা, রুপোর হুঁকো, গড়গড়া, নল, বৈঠক, রুপোর ডিসগুলো—সব আমরা একে একে ভিতরে নিয়ে এলুম।

ছুটতে ছুটতে দু'একজন করে ধোঁয়ার মধ্যে যাই—আর ছুটতে ছুটতে একটা কিছু জিনিস নিয়ে চলে আসি। এইভাবে আসরের প্রায় সব জিনিসই উদ্ধার পেয়েছিল বলে মনে পড়ে।

সে এক দৃশ্যই বটে। বালতি বালতি জল পড়ছে, আর ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু অগ্রসর-চঞ্চল অগ্নিশিখাকে রোধ করা যাবে কী করে? সে সমস্ত চালটাত পুড়িয়ে ফেলবেই, সঙ্গে সঙ্গে আসল বাড়িটাকে না ছুঁয়ে ফেলে! দোতালার বারান্দায় চিকের পর চিক ঝুলছে, সেগুলিকে গুটিয়ে ফেলা হতে লাগল, কিন্তু তবু নিঃশঙ্ক হতে পারা যাচ্ছে কই?

ঢং ঢং ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ইতিমধ্যে এসে পড়ল দমকলের লোকেরা। মাথায় হেলমেট-পরা বিচিত্র পোশাকের সব দমকলের লালমুখো কর্মিদল! ষণ্ডা-ষণ্ডা চেহারা। তারা প্রথমে এসেই জানতে চাইলে—সিঁড়ি কোথায়?

তারপর সিঁড়ি দেখিয়ে দিতে, তর তর করে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে একেবারে ছাতে গিয়ে, তার কার্নিসে দাঁড়িয়ে দা দিয়ে কেটে ফেলতে লাগল সেই অতিকায় হোগলার চালটা।

ঠক ঠক ঠকাস্ দায়ের কোপ পড়ছে বাঁশের উপর দড়ির ওপর আর সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়েছে সেই কোণটা। এইভাবে চালটা কাটা পড়তে লাগল, আর ওদিকে পাইপে করে ধারায় ধারায় বারিবর্ষণ ত আছেই!

এমনি করে, দেখতে দেখতে, সারা চত্বরটা ভরে গেল পোড়া বাঁশে, পোড়া আর আধপোড়া হোগলায়, আর পোড়া কাপড়ে। পোড়ার গন্ধে ভরে গেছে চারিদিক আর চারিদিক ভরে গেছে

ধোঁয়ায়। বাড়ির ছেলেরা সমানে তখনো খাটছে। বালতি বালতি জল আসছে তখনো। কালীপুজোর উৎসব আর যাত্রা উপলক্ষে বাড়িতে অভ্যাগতও ছিল প্রচুর, ওদের আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ছিল ভর্তি। সক্ষম পুরুষদের প্রায় প্রত্যেকেই লেগে গেছে কাজে, দমকলের লোকদের সাহায্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অগ্নি-নির্বাপণের কার্য সমাধা হলো। চলেও গেল এক সময় দমকলের লোকেরা। জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে, যেন পরিত্যক্ত এক যুদ্ধক্ষেত্র! কিছুক্ষণ আগে যেন এখানে তুমুল এক যুদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা আসরের নীচের সব বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু মাথার ওপরের চাঁদোয়া বা আর কাপড়ের সব ঝালর, এসব বাঁচাতে পারিনি। জিনিসপত্র সব আমরা ওদের বৈঠকখানায় তুলে দিয়েছি। উঠানে তখন জল দাঁড়িয়েছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত।

আমরা কোনক্রমে বাড়ির কর্তাদের সম্মুখীন হয়ে বললাম—এবার বিদায় দিন। আমরা যাই।

বস্তুত আমাদের এক এক-জনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমাদের পার্থ-প্রতিজ্ঞার প্রথম রজনীর অভিনয় এতদিনের এতো পরিশ্রম, এতো আশা, সব এভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য কর্তাদের প্রতিক্রিয়া। সবিস্ময়ে বললেন—সে কী? যাত্রা হবে না!

বিস্ময়ের পালা আমাদের! ভদ্রলোক বলছেন কী! সারা উঠানে জল থৈ-থৈ, তার ওপরে ঐ দগ্ধ হোগলা আর বাঁশের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, এখানে যাত্রা হবে কী? কোথায় হবে?

ওঁরা বললেন—যে যাত্রা এমন জমেছিল সে যাত্রা হবে না! থেমে থাকবে মাঝপথে?

আমাদের স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁরা আবার বললেন—আপনারা আমাদের একটি ঘণ্টা সময় দেবেন অনুগ্রহ করে? এই এক ঘণ্টায় আসর আমরা আবার সাজিয়ে দিচ্ছি।

তারপর, চোখ মেলে দেখলাম, বাড়ির ছেলেরা পর্যন্ত বড়োদের সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছে। এক বৃহৎ পরিবার, তার উৎসব উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ছিল ভরাট এবং আশ্চর্য, ঠিক ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা না হোক, দেড় ঘণ্টার মধ্যে সত্যি সত্যি চত্বরটা পরিষ্কার করে ফেললেন ওঁরা। কোথায় গেল অতো জল—কোথায় গেল পোড়া বাঁশ আর হোগলার স্তূপ! দেখতে দেখতে আবার এলো শতরঞ্জি, চাদর, জাজিম, গালিচা। রুপোর হুঁকো গড়গড়া থেকে ডিস পর্যন্ত সব যেখানকার জিনিস সেখানে শোভা পেতে লাগল। শুধু রইল না মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদন আর চাঁদোয়া। রইল শুধু খোলা আকাশ।

ওঁরা বললেন—আরেকবার 'আখড়াই' বাজিয়ে দিন। শুনে ঠিক লোক এসে জুটবে।

বাজতে লাগত আখড়াই। যথারীতি আসরে আবার ঘুরতে লাগল—রুপোর রেকাবিতে তবক-দেওয়া পান আর সিগারেট। এলাচ আর লবঙ্গ।

যেন কিছুই হয় নি, চারিদিকে এমনি একটা ভাব। আবার চিক পড়ল বারান্দায়। আবার বাইরে থেকে দু'দশজন করে আসতে লাগল লোক। আসর দেখতে দেখতে আবার উঠল ভরে।

অর্জুনের জয়দ্রথ-বধের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে যুধিষ্ঠির যেমন প্রথমটায় প্রায় মাথায় হাত দিয়ে

বসেছিলেন, ,আমাদের ততক্ষণে হয়ে গেছে সেই অবস্থা। অভিনয় ত শুরু করতে বলছেন ওঁরা, কিন্তু হবে কীভাবে? ভাঙা আসর কখনো জোড়া লাগে? তাও বলছেন, যতখানি হয়েছিল তার পর থেকে শুরু করতে। এরকম মধ্যপথে শুরু করে অভিনয়টা জমিয়ে তোলা কি সহজ কথা? আর, ঐ যে কাণ্ড হয়ে গেল! সেই·লেলিহান অগ্নিশিখার স্মৃতি কি চট্ করেই মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব?

কী আর করা যায়? এভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে কোন লাভ নাই। বরং উঠে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁধতে হবে। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। দ্বিগুণ উৎসাহ আনতে হবে মনে। অর্জুনের কঠোর প্রতিজ্ঞার মতো আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আসর আমরা জমাবোই।

তা-ই হলো। তৃতীয় অঙ্কের গোড়া থেকে শুরু হলো। অভিমন্যু যুদ্ধে যাত্রা করবে, সুভদ্রার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

আজও আমার স্মৃতিপটে সে-সব দৃশ্য অম্লান হয়ে আছে। ভাঙা আসর যে কেমন করে জোড়া লেগে গেল, সে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারলাম না। প্রতিটি লোক যেন, কী এক দুর্জয় প্রেরণায় জেগে উঠেছে। এমন কি সখির দলের ছেলেরা যারা কোনো জিনিসেরই তেমন গুরুত্ব বোঝে না তাদের মধ্যেও যেন এক অদ্ভুত প্রাণ-সঞ্চার হয়ে-গেছে! যন্ত্রের বাজনা, জুড়িদের গান, অভিনেতাদের অভিনয় সব যেন অকস্মাৎ এক সুরে বাঁধা হয়ে গেল। যেমন আবেগপূর্ণ হতে লাগল জুড়িদের কণ্ঠে গান, তেমনি বাদ্যযন্ত্রের নৈপুণ্যে, ।তেমনি সখিদের নাচের ছন্দ, আর তেমনি প্রাণবন্ত অভিনয়। দর্শক কেন, বাড়ির কর্তারা কেন, আমরা শুধু অবাক হয়ে গেলাম। অভিনয়-নৃত্যগীতের এরকম সঙ্গতি, এরকম প্রাণঢালা অভিনয় মনে হলো সবাই যেন কী এক স্বর্গীয় উন্মাদনায় মত্ত হয়ে গেছে। কথায় বলে, সু-অভিনয় যেমন সংক্রামক, কু-অভিনয় তেমনি সংক্রামক। আসর এমনি জিনিস, কেউ বলতে পারে না, কোনদিন কার ঠিক কেমনটি হবে। কু অভিনয় সু-অভিনেতার অভিনয় পর্যন্ত খারাপ করে দেয়। সেদিন প্রাণভরে অনুভব করেছিলাম এর বিপরীত ফলটা। সু-অভিনয় যে কতখানি সংক্রামক হতে পারে, তা সেদিন প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে আর আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। এর পরে বৎসরাধিককাল ধরে—বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে—বিশ বাইশ বার অভিনয় করেছিলাম আমরা এই 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা' কিন্তু প্রথম রাত্রিতে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেরকম আর কখনো হতে হয় নি। এও যেমন সত্যি, তেমনি সম্মিলিত সু-অভিনয়ের ওপরেও যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সেদিন অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলাম, তা-ও আর পাইনি।

তারপর, ক্লাবে নিয়মিত মহলা চলে। যাই-ও আমরা নিয়মিত। এর মধ্যে থিয়েটার দেখাও হ'তো সুযোগ-সুবিধা মতো। রসা রোডের ওপরে, আজ যেখানে 'ভারতী' সিনেমা, ঐ বরাবর বাড়িঘর দোর সব ভেঙে দিয়েছে, রাস্তাটা চওড়া হয়ে গেছে, অনেকখানি জমি ফাঁকা প'ড়ে আছে, সেইখানে, কিছুটা নাবাল জমিতে—দু'তিনজন মিলে উদ্যোগী হয়ে তখন একটি থিয়েটার খুলেছিল, তার নাম দিয়েছিল, "শান্তি থিয়েটার"। এক মানুষ দেড়-মানুষ সমান ছোট বেড়ার

দেওয়াল, তার ওপরে দরমা দেওয়া, মাথার ওপরে চালটা খোলা দিয়ে ছাওয়া। ভিতরে মাটি ফেলে ফেলে উঁচু করেছে লোকদের বসবার জন্য। পিছনে গ্যালারী, সামনে চেয়ার। আয়তনে ছোট্ট হলেও শান্তি থিয়েটারের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ছিল না। চেয়ারের মাথায়-মাথায় বাঁশ বেঁধে টিকিট অনুযায়ী বসবার জায়গার তারতম্য করা ছিল। দু' টাকার সীট সামনে, এক টাকার সীট পিছনে। তারও পিছনে গ্যালারী। আর ছিল বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা। এই মঞ্চে উত্তর কলকাতা থেকে প্রাইভেট থিয়েটারের কোনো কোনো দল কখনো-সখনো অভিনয় করে যেতো, আর অভিনয় করত "আশা থিয়েটার" বলে অপেক্ষাকৃত নূতন এক দল, এছাড়া, পুরাতন "ভবানী থিয়েটার"। ভবানীপুরের বহুদিনের দল এই ভবানী থিয়েটার। এরা সবাই-ই অভিনয় করতেন অভিনেত্রী নিয়ে। অভিনেত্রীরা সবাই কৃতবিদ্যও ছিল, বলা চলে। ভবানী থিয়েটারের নাচ আর গান অপূর্ব হতো। উত্তর কলকাতার প্রাইভেট থিয়েটারের থেকে নাচ আর গানে এঁরা যথেষ্ট অগ্রবর্তী ছিলেন। এঁরা ধরতেনও ঐসব গীত ও নৃত্যপ্রধান বই। অপেরা-ধরনের থিয়েটার বলতে পারা যায়। এঁদের নৃত্যশিক্ষক ছিলেন অতুলবাবু বলে এক ভদ্রলোক। মুখে মুখে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল "অতুল মাস্টার" হিসাবে। উত্তর কলকাতাতে বাড়ি ছিল এঁর, কিন্তু চাকরি করতে আসতেন রসা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে। সকালের দিকে আসতেন চাকরিতে, তারপরে বিকেলে ছুটির পর যেতেন ওঁদের ক্লাবে, চলত নৃত্য ও গীতের অনুশীলন। সন্ধ্যার সময়ে মেয়েদের ছুটি হয়ে যেতো। উনিও তাদের নাচ-টাচ শিখিয়ে তারপরে ফিরতেন বাড়ি। নিদারুণ পরিশ্রমী ব'লে নামডাক ছিল অতুল মাস্টারের, মেয়েরাও ছিল ওঁর খুব বাধ্য। এঁদের অপেরা ধরনের নৃত্যগীতবহুল প্লেগুলি এতো ভালো হতো যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছাড়া তেমনটি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যেতো না। শান্তি থিয়েটারের আগে "আশা থিয়েটার"ও অভিনয় করেছে। আমরা এইসব অভিনয় কিছু কিছু দেখেছি। অধিকাংই চেনাশোনা হয়ে গিয়েছিল অভিনয়ের দৌলতে, দেখতে পেলেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতো! সবচেয়ে সুবিধা হয়েছিল মেয়েদের থিয়েটার দেখবার জন্য আর গাড়ি ক'রে সেই অতদূর উত্তর কলকাতায় যেতে হচ্ছে না, একেবারে বাড়ির কাছে থিয়েটার। যারা দূরে যাবার সুযোগ-সুবিধা তেমন পেতেন না, তাঁরাও এসে ভিড় করতে লাগলেন এই থিয়েটারে। আমরা শান্তি থিয়েটারের মঞ্চে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক "কালপরিণয়" দেখেছি, "চন্দ্রগুপ্ত" দেখেছি, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "শ্রীকৃষ্ণ"ও দেখেছি! ভবানী থিয়েটারের অন্তত একটি অভিনেত্রী পরবর্তীকালে উন্নতির সোপানে আরোহণ ক'রেছিল, এর নাম "রাইমণি"। উত্তরকালে যখন আমি "মিনার্ভা"র ম্যানেজার তখন এঁকে দেখেছিলাম, "মিনার্ভা"র অভিনেতৃমণ্ডলে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

এই থিয়েটার বেশ জাঁকিয়ে বসলেও বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অস্থায়িভাবেই ওঁরা অবশ্য ছিলেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট্ ওঁদের নোটিশ দিয়ে উঠিয়ে দিলো। ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে ঐ অঞ্চল, জমিও বিক্রি হচ্ছে। অতএব উঠে গেল মঞ্চ।

এছাড়া, সার্কাসের আমদানীও হলো ভবানীপুরে। এইসব ভাঙা-গড়ার ফলে, যে-সব ফাঁকা জমি পড়ে থাকত, তার ওপরে ম্যাজিক, সার্কাস এসবও এসে তাঁবু ফেলত। উত্তরদিকে ·রসা ইঞ্জিনীয়ারিং, তারও পশ্চিমদিকে, রাস্তার ধারে বেশ খানিকটা জমি খালি পড়ে ছিল। শীতকালে সেইখানে আসত সার্কাস। মহারাষ্ট্রের আগাসী সার্কাস ত প্রতিবার আসবেই। তা এইসব নানান আমোদ-প্রমোদ আর জাঁকজমকের পাশে ঐ শান্তি থিয়েটার যে খানিকটা জমিয়ে বসতে পেরেছিল, সে কম গৌরবের কথা নয়। শুনেছি খরচ কম ছিল থিয়েটারের। যে-সব দল এসে অভিনয় করতো, তাদের মধ্যে এমন দলও ছিল, যাদের অভিনেত্রী উৎসাহের প্রাবল্যবশত টাকা পর্যন্ত নিতো না। সব মিলিয়ে কর্তৃপক্ষের লাভও ছিল না, আবার লোকসানও ছিল না। এঁরা যদি আর কিছুদিন থাকতে পারতো, তাহলে হয়ত স্থায়িভাবেই দাঁড়িয়ে যেতেন। হয়ত একদিন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠতেন ওঁরা। হয়ত একদিন এটা এক লাভজনক প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হতো, কে বলতে পারে।

যাই হোক, ক্রমশ জগদ্ধাত্রী পুজো আসছে এগিয়ে। তাই আমাদের ক্লাবেও চলছে জোর মহলা। কারণ, পুজোয় এক জায়গায় যাত্রা হবে স্থির হয়েছে। সম্ভবত সেটা পুজোর ঠিক আগের দিন, সবাই এসে জম্‌ছে একে-একে মহলা দেবার উদ্দেশ্যে, হঠাৎ শুনলাম একজনের কাছ থেকে একটা খবর,—ওহে শুনেছ, যুদ্ধ থেমে গেছে !

যুদ্ধ থেমে গেছে !

—হ্যাঁ, যুদ্ধ-বিরতির ঘোষণা হয়ে গেছে।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে থেমে গেল যুদ্ধ। অবশ্য যুদ্ধের বেগ ১৯১৮-এর গোড়া থেকেই ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসছে। নানা দিক থেকেই উঠছে তখন শান্তির বাণী। পূর্ণবিরতির কিছু আগে থাকতেই একে একে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে চুক্তি হচ্ছিল মিত্রশক্তির, অবশেষে 'আর্মিস্টিস্' স্বাক্ষরিত হলো ১১ই নভেম্বর। ইতিমধ্যে, এই যে চার বছরের যুদ্ধ, এর মধ্যে তুমুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছে জার্মানী, অস্ট্রিয়া আর তুর্কী। একা জার্মানী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কাঁপিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে, এমনও সময় এসেছে যে, মিত্রশক্তির পক্ষে আর বুঝি সে প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয়। আমেরিকা তখন ছিল নিরপেক্ষ। মিত্রপক্ষ তাকে যুদ্ধে নামাবার প্রচুর চেষ্টা তখন করেছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট উইলসন কিছুতেই টলেন নি। যুদ্ধে আমেরিকার ক্ষতি হতে পারে, এটাই কারণ ছিল না। কারণ ছিল এই যে, আমেরিকা যদি এই বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে, তাহলে, অগ্নিতে ইন্ধনের কাজ হবে, সমরানল আরও জ্বলে উঠবে দাউ-দাউ করে। জার্মানী অনেক সময় করছিল রীতিমত অন্যায় যুদ্ধ, যেমন ডুবোজাহাজ দিয়ে বাণিজ্যতরী ডুবিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। প্রেসিডেন্ট উইলসন তাদের মাঝে মাঝে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, বলছিলেন—না-না, এটা অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়, এ তোমরা কখনই করতে পারবে না।

ওদিকে, আমেরিকার মধ্যে তখন ছুটি দল। একদল চাইছে, মিত্রশক্তিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হোক। কিন্তু আরেক দল, তার মধ্যে জার্মানভাষাভাষী বহু অ্যামেরিকান ছিল, তাঁরা মিত্রপক্ষকে সমর্থন করতে চাইছে না। আমেরিকার মালবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য নিরাপত্তা রক্ষায় আমেরিকা যুদ্ধের হুম্‌কি পর্যন্ত দিয়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তার ওপর ঘটেছিল আর এক অভাবনীয় পরিস্থিতি। ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে প্যাসেঞ্জার-জাহাজ "লুসিটানিয়া"কে ডুবিয়ে দিলো জার্মানী ডুবোজাহাজ দিয়ে। জার্মানীর এই বর্বর আচরণ কেউ সমর্থন করতে পারেন না। আমেরিকার জনমতও সঙ্গে সঙ্গে গেল মিত্রশক্তির পক্ষে। ১৯১৭-এর গোড়ার দিকে সাবমেরিন-যুদ্ধ যখন প্রকট হয়ে উঠল, তখন প্রেসিডেণ্ট উইলসন মধ্যবর্তী হয়ে এই কথাই বলেছিলেন, সাবধান-বাণী উচ্চারণ না করে কোনো জাহাজ তোমরা ডুবিও না।

অনেক কথা-চালাচালির পর স্থির হয়েছিল, উইলসন শান্তির দূত হয়ে কাজ করবেন, যথার্থ নিরপেক্ষ শক্তির প্রতিভূ হয়ে বিরাজ করবেন তিনি, সমস্ত বিবাদের মধ্যে তিনি থাকবেন মধ্যবর্তী ব্যক্তি।

বিশ্বরাজনীতিতে যখন এইসব চলেছে, তখন আমেরিকায় মিত্রশক্তির পক্ষে যথাযোগ্য প্রচারকার্য পরিচালনা করার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল একজন অভিনেতার। ইনি ইংরেজ। সার হেনরী আরভিং-এর মৃত্যুর পর বিলাতী রঙ্গমঞ্চের জগতে ইনিই তখন নেতৃস্থানীয়। এর নাম—স্যর হার্বার্ট বিরভোম ট্রি। আমেরিকায় এঁর তখন খুব নামডাক। দেশের জন্য—শান্তির জন্য—ইনি অভিনয় ছেড়ে গেলেন আমেরিকা। কিন্তু, কিছুদিন পরে তিনি প্রয়োজন অনুভব করলেন দেশে ফিরে আসার, তখন আর আসতে পারেন না। জাহাজ কই আসবার? বহু মালবাহী আর যাত্রিবাহী জাহাজ দিচ্ছে ডুবিয়ে জার্মানীর মারাত্মক ডুবোজাহাজগুলো। পরে, তাঁর জীবনীতে পড়েছি কোনক্রমে তিনি এসে পৌঁছলেন পর্তুগালের দক্ষিণে, ১৯১৭ সালের কথা সেটা। এখান থেকে. ধীরে ধীরে, একটু-একটু করে দেশের দিকে ফিরে যেতে লাগলেন তিনি। যখন তিনি দেশে পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য রুগ্ন এক ব্যক্তি। এর কিছুকাল পরে তিনি মারাও গেলেন। বিলাতের বিখ্যাত 'হিজ ম্যাজিস্টেস্ থিয়েটার'-এর মালিক ছিলেন এই বিরভোম ট্রি।

'লুসিটানিয়া' জাহাজের নিরীহ যাত্রিদল—কতো শিশু নারী আর বৃদ্ধ যখন একান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করল, তখন আমেরিকা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেনি। সে যথেষ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিল। তাতে যে কাজ হয়নি, এমন নয়। প্রথম-প্রথম জার্মানী আমেরিকার হুমকি শুনত। দু'একবার খেসারতও দিয়েছে মিত্রশক্তিকে। কিন্তু, তারপরে, সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে ধরল জার্মানী যাতে করে বৃটেনে কোনো খাদ্যদ্রব্য না যেতে পারে, সেই অবস্থায় পৌঁছে জার্মানী আর কোনো কথা শুনত না আমেরিকার। কোনো পত্রেরই

কোনো উত্তর দিতো না, গ্রাহ্যই করতো না। ওদিকে বৃটেন যদি ঐভাবে অবরুদ্ধ হয়ে মাসখানেক কি মাস-দুই থাকে, তাহলে সত্যিই সে শুকিয়ে মরবে। জার্মানী সেটাই তা চায়। তার দুর্ধর্ষ ডুবোজাহাজগুলি দিয়ে বেপরোয়াভাবে সব জাহাজই ডুবিয়ে দিতে শুরু করেছে, কারুর কোনো কথায় সে কর্ণপাত করছে না।

অতএব, পুনঃ পুনঃ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেও যখন কোনো ফল হলো না, তখন, সেটা ১৯১৭-র শেষের দিক, রুদ্রমূর্তি ধারণ করল আমেরিকা। সে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

পরবর্তী অধ্যায়ে, শোনা গেল, দলে দলে আমেরিকান সৈন্য এসে উপস্থিত হচ্ছে ফ্রান্সের উপকূলে। বিরাট এই সৈন্যদলটির সর্বময় কর্তা হয়ে এলেন জেনারেল পারশিং। এই জেনারেল পারশিং সম্বন্ধে শুনতাম আমরা বহু কাহিনী। কাগজে বেরুতো। মহলার মাঝে মাঝে এসব যুদ্ধের গল্প আমাদের মধ্যে হ'তো বই কী। কাগজে পড়তাম, দীর্ঘপথ পার হতে গিয়ে সৈন্যরা কষ্ট পাচ্ছে, কেউ বা হয়ত চলতে না পেরে পথে পড়ে আছে, জেনারেল পারশিং হয়ত তখন মোটরে ক'রে যাচ্ছিলেন ঐ পথে, দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে নিজের গাড়িতে তুলে নিতেন তাদের। দরদী ছিলেন। অবশ্য এটা প্রচারও হতে পারে, আবার সত্যও হতে পারে।

যাই হোক, এইভাবে চলতে চলতে এক সময়—অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি অবশেষে স্বাক্ষরিত হলো। এ-ও এক মজার ঘটনা। এই ঐতিহাসিক স্বাক্ষর-কার্যটি ঘটল কোনো রাজপ্রাসাদে নয়, কোনো জাঁকজমকের মধ্যে নয়, ছোট একটি ট্রেনের কামরায়। ফরাসী সেনাপতি মার্শাল ফোক-এর একটি স্পেশ্যাল ট্রেন ছিল, সেটি রাখা হলো একটা জঙ্গলের ভিতর—নির্জনে—ঘটনার দু' একদিন আগে। যথাসময়ে এলো জার্মান ডেলিগেট্‌দের ট্রেন সেদিন ভোরবেলায়। এসে লাগল ঐ ট্রেনটির পাশে। তারপরে মার্শাল ফোকের কামরায় উঠে এলেন তাঁরা। চলল আলোচনা কিছুক্ষণ ধ'রে। চলল তর্কাতর্কি। সই হলো ঐদিন বেলা এগারোটায়—মর্শাল ফোক-এর গাড়ির নিজস্ব সেলুনে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফে খবর গেল পৃথিবীর সব বড়ো-বড়ো শহরে আর রাজধানীতে। হৈ-হৈ ব্যাপার। ছবি দেখছি সে সবের। লণ্ডনের লোক স্বভাবতই শান্ত স্বভাবের—হৈ-চৈ-এর পক্ষপাতী নয়। সেই লণ্ডনের মতো শহরের রাস্তার যে দৃশ্যের ছবি দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, লোকগুলি বুঝি হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে গেছে! সারা বিশ্বের বিভিন্ন সব রাজধানীতে শান্তির দূত আর নিদর্শন হিসাবে কতো যে শ্বেতকপোত উড়েছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই।

খবর এলো কলকাতাতেও। সন্ধ্যের সময়। কিন্তু এতো দেরিতে এলো যে, সেদিন আর বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান হলো না। সকাল থেকে হগ্ মার্কেটে নিশান কেনার ধুম পড়ে গেল। সাহেব-ফিরিঙ্গী-হিন্দু-মুসলমান, যে পারছে সেই কিনছে সব 'ইউনিয়ন জ্যাক'। ছোট-বড়ো নানান্ আকারের, কেউ কেউ কোটে পিন দিয়ে আটকাবার মতো ক্ষুদে-ক্ষুদে নিশানও কিনেছিলেন। যুদ্ধের খবরের টেলিগ্রাম অবশ্য বেরিয়েছিল সেইদিনই সন্ধ্যের সময়। ছুটি ছিল পরের দিন। যথাযোগ্য প্রস্তুতির

অভাবে তখন উৎসবটি আর হতে পারেনি। উৎসব হয়েছিল পরে। ২৯শে ছিল আলো ও বাজীর মহলা, আর ৩০শে নভেম্বর ছিল প্রকৃত উৎসবের ঘটা। সমস্ত শহর উঠলো সজ্জিত আলোক-মালায় ঝলমল করে। সরকারী অফিসগুলি থেকে শুরু করে বাঙালীটোলার প্রতিটি বাড়ি পর্যন্ত আলোয়-আলোয় ভরে গেছে সে সন্ধ্যায়। সাজানো হলো আমাদের বাড়িও। বাড়িতে ছেলের মধ্যে আমি একা বললেই হয়, পঞ্চু তখন ছোট। তাই আমার মামাতো ভাই এলো আলো সাজাতে। ময়দানে প্রচুর বাজী ছোঁড়া হলো।

পরদিনও তাই। আলো আর আলো চারিদিকে। বাজীর ধুম দেখতে আমরাও বেরিয়ে পড়েছিলাম। রাস্তায়-রাস্তায় গাড়িঘোড়ার অসম্ভব ভিড়। পার্ক স্ট্রী ট ঘেঁষে "হল এণ্ড অ্যাণ্ডারসন"-এর বাড়ির বিপরীত দিককার মাঠে বাজী পোড়ানো হচ্ছিল। হুস্ করে বাজী উঠছে আকাশে, আর সেটা ফেটে গিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে কখনো 'রাজারাণীর ছবি' কখনো বা 'গড্ সেভ্ দি কিং' লেখা!

এই যুদ্ধবিরতিকে কেন্দ্র করে, কাগজে-কাগজে যুদ্ধের কতো বিবরণই না বেরিয়েছিল। আর বেরিয়েছিল—ছবি। যুদ্ধের কতো ছবিই না দেখেছি সেদিন! তার মধ্যে এক-একটি মানুষের ছবি মনে এমন গেঁথে গেছে যে, মনে হতো, ঐরকম 'পোজ' কিংবা ঐরকম 'মুখের ভাব' আয়ত্ত করে রাখি, কখন কোন্ বইয়ের কোনো চরিত্রের অভিনয়ে যে কাজে লেগে যাবে, তার ঠিক কী।

একটি বিলিতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত একটি ছবির কথা কোনোদিনও ভুলতে পারি নি। যুদ্ধের সময়, যখন অস্ট্রিয়ানরা পিছু হটে যাচ্ছে, সেই সময়কার ছবি। একটা পার্বত্য সঙ্কটের কাছে ঘোড়া বদল হচ্ছে। তার কাছে একটা পাথরের ওপর লাঠিতে ছুটি হাত দিয়ে মাথাটি নীচু করে বসে আছেন বৃদ্ধ অস্ট্রিয়ান সম্রাট ফ্র্যান্সিস জোসেফ। তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে এক অফিসার। কিন্তু সম্রাটের মুখে যে নিদারুণ বিষাদের ভাব আঁকা ছিল, তা দেখলে কেউ ভুলতে পারবেন না। একেবারে হতাশার প্রতিমূর্তি। মনে হলো, এ ভঙ্গি গ্রহণ করার মতো। অভিনয় করি, পোজ দিতে হয়। এটা অভ্যাস করবার মতো জিনিস। বই থেকে ছবিটা কেটে নিতে পারলাম না, কিন্তু মনের মধ্যে তা যেন গাঁথা হয়ে গেল।

আরও কতো ছবি। একে-একে জার্মান ফ্লিট আত্মসমর্পণ করতে লাগল দিন স্থির ক'রে, তারও ছবি বেরুতে লাগল! যুদ্ধ চলবার প্রাক্কালে বেলজিয়মের অনেকটা দখল করে নিয়েছিলেন মিত্রশক্তি। অবশ্য সবটা পারেন নি। জার্মানীতে ত ঢুকতেই পারেন নি। এইবার দখল করতে শুরু করলেন। 'পজেসন আর্মি' এগিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ। বড়ো-বড়ো গথিক শৈলীর রাজপ্রাসাদ সব গুঁড়িয়ে আছে, কোথাও দাঁড়িয়ে আছে একটা থাম, কোথাও একক একটি ভাঙা প্রাচীর। আরও আশ্চর্য ছবি দেখেছি। জঙ্গল নেই। গুঁড়ি রয়েছে বনস্পতির, কিন্তু ডালপালা কিছু নেই, নেই গাছের পাতা। সারি সারি সব দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালের মতো, জনহীন প্রান্তরের ওপরে। কোথাও ট্রেঞ্চ কেটেছে, সেখানে গোলা পড়ে, প্রচণ্ড খাদের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষই শুধু মরেছে তা নয়,

ঘোড়া-উট-খচ্চরও প্রচুর মারা পড়েছে। বীভৎস সে-সব ছবি! যেন কোনো উন্মত্ত দানব মুহূর্তে সব-কিছুকে এলোমেলো করে দিয়ে চলে গেছে!

প্রেসিডেন্ট উইলসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'লীগ অব নেশন্‌স্' গঠিত হলো। চিরকালের যুদ্ধ-বিরতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো এই বিধান। বিবাদ-বিসম্বাদ সমস্তই মেটানো হবে আলাপ-আলোচনার দ্বারা। ভবিষ্যতে যুদ্ধ আর হবে না। যুদ্ধ হবে না, ভালো কথা। কিন্তু, আমাদের দেশের ভিতরের অবস্থা তখন দাঁড়ালো কেমন? এতে আমাদের কী হলো, লাভ, না, ক্ষতি? দেখা গেল, ব্যাপকভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। তখন বালাম চালের দর ছিল আড়াই টাকা মণ, পাটনাই বা দিশী চাল পৌণে তিন বা তিন টাকা, বড়োজোর, দাদখানি চাল পাঁচ টাকা মণ। দেখতে-দেখতে এইসব চালের দাম বেড়ে গেল। আড়াই টাকার চাল দাঁড়ালো গিয়ে পাঁচ টাকায়। দৈনন্দিন সংসার-নির্বাহ তখনো করি না, কিন্তু সংসারের গল্প শুনি বৈঠকখানায় বসে। বাবার মেসোমশাই ছিলেন হরিচরণ বসু মশায়। জমিদার। এই হরিচরণবাবুর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল—গোবর্ধনবাবু—সবাই ডাকত 'ছোটবাবু' বলে! এই ছোটবাবু ছিলেন উকিল—বাবার বিশেষ বন্ধু। ছোট থেকেই দেখে আসছি, শনিবার হলে তিনি আসবেনই বাড়িতে, বাবার সঙ্গে গল্প করতে। ছোটবেলায়, তিনি বসে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন, তাঁর পাশে বসে গল্প শুনতে শুনতে কখন ঐখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম কে জানে, তিনি গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বড়ো হয়েও অভ্যাসটা একেবারে যায় নি। পাশে বসে আর ঘুমুই না, তবে গল্প শুনি। বেশ মনে আছে, বাবার একটি কথা। ছোটবাবুকে বাবা বলছেন—চালের দাম পাঁচ টাকা হলো। কী অসম্ভব কথা!

তারপরে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওদের সময়ে হয়ত চালের দাম দশ টাকা হয়ে যাবে। ওরা আর সংসার করতে পারবে না। চালের পাঁচ টাকা দর হওয়াতেই ওঁদের দুশ্চিন্তা, অথচ, দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে লোকে পঞ্চাশ টাকা মণ দর দিয়েও চাল কিনেছে। বর্তমানেও ছাব্বিশ-সাতাশ টাকার কমে চাল নেই বললেই হয়।

কিন্তু, যা বলছিলাম। ঐ অনুপাতে সব জিনিসেরই দাম বেড়ে গেল, কাপড় পর্যন্ত। লাভ করলে ব্যবসায়ীরা, বিশেষ ক'রে লৌহ-ব্যবসায়ীরা। আর-একটা ব্যবসা তখন প্রচণ্ডভাবে জেঁকে উঠেছিল, সে হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার সরবরাহ করার ব্যবসা। এইসব সরবরাহের ব্যাপার নিয়ে গভর্নমেন্ট একটি বোর্ড তৈরি করেছিলেন, তার নাম, মিউনিশন বোর্ড। এই বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ঠিকাদাররাই একমাত্র ঐ ব্যবসা করবার অধিকারী। এই ব্যবসায়ের উৎসাহে অনেক নাম-করা সব বড়ো-বড়ো ঠিকাদার কোম্পানি আসল মালের সঙ্গে বহু বাজে জিনিসও সরবরাহ করেছে! যুদ্ধের সময় বলে বোর্ড টুঁ শব্দটিও করেনি, কারণ, গ্রেপ্তার করলে বা অন্য কিছু করলে, যদি মাল-সরবরাহে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়? তাই যুদ্ধের পর, বোর্ড একে-একে মামলা দায়ের করতে লাগল। মাল খারাপ ইত্যাদি নানান ফাঁকির অভিযোগ ছিল। এই মামলার ব্যাপারে প্রচুর

টাকা খরচ হয়ে গেল, অভিযুক্ত ব্যবসায়ীদের। খরচে-খরচে বহু কোম্পানি দেউলে হয়ে গেল। ছোট-খাট কোম্পানি শুধু নয়, বড়ো-বড়ো নাম-করা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরও ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে গেল।

যুদ্ধ বিষয়ে আর কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ ক্ষতি আমাদের হয়নি, কারণ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছিলাম আমরা বহুদূরে। শুধু একটি ভয় কলকাতার বুকে সেদিন প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। সে-কথা মনে করলে, সে আতঙ্কের দিনগুলির কথা স্মরণ করলে, আজও বুঝি বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে! সেটি হচ্ছে—জার্মান যুদ্ধযাহাজ "এমডেন"-এর দুঃসাহসিক কার্যাবলী। যুদ্ধের প্রথম বছরেই—সেপ্টেম্বরে—এমডেন এসে উপস্থিত হলো একেবারে আমাদের দরজার গোড়ায়। 'ফার ইস্ট'-এর ফ্লিট-এ এটি ছিল, যুদ্ধ-বিপর্যয়ে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে, পলায়নের মুখে, এটি ভারত মহাসাগর হয়ে একেবারে 'বঙ্গোপসাগরে' এসে হাজির! এসেই সব মালবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দিতে শুরু করল। মাদ্রাজের বন্দরে উপস্থিত হয়ে শহরের মধ্যে গোলাবর্ষণ পর্যন্ত করল। মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে—স্ট্রাণ্ডে—বার্মাশেলের ছিল পেট্রোল রাখবার বিপুলকায় ট্যাঙ্ক—'এমডেন'-এর গোলা তার ওপরে পড়ায় বিরাট এবং ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হলো। মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ থেকে উপকূল রক্ষীরা কামান ছোড়া শুরু করতেই 'এমডেন' অবশ্য পালিয়েছিল। কতো-কী কাহিনী তখন শুনেছি এই এমডেনের। পেনাং-এ গিয়ে করলে কী, ছদ্মবেশ ধারণ করলে। রঙ্‌টাকে পালটে দিলে। তিনটে ফানেলের জায়গায় ক্যানভাস দিয়ে আরেকটি নকল ফানেল তৈরি করলে, দেখাতে লাগল যেন চারটে ফানেল। তারপরে, মাস্তুলে উড়িয়ে দিলে নিরপেক্ষ শক্তির পতাকা। এইভাবে, একেবারে সোজা ঢুকে গেল বন্দরে। বন্দরে ঢুকে রাশিয়ান একটা ক্রুজার নোঙর করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দিলে একেবারে টরপেডো করে। তখন বুঝতে পারল সবাই। উঠল হৈ-হৈ করে। আর হৈ-হৈ! এমডেন অমনি পালিয়ে এলো দ্রুতগতিতে। পালাবার সময়—বন্দরের মুখে একটা নোঙর-করা ফরাসী টর্পেডো-বোট ছিল, সেটাকেও ডুবিয়ে দিয়ে গেল। তারপরে, ছুটে বেরিয়ে গেল সটান সমুদ্রের দিকে।

এইসব অত্যাচার চলতে লাগল কয়েকটা মাস ধরে। ইংলণ্ডের তখন যা অবস্থা সেখান থেকে কোনো যুদ্ধজাহাজ পাঠানো সম্ভব নয়। ভারতের ত নেই-ই। ভার পড়ল অস্ট্রেলিয়ান নেভির ওপরে এমডেনকে খুঁজে বার করবার। এছাড়া ঐ অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় আর দু'চারটে জাহাজ যা ছিল, তারাও শুরু করল খোঁজা, এমন কি দু' তিনখানা জাপানী জাহাজও লেগে গেল কাজে। কিন্তু, 'এরই মধ্যে এমডেন, এমনভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল যে, তাকে ধরে কার সাধ্য? সাহসও তার কম নয়। এর মধ্যে সে মোট সতেরখানা জাহাজ দিয়েছে ডুবিয়ে। কম কথা নয়!

এমডেনের ক্যাপ্টেন কিন্তু ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা। শোনা যেতো, জাহাজ ডুবোতে গিয়ে জাহাজের একটি প্রাণীকেও তিনি বধ করতেন না, বা তাদের প্রাণ নষ্ট হতে দিতেন না। জাহাজ দেখলেই তাকে অমনি দাঁড়িয়ে যেতে বলতেন। তারপরে, নিজের জাহাজটা তার কাছে নিয়ে গিয়ে,

বোট নামিয়ে দিয়ে, ঐ জাহাজের সব মানুষগুলিকে তুলে আনতেন নিজের জাহাজে। তার পরে, টর্পেডো করতেন সেই জাহাজে। মালসুদ্ধ জাহাজ ডুবে যেতো, কিন্তু রক্ষা পেতো মানুষগুলি। এরপরে পরবর্তী যে জাহাজটি পেতেন, সেটাকে আর ডুবাতেন না, সেটার মাল সব ডুবিয়ে দিয়ে, পূর্ববর্তী জাহাজের লোকগুলিকে উঠিয়ে দিতেন ঐ নতুন জাহাজে, তারপরে সেই জাহাজটাকে লোকজন সুদ্ধ পাঠিয়ে দিতেন মাদ্রাজে বা কলকাতায়।

কলকাতায় লোকের তখন আতঙ্ক এই ছিল যে, তারা এক সময় শুনবে, "এমডেন" হুগলী নদীর মোহানায়—সাগরদ্বীপের কাছাকাছি ওত পেতে বসে আছে। জাহাজ বেরুবার উপায় নেই, বেরুলেই টরপেডো খেয়ে ডুবে যাবার ভয়। আবার তার চেয়েও ভয়, যদি পেনাঙের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে! যদি এমডেন এসে পড়ে—নদীপথে—একেবারে কলকাতায়! এসে যদি শহরের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে! বাধা দেবে কে? বাধা দেবার মতো কী আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কলকাতায়? কিছুই নেই।

এক রক্ষা, হুগলী নদী নিজে। অভিজ্ঞ পাইলট না হলে ঐ নদী বেয়ে ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এর কোথায় চড়া, কোথায় গভীর জল, তা হদিস জানে একমাত্র এখানকার পাইলট্‌রাই। অবশ্য, এমডেন কৌশলে এখানকার কোন পাইলট্‌কে চুরি করে নিয়ে যেতে পারত! জাহাজ আসবার প্রতীক্ষায় যে-সব পাইলট্‌ গিয়ে মোহানার কাছে থাকতো, অতর্কিতে সে তাদের একজনকে ধরলেই বা প্রবল বাধাটা আসছে কোথা থেকে? অবশ্য অতটা সাহস 'এমডেন' পায়নি। পাইলট্‌ চুরি না করলেও 'এমডেন' এমন অবস্থার সৃষ্টি তখন করেছিল যে, জাহাজ আর ভয়ে বেরুতে পারে না মাল নিয়ে! সমগ্র কলকাতা বন্দরটা জাহাজে জাহাজে একেবারে ভর্তি হয়ে গেল।

যাই হোক এই সময়টা কলকাতাবাসীর বড়ো উদ্বেগে কেটেছে। দিনের পর দিন কত কী যে খবর আসত। একদিন শোনা গেল, এমডেন চলে গেছে দূরে ভারত মহাসাগরের দিকে। যেন খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তখন কলকাতা!

ভারত মহাসাগরে আছে 'কোকোস' ব'লে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। দ্বীপে 'ওয়ারলেশ স্টেশন' ছিল। এমডেন গিয়ে হাজির হলো ঐ কোকোস দ্বীপের কাছে। ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে বোটে ক'রে লোক পাঠালেন ঐ 'ওয়ারলেশ স্টেশন'টিকে ধ্বংস করে দিতে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হবার আগে ঐ ওয়ারলেশ স্টেশনটি একটিমাত্র খবর পাঠাতে পেরেছিল, "অপরিচিত একটি জাহাজ অদূরে দেখা গেছে।"

কোকোস দ্বীপে স্টেশনটি ধ্বংস করেই এমডেনের সেই মানুষগুলির কাজ শেষ হয়নি, তারা সেখানে তখন খাদ্য আর জল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইত্যবসরে বেতারে ঐ সংবাদ-সঙ্কেত পেয়ে অস্ট্রেলিয়ান জাহাজ "সিডনি" এসে গেল তাড়াতাড়ি। 'সিডনি' তখন ঐ অঞ্চলেই ছিল এমডেনের খোঁজে। দিগন্তরেখায় সিডনিকে দেখেই 'এমডেন' বুঝতে পারল যে, বিপদ আসন্ন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জাহাজের পক্ষে যুদ্ধ করা মারাত্মক, তাই সে 'সিডনি'র সঙ্গে "রানিং ফাইট"-এর উদ্যোগ করলে। ঘুরে ঘুরে, ছুটে ছুটে, একে অপরকে আঘাত করব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাব না। দ্বীপে বাকী লোকগুলিকে

অগত্যা ফেলে রেখেই 'এমডেন' নোঙর তুললে। 'রানিং ফাইট' কিছুক্ষণ চালাতে পারলে কী ফলাফল হতো বলা যায় না, হঠাৎ এক সময় চলতে-চলতে 'প্রবাল বাঁধের চড়ায়' বা 'কোরাল রীফ'-এ আটকে গেল "এমডেন"। প্রতিপক্ষের গোলা খেয়ে কাৎও হয়ে পড়ল। ঘটল পরাজয়। "সিডনি" থেকে বোট নামিয়ে দিয়ে এদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হলো, এমন কি, ক্যাপ্টেনকেও। যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে, বড় অফিসারকে যখন বন্দী করা হবে, তখন প্রথমেই খুলে নেওয়া হবে তার তরোয়াল। কিন্তু 'এমডেন'-এর ক্যাপ্টেন এমনি বীরত্ব আর মানুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর তরোয়াল কেড়ে নেওয়া হয়নি।

এইভাবে শেষ হলো "এমডেন"। কিন্তু এর যে লোকগুলি তীরে নেমেছিল, তাদের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অবিস্মরণীয় এক রোমহর্ষক কাহিনী। যে-সব কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী পড়ে আমরা মুগ্ধ হই, এই সত্যি ঘটনাটি তার থেকেও রুদ্ধনিশ্বাসী ভয়াবহ এক কাহিনী। এটা মিত্রশক্তি-পক্ষীয় কাহিনী হলে 'ফিল্ম' হতো সন্দেহ নেই। হয়ত জার্মানীতে পরে হয়ে থাকবে, আমরা জানি না। 'এমডেন' সম্পর্কে অনেক বই বার হলেও এ কাহিনী নিয়ে বহুলপ্রচারিত কোনো ফিল্ম হয়নি। কয়েকটি মানুষ মাত্র গোটাকয়েক বোট সম্বল করে ভেসে পড়েছিল সেই মহাসমুদ্রে। কোথায় যাবে, কতদূরে যাবে কী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে কিছুই জানা নেই। তবু শুরু হয়েছিল সেই দুঃসাহসিক জলপথ-যাত্রা। তারপরে একদিন সঞ্চিত সব খাদ্য ফুরিয়ে গেল, পানীয় জলটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ। না খেয়ে, প্রবল তৃষ্ণায়, কত সঙ্গী ত্যাগ করলো শেষ নিঃশ্বাস। তাদের প্রাণহীন দেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে, তবু চলতে লাগল তারা। বিপুল-বিস্তীর্ণ উত্তাল সমুদ্র, আর সামান্য বোট। তবু যেতে হবে। এইভাবে মৃতপ্রায় হয়ে কতগুলি কঙ্কালসার মানুষ অবশেষে এসে পৌঁছল একদিন আরবের উপকূলে। এইবার শুরু হলো জলপথ ছেড়ে, স্থলপথে যাত্রা। যাত্রার মধ্যে একদিকে প্রবল মরুঝড়, অন্যদিকে প্রচণ্ড সূর্যতেজ। তার মধ্যে তবু তারা অগ্রসর হতে চায়! এখানেই চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল কয়েকজন সঙ্গী, অথচ ফিরে তাকালে চলবে না, "যারা বেঁচে আছে, তারাই চলো এগিয়ে।" কিন্তু, যাবে কতদূর? হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনদের সাথে। তারা যেতে দেবে না এদের, এরাও যাবে। জীর্ণ-শীর্ণ শরীর নিয়ে এদের যুদ্ধ পর্যন্ত করতে হলো। এতেও হতাহত হলো কিছু। এইভাবে, আরব-দেশ পার হয়ে, দামাস্কাসের মধ্য দিয়ে অবশেষে তুর্কীতে গিয়ে যখন এরা পৌঁছল তখন ভিতরে প্রাণটা ধুক্‌ধুক্ করছে মাত্র কয়েকটি লোকের। তুর্কী তাদের পাঠিয়ে দেয় জার্মানীতে—তাদের নিজের দেশে।

যুদ্ধবিরতির কথা বলতে বলতে অনেক কথাই বলে ফেললাম। না বলে পারাও যায় না। কারণ, যে-পরিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়ে আমরা উঠে দাঁড়াচ্ছি, সে পারিপার্শ্বিকের একটা মোটামুটি ধারণা আজকের মানুষকে না দিতে পারলে, তাঁরা আমাদের সঠিক বুঝে উঠতে পারবেন কেন? আমি থিয়েটার করেছি, অভিনেতা হয়েছি। কিন্তু এই 'হয়ে-ওঠা'র পিছনে অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে, জেগে

আছে অনেক কথার ইতিবৃত্ত, যা তুচ্ছ শোনালেও মূল্যহীন নয়। অভিনয় করতে গিয়ে কত বিভিন্ন ভাবের নাটকের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হয়েছে, কত বিভিন্ন চরিত্রের ভঙ্গিমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে! তার পিছনে রয়েছে এই বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের অতুল ভাণ্ডার, যা কখনো পারিবারিক কাহিনীতে আলোড়িত, কখনো বা দেশের পরিবর্তন-আবর্তনের তরঙ্গে উচ্ছলিত। নিছক পারিবারিক ঘটনাই বলতে চাই না, তেমনি দেশের ইতিহাসও বর্ণনা করতে চাই না। যা চাই আমি বলতে সে আমার সঞ্চয়ের কথা। অভিজ্ঞতার সেই সঞ্চয় যা আমার জীবন মন আর অনুভূতিকে চালিত করেছে, একটা অনিবার্য পরিণতির দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিয়েছে, এগিয়ে দিয়েছে।

পাঁচ

১৯১৮—১৯২০

১৯১৮ সাল শেষ হতে চলল। এর মধ্যে আমরা কেদার বসু লেনের বাড়ি বদল করেছি। ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট-এর যে-ভাঙনের কথা ইতিপূর্বে এত বর্ণনা করেছি তারই করাল কালো ছায়া এসে পড়েছে কেদার বসু লেন অঞ্চলে। আমাদের অঞ্চলটা ঠিক ভাঙল না বটে, কিন্তু ড্রেনের সমস্যা এসে দাঁড়ালো। বাড়ি ছেড়ে নতুন ভাড়া বাড়ি খোঁজা প্রয়োজন। কিন্তু উপযুক্ত বাড়িবা চট করে পাওয়া যায় কোথায় এই ভাঙনের সময়ে। কিছু খোঁজাখুঁজি করা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু বাবার মনের মতনটি আর হয় না!। শেষ-পর্যন্ত উনি বিরক্ত হয়ে বললেন—আর ভাড়া-বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ি একেবারে করেই ফেলা যাক।

কাঁসারীপাড়াতে বেশ খানিকটা জমি আমাদের অনেকদিন ধরে কেনাই ছিল, তা প্রায় বিঘা দুয়েক হবে, তার একপাশে ছিল আমাদের আস্তাবল। সেই আস্তাবল ভেঙে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হলো। কিন্তু ওই তৈরির কাজকর্ম দেখাশুনার ব্যাপারে কাছাকাছি কোনো বাড়ি পেলে সুবিধা হয়। তা সে সুবিধা হঠাৎ হয়েও গেল। আমাদের ইন্দু বললে—তোমাদের জমির সামনেই একটা ভালো বাড়ি খালি আছে! নেবে?

দেখলাম গিয়ে। বাড়িটার পাশের গলিতে কিছুটা ঢুকলেই—ইন্দুদের বাড়ি। ইন্দুকে কাছাকাছি পাওয়া যাবে মনে করে ও বাড়ি নেওয়ার আমার উৎসাহের আর অন্ত ছিল না। তাছাড়া বাড়িটা একেবারে আমাদের জমির সামনে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিস্ত্রীদের কাজ দেখা যায়। অতএব, নিলাম আমরা বাড়িটা।

ওদিকে, যাত্রারও এক আহ্বান এসে উপস্থিত। ইন্দুদের বন্ধু—ভবানীপুরেরই লোক—অশোক মিত্র, তার সঙ্গে ইন্দুরা আগে খুব থিয়েটার-টিয়েটার করেছে, বেশ শৌখীন ও ধনী ঘরের ছেলে। তখনকার দিনের বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর 'টি. মিত্র এণ্ড সন্স'-এর ত্রিপণ্ডেশ্বরবাবু (আমরা ডাকতাম টিপনবাবু বলে), তাঁরই তিন সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ ছিল অশোক মিত্র। এরা রাজারহাট-বিষ্ণুপুরের মিত্র বংশ —স্যর রমেশ মিত্রের জ্ঞাতি—ভবানীপুরে এদের বহু আত্মীয় আছেন ছড়িয়ে। এই টিপনবাবু ও তাঁর ভাইদের খুব যাত্রার শখ ছিল, বহু যাত্রার পালা ওঁরা করেছেন। তখনকার নাম-করা 'অক্রুর সংবাদ', 'সীতাহরণ'—এসব ওঁদেরই পালা।

এহেন অশোক মিত্র-র মেয়ের বিয়ে। সে উপলক্ষে যাত্রার 'গাওনা' দেবেন এবং ডাক পড়ল আমাদের। যথারীতি ওঁরা এলেন আমাদের সবিনীত আমন্ত্রণ জানাতে। সেই হাতজোড় করে

সবিনয়ে বক্তব্য নিবেদন করার সামাজিক রীতি। ইন্দু প্রভৃতি বন্ধুরা অশোকবাবুকে বললে—তুমিও এসো না আমাদের মধ্যে! তোমার কাকাকেও নিয়ে এসো!

ওর রাঙাকাকা, অনাদি মিত্র, ভালো গাইয়ে, বয়স হয়েছে তবু গানের ক্ষমতাটা যায় নি।

এলেন অশোকবাবু কাকাকে নিয়ে আমাদের দলে। হরিমোহনবাবুর ভগ্নীপতি ললিতবাবু ছিলেন সেক্রেটারী, রীতিমত ধনী লোক। তার সঙ্গে অশোকবাবুকেও আমরা সেক্রেটারী করে নিলাম। আমাদের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক—প্রেসিডেণ্ট—সবাই বেশ পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন—তার সঙ্গে যোগ হলো আরেক ধনী ব্যক্তির, ক্লাব বেশ জাকিয়ে ওঠবারই কথা। ঐ যাত্রার আসরে অশোকবাবু স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন 'কর্ণ'-এর ভূমিকায়, অনাদিবাবু 'জুড়ি' গাইলেন। বেশ ভালোই হলো—'গাওনা'।

ও আসরের পর নতুন সেক্রেটারীর সাহচর্যে ক্লাবের তখন একটা উৎসাহজনক পরিস্থিতি চলেছে বলতে হবে। অর্থাৎ, সবাই মিলে বেশ জমে উঠেছি, আর কী। মিটিং করে ক্লাবের উন্নতির বিষয় নিয়ে আলোচনাই চলছে বেশী। কথা উঠলো, আমাদের নিজস্ব পোশাক না থাকার কথাটা লজ্জার কথা।

অবশ্য, যে-পোশাক আমরা ভাড়া করে আনতাম, তা খুব ভালো এবং উঁচুদরেরই ছিল। চোরবাগানের 'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক' ক্লাবের পরিচালক ও নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের তিনকড়িবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল, ওঁরা দুজনে সমবয়সীও ছিলেন, সেই সূত্রে মাঝে মাঝে ভূপেনবাবু আসতেন আমাদের ক্লাবে, মহলাও দেখতেন। তিনিই বলে দিয়েছিলেন—চোরবাগানের ফতেবাবুর কথা। ফতেবাবু শৌখীন ব্যক্তি, পয়সাওয়ালা লোক, শখের বশেই পোশাক তৈরীর কাজ শুরু করেছিলেন, ভাড়াও দিতেন।

ভূপেনবাবু বলেছিলেন—ফতেবাবুর কাছে আমাদের নাম করবেন। ভালো পোশাকই দিতে পারবেন উনি। ওখান থেকেই পোশাক আনান আপনারা।

গিয়েছিলাম আমি আর হরিমোহনবাবু। ফতেবাবুর বড়ো বাড়িটার নীচের তলাটা দেখে মনে হলো, যেন একটা ফ্যাক্টরী। দর্জিরা মেশিন নিয়ে সার-সার বসে গেছে। যারা সল্মা-চুমকির কাজ করত, তাদের বলত—'কারচোপওয়ালা', ওই 'কারচোপওয়ালারা' আপনমনে বসে বসে কাজ করেছে। বড়ো-বড়ো ট্রাঙ্ক সাজানো রয়েছে স্টোরের মধ্যে। তার থেকে পোশাক বার করে আমাদের সামনে দড়িতে পর পর টানিয়ে দিলে। আমাদের ত দেখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। সুন্দর ত বটেই, জাঁকজমকই বা কী তার!

সেই থেকে ফতেবাবুর পোশাকই চলে আসছিল ক্লাবে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নিই। তিনকড়িবাবুর কথা উঠল, না? তিনকড়িবাবু করতেন 'কর্ণ', অথচ, এবার অশোকবাবু 'কর্ণ' করলেন বলে উল্লেখ করে গেছি। এ-অভিনয়ে নয়, তারও আগের

কয়েকটি অভিনয় থেকেই তিনকড়িবাবু আর নামছিলেন না। তিনি ক্লাব ছেড়ে দিয়েছিলেন। শৌখীন অভিনেতা হিসাবে তিনকড়িবাবুর সেদিন রীতিমত সুনাম ছিল। কী দক্ষিণ কলকাতা কী উত্তর বহু জায়গায় গতায়াত ছিল তাঁর, বহু ব্যক্তিরই তিনি ছিলেন স্নেহভাজন। হাওড়া রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে চাকরি করতেন। সে অফিসে হরিমোহনবাবু এবং ইন্দুও চাকরি করতো। দু'একবার গেছিও সে-অফিসে। কিন্তু, যখনকার কথা বলছি তখন তিনকড়িবাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাটের দালালী করছিলেন। তারপর তাঁর খেয়াল হয়েছিল তিনি কারখানা করবেন। একটা লোহার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা করেছিলেন তিনি। সে-সব কারখানার নানাবিধ কাজকর্ম, এসব নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে ক্লাবে আসা বা অভিনয় করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। শৌখীন লোক ছিলেন। তামাক খেতেন। এবং ঘোরতর বিরোধী ছিলেন মদ্যপানের।

কথাটা যখন উঠল, তখন সেকথাটাও বলে নিই। দু'একজন মদ্যপায়ীর চেহারা যে সে সময় না দেখেছি এমন নয়। বয়স্ক ব্যক্তিই হবেন। শনিবারের রাত্রে মদ্যপানের ফলেই সম্ভবতঃ বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তেন রবিবার সকালে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেসামাল অবস্থায় যা-ইচ্ছে-তাই গালাগালি করছেন, আর দূরে-দূরে সমীহ করে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীরা। বাড়ির দেউড়ীর কাছে বৃদ্ধা মাসী কিংবা পিসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে হুকুম করলেন—ধরে নিয়ে আয়।

দু'একটি ছেলে পা টিপে পা টিপে পিছন থেকে এগিয়ে গিয়েই অমনি 'গাঁক' করে ধরত। ধরার পর আর কী! হাত-পা ছোড়াছুঁড়ি আর কতো করবেন তিনি! তাঁকে ধরে নিয়েই ছেলেরা দিত ছুট। নিয়ে, একেবারে বাড়ির ভিতরে—কলতলায়—কলের নীচে কিংবা চৌবাচ্চার মধ্যে একেবারে চুবিয়ে দিয়েছে। সোমবার—সেই মানুষই কিন্তু আবার আলাদা! দিব্যি ভদ্রলোক! খেয়েদেয়ে শান্ত শিষ্ট-নিরীহের মতো যথারীতি অফিসে চলেছেন, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই!

কিন্তু যা বলছিলাম। তিনকড়িবাবু চলে যাওয়ার পর, ঐ পাড়াতেই একটা যে থিয়েটার-ক্লাব ছিল, তা' থেকে আমাদেরই বয়সী দুটি ছেলেকে আনা হলো, বঙ্কিম আর ফণী। আমাদের টাবুর কথা আগে বলেছি, সেও কর্মব্যপদেশে চলে গেছে অন্যত্র। তাই দুজনের দরকার। ফণী করতে লাগল 'কর্ণ'—তিনকড়িবাবুর ভূমিকা, আর 'দুর্যোধন' সাজতে লাগল বঙ্কিম। আসল কথা, 'কর্ণ'-এর ভূমিকায় নতুন ছেলে ছিল বলেই তার জায়গায় অশোকবাবুকে নিতে পারা গিয়েছিল অতি সহজে!

অশোকবাবুর আমলে, প্রথম প্রশ্নই উঠল, নিজেদের পোশাক কই? চাঁদা হিসাবে টাকাও উঠল মন্দ নয়। উদ্যোগী লোকও ছিল। হরিমোহনবাবুর এসব জ্ঞান ছিল। তাঁর বাবার দোকান ছিল চাঁদনীতে—চাকরীর আগে হরিমোহনবাবু এই দোকানে বসতেন। কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক। তাই তিনি আর আমি, কখনো-সখনো বৃন্দাবনও দলে থাকত, বড়বাজার ঘুরে ঘুরে দেখে-শুনে নানারকম রঙের সাটিন, ভেলভেট, তারপরে জরির সলমা-চুমকি, ঝালর—এসব কিনে ফেললাম। এইসব কেনাকাটা চলেছিল মাসাবধি কাল ধরে। একটা কিছু নিয়ে

আসি আর সবার পছন্দ হয় না, আবার তা ফেরত দিয়ে আসি, নিয়ে আমি নতুন জিনিস। এই-রকম করে চলত আর কী? এরপরে কাপড়-চোপড় কেনার পালা যখন অবশেষে সাঙ্গ হলো, তখন উঠল আবার আরেক প্রশ্ন। কী স্টাইলের পোশাক হবে?

মাতব্বররা ছিলেন পুরাতনপন্থী, তাঁরা বললেন—প্যান্টলুন-চাপকান ত হবেই। নানান আকারের পৃষ্ঠ-বস্ত্র অর্থাৎ পিছনে রাজা-রানীর মতো প্রকাণ্ড কাপড় ঝোলোবার মতো কাপড়, এসবও চাই নানান আকারের।

আমরা বললাম—না, তা হবে না। আমরা যে-সব কাপড় কিনেছি, তাতে করে অর্ধেক উরু পর্যন্ত ঝুল—হাতকাটা—এইরকম সব বেনিয়ান হবে। তার সঙ্গে থাকবে কোমরবন্ধ। আর কাপড় হবে—বেনারসী। পাজামা—প্যান্ট্‌লুন নয়। আর মাথায় পরবার জন্য কিরীট ইত্যাদি, এসব ত করে নিতে হবেই।

অস্ত্রের ব্যাপারে অবশ্য ঝামেলা নেই। অস্ত্র-শস্ত্র আমরা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিলাম। বৃন্দাবন আর আমি, দুজনে মিলে—তূণ—মায় অর্জুনের যুগ্মতূণ—এসব টিনের করিয়ে নিয়েছিলাম, তলোয়ারও টিনের করিয়ে নিয়েছিলাম। বাকী ছিল তীর-ধনুক। ছেলেরা, যারা সখীর ব্যাচে ছিল, তাদের দিয়ে তীর তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তীরের পালকের জায়গায়—পার্চমেণ্ট কাগজ কেটে—ব্যাখারী চিরে তার ভিতরে আটকে দেওয়া হতো আঠা দিয়ে। আর ধনুক করেছিলাম আমরা নিজেরা। এবং তা বাঁশ থেকে করিনি। যাত্রার তখন প্রথমাবস্থা—এখন যেখানে নর্দার্ন পার্ক আছে—সেখানে তখন অনেক নারকেল গাছ আর সুপারী গাছ ছিল। সে-সব কেটে ফেলেছে একে একে। আমরা সেই সুপুরী গাছ থেকে ধনুক তৈরি করেছিলাম। সুপুরী গাছের ওপর আর নীচ, অর্থাৎ পাতা আর গুঁড়িটাকে কেটে দিয়ে—মধ্যবর্তী অংশ—যাকে বলে কাণ্ড সেটাকে ধনুকের মাপে কেটে কেটে তার গা থেকে কাঠ বার করে নিয়েছিলাম। সেই কাঠ আবার কেটে—ছুতোর দিয়ে বেশ করে 'শেপ' করে নিয়েছিলাম, মাঝখানে ছিল ধরবার হাতল—পাশদুটো সরু হয়ে গেছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, কাঁসারীপাড়া থেকে মুখ দুটো পেতলের করে নেবো—হাঙরমুখ, ব্যাঘ্রমুখ, এইসব—কিন্তু সে আর হয় নি। ওতেই চালিয়ে গেছি। ধনুকগুলোতে এনামেল রঙ করে নিয়েছিলাম। ধনুকগুলোর 'স্প্রিং' করার ক্ষমতা এতো ছিল যে মাঠে গিয়ে আনাড়ী হাতে নীচে থেকে ছুঁড়ে দিয়ে দেখেছি—বড়ো নারকেল গাছের মাথা পর্যন্ত তীর যেতো।

অস্ত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না, দ্বন্দ্ব উঠল পোশাকের স্টাইল নিয়ে। রবিবার-রবিবার মিটিং বসে—আলোচনার ঝড় বয়ে যায়—কোনো সিদ্ধান্তে এসে আর পৌঁছানো হয় না। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে হরিমোহনবাবু বললেন—থাক। নতুন পোশাক আর তৈরি করেই দরকার নেই। ভাড়া পোশাক ত পাচ্ছি, লোকে সেগুলিকে ক্লাবের নিজের পোশাক ভেবে সুখ্যাতিও করে যাচ্ছে। লাভ নেই আর তর্কাতর্কি করে।

এদিকে ১৯১৯ সাল চলেছে এগিয়ে। 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা' নিয়ে ত এতদিন কাটল, এবার নতুন বই ধরতে হয়। সামনে পুজো। কোথাও-না-কোথাও থেকে ডাক আসবেই। সুতরাং এই মার্চ এপ্রিল থেকেই নতুন বইয়ের মহলা বসাতে হয়।

ধরা হলো নতুন বই—'সীতাহরণ'। টিপনবাবুদের যে-যাত্রার কথা আগে বলেছি, তাঁদেরই বই ছিল এটি। অশোকবাবুদের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগ হলো, তারই সূত্র ধরে ওঁদের গীতিকার ও নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মশাই ক্লাবে আসতেন রবিবার-রবিবার। ইনিই টিপনবাবুর পালা লিখতেন। 'সীতাহরণ' এঁরই 'বাঁধা'। গান এখানে সেই পুরানোগুলিই রইল, সঙ্গে ঐ নগেনবাবুই বেঁধে দিলেন দু'চারখানা নতুন গান। পুরানো গাইয়ের মধ্যে এলেন ধ্রুপদী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশাই। খুব নামডাক ছিল ওঁর গাইয়ে হিসাবে, মধুর গলা ছিল। মুখ বিকৃতি করা আর হাত ছোড়া, এসব মুদ্রা ওঁর ছিল না, স্মিতমুখে ধ্রুপদ গেয়ে যেতেন। ক্ষেত্রবাবুর বড়ো ছেলে জিতেনবাবুর কথা আগেই বলা আছে, এঁরা দুজনে সুর দিলেন। ক্ষেত্রবাবুর দেওয়া পুরানো সুরও কিছু রাখা হয়েছিল। বসল এইভাবে 'সীতাহরণ'-এর মহলা।

নগেন্দ্রবাবু আমাকে ডেকে বললেন—তুমি করবে 'দশরথ'।

দশরথের অংশটা কিছু বাড়ানোও ছিল। 'কৈকেয়ী' হলো ইন্দু। 'রাবণ'—ভুজঙ্গবাবু। 'সূর্পনখা' বলে রামায়ণী বইগুলিতে যে চরিত্র থাকে, নগেন্দ্রবাবু তার এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রাক্ষসী বলে ঘৃণা করে ওকে 'সূর্পনখা' বললেও ওর নখ ছিল চন্দ্রকলার মতো সুন্দর। ওর নামকরণ হয়েছিল এ বইতে—'চন্দ্রনখী'। চন্দ্রনখীর অনেক গান ছিল। এ ভূমিকা দেওয়া হ'লো আমাদের বসন্ত আচার্যকে। হরিমোহনবাবু—'রাম'। অশোকবাবু—'লক্ষ্মণ'। বিধু সরকার—'সীতা'। 'মন্থরার' পার্ট করেছিল কালীঘাটের একটি ছেলে—পাঁচু তার নাম। আগে দোয়ারকী করতো, আবার 'সুশর্মা'র ছোট একটা পার্টও করেছিলো। এ পালায় ভুজঙ্গবাবুর ভাই ফণী (পঙ্কজভূষণ) রইলেন না, আর রইলেন না প্রবীণ অভিনেতা খগেনবাবু। খগেনবাবুর শরীরও ভেঙে পড়েছে, যাত্রা করাই তিনি ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা'র আহ্বানও এসেছে। অভিনয় করেছি, আর তার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে 'সীতাহরণ'-এর প্রস্তুতি।

এর পর হলো এই, পুজোর সময় থেকে যাত্রার যে মরসুম পড়ল তাতে আমরা ঘুরে ঘুরে এই নতুন বই-ই করতে লাগলাম। আমি ত এদিকে বেকার, বাড়ির রকে বসে আড্ডা দেই। আমাদের নতুন বাড়িটা বেশ বড়ই ছিল। রাস্তার একেবারে ওপরে। দোতালায় বারান্দা, নীচে রক। রকে ছাগল-ভেড়া না এসে জোটে বা ভিখারীর দল না এসে আড্ডা গাড়ে, তাই বাড়িওয়ালা রকটার চারদিকে লোহার শিক পুঁতে দিয়েছিল।

এই শিক-ঘেরা রকে না বসে আমরা বসতাম দেউড়ির সংলগ্ন রকটিতে। দুপাশে রক—মাঝখানে উঠানে যাবার রাস্তা। সকালের দিকেই অবশ্য বসাটা সম্ভব হতো বেশী। সামনের

দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম, আমাদের জমিতে বাড়ির কাজ হচ্ছে। আমাদেরই আস্তাবল ছিল আগে ওখানে, আমাদেরই প্রজা হরমণি, সে ছিল আবার গাড়োয়ানদের সর্দারনী, সে দেখতো সেই আস্তাবল, বহু পুরানো লোক সে আমাদের। বাড়ি তৈরির ব্যাপারে আমাদের আস্তাবলটা সরে গিয়ে তার আস্তাবলের সঙ্গে মিশে গেল। অর্থাৎ সে তার নিজের আস্তাবলে থেকেই আমাদের গাড়ি-ঘোড়ার তদারক করত আর কী।

এই সব দেখি আর শুনি। সকালের দিকে রকে বসে বসে এ-ও দেখতাম, ইন্দু অফিস যাবার পথে, হাতে টিফিনের বাক্সটি নিয়ে তাদের গলিটা থেকে বেরিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলেছে। ফেরার সময়, বিকেলের দিকে, সে ফিরছে ধীরগতিতে, আমাদের রকে এসে বসে গল্পগুজব ক'রে বাড়ি যেতো। খাওয়াদাওয়া করে আবার আসতো, একসঙ্গে যেতাম ক্লাবে। এমন দিনে, আমাদের পাড়ারই একটি পরিচিত ছেলে, এক অফিসে সে চাকরী করত শুনেছিলাম, এসে হঠাৎ বললে—আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো ভাই ?

থিয়েটার-যাত্রা ছাড়া আর কী সাহায্য আমি করতে পারি ?—মনে মনে অবাক হলাম। যতদূর জানি ছেলেটির যাত্রা-থিয়েটারের শখ নেই, করেও নি কখনো। তবে, আমার মতো লোকের কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য সে পেতে চাইছে ? সে বললে—শরীর খারাপ, ডাক্তার বলছে চেঞ্জে যেতে। মাসখানেক চেঞ্জে থাকলেই উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু মার্চেন্ট অফিসের চাকরী ছুটি পাওয়া কি সহজ কথা ? তাছাড়া, এও জানি, আমার বদলে নতুন লোক না দিতে পারলে, ওরা অন্য লোক নিয়ে নেবে। এইবার বুঝতে পারছ, কী বলতে চাই ?

—কী ?

ছেলেটি বললে, আমি ছুটিতে যাব, আর তার বদলে কেউ একজন যদি অফিসের কাজগুলি করে, তাহলে আমার ছুটি পাওয়া সম্ভব হবে। তুমি বসে আছো, তুমি যদি ভাই এই একটি মাস 'একটিনি' খেটে দাও !

আমি আরও অবাক। অফিসের কাজ জীবনে কখনো করিনি। কাজের মধ্যে—হালফিল —যখন অন্য কাজে তল পেলাম না—তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আসা-যাওয়ার পথে বউবাজারের এক স্কুলে কদিন ধরে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং আর বুককিপিং শিখেছিলাম। বউবাজারে তখন ওসব শেখার জন্য বহু স্কুল ছিল। ইন্দু ভালো স্টেনোগ্রাফার ছিল, হাওড়া রেলের জেলা ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে সে ঐ কাজই করত। তার কাছ থেকে মাঝে মাঝে দেখেশুনে নিতাম। শর্টহ্যাণ্ড আয়ত্ত করতে পারিনি, টাইপরাইটিংটা শিখেছিলাম, তাও চর্চার অভাবে ভুলতে বসেছি। কী করব ?

বন্ধুটি বললে—হাতের লেখা মোটামুটি ভাল হলেই চলে যাবে।

—বেশ। হাতের লেখার নমুনা দিচ্ছি। নিয়ে যাও। খামোকা গিয়ে নাকোচ হয়ে ফিরে আসতে পারব না।

নিয়ে গেল হাতের লেখা পরের দিন। এসে বললে—চলবে।

—চলবে ত ঠিক আছে। চলো।

পরের দিন সাড়ে নটা বাজতে-না-বাজতেই খেয়েদেয়ে প্রস্তুত। অতো সকালে স্নান করে খেয়ে নিতে দেখে মা অবাক হলেন, বললেন—কী রে?

বললাম সব।

—চাকরী!

—হ্যাঁ।

খুব খুশীই হলেন মা। চায়না মিউচুয়্যাল লাইফ ইনসিওরেন্সের অফিস। ওর এজেণ্ট ছিল গ্ল্যাডস্টোন ওয়াইলি কোম্পানি। বন্ধুটি নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন তাদের বড়বাবুর সঙ্গে। 'বড়বাবু' বলতে যা বোঝায়, সেরকম রাশভারী প্রবীণ ব্যক্তি ইনি নন। ছোকরা বয়স। কাজের লোক। বাড়ি—আড়িয়াদহ। শ্যামবাবু—নাম। আড়িয়াদহে নিজেদের একটি শখের যাত্রাদল ছিল। এই অফিসে যে-সব লাইফ ইনসিয়োরেন্সের যে-সব প্রপোজাল আসে সেই সব ফর্মের নকল ক'রে একটা রেকর্ড রাখতে হয়। একেবারে 'মাছি-মারা কেরানীর কাজ' যাকে বলে। এমন কিছু ভারী কাজও নয়। তবে বেরুতে হয় সকল সাড়ে নটায়। ট্রামেই যেতাম, ফেরার সময় আসতাম হেঁটে। হেঁটে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেতো। খাওয়া-দাওয়া করে তারপর যেতাম ক্লাবে।

এইভাবে কাটল মাসখানেক। ফিরে এলো বন্ধুটি চেঞ্জ থেকে। সে-ত জয়েন করলো, আমারও ছুটি হয়ে গেল। যেদিন আসি, ছোটসাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। কেরানীরা বলতো, 'ভিজিয়ে' সাহেব, আসল নামটা হচ্ছে—ভি-জি-আলেকজাণ্ডার, কাস্টম্‌স্‌-এ ফুটবল খেলতেন। বললেন—চাকরি করবে? স্থায়ী চাকরি চাও ত দিতে পারি। তিরিশ টাকা মাইনে দোব।

তখন মাইনের ব্যাপারে ও-ই রেওয়াজ ছিল। নতুন লোক নিলে ঐরকমই মাইনে দিত। বললাম—আমার গার্জেন আছে। তাঁর মত নিয়ে কাল বলে পাঠাবো।

বলা বাহুল্য, ঐ চাকরি নেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। বন্ধুকে ডেকে বললাম—না ভাই, অত দূরের কাজ, তিরিশ টাকায় আমার পোষাবে না। 'ভি-জি-এ' সাহেবকে বলে দিও।

যাত্রার ব্যাপারে—বই খোলার আগে পর্যন্তই মহলার খুব তোড়জোড় থাকত। তারপরে কোথাও 'ডাক' পাবার আগে একটু ঝালিয়ে নিলেই চলে যেতো। তা নইলে, ঐ শনিবারে-শনিবারে যা মহলা হতো, সে-ই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের যা উৎসাহ ছিল, তাতে সপ্তাহের বাকী দিনগুলি বসে বসে কাটতে ইচ্ছা করত না, তাই আমরা মাঝে মাঝে থিয়েটারের মহলা দেওয়া শুরু করেছিলাম। ইতিমধ্যে কার বাড়িতে উঠানে যেন স্টেজ বেঁধে আমরা 'বিজয়-বসন্ত' আর 'বিরহ' করেছিলাম। 'বিজয়-বসন্ত'-এ ইন্দু—রানী দুর্জয়ময়ী, আমি রাজা। 'বিরহ'তে আমি ফটোগ্রাফার। শুধু, এই-ই বা কেন, একদিন মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে আমরা 'পার্থ-প্রতিজ্ঞা' থিয়েটার

পর্যন্ত করেছিলাম। ওদের নকল করে সুলভ প্রেস থেকে লাল-নীল রঙে পোস্টার ছাপিয়ে খুব সমারোহ করেই অভিনয় করেছিলাম আমরা। সুলভ প্রেসই তখন ঐসব পোস্টার ছাপত। সে-ই আমার সাধারণ মঞ্চে উঠে প্রথম 'প্লে' করা। এর পরে কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া নিয়ে 'সরলা' আর 'তুফানী' করেছিলাম। 'সরলা'য় আমি হয়েছিলাম—দারোগা রমেশ, 'তুফানী'তে 'জাফর'। 'জাফর' করতেন মুস্তফী সাহেব, ওটা আমার দেখা ছিল।

এই অভিনয়ের আগে একদিন ক্লাবে 'সরলা' আর 'তুফানী' রিহার্সাল দিচ্ছি, এমন সময় মদন এসে আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল। 'অশোকবাবু' ততদিনে 'আশোক' হয়ে গেছে আমাদের কাছে, তাকে আমরা ডাকতাম 'পুঁটিয়া' বলে। পুঁটিয়ার কাকা অনাদিবাবু, যিনি জুড়ি গাইতেন আমাদের ক্লাবে, তাঁর ছেলে হচ্ছে মদন, এ-ও শৌখীন প্রকৃতির, সুন্দর চেহারা, কিন্তু অভিনয় করত না। দু তিন বছরের ছোটই সম্ভবত ছিল সে আমার। বললে—অহিনবাবু, চাকরি করবেন আমাদের অফিসে ?

—তোমার বাবার কোন্ অফিস ?

—রসা ইঞ্জিনীয়ারিং। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে।

—না।

—না কেন ? বাড়ি থেকে চান করে আটটায় পৌঁছবেন, বারোটায় খবার ছুটি, আবার আসবেন সেই দেড়টায় ; ছুটি হয়ে যাবে সাড়ে ছয়টায়। যেতে-আসতে পয়সা খরচা নেই, গাড়িভাড়া লাগবে না, কারখানা আপনার বাড়ির কাছেই। শক্ত কাজও কিছু নয়—কার্ড-ফাইলিং-এর কাজ।

—কার্ড-ফাইলিং ?

মদন বললে—হ্যাঁ। আমিই করতাম। আমাদের যে সেকশন-ইনচার্জ ছিল, সে টায়ার ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হয়ে গেছে। অবশ্য এ ডিপার্টমেন্টও 'টায়ার ডিপার্টমেন্টের' মধ্যে। আমি হয়েছি এখন সেকশন-ইনচার্জ। আমার আগের পোস্টের জন্য একজন লোক দরকার। কী ভেবে রাজী হয়ে গেলাম। ১৯১৯ সালের এটা শেষের দিকের কথা।

—দেখা করবেন তাহলে। আটটায়।

গেলাম। যে নতুন বড়বাবু হয়েছে, আমার চেনা পাড়ারই ছেলে, রমেন। সে আমাকে দেখে একটু হেসে বললে—এই যে। বসে যাও একেবারে কাজে। মদন, কাজগুলি ওকে দেখিয়ে দাও।

শুরু হলো আমার চাকরির জীবন। কাজ করি। বিরাট কারখানা—ঘুরে ঘুরে দেখি। 'টায়ার' বিভাগে আমরা 'বাবু' আছি জনা আষ্টেক, আর সাহেব আছে জন চারেক। মেমসাহেব আছে ছ'সাত জন। আমাদের বিভাগের বড়সাহেব—'কভারডেল' সাহেব—জাতে স্কচ—মিলিটারী অফিসার ছিল। যুদ্ধের সময় কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছিল। এসে ওদের ম্যানেজিং এজেন্ট কিলবার্ন কোম্পানিকে ধরে ওদের 'টায়ার' বিভাগ খুলিয়ে দিয়েছিল। নানা সরকারী ও মিলিটারী বিভাগের

বড় বড় কর্তাদের সঙ্গে ওর দহরম-মহরম ছিল। সুতরাং মোটর টায়ারের মত মিলিটারী সাপ্লাই সব ছিল—এদের। পেশওয়ার রাওয়ালপিণ্ডি—ভারতের সর্বত্র এদের টায়ার যেত। এসব আমি দেখিনি, পুরানো কার্ড দেখতে দেখতে এসব কথা আমি জানতে পেরেছিলাম। মিলিটারী ছাড়া, বাইরের কিছু কোম্পানিও সাপ্লাই নিত। গুদামের মধ্যে দুপাশে ব্রাকেটে সব মোটর-টায়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে—মাঝখানে সরু পথ। নানান আকারের সব টায়ার—নানান মেকারের। ডানলপ-মিচেলিন-গুডইয়ার—এসব ছাড়া, নতুন একটা মেকার ছিল—নর্থ বৃটিশ টায়ার। ঘুরে ঘুরে দেখতাম। দেখি, বহু চেনালোক এখানে কাজ করে। অনেক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভবানী থিয়েটারের বহু সভ্য চাকরি করতেন। অতুল-মাস্টার ত ছিলেনই। আমি থিয়েটার-যাত্রা করি, অনেকেই আমাকে জানতো! বেশ লাগত। কোথায় মেশিনশপ, কোথায় স্টোর, এইসব ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

এইভাবে কেটে গেল একমাস। মাইনেও হলো। পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়ে বাবাকে দেখালাম, বললাম—এই পেয়েছি।

বাবা বললেন—রেখে দাও। নিজের ইচ্ছা মতো খরচ করো।

বড়সাহেব 'কভারডেল' সাহেব বিশেষ রাগী লোক ছিল। কাজকর্ম বিশেষ কিছু বুঝত না। অন্যান্য সাহেবরা পর্যন্ত ওকে ভয় পেত। বড়সাহেবের সেক্রেটারীমতন ছিল এক মেম। সে কাজকর্ম বুঝত, দেখতও সব সে। সাহেব আসতো কারখানায় বিকেলের দিকে। এসে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত বসে কাজ করত। টাইপিস্ট মেমগুলি আরামে ছিল। তাদের সাহেব কখনও বকাবকি করত না—অবশ্য তার প্রয়োজনও হয়নি কখনও। তারা ছিল আবার ঐ 'বড় মিসি'র অধীনে। তাদের মাথাপিছু দু'টাকা করে সপ্তাহে বড়সাহেব দিত সিনেমা দেখবার জন্য। আমার হত মুশকিল, কারণ ওর সঙ্গে আদান-প্রদান আমারই ছিল সরাসরি। ফাইল-ক্যাবিনেটটি থাকত সাহেবের বাঁ পাশে। কার্ড দেখতো সে অনবরত। ঐ কার্ডগুলি দেখে বুঝতে চেষ্টা করত সাহেব তার কমিশন কত হবে। সে-ও যে হিসেব দেখে চট্‌পট্ বুঝতো, তা নয়, 'বড় মিসি' বুঝিয়ে দিলে তবে বুঝতো। মাথা মোটা—গোঁয়ার প্রকৃতির লোক। স্কচ্‌ম্যান ত, এমন তাড়াতাড়ি ইংরেজী বলত যে, বোঝা যেত না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবামাত্রই উত্তর দিতে হবে, সে তুমি বোঝো আর না-বোঝ। এতেই সে খুশী—ইয়েস স্যার! ক'রে এসে ফিগার টোটাল করে কার্ডে বসিয়ে দিতাম। কারণ আন্দাজে বুঝেছিলাম, ঐ টোটাল নিয়েই তার যত মাথাঘামানো। মেমসাহেব সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে ঐ টোটালটাই শুধু ভেরিফাই করে সাহেবকে বুঝিয়ে দিতো। ফিগার দেখেই সাহেব সন্তুষ্ট। কিন্তু এখানে সন্তুষ্ট হলে কী হবে? হেড অফিসে গিয়ে যখন দেখত, ওদের ফিগারের সঙ্গে তার ফিগার মিলছে না, তখন একেবারে রেগেমেগে অস্থির হয়ে উঠত। রীতিমত ঝগড়া করে আসত তাদের সঙ্গে। আমরা বলতাম—ওদেরই ভুল। আমাদের হিসাব ঠিক আছে।

সাহেব আবার ছুটত। ওরাও মানবে না, এ-ও তাদের বুঝিয়ে ছাড়বে। তুমুল ঝগড়া একেবারে।

তুমুল ঝগড়া যে আমাদের জন্য করত তা, নয়। মেমসাহেব বুঝিয়ে দিয়েছে যখন সেটাই ছিল ধ্রুব সত্যি। ফাইল বগলে হিসাবপত্র নিয়ে অফিসে এসে বেরিয়ে যাবার সময়ে সাহেব একবার আমাকে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিতো—অলরাইট?

আমিও ঘাড় নেড়ে জানাতুম—অলরাইট।

যদিও মনে মনে জানতাম যে অলরাইট নয়। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। এর অনেক দিন পরে তখন সাধারণ মঞ্চে যোগদান করেছি—নাট্যকার ভূপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে খুবই আলাপ হয়ে গেছে। ওঁর বাড়িতে খুবই যেতাম, খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। তাঁর কাছে বসে বসে অফিসের এইসব গল্প করতাম। এই বদমেজাজি সাহেবটাকে সামলে বেড়ানোর গল্প। তিনি শুনে বললেন—কী রকম হলো? অফিসে ত আর চাকরি করিসনি, সাহেব সামলানোর এ মোক্ষম অস্ত্রটি তুই পেলি কী করে? হ্যাঁ, ওই হলো একমাত্র অস্ত্র। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বোঝো আর না-বোঝো চটপট যা হোক একটা কিছু জবাব দিয়ে দিতে হবে।

বললেন, ওঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা। বি-এ পাশ ছিলেন। বড়বাবু ছিলেন। বোধ হয় 'টমাস ডাফ'-এ কাজ করতেন। সাহেবের ঘরে অনবরত ডাক পড়ত বড়বাবুর। একদিন সাহেব এসে হন্তদন্ত হয়ে ডাকলে, ভূপেন—ভূপেন?

ব্যাপার কী—ব্যাপার কী? তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম।

বললে—ক্যান ইউ টেল মি হোয়ার ইজ টেলিচেরী?

সর্বনাশ! 'টেলিচেরী' আবার কী! কখনো ত শুনিনি! কী বলি! এক সেকেণ্ড সময়ও নিলাম। তারপর চটপট বলে ফেললাম—ইয়েস স্যার। 'টেলিচেরী' ইজ নিয়ার 'পণ্ডিচেরী'।

সাহেব খুব খুশী। রাইট ও।

বেরিয়ে এলাম। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। বোধ হয় টেলিচেরীতে কোনো মাল সরবরাহের 'এনকোয়ারী' এসেছে। জায়গার ভুল হলে ত হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে! টেবিলে এসে তাড়াতাড়ি গেজেটিয়ারটা আনিয়ে দেখতে লাগলাম। যা দেখলাম, তাতে চক্ষু চড়ক গাছ! 'টেলিচেরী' পণ্ডিচেরীর কাছে মোটেই নয়—'টেলিচেরী' একেবারে মালাবার উপকূলে। কোথায় বঙ্গোপসাগর, আর কোথায় আরব সাগর! দুটিই অবশ্য বন্দর, কিন্তু এটা কী হলো? একেবারে সমুদ্র ভুল! কী করে সাহেবকে কায়দা করে বলি? মেজাজ বুঝে পরদিন বললাম পরে। সাহেব হেসে বললে, ঠিক আছে বাবু, ইটস অলরাইট।

আমার ব্যাখ্যা আর বুঝতেই চাইলে না। ঐ যে চটপট উত্তর দিয়েছিলাম। সাহেব তাতেই বেজায় খুশী। ভূপেনবাবু নিজের অভিজ্ঞতাকে এভাবে বর্ণনা করে, আমাকে প্রশ্ন করলেন—তা, নতুন ঢুকেছিস তুই সাহেবকে এভাবে সামলালি কী করে?

বললাম চট করে উত্তর দিয়ে ফল পেয়েছিলাম। সেই থেকে প্রতিবারই ঐ ওষুধই প্রয়োগ করে আসছি।

—সাবাস।

আসল কথা সাহেব ঐ মেমসাহেবটিকে খুবই বিশ্বাস করতেন। মেমসাহেব যে-হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছে, তা কি কখনো ভুল হতে পারে? ভুপেনবাবু জিজ্ঞাসা করতেন—তা তুই ত মিথ্যা ফিগার দিতিস। ম্যানেজ করলি কী ক'রে?

বলতাম—ম্যানেজ আমি করিনি দাদা, ম্যানেজ আপনিই হয়ে গেল। ঐ ধরনের ঘটনা যদি ক্রমাগত আরও ঘটতে থাকত, ত আমাকেই আসতে হতো ডুব দিয়ে। ঈশ্বর সহায়, সাহেবই পালিয়ে গেল।

—সে কি রে!

—হেড অফিসের ব্যাপার। সাহেবের মাথা গরম। তাদের হিসাব যে ঠিক আর আমাদের হিসাব যে ঠিক নয়, এ সে শুনতেই রাজী নয়। ছেড়ে দিলো চাকরি।

আসল কথা, যুদ্ধের সময়, টাকাও সাহেব আয় করেছিল প্রচুর। চাকরি ছাড়তে আর কী! সস্ত্রীক সাহেব চলে গেল দেশে। এখানকার সাহেব-মেমদের মুখ কিন্তু শুকনো। যে-পাহাড়ের আড়ালে ওরা ছিলো, তা যেন হঠাৎ-ই সরে গেছে।

এদিকে সাহেব চলে যাওয়ার পর, কোম্পানী এ অফিসও আর রাখল না। যুদ্ধও শেষ হয়ে গেছে, টায়ারের কারবারেও ভাঁটা পড়ে গেছে। এক মাসের নোটিশ সবাইকে দিলেন কোম্পানী। মাথায় হাত দিয়ে পড়ল সবাই, এতগুলো লোক, কোথায় যাবে এবার!

পুরনো লোক যারা এ বিভাগে এসেছিল তারা ওয়ার্কস্ ম্যানেজারকে ধরে অন্যত্র ব্যবস্থা করে নিলো, মুশকিল হলো নতুনদের। তাদের আর কিছু হলো না। ছোকরা এক সাহেব ছিল, সে চলে গেল মিলটন কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে। বললে—বাবু তোমরা আমার ওখানে খবর করো।

ধর্মতলায়যেমন কুক এণ্ড হার্ট ব্রাদার্সের ঘোড়ার আড়গড়া ছিল তেমনি ছিলমিলটন কোম্পানীরও আড়গড়া। মিলটন কোম্পানীর ছিল দালালী, ঘোড়ার গাড়ি সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। একটু অন্য ধরনের। প্রত্যেকটি গাড়িতে জুতে দিতো সকালে একটি ঘোড়া, বিকেলে একটি ঘোড়া। সকাল থেকে মধ্যাহ্নের টিফিন পর্যন্ত একটি ঘোড়া, তারপরে আসত অন্য ঘোড়াটি। গাড়ি অবশ্যই ভাড়াটে। পাদানির কাছটা থাকত খোলা। অন্য গাড়ির যেমন পাশে কবজা-ওয়ালা দরজা মতন থাকত, তা নেই, এ একেবারে খোলা। দালালরা গাড়ি করে এ-অফিস সে-অফিস করত ত, তাই তাড়াতাড়িরজন্য এই ব্যবস্থা। গাড়িটা নির্দিষ্ট স্থানে থামবার আগেই সাহেব লাফ দিয়ে নেমে পড়ে, সামনের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যেতো অফিসে। গাড়ি ততক্ষণে ঘুরিয়ে নিয়ে সিঁড়ির সামনাসামনি রাখা হয়েছে। সাহেব এক-দু'মিনিটের মধ্যেই যে-দর জানবার তা জেনে হুড়হুড় করে নেমে আসত, এসেই আবার প্রায় লাফ দিয়েই গাড়ির মধ্যে। চলো, অন্য অফিস। এরই নাম—দালালী গাড়ি।

কিন্তু, সে-অবস্থাও তখন দ্রুত পরিবর্তনের মুখে। কারণ, মোটর গাড়ির আমদানি হতে শুরু করেছে তখন। আড়গড়া তুলে দিলেন মিলটন কোম্পানী। তার জায়গায়—মোটরের কারবার আরম্ভ করেন। সেইজন্য টায়ার ডিপার্টমেণ্টও খোলা প্রয়োজন। তাই সেই ছোকরা সাহেব ওখানে গেল। তার কথামতো অন্যান্য বাবুরাও গেল। আমাকেও যেতে বলেছিল। কি জানি কেন, আমি আর গেলাম না। বাড়ি এসে বসলাম। তা তিন মাস চাকরি করলাম। প্রতি মাসে খরচা তো পাঁচ টাকা করে, তাই তিন মাসে নব্বই টাকা জমে গেছে। ঐ টাকা নিয়ে কি করি? বাবার কাছে নিয়ে গেলাম।

বাবা সব শুনলেন, কিন্তু টাকাটা নিলেন না। বললেন, কিছু কিনে নিও।

কী আর কিনব? নব্বই টাকা দিয়ে শালওয়ালাদের কাছ থেকে একখানা শাল কিনলাম। তখন বছরে একবার করে শালওয়ালারা আসত কাশ্মীর থেকে। এখনো আসে, তবে সংখ্যায় কম। অনেক সময় ধারও রেখে যেতো, পরের বছর করত সেটা আদায়। ধারে একশো দশ টাকা পড়ে যেতো শালখানার দাম, নগদ টাকায় নিলাম বলে নব্বইতে হয়ে গেল। বেশ ভালো শাল।

বাবাকে দেখালাম গিয়ে। বাবা বললেন, শাল কিনলে, জুতো কিনলে না?

বললাম—জুতো যা আছে, তাতেই চলে যাচ্ছে।

আর কিছু বললেন না বাবা।

শালটা বরাবর তোলাই থাকত, খুব কমই ব্যবহার করেছি। কিন্তু যে-কথা বলছিলাম, তার সূত্র ধরে আবার ঐ মিলটন কোম্পানীর ব্যাপারেই ফিরে আসি। ওরা ত আগে দালালী গাড়ির ব্যবসা করত, ঘোড়ার খাবার সাপ্লাইয়েরও ব্যবসা করেছে। সেই প্রসঙ্গে গ্র্যাণ্ড স্ট্রীটের ঘেসোপট্টির কথাও মনে আছে। পশ্চিম থেকে আসত চালানী ঘাস, সেসব শুকনো ঘাস আঁটি করে জড় করা, সেইসব রাশি রাশি আঁটি সাজিয়ে গোলায় নিয়ে বসেছে বিক্রি করতে। এছাড়া ছোলা, দানা ইত্যাদি আবার ভিজিয়ে গুঁড়ো করে খেতে দেবার রেওয়াজ হয়েছিল। নইলে ঘোড়ার সহিস ছোলা বা দানা ঘোড়াকে সবটা না দিয়ে কিছুটা সরিয়ে ফেলবে। ঘোড়ার নিয়ম ছিল, নিয়মমতো রোজ ডলাই-মলাই না করলে তার আবার বাত ধরে যায়। তাই যখন প্রতিদিনকার সাফসুতরো কাজ হতো খররা-বুরুশ দিয়ে তখন সেটা হতো বাইরের ফটকে, ঘোড়া বেঁধে। যাতে করে দোতলার বারান্দা থেকে বাড়ির কর্তা স্বয়ং দেখতে পান। তারপর ভিজে ছোলা অথবা গুঁড়ো ছোলা খেতে দেওয়া হতো ঘোড়াকে।

কিন্তু এ বার ত আর ঘোড়া নয়, এবার মোটর। এসব চালাবার জন্য নানাবিধ দোকান অল্পবিস্তর খোলা হতে লাগল। ট্যাক্সীও দেখা গেল। তার মধ্যে 'এ' কোম্পানী ছিল নামকরা। তাদের গ্যারেজ ছিল মুলেন স্ট্রীটে। সবই 'এ' নম্বরওয়ালা। তা ওদের তখন ছিল প্রায় আশি-নব্বইটি ট্যাক্সী। ড্রাইভারদের সবাই ছিল বাঙালী, ভালো মাইনে আর মোটা কমিশন। কমিশনটা শুনেছি তাঁরা ভালোই পেতেন। অত্যন্ত সৎভাবে থাকলেও তাঁরা তখনকার দিনে এক-একজন মাসে তিনশো সাড়ে

তিনশো টাকা উপার্জন করতেন, কম কথা নয়! এর একটা খারাপ ফলও দেখা দিয়েছিল কোথাও-কোথাও। ড্রাইভারদের অনেকের মধ্যে দোষ দেখা যেতে লাগল, মদ খেতেও শিখলেন অনেকে, চরিত্রও অনেকের নষ্ট হতে লাগল। অবশ্য ভালো লোকও ছিল। তাদের কথা বলছি না। যাদের কথা বলছি, তারা বড়ো-বড়ো বাবুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাপ্তেনী করা শুরু করেছিল। ফলে টান পড়ত টাকার। তখন চুরি-চামারিও আরম্ভ হওয়া স্বাভাবিক। এইসব বিপর্যয়ের ফলে আসতে শুরু করল—শিখ ড্রাইভার। ফ্যামিলি নিয়ে তখন তারা আসত না। ভবানীপুরে বাড়ি নিয়ে অনেক লোক থাকত একসঙ্গে, এটা দেখেছি। ভবানীপুরে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যেসব রাস্তা বের করেছে, তার মধ্যে পাড়ার ভিতরকার অনেক রাস্তাতেই তখন সবে খোয়া দেওয়া হয়েছে, তখনো ভালো করে পেটানো হয়নি বা রোল করা হয়নি, আলো দেওয়াও শুরু হয়নি, সেইসব জায়গায় অন্ধকার। সেইসব জায়গায় এক-একদিন বাঙালীদের সঙ্গে মাতাল অবস্থায় তাদের লেগে যেতো তুমুল মারামারি।

যাই হোক, ট্যাক্সী চালনায় তখন বাঙালী ওদের মতো পরিশ্রম করতে পারল না, তাই ক্রমে ক্রমে হটে যেতে লাগল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছিল তখন। বেশ মনে আছে, ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাস সেটা। সেদিন কলকাতায় প্রথম এরোপ্লেন নেমেছিল। অন্ততঃ আমরা কলকাতায় এই প্রথম এরোপ্লেন নামা দেখেছিলাম। রেস কোর্সের ঘেরা মাঠটার মধ্যে নেমেছিল। কোথায় যাচ্ছিল তা বলতে পারব না, কেন যে নামল, তা-ও জানতে পারিনি। তবে আগ্রহের সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলাম দেখতে। বেড়ার বাইরেই দাঁড়াতে হলো, বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের ভিতরে যেতে দিলো না। আমি শুধু নয়, আমার মতো বহু লোক জড়ো হয়েছিল দেখতে। লোকে বলাবলি করছিল, নামবার সময় একটা গাছের ডাল নাকি গায়ে লেগেছিল, কিন্তু যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় ভাঙা ডালপালা কোথাও দেখতে পেলাম না। দূর থেকে যা দেখলাম, সে ঐ অতিকায় ক্লান্ত পাখির মতো ডানা মেলে পড়ে থাকা এরোপ্লেন। দুদিকে ছড়ানো পাখা, পুরোনো ধরনের। এর আগে ছবিতেই শুধু দেখেছি। পরে আবার সেটা উড়েও গিয়েছিল। এ দৃশ্য আমরা দেখেছিলাম দুটি অবাক বিস্ফারিত চক্ষু মেলে। এর আগে অবশ্য:বেলুন-ওড়া দেখার অভিজ্ঞতা ছিল। বন্দরের জেঠিতে মোটা কাছি জড়িয়ে জাহাজ বাঁধবার যে লোহার 'ক্যাপস্টান' আছে, ঠিক তারই মতো 'ক্যাপস্টান', প্রায় সেইরকমই মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা থাকত বেলুন—সেই বেলুন উড়ে যেতো আকাশে। বিশপ কলেজের কাছাকাছি—লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর, রাস্তার দক্ষিণ দিকে টিভলী গার্ডেন নামে বাগানওয়ালা একটা বাড়ি ছিল, সেখান থেকে বেলুন ওড়ান দেখেছিলাম তখন। বেলুনে সঙ্গে থাকত বালির বস্তা ভার হিসাবে। সেইগুলি নামিয়ে দেওয়া মাত্রই বেলুন হালকা হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতো ওপরে, দড়ির সংযোগটা অবশ্য থেকেই যেতো। বেলুন নামাবার

সময় ক্যাপ্টেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির একটা টানের সৃষ্টি করত, সেই টানে বেলুন আস্তে আস্তে নেমে আসত।

যুদ্ধের পর এইসব নানান জিনিসের প্রবর্তন, আর কারুর চোখে কেমন পড়ছিল জানি না, আমার চোখে পড়ত। কারণ আমি ত বেকার—ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কি কাজ আমার আছে? ব্যবসা হলো না, পড়া হলো না, চাকরিও হলো না। ঘৃণ্য হয়েছিলাম আত্মীয়স্বজনের কাছে, পড়শীরাও ভালো চোখে দেখে না, বলে—যাত্রা থিয়েটার করে, ও হচ্ছে বখা ছেলে।

এদিকে বেকার ছিলাম বলে বন্ধুরাও যে মনে মনে খুশী নয় সেটা বুঝতে পারতাম। ক্লাবে খুব খাটতাম বলে—একদিক থেকে তারা সন্তুষ্ট ছিল অবশ্য, তাই মুখে কিছু বলত না ও বিষয়ে। বৃন্দাবন রাগ অভিমান করে এক-একবার সাত-আট দিন পর্যন্ত ক্লাবে আসতই না, আমার কিন্তু সেরকম ছিল না। যা-ই হোক না কেন, ক্লাবে যাবোই। কাজের জন্য এমনিতে ভালোবাসত সবাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে আমার যা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাতে বুঝতাম, সামাজিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রকৃতপক্ষে আমি একা, একঘরেও বলা যেতে পারে।

ক্লাবের প্রবীণরা মুখ ফুটেই আক্ষেপ প্রকাশ করতেন, বলতেন—করো না কেন কিছু?

আমাদের বাড়ি তৈরির ইঙ্গিত আগেই করেছি। ১৯১৮-র শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছিল গৃহ-নির্মাণ। সেসব দেখাশুনা করবার ভার পড়ল আমার উপরে। এ কাজটা আমার খুব পছন্দসই হয়েছিল, বেশ চিত্তাকর্ষক মনে হতো কাজটা। বাড়ির প্ল্যানের যে 'ব্লু-প্রিন্ট' সেটা দেখে-দেখে মিলিয়ে নিচ্ছি বাড়ির কি কাজ হচ্ছে বা কোথায় কতটা এগিয়ে যাচ্ছে। ভালো লাগত কাজটা। প্রত্যেক সন্ধ্যাতে ক্লাবে যাওয়া অবশ্য ঠিকই আছে কিন্তু অন্য সময় আর যেতে পারতাম না। ইতিমধ্যে হলো কী, আমাদের বাড়ির ব্যাপার নিয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হলো, ফলে বাড়ি তৈরির কাজ রইল বন্ধ বহুদিন ধরে।

সুতরাং যথা পূর্বং তথা পরং। একটা কাজে মন উৎসাহ পাচ্ছিল, সেটাও গেল। মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কদিন ধরে। এমন সময় হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল, আমাদের ক্লাবেরও নিজস্ব বাড়ি হবে। রাজেন্দ্র রোডটা তখন সবে বেরিয়েছে, আলোটালো দেয়নি। তারই ওপর একটা পছন্দমতো জমি পাওয়া গেল. উত্তরে নর্দার্ণ পার্ক। জমির মালিক প্রবীণ ব্যক্তি—আমাদের ক্লাবেরই পৃষ্ঠপোষক, আশুতোষ ঘোষ, হংকং ব্যাঙ্কের তদানীন্তন ক্যাশিয়ার। অশোকেরই উৎসাহ বেশি। সে বললে, তেত্রিশ বছরের লীজ নাও আশুবাবুর কাছ থেকে। ক্লাবের একটি বাড়ি হোক। এসো চাঁদা তোলা শুরু করে দেই।

যে কথা সেই কাজ। চাঁদা উঠুক আর না-ই উঠুক, কাজ আরম্ভ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। জমিটার ব্যবস্থাও পাকাপাকি হয়ে গেল। এবার বাড়ি তৈরির অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে হয়ে গেছে, তাই আমারই ওপর পড়ল সবকিছু দেখাশুনা করবার। আবার আমি পেলাম মনের মতো কাজ।

কতো ধরনের ব্যবসা আর চাকরি করে ত দেখলাম, কোনোটাতেই মন বসেনি, একমাত্র বাড়ি তৈরির কাজ ছাড়া। একটা কিছু চোখের সামনে প্রস্তুত হয়ে উঠছে, এ যেন একটা জিনিসের ক্রমোন্নয়ন ও ক্রমবিন্যাস, সৃষ্টির ক্রমবিকাশও বলতে পারি এবং তার সঙ্গে আমি যে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছি, অনুভব করে একেবারে আনন্দে ভরে যেতো মন। পরে ভেবে দেখেছি, অন্য সব কাজে না লাগিয়ে আমাকে যদি এই কাজেই লাগিয়ে রাখতেন অভিভাবকরা, তাহলে হয়ত কনট্রাক্টরির কাজে উন্নতি করতে পারতাম। কিন্তু তা হয়নি, ভাগ্য আমাকে ক্রমাগত অন্যদিকেই টেনেছে।

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে আদি গঙ্গার ধারে এখন যেখানে হিন্দু মিশনের বাড়ি, সে অঞ্চলে অশোকদের সুরকির কল ছিল। সে সেখান থেকে প্রয়োজনমত ইট, সুরকি এসব যোগান দিতে লাগল। ততদিনে হরিমোহনবাবু চাকরি ছেড়ে অশোকের সঙ্গে লেগে গেছেন কনট্রাক্টরির ব্যবসাতে। যাই হোক, এদিকে তৈরি ত হতে লাগল ক্লাববাড়ি। সকালের দিকেই চলে যেতাম কাজের জায়গায়। তদ্বিরতদারক করতাম, সেই সঙ্গে ক্লাবে বসে করতাম আরও একটা কাজ।

তখন ত আমাদের 'সীতাহরণ' পালা চলছে। ১৯১৯ সালের শেষও হয়ে আসছে। অতএব আগামী পূজোয় আবার কী নতুন বই দেওয়া যায়, সে চিন্তা তখন থেকেই করলে ভালো হয়। আমি প্রস্তাব করলাম 'ভীষ্ম' বই করা যাবে।

—কে লিখবে ?

বললাম—চিন্তা নেই, আমি দেবো !

ওরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বললাম—ভীষ্ম বই আমি করে দিচ্ছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' পড়েছি। আরও 'ভীষ্ম' পড়েছি। এক ডাক্তারবাবুর লেখা 'কুরুক্ষেত্র' —একটা শখের দলে অভিনীত হয়েছিল। দেখেছিলাম। কোনো-কোনো দৃশ্য ভালোও লেগেছিল। নাট্যকার একখানা বই উপহারও দিয়েছিলেন আমাকে। এছাড়া 'দেবব্রত' বলেও একখানা বই পেয়েছিলাম। এইসব বই একসঙ্গে করে, তার থেকে দৃশ্য বা দৃশ্যাংশ বেছে নিয়ে সংকলন করে একখানা বইতে দাঁড় করাতে হবে। ধারাবাহিকতা রাখবার জন্য কোথাও কোথাও বা নতুন কিছু রচনাই করে নিতে হবে। দুপুরে মিস্ত্রীদের কাজও দেখি, আবার ক্লাবে বসে বসে এই সংকলনের কাজও করি। দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য মেলানোর কাজ করতে করতে মাথাটা এক এক সময় ঝিম ধরে যেতো। তখন, ঐ দুপুরেই খেয়ালীর মতো বেরিয়ে পড়তাম। হাঁটতে পারতাম খুব। হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদহ, সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আবার হাওড়া।

এইরকম করে দিন কাটে। মাসখানেক পরিশ্রম করার পর অবশেষে বইটা দাঁড় করাতে পারলাম। একদিন শোনালাম সবাইকে। ওরা সব শুনে বললে—বেশ হয়েছে ত ! কয়েকজন বললে—তবে, একটা দৃশ্য ওর সঙ্গে জুড়ে দিলে ভালো হয়।

—কী দৃশ্য ?

ওরা বললে—ঐ যে যেখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বরণ করবার কথা শ্রীকৃষ্ণকে। শুয়ে আছেন তিনি, নিদ্রিত। মাথার কাছে একটা সিংহাসন পড়ে রয়েছে। সাত্যকী দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। প্রথমেই এলেন দুর্যোধন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত দেখে বসলেন গিয়ে তাঁর মাথার কাছে সিংহাসনে। পরে এলেন পার্থ, তিনি বসলেন পায়ের কাছে। সুতরাং নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের চোখ পড়ল পার্থের দিকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞামত যাঁর দিকে তাঁর প্রথমেই চোখ পড়বে, তাঁকেই বরণ করবেন তিনি।

নিজেই লিখে ফেললাম দৃশ্য। ওরা শুনে বললে—মন্দ হয়নি, তবে নগেনবাবুকে দিয়ে একটু আধটু সংশোধন করিয়ে নিলে ভালো হয়। তাই হলো। নগেনবাবুর কাছে বইখানা আমরা নিয়ে গেলাম। শুধু একটু-আধটু সংশোধনই নয়, গানগুলি পর্যন্ত লিখে দিলেন নগেনবাবু।

নগেনবাবু আমার বাবার পরিচিত ব্যক্তি। বাবা যখন বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, উনিও বেঙ্গল থিয়েটারে যেতেন, ছোট ছোট দু একখানা বইও দিয়েছিলেন। থিয়েটার ফেরৎ উনিও বাবার সঙ্গে বাবার গাড়ি করে ফিরতেন অনেক সময়। বাবাকে চিনতেন আর তাছাড়া তাঁর ছেলে দেবেন, আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তাদেরও ক্লাব ছিল, থিয়েটার করত, কতবার বেড়াতে গেছি তাদের ক্লাবে। এইসব কারণে তাঁর বেশ স্নেহই ছিল আমার উপরে। সেটা বুঝতাম বলেই আবদার করে একদিন ওঁকে বললাম—গান লেখা শিখিয়ে দেবেন আমাকে ? উনি একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললেন—ও ত আর শেখাবার জিনিস নয়। তুমি চেষ্টাচরিত্র করে লিখে ফেলো, আমি সংশোধন করে দেবো।

সত্যি কথা বলতে কি, কিছু-কিছু গানও লিখেছিলাম। সংশোধন করিয়ে নিতাম নগেনবাবুর কাছ থেকে। মনে আছে একবার রথের শোভাযাত্রায় আমরা সবাই আমাদের ক্লাবেরই কনসর্ট নিয়ে আমারই একখানা গান কোরাসে গেয়ে বেড়িয়েছিলাম।

১৯২০ সালের সেটা প্রথম দিক। দেখতে দেখতে হয়ে গেল বাড়ি তৈরি। ফুটপাতের ওপরেই হাফ পাঁচিল, সেটা কোমর ভোর উঁচু, তার ওপরে কাঁটা তার দেওয়া। মাঝখানে ফটক। সেটা পেরিয়েই বারো ফুট আন্দাজ ফাঁকা জায়গা বাগান করার মতো। পোতাটা একটু উঁচু, গোটা তিন-চার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে গোল থাম আর খিলেন দেওয়া, আর নীচে কলসের রেলিং। বারান্দা পার হয়েই প্রকাণ্ড হলঘর—পঞ্চাশ বাই পঁচিশ ফুট। এরই পূর্বধারে আমরা স্টেজ করে নিয়েছিলাম। দেড় ফুট থেকে দু ফুট উঁচু হবে স্টেজ। সামনে অডিটোরিয়ামের দিকে মুখ করে গাঁথা প্রসেনিয়াম। অডিটোরিয়ামের দশ ফুট উঁচুতে আবার কাঠের ব্যালকনি করা হল—মেয়েদের বসবার জন্য। ছাদটা অবশ্যই পাকা ছিল। এছাড়া জমির এক কিনারায় লম্বা একটা শেড করে নেওয়া হয়েছিল, টিনের ছাউনি, সরু ইটের পার্টিসান দেওয়া

সামনে-পিছনে দুটি ছোট ঘর—একটিতে অফিস, অন্যটিতে মালির ঘর। মাঝখানের ঘরটা ছিল লম্বা—প্রয়োজনমত এখানে মহড়া হতে পারত। বাড়িটার উত্তরে লম্বামতন খোলা রক ছিল, রকের পরেই ব্যাডমিণ্টন খেলবার জায়গা ছিল। সব মিলিয়ে দেখতে বেশ ছবির মতোই হয়েছিল। দক্ষিণটা ছিল খোলা, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হু-হু করে হাওয়া আসত। সেই হাওয়ায় বসে কাজ করতে করতে হঠাৎই এক সময় শতরঞ্জির উপরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম এক-একদিন। এক সময় ধড়মড় করে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে দেখতাম, দুপুরবেলা চারিদিক সব নিঝুতি হয়ে গেছে। তখনকার দিনে দোকানদাররা বারোটা নাগাত সব দোকানপত্র বন্ধ করে বাড়ি চলে যেত, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করে ফিরে এসে আবার দোকান খুলত তিনটে নাগাত। তাই দুপুরবেলাটা দোকানপত্তরের ঝাঁপ সব বন্ধ, লোকজন রাস্তায় বিশেষ নেই—অদ্ভুত নিঝুতি লাগত পরিবেশ! বুঝতে পারতাম যে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। সেই অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে আসতাম খাওয়া-দাওয়া করতে।

দিন যায়। ইতিমধ্যে 'ভীষ্ম' পড়ে গেছে মহড়ায়। এবার আমাকে বুড়োর পার্ট দেয়নি, আমি এবার—কর্ণ। সেই আমাদের রয়্যাল ক্লাবের প্রফুল্ল ঘোষ, যে গ্যাস কোম্পানীতে চাকরি করতো, আর কোহিনুর থিয়েটারে ঢুকেছিল, সে যুদ্ধের সময় চাকরি নিয়েছিল বার্ড কোম্পানীতে অ্যাকাউণ্টস বিভাগে। যুদ্ধের সময় মাইকা বা অভ্রের খুব চাহিদা হয়েছিল। বার্ড কোম্পানী মুঙ্গের অঞ্চলে মাইকা মাইন খুলেছিল, ঝাঁঝা স্টেশনে নেমে আঠারো মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হয়, প্রফুল্ল সেখানে গিয়েছিল অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হয়ে। ততদিনে ও বিয়ে-থা করেছে। মাঝে মাঝে যখন সেখান থেকে ও কলকাতায় আসত, দেখা করে যেতো আমাদের সঙ্গে। অর্থাৎ যোগাযোগটা রেখেছিল। এখন হলো কী, যুদ্ধও শেষ, অভ্রের খনির কাজও শেষ, প্রফুল্ল চলে এলো কলকাতায়। সেই খনির এক সাহেব, পিলচার সাহেব নিজে অফিস করলেন, ও এখানে এসে জয়েন করল অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ও বড়োবাবু হয়ে। সুতরাং এবার আমাদের ক্লাবে ওর নিয়মিত গতায়াত করার আর কোনো বাধা রইল না। ও 'ভীষ্ম'তে হলো—সাত্যকী। 'ভীষ্ম' হয়েছিলেন ঐ আশুবাবুরই ছেলে—ভোলাদা। নরেন্দ্রনাথ ঘোষ কানে ভালো শুনতে পেতেন না, তাই আগাগোড়া পার্টটা মুখস্থ করে ফেলতেন খেটেখুটে, অভিনয় ত ভালো করতেনই, এতে করে আরো ভালো হত। বইয়ের প্রথম অংশে—তরুণ ভীষ্ম অর্থাৎ 'দেবব্রত' করতো আমাদের সেই ফণি মুখোপাধ্যায়, বাকি অংশ করতেন ভোলাদা। ভোলাদা অভিজ্ঞ অভিনেতা, ভবানী থিয়েটারের শিক্ষকও ছিলেন। আমাদের সেই 'বিরহ' অভিনয়ে—কর্তা সেজে বেশ ভালোই অভিনয় করেছিলেন। উনি আবার ভালো গানও গাইতেন, তদুপরি ছিলেন সুদক্ষ হারমোনিয়াম বাজিয়ে। অম্বা ও শিখণ্ডী করেছিল বসন্ত। সত্যবতী—বিধু সরকার। গঙ্গা—ইন্দু মুখার্জি। শান্তনু—যুগল বসু। অর্জুন—হরিমোহনবাবু। শল্য—অশোক। শ্রীকৃষ্ণ—সিদ্ধেশ্বর বসু, যিনি আমাদের 'পার্থ প্রতিজ্ঞা'তেও শ্রীকৃষ্ণ করতেন। নাম

করা হলো—'বস্ত্র মুক্তি।' যাত্রা আমাদের এই পালার ভালোই হলো। এবার হলো আমাদের নিজেদের পোশাক। যেমন পোশাক আমাদের করার ইচ্ছা ছিল, কাপড় ও বেনিয়ানের, এবার ঠিক সেইরকমই হলো। এবার কেউ আপত্তিও করল না। ইতিমধ্যে আমার মনে এক অভিলাষ জাগল। নাটক পড়ারও অভ্যাস ছিল। হঠাৎ একদিন মনে হলো, গিরিশবাবু রামের জীবনের সব ঘটনাই নিয়ে নাকি লিখে গেছেন। রামের বিবাহ 'থেকে শুরু করে লক্ষ্মণ বর্জন পর্যন্ত সমস্তই দেখলাম আছে গিরিশবাবুর রচনায়। এইসব রচনা থেকে সংকলন করে একটি রামায়ণ নাটক কি করা যায় না? 'ভীষ্ম' সংকলন করে আমার অভিজ্ঞতাও হয়েছে, সাহসও বেড়ে গেছে। তাই এই কাজে মনোনিবেশ করলাম।

খাটছি এই নিয়ে, এমন সময় অশোক আমাকে হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল—হ্যাঁ হে, বসন্তকুমার ঘোষ বলে তোমার এক মাসতুতো ভাই আছে?

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

—বলোই না।

বললাম—আছে। আমার থেকে বছর চারেকের ছোট।

অশোক বললে—তোমার মামাবাড়ি কি শুঁড়ো?

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি কি বি-এ পাশ করেছে এবার?

—হ্যাঁ। কিন্তু, কেন?

অশোক বললে—আমার মেজো মেয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছে।

—তাই নাকি! এতো আনন্দের কথা! লাগিয়ে দাও।

অশোকের বড়ো মেয়ে ভানুর বিয়ে হয়ে গেছে, মেজো মেয়ে পানুকেও আমি দেখেছি। বললাম—মেয়ে আমার দেখা, এবার ওরা এসে দেখুক। শেষ পর্যন্ত আমিই নেমে গেলাম কথাবার্তায়। বলতে গেলে, এককথায় হয়ে গেল বিবাহ। জুন মাস, ১৯২০ সাল।

বসন্তের বিয়ে ত হয়ে গেল, এদিকে পরিবারে আমাকে নিয়ে দেখা দিলো এক সমস্যা। বসন্তের মা-বাবা ওর অল্প বয়সেই মারা যায়, তাই মামাবাড়িতেই ও মানুষ। ওর নিজের বড়ো এক বোনও ছিল, তারাও মারা যায়। ওর নিজের কিছু সম্পত্তিও ছিল। এখন করছে কি, আমার মামাবাড়িতে বেশী যাতায়াত ছিল বলে আপনা-আপনি ভাবটা গড়ে উঠেছিল ওদের সঙ্গে বেশি করেই। আমি বয়সে ভাইদের মধ্যে সবার বড়ো, তাই আমি ছিলাম বড়দা, ও মেজদা, আমার ছোট মাসির ছেলে ছিল সেজদা, আর বড়মামার ছেলেকে ছোটরা ডাকত 'নদা' বলে। এইভাবে আমি যেন ছিলাম এবাড়িরই ছেলে একজন। সেই হিসাব ধরে মেজোর হয়ে গেল আগে, আর বড়ো বসে রইল, এই কথা তুলে শুরু হলো কানাকানি। বিয়ে উপলক্ষে যেসব আত্মীয়স্বজন

এসেছিলেন, তাঁদের মুখে, বিশেষ করে মেয়ে মহলে কথাটা শুনে শুনে মার আর ভালো লাগল না, বলা যায়, মার বুকে একটা ব্যথাই এসে বাজল। মা অবশ্য আগেও একবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হননি। ছেলে কিছু করে না, এঅবস্থায় বিয়ে দেবো কি ?

বাবা বলতেন, শেষ পর্যন্ত ওই বলবে, বাবা আমার বিয়ে দিয়ে কী বিপদেই না ফেলে গেল ! আমার অবর্তমানে আমাকেই গাল দেবে ছেলে। আমার বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে, ছেলেরা তা রাখতে পারবে না।

তারাপদ তখনো আছে, কিন্তু তার তখন ফ্যাশানের চাকরি ! বয়সও হয়েছে তার। আর বয়স কালে—সে নিরক্ষর ছিল বলে তার একটা ক্ষোভ ছিল, চিঠিপত্র এলে পড়তে পারত না, অপরকে গিয়ে ধরত, বলত—পড়ে দাও।

তাই, সে করেছিল কী, কষ্টেসৃষ্টে তার ভাইপো দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তারা এখন মানুষ হয়েছে, ভালো সরকারী চাকরি করছে। একজন বি-এ পাশ, আরেক জন এফ-এ। তাদের ইচ্ছা নয় যে, তাদের কাকা এই বৃদ্ধ বয়সে চাকরি করে। তাই থাকত সে দেশে, কিন্তু কতদিন থাকবে ? সুযোগসুবিধা পেলেই সে চলে আসত আমাদের বাড়ি। আমাদের ছেড়ে সে থাকতে পারত না। দু তিন মাস দেশে থাকে, কিন্তু মন টেকে না বলে আবার চলে আসে। ভাইপোরা অমনি তাগিদ দেয়, তারাপদকে ফের ফিরে যেতে হয় দেশে। এমনি আসা-যাওয়া তার চলে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছিল এই যে, আমি যাত্রা-থিয়েটার করি, একথা আমিও তাকে বলিনি, অন্য কেউও তার কানে দেয়নি কথাটা। আমাকে শুধু সে বলত, লেখাপড়া ছাড়লে কেন ? একবারে হয়নি, দুবারে পাশ হয়ে যেতে ! ছাড়তে গেলে কেন ?

এই তারাপদকে চিঠি দিয়ে আনানো হয়েছিল বসন্তের বিবাহ উপলক্ষে। সে সূত্রে সে আমাদের বাড়িতে এবার থেকেই গেল কিছুদিন। আমার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে যে গুঞ্জন উঠল, সেটাও কানে গিয়েছিল তার। বললে—সত্যিই তো বড়ো থাকতে ছোটর বিয়ে হলো ! একী কথা।

বিগত পাঁচ-ছয় বছর ধরেই সে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল তাদের দেশের এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে। প্রায়ই তখন সে বলত—খোকা সাহেবকে আমার দেশে নিয়ে যাবো। বিয়ে দেবো, খুব সুন্দরী মেয়েটি।

কিন্তু সে শখ তার মেটেনি। আজ যখন কথা উঠল, তখন তারাপদর দেশের সেই মেয়েটি নিশ্চয়ই এতদিন আইবুড়ো হয়ে বসে নেই, বিয়ে হয়ে গেছে।

তা হোক তারাপদর একান্ত অভিলাষ, খোকাসাহেবের এবার কোথাও-না-কোথাও বিয়েটা হয়ে যাক। তাই সে মায়ের সঙ্গে এসব কথাবার্তায় যোগ দিলে। বাবার কাছে অনুনয়-বিনয় করলে। বাবা কিন্তু অটল, তাঁর গোঁ থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারল না। কী করা যায় ? মা গেছেন দাদামশায়ের কাছে। সব শুনে বললেন—ঠিকই ত, বিয়ে দেওয়া খুবই উচিত। কাজকর্ম ছেলে

করে না, তাতে কি হয়েছে? মাথার ওপর সংসারের ভার পড়লে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বাপু, একটা কথা। আমি যা ঠিক করব, তোমরা তার ওপর কথাটি কইতে পারবে না। যে-মেয়েকে আমি ঠিক করে দেবো, তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। তবেই আমি নেবো এ ভার। মার তখন এমন অবস্থা, যে বউ না হলে তাঁর চলছে না। আত্মীয়-স্বজনের গঞ্জনা বড্ড বেজেছে তাঁর। দাদামশায়ের প্রস্তাবে মা রাজী হয়ে গেলেন। বললেন তাই হোক বাবা।

আমার ছোটমামার বিয়ে হয়েছিল ইটালীর ৺দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাড়ি, সুরেন্দ্রনাথ দেবের কন্যার সঙ্গে। ওরা খুব বড়ো জমিদার, শৌখিন লোক। সুরেন্দ্রনাথবাবু খুব ভালো ধ্রুপদ গান গাইতে পারতেন। এই সুরেনবাবু হলেন তাহলে দাদামশায়ের বেয়াই। দাদামশাই বেয়াইকে বললেন—আমার বড়ো দৌহিত্রের জন্য পাত্রী চাই। বড়ো দৌহিত্র মানে, আমার মেজো মেয়ের ছেলে। পাত্রী আছে সন্ধানে?

সন্ধান দিলেন সুরেনবাবু। ওঁদের বাড়ির পাশেই ৺ত্রৈলোক্য মিত্র মহাশয়ের বাড়ি, তাঁর ছেলে শরৎচন্দ্র মিত্র ছিলেন ওঁর বাল্যবন্ধু। সুরেনবাবু দাদামশাইকে বলেছিলেন—শরৎ মিত্রের ছোট মেয়ে আছে বিয়ের যোগ্য। দেখতে চান দেখিয়ে দেবো।

—বেশ।

কথা মোটামুটি ঠিক হতেই দাদামশাই একদিন মেয়ে দেখতে গেলেন। মেয়ে দেখে বুঝি পছন্দও হলো।

তখনকার দিনে পাত্র হিসাবে আমার বয়স হয়ে গেছে বেশি—চব্বিশ-পঁচিশ। সেই জায়গায় মেয়ের বয়স চৌদ্দ। তাই একটু সঙ্কুচিত হয়েই কন্যাপক্ষ নাকি বলেছিলেন—বছর খানেক ধরে চেষ্টা করছি, ভালো ঘর ভালো বর পাচ্ছি না। ছ'টি মেয়ে। পাঁচটির বিয়ে হয়ে গেছে—এটি ছোট।

দাদামশাই সব শুনে বুঝি বলেছিলেন—ঠিক হবে। ঠিক মিলবে। নিয়ে আসুন মেয়েকে।

মেয়েকে আনা হলো ওঁর সামনে। ওঁরা বললেন—আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করুন? লেখাপড়া, শেলাই-ফোঁড়াই?

দাদামশাই বললেন—বংশ পেয়ে গেছি, এমন ভালো বংশ! জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা আর কি করব?

—তা হোক, তবু কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

দাদামশাই ওঁদের অনেক পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করে বসলেন—ধোপার খাতা লিখতে জানো?

মেয়ে নতমুখে বসে ছিল। এ প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল।

দাদামশাই আবার বললেন—ধোপার হিসেব, বাজার খরচের হিসেব, ওসব রাখতে পারবে?

—পারব।

— ব্যস, আর দেখতে হবে না।

মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন ভিতরে। দাদামশাই ওঁদের বললেন—এবার আপনারা ছেলে দেখে আসুন। ছেলে কিছু করেটরে না, তবে বাপের বিষয় সম্পত্তি আছে।

ওঁরা বললেন—ওসব খবর নিয়েছি। ছেলে দেখবার দরকার নেই।

—তবে, পাকা দেখার দিন স্থির হোক।

হলো পাকা দেখা, আমাকে ওঁরা আশীর্বাদ করে গেলেন মামাবাড়িতে বসে। বাবা রাজী নয়, তাই ওখানেই হলো পাকা দেখা। বাবা আসেননি। তাঁর তখনো ঘোর অমত বিয়েতে। বিয়ের দিন স্থির হলো একটা, কিন্তু এবার ত ছেলের বাবার অমতে বা অনুপস্থিতিতে কোনো কাজ হবার নয়। তাই তাঁকে সব জানানো হলো। বাবা সব শুনে গুম হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন—না, এ বিয়ে হবে না।

মা পড়লেন দো-টানায়। একদিকে, দাদামশায়ের শর্ত—আমার কথার ওপর কোনো কথা বলবে না। অন্যদিকে, বাবা বসে আছেন বেঁকে। এই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করলেন আমার বন্ধুরা। হরিমোহনবাবু, অশোক আর ইন্দু এসে বাবাকে বোঝাতে লাগলেন। বাবা বুঝতে চান না, ওঁরাও বোঝাবে। এমন করে দু'তিন দিন ধরে বোঝানোর পর, অবশেষে রাজী হলেন বাবা। এবং রাজী যখন হলেন, তখন আর আয়োজনে কোনো ত্রুটি করলেন না, তাঁর সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী যা যা তাঁর করা কর্তব্য, সবই করলেন তিনি। আমাদের ভাড়াটে বাড়ির প্রকাণ্ড ছাদটা জুড়ে মেরাপ বাঁধা হলো। আমাদের নিজস্ব বাড়ির সামনেটা এতদিনে হয়ে গেছে, পিছনটা বাকী, সেখানে লোকজন বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বিয়ের দিন বিকেলবেলা রকে বসে আছি চুপচাপ। অফিস-ফেরত ইন্দু এলো, বললে—এখনো বসে আছো? স্নানটান করে তৈরি হয়ে নাও নি?

—এই, যাচ্ছি।

ইন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝলে কে জানে, ভিতরে গিয়ে মাকে বললে—মাসিমা, ওকে ডেকে নিন। বর বেরুবার সময় হয়ে এলো। আমিও আসছি তৈরি হয়ে।

আয়োজন আর এটা করো সেটা করোর উত্তেজনায় এ কয়টা দিন কেটে গিয়েছিল, কিন্তু আজ ঠিক বিয়ের দিনে, আমার মাথায় শুধু চিন্তাই ঢোকেনি, দারুণ এক ভয় হলো মনে। ভাবছি, বাবার কথাই ঠিক। নিজে কিছু করি না, এর ওপরে আর একজনের ভার বহন করব কেমন করে? বাবার বয়স হয়েছে, এর ওপর এ-বাড়ি যাচ্ছেন, সে-বাড়ি যাচ্ছেন, নিজে নেমন্তন্ন করতে। কিন্তু কদিন আর উনি? তারপর?

বলেছিলেন—সংসারে দাঁড়াতে শিখল না এখনো, ওরা আমার এই যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তি, একি রাখতে পারবে?

আজ মনে হচ্ছে, কথাটা সত্যি। সংসারের পথযাত্রায় চলবার ক্ষমতা অর্জন করেছি আমি

কতটুকু ? এখন মনে হচ্ছে বিয়ের প্রস্তাবে বাবা অরাজী ছিলেন, আমিও বা কেন বাবার পথ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তুলিনি ?

কিন্তু, আর ভাবনা করা বৃথা। ভবিতব্যই বা খণ্ডাবে কে ? ২৮শে আষাঢ় ১৩২৭ সালে সোমবার আমার বিয়েটা হয়ে গেল। তখনকার দিনের বাসরঘর ছিল, যাকে বলে—প্রমীলার রাজ্য। মেয়ে আর মেয়ে, তাদের মধ্যে 'হংসমধ্যে বক যথা'র মতো বরকে বসে বসে তাদের বহু জুলুম সহ্য করতে হতো—বরের কান বাঁচানো ছিল এক সমস্যা—কান মলে মলে বরকে লম্বকর্ণ করে দিলেও বলার কিছু ছিল না। তবে আমার বেলা, ওসব অত্যাচার হয়নি। তখন সচরাচর বরদের বয়স হতো ষোলো আঠারো, কি, বড়োজোর কুড়ি। সে হিসাবে আমি বেশি বয়সের বর, তাই আমাকে বরং সবাই একটু সমীহ করতে লাগল। তার ওপরে 'কনে' ছিল বাপমায়ের ছোট মেয়ে, তাই তার দিদিরা নির্দেশ দিল—ওদের বিরক্ত কোরো না।

বিরক্ত সত্যিই করেনি। একটি ছোট মেয়ে,—পরে শুনলাম সেটি আমার মেজো শালির মেয়ে। বাসরে গান গাইছিল, সে খানকতক গান শোনাবার পর আমাকে ধরে বসল, গান গাইতে হবে। 'না-না, সে কী ?'—বলে প্রতিবাদ করে উঠলাম, কিন্তু, সে কী শুনতে চায় ? শেষ পর্যন্ত আর সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললে—এবার গান ?

গান আরম্ভ করলাম ! ওমা দেখি, বাইরে থেকে পা-টিপে-টিপে সবাই ভিতরে এসে উপস্থিত ! বাইরে গিয়ে সবাই ওত পেতে ছিল আর কী !

বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, বাড়িতে এলাম। বধূ এলেন নাকে নোলক, পায়ে মল। একমাথা সিঁদুর, পায়ে আলতা, বেনারসী আর ওড়না লাল—সব লালে লাল। বিয়েতে তখন দুটি উৎসব হতো, গায়েহলুদ ও ফুলশয্যা। আর ছিল পাকস্পর্শ। আত্মীয়স্বজনরা খেতে বসেন দিনের বেলা, নববধূ ভাতে ঘি ঢেলে দেবে তাদের পাতে। অর্থাৎ, 'কনে' জাতে উঠবে। সে রাত্রে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হবে—প্রীতিভোজ। আমাদের পাকস্পর্শের দিনে ঘটল এক দুর্ঘটনা। বাবা একে বৃদ্ধ, তায় একটু পেট-রোগা মানুষ। সে-রাত্রে হঠাৎ শুরু হলো তাঁর ভেদবমি। সবিশেষ কাতর হয়ে পড়লেন। ডাক্তার এলেন, কিন্তু নতুন কনে বউ গিয়ে পড়লেন শ্বশুরের সেবায়। বাবা সে সেবায় সুস্থ হয়ে উঠলেন, তৃপ্ত হলেন, তাঁর মন প্রসন্নও হলো। কনে বউকে ডেকে উঠলেন—'মা' বলে। পরে বউমা বলে ডেকেছেন, কিন্তু প্রথম সম্বোধন ছিল—'মা'। সেই থেকে আমার স্ত্রী বাবার খুব আদরেরই হয়ে উঠলেন বলা চলে। বিয়ে নিয়ে বাবার মনে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, তা যেন মুহূর্তে ভেসে চলে গেল। দাদামশাই এসেছিলেন। বাবার ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, বললেন—কী ! বেঁকে ত বসেছিলে ? কেমন মানুষটি এনে দিয়েছি ?

বাবা উত্তর দিতে পারেননি। ক্রমে আমার স্ত্রীর কাছে যেন আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর যাবতীয় কাজ—তাঁর পুত্রবধূ করবে—সব সেবা। এ চলেছিল তাঁর মৃত্যুক্ষণটি পর্যন্ত।

তখনকার দিনে বউদের দাম্পত্যজীবন ছিল একমুখী। নিজের সুখসম্পদ বলে কিছু ছিল না, সমগ্র পরিবারের সুখসম্পদই তাদের সম্পদ। পরিবারস্থ সকলের সেবা করে বেড়ানো, নিজের সুখ বা শৌখিনতা বলে কিছু থাকবার উপায় নেই। তখন সিনেমা মানে নির্বাক ছবি, আর ছিল থিয়েটার। বছরে একবার কি দু'বার এসব দেখার সুযোগ আসত। তা-ও শাশুড়ী গেলে, তাঁর সঙ্গেই বধূ যাবে, নইলে নয়। সেবা দিয়ে যে বধূ মন নিতে পেরেছে, সে-ই মন পেয়েছে, যেরকম সংসারই হোক, ঠিক আদর পেয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ী গত হবার পর—বউ যখন গৃহিণীপদ পেতো, তখন স্বামীর সঙ্গে একটু-আধটু কলহ বা মান অভিমান হলে রাগ করে বাপের বাড়ি যাবার স্বাধীনতা পেতো। স্বামী আবার দু'তিন দিন পরে, ফিরিয়ে নিয়ে আসত। আমাদের চল্লিশ বছরের এই দাম্পত্যজীবনে কখনো তা হয়নি। আজও বৃদ্ধা শাশুড়ী ও বৃদ্ধ স্বামীর সেবা নিয়ে আছেন, এতেই তাঁর সুখ আর আনন্দ।

এদিকে জীবন যেমন চলছিল, তেমনি চলছে। ভাবনা উপার্জনের। কিন্তু, কী ভাবে উপার্জন করব? বাবা তাঁর বউমাকে চুপি চুপি নাকি বলতেন—ওর কাছে কিছু চেও না। আমি ত বেঁচে আছি, যা যখন দরকার, আমার কাছে চাইবে।

এমনকি, আমার প্রয়োজন পর্যন্ত মেটাতে আর দ্বিধা করতেন না। আমি অবশ্য মুখ খুলে তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা বলতেও পারতাম না। বিয়ের পর শ্রাবণ মাস কেটে গেল—এলো ভাদ্র। অর্থাৎ পুজো সামনে। অশোক পুজোয়-পুজোয় বেড়াতে বেরুতো। আমাদের ডেকে বললে, গত বছর রাজস্থানে গেলাম। তুমি আর হরিমোহন বর্ণনা শুনে খুশী হলে। এবার যাচ্ছি দাক্ষিণাত্যে। তোমরা যাবে?

বললাম—আমার ত কাজকর্ম নেই। আমি যাবো না কেন?

হরিমোহনবাবু বললেন—ও নতুন বিয়ে করেছে, পুজোর দিন বলে কথা, ও যাবে কি করে?

বললাম—তা হোক আমি যাবো।

হরিমোহনবাবু ত অশোকের সঙ্গেই কনট্রাকৃটরি করছিলেন, সুতরাং, ওঁরও যেতে বাধা নেই। শুধু অফিস আছে বলে ইন্দু পারল না যেতে।

ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা। মা শুনে অবাক হয়ে বলল—পুজোর সময় বাড়ি থাকবি না? নতুন বউ—নতুন কুটুম তাঁরা হয়ত তোকে নিয়ে যাবেন আমোদ আহ্লাদ করে, এসময় বাইরে যাবি কি?

আমি তখন ভাবছি, বেড়াবার এ সুযোগ কি আর আসবে জীবনে? বললাম, আমি যাবোই।

অগত্যা যেতে দিতে হলো। ত্রয়োদশীর দিন রওনা হলাম পুরী এক্সপ্রেসে। আমরা দুজন, পুটিয়া, ওর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা, ওর চাকর, ঠাকুর, এমনকি ওর যে এক প্রিয় মোটর ক্লিনার ছিল, যাকে সে শখ করে মোটর ড্রাইভিং পর্যন্ত শিখিয়েছিল, তাকে পর্যন্ত সঙ্গে। বেশ একটি দলই হলো বলা চলে।

পুরী। পুটিয়ার পাণ্ডা বাড়ি ঠিক করে রেখেছিল। সমুদ্র তীরে নয়, তবে সমুদ্রে যাবার পথটির

ওপরে। পাঁচ-সাতদিন এখানে থেকে, তার পরে গেলাম আমরা মাদ্রাজ। দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা আমাদের রিজার্ভ করা। দেখলাম, আমাদের কোচখানা কেটে খুর্দা রোড স্টেশনে জুড়ে দিলে মাদ্রাজ মেলের সঙ্গে। রাত্রের ট্রেন। কোচ্ কেটে রাখা জুড়ে দেওয়া এসবের জন্য রাত্রে তেমন ঘুম হলো না। ভোর হবো-হবোর সময় উষাকাল বলা যায়, চিল্কা হ্রদ পার হয়ে গেলাম। ভূগোলে পড়েছি চিল্কার কথা, সেই চিল্কা দেখব, সুতরাং আগ্রহ নিয়ে বসেছিলাম। ওদের ডেকে তুললাম, দেখুন দেখুন চিল্কা!

শান্ত স্নিগ্ধ নিস্তরঙ্গ জল দিগন্তে গিয়ে মিলেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। আর জলের ওপর জেলেরা মাছ ধরতে বেরিয়েছে পালতোলা নৌকো নিয়ে। পুরীতে জেলেরা মাছ ধরছে দেখে এলাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে এদের নৌকোর তফাৎ আছে। তারপরে দেখতে লাগলাম, ট্রেনও যাচ্ছে, চিল্কার জলও প্রায় রেলের লাইন ছোঁয় আর কী। মনে হলো, চিল্কা দেখলাম, কবে এর বুকে ঐরকম নৌকো নিয়ে বেড়াতে পারব! উষাকালের এই প্রার্থনা ব্যর্থ হবার নয়, ভগবান এ ইচ্ছা আমার পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু সে-সব কথা হবে পরে।

সকালে গাড়ি এলো বহরমপুর। তারপরে সারাদিন ধরে চলল গাড়ি। পাহাড় দেখতে দেখতে বললাম—পূর্বঘাট পর্বতমালা। সন্ধ্যার পর এলো—রাজামণ্ড্রী। ডিনার টাইম। তখনকার দিনে গাড়িতে 'রেস্তের াঁ-কার' থাকত না। স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে গিয়ে খেতে হতো। কতজন যাত্রী খাবে, সেই বুঝে গার্ড টেলিগ্রাম করে রাখত আগে থাকতেই। সেই বুঝে টেবিল সাজিয়ে রাখা হতো রিফ্রেশমেণ্ট্-রুমে। তখনো বিদ্যুৎ আসেনি, গ্যাসেরই পাম্প্ করা লাইট্ জ্বলছে, আর রয়েছে টানা পাখা।

আমি কিন্তু সবার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ-ই ভিতরে ঢুকতে পারিনি, পাশের বইয়ের স্টলটি যেন আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে নিলো। এদিককার হুইলারের মতোই ওদিককার সব হিজিনবোথাম বুকস্টল। আমার বাই ছিল স্টল ঘেটে কী কী বই আছে দেখার। কলকাতাতেও বুকস্টলে ঘুরতাম। লাটসাহেবের বাড়ির উত্তর দিক্‌কার রাস্তাটার ওপরে তখন ছিল থ্যাকার-স্পিঙ্ক্‌এর দোকান, সেখানে ঘোরাঘুরি করার বাতিক ছিল। কিন্তু, যে-সব ধরনের বই আমি খুঁজছি, তা আমি কোথাও পেতাম না। এ স্টলে এসে বই তুলে তুলে দেখছি অভ্যাসেরই বশবর্তী হয়ে। হঠাৎ হাতে এলো এক্‌টা বই, আর্ট অব স্পিকিং! চটি বই, তবে বোর্ড বাঁধানো বারো আনা দাম। বইখানার দুচারটে পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলাম। ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে মনে হলো, এযাবৎ যা খুঁজে বেড়িয়েছি, এটি ঠিক সেই জাতীয় বই! বুকের রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠল। ওদিকে ওরা ডাকছে—খেতে এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে!

আর, এদিকে বইখানা ছেড়ে যেতেও মন সরছে না! তাড়াতাড়ি বারো আনা পয়সা বার করে দোকানদারকে দিয়ে বইখানা আমি নিয়ে নিলাম। চলল খাওয়া। খেতে-খেতে প্রথম আলোচনার

বিষয়ই হলো—মাদ্রাজে ত কোনো চেনাশোনা লোক নেই, কোথায় থাকা হবে? নতুন জায়গা, এতগুলি লোক।

এক ভদ্রলোক পাশের টেবিল থেকে হঠাৎই অনুপ্রবেশ করলেন আমাদের সমস্যায়। তিনিও সহযাত্রী, তবে মাদ্রাজের অনেক আগেই তিনি নেমে যাবেন। বললেন—কোথাও যদি জায়গা না পান, ত, এক কাজ করবেন। স্টেশনে নেমেই ডান দিকে যাবার রাস্তা—মূর মার্কেটের দিকে চলে গেছে। একটু এগিয়েই একটা খাল পাবেন, তার ওপরে ব্রীজ। সেটা পেরিয়েই বাঁ দিকে দেখবেন রয়েছে রামেশ্বর মুদালিয়র চৌলট্রি। সেখানে থাকবেন, ভালো জায়গা।

এইসব কথাও চলছে, খাওয়াও চলছে, ইতিমধ্যে ঘণ্টা পড়ে গেল গাড়ি ছাড়বার। হুড়মুড় করে তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলে সবাই উঠতে যাচ্ছি, দেখি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন গার্ড, বললেন—উঠবেন না খেয়ে নিন। আপনাদের খাওয়া না হলে গাড়ি ছাড়বে না।

তখন ঐরকম নিয়মই ফার্স্ট-সেকেণ্ড-ক্লাস যাত্রীদের জন্য। খেতে দেরি হওয়ায় ট্রেন একটু-আধটু লেট হলেও ক্ষতি নেই। যাই হোক খাওয়ার পালা চুকিয়ে ত ট্রেনে উঠলাম। হাতের বইখানা পড়বার চেষ্টা করছি। কিন্তু একে ছোট হরফে ছাপা, তার ওপর গাড়ি দুলছে, পড়া আর গেল না। অথচ মন চাইছে, বইতে কী কী আছে, যত সত্বর পারি সব জেনে ফেলি। তা আর হলো না। সুটকেসে রেখে দিলাম, মাদ্রাজে নেমেই নিশ্চিন্তে বসে পড়া যাবে।

নামলাম মাদ্রাজে। সেই ভদ্রলোকের কথা মতো খুঁজে বার করলাম রামেশ্বর মুদালিয়ার চৌলট্রি। চৌলট্রির সামনেই আমাদের হগ্ মার্কেটের মতো কেতাদুরস্ত সাজানো-গুছানো মূর মার্কেট। চৌলট্রির দোতলায় ঘর খুলে দিলেই বেশ ভালো বড়ো এবং খোলামেলা ঘরগুলি দেখে, মনটা বেশ প্রসন্নই হয়ে উঠল। কিন্তু, আসলে বাঙালী ত, তাই ঘুরে ঘুরে সব সুবিধা-অসুবিধাগুলি আগেই দেখে নিতে গেলাম। তার মধ্যে প্রাতঃকৃত্যের স্থানটা কেমন, সে খোঁজও নেওয়া দরকার।

চৌলট্রির লোক দেখিয়ে দিলে—ঐ যে দরজা।

কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকেই বেরিয়ে এলাম। কাঠা দশেক জমি বেড় দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে উঁচু করা চাতাল কিন্তু সবই পাশাপাশি একটা থেকে আরেকটায় কোনো বেড়া বা আড়াল নেই। নিঃসঙ্কোচে সব বসে গেছে পাশাপাশি। শুনলাম, এইরকম আরেকটি রয়েছে মেয়েদের জন্য।

সর্বনাশ! কোথায় এসেছি! এখানে থাকা হবে না। মালপত্তর কিছু ততক্ষণে ওপরে উঠে গেছে, কিছু উঠছে, বললাম দাঁড়াও। আর তুলতে হবে না। বরং সব নামাও।

অবিলম্বে একটি ট্যাক্সি যোগাড় করে আমি আর হরিমোহনবাবু ভালো কোনো হোটেলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সেই খাল আবার পার হয়ে জর্জ টাউন। যেখানে ওয়াই-এম-সি-এ আছে, তার পাশ দিয়ে গেছে একটা গলি। সেই গলিতে হোটেল পেলাম। রাস্তা থেকে সোজা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। হোটেলের নাম 'কোমলা বিলাস'। আসলে অসুবিধার ব্যাপারটা আগে

দেখে নিলাম। ঠিকই আছে। মোটামুটি পছন্দসই হোটেল। ঘর দিলে, কিন্তু বললে—বৈষ্ণব হোটেল, মিলিটারী হোটেল নয়। মাছ মাংস খাওয়া এখানে চলবে না। আমিষ ভোজনালয়কে এরা মিলিটারী হোটেল বলে কেন, সেটা গবেষণার বিষয়। ইউনিফর্মধারী মিলিটারীরাই বেশী মাছ মাংস খেতে চায় বলে বোধহয় হোটেলও মিলিটারী নাম ধারণ করেছে।

যাই হোক, 'তথাস্তু' বলে ত আমি বসে রইলাম, হরিমোহনবাবু ঐ ট্যাক্সি করেই ওদের সব নিয়ে এলেন। রইলাম আমরা ওখানে। সারাটা দিন একরকম কেটেও গেল। তবে, হোটেল বলে কথা, পাঁচজনের যাতায়াত আছেই, এর মধ্যে মেয়েদের নিয়ে থাকা, তার ওপর রান্নাবান্না করে খাবো বলে ঠাকুর পর্যন্ত নিয়ে এসেছি! ঠিক মনঃপুত হচ্ছে না। বিকেল হতে-না-হতেই গেলাম ত স্টেশনের রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে কিছু খেতে। দেখি টিনে করে টিন ফিশ সাজান রয়েছে। কি খেয়ালে নিয়ে এলাম সেই টিন ফিশ কিনে। ভাবলাম, ঘর বন্ধ করে স্টোভে করে একটু গরম করে নিলে কে-ই বা টের পাচ্ছে।

কিন্তু, তারপরের সকালবেলা যেই ও কাজটা করতে গেছি, গন্ধটা নাকে না লাগলেও, যারা চিরকালের নিরামিষাশী, তাদের নাকে অমনি গিয়ে গন্ধ লেগেছে। আর যাবে কোথায়, 'হৈ-হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড।' ফেলে দাও ওসব, হোটেল ছেড়ে দাও এখ্‌খুনি, ইত্যাদি কলরব। এবং ফলস্বরূপ অবিলম্বে হোটেলচ্যুতি।

অতএব খোঁজো আবার বাড়ি। খোঁজাখুঁজির পর খানিকটা দূরে বড়ো রাস্তার ওপরে বাংলো প্যাটার্নের সারি সারি সব বাড়ি আছে, তারই একদিকে একটা দোতলা বাড়ি পাওয়া গেল। কথাবার্তা সব ঠিকঠাক করে চলে গেলাম। গিয়ে দুখানা ট্যাক্সি করে সবাইকে নিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। এসে দেখি, কা কস্য পরিবেদনা! দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর পাশের বাড়ি থেকে ত কর্তা বেরুলেন। বললেন তোমাদের ভাড়া দেবো না, তোমরা বাঙালী, তোমরা মাছ খাও।

আর কোনো কথা নয়, আমাদের স্বপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই রায়দানকারী বিচারক অন্তরালে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এদিকে মালপত্তর ঠেলায় চাপিয়ে আমাদের বামুন চাকররাও এসে পড়েছে। সেসব অবর্ণনীয় অদ্ভুত অবস্থা! অশোকের স্ত্রীর কোলে ছোট ছেলে। সেই রাস্তার ধারেই বসে দুধ গরম করে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে লাগলেন তিনি। সব দেখে-টেখে এক পথচারী ভদ্রলোকের বোধহয় করুণা হলো। তিনি এগিয়ে এসে সন্ধান দিলেন একটা বাড়ির। বল্লেন—ব্যারিস্টারের বাড়ি। তিনি মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী আছেন। তিনি তোমাদের ভাড়া দিলেও দিতে পারেন। এই রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডাইনে বাঁক নিলে দেখতে পাবে—বড়ো একটা কম্পাউণ্ড তার একদিকে পুরানো একটা বাড়ি রয়েছে, অন্যদিকে নতুন একটা বাড়ি রয়েছে, অন্যদিকে নতুন একটা বাড়ি উঠেছে। সেটাই। খোঁজ নাও।

নিলাম। ভদ্রমহিলা ইংরেজী জানেন। নতুন বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিতে তাঁর আপত্তিও হলো না, এমন কি মাছ মাংস খাবার ব্যাপারেও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সন্ধ্যা-সন্ধ্যি এসে পড়লাম বাড়িতে।

বাংলো প্যাটার্নের চমৎকার বাড়ি। বড়ো-বড়ো ঘর—খোলামেলা—সামনে ভালো একটি বারান্দা। তার সামনে বাগানের মতো। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, সম্ভাব্য বিশেষ অসুবিধার ব্যাপারটা আগেই দেখে নিলাম। ঠিক আছে।

কেটে গেল রাত। পরদিন থেকে শহর দেখবার পালা! মাদ্রাজ মিউজিয়ম দেখলাম। ঘুরলাম মাউণ্ট রোডে। আমাদের চৌরঙ্গীরই মতো, শুধু ময়দানটা নেই, নইলে ফ্যাসানেব্‌ল রেস্তোরাঁ, হোটেল, সবই আছে। গেলাম বীচ্-এ। ফোর্ট সেণ্ট জর্জে এবং বার্মা শেলের ট্যাঙ্কে—যেখানে-যেখানে এমডেন বোমা ফেলেছিল—সে সব চিহ্নও পর্যবেক্ষণ করলাম। গাইড সমুদ্রের দিকে একটা স্থান লক্ষ্য করে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওখান থেকে বোমা মেরেছিল।

মাদ্রাজবাসী সেদিন অবশ্যই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু জনকয়েক দুঃসাহসী ব্যক্তি দূর থেকে সেই বিচিত্র জাহাজটিকে দেখেও ছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে দেখলাম, অক্ষয় হয়ে আছে এমডেনের চেহারা!

আর দেখলাম মাদ্রাজের সুবিখ্যাত অ্যাকোয়ারিয়াম। কাঁচঘেরা সব বড়ো বড়ো চৌকো খোপ, সেগুলি আবার যাকে বলে ওয়াটার-টাইট্, একদিক থেকে সমুদ্রের জল ঢুকছে বুদ্‌বুদ্ করে, আবার অনুরূপভাবে বেরিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে বিস্মিত হয়ে গেলাম। যাদুঘর আছে—চিড়িয়াখানা আছে—কিন্তু এ-জিনিস ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই! সব জ্যান্ত মাছ! আর কতো রকমেরই না মাছ! খল্‌সের মতো, ছোট আর বড়ো। সাপের মতো। আর আশ্চর্য তাদের গায়ের রঙ! সে সব রঙের বাহারই বা কতো! গাঢ় বেগুনী রঙের একটি মাছ দেখে চোখ আর ফিরতে চায় না! মাছটা ঘুরছে, হাই-লাইট্ পড়ছে তার ওপর, আর তার রঙটা যেন টলটল করে উঠছে—উপচে যেন এইমাত্র গড়িয়ে পড়ে যাবে। আমাদের চিড়িয়াখানায় জেব্রা দেখেছি, সেই জেব্রার মতো ডোরাকাটা মাছ আর চাটাইবোনা মাছ দেখলাম এখানে। আর আছে উড়ুক্কু মাছ, সেডিফিস, নানারকম গেঁড়ি-গুগ্‌লী, শামুক। আর আছে অতিকায় কচ্ছপ। এই সব জলজ প্রাণীর বিচিত্র সব রঙ দেখতে দেখতে মনে হলো, মাটির ওপরে আমরা মুগ্ধ হই ফুলের রঙ দেখে—মেঘের বর্ণালী দেখে, কিন্তু জলের নীচে এই যে সব রঙের সমাবেশ, এ ত আমরা দেখতে পাই না, এ রঙ্ সেখানে তবে সঞ্চিত হয়ে আছে কার দেখার জন্য—কার দুটি চোখকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেবার জন্য?

যাই হোক, দেখার পালা চলেছে বটে, আর অবসর বুঝে পড়ছি সেই চটি বইটা। বইটার প্রথম বিশেষত্ব হলো, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা অঙ্কে দেওয়া নেই—রোমান হরফে দেওয়া আছে—আগাগোড়া। এ বইতেই প্রথম দেখলাম—কার্যকরী বহু জিনিস দেওয়া আছে। কণ্ঠস্বরটা আসে কীভাবে, কোথা

থেকে। দমটা কীভাবে নিতে হয়। মাঝে মাঝে উড ব্লকে ছাপা ছবিও রয়েছে বিষয়বস্তুকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্য, উচ্চারণের জন্য নানারকম সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া আছে। পড়ছিলাম বটে, তবে তখন যে সবটাই বুঝতে পেরেছিলাম, এমন নয়। তবে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় যে এতে রয়েছে, সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি। হাফটোনে ব্লক-করা নানান্ ভঙ্গির রোমান স্ট্যাচুর ছবিও রয়েছে—বক্তৃতা দিতে কী রকম "attitude" নিতে হয়, সেসব বোঝাবার জন্য। এসব অনুশীলনের জন্য যে ব্যায়াম দরকার, তারও চার্ট করা আছে। এ যাবৎ কণ্ঠস্বরের জন্য কতো সাধনা করেছি, কিন্তু এর যে কোন বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, তো একেবারে জানাই ছিল না। এবার মনে হচ্ছে, নূতুন এক জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আমার সামনে।

আরও একখানা মূল্যবান বই পেলাম ওখানে। ছপারী অঞ্চলে আমাদের বাসা, কাছেই ছিল হিগিনবোথামের অফিস। গেলাম বইয়ের খোঁজে। ওরা বললে—র‍্যাকে সব সাজানো আছে, তোমার পছন্দমতো বই তুমি খুঁজে দেখতে পারো।

খুঁজতে খুঁজতে পেলাম একখানা বই। এ-ও চটি বই, হলদে কাগজের মলাট, তিরিশপাতা আন্দাজ পাঠ্যবস্তু আছে, তারপরেই বাকী দশ-পনরো পাতা, যাকে বলে—নির্ঘণ্ট। নাট্যকার আর নাটকের নাম। কতোদিনের প্রাচীন বই কে জানে—মলাটটা ময়লা হয়ে গেছে, পাতাগুলিও বিবর্ণ। কবে বেরিয়েছে তার সনতারিখ উল্লেখ করা নেই। বইয়ের নাম—অ্যাক্টর্স্ হ্যাণ্ড্-বুক—কিন্তু লেখকের নাম নেই—শুধু আছে, বাই দি ওল্ড্ স্টেজার। এ-ও এক অমূল্য বই। তিরিশ পাতার মধ্যে হেন জিনিস নেই, যা এতে অনুপস্থিত। প্রতিটি এক্স্‌প্রেশন—প্রতিটি জেশ্চার—সব বুঝিয়ে বলা আছে আর আছে মেক্‌আপের কথা। এটা ত একেবারেই জানতাম না। আগে জানতাম, হোয়াটিং—পিউরী আর মেক্সিক্যান রেড—এই দিয়ে কোন রকমে রঙ করে নেওয়াই হচ্ছে বুঝি মেক-আপ। এটা পড়ে জানলাম, মেক-আপ ব্যাপারটা কী! পরে আন্দাজ করেছিলাম, এটি উনবিংশ শতকের লেখা বই। বড়ো বড়ো সব অভিনেতারই নাম আছে, আরভিং-এর নাম নেই। তাহলে, আরভিংএর নাম হবার আগেই লেখা হয়েছে বইটি। অর্থাৎ, আন্দাজ ১৮৮০ সালের আগের লেখা। এতে একটি অসাধারণ মূল্যবান কথা আছে। বলছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অভিনেতার যতই থাক না কেন, যতই গুণ কেন না তাঁর থাক, রূপটা আদৌ উপেক্ষার বিষয় নয়। সুন্দর একটা উদাহরণও দিয়েছেন। জনৈক নাট্য-উন্মাদ ব্যক্তি গিয়ে জনৈক থিয়েটার-ম্যানেজারকে জানালো, সে অভিনয় করতে ইচ্ছুক।

তাকে আগাগোড়া ভালো করে দেখে নিয়ে ম্যানেজার বললেন—স্টেজে-এ যোগ দিতে চাও?

—নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—কিন্তু, আকৃতিতে তুমি দেখছি একটু বেঁটে।

সে বললে—কিন্তু এডমণ্ড কীনও একটু বেঁটে ছিলেন।

—তোমার ঘাড়টা ছোট। যাকে বলে—ঘাড়ে-গর্দানে এক।

সে বললে—চার্লস্ ম্যাথুজেরও এরকম ছিল।

—তোমার হাঁটু দেখছি একটু ভিতর দিকে ঢোকানো—যাকে বলে "Knock Kneed"।

—লিস্টনেরও এরকম ছিল।

—তোমার কথায় একটু জড়তা আছে দেখছি।

—ফেডারিক কুকেরও এরকম ছিল।

ম্যানেজার হেসে বললেন—এদের এক-একজনের এক-একটা দোষ ছিল, তোমার যে সব দোষই আছে!

সে বললে—So much the better.

মূল্যবান উপদেশ। আমার অভিজ্ঞতাকালে কতো লোকই না এসেছেন অভিনেতা হবার ইচ্ছা নিয়ে, এখনো আসেন অনেকে! কিন্তু এই অসুবিধার কথা এখনো বুঝতে চান না বেশীর ভাগ লোক। আরভিং-এর হাঁটু একটু বেঁকানো ছিল বলে তাঁকে কতো সমালোচকের গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে!

আজ মনে হয়, এ বইতে 'ওল্ড স্টেজার' যে-কথা বলে গেছেন, তা দেশোত্তীর্ণ কথা, কালোত্তীর্ণ কথা। বড়ো উপকার পেয়েছি বইখানা পড়ে। পরবর্তীকালে কত বড়ো-বড়ো ভালো-ভালো বই-ই ত হাতে এসেছে, কিন্তু এতো কার্যকরী কথা এই ছোট বইয়ে যা পেয়েছি, তা আর কোথাও পাইনি। এ ছাড়া আরও একটি অধ্যায় আছে কণ্ঠস্বরের যত্ন কী করে নিতে হয়, সে সম্বন্ধে। এমন কি, গলার ব্যাপারে টোট্‌কা ব্যবস্থা ও ওষুধের কথা পর্যন্ত আছে। বিলাতী থিয়েটারের নিয়মাবলী আছে, অতি পরিশ্রম থেকে একটু রিলিফ পেতে গেলে কি কি করা উচিত, তাও আছে। এখন মনে হচ্ছে, আমেরিকায় তখন একটা নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে ওঠবার কথা হচ্ছে, সেটা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের কথা, ইংলণ্ডে তখনো কোনো স্কুল হয় নি, বইটা কি তখনকার দিনে লেখা? খুব সম্ভব। লিখছেন —এই যে বিদ্যালয় হবে, এতে শুধু অভিনেতারাই যে উপকৃত হবেন, তা নয়। এতে উপকৃত হবেন ইংরেজীভাষী সব তরুণরাই। আর উপকৃত হবেন, দেশনেতা, পার্লামেণ্টের বক্তা, স্কুলের শিক্ষক, আদালতের কৌঁসুলী, গীর্জার পাদ্রী। কথা বেচে যাদের খেতে হয়, এককথায় তারাই উপকৃত হবেন বেশী। তরুণেরা সহবতও শিখবে। সুষ্ঠুভাবে হাঁটা, চলাফেরা, ওঠা-বসা—দেশকে সর্বতোভাবে গড়ে তুলতে গেলে, জাতি গঠনের দিক থেকে এ-ও একটা দিক।

হিগিনবোথাম থেকে তখন আরও একখানা বই পেয়েছিলাম। বইখানা আজ দেখছি হারিয়ে গেছে। সিনেমার চিত্রনাট্য কী করে লিখতে হয়, গল্পকে কেমন করে চিত্রনাট্যে সাজাতে হয়, তার বই। একটু মোটা বই, এটিরই দাম ছিল বেশী—আড়াই টাকা—তিন টাকা।

এই ভাবে মাদ্রাজে দিন কাটছে। এবার প্ল্যান হচ্ছে কাঞ্জীভরম হয়ে মাদুরা যাবো, তারপরে সেতুবন্ধ—ধনুস্কোডি। এমন সময় কলকাতা থেকে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির। যাত্রার

ডাক এসেছে, দিন স্থির হয়ে গেছে, তোমরা চলে এসো। পালা হবে—'বস্তুমুক্তি' (ভীষ্ম)। আমরা তিনজন কর্মীই এখানে—তাঁরা পড়েছেন বিপদে। চিন্তিত হলাম। কাঞ্জীভরম-মাদুরা আর রামেশ্বর-সেতুবন্ধ যাবো মনে করেছি। এসেছি এত দূর দেশে—কষ্ট করে, আর দরজার কাছ পর্যন্ত এসেই কি না ফিরে যেতে হবে! অশোক বললে—একে ত বেরুনো হয় না। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে এসেছি—পথে বেরুনো কত কষ্ট! এসেছিই যদি সব না দেখে ফিরে যাবে? এক কাজ করো, আমি এদের নিয়ে থেকে যাই, তোমরা বরং চলে যাও। আমার ঐ ড্রাইভারটাকেও বরং সঙ্গে নিয়ে যাও।

অগত্যা তাই হলো। আমি আর হরিমোহনবাবু রাত্রির মেল ধরলাম। আবার—কলকাতা। ছিলাম পুরী আর মাদ্রাজের সমুদ্রে, এসে পড়লাম—কর্মসমুদ্রে। মহড়া বসাও, অশোকের বড়ো পার্ট ছিল, তার বদলে আর একজনকে খেটে খুটে তৈরি করাও। পরিশ্রমও হতে লাগল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদের যাত্রাও হয়ে গেল। মোটামুটি ভালোই হলো।

কিন্তু, আমরা ত যাত্রার মধ্যে বসে থাকতাম না, অবসর মতো থিয়েটারও করতাম। এবার তোড়জোড় করতে লাগলাম নিজেদের স্টেজে অভিনয় করবার জন্য। স্থির হলো, রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" অভিনয় করা হবে। থিয়েটার যাত্রা, দুটোতেই অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। অভিনয়ের একটু সুখ্যাতিও হয়েছে আমার এতদিনে। তাই, এখানে-ওখানে থিয়েটার করবার জন্য টেনেটুনেও নিয়ে যায়। বড়ো-বড়ো পার্টের জন্যই ডাক পড়ে। সা-নগরে একবার গিয়ে 'দেবলাদেবী'তে খিজির খাঁ করে এসেছি। চেতলার ওদিকে—'বেহুলা' হলো—তাতে 'চন্দ্রধর' বা চাঁদসদাগর আমি। সঙ্গে বিধু সরকারকেও নিয়ে গেছল ওরা—নায়িকার জন্য। 'বেহুলা' নায়িকা নয় এ বইয়ে, নায়িকার নাম—'মণিভদ্রা'। এ নাটক অভিনয় করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। নাট্যকারের নাম—ডাঃ হরনাথ বসু। আমি যখন পরবর্তীকালে মিনার্ভার ম্যানেজার, তখন এ বইটি অভিনয় করিয়েছিলাম, 'চন্দ্রধর'-এর ভূমিকাতেও ছিলাম আমি। এছাড়া, এক গ্রামে গিয়ে 'পদ্মিনী'তে 'আলাউদ্দিন' করে এসেছিলাম। তারপরে, যশিডিতে জ্যোতিষবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন চ্যারিটি অভিনয় করতে—'আওয়ার ডে'-র ফাণ্ডের জন্য। ভবানীপুরে আমাদের ক্লাব আর বাগবাজার থেকে বাছা বাছা লোক নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাতে 'বিল্বমঙ্গল'-এ বিল্বমঙ্গল ছিলাম আমি। সঙ্গে অমৃতলাল বসুর 'কলসী উৎসর্গ'ও অভিনীত হয়েছিল, তাতে আমার অবশ্য কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে, এই সব বাইরে থিয়েটার করার ব্যাপারের মধ্যে বৃন্দাবনের মাধ্যমে খড়্গাপুরে গিয়ে যে অভিনয় করেছিলাম, সে বিচিত্র অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। একদিকে 'বিসর্জন' অভিনয় করবার প্রস্তুতিকে উপলক্ষ করে জীবনের যে বিপুল পরিবর্তনের মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম, তাও যেমন বিস্ময়কর, তেমনি এও কম নয়। একথাই এবার বলব।

যোগাযোগটা ঘটেছিল বৃন্দাবনের মাধ্যমে। 'সাজাহান' অভিনয়। খড়্গাপুরের রেল-কর্মচারীরাই

করছে, ওদের দরকার শুধু সাজাহান আর জাহানারার। বৃন্দাবন বললে—এমন করে ধরে পড়েছে, চলোই না, বেশ বেড়ানোও হবে।

—তা না হয় সাহাজান ওঁরা পেলেন, কিন্তু জাহানারা?

বৃন্দাবন বললে—সে ব্যবস্থাও করেছি। যতীনকে নিয়ে যাচ্ছি।

যতীন আমাদের বন্ধুস্থানীয়ই বটে, কিন্তু সে রেলে কাজ করে, প্লের পরদিনই আবার তার ডিউটি পড়েছে। যদিও শনিবার রাত্রে প্লে হচ্ছে, পরের দিনটা রবিবার, তবুও তার পালা পড়েছে অফিসে বেরুবার। তা সকাল আটটার মধ্যে পৌঁছলেই হবে। হিসাব করে দেখা গেল, শেষ রাত্রির দিকে খড়্গাপুর থেকে একটা ট্রেন ছাড়ে, সেটা ধরতে পারলেই তার চলবে।

অতএব গেলাম আমরা তিনজনে। স্টেশনে অভ্যর্থনা জানাবার লোক অবশ্যই ছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটু সঙ্কুচিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ঠিক সময়ে এসেছি ত?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে।

হেঁটেই গেলাম। রেলের খালি-কোয়ার্টার একটা, ছোট। সেখানেই বিশ্রামাদির ব্যবস্থা হয়েছে। বিছানো একটা শতরঞ্জির ওপরে আমরা বসলাম। নাচের ছেলেদের নিয়ে গেছে, তারা দেখছি অদূরে বেঞ্চিতে বসে বসে গল্প করছে। আমাদের জন্য চা এলো, বিস্কুট এলো। সে সবের সদ্ব্যবহার হয়ে গেল। ওঁরা বললেন—এবার একটু গড়িয়ে নিন আপনারা।

গড়িয়ে নেবো? জিজ্ঞাসা করলাম—কী টাইম দিয়েছেন? আরম্ভ করছেন কখন?

বললেন—এই হবে। ট্রেনে এলেন, একটু জিরিয়ে নিন।

সিগারেট খাচ্ছি, গল্প করছি, উদ্যোক্তাদের আর দেখা নেই। এদিকে নটা প্রায় বাজে। সর্বনাশ! 'সাজাহান' বই বলে কথা, এরা আরম্ভ করবে কখন? এখনো স্টেজে ডাকছে না, মেক-আপ শুরু হচ্ছে না, নাচের ছেলেরাও যাচ্ছে না! ব্যাপার কী!

উঠলাম। কিন্তু যাবোই বা কোন্ দিকে? বৃন্দাবনকে বললাম—স্টেজটা কোন্ দিকে হে?

সে গাঁই-গুঁই করে কী যেন বললে, অর্থাৎ তারও কিছু জানা নেই। তার কেন, কারুরই কিছু জানা নেই। অগত্যা অস্থির হয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে শুরু করলাম। একটু পরেই ওদের এক ভদ্রলোক, ইনি 'আওরঙ্গজেব' করবেন। বললেন—আসুন দাদা। আপনারা এখন খেয়ে নিন। আমার বাসায়।

—সে কী কথা! এখন খাবো কী? প্লের আগে? প্লে কখন বলুন ত?

—এই হচ্ছে। আগে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিন। সেটাই সুবিধে!

অগত্যা রাজী হলাম। মনের অস্থিরতা কমছে না। ওদিকে যতীনকে যেরকম করেই হোক, চারটায় যে-গাড়িটা ছাড়ে সেটা ধরতেই হবে।

এদিকে হাঁটছি ত হাঁটছিই। লাইন পেরিয়ে ওপারে গেলাম। রেলের বড়ো বড়ো কোয়ার্টারগুলি যেদিকে আর কী!

সাজানো গোছানো সব কোয়ার্টার। সাহেব সুবোরাও থাকে। রাস্তার ধারে ধারে ঝাউ গাছ।

—আর কতদূর?

—এই যে এসে পড়েছি।

কিন্তু পথ যেন তবুও আর শেষ হয় না! দেড় মাইলের মতো একটানা পথ হেঁটে তবে তার বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়ির কম্পাউণ্ডে মোড়া নিয়ে বসলাম আমরা। খেতে-খেতে কোন্-না আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার কেটে গেল! মাংস আর লুচি। বেশ গুরু-ভোজনই হয়ে গেল। তারপরে আবার হেঁটে চলে এলাম যথাস্থানে, আবার লাইন পেরিয়ে। সেই আগেকার কোয়ার্টারটি। রাত তখন সাড়ে দশটা। বললেন—একটু গড়িয়ে নিন। এসে, ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে তন্দ্রা আসছে। ডেকে নিতে কেউ আর আসছে না। বৃন্দাবনকে বললাম—ব্যাপার বড়ো সুবিধের মনে হচ্ছে না, তুমি যাও, একটু তাড়া দাও গিয়ে। ভাবনা যতীনকে নিয়েই বেশী। তার ওপরে প্লেরই বা কী হবে? সাড়ে দশটাতেও মেক-আপে বসলাম না!

ওদিকে, সেই যে বৃন্দাবন গেছে, আর ফেরে না। ছেলেগুলি ঘুমিয়েছে, যতীনেরও নাক ডাকছে। এতো মহা বিপদের কথা হলো। এমন সময় এলো বৃন্দাবন, বললে—ঘুমোও। এখনো অনেক দেরি। এই সবে স্টেজ এসে পৌঁছলো—খাটানো হচ্ছে।

তখনো ইনস্টিটিউট হয়নি। প্লে হচ্ছে কাছেই কোনো ফাঁকা জায়গার ওপর—মাঁচা বেঁধে। কিন্তু বৃন্দাবনের কথা শুনে আমি ততক্ষণে উঠে বসেছি।—এখন খাটানো হচ্ছে কী হে! প্লে হবে কখন? চলো যাই?

—গিয়ে কী করবে?

—তা-ও ত বটে!

অগত্যা বসে রইলাম। কিন্তু কাঁহাতক বসেই বা থাকা যায় এভাবে? বললাম—না, বৃন্দাবন, হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সবাইকে তোলো। যাই। নিজেরা গিয়ে পড়ে যাহোক একটা-কিছু করে তুলি।

গেলাম। স্টেজ খাটানো হচ্ছে। কাজ পুরো হতে তিন কোয়ার্টার, কি এক ঘণ্টা বাকী। আমি বললাম—আপনারা যে-যার মেক-আপে বসে যান ত! আমি দেখছি এসব!

এদিকে, প্রসেনিয়াম হয়েছে, ড্রপ হয়েছে, আর কিছু হয়নি। বললাম—আর কিছু করতে হবে না, এতেই হবে। সিনও খাটাতে হবে না, উইঙ্গসও দরকার নেই।

শুরু হলো অভিনয়। মঞ্চের সামনে ত লোক বসেছেই। স্টেজের পাশে ত উইঙ্গস নেই,

সেখানেও লোকের ভিড় হয়েছে খুব, তাদের ঠেলে ঠেলে যখন যার দরকার, সেই মতো মঞ্চপ্রবেশ করতে হচ্ছে। আবার এক সময় প্লে করতে করতে চেয়ে দেখি, সর্বশেষ স্টেজে যে একখানি মাত্র সিন ঝুলে ছিল, সেটা ঠেলে, তার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী মেয়েরা মুখ বার করে দেখছে মঞ্চের ওপর হাতের ভর রেখে। দু সারি মেয়ে, একজনের পেছনে আরেকজন। মন্দ নয়, চারদিকেই লোক। তবে কি যাত্রার মতো চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্লে করবো নাকি? দুই-ই পারি। যাত্রাও পারি, থিয়েটারও পারি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সামনে যখন ড্রপসিনটা রয়েছে, ওটা সময়মতো উঠছে আর নামছে, তখন প্রধানতঃ সামনে তাকিয়ে অভিনয় করাই ভালো। সুযোগমতো এপাশে ওপাশে পশ্চার দিলেই হল। মেঝেতে যাত্রা করে এসেছি, এবার মঞ্চের ওপর যাত্রা। আমি নাম দিয়েছিলাম—'মঞ্চোপরি যাত্রা।'

এইভাবে ত অভিনয় চলেছে। 'সাজাহান'-এর সব সিনগুলিই তখন করতাম। যখন চতুর্থ অঙ্কের সেই 'দেবো লাফ দেই লাফ'-এর সিনটা হয়ে গেল, তখন শোনা গেল হুইসিল দিয়ে যতীনের সেই চারটের ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকছে। ও তো মরি-বাঁচি করে কোনক্রমে পোশাকটা বদলে হ্যাণ্ড ব্যাগটা হাতে নিয়েই দে ছুট। ট্রেনটা খড়্গপুরে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তাই রক্ষে, নইলে এইভাবে ছুটেও ও ট্রেন ধরতে পারত না। আমি বললাম—মুখের রঙ রয়ে গেছে যে।

তুলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। ব্যাগে সব আছে, ট্রেনে উঠে, তারপর রঙ তুলব। আমি চললাম।

ও ত গেল। কিন্তু 'জাহানারার' কি হবে? ও-পার্টটা যে আছে একেবারে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত। বস্তুত প্রথম অঙ্কে সাজাহানের দুটি দৃশ্য জাহানারার সঙ্গে। একটা না-হয় বাদ যাবে, কিন্তু শেষেরটা? যেখানে আওরঙ্গজেব এসে ক্ষমা চাইছে? আওরঙ্গজেব বললে—দাদা, ঐ সিনটা বাদ দেবেন না! আপনি বসে থাকুন, জাহানারা না-ইবা রইল, আমি এসে ক্ষমা চাই। আপনি আমাকে বুকে-টুকে যা জড়াবার জড়িয়ে ধরুন, বলুন—ক্ষমা করলাম। সেই সূত্র ধরে—তেড়ে—ঢুকে পড়ুক জহরত—কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করি নাই ঘাতক!

তাই হলো। ভাঙলো থিয়েটার। একটু একটু আলো ফুটলেও আবছা অন্ধকার। আলো সব নিবিয়ে দিচ্ছে। গালের চাপ দাড়ি ত টেনে ছিঁড়ছি, কিন্তু তেল চাই রঙ মুছবার। সাজঘরে কেউ নেই, যে-যার চলে গেছে, ড্রেসাররা ড্রেসগুলি বাক্সে বন্দী করে ফেলছে। তারা ব্যস্ত! তেল কই? কেউ কিছু জানে না। বাবুদের দেখা নেই। বৃন্দাবনও নেই। এইবার বাড়ি যাবার পালা। কেমন যেন সন্দেহ হলো, ফিরে যাবার গাড়ি-ভাড়ার টাকা বৃন্দাবনের কাছে নেই, ও বোধহয় সে সবের তদ্বিরেই গেছে। এদিকে সাজঘরটা ফাঁকা। তেল খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা শিশি পড়ল হাতে। সামান্য একটু তলানি পড়ে আছে—রঙ দেখে মনে হলো, বোধহয় সরষের তেল। শেষকালে সরষের তেলে মুখ মুছতে হবে? তা-ই সই। বলে যেমন সেই তেল হাতে ঢেলে মুখে মেখেছি, অমনি মুখখানা যেন একেবারে জলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র গন্ধ এসে ভক করে নাকে লাগল। বুঝলাম—

এটি তেল নয়, মদ্য। বিলিতী। কেউ লুকিয়ে পান করবার জন্যে এনেছিল, সবটা শেষ করবার আর সময় পায়নি আর কী!

ইতিমধ্যে বৃন্দাবন এসে পড়েছে। তাকে ডেকে বললাম—এই দেখ, কী হলো।

সে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে এলো কোথা থেকে। বললে—এটা দিয়ে মোছ। এর পরে কোয়ার্টারে গিয়ে একেবারে চান করে ফেলবে।

কাগজের টুকরোয় আর কী উপকার হবে। অগত্যা ঐ কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে চানটান করে শুদ্ধ হওয়া গেল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। শরীর বেশ ক্লান্ত। বৃন্দাবন বললে—শুয়ে নাও। তারপরে, অনেক ট্রেন আছে, যেটা হোক ধরা যাবে।

ঘুম থেকে যখন উঠলাম, তখন নটা বেজে গেছে। দেখি, বৃন্দাবন মাটির হাঁড়ি, চাল, ডাল, এসব নিয়ে এসেছে। বললে—চাপিয়ে দি। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে তার পরে রওনা হওয়া যাবে'খন।

—চাপাবে কী হে? উদ্যোক্তারা কোথায়?

বৃন্দাবন চুপ।

বললাম—ব্যাপারটা কী বলো ত বৃন্দাবন? গাড়িভাড়া পাওনি, এখনো না?

ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছি। কিন্তু সে লজ্জা ঢাকবার জন্যে ও একটু উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—আরে, ওসব ভাবছ কেন? ও ঠিক পাওয়া যাবেই। ভদ্রলোকের ছেলেরা—

ভাতে ভাত আর মাছের ঝাল করল বৃন্দাবন। বৃন্দাবন রাঁধে ভালো, খেলাম যেন অমৃত। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর শোওয়া নয়, না-হয় স্টেশনে গিয়েই বসে থাকবো। তুমি রওনা হবার চেষ্টা দেখো।

কিন্তু বৃন্দাবনের সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে-হতে বিকেল হয়ে গেল। বিকেলের গাড়িতে উঠে কলকাতা যখন পৌঁছলাম, তখন সাড়ে সাতটা-আটটা। খড়্গপুরের এই 'মঞ্চোপরি যাত্রা' কখনো ভুলবার নয়।

কিন্তু যে-কথার সূত্র ধরে এত কথায় এসে পড়লাম, সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক আবার। 'বিসর্জন' মহড়ার জন্য প্রস্তুত হতে-হতে আমাকে অন্য এক মত্ততায় পেয়ে বসল। ঐ যে মাদ্রাজ থেকে চিত্রনাট্য-লেখা-শেখার বই কিনে এনেছিলাম, তাতে একটা গল্পের চিত্রনাট্য দেওয়া ছিল। সেটা পড়ে মনে হলো, আমি একটা ঐরকম চিত্রনাট্য লিখেই ফেলি না! কিন্তু কী গল্প ধরে এটা করা যায়? 'বিসর্জন'ই তখন মাথায় ঘুরছিল, ভাবলাম, ঐ 'বিসর্জন'-এরই চিত্রনাট্য করে ফেলা যাক। তাই শুরু করলাম। এতে এমন নেশা চেপে গেল যে, রোজকার বই-এর দোকানে ঘোরা, এমনকি নিয়মমতো ক্লাবে আসাও ঘটত না। প্রফুল্ল ত তখন রোজই ক্লাবে আসছে। সে বললে—হলো কী তোমার? দুদিন কামাই? কী কাজ? প্লে করতে গিয়েছিলে?

—না-না, সেসব নয়।

—তবে?

চুপি চুপি বললাম তাকে সব। সে ত শুনে অবাক! বললে—চিত্রনাট্য লিখে ফেলেছ! কী করে? বললাম—শিখেছি।

—বটে! দেখাও না একদিন? দেখি, হয়েছে কেমন জিনিসটা?

বললাম—দেখাবো নিশ্চয়ই। কিন্তু, যে হাতের লেখা, তার ওপর তাড়াতাড়ি লিখেছি জড়িয়ে গেছে। ওটা আগাগোড়া টাইপ করাতে হবে।

—বেশ ত, টাইপ করে নিলেই ত হয়।

টাইপ অবশ্য আমি তখনো পারি। ভুলিনি। প্রফুল্ল তখন কাজ করছে 'প্রাণ-কিষেণ টি'র অফিসে, দশ নম্বর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে। বেন্টিক স্ট্রীট দিয়ে ঢুকতে হয়। সে হচ্ছে ১৯২০ সালের বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট—সরু রাস্তা—তখনো ও অঞ্চলটা ভাঙেনি। ডি. গুপ্তর বাড়ির পাশ দিয়ে উত্তরমুখো যেতে গেলে বাঁদিকে যেখানে এখন প্যারাডাইস সিনেমা—তার কাছাকাছি ছিল স্যাভয় থিয়েটার। ঠিক থিয়েটার নয়, একটা স্টেজ ছিল—তাতে মোটামুটি হালকা অভিনয় আর নাচগান হতো—অডিটোরিয়াম, টেবিল সাজানো—তাতে খাবার সার্ভ করে যাচ্ছে—মদ্যপানই বেশী হতো সেখানে—দর্শকরা পানভোজনও করছে, নাচগানও দেখছে। গোরার দলই বেশী যেতো, ফিরিঙ্গী বারবিলাসিনীদের জটলাও ছিল। রাস্তার ওপরে একটি ফটোগ্রাফারের দোকান—তার পাশ দিয়ে সরু গলি—এত সরু যে পাশাপাশি দুজনে মাত্র কায়ক্লেশে যেতে পারে। সেই গলির ভিতরে থিয়েটার, বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই। আর ছিল ও অঞ্চলের পূর্বদিকে—সারি সারি সব রঙের দোকান, যা এখন ধর্মতলা স্ট্রীটে উঠে গেছে। তারপরে চীনেদের দোকান সেই লালবাজার পর্যন্ত। চীনেপট্টির জুতো শুধু নয়, রকমারী সব ছবি আর বাঁশের জিনিস। সাহেবরা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সব কিনত দেখতাম। আর ছিল চীনে চাটনী, মোরব্বা। চীনেমাটির জার সুদ্ধ বিক্রি হতো।

এসব অঞ্চল দিয়েই প্রফুল্লর কাছে গেলাম। সে বললে—এনেছিস? দে।

দিলাম। ও নিজেই বসে বসে টাইপ করা শুরু করে দিলো, ওর কাজের চাপ পড়লে আমিও করতাম। ও অফিসের মালিক ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—আমাদের সাহিত্যিক শৈলজানন্দের শ্বশুর। বীরভূমে বাড়ি—জমিদারী আছে, তার নাম বাসন্তী এস্টেট। ওঁরা বোধ হয় দেবী বাসন্তীর খুব ভক্ত ছিলেন। জাঁকজমক করে বাসন্তী পুজো করতেন। ছেলের নামই রেখেছিলেন বাসন্তী। বাসন্তীবাবু আমাদেরই সমবয়সী হবেন। তিনি টাইপ করা চিত্রনাট্য দেখতে দেখতে খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন কাজটার প্রতি। ওদিকে প্রাণকৃষ্ণবাবু নিজেও খুব সাদাসিদে লোক। অনেক কলিয়ারী ছিল—তখনকার 'জোট-জানকী কলিয়ারী' ত ওঁদের নিজেদেরই ছিল। আর পেতেন বহু কলিয়ারীর

নিম্নস্বত্ব—যাকে বলে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাইটের রয়্যালটি। প্রাণকৃষ্ণবাবুকে নানাভাবে লোকে ফাঁকি দিয়েছে। কোনো অভাব ওঁর ছিল না, তবু ওঁর মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছিল চায়ের ব্যবসার ব্যাপারটা। বাড়ি নিলেন ব্যবসার জন্য, মোটা মাইনে দিয়ে চায়ের 'টেস্টার' রাখলেন, আর কী বিজ্ঞাপনই না দিতেন! চারিদিকে তখন 'প্রাণকিষেণ টী'র নাম! তবু ওই চায়ের ব্যবসা করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওঁর কাছেও পেলাম উৎসাহ। দেখতে দেখতে টাইপ করা একদিন শেষ হয়ে গেল। প্রফুল্ল ভালো করে আগাগোড়া পড়ে নিয়ে বললে—বেশ হবে হে! কিন্তু এর এখন কী গতি করা যায়? যেভাবে লেখা হয়েছে সেভাবে এখন ছবি হয়ে চোখের সামনে না দেখা দিলে এর সার্থকতা কী? কী করা যায় বলো তো?

শুরু হলো যুক্তি আর পরামর্শ। থিয়েটার তখন মাথায় উঠে গেছে, 'বিসর্জন'-এর মহড়া কোথায় উবে গেল। এখন চেষ্টা হলো কী করে একে সিনেমার পর্দায় দেখানো যেতে পারে।

ওর অফিসে বসেই এসব জটলা হতো। রোজ ট্রামে যাওয়া-আসা করবার পয়সা নেই। যাবার সময় আমি এতটা পথ হেঁটেই যেতাম, আসবার সময় শুধু প্রফুল্লর সঙ্গে ট্রামে। আমার জন্য ওর বাড়তি খরচা হতো বোধ হও পয়সা চারেক। সে-ও এক বুদ্ধি বার করেছিল ও। ও করত কী, যাবার সময় এসপ্লানেডের টিকিট না কেটে বাগবাজারের টিকিট করত কালিঘাট থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত দুআনা, আর বাগবাজার পর্যন্ত দশ পয়সা। ওর অফিসের এক ভদ্রলোক আবার বাগবাজার থেকে আসতেন। তিনি কাটতেন বাগবাজার-টু-কালিঘাট। প্রফুল্লর অসমাপ্ত যাত্রার দরুন টিকিটের অংশটুকু নিতেন তিনি, আর তাঁর অসমাপ্ত যাত্রার দরুন অংশটুকু প্রফুল্ল নিতো আমার জন্য। তখন ট্রামে ভায়া এসপ্লানেড কোথাও যেতে গেলে ঐ ধরনের ট্র্যান্সফারেবল্ টিকিট পাওয়া যেতো।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শলাপরামর্শ করে এই সাব্যস্ত হলো যে, টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে যে-সব ফিল্ম কোম্পানীর নাম পাওয়া যাবে তাদের এক-এক করে চিঠি লিখতে হবে।

প্রথমে লিখলাম চিঠি—ইণ্ডিয়া ফিল্মসকে। তাদের ম্যানেজার কলিন্‌স্ সাহেব। উত্তর দিলেন। লিখলেন—এসে দেখা করো।

বলা বাহুল্য, অভূতপূর্ব উদ্দীপনায় ভরে উঠল মন। কিন্তু কে যাবে দেখা করতে? প্রফুল্ল বললে—তুই-ই যা।

অগত্যা আমিই গেলাম। সাহেব বসতে বলে প্রশ্ন করলে—তোমাদের চিঠি পেয়েছি। কিন্তু কী করতে চাও?

—ফিল্ম করতে চাই। গল্প আছে। শুনবে?

সাহেব বললে—শুনে কী করব? ফিল্ম প্রোডাকশন ত আমরা করি না! যদিও কোম্পানীর

নামের নীচে—ডিস্ট্রিবিউটর, ম্যানুফ্যাকচারার—এ সব লেখা আছে, তবু আসলে আমরা—ডিস্ট্রিবিউটার।

সাহেবের কথা শুনে আমার সাধারণ ওয়াচমেকারদের কথা মনে পড়ল। ছোট্ট খুপরির মতো হয়ত ঘর, বসে বসে একটি লোক একমনে ঘড়ি সারাচ্ছে, সাইনবোর্ডে লেখা আছে—ওয়াচমেকার।

আসলে ঘড়ি সারায়, ঘড়ি তৈরি করে না। ঘড়ি তৈরির ব্যাপার একটি মস্ত জিনিস্।

বললাম—সাহেব, এখানে কারা ছবি করে? বললে—কেন, ম্যাডান করে।

আর কিছু বললাম না। ম্যাডানের ছবি দেখেছি। তেমন উৎসাহিত হবার মতো নয়। ফিরে এলাম। আমার অপেক্ষায় অফিসের দরজার গোড়ায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছিল প্রফুল্ল, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—কী হলো?

—হলো না।

বললাম সব ওকে। এরপর চিঠি লিখলাম অরোরা ফিল্ম-কে। যথারীতি উত্তর এলো—এসে দেখা করো। ৪১ নম্বর কাশীমিত্র ঘাট স্ট্রীট। অনাদিবাবুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম চাক্ষুষ আলাপ। অনাদিনাথ বসু। আমার থেকে বয়স বেশী—আমার চাইতে সাত-আট বছরের বড়ো হবেন। বললেন—কী করতে চান?

—ছবি। গল্প আছে।

মনঃসংযোগ সহকারে দেখতে লাগলেন আমাকে! বললেন—ছবি ত আমি তৈরি করি। তবে আপনাকে ত দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আধুনিক।

—আধুনিক মানে? কী বলছেন, ঠিক—

বলে উঠলেন—না, মানে—আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোক।

দেখলাম, ওঁর কথাবার্তার ঢংটাই আলাদা। কৌতূহল হলো। কিছুটা আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লাম ওঁর ব্যাপারে! বললেন—আমাদের ছবি কি আপনার পছন্দ হবে? দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।

লোকজন ডাকলেন। বড়ো-বড়ো লাটাইয়ে ফিল্ম গুটিয়ে গুটিয়ে রাখা আছে। বললেন—'রত্নাকর' তুলছি। চুনীলাল দেব সেজেছেন দস্যু রত্নাকর, আর সঙ্গে আছে মনমোহন থিয়েটারেরই—শশীমুখী

দেখালেন দু'একটা রীল। বললেন—আরও তোলা হবে। এখনো কমপ্লিট হয়নি।

তখন থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো দৃশ্য ফিল্মে দেখানো হতো। যেমন, মনমোহনে মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' নাটকে—সমুদ্রের ধারে লঙ্কার প্রাসাদের প্রাকারে উঠে রাবণ চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করছেন—এই ধরনের সব দৃশ্য। অপরেশচন্দ্র যখন স্টারে "চন্দ্রশেখর" করলেন, তখন তার মধ্যে কিশোর প্রতাপ ও বালিকা শৈবলিনী গঙ্গায় সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। এবং এই বিখ্যাত দৃশ্য—গঙ্গায় ডুবে মরতে চলেছেন শৈবলিনী আর প্রতাপ—চন্দ্রশেখর নৌকায় তুলে উদ্ধার

করলেন—এ সবও ফিল্মে দেখানো হতো। অনাদিবাবুই তুলেছিলেন। থিয়েটারের মধ্যে ফিল্ম দেখানোর প্রথা প্রথম চালু করেছিলেন কিন্তু অমরেন্দ্র দত্ত।

অনাদিবাবু এসব ফিল্মও দেখালেন, বললেন—দেখুন, এসব কি পছন্দ হয় আপনার?

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের বড়ো সাদাসিদে কথা, ঘোরপ্যাঁচের কথা নেই। এর সঙ্গে কারবার করতে পারলে ভালোই হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ছবি যেরকম দেখলাম, তাতে ঠিক পছন্দ হলো না। আমার কল্পনায় তখন ভেসে বেড়াচ্ছে বড়ো-বড়ো সব বিদেশী ছবির রূপ, এতে আমার মন উঠবে কেন?

ওঁর সাদাসিদে কথার উত্তরে আমিও সাদাসিদেভাবে বললাম—আমি একা নই, আমার এক সহকর্মী আছে। তাকে গিয়ে জানাই। যদি মত হয়, দুজনেই আসব সাতদিনের মধ্যে। আর যদি মত না হয়, ত কিছু মনে করবেন না, আমি আর আসব না।

—খুব ভালো কথা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা আলাপ-আলোচনাদি করে সেদিন চলে এসেছিলাম। পরে অনাদিবাবুর সঙ্গে এই আলাপই যখন ঝালিয়ে নিয়ে অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, সে অন্তরঙ্গতা বজায় ছিল তাঁর মহাপ্রস্থান পর্যন্ত। দুজনে পরস্পরের জীবনের সঙ্গে যে কীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলাম, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! এক এক-জনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, কী-সব শুভ মুহূর্ত, সঙ্গে সঙ্গে যেন উভয়ের যোগসূত্রের ভবিষ্যৎও নির্ধারিত হয়ে যায়! অনাদিবাবু কথা বলেন—সাদাসিদেভাবে—কঠোরও নয়—কোমলও নয়। সাহেব নয়—সাজসজ্জায় আর অন্তরে—একেবারে বল্লালী। ধুতি-চাদর পরতেন, পানদোক্তা খেতেন। আলাপী, অহঙ্কারী নন।

প্রফুল্লকে এসে জানালাম—না ভাই হলো না।

অগত্যা, ম্যাডান কোম্পানী। চিঠি গেল। যথারীতি উত্তরও এলো—দেখা করো।

ওঁদের কর্ণধার তখন রুস্তমজী ধোতিওয়ালা—জে. এফ্. ম্যাডান সাহেবের জামাতা। ম্যাডান সাহেব সকালে একবার অফিসটা টহল দিয়ে ঘুরে যান, বসেন না অফিসে, বৃদ্ধ হয়েছেন। কাজকর্ম দেখেন এই রুস্তমজী সাহেব। খুব কর্মঠ ব্যক্তি ইনি, ব্যবহারিক বুদ্ধি নিদারুণ, স্মরণশক্তিও অদ্ভুত! মানুষ চেনবার ক্ষমতাও অসাধারণ। ইতিপূর্বেই এঁর সঙ্গে আমার দু তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছে। ম্যাডানের বিশেষ বন্ধু ছিলেন প্রিয়নাথ মল্লিক মশায়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন ভবানীপুরের। এঁকে ম্যাডানরা খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমরা যখন ক্লাব থেকে ওঁদের কোরিন্থিয়ান মঞ্চে 'সরলা' ও 'তুফানী' থিয়েটার করতে যাই, সেই সূত্রে সর্বপ্রথম আমি গিয়ে দেখা করি এই রুস্তমজীর সঙ্গে প্রিয়নাথবাবুর চিঠি নিয়ে। তখন কোরিন্থিয়ানে সপ্তাহের ছ' দিনই প্লে হতো, প্রতিদিন রাত সাড়ে নটায়, আর রবিবারে—ম্যাটিনী চারটেয়—একটাই শো। বন্ধ থাকতো শুক্রবার—জুম্মাবার বলে। সাহেব আমাদের শুধু শুক্রবার অভিনয় করবার অনুমতিই যে দিলেন তা নয়, অধিকন্তু

একটি পয়সা ভাড়া পর্যন্ত নিলেন না, প্রিয়বাবুর চিঠির খাতিরে। আমাদের এই প্লের ব্যাপারে—স্টেজ রিহার্সাল—অভিনয়ে কি কি লাগবে তার ফর্দ—এই সব নিয়ে দেখা করেছিলাম রুস্তমজীর সঙ্গে, প্লের পরেও প্রিয়নাথবাবুর ধন্যবাদ-জ্ঞাপক চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য কর্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে এ কয়টি সাক্ষাৎকারের ফলেই মানুষকে মনে রাখা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না, তবু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, রুস্তমজী আমাকে মনে রেখেছেন। বললেন—হ্যালো, তুমি? ভাবলেন, আবার বুঝি স্টেজ-সংক্রান্তই কোনো কথাবার্তা কইতে এসেছি। বললাম—সাহেব, তোমাদের চিঠি। ওটা পেয়েই এসেছি। চিঠিটা হাতে নিয়েই সব বুঝতে পারলেন সাহেব, বললেন—চিঠি তবে তোমাদেরই! কি ব্যাপার বলো ত?

বললাম—টেগোরের 'স্যাক্রিফাইস'টার সিনারিও করেছি, সেটাকে যদি তোমরা ফিল্ম করো, সে উদ্দেশ্যেই এসেছি।

অন্য কোনো গল্প হলে সাহেবের কী প্রতিক্রিয়া হতো বলা যায় না, হয়ত বলে বসতেন—আমাদের সব গল্প আছে, সেসবই আমরা করি, নতুন গল্পে আমাদের দরকার নেই! কিন্তু, এ হচ্ছে টেগোরের গল্প, শুনে সাহেবের চোখ দুটো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলে উঠলেন—সত্যি! নিশ্চয়ই আমরা করব।

সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে বললেন, ফ্রামজী সাহেবকে ডেকে দিতে।

ম্যাডান সাহেবের বড় ছেলে—বার্জোর্জী সাহেব—রুস্তমজীর সামনের টেবিলেই বসতেন—তাঁর সহকারী হয়ে কাজ করতেন। মেজো ছেলে, ফ্রামজী ম্যাডান, ইয়োরোপ-টিয়োরোপ ঘুরে বায়োস্কোপের সব-কিছু শিখে এসেছেন। তিনিই হচ্ছেন ম্যাডানদের সিনেমা এক্‌স্‌পার্ট। এ হেন ফ্রামজী ত এসে দাঁড়ালেন ঘরের ভিতরে। ওঁদের পার্শী-গুজরাতী ভাষায় রুস্তমজী ওকে কী কী যেন বললেন আমাকে দেখিয়ে। তারপরে আমাকে বললেন—তুমি যাও, এঁর সঙ্গে কথা কও। ইনিই আমাদের সিনেমা বিভাগের কর্তা।

ফ্রামজী থাকতেন পাঁচ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটেরই ম্যাডানদের বাড়িতে, তবে ওপর তলায়। সেখানেই ওঁর অফিসঘর। পরে জেনেছিলাম, ম্যাডানদের সমগ্র পরিবারই থাকত ওপর তলায়। মহলের পর মহল ভাগ করা আছে এক-একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য। তবে, ভাগ হলে কী হবে, কী দিনে কী রাতে, খাওয়া-দাওয়া সব একসঙ্গে—এক টেবিলে। বৃদ্ধ বসবেন—বৃদ্ধা বসবেন—ছেলেরা বসবেন—পুত্রবধূরা বসবেন—জামাই বসবেন—কন্যা বসবেন—পৌত্রপৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা বসবেন, সব একসঙ্গে খাওয়া।

এদিকে ফ্রামজীর সঙ্গে ওপরে যাবো বলে চেয়ার ছেড়ে সবে উঠেছি, এমন সময় কানে এলো রুস্তমজী বলছেন—গল্পের রাইট্‌টা কিন্তু তোমাকে এনে দিতে হবে।

রাইট্‌! মাথাটা যেন ঘুরে গেল। রাইট্‌ আবার কী! ওটা ত খেয়াল ছিল না! নাটক

করছি, এর কোনো রাইট্ নেই, রয়্যালটিও নেই—ভেবেছিলাম, এ-ও হয়ত তাই। কিন্তু, এখন এ আবার কী শুনছি? একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলাম—আচ্ছা, দেবো। বলে ওপরে গেলাম ফ্রামজীর সঙ্গে। বহু আলাপ-আলোচনা হলো ছবি তোলার ব্যাপার নিয়ে। সাহেবকে ত দেখলাম, খুবই উৎসাহী। সরল প্রকৃতির লোক বলেই মনে হলো। ওঁর মতো আমি ইয়োরোপে যাইনি, তবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিলিতী ছবি দেখতাম প্রচুর, যে-সব সস্তা বিদেশী ম্যাগাজিন তখন ফিল্ম-সংক্রান্ত আসত, সে সবও পড়তাম। সুতরাং, কথাবার্তায় হটবার পাত্র আমি নই। সাহেবের কথার পৃষ্ঠে ঠিক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি। সাহেব বুঝতে পারলেন—লোকটি ফালতু নয়, কাজ জানে। তাই, উঠে ড্রয়ার থেকে বার করলেন একরাশ 'লবি কার্ডস'। সিনেমা-হাউসের লবিতে যে-সব ছবি—অর্থাৎ ষ্টীল ফটো সাজানো থাকে—সেসব দেখাতে লাগলেন আমাকে। বললেন—দেখ, কী সব ছবি করেছি আমরা! সুন্দর না?

গর্ব করেই দেখাচ্ছিলেন। অবশ্য গর্ব করার মতো ব্যাপার যে না ছিল, এমন নয়। গর্ব করার ব্যাপার ছিল—কয়েকটি ইটালিয়ান অভিনেত্রী ও অভিনেতার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ! ফোটোগ্রাফীও ভালো। এই সব ইটালিয়ান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখানে এসে ওঁর প্রোডাকশনে কাজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, অনেক অর্থ ব্যয় করে ফ্রামজী 'সাবিত্রী' বলে একখানা ছবি খাস ইটালী দেশে তৈরি করিয়েছিলেন। এবং কতকগুলি ইটালিয়ান অভিনেতা-অভিনেত্রীকে এদেশে নিয়েও আসেন। তাঁদের এখানে রেখে অভিনয় করাতেন। এবং ইটালিয়ান ক্যামেরাম্যান পর্যন্ত ছিল, তিনি ক্যামেরাম্যানও ছিলেন—ডাইরেক্টারও ছিলেন, নাম—লেগুরো সাহেব। এঁর বাবা ছিলেন কাউন্ট লেগুরো—সে দেশের নাম-করা প্রযোজক। তাঁর কাছে কাজ শিখেছিলেন এই লেগুরো সাহেব। সেইজন্য ওঁর তোলা ছবি-টবিগুলো ভালোই হয়েছিল। ওঁর তোলা ছবি 'শিবরাত্রি' তখন বেরিয়েছে। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এই 'শিবরাত্রি'। এতে ব্যাধ আর ব্যাধপত্নী যা সাজানো হয়েছিল, এদেশে তখন তা অকল্পনীয়। ব্যাধের কোমরে হাঁটু পর্যন্ত একটা বাকলমাত্র, মাথায় পালক। আর ব্যাধ-পত্নীরও অনুরূপ স্বল্পপরিসর পোশাক। ঐ হাঁটু পর্যন্ত বাকল, বক্ষদেশ একটা বাকলে ঢেকে আছে, মাথায় পালক-টালক দেওয়া, যে সেজেছিল তার রূপ কী! কী অদ্ভুত তার দেহের গড়ন! এর স্বামীই সেজেছিলেন ব্যাধ। দুজনেই অসাধারণ রূপসম্পন্ন। যে ইটালিয়ানটি শিব সেজেছিলেন, তাঁকেও মানিয়েছিল চমৎকার। এসব কারণে তখনকার 'শিবরাত্রি' একটা 'হিট্' ছবি হয়েছিল।

ফ্রামজী বললেন—কিছুদিন পরেই আমাদের নতুন তোলা ছবি 'নলদময়ন্তী' দেখানো হবে এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে। পাবলিক শো নয়। আমরাই দেখব রাফ্ প্রিণ্ট। তুমিও ঐদিন এসো, দেখবে। কেমন?

বললাম—কিন্তু সাহেব, আমার যে একজন সহকর্মী আছে।

—বেশ। তাকেও নিয়ে এসো।

বললাম—তোমরা ত প্রাইভেট শো দেখবে, সেখানে আমাদের ঢুকতে দেবে কেন?

—দেবে।

আর কিছু বললেন না। মনটা ততক্ষণে কিন্তু মত্ত হয়ে উঠেছে। তাহলে কি সিনেমার স্বপ্ন আমাদের সফল হতে চলেছে!

এঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। এঁরা ধনী লোক, ছবি তোলার ব্যবস্থাও অনেক আছে। শুধু একটা কাঁটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করছে—রাইট্টা এনে দিতে হবে।

ভাবছি, রাইট্ কি সত্যিই এনে দিতে পারব না? যদি না পারি, তাহলে কি এত শ্রম, এত চেষ্টা, এত আগ্রহ, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

'বিসর্জন'-এর রাইট-সংগ্রহের জন্য কাকে ধরা যায়? তখনকার সুকিয়া স্ট্রীটের ওপর নামকরা প্রেস ছিল—কান্তিক প্রেস। তার ওপরতলায় ছিল প্রধানত 'ভারতীগোষ্ঠী'র সাহিত্যিকদের আড্ডা। শুনলাম সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে ধরলে এর একটা সুরাহা হতে পারে। কিন্তু কেমন ক'রে তাঁকে গিয়ে ধরি? তাঁকে ত চিনি না। আমাদের এক বন্ধুর কাকা—বরদা সেন, তাঁর যাতায়াত ছিল ঐ আড্ডায়। তাঁর সঙ্গে একদিন আমিও গেলাম, দেখা করলাম মণিলালবাবুর সঙ্গে। মণিলালবাবু বললেন—কবি এখন বিদেশে, ইয়োরোপ ভ্রমণে গেছেন। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ত কিছুই হবে না! কারণ সিনারিও কী করছেন আপনি, সেটা ত তাঁকে একবার দেখাতে হবে!

ফিরে এলাম কিছুটা হতাশ হয়েই। সব শুনে প্রফুল্ল মুখে কিছু না বললেও ভিতরে-ভিতরে দমে গেল। গেল কেটে বিশ সালের বাকি দিনগুলি। রুস্তমজী সাহেবকে গিয়ে বলে এলাম—কবি দেশে না ফিরে আসা পর্যন্ত রাইটের ব্যাপারে কিছু করা যাবে না। রুস্তমজী শুনলেন কথাটা, কিন্তু আলাপের সূত্র তবু ছিন্ন করতে চাইলেন না, সামনের একটা তারিখ উল্লেখ করে বললেন—নলদময়ন্তী দেখানো হচ্ছে ঐদিন। তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসো কিন্তু দেখতে।

গেলাম দুজনে। ১৯২১ সালের গোড়ার কথা ওটা। গিয়ে দেখি, ম্যাডানের সব সাহেবরাই এসেছেন, অভিনেতৃবর্গও এসেছেন। ছবি দেখানো শেষ হলো। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলে বলো?

—ভালোই।

এমনিতে ভালো না বলার কিছু ছিল না, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছিল ছবির পটভূমি নিয়ে। নলদময়ন্তীর গল্প—নিঃসন্দেহে পৌরাণিক ছবি। কিন্তু পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীদের পারিপার্শ্বিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ওঁকারমল জেঠিয়ার বাগানবাড়ির মার্বেল মূর্তিগুলি, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্যালেসের ভেনিসীয়ান ফোয়ারা—ইটালিয়ান মূর্তি, আর বড়ো বড়ো কোরিন্থিয়ান থাম!

এই পরিবেশে নলদময়ন্তীকে দেখতে বিসদৃশই লাগল। প্রফুল্লকে জনান্তিকে বললাম—আমাদের বিসর্জন এই রকম হবে নাকি রে?

প্রফুল্ল বললে—না না, তা কেন! আমরা বলব, আমরা এইসব থাম আর ফোয়ারা আর পরী চাই না। ওদের বললেই ওরা শুনবে। অসুবিধা হবে কেন?

প্রফুল্ল একথা বললেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, ছবিকে আরও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য ওরা এসব করবেই। ওদের সেটই হচ্ছে এই রকম। ওরা কার্যকালে আমাদের পরামর্শ কানে নেবে কি? কিন্তু সে যাই হোক, রাইট না পাওয়া পর্যন্ত যে কোনো পথ নেই! যে উদ্যম আর উদ্দীপনা নিয়ে কাজে এগিয়েছিলাম, তাতে যে ভাঁটা পড়ে যাচ্ছে! চুপচাপ বসে থাকাও যে এখন অস্বস্তির ব্যাপার।

প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত বললে—একটা কাজ কর না!

—কী?

বললে—রেখে দে এসব ঝামেলা! তুই নিজে একটা গল্প বানিয়ে নে না!

—গল্প!

—হ্যাঁ।

—বলছিল্ কী তুই!

—বলব আবার কী! এই ত কতো যাত্রার বই-টই এডিট করিস, একটা গল্প আর বানাতে পারবি না!

প্রস্তাবটা অভিনব। উৎসাহিত হবারই কথা। কিন্তু তবু বললাম—গল্প বানালেই বা সাহেবরা নেবে কেন? ও ছিল বিশ্বকবির 'বিসর্জন', জানে যে চাইলেই পাবে না, তাই ওরকম লাফিয়ে উঠেছিল! আমাদের নিজেদের গল্প শুনলে কি আর সে উৎসাহ দেখাবে?

প্রফুল্ল কোনো উত্তর দিলো না।

মনমরা হয়েই আছি দু'বন্ধুতে। আছি, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা চেষ্টা আমার চলতেই লাগল। তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ভারতীয় শিল্পকলার ওপর কিছু কিছু বই পড়েছিলাম, আর অবনী ঠাকুরদের ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির এগজিবিশন দেখতাম, আর দুপুরের দিকে দুরন্ত কৌতূহল নিয়ে জাদুঘরে ঘুরতাম। বেকার লোক, এসব ঘোরাঘুরি ছাড়া কাজই বা আমার তেমন ছিল কী? প্রফুল্লকে একদিন বললাম—দেখ, পৌরাণিক পটভূমিকা কেন, আমি বোধ হয় নতুন গল্পই তৈরি করতে পারব।

—পারবি!

—হ্যাঁ।

—দেখ্।

মনের মধ্যে কেন জানি না ঐসব ঐতিহাসিক পটভূমিকাই ছায়াপাত করে যাচ্ছিল ক্রমাগত। তাই, ক্রমশঃ ভাবতে ভাবতে ঐতিহাসিক পটভূমিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠল গল্প। ধীরে ধীরে ছকেও ফেললাম। এসব করতে করতে মাস দুয়েক কেটে গেছে। প্রফুল্লকে গিয়ে বললাম—মোটামুটি একটা গল্প তৈরি হয়েছে।

—কই?

অবাক হয়ে বললাম—কী, কই?

—সিনারিও?

বললাম—সিনারিও এখনো করিনি। গল্পটাই শুধু শোন। ঘটনাকাল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক। তক্ষশীলা নগরীর কথা। তক্ষশীলা তখন হিন্দু ও বৌদ্ধরাজ্য—নামকরা বাণিজ্যকেন্দ্র। ঐ শহরের পথ ধরেই পাহাড়ের শ্রেণী ডিঙিয়ে মধ্য এশিয়ায় যেতো ব্যবসায়ীদের ক্যারাভান। ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী যে সব ফিনিসিয়ান বন্দর ছিল সেখানে, তার সঙ্গে ছিল এই পথের যোগাযোগ। এই পথ দিয়ে আমদানি-রপ্তানি হতো প্রচুর দাস-দাসী। তক্ষশীলা তখন দাসব্যবসায়ের বিখ্যাত কেন্দ্র। তক্ষশীলায় তখন বহু বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন, যাঁদের 'বৈশ্যরাজ' বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। ওই রকম এক বৈশ্যরাজ ছিলেন বৃদ্ধ জয়পাল। জয়পালের একমাত্র পুত্র—যুবক ধর্মপাল। ধর্মপাল অবিবাহিত, কিন্তু বিলাসিতার সলিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বহু নারী পরিবৃত হয়ে দিন কাটাতো ধর্মপাল—আনন্দ উৎসব আর সম্ভোগের মধ্য দিয়ে কাটতো তার প্রতিদিনের মুহূর্তগুলি। বৃদ্ধ জয়পাল এতে বাধা দেন নি। ধর্মপালের একজন প্রিয় রক্ষিতা ছিল, সে থাকত তার জন্য নির্দিষ্ট উদ্যান-প্রাসাদটিতে। ঘটনার সূত্রপাত হলো সেই দিন থেকে, যেদিন ধর্মপালের পরিচিত একজন আরবজাতীয় দাসব্যবসায়ী ধর্মপালের কাছে নিয়ে এলো একটি সুন্দরী তরুণী মেয়েকে দাসী হিসাবে বিক্রয় করতে। পর্বতমালার পরপারে যে দেশ, তারই এক উপজাতীয় মেয়ে এটি। ধর্মপাল তাকে কিনে নিলো, মেয়েটি রয়ে গেল তার দাসীদের মধ্যে—বিলাস-প্রাসাদের অন্দরমহলে। কিন্তু মেয়েটি যে তার অসামান্য রূপ দিয়ে ধর্মপালের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এ সংবাদ ধর্মপালের সেই রক্ষিতার অগোচর রইল না। ধর্মপালের অলক্ষ্যে সে মেয়েটির প্রতি নানাবিধ অত্যাচার শুরু করে দিল। ধর্মপাল জানতে পারে না সে সব নিগূঢ় নির্যাতনের কাহিনী, সে ক্রমশই আকৃষ্ট হতে থাকে এই অলোক-সামান্যা রূপবতীর দিকে। উপজাতীয়া মেয়েটির ভাষা বোঝা যায় না, ধর্মপালের ভাষাও সে বোঝে না। তার ভাবভঙ্গিতে এইটুকু শুধু বোঝা যায়, সেও ধর্মপালের প্রতি সমান আকৃষ্ট হয়েছে। গভীর রাত্রে প্রাসাদ-উদ্যানে দুজনের দেখাও হয়েছে নিভৃতে। ধর্মপাল বুঝলো, তার জীবনে এযাবৎ যত নারী এসেছে, এ মেয়েটি সে রকমের নয়। রূপোপজীবিনী নয় মেয়েটি। আরও একটা জিনিস বুঝলো ধর্মপাল। এই যে সে এতো বিলাসের জীবন যাপন করে, এই যে সে মদ্যপান করে, মেয়েটি তা পছন্দ করে না।—মেয়েটির

নীরব নিষেধ ধর্মপালের কাছে দুর্বোধ্য থাকে না। আবার ওদিকে মেয়েটিও বুঝতে পারে ধর্মপালের মনোভাব, একে সে ধর্মপালের করুণা বলেই মনে করে এবং এই করুণা তার নির্যাতীত কষ্টকর জীবনে প্রধানতম অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে—দুজনের প্রতি দুজনে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু আকর্ষণই বাড়ে, সর্বতোভাবে মিলন ত তবু হয় না! ধর্মপাল ঠিক করলো, সবাইকে পরিত্যাগ করবে, মদ্যপান ছেড়ে দেবে, বিলাস-ব্যসন নির্মোকের মত ত্যাগ করবে। বিবাহ করবে সে।

শুনে সুখী হলেন বৃদ্ধ জয়পাল। বললেন—তাহলে পাত্রীর সন্ধান দেখি।

পুত্র বললে—মনোমত পাত্রী আছে।

—কে ?

—ওই দাসী।

ক্ষুণ্ণ হলেন জয়পাল। বললেন—তা হয় না। সামাজিক মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হবে। তুমি উপভোগের জন্য যে-দেশের খুশি, যতো মেয়ে খুশি রাখতে পারো কিন্তু বিবাহ একটা সামাজিক ক্রিয়া। এ হতে পারে না, কিছুতেই এতে আমি মত দিতে পারি না। পুত্র মিনতি করতে লাগল পায়ে ধরে! বৃদ্ধ সেই পায়ে-ধরা হাত ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন, শুনলেন না কোনো কথা। এবং এখানেই যে তিনি ক্ষান্ত হলেন, তা নয়। মেয়েটিকে তিনি গোপনে লোক দিয়ে চুরি করালেন। তাঁর আদেশে সেই লোকগুলি মেয়েটিকে সেই বিজন পর্বতমালায় ছেড়ে দিয়ে এলো।

তারপরে ধর্মপাল—যখন দেখতে পেলো না মেয়েটিকে, একেবারে চোখে যেন সে অন্ধকার দেখলো। মেয়েটিরই দুটো চোখের নীরব মিনতিতে সে মদ্যপানাদি ছেড়ে দিয়ে নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু হঠাৎ এ কী হলো! তারপরে, এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাছে শুনতে পেলো সব। কিন্তু কোথায়—কোথায় সে তখন ?

—ঐ পাহাড়ে।

বান্ধবীরা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে কতো লোভ দেখায়, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। অলিন্দ থেকে পর্বতমালার দিকে চেয়ে থাকে সে অনুক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে। কারুর কথা সে শুনলো না, কারুর বাধা সে মানলো না, পরদিন হস্তিপৃষ্ঠে তার প্রিয় ভৃত্যটিকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন গিয়ে নদীতীরে। নদীর ওপরেই পর্বতমালার শুরু। ধর্মপাল করলো কী, সব অলঙ্কার ভৃত্যের হাতে খুলে দিয়ে একা প্রবেশ করলো এই পর্বতমালায়। বুদ্ধের গৃহত্যাগের দৃশ্যের সঙ্গে মিল আছে এই দৃশ্যটির। তারপরে, শুরু হলো ঘোরা। পাহাড়ে-পাহাড়ে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়ালো। বেলা শেষে রাত্রি আসে, রাত্রি শেষ হয়, দিন আসে, দিনও শেষ হবার মুখে, অনাহারে অবসন্ন, পথচলায় ক্লান্ত, ধর্মপাল বসলো এসে এক বনস্পতির নীচে—একটা পাথরের ওপর।

কতক্ষণ বসে আছে কে জানে, হঠাৎ দেখতে পেলো ধর্মপাল, অদূরে বনরাজির আড়ালে কী যেন নড়ছে। মনঃসংযোগ করে বুঝলো, কোনো মানুষই হবে, অতি ক্লান্ত—পাহাড়ে আর উঠতে

পারছে না।—কোনো রকমে পাহাড়টাকে বেষ্টন করে চলে যাবার চেষ্টা করছে। ছুটে গেল ধর্মপাল। দেখল—সেই দাসী—তার প্রিয়তমা। তার দেহে আর শক্তিবিন্দুটুকুও অবশিষ্ট নেই। ধর্মপাল ছুটে এসে ধরলো তাকে, একেবারে কোলে তুলে নিলো। মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো তাকে। তার ভাষা ত অজানা। কিছু সে বলতেও পারলো না, নীরবেই একখানা হাত শুধু উর্দ্ধে তুললো, যেন বলতে চায়—চললাম। আবার দেখা হবে।

মারা গেল মেয়েটি।

প্রফুল্ল বেশ মন দিয়েই শুনল গল্প। বললে—খুব ভালো। কিন্তু মেয়েটি কে? কোত্থেকে এলো?

বললাম—সেটাও ভেবে রেখেছি। দেখাতে হবে ঐ পর্বতমালার পরপারে যে উপজাতীয়রা বাস করে, তাদেরই এক সর্দারের অধীনে থাকে একটি যুবক। মেয়েটি তারই বোন। সর্দারের সঙ্গে যুবকটি শিকারে যায়—যুদ্ধে যায়, আর মেয়েটি তার গৃহকর্ম করে। ঝরনায় জল আনতে গিয়ে জলে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করে, তারপরে ফিরে আসে কাঁধে কলসী বসিয়ে জল নিয়ে, তারপরে রান্না। মেয়েটি নিজের মনের আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে বেড়াতো প্রাণোচ্ছল পর্বতহরিণীর মত। কিন্তু, একদিন সে হঠাৎ পড়ে গেল প্রৌঢ় সর্দারের চোখে। সর্দার চাইল তাকে বিয়ে করতে। মেয়েটি ভয় পেলো। দাদা বোনের অবস্থা দেখে রাজীও হলো না এ প্রস্তাবে। সর্দার তখন তাকে বর্বরভাবে শারীরিক যন্ত্রণা দিতে লাগল। সে যন্ত্রণা বোন হয়ে চোখে দেখা যায় না। সর্দার মেয়েটাকে বললে—এখনো রাজী হও, নইলে ওকে একেবারে মেরেই ফেলব।

দাদা ঐ অবস্থাতেই বলতে লাগল—না, না, রাজী হয়ো না। প্রাণ যায়, সে-ও স্বীকার।

যন্ত্রণার বীভৎসতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো, দাদা আর সইতে পারল না, অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তাই দেখে বোন নতজানু হয়ে সর্দারকে বলতে লাগল—আমি রাজী হবো। ওকে বাঁচাও।

—বেশ। ওকে তুমি সেবা করে ভালো করে তোলো। আমরা কাছাকাছিই আছি। তবে শোনো, ওকে চলে যেতে হবে দল ছেড়ে। তুমি থাকবে, কিন্তু ওর থাকা হবে না। ওর তখন আক্রোশ জন্মাবে আমাদের প্রতি, হয়ে দাঁড়াবে শত্রু।

চলে গেল সর্দার তার দলবল নিয়ে। সেবা করতে করতে বোনটি অনেক রাত্রে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো দাদার। দাদা সব শুনেটুনে বললে—চল পালাই।

কিন্তু পালানো কি সোজা? চারিদিকে পাহাড় আর অরণ্য। সেটা জেনেশুনেই সর্দার ওভাবে ওদের রেখে যেতে পেরেছে। তবু তারা সেই উপত্যকা ছেড়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল প্রাণ হাতে করে। সে এক অদ্ভুত প্রাণান্তকর ব্যাপার। পর্বতের কন্দরের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথ বেয়ে ওরা এসে পড়ল শহরে যাবার পথে। সেটাই হলো কাল। দেখা হল একদল দাসব্যবসায়ীর সঙ্গে। সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে তারা ভাইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো বাজপাখির মতো। ভাই পড়ে রইল।

মেয়েটিকে নিয়ে তারা রাখল তাদের তাঁবুর মধ্যে। রাত্রে মেয়েটি ব্যবসায়ীদের একটা ঘোড়া খুলে নিয়ে পালালো। কিন্তু পালিয়েই বা সে কোথায় যাবে ? শহরের দিকে যেতে পারে না, ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়বে ; গ্রামের দিকেও যেতে পারে না, সর্দারের ভয় আছে। এইভাবে এদিকে খানিক গিয়ে, ওদিকে খানিক গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ঘোরা পথ ধরে যেতে গিয়ে পুনর্বার ধরা পড়ে গেল সেই দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা যাচ্ছিল তক্ষশীলার দিকে। বিলাসী ধর্মপালকে তারা জানত। তাই তারই কাছে গিয়ে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলো মেয়েটিকে।

আমি থামলাম। প্রফুল্ল বললে—আর দেরি করিসনি, সিনারিও করে ফেল।

—সিনারিও করে ফেল ! ছবি তুলবে কে ?

—দেখাই যাক না। তুই করে ফেল।

তাই হলো। করতে লাগলাম সিনারিও। মাস দুই লাগল কাজটা শেষ করতে। ভাবলাম, ম্যাডানদের কাছেও আর যাইনি, এবার গেলে কেমন হয় ? শোনাবো কি গিয়ে একবার ফ্রামজীকে ? ছবি তোলার যে সব ব্যবস্থা ওদের আছে দেখে এসেছি, তাতে করে ওরাই এ ছবি করতে পারে। কিন্তু, নতুন গল্প, এতে কি ওরা আগ্রহান্বিত হবে ? সাতপাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত আর গেলাম না ওদের কাছে। কিন্তু, করা যায় কি এবার ?

সে সময় 'ডু-কাস' (Du-Casse) বলে একটি সাহেব সিনেমার ব্যবসা করছে। কী জাত তা জানি না। যখনকার কথা বলছি, তারও আগে তিনি ব্যবসায়ে নেমেছিলেন অতি সামান্যভাবে। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি স্ট্রীটে যে কর্পোরেশন বিল্ডিং আছে, তার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা একতলা সিনেমা-হাউস নিয়ে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন—Bijou (বিজু) সিনেমা। এতে খুব ভালো ভালো ছোট ছবি দেখানো হতো। মেট্রো কোম্পানীর তোলা পাঁচ-ছ' রীলের ছবি। একটার নাম আজো মনে আছে —"বার্নট্ উইঙ্গস।" একটি বাতি জ্বলছে—আর তার চতুর্দিকে ঘুরছে রঙীন এক প্রজাপতি। সে আলোর কাছে আসে আবার সরে যায়। আবার আসে—আবার সরে যায়—আবার আসে। ওই করে করে এক সময় ডানা পুড়ে মরে যায় সেই প্রজাপতি। এই উপমা দিয়েই শুরু হয় একটি মেয়ের গল্প। তার করুণ পরিণতি। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অগ্নিশিখার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে পুরুষটির, প্রজাপতির সঙ্গে মেয়ের। পুরুষের রূপের নেশায় ঘুরে ঘুরে পুড়ে গেছে মেয়েটি।

যাই হোক, এই ডুকাস সাহেব এমন ব্যবসা শুরু করলেন যে, ম্যাডানদের বড়ো বড়ো ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তিনি ব্যবসাতে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনলেন। ছোট হাউসটি ছেড়ে ইনি গেলেন লিণ্ডসে স্ট্রীটের 'গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসে'। নাম দিলেন 'বিজু গ্র্যাণ্ড অপেরা'। এখানে কিছুদিন ব্যবসা চালিয়ে চলে এলেন, এখন যেটা 'টাইগার'—সেখানে, নাম দিলেন—পিকচার হাউস। এটি আগে ছিল গ্যেইটি থিয়েটার—এখানে অভিনয় হতো। এখানে বহুদিন সগৌরবে ও সদর্পে ব্যবসা চালিয়েছিলেন ডুকাস সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে একটা ডিস্ট্রিবিউশনের অফিসও করেছিলেন। আর

করেছিলেন ছোট্ট একটা ইংরেজ ও এক বাঙালীবাবু নিয়ে হাস্ত-পরিহাসের ছবি। দেখিনি, তবে শুনেছিলাম। ভাবলাম, ওদের লিখে দেখলে কেমন হয় ?

দিলাম চিঠি। উত্তরও এলো দু তিন দিনের মধ্যে ওদের অফিস থেকে। দুই নম্বর মার্কুইস স্ট্রীট, সই করেছেন চিঠিতে তাঁর ম্যানেজার—এইচ মুখার্জি। দেখা করো।

করলাম। সিনারিওটা বগলে আছে। দোতলায় উঠে দেখি—বেশ ফলাও অফিস—ফিল্মের স্টোর আছে—অফিস আছে। ম্যানেজারের খবর করতেই এক বেয়ারা এসে দেখিয়ে দিলে। একটা হলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ঘরে ঢুকে দেখি, মোটাসোটা গম্ভীর প্রকৃতির এক ভদ্রলোক বসে আছেন, বাঙালী হলেও, সাহেব। চুরুট খেতে-খেতে কাজ করছিলেন। পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও ইংরেজীতে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বসুন।

বসলাম। সাহেব কাজ করছেন, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরখানা দেখছিলাম। সারা ঘরখানা জুড়ে পত্রিকার স্তূপ সাজানো। দেখি, একটু দূরে বসে একটি ফিরিঙ্গী সাহেব একরাশ পত্রিকা দেখছেন। আন্দাজে বুঝলাম, সিনেমার পত্রিকা। সাহেব হাতের কাজ সেরে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন। একাই আমি গিয়েছিলাম—ধুতি চাদর পরা। বললাম—ছবি করতে চাই। সিনারিও করা গল্প আছে।

ভদ্রলোক ইংরেজীতেই বললেন—ছবি ত আমরা করি না।

—কেন ? ঐ যে এক, ন', দুই রীলের একটা ছবি করেছেন।

—হ্যাঁ, তা করেছি। ডুকাস সাহেবের একটা শখ ছিল, তাই।

হতাশ হলাম। ভাবলাম, তাহলে ডাকল কেন ? সেই ইণ্ডিয়া ফিল্মের মতো, ম্যানুফ্যাকচারিং শব্দটা নামের নীচে শোভা পাচ্ছে বটে, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং করে না।

ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তবে, যদি কেউ ছবি করে ত সাহায্য করতে পারি।

একটু উৎসাহিত হয়ে বললাম—কী রকম সাহায্য ?

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—উপদেশ দিয়ে।

আকাশ থেকে পড়লাম। শুধু উপদেশে কী হবে ! বসে আছি চুপ করে। উনি আবার বললেন—আমাদের দু' রীলের ছবিটা দেখেছেন ?

—না। বাঙালীকে নিয়ে হাস্যকৌতুক, তাই দেখিনি।

বললেন—না, তা ঠিক নয়, কোনো সম্প্রদায়কে নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুক নয়। দেখলে পারতেন—কোয়ালিটিটা বুঝতে পারতেন। কে তুলেছেন জানেন ? ঐ উনি।

সেই ফিরিঙ্গী ভদ্রলোককে দেখালেন, বললেন—মিস্টার চার্লস্ ক্রীড। ফটোগ্রাফার। সিনেমাটোগ্রাফারও বলতে পারেন। বলে, ওঁকে তিনি ডাকলেন কাছে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন—মিস্টার চৌধুরী ছবি করতে চান।

করমর্দন করলাম। তারপরে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। এক সময় বললেন—আমার তোলা ছবি তুমি দেখবে ?

বললাম—দেখলে ভালো হয়।

ক্রীড বললে—বেশ, এসো। পিকচার হাউসে। প্রতিদিন দুটো করে শো হয়, শনি রবিবারে হয় তিনটে শো। তুমি কাল নয়, পরশু এসো। ছবি দেখাবো।

বললাম—আমার একজন সহকর্মী আছে, তাকে নিয়ে আসতে পারি ?

—নিশ্চয়ই।

মুখার্জি সাহেব সব শুনছিলেন। বললেন—আমার তখন অফিস থাকবে, আমি যেতে পারবো না। সাড়ে পাঁচটার পর যাবো। দেখা হবে।

প্রফুল্লকে সব বললাম এসে। যথানির্দিষ্ট দিনে গেলামও যথাসময়ে। সাহেব দাঁড়িয়েছিলো, বললেন—এসো। প্রফুল্লর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তারপরে সাহেবের সঙ্গে গেলাম ওপরে। ওপরে, অর্থাৎ দোতলায়, প্রোজেকশন চেম্বার, তার দুপাশে দুটি বক্স। আর দোতলায় কিছু নেই। ডানদিককার বক্সটিতে গিয়ে আমরা তিনজন বসলাম। সাহেব কথায় কথায় বললে —এই-ই আমার আসন। যত ছবি আছে, সপ্তাহে অন্তত দু তিন দিন এখানে বসে ছবি দেখি। সেদিন সাহেবের যে ছবিটি দেখানো হচ্ছিল, সেটি হচ্ছে দার্জিলিঙের ওপরে তোলা একটা ডকুমেণ্টারী ছবি। এ ছবি তোলার একটা ইতিহাস আছে। ক্রীড হচ্ছে জাতিতে আর্মেনিয়ান—ব্যাঙ্গালোরে বাড়ি। ভাগ্যান্বেষী যুবক—ভাগ্যের অন্বেষণে এসেছিল কলকাতায়। তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের মালিকও ছিল আর্মেনিয়ান—স্টাফেন সাহেব। আর্মেনিয়ান জাতের মধ্যে পরস্পরকে দেখার একটা সম্প্রদায়গত মনোভাব ছিল। ধনীরা দরিদ্রদের আশ্রয় দিতেন। স্টীফেন সাহেবও তাই ক্রীডকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গ্র্যাণ্ড-এ যে 'থিয়েটার রয়্যাল' ছিল, সেখানে ব্যারিস্টার শিরীষ বসু ইংরেজীতে নলদময়ন্তী—বুদ্ধ (এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' অবলম্বনে) প্রভৃতি অভিনয় করেছিলেন। এবং এখানেই তৎপরবর্তীকালে হয়েছিল 'রিফরমড্ থিয়েটার'—এখানে বাংলায় অভিনয় করতেন আমাদের সেই কলেজের থিয়েটারের সেক্রেটারী ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, পেসেন্স কুপারকে নিয়ে। পরে এ থিয়েটারটি পুড়ে যায়। এ-থিয়েটারের কথা পরে আরও বলব। এই থিয়েটারে প্রধান ইলেকট্রিসিয়ান ছিল এই ক্রীড সাহেব, পুড়ে যাবার পর—ও এসেছে ডুকাস সাহেবের এখানে। নানা রকম কাজ জানে। এখানে এসে ক্রীড তুলেছিল সব ট্রপিক্যাল ছবি, নিজের ক্যামেরা আছে, ল্যাবরেটরী পর্যন্ত আছে। খানা ত সাহেব খেত গ্র্যাণ্ড হোটেলে, সে ছিল চিরবন্দোবস্ত তার। পরে অবশ্য বিয়ে করে একদিন সংসারী হয়েছিল সাহেব, সে কথা স্বতন্ত্র। ঐ স্টিফেন সাহেবের দার্জিলিঙে একটা হোটেল ছিল—হোটেল মাউণ্ট এভারেস্ট। এই হোটেলে আসত বহু বিদেশী

টুরিস্ট। টুরিস্ট আকর্ষণ করার জন্য ইনি একটি ছবি তৈরি করান ক্রীডকে দিয়ে। সেই ছবি স্টিফেন সাহেব ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে—বিনা পয়সায় পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রচারার্থে। তবে এর জন্য ক্রীড পেয়েছিল অনেক টাকা, যা দিয়ে সে ক্যামেরা, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি কিনেছে বা তৈরি করেছে। খুব ভালো ছবি হয়েছিল কিন্তু ওই 'দার্জিলিং'। বহু বিদেশী টুরিস্টকে আকর্ষণ করেছিল এই ছবি। 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে' তখনকার দিনে খুবই আকর্ষণীয় বস্তু। পৃথিবীর কাছে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর এক বিস্ময়। প্রায় আট, কি নয় হাজার ফিট উচ্চতা ডিঙিয়ে —দার্জিলিং। তিনধরিয়ার কাছে যে রেল লাইনের 'লুপিং দ লুপ' আছে, তার অদ্ভুত দৃশ্যাবলী তুলেছিল ক্রীড সাহেব। তাছাড়া ঘুম-মনাস্ট্রীর লামাদের নাচ, সিঞ্চল লেকের দৃশ্য, লেবং রেস, ম্যাল, বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি জায়গার ফটোগ্রাফী দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। শুধু মাত্র এজন্য নয়, ক্রীড সাহেবের সঙ্গে নানান কথা বলে আমরা রীতিমত ভক্ত হয়ে গেলাম সাহেবের। আমরা দুজন যেমন পাগল, সাহেবটিও তেমনি পাগল। ছবি দেখার পর যখন তিনজনে নীচে নেমে এলাম, দেখি, মুখার্জি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম প্রফুল্লর। উনি বললেন—ছবি যদি করেন ত আমাদের সাহায্য অবশ্য পাবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কতো খরচ হতে পারে একটা মোটামুটি বড়ো ছবি তুলতে?

বললেন—আমি জানি না, তবে ক্রীড বলতে পারে।

চলে গেলেন উনি। লনে বসে চা খেতে লাগলাম আমরা তিনজনে। ক্রীড বললে—আমাকে চার্জ দিতে হবে ফুট প্রতি এক টাকা দু আনা। এর মধ্যে কাঁচা ফিল্মের খরচ, কেমিক্যাল আর ল্যাবরেটরীর খরচ এবং তৎসম্পর্কিত মজুরী—সবই আছে। নেগেটিভটা পাবে, আর পাবে একখানা পজেটিভ প্রিণ্ট।

হিসাব করে দেখা গেল, সাহেবের রেট খুবই কম। ওঁর মতন গুণী ক্যামেরাম্যানকে মাইনে করে রাখা, ল্যাবরেটরী আর কেমিক্যালের আলাদা খরচ, কাঁচা ফিল্ম ইত্যাদি যে টাকা ও বললে, তাতে হয় না। সাহেবের দেওয়া হিসাব মতো দশ হাজার ফিটের একটা ছবির মূল্য দাঁড়ায় ১০,১২৫৲ টাকা। টাকা আমাদের কই? তবে ছবি হোক আর না হোক, ক্রীড সেদিন থেকে হয়ে গেছে সিনেমাজগতে আমাদের পথপ্রদর্শক। প্রফুল্ল সাহেবকে বললে—ছবির ব্যাপারে তুমি সব সময় আমাদের পরামর্শ দিও, আমরা টাকা তুলতে চেষ্টা করব।

সাহেব বললে—বেশ। যখন আসবে, বিকেলের দিকেই এসো। এখানেই থাকি। যেদিন খুশি এসো। একসঙ্গে বসে ছবি দেখব, আর আলোচনা করব।

এবং তাই-ই করেছি পরবর্তী দুটি বছর ধরে। তবে সেকথা এখন থাক। প্রফুল্লকে বললাম—কিন্তু তুই কি বলে এলি? টাকা?

—দেখছি, কী করা যায়।

ট্রামে করে জগুবাবুর বাজারের কাছে নামলাম। কাঁসারিপাড়া রোড ধরে চলে গেলাম বাড়ি, ও-ও চলে গেল ওর বাড়ি হরিশ মুখুজ্যে রোড ধরে। বলে গেল—কাল অফিসে যাস কিন্তু।

—আচ্ছা।

শুধু কাল কেন, রোজই ত যাই অফিসে। পিকচার হাউসে ক্রীড সাহেবের সঙ্গে রোজ বিকেলেই দেখা হয়, মুখার্জি সাহেবের সঙ্গেও হয়। আমরা তিনজনে একসঙ্গে বসে ছবিও দেখি। কিন্তু আমাদের ছবি সম্বন্ধে আর কোনো কথাই হয় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন প্রফুল্ল হঠাৎ আমাকে বলে বসল—ছবি আমরাই করব।

—কী করে ?

—বড়দাকে বলেছি।

প্রফুল্লর বড়দা চণ্ডীচরণ ঘোষ মশাই।

তিনি বলেছেন—কানাইকে রাজী করাও।

ভবানীপুরের বিখ্যাত "বুকী" শশীভূষণ দাস মশাই, তাঁর মধ্যম সন্তান—কানাইলাল দাস। টার্ফ ক্লাব তখন কড়াকড়ি করেছে, বাঙালীকে 'বুক' দেয় না, যদি কাউকে দেয় ত ইংরেজ পার্টনার নিয়ে তবে তাকে কোম্পানী খুলতে হবে। ওঁরাও তাই করেছেন। টাকা দাস কোম্পানীরই, কিন্তু পার্টনার হিসাবে নিতে হয়েছে এক সাহেবকে। 'হ্যাচিনসন দাস এণ্ড কোং'—রেসের মাঠের বেড়ার ভিতরে একমাত্র এঁদেরই তখন 'বুক' করার অধিকার ছিল। সে সময় 'বুকীদের' যে কী পরিমাণ লাভ হতো তা আমরা আজ ধারণাও করতে পারব না! কানাই এই 'বুকীর' ব্যবসাটি দেখে; তাছাড়া টালিগঞ্জে একটি ইটখোলা তৈরি করেছে, তা থেকেও প্রচুর লাভ হয়। অন্যান্য ব্যবসাও আছে। ওই কানাইয়ের বিয়েতে আমরা ওদের বাড়িতে যাত্রা করে এসেছিলাম। এই কানাই, বিশেষ করে, ওর বড় ভাই হীরালাল আমার বন্ধু ছিল।

প্রফুল্ল এসে বললে—এই, কানাই রাজী হয়েছে।

প্রফুল্ল ভালো অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট। আমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়েছিল—কী কী চাই। তখন সিনারিও করতে গেলে, পাশে পাশে কতো ফিট ফিল্ম খরচা হবে, তাও আন্দাজ করে লিখে দিতে হতো ছবির অ্যাকশানগুলিকে কল্পনা করে। এক মিনিটে ষাট ফিট ফিল্ম খরচা হতো নির্বাক ছবিতে। আমি এই 'ফুটেজ'-এর হিসাব করেছিলাম 'স্টপ ওয়াচ' ধরে ধরে। এও শিখেছিলাম সেই ইংরেজী বইটা থেকে।

যাই হোক, হিসাব করে দাঁড়িয়েছিল এই যে, ন'হাজার থেকে দশ হাজার ফিট যদি ছবির দৈর্ঘ্য হয় ত, টাকা লাগবে আঠারো হাজারের কম নয়। প্রফুল্ল বললে—কানাই বলেছে বারো হাজার টাকা দেবে। তবে সে আমাদের মাত্র 'স্লিপিং পার্টনার' করে রাখতে চায় না, যাতে আমাদেরও

আয়-ব্যয়ের দিকে টান থাকে, সেইজন্য আমাদেরও কার্যকরী অংশীদার করে রাখতে চায়। সে হিসাবে, দাদা দেবে—দু হাজার. আমি দেবো—দু হাজার, আর তুই দিবি—দু হাজার।

—আমি!

—হ্যাঁ।

বললাম—তোমাদের উপার্জন আছে, তোমরা দিতে পারো। আমার উপার্জন নেই, আমি দেবো কোত্থেকে? আমাকে যদি রাখতে চাও ত রাখো আমাকে পরিশ্রমের বিনিময়ে। লাভের কোনো ভাগ আমি চাই না। আর নয়ত, আমাকে ছেড়ে দাও।

প্রফুল্ল বললে—তাই হয় নাকি? তুই তোর বাবাকে বলে টাকা নে না?

—বাবা!

আকাশ থেকে পড়লাম। তারপরে বললাম—না, সে অসম্ভব।

—কেন?

বললাম—সারাজীবনে তাঁর আশা পূরণ করতে পারিনি। কতো কাজে ঢুকিয়েছেন, কোনো কাজে লাগতে পারিনি। এখন চাপিয়েছি তাঁর ওপরে আমার সংসার। এ অবস্থায় কী করে তাঁকে বলব—আমাকে টাকা দাও, ফিল্ম করব?

আর এমন বাবা, যিনি অতীতে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সে থিয়েটারই ত উঠে যায় ১৯০১ সালে, আমার জ্ঞানোন্মেষের প্রাক্কালে। তাঁর একটা শিল্পবোধ ছিল এটা বোঝা যায়। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনোদিন তিনি ওমুখো হননি। গানের ছন্দ রাখবার জন্য যে 'মেট্রোনম্' যন্ত্র থাকে, তা একটা ছিল শুধু বাড়িতে, শৈশবে দেখেছি। দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই সেটা "টক্ টক্" শব্দ করে উঠত। আমরা তাই নিয়ে খেলা করতাম। কিন্তু এছাড়া গানবাজনা-থিয়েটার সংক্রান্ত আর কিছুই ছিল না। মার একবার একটা শখ হয়েছিল গ্রামোফোন কিনবার। বাবার কাছে চাইলেও তিনি তা দেবেন না, মা এটা জানতেন। ঐ যে গোবর্ধনবাবুর কথা আগে বলেছি, যাঁকে বলা হতো ছোটবাবু, বাবার মেসোমশাইয়ের ছোটভাই—বাবার খুব বন্ধু। তিনি তখন অবশ্য বিপত্নীক, কিন্তু আগে তাঁর স্ত্রী ছিলেন মার খুব বন্ধু, দুজনে এক সঙ্গে বধূ হয়ে ঢুকেছিলেন ঐ বাড়ি। ছোটবাবুর ছেলে ভুপেন আর তাঁর ছোট দুই বোন ছিল মার খুব বশীভূত। এই ভুপেনকে 'ভুপেনকাকা' বলে ডাকতাম। বয়সে সে দেড় বছরের বড়ো হবে মাত্র, কিন্তু সম্পর্কে বড়ো—বাবার মেসোশায়ের ছোট ভাইয়ের ছেলে। তখন ও-ই ছিল, বয়সটা বড় কথা নয়, সম্পর্কটাই ছিল। বড় মা তাকে আর আমাকে গোপনে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন গ্রামোফোন কিনতে। সে হলো .৯১০ সালের কথা। ফিটন গাড়ি করে নিয়ে এলাম ধর্মতলায় মল্লিক ব্রাদার্সের দোকান থেকে—চোঙ্গাঅলা গ্রামোফোন, তখন গ্রামোফোনের চোঙাই ছিল। এই গ্রামোফোন আবার রাখতে হতো লুকিয়ে, বাবা যাতে না টের পান। ঐ চোঙাটা লুকিয়ে রাখাই হতো বিপদ। দশটি

বছর পরে, ১৯২০ সালে, তিনি টের পেয়েছিলেন যে, বাড়িতে গ্রামোফোন আছে। বোধহয় আমার বিয়ের আগেই। কিছু অবশ্য বলেননি।

প্রফুল্লকে বললাম—এমন যে আমার বাবা, তাঁকে বলব ফিল্ম করব! আর, তিনি টাকা দেবেন? তুই ভেবেছিস কী রে?

প্রফুল্ল বললে—তবু একবার বলে দেখ না।

অনেক ইতস্তত করার পর অগত্যা বাবার ঘরে ঢুকে বাবাকে কোনওক্রমে বললাম কথাটা। উত্তরে, 'হাঁ'-'না'—কোনো কথাই বললেন না তিনি। গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন, তামাকই খেতে লাগলেন। তিরস্কারও করলেন না, পুরস্কারও দিলেন না।

আবার বললাম একদিন। বললাম—কিছুই ত আমার হলো না। আমি তবে করব কী?

এবারও কোনো উত্তর নেই।

শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতেও বললাম কথাটা। কখনো বাড়িতে বলেছি। কখনো তাঁর গাড়িতে উঠে তাঁর সঙ্গে চলতে চলতেও বলেছি। কিন্তু কোন ফলই হয়নি।

প্রফুল্ল সবই শুনত আমার কাছ থেকে। সে এবার বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, তোকে কিছু বলতে হবে না, যা' বলবার আমি গিয়ে বলব। আমি দেখা করব তাঁর সঙ্গে।

তাই করেছিল প্রফুল্ল। উৎসুক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, ও বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কী হলো রে?

—ঠিক আছে। তোকে এসব টাকা-পয়সার কথা কিছু ভাবতে হবে না। তুই কাজে লেগে যা।

কাজে আমি সত্যিই লেগে গেলাম, কিন্তু এর পর টাকা নিয়ে আর একটি কথাও হয়নি প্রফুল্লের সঙ্গে। সে কাগজপত্র বগলে ক'রে বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে কী সব বলাবলি করে জানি না। প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করলেও সে কিছু ভাঙে না। টাকার ব্যাপার নিয়ে আর আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি, ওসব ব্যাপার প্রফুল্লই পরিচালনা করেছে। তবে, অনেক পরে একদিন শুনেছিলাম, বাবা নাকি প্রফুল্লকে বলেছিলেন—যখন যা লাগে, নিয়ে যেও।

আমাদের কাজ কিন্তু পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। প্রথমেই প্রয়োজন স্টুডিও তৈরি করবার জন্য উপযুক্ত জমি। সে-ও সংগ্রহ করা হয়ে গেল। বেহালার ট্রাম-টারমিনাস যেখানে, তার থেকে পূর্ব দিকে, মাইলখানেক হাঁটতে হয়, কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে ছিল তখন, সেই লাইন পেরিয়ে গ্রামের ভিতরে, দু প্লটের জমি একসঙ্গে নেওয়া হলো, বিঘে আড়াই জমি। জমিটার লাগোয়া আরও বিঘে-খানিক জমি নেওয়া হয়েছিল যাতায়াতের সুবিধার জন্য, নইলে বড়ো ঘুরপথে যেতে হতো ওখানে। মূল জমিটার পাশে ছিল শ্রীকানাইয়ের বড়ভাই হীরালালের শ্বশুরবাড়ি। জমির খবরটা হীরুই দিয়েছিল। বার্ষিক পঁয়ষট্টি টাকা খাজনায় লীজ হিসাবে আমরা নিলাম। আর রাস্তা করার জন্য বাড়তি জমিটার দরুণ সামান্য কিছু ধরে দিতে হয়েছিল তার মালিককে।

আমি ওখানে বসে গেলাম। সামনের জমিটায় ছিল প্রায় বিঘে দেড়েক অংশ একেবারে সমান —প্লেন-করা একটা চত্বর। ক্রীড্ সাহেবকে দেখাতে সে বললে—সুন্দর জমি হবে।

চত্বরের আশেপাশে যেসব ঝোপজঙ্গল ছিল, সব কেটে সাফ করে ফেললাম। চত্বর-ছাড়া বাকী জমিটা ছিল উঁচু, সেখানে ছিল সব বাঁশঝাড়। সেই বাঁশঝাড় উপড়ে ফেলা সহজ নয়। মাটির নীচে অনেকদূর পর্যন্ত খুঁড়ে—অনেকটা বেড় ধ'রে, তবেই বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছেদ করা সম্ভব। এর জন্য কম বেগ পেতে হয়নি। ছোটনাগপুরিয়া নারীপুরুষ মজুররা খাটতোও অদ্ভুত। কিছুই তাদের বলতে হতো না, কাজটা শুধু বুঝিয়ে দাও, ব্যস, প্রাণপণে খেটে চলেছে, কাজে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার যেন তাদের স্বভাবেই নেই! অসাধারণ পরিশ্রম করে চলেছে, এক মুহূর্তের জন্যও কাজের তাগাদা দিতে হয় না, সমস্ত দিন ধ'রে কাজ করে যায়। সপ্তাহে সপ্তাহে পারিশ্রমিক দিতে হয়। প্রফুল্ল আসে টাকাপয়সা নিয়ে শনিবার শনিবার। রোজ হিসাব করে তাদের টাকা দিয়ে দেয় প্রফুল্ল। সব বাঁশ-ঝাড় অবশ্য উপড়ে ফেলিনি, কিছু রেখে দিয়েছিলাম ছায়ার জন্য। এছাড়া, সেই উঁচু জমিটা থেকে চত্বরে যাবার মুখে ছিল জলনিকাশী খানা, সেটাকে ঠিক করে কেটে নিয়ে, তার ওপরে বাহারে সাঁকো বানিয়ে নিয়েছিলাম। সীমানা বরাবর ছিল আঁশফল গাছ, পেয়ারা গাছ। এগুলি আর কাটিনি, রেখে দিয়েছিলাম। উঁচু জমিটার ওপরে—মাঝখানে করালাম সাজঘর। বেশ উঁচুই হলো ভিত—ইঁটের গাঁথুনি—সিমেণ্ট করা মেঝে। দু'পাশে দুটি সাজঘর—মাঝখানে স্টোর-রুম। স্টোর-রুমে আলমারি। যে-সব পোশাক-আশাক, গয়নাগাঁটি আমরা তৈরি করিয়েছিলাম, সেগুলি রেখে দিতাম আলমারিতে সাজিয়ে। যে-দিন শুটিং থাকত, সেদিনই নিয়ে যেতাম পোশাক-আশাক। সাজঘর দুটির একটি পুরুষদের, অপরটি মেয়েদের। দুটির সঙ্গে সংলগ্ন দুটি বেসিন-পাতা বাথরুম। মাথার ওপরে ট্যাঙ্ক, শুটিংয়ের দিন, আগেভাগে ভিস্তিওয়ালাদের দিয়ে ঐ ট্যাঙ্ক দুটি জলে ভর্তি করিয়ে রাখতাম। সমস্তই প্ল্যানমাফিক তৈরী করা। সাজঘরের ঘর তিনটির সামনে টানা বারান্দা—শালের খুঁটি দেওয়া, মাঝখানে সিঁড়ি। জাফরী-করা কাঠের রেলিং—তাতে লতা গাছ তুলে দেওয়া। তার সামনে বাগান তৈরি করা। ক্রোটন গাছের সারি মাটিতে বসানো। ঘরের মাথায় ছিল দেশী খোলার ছাউনি, দেওয়ালে ছিল ছিটে-বেড়ার ওপরে মাটি দেওয়া। কঞ্চি আর বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া তৈরি করে তার ওপরে—বাইরে-ভিতরে—পুরু করে মাটি দেওয়া। চোরে দেওয়াল ফুটো করতে গেলে শব্দ হবে, গৃহস্থ জেগে যাবে, তাই এ' দেওয়াল হলো গিয়ে, যাকে বলে—"থিফ-প্রুফ।" আবার বাগানের দু'ধারে বসানো ছিল গোলঘর। সিমেণ্ট-করা গোলাকার মেঝেটাকে ঘিরে শালের খুঁটি বসানো, তার মাথায় খড়-ছাউনি দেওয়া চাল, আর গায়ে-গায়ে বেড়া না দিয়ে বাখারী দিয়ে জাফরিবোনা রেলিং, তাতেও লতাগাছ তুলে দেওয়া। ভিতরে বেতের চেয়ার-টেবিল পাতা আছে, বসে গল্প করো, চা-টা খাও, কোন অসুবিধে নেই। আর বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে চলার পথ, ছায়ায় ছায়ায় এসো, আর যাও। বাইরে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু যখন

তুমি বেণু-বনের মধ্যে এসে পড়লে, তখন ঝিরঝিরে একটা বাতাস তোমার শ্রান্তি কিছুটা মুছে দেবেই।

দক্ষিণ প্রান্তে ছিল বড়ো একটা চালার ছাউনি। ওটা ছিল আমাদের ওয়ার্কশপের মতো। সিন, কাটা কাঠ, এই সব থাকত। আঁকা-জোকার কাজ চলত এখানে। আরেকটা চালা ছিল অনুরূপ, তবে তার চারিদিকটা ছিল ফাঁকা, কোনো দেওয়াল ছিল না। এখানে ছুতোরের কাজ চলত —কাঠ কাটা হতো।

এতো গেল স্টুডিও নির্মাণের প্রাথমিক কথা। অফিসবাড়ি কোথায় হবে? প্রফুল্ল করলো কী, 'প্রাণকিষেণ টী' কোম্পানীর কাছ থেকে সমস্ত দোতলাটাই ভাড়া নিয়ে নিলো দশ নম্বর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের বাড়িটার।

সবিস্ময়ে বললাম—এতো বড়ো বাড়ি নিয়ে কী হবে!

ও বললে—দেখ না।

বড়ো বড়ো উঁচু ঘর—অনেকগুলি। মাঝখানে ত বিরাট একটি হল, কাঠের মেঝে, কাঠের সিঁড়ি। প্রফুল্ল বললে—দাঁড়া, 'সাবলেট' করে দিচ্ছি।

তাই হলো। ইউনিভার্সাল ফিল্ম কোম্পানী একটা দিকই ভাড়া নিয়ে নিলে। এদের ম্যানেজার এ-ভি-রাও ছিলেন মহারাস্ট্রীয়, গল্প করতে আমাদের ঘরে আসতেন, আমরাও যেতাম ওঁর ঘরে। ওঁরা আবার করতেন কী, ফিল্মের বই আনাতেন আমেরিকা থেকে। নানাবিধ ফিল্মের চটি-চটি বই, তাতে গল্পও দেওয়া আছে, নানান্ ছবিরও ব্লক দেওয়া আছে। এগুলি যথাস্থানে পাঠাতেন। ওঁদের ব্যবসার একটা দিক। আমরা কিন্তু এসব বই পেয়ে আর ছবি দেখে-দেখে খুবই লাভবান হতাম। এক-একটা ভালো স্টীল-ফটো দেখি, আর তার কম্পোজিশন বুঝবার চেষ্টা করি। মাথায় নানারকম কল্পনা আসে। সুতরাং এ-ও প্রচণ্ড লাভ নয় কী?

আমাদের অফিস-বাড়ির পিছন-দিককার বড়ো ফ্ল্যাটটাও ভাড়া হয়ে গেল, এলেন এক ফিরিঙ্গী স্বামী-স্ত্রী। আমাদের জন্য রেখে দিলাম শুধু একখানা বড়ো ঘর। ঘরের সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড কাঠের একটা চাতাল বা ল্যাণ্ডিং। তার পাশ দিয়ে গাড়ি বারান্দার দিকে সবার যাতায়াতের মতন একটা পথ রেখে দিয়ে বাকীটা আমরা পার্টিশন করে নিলাম। তার মধ্যে সাজিয়ে দিলাম টেবিল আর চেয়ার। মেকেঞ্জী লয়্যালের সেল্ থেকে সস্তাতেই কিনেছিলাম আমরা এই সব চেয়ার-টেবিল আর আলমারি। তার কিছু বেহালায় পাঠিয়ে দিয়ে কিন্তু রাখা হয়েছে এখানে। চাতালের পার্টিশনের মধ্যেকার টেবিলে সিন-টিনের নক্শা করা হতো। আমি বসতাম ঘরের ভিতরে অফিসে। পাখা-ভাড়াও করা হলো এবং হলোও সবই এক রকম, এবার কোম্পানীর নামকরণ কী করা হবে?

অফিসের পর, পিকচার-হাউসে আমাদের যাওয়ার নেশা ত ছিলই। সেখানে ক্রীড সাহেবের সঙ্গে বসে বসে ছবি দেখা, আর গল্প-গুজব করা। মুখার্জী সাহেবও আসতেন, তবে একটু দেরিতে

তাঁর অফিসের কজে সেরে। মুখার্জী সাহেব আর ক্রীডকে আহ্বান করে নিয়ে এসে দেখিয়েছি আমাদের অফিস। আমাদের কাজে তাঁদেরও সমান উৎসাহ। পিকচার হাউসে বসে গল্প করতে করতে মুখার্জী সাহেবকে বললাম—এইবার প্রতিষ্ঠানের একটা নামকরণ করে দিন দেখি?

তিনি একটু ভাবলেন। তারপরে, সাহেব মানুষ ত, দিলেন এক ইংরেজী নাম—ফটো প্লে সিণ্ডিকেট অব ইণ্ডিয়া। নামটা এককথায় পছন্দও হয়ে গেল আমাদের।

অফিসে ওরা দুজন ত মাঝে মাঝে আসতেনই। ওঁরা ছাড়া, নিয়মিত আসতেন—জ্যোতিষ মিত্র মশাই, যাঁর কথা আগে বলেছি, ভীষণ নাট্যামোদী, আমাকে কতবার বাইরে নিয়ে গেছেন অভিনয় করাতে। আমাদের ছবির ব্যাপারে—এঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম এবং কতো যে 'ব্যাগার' খেটেছেন হাসিমুখে, তার ঠিক নেই। রোজ অফিসে এসে বসা, এ যেন ওঁর নেশায় পরিণত হয়েছিল। আর আসতেন আমাদের নেংটিদা—যুগল বসু। ইনিও ছিলেন প্রফুল্লের মতো অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট এক সওদাগরী অফিসের। অফিস-ফেরতা ইনিও একবার না এসে পারতেন না। এছাড়া ছিলেন নেড়ুবাবু—সুধীরবাবু—ভালো ছবি আঁকতেন এবং পরে প্রফুল্লর বোনকে বিয়ে করে প্রফুল্লর আত্মীয়ে পরিণত হয়েছিলেন। কথা হচ্ছে, ইনি ছবি আঁকেন বটে, কিন্তু মাপ-জোঁক-এর ব্যাপার এঁর জানা নেই, ইনি ত 'ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান' নন। অথচ যা দেখছি, আমাদের অবিলম্বে দরকার এক ড্রাফটস্‌ম্যান-আর্টিস্টের।

প্রফুল্ল বললে—কাগজের 'কর্মখালি'র কলমে বিজ্ঞাপন দে।

—বলিস কী!

—তুই দে না।

তাই দিতে হলো। দরখাস্তও এলো অনেক। তার মধ্য থেকে কিছু-কিছু বেছে নিয়ে 'ইণ্টারভিউ'রও ব্যবস্থা করা হলো। যাঁকে ভালো লাগল, তিনি অদ্ভুত কাজের লোক, নানান্ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আর্ট স্কুলের পাশ করা শিল্পী, তার ওপরে কৃতী ফটোগ্রাফার। বহুদিন যাবৎ 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' বিভাগে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীনে কাজ করেছেন। পুণায় ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে হয়েছে, বহু আঁকজোক করতে হয়েছে, বহু ফটো তুলতেও হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম—গোকুল নাগ। রোগারোগা নাতিদীর্ঘ চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল। সেদিন অবশ্য প্যাণ্ট-কোট পরেই এসেছিলেন, কিন্তু পরে যখন আসতেন, ধুতি-পাঞ্জাবিই পরনে, আর চোখে থাকত ফিতেওয়ালা পাঁশনে চশমা। মিষ্টভাষী, রুচিশীল ব্যক্তি, মুখে চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপও সুস্পষ্ট। তদানীন্তন 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে গোকুলবাবুর নাম বিশেষভাবে বিজড়িত, কিন্তু যখনকার কথা বলছি, 'কল্লোল' তখনো বার হয়নি। তবে, এঁর লেখক-জীবন শুরু হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ডঃ কালিদাস নাগ মশায়ের ভাই। কথাবার্তা কয়ে ভারী ভালো লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় থাকেন?

—চিড়িয়াখানায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য ক'রে অবিলম্বে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। জু-গার্ডেনের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বিজয়কুমার বসু। তাঁরই ভাগ্নে হচ্ছেন গোকুলবাবু। বললেন—ঐখানেই থাকি। ঐখান থেকেই যাতায়াত করি।

বললাম—দেখুন, আমরা সব ভবঘুরে। আমার নিজের একটা পয়সা নেই, পাইও না কিছু, ভুতের ব্যাগার খেটে মরছি। আপনাকে ত তা' বলতে পারি না। অথচ, বেতন দেবার সামর্থ্যই বা কোথায়? ভিক্ষা-অর্থে প্রতিষ্ঠান। আপনার যাতায়াত-হাতখরচা—এই বাবদ মাত্র চল্লিশ টাকা মাসে-মাসে দিতে পারি। বিবেচনা করে জানাবেন।

আলোচনা হলো অনেকক্ষণ ধরে। তার মধ্যে আমাদের কর্মপদ্ধতি এবং গল্পের কথাও হলো। দেখলাম গোকুলবাবু শুধু কাজের লোকই নন, ভাবের লোকও বটেন। হৃদয়ধর্মী পুরুষ; হিসেব-কষা মন নয়। বললেন—বিবেচনা করব আবার কী! আপনার কথাতে রাজী আছি। আসব।

এদিকে প্রফুল্ল তখন এ অফিসে বসে না, বসে অন্য জায়গায়। চায়ের ব্যবসায়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে প্রাণকৃষ্ণবাবু তাঁর 'জোটজানকী' কলিয়ারী বন্ধক রেখেছেন 'দাগা কোং'-র কাছে, যাকে বলে 'মর্টগেজ ইন্ পজেশন।' প্রফুল্ল তাই বসছে দাগা কোম্পানীর বিকানীর বিল্ডিং-এ। অফিসের পর সে এখানে আসে। সেদিন সে আসামাত্র, তাকে বললাম গোকুলবাবুর কথা। পরদিন গোকুলবাবু যখন এলেন, আলাপ করিয়ে দিলাম প্রফুল্লর সঙ্গে। বললে—কী কী জিনিস চাই বলুন।

গোকুল দিলেন ফর্দ। স্ল্যাণ্টিং সার্ভেয়ার বোর্ড—কার্টিজ পেপার—আঁকবার যন্ত্র ইত্যাদি।

এসেও পড়ল জিনিস। সিনটিন আঁকতে হবে। দু একবার সিন বুঝিয়ে দিলাম, গোকুলবাবু কাজ শুরু করে দিলেন।

কাজও হয়, আলাপ-আলোচনাও চলে। কতো কী কল্পনা করি দুজনে মিলে। একেবারে মশগুল হয়ে আছি। আমরা বলতাম, সাত পাগলের মেলা! তারপর, স্টুডিও যেখানে হবে, সেখানে একদিন নিয়ে গেলাম গোকুলবাবুকে। খিদিরপুরের লোহার ব্রিজটা ভেঙে কংক্রীটের ব্রীজ তৈরি হচ্ছে, পাশে একটা কাঠের ফুটব্রীজ তৈরি করে দিয়েছে হাঁটাচলা করার জন্য। তার ফলে, হেস্টিংসের মোড়ে, রেসের মাঠের বিপরীত দিকে, গোল করে লাইন বসিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে ট্রামগুলি। ওইখানে নেমে, হেঁটে কাঠের ব্রীজ পার হয়ে, তারপরে ধরতে হবে বেহালার ট্রাম। অসুবিধা হতো বৃষ্টির দিনে। কাঠের ব্রীজের কাছে নেমে যাবার যে সিঁড়ি ছিল, সেগুলি লোক চলাচলের জন্য ভীষণ কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল হয়ে থাকত, হাঁটা চলা করতে হতো অতি সন্তর্পণে। অথচ, কাজের তাগিদে কতোই না হাঁটাচলা করতে হয়েছে আমাদের! এসপ্লানেড থেকে খিদিরপুরের দিকে যেতে রেড রোড আউট্রাম রোডের সঙ্গমস্থলে ছিল ডাফরিনের মর্মর মূর্তি, এখন সেটা নেই, ছোট্ট গোলাকার বাগান হয়েছে জনসন নিকলসনের। তখন ওখান থেকে ছিল সিঙ্গল ট্রাম লাইন, তাই গাড়ি সান্টিং করার জন্য

ওখানে সদাসর্বদা থাকত একজন পয়েণ্টসম্যান। সে করেছিল কী, ওখানে ফোর্টের দিকে একটা বট বৃক্ষের চারা পুঁতেছিল। যেতে আসতে রোজ সেটা দেখতাম। আজও দেখি, সে আর ছোটটি নেই, ডালপালা মেলে সে আজ আমার কৈশোর-যৌবনকালের সাক্ষী এই বটগাছ, আর আছে সেই হরিণবাড়ির জেলের সামনেকার দুটি অশ্বত্থ-বৃক্ষ। তবে, বট-টির মতো যৌবন তার আর নেই, সে এখন বিশীর্ণ, শুষ্কও বটে।

কাজ চলছে। গোকুলবাবু সিন-এর নকশা করে চলেছেন। ইতিমধ্যে ক্রীড এলো একদিন, বললে—এবার স্টুডিও তৈরি করতে হয়।

মুখার্জিকে বলে একটি ছবিও নিয়ে আসছে সে। বিখ্যাত চিত্র-প্রযোজক উইলিয়াম ফক্স। তাঁদের ওয়েস্টার্ন স্টুডিও ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়—হলিউডে। আর ইস্টার্ন স্টুডিও ছিল নিউ ইয়র্কের কাছে—লং আইল্যাণ্ডে, ফার্নডেল স্টুডিও তার নাম। বিরাট বাগানের মধ্যে ছিল সেই স্টুডিও। সাহেব তারই ছবি আর মাপ দিলো আমাদের। উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরাল একটি একশো ফুটের দেওয়াল, উচ্চতায় বিশ ফুট। তাকে মাঝামাঝি জায়গায় ভেদ করে চলে গেছে আর একটি সত্তর ফুটের দেওয়াল, ওই একই উচ্চতার। ফলে চারটি সমকোণের স্থষ্টি হয়েছে। স্থষ্টি হয়েছে স্টুডিওর চারটি ভাগ। প্রতিটি কোণে দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের রেলিং তৈরি করা আছে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায় সেই রেলিংএ। আর আছে সেখানে বড়ো বড়ো আয়না পর পর সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা।

কানাইয়ের ইটখোলার কথা আগেই বলেছি। সুতরাং ইঁট এনে দেওয়াল গেঁথে ফেলবার ব্যবস্থা করতে দেরি হলো না। কাঠের রেলিং, সিঁড়ি, মিরর—সবই হলো ফার্নডেলের মতো। ছবি তোলার সময় দেওয়ালের যে-কোনো একটা কোণ ধরে সেট সাজিয়ে নেওয়া হতো। দিনের বেলাতে সূর্যালোকে কাজ। সকালে একদিকে—বিকেলে আরেক দিকে—ছায়ার অবস্থান বুঝে। ছায়ায় কাজ করতে হবে, তাই হাই-লাইটের প্রয়োজনে ফ্লোর থেকে কিছুটা দূরে পঁয়ত্রিশ ফুটের মতো উঁচু স্তম্ভ বসিয়ে তার মাথায় আবার 'মিরর' ফিট করে সূর্যালোক ধরা হতো। এই স্তম্ভ ছিল দুটি—একটি উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এছাড়া, ওই যে দেওয়ালের সমকোণ বললাম, তার বিপরীত দিকে সুবিধামতো স্থানে বসানো হতো অর্ধবৃত্তাকারে রিফ্লেক্টরগুলি। সরাসরি সূর্যালোকে ত কাজ হয় না, তাই সকাল-বিকেল কাজের সময় বুঝে, যেদিকে ছায়া হতে পারে, সেদিকে সেট্ সাজিয়ে ওইভাবে সূর্যালোকের একটা সমতা রক্ষা করে ছবির কাজ করা হতো। এতে করে সমগ্র স্টুডিওর জন্য দরকার হতো সাত হাজার স্কোয়ার ফুটের মতো জমি। তা তো আমাদের ছিলই। স্তম্ভ দুটি তৈরি হয়েছিল শালের খুঁটি দিয়ে। আর স্টুডিওর মেঝেটা আমরা তৈরি করলাম কয়লার ঘেঁস আর চুন দিয়ে। সিমেণ্টের চেয়েও দৃঢ় হলো জিনিসটা, অথচ পিচ-এর মতো গলে যায় না। এসব একদিনে হয় নি, অনেকদিনকার অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে এটা গড়ে উঠেছিল। দিনে আর রাতে আমরা খেটেছি প্রচুর উৎসাহ নিয়ে। একটা ছোট্ট ঘোড়া আর টমটম গাড়ি কিনে নিতে হয়েছিল

জিনিসপত্র বহন করার জন্য, নিজেদের যাতায়াতের জন্যও বটে। পিছনে বসতাম আমরা। মাথার ওপরে হুড নেই। সহিস আর কোচোয়ান একই ব্যক্তি। আমাদের আস্তাবলেই রাখা হতো। কোন কোনোদিন কাজের চাপে বাড়ি এসে খাওয়া হতো না। সেদিন পাশের গ্রাম থেকে মুড়ি আর ফুলুরি আনিয়ে খেতাম। এই মুড়ি আর ফুলুরির চাহিদা ক্রমে এতো বেড়ে গেল যে সাত-আটজন একসঙ্গে বসে এক ধামা মুড়িই খেয়ে ফেলতাম।

যাই হোক, স্টুডিওর পরে অফিস, অফিসের পর পিকচার হাউস। শুধু আড্ডা আর সিনেমা দেখা নয়, আরও একটা আকর্ষণ ছিল। ছবির যে-সব অংশ পছন্দ হতো, সাত-আট ফ্রেম করে অপারেটর কেটে দিতো আমাদের। অ্যালবাম করে তা রেখে দিতাম সযত্নে। পরীক্ষা নিরীক্ষা ক্রীড়্ও করত মুখার্জির অফিসে বসে। কতো সিনেমারই না ছবি আসত ও অফিসে! কয়েকটা রীতিমত মনে রাখবার মতো। মুখার্জি এই কাজ ছাড়াও একটা কাগজ আবার এডিট করতেন, ডুকাস তা বিনামূল্যে প্রচার করত সারা ভারতে, ডিস্ট্রীবিউটরদের জন্যই অবশ্য, সাধারণের জন্য নয়। এ ছাড়া মুখার্জি আবার 'ইংলিশম্যান' কাগজের খেলাধুলোর বার্তাপ্রেরকও ছিলেন। বহুদিন ধরে একাজ করেছেন। তাঁর অধীনে জনকয়েক লোক ছিল, যারা সাধারণ ফুটবল ম্যাচ-ট্যাচগুলো দেখত, 'কভার' করতো তারাই, উনি এডিট করে দিতেন। তবে বড়ো বড়ো ম্যাচ হলে উনি দৌড়তেন নিজেই। এছাড়া আবার বম্বের টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া কাগজে প্রতি সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। এখন ওঁর সঙ্গে রীতিমত আলাপ হয়ে গেছে তাই বাঙলাতেই কথাবার্তা হয়। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এও জানেন।

—এডিটিং করতে গেলে কী না জানতে হয়!

—লেখেন কী করে?

—ঐ যে সব ম্যাগাজিনের স্তূপ রয়েছে! টেবিলে কাঁচিও রয়েছে। কাটিংগুলো পিন করে রাখা হয়। ওর থেকে মিলিয়ে-মিশিয়ে—তারপরে একটু হেসে বললেন—আরে মশাই লেখার ক্ষমতা থাকলে সবই হয়।

কিন্তু যা বলছিলাম। তখনকার নির্বাক ছবিগুলিতে—ঘটনা বোঝাবার জন্য টাইটেল লেখা থাকত। একটা ছবিতে যত কম টাইটেল থাকবে, ততই তার উৎকর্ষতা। আমরা ছবি দেখতাম আর গুনতাম—কতো টাইটেল আছে। দেশী ছবির বেশী টাইটেল থাকত। এসব যখন শিখছি তখন দেখা ছবির ব্যাপারগুলি মাথার মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। ১৯১৪-১৫-১৬ সাল থেকে যে-সব ছবি দেখেছি সে সবই স্মরণ করে করে মনে মনে বিশ্লেষণ করে তার উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা বুঝবার চেষ্টা করছি। মনে রাখার মতো ছবির মধ্যে দেখেছি—কুয়ো ভাডিস, ক্যাবেরিয়া, লাস্ট ডেজ অব পম্পিয়াই, অ্যাণ্টনী ও ক্লিয়োপেট্রা, জুলিয়াস সীজার, স্যালাম্বো আর ইনটলারেন্স। সমসাময়িক ছবিও দেখেছি। বিচার করছি। চোখ খুলে যাচ্ছে। ফলে হলো এই, গল্পের যে সিনারিওটা করেছিলাম, সেটা আর কিছুতেই যেন পছন্দ হচ্ছে না। এখন করি কি?

তখন ছবি দেখেছি অভিনয়ের জন্য। এখন তার প্রয়োগ-কৌশল, কাহিনীর বিন্যাস, সবই মনে মনে পর্যালোচনা করে দেখি। তখন নির্বাক ছবির যুগ। আজকের তুলনায় ছোট-ছোটই সব ছবি। যেমন হ্যামলেট-এর মতো ছবি ছিল তিন হাজার একশো ফুট মাত্র দীর্ঘ। এই 'হ্যামলেট'-এ 'হ্যামলেট' করেছিলেন সেযুগের বিখ্যাত প্রবীণ অভিনেতা সার জনস্টন ফরবেস রবার্টসন। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনি বিদায় নেন ১৯১৩ সালে। তারপরেও অবশ্য অনেকদিন পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। তাঁর ভক্তরা ধরলেন, ফিল্মে ধরে রাখতে চাই আপনার অবিস্মরণীয় অভিনয়।

ইতিপূর্বে সারা বার্নাডের কতগুলি নির্বাচিত দৃশ্য ফিল্মে তোলা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ভালো হয়নি। তাই তিনি প্রথমটায় রাজী হননি ফিল্ম তুলতে। ১৯১৩ সালেই তিনি অভিনয়ের জন্য 'নাইট' উপাধি পান। এবং তাঁর তখন বয়স হয়েছে ষাটেরও ওপর। তবু অনেক বলে কয়ে তাঁকে রাজী করিয়ে ফিল্মে নামানো হলো। তাঁকে বলা হতো, 'The best Hamlet of his time' ছবিতেও টাইটেল ছিল ওই বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে। বইতে পড়ে জেনেছিলাম, অদ্ভুত ভালো কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর নির্বাক হ্যামলেটে সে অপূর্ব স্বর শুনতে পেলাম কই! বিজ্ঞাপনে ওঁর যৌবনের হ্যামলেটের ছবিও মুদ্রিত ছিল, কিন্তু যখন উনি হ্যামলেট হয়ে ছবিতে নামলেন, তখন সে চেহারা আর তাঁর নেই, বার্ধক্য এসে ভর করেছে, গণ্ড শুষ্ক, চক্ষু কোটরগত, দেহ শীর্ণতর। তবু অদ্ভুত লেগেছিল তাঁর অভিনয়। জেরোম-কে-জেরোম-এর 'পাসিং অব দি থার্ড ফ্লোর ব্যাক' তাঁর মঞ্চসফল নাটক, এটিও চিত্রে তোলা হয়েছিল তখন, তবে দৈর্ঘ্যে ছিল হ্যামলেটের মতোই। স্যার হার্বার্ট বীরভোম ট্রির 'হেনরী দি এইটথ' এবং সাইমোর হিকস্ অভিনীত অভিনেতা গ্যারিকের জীবনী—'ডেভিড গ্যারিক' এসব ছবিও তিনি হাজার ফুট, কি, সামান্য একটু বেশী দৈর্ঘ্য। 'আইভ্যান হোতে অনেক টুর্নামেণ্ট আর যুদ্ধটুদ্ধ ছিল, তাই তার দৈর্ঘ্য ছিল আট হাজার ফিট। সব থেকে বড়ো ছবি তখন এলো—'কুয়ো ভ্যাডিস'। বারো তেরো হাজার ফিট। ইটালি দেশে তোলা। রোম-এর Cines কোম্পানীর ছবি। এই এক ছবিতে চলচ্চিত্র শিল্প হিসাবে সম্মান পেলো এবং মঞ্চের সম্ভ্রমের সমান হলো। তার আগে সিনেমাকে কেউ আর্ট বলে নিতো না, বড়ো অভিনেতারাও চাইতেন না অভিনয় করতে। আমি অবশ্য ১৯০৮ সালের কথা বলছি। মেরী পিকফোর্ড ফিল্ম জগতে এক বিখ্যাত নাম, ওঁকে বলা হতো, 'সুইট হার্ট অব দি ওয়ার্লড'। সেই মেরী তখন ব্রডওয়ের মঞ্চে ছোট-ছোট পার্ট করতেন, আদৌ স্টার নন। মেরী তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, সেই তখনকার দিনে, যখন আমাদের কোনো নাম নেই, তখন নিউইয়র্কে বায়োগ্রাফ স্টুডিওতে ঢুকতাম আর বেরুতাম চুপিচুপি, চোরের মতো, যেন কেউ না দেখে! লোকে ঘৃণা করবে!

গ্রামোফোনে যেমন কণ্ঠস্বরটা লোকে রেকর্ড করে রাখতে চাইতো, যাতে মরে গেলেও প্রিয়জনরা কিছু সান্ত্বনা পায়, তেমনি অভিনেতারা শখ করে দুটো-একটা ছবিতে নেমে যেতেন, যাতে করে প্রিয়জনরা একটি স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখতে পারে।

'কুয়ো ভ্যাডিস' দিলো সবার সব ধারণা ওলোটপালোট করে। বারো-তেরো হাজার ফিটের ছবি যে কেউ এককালীন বসে দেখবে, একথা এর আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। ছবির জাঁকজমকে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। ছবির দৃশ্যপট ত তৈরিই করা হয় বলে জানি, কিন্তু এই ছবিতে নীরোর প্রাসাদ, রোমের অন্যান্য দৃশ্য, সব যেন সত্যিকার বস্তু থেকে নেওয়া মনে হলো! প্রাসাদের মেঝেগুলি এতো পালিশ করা যে, মুখ দেখতে পাওয়া যায়। অ্যারিনাতে হাজার হাজার দর্শক বসে গেছে, নীরো বসে বসে সব দেখছেন আর খাচ্ছেন। সামনে চলেছে 'চ্যারিয়ট রেস'! কী তার বেগ! প্রবলবেগে রথ ছুটছে আর ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে! দুজন পেশাদারী মল্ল যুদ্ধ করতে নামল। একজনকে ফেলে দিয়ে আরেকজন তার বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরবারি উন্মুক্ত করে। নীরোর ইঙ্গিতের অপেক্ষা। সম্রাট মর্জিমতো যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচু দিকে তোলেন, লোকটি তাহলে বেঁচে যাবে। আর যদি নীচের দিকে নির্দেশ করেন, যাকে বলা হতো 'থাম্‌বস ডাউন', তাহলে পরাজিত মল্লটি মারা পড়বে তক্ষুনি। তরবারির আঘাতে। এর পরে ছেড়ে দেওয়া হলো খৃষ্টানদের ক্ষুধার্ত সিংহের সম্মুখে। এগিয়ে আসছে সিংহ। একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপরে দেহটা গুটিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে চার্জ করলে শিকারের ওপরে। ছবি এখানে কেটে দিলে। এছাড়া অপর দৃশ্যটি। নায়িকা লিজিয়াকে ষাঁড়ের পিঠে বেঁধে ষাঁড়টাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হলো। তার রক্ষক ক্রীতদাস উরসাস, যিনি তাকে বহুবার বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, তাঁকে সে-সময় অন্ধকারময় কক্ষ থেকে হঠাৎ রৌদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। খ্যাপা ষাঁড়টা শিং নীচু করে এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। অতীব শক্তিমান পুরুষ তিনি। ষাঁড়ের শিং দুটো ধরলেন চেপে শক্ত হাতে। যুদ্ধ হলো শুরু, ষাঁড়টা একবার ওঁকে ঠেলে পিছিয়ে নিয়ে যায়, আরেকবার উনি ঠেলে পিছিয়ে নিয়ে যান ষাঁড়টাকে। পিঠের ওপর হাত-পা-বাঁধা মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। যুদ্ধটা ছেলেখেলা যুদ্ধ হলো না, রীতিমত পেশী সংকোচন দেখতে পাচ্ছি। শিংটা ধরে শেষ পর্যন্ত ষাঁড়টার ঘাড় তিনি মটকে দিলেন, মুখ বেঁকিয়ে মাটিতে পড়ল সেটা, গলগল করে মুখ দিয়ে বেরুলো রক্ত। উনি এগিয়ে গিয়ে জ্ঞানহারা মেয়েটার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে দু হাতে করে কোলে তুলে নিলেন। এছাড়া নীরোর প্রাসাদে পানোন্মত্ত নরনারী। বিরাট হল-ঘর, বিপুল তার সমারোহ। বড়ো বড়ো থাম। 'হিস্টোরিয়ান্স হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্লড'-এ রোমের যে ছবি দেখেছিলাম, এ যেন দেখলাম তারই প্রতিচ্ছবি। সিসিল ডি মিলের রোমান ছবি পরে অনেক দেখেছি, মনে হয়েছিল, সবাই যেন সেজেগুজে এসেছে, পোশাক-আশাকে একটু পারিপাট্য এই যা! এঁদের কিন্তু সবকিছু সরল, সহজ, ঐতিহাসিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভূমিকা বণ্টনও অদ্ভুত। নায়ক মার্কাস যিনি হয়েছিলেন, তাঁর রূপে রীতিমত আকৃষ্ট হতে হয়। 'আমলেত্তো নভেল্লি' এঁর নাম। 'নভেল্লি' বলে ইটালীতে তখন যে বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ছিলেন, ইনি তাঁরই ছেলে। বলিষ্ঠ নায়কোচিত গঠন, অভিনয়েও মুগ্ধ করে দিলেন। একটু মঞ্চঘেঁষাই ছিল এঁদের অভিনয়, কিন্তু

ইতিহাসের পারিপার্শ্বিকের ছবিতে তা মানিয়ে গেছে। স্থূলকায় নীরোর যে-রকম চেহারা হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি নীরোই দেখলাম। পেট্রোনিয়াসেরও এমন চেহারা যে ভুলবার নয়! মেয়েগুলিও অপূর্ব সুন্দরী মনে হয়, বেছে-বেছে নেওয়া। এসে সামনে দাঁড়ালেই মুগ্ধ হতে হয়, এমনি তাদের রূপ!

এরপর, ইটালীরই আম্বোসিও কোং করলে 'লাস্ট ডেজ অব পম্পিয়াই'। ইটালিয়া কোং করলে বিখ্যাত ইটালিয়ান কবি ও সৈনিক গ্যাব্রিয়েলে দানানজিও-র গল্প 'ক্যাবেরিয়া'। জাঁকজমকের যতো ছবি হয়েছে, একে কেউ ছাড়াতে পারেনি, এমন কি গ্রিফিথের 'ইনটলারেন্স'ও তুলনায় এতটা পেরে ওঠেনি। মন্দিরের ভিতরে দেবতার মূর্তি তৈরি হয়েছিল ১২৫ ফিট উঁচু করে। কার্থেজের সৈন্যদল আসছে তুষারাবৃত আল্পস পর্বতমালা পার হয়ে। অসংখ্য শ্রেণীর সৈনিক চলেছে বরফের ওপর দিয়ে, পদাতিক, অশ্বারোহী, নানারকম। নগরকে অবরুদ্ধ করল তারা। তারপর যুদ্ধ। পাথর ছুঁড়ে মারছে, নগর প্রাকার থেকে ফুটন্ত গরম জল ফেলা হচ্ছে। অবলঙ-সাইজের বড়ো-বড়ো ঢাল মাথায় রাখছে একদল। তার ওপরে উঠে দাঁড়াচ্ছে আরেক দল, তারা মাথায় দিচ্ছে ঢাল, তার ওপরে আবার আরেক দল, এমনি করে করে গড়ে উঠত মানুষের পিরামিড। এই পিরামিডের আকারে নগর প্রাকারের শীর্ষে ওঠবার চেষ্টা ও যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ আত্মরক্ষার জন্য বস্তা বস্তা লঙ্কার গুঁড়ো ফেলছে, আর ঢালের পিরামিড-করা সৈন্যরা প্রবল হাঁচির ধাক্কায় এক-এক করে ধপাস ধপাস করে পড়ে যাচ্ছে, সে এক দৃশ্য! আক্রমণের আরও পদ্ধতি আছে। পিরামিড করে প্রকাণ্ড শালবল্লী ঝুলিয়ে দশ-বারো জন মিলে ঢাঁই করে মারছে দুর্গের সিংহদরজায়। ভাঙবার চেষ্টা করছে। আতস কাঁচ দিয়ে যেমন কাগজ পোড়ানো যায়, তেমনি সূর্যের আলোককে কেন্দ্রীভূত করে আর্কিমিডিস করছেন কী, 'রিফ্লেক্টিং মিরর' দিয়ে ফেলছেন বিপক্ষের যুদ্ধ জাহাজের ওপরে, আর জাহাজগুলি দাউ দাউ করে জলে যাচ্ছে! আসল গল্পটা অবশ্য জাঁকজমকের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল, তখনো তা ঠিক বুঝতে পারিনি, আজ ত মনেই নেই—দৈত্য-গোছের একটা লোক ছিল, সে নাকি জেনোয়া বন্দরে কুলিগিরি করত। অতিকায় তুলোর গাঁট পাঁচ-সাত মণ ওজন হবে, সে একাই ওঠাতো আর নামাতো। কেউ কেউ বলেন, তুলোর গাঁট নয়, সাধারণ আসবাবপত্র। চিত্র-প্রযোজক ওকে দেখে ছবিতে কাজ করবার জন্য নিয়ে আসেন। নাম স্যাকিস্ট। অভিনয় কিছু করতে পারেনি, তবে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। পরে একে নিয়ে আরও দু একটি শক্তিমত্তার পরিচিতি সম্বলিত ছবি তোলা হয়েছিল বলে শুনেছিলাম।

এর পরে দেখেছিলাম—স্যালাম্বো। এতো জাঁকজমকের ছবি নয়, তবে শিল্পসম্মত ছবি। এটিও ইটালিয়ান ছবি, বোধ হয় প্যাসক্যালের। ওদিকে সাইনস কোম্পানী উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও ছবি তুললে। অ্যান্টনী ক্লিওপেট্রা, জুলিয়াস সীজার, অ্যাগ্রিপিনা। (এর আগে নীরো ও অ্যাগ্রিপিনা বলে ছবি একখানা হয়ে গেছে।) ওদের শেষ ছবি, একটা সামাজিক ছবি, নাম—'অবতার'।

একেবারে বাংলা নাম। একজনের আত্মা আরেকজনের মধ্যে চালু করে দেয় ওদেশেরই এক যোগী, এই নিয়ে গল্প। এতেও 'নভেল্লি' অভিনয় করেছিলেন। নভেল্লিকে ম্যাডানরা এদেশে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। তার আসার কথাও সব ঠিকঠাক, চুক্তিবদ্ধও হয়েছেন। কিন্তু কাগজে হঠাৎ একদিন দেখলাম, তিনি মারা গেছেন। এদেশে আসা তাঁর আর হলো না।

জাঁকজমকের ছবির এতো সাফল্য লক্ষ্য করে, শেষ পর্যন্ত গ্রিফিথের মতো লোকেরও মাথা ঘুরে গেল। ডি. ডাবলিউ গ্রিফিথ—সিনেমা শিল্পের যিনি শ্রেষ্ঠ কারিগর, যিনি 'বার্থ অব নেশন'-এর মতো ছবি করে সবার শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন, এবার তিনিও নেমে পড়লেন জাঁকজমকের ছবি করতে। বহু ব্যয় করে, বহু দিন ধরে, তিনি ছবি তুললেন—'ইনটলারেন্স।' দু-ভাগে দেখানো হতো এত বড়ো ছবি। চারিটি গল্প একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। চারটি যুগের চারটি গল্প। (১) সাইরাস যে সময়ে ব্যাবিলন আক্রমণ করেন এবং তখন ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন বাল্‌থাজার। ব্যাবিলনের উচ্চতম পুরোহিত (High Priest) বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্যাবিলনকে সাইরাসের হাতে তুলে দিলেন। (২) যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। এতেও তাঁর জনৈক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা। জুডাস বা জুডা তার নাম। (৩) ফরাসী দেশে প্রটেস্ট্যান্ট আর ক্যাথলিকের যুদ্ধ। ইতিহাসে 'সেন্ট বার্থালোমিউস ম্যাসাকার' বলে যে ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে। (৪) বর্তমান আমেরিকা। যেখানে কারখানা আর ধর্মঘট চলেছে। ধর্মঘটীদের একজনের স্ত্রী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। এই চারিটি গল্পকে বন্ধন করেছেন একটি সূত্রে এবং তার প্রতীক হচ্ছে—মা আর ছেলে—শিশুকে দোলনায় দোলা দিয়ে দিয়ে গান গাইছে মা। সভ্যতার আদি যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ শিশুই রয়ে গেছে, বড়ো আর হলো না। প্রকৃতি মায়ের মতো সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে। প্রকৃতির স্নেহ না হলে এরা মানুষ হয় না। হিংসা, দ্বেষ আর অসহিষ্ণুতা—এ সবই শিশু-সুলভ। এ বুঝি আজও চলে আসছে।

কিন্তু লোকে এ ছবি ঠিক বুঝতে পারলে না।

"The four stories culminate in a plea for tolerance."

চার যুগের চারটি গল্প পাশাপাশি চলছে। চারটি যুগ যেন চারটি বেণী দিয়ে একত্র গ্রথিত করা। গ্রিফিথ সিনেমার ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তার জন্মদাতা। কিন্তু ওঁর চিন্তা এত অগ্রসর যে, লোকে তা অনুসরণ করতে পারলো না, তাদের কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল ছবিটি। অথচ এত অর্থব্যয় করবার পর গ্রিফিথের পক্ষে ব্যবসায়ে দাঁড়ানো হলো শক্ত। এরপরে দু একটা মাত্র ছবি তিনি করেছিলেন, আর তোলেননি।

পিকচার হাউসে বসে বসে আর যে-সব ছবি দেখেছিলাম, তার মধ্যে সিসিল-ডি-মিলের 'মেল এণ্ড ফিমেল' এবং ফেডা বারা অভিনীত 'ক্লিয়োপেট্রা'র কথা বেশ মনে আছে। ক্লিয়োপেট্রা স্নান করছেন অতিকায় এক ময়ূরের পেখমের ফোয়ারার নীচে। প্রতি পেখমের 'চোখ' থেকে

জল পড়ছে ঝিরঝির করে। আর দেখেছিলাম, নাজিমোভা অভিনীত 'সালোম' এবং রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর বহু ছবি।

এইসব দেখাশোনার ফল হলো এই যে, আমাদের ছবিতে কিছু কিছু নকল করবার ইচ্ছা হলো। সিনারিওটা সত্যিই বদলে ফেললাম। এইসব ধরনের কিছু কিছু দৃশ্যও যুক্ত হলো তাতে। আমার গল্পে যে পানভোজ প্রভৃতির একটা দৃশ্য আছে, সেটা 'কুয়ো ভ্যাডিস'-এর অনুরূপ করব, অভিলাষ হলো। কিন্তু পাবো কোথায় অতো লোক। ক্রীড্ বললে, জনা পঁচিশেক লোক নিও, এমনভাবে ক্যামেরা বসাবো যে, বহু লোক বোঝাবে!

ছবির প্রারম্ভ বা পূর্বাভাস হিসাবে আমি আরও একটা জিনিস করেছিলাম। এক আত্মা, কোনো কারণে তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কতো জন্মে—কতো বার তারা ঘটনাচক্রে কাছাকাছি হয়, তবু মিলতে পারে না। ক্যামেরার 'ডাবল এক্সপোজার' কৌশলে আমারই ছবি থেকে বেরিয়ে এসেছিল নায়িকা, তারপরে সরে গেল পরস্পর থেকে দূর—বহু দূরে—ধীরে ধীরে তারা মিলিয়ে গেল বিরাট মহাশূন্যে। টাইটেলে লেখা পড়ল—'Till Eternity'।

সিনারিও নতুন করে লেখবার পর, তা একদিন সবাইকে শোনালাম। মুখুজ্যে মশাইকেও। তিনি বললেন—এবার গল্পের নাম একটা ঠিক করে ফেলুন।

—বেশ।

গল্পের ঐ যে দাসী, যার ভাষা ধর্মপাল বোঝে না, তার নাম তিনি রাখলেন—রমোলা। আমার এই রমোলা চরিত্রটি খুব ভালো লাগল। সে ভাষায় কিছু বোঝাতে পারে না। মাত্র অঙ্গভঙ্গি, ইশারা ইঙ্গিত আর চোখের ভাষায় তার সবকিছু ব্যক্ত করছে। নায়কও তার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু কোথা থেকে এলো গভীর এই প্রেম, যদি না কোথাও এর সূত্র থেকে থাকে? কামনার হুতাশন নয়, সত্যিকার প্রেমের দীপশিখা। রূপ নয়, রূপাতীত কিছু। সব ঠেলে ফেলে যা ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। এ আকর্ষণ বুঝি জন্মান্তরের। নইলে এমনটি হয় না। এ আকুতি আত্মার।

এটা ভাবতে ভাবতেই গল্পের নাম এসে গেল। তবে ইংরাজী নাম। প্রফুল্ল একটু খুঁতখুঁত করলে, বললে—বাংলা নাম পেলে না? কিন্তু মুখুজ্যেমশাই প্রবলভাবে সমর্থন করলেন আমাকে। তখন আবার ছবির ক্ষেত্রে ইংরেজী রুচিই কাজ করত বেশী। কাহিনীর নাম হল 'সোল অফ এ স্লেভ'।

ছয়

১৯২০—১৯২৩

নতুনভাবে যে চিত্রনাট্য করলাম, তা ভালো লাগল সবারই। এবারে প্রশ্ন হলো ভূমিকা বণ্টনের। ঠিক হলো, পেশাদারী অভিনেতাদের আনিয়ে খরচার অঙ্ক না বাড়িয়ে নিজেরাই চেষ্টা করব অভিনয় করবার। ফটোগ্রাফার ত আছেই আমাদের ক্রীড সাহেব, দরকার আমাদের একজন ডিরেক্টর বা পরিচালকের। ঐ যে পিকচার হাউস আগে ছিল প্যেইটি থিয়েটার, তার পরিচালক ছিলেন এক সাহেব। আমরা গেলাম তাঁর কাছে। গল্পটা শুনে তাঁর খুব পছন্দ হলো, রাজীও হলেন তিনি পরিচালনা করতে, কিন্তু টাকা যা চাইলেন, তাতে ত আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। টাকা চাইলেন দশটি হাজার। একি সম্ভব? কখনই সয়। অথচ পরিচালনার দায়িত্ব নেবেই বা কে? গোকুল পরামর্শ দিলেন—আপনিই নিন না নিজে। গল্প লিখেছেন, সিনারিও লিখেছেন, অভিনয়ও করবেন, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দৃশ্যপটাদিও করছি, আপনার পারিচালনা হলেই ত কাজ হবে ভালো।

আপত্তি ছিল না নিজে পরিচালক হওয়ার। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম, আমি এ লাইনে নবাগত এবং অখ্যাতই শুধু নয়, বয়সে ছেলেমানুষ, আমাকে ত সবাই হেসে উড়িয়ে দেবে! আমাদের দরকার একজন মুরুব্বি গোছের লোক, যিনি হতে পারবেন দলের কর্ণধার। কাজ-টাজ যা করবার, তা নয় আমি করে দিলাম আমার সাধ্যমতো, কিন্তু মাথার ওপর চাই একজন ভারিক্কি লোক। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব এলো। মুখার্জি সাহেবের নাম। বেশ কথা। গেলাম আমরা তাঁর কাছে। প্রথমটায় ত তিনি রাজী হন না, বলেন—আমার কতো কাজ দেখছেন ত!

পরে অবশ্য আমাদের অনুরোধ-উপরোধে সম্মত হলেন তিনি। বললেন—বিস্তৃতভাবে যে সিনারিওটা করেছেন, ওটা রেখে যান। পড়ে দেখি। আর সিন-সেটের নক্সা-টক্সা যা করেছেন, তা-ও দিয়ে যান, দেখে রাখব।

—বেশ ত।

মুখার্জি বললেন—শুনুন। দেখে-টেখে সব রাখছি বটে, কিন্তু আমার যা অফিসের কাজ, সময় বেশী দিতে পারবো না, মাথাও যে খুব ঘামাতে পারব, তা-ও নয়। সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য চাই।

—নিশ্চয়ই তা পাবেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, তবু ত ডিরেক্টর একজন হলেম!

পুরুষ-ভূমিকাগুলির ব্যবস্থাই করা হলো প্রথমে। নায়ক ধর্মপালের ভূমিকা সবাই একমত হয়ে

দিলেন আমাকে। নায়িকার যে ভাই, সেই ভূমিকাটি নিলো—প্রফুল্ল। বাইরে থেকে পেশাদার কাউকে আনব না, তাই নিজেদের মধ্য থেকেই সবাইকে সব করতে হবে। জয়পাল হলেন আমাদের যুগলকিশোর বসু, নেংটিদা—বয়সে প্রবীণ, চেহারাও ওঁর সুন্দর। ধর্মপালের বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভূমিকাটি নিলো নেড়ু—যার নাম সুধীরবাবু। আর, ধর্মপালের জনৈক সহচর হলেন গোকুলবাবু। অভিনয় করতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু আমাদের অনুরোধ-উপরোধে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন ভূমিকা। দাস-ব্যবসায়ী হলেন জ্যোতিষ মিত্র। এবার বেশী রইল সর্দারের ভূমিকা। হেমবাবুকেই ঠিক করলাম আমরা। হেমবাবু, মানে মুখার্জি সাহেব। বেশ ভারিক্কী জাঁদরেল চেহারা, সুন্দর মানাবে। কিন্তু উনিও কি রাজী হন সহজে? শেষ পর্যন্ত আমাদের আগ্রহে ওঁর আপত্তি অবশ্য টিঁকল না।

এইবার, নারী-চরিত্রের কথা। যে-পটভূমিকার গল্প, তাতে বাঙালী মেয়ে নিলে ঠিক খাপ খাবে না। এদিক থেকে ম্যাডানের পথ অনুসরণ করাই প্রশস্ত। চেহারার সৌষ্ঠব দরকার। বিদেশিনী, কিংবা ফিরিঙ্গি। কথা কইবার ত বালাই নেই, তবে আর অসুবিধা কী? দুটি ত নারী চরিত্র। নায়িকা ক্রীতদাসীর নাম দিয়েছিলাম—রমোলা। আর ধর্মপালের প্রিয় যে রক্ষিতার কথা আছে গল্পে, তার নামকরণ করেছিলাম—ইলা। মুখুজ্যেমশাই বললেন—এই রমোলা আর ইলার জন্য স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।

—বেশ।

আর, দাসী করঙ্ক বাহিনী ইত্যাদি যেসব ছোট ছোট নারী ভূমিকা আছে, তার জন্য মোটামুটি সুগঠিত চেহারার এবং সুশ্রী মুখের দেশী মেয়ে পেলেই চলবে। অভিনয় যখন কিছু তাদের নেই, তখন তা পাওয়াও অসম্ভব হবে না। রূপোপজীবিনীদের মধ্য থেকে বেছে নিলেই হবে। যাই হোক, বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে-সব দরখাস্ত এলো, পাঠানো হলো মুখুজ্যে মশায়ের কাছেই। উনিই সে-সব পড়ে দেখতেন। একটি মেয়েকে পছন্দ করে উনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। গেলাম প্রফুল্ল আর আমি ওঁর অফিসে।

ফরাসী মেয়ে। বসে আছে চেয়ারে। সঙ্গে তার স্বামী। মাথার টুপি খুলিয়ে দাঁড় করিয়ে, আমরা তাকে দেখলাম। স্থূলাঙ্গিনী নয়, রীতিমত সুন্দরী। যাকে বলে—পুতুলের মতো মেয়ে। ক্রীড্ সাহেবও ছিল আমাদের সঙ্গে। বললাম—ঠিক আছে। পরে আমরা খবর দেবো।

মেয়েটি অভিবাদন জানিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল।

বসলাম আমরা তখন চারজনে যুক্তি করতে।—এতো চমৎকার মেয়ে! কিন্তু এ নেবে কত টাকা?

মুখুজ্যে মশাই বললেন—বেশী নেবে না। কথাবার্তা কয়ে যা বুঝলাম, স্বামীর পয়সা আছে। দেশ-ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল দুজনে, কলকাতায় এসে, কিছুদিনের জন্যে রয়ে গেছে আর কী। শুনছেন না, শখের ব্যাপার! চাই কী, একটি পয়সাও হয়ত লাগবে না!

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। তাই ত মনে হলো। সিনারিও পড়িয়েছি, ওর ভালোও লেগেছে নায়িকার ভূমিকা।

মনটা খুশীতে ভরে গেল, নায়িকার ভূমিকায় সত্যিই মেয়েটিকে মানাবে!

এবার 'ইলা'র ভূমিকা। যাকে পছন্দ হলো, তার নাম—জুন রিচার্ডস, ব্যাণ্ডম্যানের থিয়েটার কোম্পানীতে কাজ করে মেয়েটি।

মরিস-ই-ব্যাণ্ডম্যান ছিলেন জাতিতে জার্মান, ধর্মে ইহুদী। রক্তে থিয়েটারের ঐতিহ্য ছিল। থাকতেন অধুনা যেখানে রক্সি সিনেমা হয়েছে, তার পাশের বাড়িতে। রক্সির আগের নাম ছিল—এম্পায়ার। সেইখানে ওর দলের অভিনয় হতো তখন। যেখানে তিনি থাকতেন, সেটা ছিল তাঁর কলকাতার হেড-অফিস। একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্য সম্প্রদায়ও গঠন করেছিলেন। আফ্রিকার উপকূল থেকে সারা ভারতবর্ষ, বর্মা, হংকং, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ঘুরে আসতেন। এ-দলে কখনো কখনো বিলাতী অভিনেতাদেরও আনাতেন তিনি। ব্যাণ্ডম্যানকে দেখেছিলাম। অতীব শৌখিন ব্যক্তি, সোনার সিগারেট-কেস ছিল তাঁর, সেটা থেকে সিগারেট বার করে ঠোঁটের ফাঁকে রাখছেন, চোখের সামনে সে-দৃশ্য যেন এখনো দেখতে পাই! আমার মামাদের সেই যে লীণ্ডসে স্ট্রীটের দোকান, তাতে ইনি আসতেন সওদা করতে। এবং সেই সূত্রেই এঁকে দেখা। এঁর দলের নাম ছিল—'ব্যাণ্ডম্যানস ভ্যারাইটি 'শো'—নাচ-গান, হাস্যকৌতুক আর কিছু কিছু অভিনয়, এই সব থাকত। বড়দিনের সময় ব্যাণ্ডমান সাহেব ক্রয় করতেন প্রচুর জুয়েলারী, দলের সবাইকে ঐ সময় ওসব দিতেন উপহার। এহেন ব্যাণ্ডম্যানের দলে ছিল ঐ জুন। জাতে—ইংরেজ। বিলাতের নানান ভ্যারাইটিতে অভিনয় করেছে এবং ওখানকার ছবিতেও ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয় করেছে। সেই হিসাবে, জুন পেশাদারী অভিনেত্রী। তবে 'ইলা'র ভূমিকার জন্য আমরা ওকে নিচ্ছি ত, কাজ খুবই অল্প, পাঁচ ছ' দিনের কাজ মাত্র। সেইজন্য অনেক কথাবার্তার পর তিনশো টাকায় রফা হলো ওর সঙ্গে।

এইভাবে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর, অফিসে একদিন সবাইকে ডেকে, সিনারিও পড়ে শোনাবার ব্যবস্থা করলাম। ঠিক হলো, কী মেয়ে কী ছেলে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সবাইকে এক-এক কপি সিনারিও টাইপ করে দেওয়া হবে। কাজ যখন এমন করে চলছে, হঠাৎ মুখার্জি সাহেব বললেন—এদিকে যে একটা মুশকিল হয়েছে মশাই।

—কী?

—নায়িকা অভিনয় করতে পারবে না।

—সেকি! কেন?

মুখার্জি বললেন—ঐ যে বলেছিলাম, দীর্ঘ দিনের অবকাশে বেড়াতে এসেছিল ওরা এদেশে। হঠাৎ দেশ থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, ওর স্বামীকে অবিলম্বে কর্মব্যপদেশে ফিরে যেতে হবে স্বদেশে। কাজে কাজেই, স্ত্রীও যাবে।

গতির পথে এ যেন হঠাৎ হোঁচট-খেয়ে-পড়া! খানিকটা হতাশ হয়েও পড়লাম। কারণ,

নায়িকা হবার মতোই ছিল মেয়েটি, অদ্ভুত মানাতো। এখন আবার কাকে খুঁজে বার করব, কাকে পাবো আমরা মনের মতো!

মুখার্জি বললেন—দাঁড়ান, আমিই দেখছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালাম ওঁর মুখের দিকে। উনি বললেন—অনেক মেয়ে আসে সিনেমা দেখতে পিকচার হাউসে। আমি নজরে নজরে থাকব, পাওয়া যাবেই উপযুক্ত মেয়ে, ভাববেন না।

সত্যিই তাই হলো। মুখার্জির আলাপ হলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, ঐ সিনেমা হাউসেই। সময়টা তখন ১৯২১ সালের পূজা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সামনে শীত আসছে। তার অর্থ, সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় অনেক সার্কাসের দলও আসছে। আগে-আগে দু-একবার 'উইলিসন উইর্থ'-এর সার্কাস এসেছে, এবারেও আসবে।

মুখার্জি বললেন—সার্কাসের বিলিব্যবস্থা করতে ম্যানেজার আগে এসে পড়ে ত? 'উইলিসন উইর্থ'-এর ম্যানেজার সাহেবও এসেছে। তারই সঙ্গে আলাপ হলো। নাম—মিস্টার উইর্থ। সে বলছে—তার স্ত্রী অভিনয় করতে পারে।

—তারপর?

—বললাম—তাহলে একদিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে এসো তাঁকে। আমরা দেখবো।

—বেশ কথা! উইর্থ সাহেব রাজী হয়ে গেছে।

এ ঘটনার দু-তিন দিন পরেই মুখার্জি বললেন—মেয়েটিকে দেখলাম মশাই। সুন্দর মানাবে। সুগঠিত দেহ, রীতিমত রূপসী। তার ওপর, সার্কাসের মেয়ে ত, ঘোড়ায় চড়তে পারে। আমাদের যেরকম সিন আছে, তাতে ওর ঘোড়ায় চড়াটা কাজে লেগে যাবে। শুনলাম, মেয়েটির নাম হচ্ছে 'আডেলী উইলিসন উইর্থ।' উইলিসন হচ্ছে ওর বাবার নাম। এই উইলিসন সাহেব বহুবার সার্কাসের খেলা দেখাতে এসেছে কলকাতায়। জাতিতে—অস্ট্রেলিয়ান। সার্কাসের মালিক এই উইলিসন সাহেবই বটে, মিস্টার উইর্থ মালিকের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে কোম্পানীর ম্যানেজারও হয়েছেন, অংশীদারও হয়েছেন, এমন কি, কোম্পানীর নাম পর্যন্ত বদলে গিয়ে হয়েছে, 'উইলিসন উইর্থ সার্কাস!' এই সার্কাসে মেয়েটি ঘোড়ার খেলা দেখায়। একে ত অস্ট্রেলিয়ানদের ঘোড়ার খেলা ছিল বিখ্যাত, তার ওপরে মেয়েটি করতো কী, দুরন্ত ঘোড়ার ওপরে জিন না দিয়েই চড়তো।

মুখার্জি বললেন—মেয়েটিকে ডাকি একদিন চা-চক্রে, কী বলেন?

—ডাকুন।

পিকচার হাউসের লনেই চা-চক্র বসল। মুখার্জির বর্ণনা মতো মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী। কিন্তু, তবু কেন যেন, সেই ফরাসী মেয়েটির মুখখানিই ভাসতে লাগল চোখের সামনে। তবে ও-মেয়েটির ভাবভঙ্গি খুব শান্ত, 'দাসী'র ভূমিকায় যে সুন্দর মানাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চোখ দুটি বড়ো-

বড়ো, দৃষ্টিও কোমল, শান্ত। চলনভঙ্গিও সংযত। জুনের মতো অতো চাঞ্চল্য ওর মধ্যে একেবারে নেই। ভালোই হলো। চাঞ্চল্য 'ইলা'তেই মানায়, 'রমোলায়' নয়।

পছন্দ হলো, কথাবার্তাও স্থির হয়ে গেল। চুক্তি হলো, সর্বসমেত পাঁচশো টাকা দিতে হবে।

এই সব কাজকর্ম ত চলেছে আমাদের ছবির। নিজেদের ব্যাপার নিয়ে এমন ব্যস্ত আমরা যে, বাইরের কোনো খবর রাখি না বললেই হয়। তবু তারই মধ্যে একদিন কানে এলো, ফিল্ম তোলার একটি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে, তার নাম 'ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী'। বনহুগলীতে—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর, একটি বাগানবাড়ী ভাড়া নিয়ে তাঁরা ছবি তুলছেন। এঁদের কর্ণধারদের মধ্যে আছেন নীতিশ লাহিড়ী। (লাহিড়ী লিখতেন না, বানান লিখতেন, লাহারী) আমাদের মুখার্জি সাহেবের মতোই সাহেব। মুখার্জি তবু নামটা ঠিক রেখেছিলেন; ইনি সেটিকেও বদলে করেছেন—এন সি লাহারী। 'লা-হ্যারী' আর কী! বাঙ্গলা কথাই বলেন, তবে কম। আশ্চর্যের কিছু নেই, সে-যুগে বহু লোকই এমন ছিলেন, বাঙ্গলা কম বলতেন, চলনে-বলনে একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব। ভালো ইংরেজী বলতেও পারেন, লিখতেও পারেন, যুক্ত ছিলেন ম্যাডানদের সঙ্গে। তবে সাহেব হোন, যাই হোন, আসলে ইনি সদালাপী এবং সামাজিক ব্যক্তি। 'ইণ্ডো ব্রিটিশ'-এর আরেকজন কর্ণধার হচ্ছেন—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, 'ডি-জি' নামে যিনি ছিলেন সমধিক বিখ্যাত। ইনি আর্ট স্কুলে গোকুলবাবুর সঙ্গেই পড়তেন, পাশ করে বেরিয়ে চলে যান হায়দ্রাবাদে; সেখানে ওঁর বড়োভাই ছিলেন রাজ-দরবারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। সেই রাজ-দরবারের বহু ছবির কাজ করেছিলেন 'ডি-জি'। ৺বামন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র এঁরা। স্মৃতির সাহায্যনিয়েই বলছি, বড়ভাই থাকতেন হায়দ্রাবাদে, আরেক ভাই—এলাহাবাদে। সেই ভাইয়েরই কন্যা—অরুণা, যিনি পরে বিবাহিতা-জীবনে হয়েছিলেন 'অরুণা আসফ আলী।' আর-এক ভাই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জামাতা—নগেন্দ্রবাবু। বিলেত থেকে ইনি কৃষিবিদ্যা শিখে এসেছিলেন, পরে বিলেতে গিয়েই কাজ করতেন। এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সুপুরুষ ব্যক্তি। এঁদেরই কনিষ্ঠ হচ্ছেন—ধীরেনবাবু। অভিনয়ের দিকে চিরদিনই ঝোঁক ছিল ধীরেনবাবুর, নানা রকম সাজসজ্জা নিয়ে—নানান হাবভাবে ছবি তুলতেন। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন চরিত্রের রূপসজ্জায় সেজে, এমন কি, ডবল এক্সপোজরে দুটো চরিত্র—পুরুষ ও নারী সেজে ছবি তুলেছেন। 'এক্সপ্রেশন এ্যাণ্ড ক্যারেকেচার' বলে ছবি সম্পর্কিত একটি বইও বার করেন ১৯১৯ সালে। শুনলাম এই ধীরেনবাবু 'ইণ্ডো ব্রিটিশের' ছবিতে অভিনয়ও করবেন, ছবির ডিরেকশনও দেবেন।

এঁদের সঙ্গে আরও এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি জ্যোতিষবাবু, জ্যোতিষ সরকার মশাই। তখনকার যুগে ইনি একজন বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার বা ক্যামেরাম্যান। প্রথম দিকে ইনি যুক্ত ছিলেন প্যাথি কোম্পানীর সঙ্গে। প্যাথির যেসব 'নিউজ রীল' সে সময় বেরুতো দূর প্রাচ্য থেকে, আমরা সেসব কলকাতায় বসে দেখতাম বটে, কিন্তু তা ঘুরে ঘুরে অসাধারণ পরিশ্রম করে যাঁরা খুঁজে আনতেন, ইনি

তাঁদের অন্যতম। সেই স্বত্রে কখনো ইনি যাচ্ছেন সিঙ্গাপুর, কখনো হংকং, কখনো পেনাং, ইত্যাদি। সেই সব জায়গা থেকে ছবি তুলে ইনি পাঠাতেন প্যাথি কোম্পানীতে। পুরনো বেন্টিক স্ট্রীট আর এসপ্লানেডের মোড়ে, ডি. গুপ্তদের বাড়ির ওপরে ছিল প্যাথি কোম্পানীর কলকাতার অফিস। সেই অফিসের একাংশে ইনিও বসতেন। ওঁর সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলবার আছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন ভারতে আসেন, তখন সম্রাটের 'ফিল্ম প্রজেক্টর অপারেটর' হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এই জ্যোতিষবাবুই। সম্রাটকে ফিল্ম দেখাতেন, সম্রাটের সঙ্গে এঁকে ঘুরতেও হয়েছিল। এক কথায়, দেশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ওঁর থেকে বড়ো ফটোগ্রাফার তখন আর কেউ ছিল না। তারপর প্যাথি যখন নিজের অফিস তুলে দিয়ে ম্যাডানকে এজেন্সী দিলে, তখন জ্যোতিষবাবু এলেন ম্যাডানে। ম্যাডানে একটা ছবিও উনি তুলেছিলেন—হরিশ্চন্দ্র। ম্যাডানেরই বই, উনি ছিলেন সিনেমাটোগ্রাফার ও পরিচালক, দুই-ই। এই 'হরিশ্চন্দ্রের' সঙ্গে হরমুশজী তাস্রা'র নাম বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে। ইনি ছিলেন তখনকার সুবিখ্যাত পার্শী অভিনেতা, ওঁর একটি নাট্যসম্প্রদায়ও ছিল। এই সম্প্রদায় নিয়ে তাস্রা এলেন কলকাতায় 'কোরিন্থিয়ানে' অভিনয় করতে। বইয়ের নাম ছিল— হরিশ্চন্দ্র, এবং নাম-ভূমিকায় ছিলেন তাস্রা সাহেব নিজে। অভিনয়ের জন্য ওঁর তখন পদবী হয়েছিল 'আরভিং অফ ইণ্ডিয়া!' জ্যোতিষবাবু ম্যাডানদের রুস্তমজীকে বুঝিয়ে ঐ হরিশ্চন্দ্রই ফিল্মে তোলার ব্যবস্থা করলেন। 'হরিশ্চন্দ্র'-এর ভূমিকায়—'আরভিং অফ ইণ্ডিয়া'—তাস্রা সাহেব। যখনকার কথা বলছিলাম, এসব অবশ্যি তারও আগেকার কথা।

এহেন যে জ্যোতিষ সরকার মশাই, তিনি হয়েছেন 'ইণ্ডো ব্রিটিশ-'এর সর্ববিষয়ের কর্তা। কোম্পানীর মালিক ছিলেন অবশ্য সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী পি. এন. দত্ত মশাই। প্রচুর অর্থের মালিক। সুতরাং এঁরা যে একটা কিছু করে তুলবেনই ফিল্ম শিল্পে এ আর আশ্চর্য কী! কতো কী শুনতাম আমরা তখন! শুনতাম, বজবজের সন্নিকটে আখড়া বা হুগি গ্রামের গায়ে গঙ্গার ধারে বহু জমি নিয়ে আমেরিকার হলিউডের মতো বিপুল এক কলোনী গড়ে তুলবেন ওঁরা। এ-ও ওঁদের পক্ষে করে তোলা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। যে অর্থ আর সামর্থ্য ওঁদের ছিল, তাতে বিরাট কোনো পরিকল্পনাকে রূপদান করা ওঁদের পক্ষে কঠিন কাজ কিছু নয়। মোটকথা, কাজে নেমে ওঁরা বিরাট এক প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিলেন আমাদের মনে। কতো কথাই না কানে আসত ওঁদের সম্বন্ধে। আর সেই সময় শুনতে পেলাম—শখের অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কথা। তিনি নাকি পেশাদারী মঞ্চে যোগদান করছেন।

তখনকার সারা কলকাতার সাক্ষ্য আমি দিতে পারব না, তবে আমাদের দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে তখন রীতিমত একটি আলোড়ন জেগেছে, কে এই শিশিরকুমার? তখনকার দিনে খুব বড়ো "শৌখীন" অভিনেতা বলে আমরা জানতাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মশাইকে। ইনি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং প্রিয় শিষ্য ছিলেন বলে শুনেছি। প্রমথবাবুর নাম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে প্রমথবাবুর কথা উল্লেখ করেছেন। মজঃফরপুরে প্রমথবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শরৎচন্দ্রের ১৯০২ সালে, একথাও উল্লেখ করেছেন ব্রজেনবাবু। এই প্রমথবাবুরই যোগাযোগে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। প্রমথবাবু শুধু খুব বড়ো অভিনেতাই ছিলেন না, নাট্যকারও ছিলেন। ওঁর নাটক "ক্লিওপেট্রা", মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছিল ১৯১৪ সালে। সেক্সপিয়রের নাটকের কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হলেও যথেষ্ট তফাৎ আছে, নাটকটির রচনা ও গদ্যে "সি" নামক বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক রাইডার হ্যাগার্ড। রাইডার হ্যাগার্ডের আরেকটি উপন্যাস আছে "ক্লিওপেট্রা" নামে। এই উপন্যাসের উপাদান থেকেই এর কাহিনী বহুলাংশে আয়োজিত। সেই সময়, কিম্বা তারও কিছু আগে, বিলেতে স্যার বীরভোম ট্রী সেক্সপিয়রের ঐ নাটকটি যথেষ্ট সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করছিলেন। সেই অভিনয়ের শততম রজনীর স্মারকগ্রন্থ কলকাতায় পাওয়া যেতো তখন। প্রমথবাবু এরই এক কপি সম্ভবতঃ পেয়েছিলেন 'সঙ্গীত-সমাজ'এর চারু মিত্রের কাছ থেকে, তাঁর কথা পরে বলব। প্রমথবাবুর 'ক্লিওপেট্রা' নাটকে যেসব ছবি আছে, তা ঐ বীরভোম ট্রী ও তার সম্প্রদায়ের, সেগুলি উক্ত স্মারক-গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। প্রমথবাবু ছিলেন তখনকার শৌখীন নাট্যসংস্থা "ইভনিং ক্লাব"-এর নেতা, শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা। উনি অবশ্য 'ইভনিং ক্লাব' ছাড়া আরও দু'তিন জায়গায় নাট্যশিক্ষকতা করেছেন। 'মিনার্ভায়' অভিনীত 'ক্লিওপেট্রা'য় দানীবাবু হয়েছিলেন 'অ্যান্টনী,' তারাসুন্দরী—'ক্লিওপেট্রা'। ইভনিং ক্লাব যখন ১৯১১ সালে "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় করেন, তখন প্রমথবাবু হয়েছিলেন চাণক্য। এঁদের অভিনয়ের এক সপ্তাহ পরেই 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনীত হয় 'মিনার্ভা'য়। সেখানে 'চাণক্য' ছিলেন—দানীবাবু। পেশাদারী মঞ্চাভিনয়ের দিক দিয়ে ধরলে দানীবাবুই প্রথমতম 'চাণক্য' কিন্তু পেশাদারী-অপেশাদারী প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে ধরলে, প্রথম অভিনয়ের গৌরব প্রমথবাবুর প্রাপ্য। শুনেছি দ্বিজেন্দ্রলাল আগাগোড়া নিজের মনের মতো করে 'চাণক্য'-র ভূমিকা শিক্ষাদান করেছিলেন প্রমথবাবুকে। কিন্তু মিনার্ভার রিহার্স্যালে যখন রায় মশাই গিয়ে বসলেন, তখন দানীবাবু সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে একটা সন্দেহ পোষণ করেই বসলেন।

'দানী অনেক ভূমিকাই ভালো করেছে কিন্তু এ ধরণের চরিত্র কি সে পারবে?'—এই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সন্দেহ। তিনি 'চাণক্য' চরিত্রের মর্মকথা ও ভাব নানান ভাবে বোঝাচ্ছিলেন দানীবাবুকে। দানীবাবু বললেন—আমি করছি, আপনি দেখুন। কিছু না হলে, তখন বলবেন।

এই বলে, সেদিন মহলায় দানীবাবু যা করলেন, তা দেখে রায় মশাই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরে বলেছিলেন এ'এক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম! যা আমি ভেবেছিলাম ঠিক সেরকমটি নয়, কিন্তু অদ্ভুত! তাই দানীকে আর কিছু বলতে পারলাম না। মিনার্ভায় সপ্তাহখানেক আগে 'ইভনিং ক্লাব'-এর অভিনয় হলো। তাতে, প্রমথবাবু করলেন নাট্যকারের নির্দেশমতো 'চাণক্য'। প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পুস্তক-ব্যবসায়ী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন

'চন্দ্রগুপ্ত', তিনকড়ি চক্রবর্তী—সেলুকাস ও ভিক্ষুক। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা গণদেব গাঙ্গুলী, যিনি পরে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অনুরাগী হয়েছিলেন, তিনি সেজেছিলেন—বাচাল। গণদেববাবু সম্পর্কে আরও বলার আছে। তদানীন্তন সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব গাঙ্গুলী, যাঁর ট্রানস্লেসন, ডিক্সনারী প্রভৃতি জনপ্রিয় স্কুলপাঠ্য বই ছিল, তাঁর তৃতীয় পুত্র হচ্ছেন গণদেববাবু। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ১৯১৫ সালে আমরা, আমাদের ক্লাব থেকে 'চন্দ্রগুপ্ত' করেছিলাম। আমাদের সেই অভিনয়ের কিছুদিন পূর্বে শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রবৃন্দ 'চন্দ্রগুপ্ত' করেছিল তাতে শিক্ষকতা করতে যেতেন প্রমথনাথ। আমাদের রয়্যাল ক্লাবের সভ্য প্রমথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, সে তখন ঐ কলেজের ছাত্র, অভিনয়ে সে-ও অংশ গ্রহণ করেছিল। সেই প্রমথর কাছ থেকে আমরা শুনতাম প্রমথবাবুর কথা। তাঁর অদ্ভুত অভিনয় ও শিক্ষাদানের বর্ণনা শুনতাম। তিনকড়িবাবুর কাছ থেকেও শুনেছি। অল্প দিনই বেঁচেছিলেন প্রমথবাবু, কিন্তু রীতিমত শক্তিধর অভিনেতা ছিলেন তিনি।

তখন অভিনয় সম্পর্কে কথা উঠলেই প্রমথবাবুর আলোচনা শোনা যেতো। এই ১৯২১ সালে, শিশিরকুমার সম্পর্কে সেই ধরণের আলোচনার হলো সূত্রপাত। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের ভবানীপুরে, যাত্রা-থিয়েটার-কনসার্টের ক্লাব যে অনেক ছিল, শুধু তা-ই নয়, এক-এক জায়গায় এক-একটি আলোচনা-চক্র ছিল, যাকে সাদা কথায় বলে, আড্ডা। এর সঙ্গে ক্লাবের কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বৈঠকখানায় বসে নাটকপাঠ হতো, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে তুমুল আলোচন হতো। এইরকম একটি আড্ডা ছিল আমাদের পাড়ায় শাঁখারীপাড়ার নীলকুঠির বিপরীত দিকে হীরু সেনের বাড়ির বৈঠকখানায়; যে বরদা সেনের কথা ইতিপূর্বে বলেছি তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র এই হীরু সেন। পাড়ার ছেলেরা অনেকেই এখানে সমবেত হতাম মাঝে মাঝে। পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত নাট্যকার ও সমাজকর্মী নিতাই ভট্টাচার্যও এখানে আসতেন। আমি এখানে পাঠ করতাম, নবীন সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র। এমন কি 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর প্রথম দৃশ্য সেকেন্দার সাহ্-র ভাষণ পর্যন্ত আমার আবৃত্তির অংশ ছিল। আরেকটি আড্ডা ছিল আমাদের পুরাতন দেবেশ্বর ভট্টাচার্যের বাড়ির নীচের তলায়। একটি ছাপাখানা করেছিলেন দেবেশ্বরবাবু—আর্যপ্রেস তার নাম—তারই অফিসঘরে গিয়ে আমরা জমায়েত হতাম। দুপুরে আসর বসত—বিকেলে বসত। পাঠ হতো। তখন 'ব্ল্যাঙ্কভার্স'—অমিত্রাক্ষরছন্দ নিয়ে খুব মতবিরোধ ছিল। আমাদেরই মধ্যে ছিল বিভিন্ন মতবাদ। কেউ সুরে বলা পছন্দ করতেন, কেউ সুর-বর্জিত। দেবেশ্বরবাবু ছিলেন এই 'সুর-বর্জিত' দলের লোক। যখন ইনি আমাদের সেই 'রিজিয়া' শিখিয়েছিলেন তখন আমরা ঐ সুর-বর্জিত ছন্দোপাঠই শিক্ষা করেছিলাম। তারপর, আবার যখন বান্ধব-সমাজে তিনকড়িবাবু ও ভুজঙ্গবাবুর হাতে গিয়ে পড়লাম তখন হলো অন্য রকম। ওঁরা গল্প সুর দিয়ে বলতেন, গিরিশচন্দ্রের ধারার মতো। অমৃতলাল মিত্রের মতো সুরেলা না হলেও একেবারে সুর-বর্জিত তা ছিল না। এঁদের সংস্পর্শে এসে আমরা এঁদেরই রীতিতে

শিক্ষিত হলাম। কিন্তু এই দুই রকমের পদ্ধতি নিয়ে রীতিমত দ্বন্দ্ব ছিল তখন। কেউ বলতেন, এটা ভালো; কেউ বলতেন, ওটা ভালো।

আরও একটা বৈঠক ছিল আমাদের, সেটি তিনকড়িদার বাড়িতে রবিবার সকালবেলা, তাঁর বৈঠকখানায়। এঁর এখানে বসে আমরা উত্তর কলকাতার বড়ো বড়ো নাট্যসংস্থার ক্রিয়াকলাপের কথা শুনতাম। যেমন, ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ, ফ্রেণ্ড্‌স্‌ ড্রামাটিক ক্লাব, ইভনিং ক্লাব, অর্থাৎ যাদের সঙ্গে তিনকড়িদা নিজে সম্যক পরিচিত ছিলেন। এই তিনকড়িদার এখানেই প্রমথবাবুর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আর হয়েছে 'সঙ্গীত সমাজ'-এর নাট্যশিক্ষক চারুচন্দ্র মিত্রের সম্বন্ধে। ইনি কখনো অভিনয় করেছিলেন কিনা জানি না, তবে অভিনয়ের শিক্ষকতা করতেন।

এইসব বৈঠকে যেতে আসতে এতদিন যাদের নাম শুনে এসেছি, তাঁরাই আমাদের কাছে এ যাবৎ ছিলেন বড়ো। এঁদের নামের সঙ্গে হঠাৎ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম যুক্ত হয়ে পড়ায়, তাঁর কৃতিত্বের কথা-টথা শুনে আমরা ত রীতিমত হকচকিয়ে গেলাম। ঠিক বুঝলাম না ইনি কে। শুনলাম, ইনি এম-এ পাশ, এবং প্রফেসর। বি-এ পাশ পেশাদারী অভিনেতা অবশ্য ইতিমধ্যে এসে গেছেন, তবে এম-এ পাশটা নতুন বটে। অবশ্য, ডিগ্রী থাকলেই যে বড়ো অভিনেতা হবেন, এর কোনো অর্থ নেই। মনে হলো ইনি কোনো শৌখীন ব্যক্তিই হবেন। অভিনয়টা হচ্ছে শৌখীন ব্যক্তির ক্ষণিকের শখ। কিন্তু যখন শুনলাম ইনি কলেজের প্রফেসরী ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মঞ্চে যোগদান করছেন, তখন মনে হলো, এ আবার কী উদ্ভট শখ! নানান আলোচনা শুনতে লাগলাম। অনেকে বললেন—অধ্যাপনার মতো সম্মানজনক বৃত্তি ছেড়ে যখন ইনি থিয়েটারে নামলেন, এর কপালে দুঃখ আছে। কলেজ-টলেজে যাতায়াত ছিল হীরুর, ওসব জায়গার বহু খবর সে রাখত। এই হীরুর আড্ডাতেই শুনলাম, শুধু এম-এ পাশই নন, সত্যিকার শক্তিধর অভিনেতা। অনেক অভিনয় করেছেন ইনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। এবং দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। ইনষ্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ 'চাণক্য' করেছেন ও খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং ওঁর অভিনয় দেখবার জন্য সবার আগ্রহ জেগে ওঠা স্বাভাবিক। মোট কথা এঁর থিয়েটারে অবতরণকে কেন্দ্র করে নাট্য-পিপাসুদের মন আশা আর নিরাশার মাঝে দুলতে লাগল। একটা আলোড়ন পড়ে গেল বললেও ভুল বলা হয় না। দর্শকদের আশাও কম নয়। কারণ, বাংলা থিয়েটারের তখন এমন সঙ্গীন অবস্থা যে, যে-কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। খুবই আশঙ্কাজনক। তখন কলকাতায় তিনটি পুরাতন থিয়েটার। মিনার্ভা, মনোমোহন ও স্টার। এ ছাড়া সদ্যগঠিত ম্যাডান কোম্পানীদের বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী—তাঁরা অভিনয় করতেন তদানীন্তন 'কর্নওয়ালিশ' মঞ্চে, এখন যেটি 'উত্তরা'। মঞ্চ তিন-চারটি থাকলেও, ১৯১৬ সালে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে বাংলার থিয়েটার হয়ে পড়েছিল প্রকৃতপক্ষে—মুখপাত্রবিহীন। যেমন ছিলেন গিরীশচন্দ্র, যেমন ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু, বাংলা থিয়েটারের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি। সর্বকাজে এগিয়ে যান যাঁরা, সর্ব সংকটের সামনে এসে দাঁড়ান যাঁরা। অভিনয় করেছেন, আচার্যের

কাজ করছেন, ম্যানেজারের কাজ করছেন, আবার দরকার হলে নাটকও লিখেছেন,—আমি এমনই নেতৃস্থানীয়দের কথা বলছি। অমৃতলাল বসু তখনো অবশ্য বেঁচে, কিন্তু তিনি স্থবির, ঐ সময় সক্রিয়ভাকে কোনো রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্টও ছিলেন না। দানীবাবু কোনোদিনই প্রতিনিধি বা নেতা ছিলেন না, যথার্থ শক্তিধর শিল্পী, যাকে বলে—'বড়ো অভিনেতা!' যেটা 'রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার' ছিল, সেই 'বেঙ্গল প্যাভেলিয়ন'-এ শেষ থিয়েটার হয়েছিল—'প্রেসিডেন্সী থিয়েটার' কিন্তু সেটাও সে সময় উঠে গিয়ে হলো বিডন স্ট্রীট পোস্টাফিস। মিনার্ভা ১৯১৯ সালে 'মিশরকুমারী' অভিনয় করার পর আর কোনো উল্লেখযোগ্য বড়ো নাটক অভিনয় করেনি। ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'কেলোর কীর্তি' হালকা ধরনের বই। অবশ্য এটি যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটির অভিনয়কাল ১৯২০ সাল। মন্মথনাথ পাল, যিনি ছিলেন হাঁদুবাবু নামে বিখ্যাত, তাঁর ছিল নামভূমিকা। 'কর্তা' সেজেছিলেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মঘা—কার্তিক দে। এঁরা ভালো অভিনয় করেছিলেন এবং অপর একটি ছোট চরিত্র (জনৈক রেসের জুয়াড়ী) অখ্যাতনামা অভিনেতা সন্তোষকুমার দাস (ভুলু) উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। 'কেলোর কীর্তি'-তে মঞ্চের ওপর ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। বহু লোক জড়ো হয়েছে মঞ্চ জুড়ে। তাদের পিছনে মঞ্চের ওপর দিয়ে ঘোড়া ও ঘোড়া সওয়ার ছুটে যাচ্ছে, সে এক দৃশ্য! পিজবোর্ডে আঁকা ঘোড়া ঘোড়া সওয়ার তৈরি করে ঘুর্ণির ওপরে এটা দেখানো হতো। ঘুর্ণির বেগে ঘোড়া দৌড়চ্ছে, কিন্তু বিভ্রম হতো যেন ঘোড়া সওয়ার নিয়ে নিজেই ছুটে যাচ্ছে। এটি করেছিলেন শিল্প-নির্দেশক অমর রায়। 'মিশরকুমারী' সেট্-ও করেছিলেন ইনি। অপূর্ব হয়েছিল 'মিশরকুমারী'র পারিপার্শ্বিকতা, পোশাকে বাদ্যে জনতায় দর্শক অভিভূত হতো, ভাবতো, 'এ কোন্ দেশের দৃশ্য দেখছি'! অমরবাবু সুদক্ষ শিল্পনির্দেশক ছিলেন, কিন্তু চলে গেলেন অকালে। ঐ 'কেলোর কীর্তি'র ঘোড়দৌড়ের দৃশ্যে যে-ঘোড়া বাজী ধরেছিল ভুলু, দেখতে পেলো, সেই ঘোড়াই জিতেছে। অমনি সে ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো লাফাতে লাফাতে। পকেটে বিস্কুট ছিল, সেই বিস্কুট দিয়েছে মুখে, কথা অস্পষ্ট অথচ প্রবলতর উত্তেজনা। এই অবস্থায় পকেটে হাত দিয়ে সে তার টিকিট খুঁজছে, কিন্তু টিকিট নেই। ঘোড়দৌড় দেখতে দেখতে বিস্কুটের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে সে টিকিটটি মুখে পুরে চিবিয়েছিল তা কে জানে, এখন মনে পড়ল, মুখ থেকে ছিবড়ে-মতন কী একটা সে বার করে ফেলে দিয়েছিল বটে! হায়রে! তখন কোথায় সে খুঁজে পাবে সেই চিবুনো টিকিট! কাঁদতে কাঁদতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো সে! লোকে খুব উপভোগ করত এই দৃশ্য। সেই থেকে ওর নামই হয়ে গেল 'বিস্কুট খেকো ভুলু।'

'কেলোর কীর্তি'র পর মিনার্ভায় পুরানো বইয়েরই অভিনয় হতো বেশী। বরদা দাশগুপ্তর 'নাদির শাহ' ছিল নতুন বই, কিন্তু জমল না। একদিনের অভিনয়ের কথা গল্প করি। অভিনয় হবে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী, সঙ্গে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা 'হিন্দা হাফেজা'। 'লয়লা-মজনু' ধরনের

প্রেমের গল্প আর কী ! 'মৃণালিনী'তে পশুপতি হয়েছেন প্রিয়নাথ ঘোষ। হেমচন্দ্র কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। মনোরমা সুশীলাসুন্দরী, মৃণালিনী চারুশীলা ইত্যাদি। অভিনয় চলছে, কিন্তু কিছুতেই আর জমছে না। পরে একটি দৃশ্য এলো, যেখানে মৃণালিনী আর তার সখী মণিমালিনী উভয়ে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছেন। এলো সেই দৃশ্য, কিন্তু অভিনয় না জমবার দরুণ প্রেক্ষাগৃহে কেবলি কলরব চলেছে, মৃণালিনী বা মণিমালিনীর কথা কেউ শুনছে না। শোনবার আগ্রহও নেই। এমন সময় নেপথ্য থেকে হঠাৎ ভেসে এলো একটি গানের কলি 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনী রে !'

ব্যস, দর্শক সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। মণিমালিনী গেল গায়িকাকে ডাকতে। নেপথ্য থেকে আবার গান 'কহলো নাগরী গেহ পরিহরি কাহে বিবাগিনী রে !'

দর্শক স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে গেছে। ভিখারিণী মঞ্চে প্রবেশ করে গানটি পুরো গাইল। সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও গেল মোড় ঘুরে। গান শেষ হবার পর মৃণালিনীর কথা ছিল 'তোমার দিব্য গলা তুমি গানটি আবার গাও।'

কিন্তু সে সংলাপ উচ্চারিত হবার সময় আর সুযোগ এলো না। দর্শক তখন প্রমত্ত হয়ে 'এন্‌কোর-এন্‌কোর' বলে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। নাটকের সমস্ত অভিনয়ের ভিতর গিরিজায়ার গানগুলিই মাত করে দিলে। দর্শক বললে—এই গানে পয়সা উশুল হয়ে গেল।

আর অভিনয়ের যে কী ভাষায় সমালোচনা হতে লাগল, তা এখানে লেখা যায় না। দুজন নায়ক—পশুপতি ও হেমচন্দ্র, দুজনেই স্থবির। তাঁদের সে চেহারা নেই, সে দমও নেই। অভিনয় জমাবেন কী করে ? গিরিজায়া হয়ে যিনি দর্শকচিত্ত জয় করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন তখনকার সুকণ্ঠী গায়িকা-অভিনেত্রী সুবাসিনী, পরে এঁকে 'কোকিলকণ্ঠী' বলা হতো। এর আগে ইনি 'মিশরকুমারী'তে হয়েছিলেন 'বুলা'। তাতেও গানে মাতিয়ে দিয়েছিলেন সবাইকে। ইতিপূর্বে ভবানীপুরের সেই ভবানী থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন। বহুদিন ওঁদের সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট। ওখানে চন্দ্রগুপ্তে 'ছায়া' ছিলেন ইনি, ওঁর গান আমরা তখনই শুনেছিলাম।

এই ত অবস্থা তখনকার মিনার্ভার। গম্ভীর রসের অভিনয় আর জমে না। গীত, গীতিনাট্য আর হাস্যরস, তবু কিছুটা চলে। আরেকজন অনুরূপ প্রতিভাময়ী গায়িকা তখন ছিলেন মনোমোহনে, তাঁর নাম—আশ্চর্যময়ী। তবে, মনোমোহনের বড়ো সম্পদ ছিলেন—দানীবাবু। ১৯১৮-তে 'দেবলাদেবী'র উদ্বোধন হয়েছে, তাতে 'খিজির' ওঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি ! এখন বলছি ১৯২১ সালের কথা। এখনো মাঝে মাঝে ঐ অভিনয় হয় কিন্তু আশ্চর্যময়ী ওতে 'মতিয়া' সেজে যে গান গেয়েছিলেন, তা এখনো কানে লেগে রয়েছে সকলের। মনোমোহনে দানীবাবুর অভিনয়ের যোগ্য করে নাটক লিখে অনেক নাট্যকার যশস্বী হয়েছিলেন। সেই নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—মোগল-পাঠান। এটি অভিনীত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। এতে দানীবাবু সাজতেন 'শের শা', চুনীবাবু—হুমায়ুন, চাঁদ—বসন্তকুমারী (তখনকার নামকরা অভিনেত্রী), সোফিয়া—শশিমুখী। প্রসঙ্গত বলে

রাখি, আজকাল যেমন 'হিট সঙ' বলে একটা কথা শোনা যায়, তখনও তাই ছিল। রঙ্গমঞ্চের এক-একটি গান এমন জনপ্রিয় হতো যে লোকের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ত, রেকর্ড হতো, বহুকাল পর্যন্ত লোকে তা মনেও রাখত। ঐ যে প্রমথবাবুর 'ক্লিওপেট্রা' নাটকের কথা উল্লেখ করেছি, তাতে ছিল একটি গান, যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেটি হচ্ছে সখিদের গান, শুনেছি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা।

'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে।
মম তৃষিত অন্তরব্যথা
সযতনে তুমি নাশিবে।'

'মোগল-পাঠান'-এ শশিমুখীর এই গানও জনচিত্তকে মনোরঞ্জন করেছিল :—

'ভেঙে গেছে মোর সোনার স্বপন
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
(আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল
মরমভেদী হাহাকার।'

অবশ্য নাটকের জনপ্রিয় গানগুলির কথায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়দেব', এসব নাটকের গানগুলির কথা তোলাই বাহুল্য। কিন্তু কতগুলি নাটক আছে যা হয়ত খুব জনপ্রিয় হয়নি, অথচ তার গানগুলি মানুষ মনে রেখেছে বহুকাল। যেমন, ১৯১০ সালে অভিনীত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ'-এর একটি গান—

'এসো সোণার বরণী রাণী গো
শঙ্খ কমলকরে,
এসো মা লক্ষ্মী, বোসো মা লক্ষ্মী
থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।'

'দেবলাদেবী'তে অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত সৈনিকদের গানটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যদিও 'দেবলাদেবী' অতি পরিচিত নাটক—

আমার বিবি
ও তার রূপের চোটে রোশনি জ্বলে
কোথায় লাগে পটের ছবি।
নানির গলা এমনি মিঠে কথা কয় মধুর ছিটে
কোয়েলা ঘাড় তোলে না রা কাড়ে না
কে জানে সে বাসা ছেড়ে
কোন্ কবরে খাচ্ছে খাবি।

'চন্দ্রগুপ্ত'-এ দ্বিজেন্দ্রলাল সৈনিকদের মুখে একটি কোরাস গান দিয়েছিলেন,—'যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকাধারা'। এই থেকে পরে সুযোগমতো সৈনিকদের মুখে গান দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল, 'আমার বিবি' গানটি সেই রীতিরই একটা নমুনা। 'মোগল-পাঠান'-এর পর মনোমোহনের দানীবাবুর অভিনয়-দীপ্ত উল্লেখযোগ্য নাটক অতুলানন্দ রায় রচিত 'পাণিপথ'। এতে দানীবাবুর 'বাবর শা' এবং আশ্চর্যময়ীর অন্ধ ফুলওয়ালীর বেশে গান—'ওগো দাও সাড়া দাও, কও কথা কও বরষি আসিয়া শ্রবণে'—অপূর্ব হয়েছিল। এতে অবিনাশবাবু রচিত গান—'টাকা-টাকা-টাকা। তোমার শুভ্রবরণ চক্র গঠন তোমা বিনা সব ফাঁকা'—এটিও জনপ্রিয় হয়েছিল।

পানিপথ-এর পর 'দেবলাদেবী' এবং তার পরে সুরেন্দ্রবাবুরই লেখা—হিন্দুবীর। এটি ১৯২০ সালে অভিনাত হয়েছিল। এসব ছাড়া মনোমোহনে যা অভিনীত হতো সব পুরানো নাটক। 'মনোমোহনে' এর পরে দানীবাবু থাকলে কিছু বিক্রি হয়, নইলে বিক্রি তেমন হয় না। দানীবাবু তখন প্রায়ই যান হাওয়া খেতে বিদেশে, ওঁর বদলে ওঁর ভূমিকায় নামেন হীরালালবাবু, কিন্তু বিক্রি আশানুরূপ হয় না। দানীবাবু ছিলেন মনোমোহনের অংশীদার, ¼ অংশ থেকে বেড়ে বেড়ে তখন হয়েছেন অর্ধেক অংশের মালিক। মাঝে মাঝে ক্ষেত্রবাবু আর চুণীবাবু এসে অভিনয় করেন, আর দানীবাবু বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই যান কাশী। অভিনয়ে তখন তাঁর তেমন মন নেই—প্রতিপক্ষ নেই—চেষ্টাও নেই, তবে তিনি জানতেন, তাঁর নামেই বিক্রি হতো টিকিট। উনি না থাকলে, এমনও দেখা যেতো যে, ঠিকাদার 'নাইট' কিনে নিয়ে 'পুনঃ সেল' করছে, আট আনার টিকিট চার-ছ'আনাতেও বিক্রি হচ্ছে কখনো-সখনো। দানীবাবুর ব্যাপার দেখে মনোমোহন পাঁড়ে মশাইও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। থিয়েটারের প্রতি তাঁর তখন আর তেমন মমতা নেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে থিয়েটার তখন তুলেই দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বহুলোক বেকার হয়ে পড়বে, সেইজন্য মনোমোহনের বিজনেস্ ম্যানেজার চারুচন্দ্র বসু মনোমোহনবাবুকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে—মিনতি করে থিয়েটারটি নিজের দায়িত্বেই চালাচ্ছিলেন। মনোমোহনবাবু কিন্তু ভাড়ার টাকাটা মাস হতে-না-হতেই আদায় করে ছাড়তেন। চারুবাবুর প্রথম দেয়-ই ছিল মনোমোহনবাবুকে। দ্বিতীয় দানীবাবুকে। তৃতীয় ছিল—বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বাবদ খরচখরচার জন্য। চতুর্থ ছিল, শিল্পীদের। মনোমোহনবাবু এদিকে খুব কড়ালোক। তিনি জানতেন যে, পাঁচটি টাকা বাকী পড়লেও তার জন্য তিনি নিজেই আইনত দায়ী, কারণ, মালিক তিনি, তাঁর নামেই থিয়েটার চলছে। তিনি তাই করতেন কী, ভিতরে-ভিতরে উস্কে দিতেন শিল্পীদের—মাইনে পেয়েছ? আদায় করে নাও—আদায় করে নাও। চারুবাবুর হতো উভয় সঙ্কট। চারুবাবুর সঙ্গে বাগবাজারের অরোরা-র মালিক অনাদিবাবুর ছিল রীতিমত বন্ধুত্ব। উৎসব উপলক্ষ্যে যখন সারারাত্রি অভিনয় হতো, তখন থিয়েটারের পর এই অনাদিবাবুর যোগাযোগেই ওখানে বায়োস্কোপ দেখানো হতো। অনাদিবাবুরই পরামর্শে চারুবাবু করেছিলেন কী,

'মেঘনাদ-বধ' মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে খানিকটা সিনেমা দেখানো শুরু করেছিলেন। এর বর্ণনা আগেই দিয়েছি। দর্শকরা অবশ্য এটা খুবই উপভোগ করেছিলেন। নাটকের রস অবশ্য এতে ক্ষুণ্ণ হতো কিন্তু তাতে কী, বিক্রি মন্দ হতো না!

এসব ছাড়া, যা তখন চলত, সে হচ্ছে, অপেরা। আরব্য-উপন্যাস থেকে গল্পাংশ নিয়ে 'পরদেশী' অপেরা-নাটক, রচয়িতার নাম—পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৯ সালে এটি অভিনীত হয়। এটি খুব জমেছিল।

এবার স্টারের কথা বলি। অমরেন্দ্রনাথের পর অনঙ্গমোহন হালদার 'স্টার'-এর লীজ নিয়েছিলেন। তারপর নিলেন গিরি মল্লিক মশাই। গিরিবাবুরই আমলে ১৯১৯ সালে অপরেশচন্দ্র মিনার্ভার ম্যানেজারী পরিত্যাগ করে এঁর সম্প্রদায়ের ম্যানেজার হয়ে স্টারে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন তারাসুন্দরী ও মিস্টার পালিত। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে দেবেন্দ্র বসু কৃত বাংলা 'ওথেলো' করলেন এঁরা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। ওথেলো—মিস্টার পালিত। (তারকনাথ পালিত) ডেসডেমোনা—তারাসুন্দরী, ইয়াগো—অপরেশচন্দ্র, ক্যাশিও—প্রবোধ বসু। এই সময়ে দৃশ্যপটাদির ব্যাপারে অপরেশবাবুর বন্ধু প্রবোধচন্দ্র গুহ ওঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। তিনি স্টারের আগেই মিনার্ভাতে যাতায়াত করতেন অপরেশবাবুর কাছে। ইনি ছাড়া, 'ওথেলো'র ব্যাপারে অপরেশচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন বারিস্টার শিরীষ বসু। অবশ্য তাও প্রবোধবাবুর মাধ্যমে। ইনি ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত শৌখীন অভিনেতা, ইংরেজীতে অভিনয় করতেন। ইনি সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, 'হ্যামলেট' করেছিলেন সুনামের সঙ্গে। আর সেই যে প্রথমে বলে গেছি মাথিসন ল্যাংয়ের কলকাতায় অভিনয়ের কথা, তাতে তাঁর সঙ্গে মার্চেণ্ট অব ভেনিসে 'প্রিন্স অব মরক্কো'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এতো করেও 'ওথেলো' জমল না। খুলতে চেষ্টা করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের বিখ্যাত অপেরা—'কিন্নরী', যা মিনার্ভায় সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় হয়েছিল, এখনো মাঝে মাঝে হয়। এটিকে যুগান্তকারী অপেরা বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রকুমার মিত্র হাইকোর্টে মামলা করে স্টারের এই 'কিন্নরী'-প্রয়াস অবশ্য বন্ধ করে দিলেন। কাজেই, অপরেশচন্দ্র তখন নিজেই লিখলেন নাটক—'উর্বশী।' খুললেন নাচগানের বই। কিন্তু এতেও তেমন অর্থাগম হলো না। গিরিবাবু ছেড়ে দিলেন থিয়েটার। এবার স্টারের লেসী হলেন অপরেশচন্দ্র নিজে। ১৯২০-তে নতুন ব্যবস্থাপনায় ওঁরই লেখা "রাখীবন্ধন" অভিনীত হতো। ইবসেনের 'ভাইকিংস' অবলম্বনে লিখিত এই 'রাখীবন্ধন'। এতে বৃদ্ধ চন্দ্রাবত হলেন—মিস্টার পালিত, নায়িকা ধারা হলেন—তারাসুন্দরী। অদ্ভুত অভিনয় করলেন দুজনে। কিন্তু নায়ক দুজন—একেবারে অচল। 'রাখীবন্ধন' না জমতে ধরলেন—'ছিন্নহার' অপরেশবাবুর লেখা। তাছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'কুহকী'ও করলেন। কোনোটাই থিয়েটারকে দাঁড় করাতে পারছে না। শেষে অপরেশচন্দ্র লিখলেন—'অযোধ্যার বেগম'। কী নাটকে, কী প্রযোজনায় অপরেশচন্দ্র যেন নূতন উদ্যমে মেতে উঠলেন।

কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় প্লাকার্ড পড়ে গেল—অযোধ্যার বেগম—শ্রেষ্ঠাংশে তারাসুন্দরী। আর অন্যদিকে—আরও এক প্লাকার্ডে আলমগীর—শ্রেষ্ঠাংশে শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

'অযোধ্যার বেগম' স্টারে অভিনীত হলো ৩রা ডিসেম্বর তারিখে—১৯২১ সালে। মীরকাশিমের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন চুনীলাল দেব। সুজাউদ্দৌলা—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়। অযোধ্যার 'বহু' বেগম বা 'বউ বেগম'—তারাসুন্দরী। হাফেজ রহমৎ—অপরেশচন্দ্র স্বয়ং। এঁরা ছাড়া, দুটি উদীয়মানা অভিনেত্রী দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করলো, তারা হচ্ছে—'ছায়া'বেশিনী—কৃষ্ণভামিনী, 'জিন্নাৎ'রূপিণী—নীহারবালা। উত্তরকালে এঁরা দুজনেই রীতিমত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল।

এর পরবর্তী সপ্তাহে—১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১ সালে বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোং তদানীন্তন কর্নওয়ালিস মঞ্চে (এখন বোধ হয় উত্তরা সিনেমা) খুললেন—শিশিরবাবুকে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে—'আলমগীর।' তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরই শিষ্যস্থানীয় নবাগত তরুণ অভিনেতা—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর চেহারা। নেমেছিলেন 'কামবক্স'-এর চরিত্রে, মানিয়েছিল—চমৎকার! এঁরা দুজন ছাড়া, আর সবাই পুরাতন। উদিপুরী—কুসুমকুমারী। রাজসিংহ—প্রবোধ বসু। ভীমসিংহ—সত্যেন দে। রামসিংহ—গোপাল ভট্টাচার্য। এঁরা এবং আর সবাই যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ম্যাডানদের বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির পুরনো লোক। নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন—নৃপেন্দ্রনাথ বসু। সুর-সংযোজনায়—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পাল্লা দিয়ে অভিনয় চলছে দুই থিয়েটারে। দুটিতেই প্রচুর ভিড় হলো। তবে ছাত্রদল আর তরুণ-দলের সংখ্যা দেখা গেল 'আলমগীর'-এই বেশী ভিড় করছে। এমন সব ছাত্র, যাদের থিয়েটার দেখা সেকালে নিষেধ ছিল, তারাও বাড়িতে গিয়ে আবদার ধরলে, কলেজের প্রফেসর থিয়েটার করছে সে-থিয়েটার দেখতে দোষ কী?

কলেজের সম্মানীয় অধ্যাপক যেখানে অভিনয় করছেন, সেখানে বাস্তবিকই অভিনয় দেখাটা দোষের কী হতে পারে? অভিভাবকদের মনে এটা ক্রিয়া করলে। ফলে শাসনের গণ্ডি একটু শিথিল হলো, ছেলেরা দলে দলে ঢুকতে লাগল 'আলমগীর' এ। আর স্টারে গেলেন—প্রধানতঃ সাধারণ দর্শকবৃন্দ। অবশ্য ছেলেরাও এসেছিল স্টারে, তুলনামূলক সমালোচনা করবার মন নিয়ে। 'কর্নওয়ালিস মঞ্চে'র দিকে প্রবীণদের ঝোঁক তখনো ততটা হয়নি কারণ, ম্যাডানদের ওপরে তাঁদের ভরসা তখনো ফিরে আসেনি। ১৯২১-এর প্রথম দিকে ম্যাডানেরা যখন বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোং খুললেন, তখন লোকের মনে যে আশার সঞ্চার না করেছিল এমন নয়। বাংলা থিয়েটারের যা অবস্থা, অর্থ-বিপর্যয়ে নির্বাণোন্মুখ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না, সে সময় যদি ম্যাডানদের মতো ধনীরা এগিয়ে আসেন, তাহলে পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হতে পারে। এঁদের এখানে দেখা গেছে, অভিনেতাদের মাইনেও অপেক্ষাকৃত বেশী। কাজে কাজেই মাঝারি অভিনেতারা

ওখানে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে মাইনে। ক্যাশিয়ার নির্দিষ্ট দিনে থিয়েটারে এসে সবাইকে দিয়ে ভাউচারে সই করিয়ে যথারীতি বেতন দিয়ে যাচ্ছে, এ-এক অভিনব ব্যাপার তখনকার দিনে। এ যেন সরকারী অফিসের মতো হয়ে উঠল থিয়েটারের কাণ্ড-কারখানা! যা অকল্পনীয়, যা কখনো হতো না। নির্দিষ্ট দিনে মাইনে, থিয়েটারে! সে হয়ত হতো সেই আরও অতীতে—প্রতাপ জহুরীর আমলে। সে ছাড়া আর ত অনুরূপ ঘটনা শুনিনি এযাবৎ! সুতরাং হয়েছিল এই যে, ম্যাডানরা তখন যাকে চেয়েছিল, তাকেই পেয়েছিল। এসেছে তারা সাগ্রহে, অনেকে আবার যেচে। ম্যাডানরা পারেনি আনতে দানীবাবুকে। কারণ দানীবাবু ত তখন মাত্র অভিনেতাই নন, তিনি ছিলেন মনোমোহনের অংশীদারও। সুতরাং তিনি আসেনই বা কী করে? আর পারেনি অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীকে আনতে। এঁরাও যে আবার স্টারের অংশীদার। নাম-করাদের মধ্যে আর পারেনি আনতে চুনীবাবু আর মন্মথ পালকে (হাঁদুবাবু)। এঁদের রীতি নীতি বড়ো কড়া ছিল। সাধারণ চাকুরেদের মতো এঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেননি। যেখানে বুঝতেন সম্ভ্রম থাকবে না, সেখানে এঁরা কখনই যাবেন না, বিশেষত অ-বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে ত যাবেনই না এঁরা! সেই জন্য ম্যাডানদের অভিনেতৃ সঙ্ঘ প্রথম দিকে সমগ্রভাবে খুব দুর্বলই ছিল বলা যায়। তার ওপরে ম্যাডানরা আরও একটা ভুল করল। উপযুক্ত বাংলা নাটক না নিয়ে, ধরে বসল আগা হাসা কাশ্মীরীর একটি 'ক্রাইম-ড্রামা'—"অপরাধী কে?" নিকৃষ্ট নাটক। অথচ কাশ্মীরী সাহেব ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান উর্দু কবি, এবং নাটকও তিনি লিখেছেন বহু। কলকাতায় পার্শী থিয়েটারে তাঁর অনেক নাটক অভিনীত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। তবে সে-সব নাটকে ছন্দোবদ্ধ পদ থাকত, যেগুলি পার্শী থিয়েটারের দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হতো। এমন, কি তাঁর নাটকের বহু 'শের' বা 'ছন্দোবদ্ধ পদ' এতো জনপ্রিয় হয়ে পড়ত যে দু-চার দিন অভিনয় হবার পর অভিনেতাদের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শকও চলতো তা আবৃত্তি করে। আসলে কাশ্মীরী সাহেব ছিলেন কবি, এবং ঐ 'শের' বা ছন্দোবদ্ধ পদ' রচনার জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর হিন্দী নাটকের সেই সব 'ছন্দোবদ্ধ পদ' বাঙলায় তর্জমা করে যা দাঁড়িয়েছিল, তা বাঙ্গালী দর্শকের মনোমত হয়নি এবং তর্জমাও হয়নি ভালো। তর্জমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক, যিনি পরে ফিল্ম-ডিরেক্টর হয়েছিলেন।

যাই হোক এইভাবে এক 'অপরাধী কে' নাটকই বাঙালী দর্শকদের আশা-ভরসা ভেঙে দিয়েছিল। একবার ওঁরা এম-এ পাস এক অধ্যাপককে মঞ্চে টেনে এনে নতুনভাবে যে আকর্ষণের ব্যবস্থা করলেন, তাতেও লোকের দ্বিধা ছিল যথেষ্ট। কারণ প্রথম পদক্ষেপে 'অপরাধী কে' দিয়ে যে নমুনা ওঁরা সামনে তুলে দিয়েছেন, তাতে করে দর্শকদের আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। সেই জন্য শিশিরবাবুর জন্য ছাত্রদেরই ভিড় ছিল বেশী। তারাই তাঁর অভিনয় দেখে প্রথম ঢক্কানিনাদে জয়-জয়কার করেছিল।

অপর পক্ষে, স্টারের অতি-পরিচিত প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতৃবৃন্দ। অপরেশচন্দ্র প্রবীণ নাট্যকার। চুনীবাবুর 'মীরকাশিম'ও হয়েছিল চমৎকার। এবং এই 'মীরকাশিম'ও চুনীবাবুর শেষ দীপ্তি। লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের 'সুজাউদ্দৌলা' যে রকমটি হয়েছিল সেরকম সক্ষম অভিনয় অনুরূপ ভূমিকায় লক্ষ্মীবাবু আর করেন নি ইতিপূর্বে। এবং এই তাঁর শেষ নতুন বই। কিছুদিন পরেই তাঁর কর্মজীবনের ওপর তিনি যবনিকাপাত করে মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, সম্ভবত 'অযোধ্যার বেগম'-এর বছর দেড়েক পরেই। অভিনয় করেছিলেন উনি বহুদিন ধরে, কিন্তু ইতিপূর্বে তেমন দাগ কাটতে পারেন নি। 'হাফেজ রহমৎ'বেশী অপরেশচন্দ্র করেছিলেন অপূর্ব অভিনয়! ওঁর সম্বন্ধে পরে আরও অনেক বলতে হবে। তারাসুন্দরী নাম-ভূমিকায় যা করেছিলেন, তাও অতুলনীয় বলা চলে। এ ছাড়া অভিনয় করেছিলেন বটে কৃষ্ণভামিনী। বয়স তখন ওর অল্প, ছোটখাট ভূমিকা অভিনয় করেছে, বড়ো ভূমিকায় কেউ দৈবাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা ছুটি নিলে, তাঁদের ভূমিকাও চালিয়ে দিয়েছে, তার এই ভূমিকাটিই তার প্রথম যাকে বলে 'ওরিজিন্যাল' ভূমিকা। তারাসুন্দরী ওকে শিখিয়েছিলেন, তারাসুন্দরীর বাড়ি গিয়ে গিয়ে শিখে এসেছিল। এমনই হয়েছিল সেই শিক্ষার ফল যে, দর্শক যেন মঞ্চের ওপর যুবতী তারাকেই দেখছে। এ-ও বড়ো কম আকর্ষণের ছিল না। আর ছিল পরেশচন্দ্র বসু বা পটলবাবুর দৃশ্যসজ্জার জাঁকজমক। মোট কথা, অপরেশচন্দ্র শেষ চেষ্টা হিসাবে কোনো দিকটিই অপূর্ণ রাখেন নি। বইতে একটি ভূমিকা ছিল 'লছমীপ্রসাদ' বলে সেটি করেছিলেন—রাধাচরণ ভট্টাচার্য। যিনি ছিলেন স্টারের সহকারী সঙ্গীত শিক্ষক। সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ভূতনাথ দাস, প্রবীণ ব্যক্তি, প্রাচীন বহু নাটকে সুর-সংযোজনা করেছেন। 'জয়দেব' নাটকের গানগুলির সুর এঁরই দেওয়া। 'আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা, আমি হবো না ত গৃহবাসিনী!' কিম্বা 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' অথবা 'এই বলে নূপুর বাজে' প্রভৃতি গানের সুর আজও বয়স্করা হয়ত স্মরণে আনতে পারবেন! এই রাধাচরণবাবু 'অযোধ্যার বেগম'-এ একখানি গান গাইতেন অতি করুণ সুরে—'সোনার কমল ভাসিয়ে দিয়ে জলে, আমি ভাসছি নয়ন জলে।' শুনে দর্শক বোধহয় স্তম্ভিত হয়ে যেত। এমন গান তিনি আর কখনো গান নি। এই সব ব্যাপার মিলে স্টারের অভিনয় জমে গিয়েছিল।

ছেলেরা ডঙ্কা বাজালে আলমগীরের ভূমিকার। বললে—কী চমৎকার! কী নূতনত্ব! এর আর তুলনা হয় না! তারা কিন্তু শুধু শিশিরবাবুরই নাম করে গেছে, আর কোনো দিকে তাদের নজর পড়েনি। একটি নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করলেও সর্বাঙ্গীণ আবেদনে তা সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে না। প্রবীণেরা তাই বললেন—সত্যিই অদ্ভুত নূতনত্ব আছে শিশিরবাবুর অভিনয়ে, এবং সে-অভিনয়ের প্রাণপ্রাচুর্য লক্ষ্য করলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। এবং তাঁর সঙ্গে যে নতুন ছেলেটি 'কামবক্স' করলে, তার চেহারা শুধু সুন্দরই নয়, অভিনয়ের সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। কিন্তু অন্যান্য ভূমিকাগুলি শিশিরবাবুর তুলনায় নিষ্প্রভ ও প্রাণহীন।

ফলে দাঁড়ালো এই একদিকে শিশিরবাবু নিজে, অপর পক্ষে একটি সামগ্রিক অভিনয়-কুশলতা। একদিকে ব্যক্তির সাফল্য অন্যদিকে সমষ্টির। এমন কি, ম্যাডানদের সিন-সিনারীর বিষয়ে যে অতো নাম-ডাক তা-ও বাঙ্গালী দর্শকদের পছন্দ হয়নি। যদিও একখানি সিন আলমগীরের গ্রন্থাগারের দৃশ্য, চমৎকার আঁকা হয়েছিল। জহুর আলি বলে এক শিল্পী এঁকেছিল সেটি। কিন্তু সে দৃশ্যটিও আবার ঠিক কালোপযোগী হয়নি, হয়ে আছে যেন আধুনিক লাইব্রেরী। তবে এত ভালোই আঁকা হয়েছিল সেটি যে মনে হতো বিরাট এক লাইব্রেরীর সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি!

অভিনয় দৃশ্যপটাদির এই সব আলোচনা—এবং তুলনামূলক আলোচনা, আমরা দোকানে, আড্ডায়, সর্বত্র শুনতাম। আমার নিজের অবশ্য দুখানি বই দেখা হয়নি। লোকের মুখে মুখে শুনে যা ধারণা করতে পেরেছিলাম তাই বলে গেলাম শুধু। কারণ সেই সময় এত আগ্রহের অভিনয় দেখার অবসর আমার কোথায়? নিদ্রায়-জাগরণে তখন ঐ আমার ফিল্ম, সোল অফ এ স্লেভ। ঐ বেহালার স্টুডিও আর অফিস, অফিস আর স্টুডিও, এই নিয়ে প্রাণপাত করে চলেছি! আসি-যাই ময়দানের মধ্য দিয়ে। আসতে-যেতে লক্ষ্যে পড়ল—পথের দুপাশে বিশাল তোরণ স্তম্ভ এই সব তৈরি হচ্ছে। চীনা মিস্ত্রীর দল খাটছে এই সব কাষ্ঠনির্মিত তোরণ প্রভৃতির জন্য। কী ব্যাপার? না, আসছেন প্রিন্স অব ওয়েলস, যিনি পরে অষ্টম এডওয়ার্ড নাম নিয়ে রাজা হয়েও আবার রাজ্য ত্যাগ করে ডিউক অব উইণ্ডসর-এ পরিণত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে। যুবরাজ আসছেন, তাই যেভাবে অভ্যর্থনা জানানোর রীতি আছে, সেইভাবে সবকিছু করার আয়োজন চলেছে। সেই প্রিন্সেপ ঘাট—তার পরে এলেনবরো কোর্স—রেড রোড যেমন ছিল বাঁধা সব, তেমনি ব্যবস্থা হচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন হয়েও গেল চীনা মিস্ত্রীদের কাজ শেষ। জায়গায় জায়গায় একটি থাম, কোথাও বা দুটি থাম কোথাও বা বিশাল তোরণ সাজানো হচ্ছে। আর্ট স্কুলের ছেলেরা এসে সাজাচ্ছে সে-সব। রঙও করতে লাগল তারা। কাঠের তৈরি বড়ো-বড়ো সব থাম—পেডেস্ট্রাল বা পাদবেদীর ওপরে বসানো। তোরণের ওপরে 'Ich-Dien' লেখা। এটা বিশেষ করে যুবরাজেরই জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হতে দেখেছি। এটি জার্মান কথা, যার মানে—'আই সার্ভ, আমি সেবা করি।'

যুবরাজ আসবেন বড়দিনের সময়। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বর এলেন ভাইসরয় নিজে সব তদ্বির-টদ্বির করতে, রাজকুমারের অভ্যর্থনা যাতে রাজকীয়ভাবেই হয়, কোথাও কোনো মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু এত সব আয়োজন করলে কী হবে, সেই রাজা আসবার সময়কার মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা আর কারুর নেই। কারণ এর আগে রাউলাট আইন পাশ হয়ে গেছে, তার প্রতিবাদে ভারতের চারিদিকে সভা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হচ্ছে। এরকম একটি সভার পরিণতি হয়েছিল কুখ্যাত 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ড। সেইজন্য জোর শুরু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। রাজনৈতিক আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন, ভারতের জনসাধারণ তখন ব্যথিত—ক্ষুব্ধ। সেই
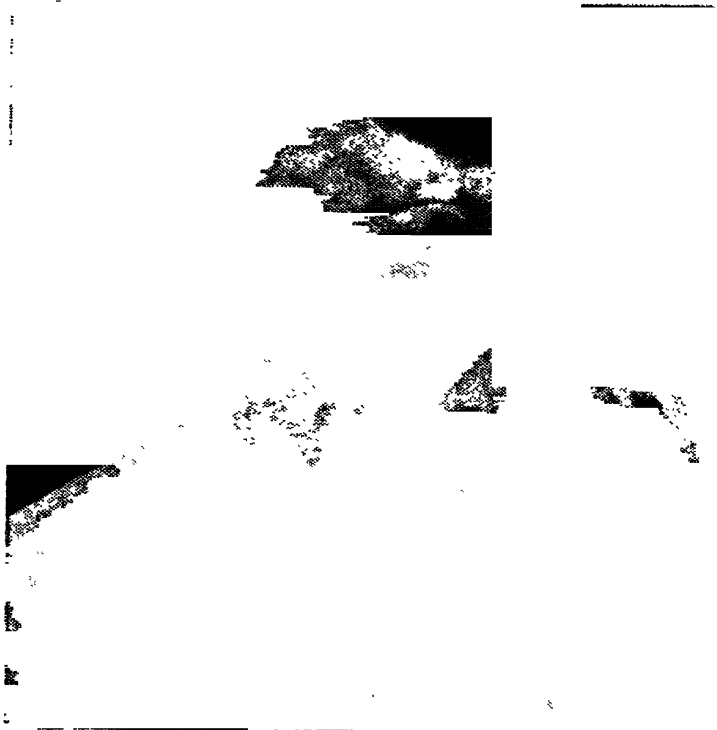
শিশিরকুমার ভাদুড়ী

সময় এলেন যুবরাজ। মহাত্মাজীর প্রতিবাদ ঘোষণা—অভ্যর্থনা বয়কট। ভারতের সর্বত্রই হলো তাই—বয়কট। কলকাতায় এই বয়কট এমন সার্থকতা লাভ করলো যে এর আগে ভারতে সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সংহতি আর দেখা যায়নি। ২৪শে ডিসেম্বর সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন যুবরাজ। পূর্বঘোষিত হরতাল প্রতিপালিত হচ্ছে। এমন হরতাল যে, কাউকে কোনো জবরদস্তি করতে হয়নি। রাস্তা শূন্য। কোন ট্রাম নেই, ঘোড়ার গাড়ি নেই, ট্যাক্সি নেই, রিক্সা নেই। হগ মার্কেটে হরতাল-টাল হলে কখনো কাঁচা আনাজ তরকারীর অভাব হতো না কিন্তু এবারে সেখানেও সব কিছু শূন্য ; ·সাহেবরা পর্যন্ত কিছু কিনতে পারেনি। এই বছরের প্রথমেই ডিউক আব কনট আসার সময়ও মহাত্মাজীর নির্দেশে হরতাল হয়েছিল, কিন্তু সে সময় ঠিক এমনটি ঘটেনি, এও হয়েছিল আরও ব্যাপক—আরও সংহত।

চিরাচরিত প্রথা অনুসারে প্রিন্সেপ ঘাটেই যুবরাজকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো উচিত ছিল, কিন্তু এবার কী কারণে জানি না সেটা হলো ডালহাউসী স্কোয়ারে। এর পরে দিনকয়েক রইলেন যুবরাজ কলকাতায় 'ভাইসরয় কাপ' ঘোড়দৌড় দেখলেন। যথারীতি 'আলোবাজি'ও হলো। কিন্তু তেমন ভিড় করে লোক আর তা দেখতে গেল না। ২৮শে ডিসেম্বর যুবরাজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন। ১৬ বছর আগে ১৯০৫ সালে এর পিতা সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন যুবরাজ হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিস্থাপনা করে গিয়েছিলেন এর। ৩০শে ডিসেম্বর—অপরাহ্ণে একটি যুদ্ধজাহাজ করে যুবরাজ চলে গেলেন রেঙ্গুন। সেখানে নবগঠিত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করবেন তিনি। বর্মার শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এবার তা থেকে হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন।

পড়ল ১৯২২ সাল। আর অপেক্ষা করতে পারি না আমরা। আমাদের কাজ চলেছে দ্রুতগতিতে এগিয়ে। একদিন বেহালা স্টুডিও থেকে ফিরে অফিসের দিকে আসতে গিয়ে দেখি যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য যেসব তোরণ ইত্যাদি হয়েছিল, সেসব ময়দানের পশ্চিমদিকে খুলে গাদা করে রেখে দিয়েছে। কী ব্যাপার? না, নীলাম হচ্ছে। সেইদিন বিকেলেই প্রফুল্ল অফিসে আসতে ওকে বললাম—কাঠকাঠরা নীলাম হচ্ছে—ময়দানে।

—বলিস কী!

—হ্যাঁ রে!

পরদিনই দুজনে মিলে গেলাম ময়দানে। গিয়ে দেখি নীলামের ডাক হচ্ছে। এত কষ্ট করে চীনে মিস্ত্রীরা যে চমৎকার জিনিস তৈরি করেছিল তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে জ্বালানি কাঠ হিসাবে। একসঙ্গে সব লট্ করা। এক এক লট হিসাবে ডাক হচ্ছে। বিক্রি করে টাকা পওয়াটা রিসেপসন কমিটির কাছে বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে অনাবশ্যক জঞ্জালগুলি যত সত্বর সম্ভব সরিয়ে ফেলা। পাদ বেদী লম্বা লম্বা ছোট ছোট কাঠ, পলতোলা থাম, থামের উপরিভাগ—মাথা—অর্থাৎ যাকে বলে

থামের ক্রাউন, এছাড়া বহু ফালতু কাঠের কার্নিশ। সব মিলিয়ে যা আমরা লট-এ পেলাম, তা বয়ে নিয়ে যেতে লেগেছিল দশ-বারোটি মোষের গাড়ি। যতদুর মনে পড়ে দাম পড়েছিল মাত্র দেড়শো টাকা। জ্বালানি কাঠের দাম। কিন্তু আমাদের কাছে ত আর ওসব জ্বালানি কাঠ নয়, আমাদের কাছে ওর ব্যবহারের দাম অনেক। মাল বোঝাই দিয়ে স্টুডিওতে নিয়ে যেতে লেগেছিল—পাক্কা দুদিন। প্রথম দিন প্রথম গাড়িটির সামনে সওয়ারী হয়ে বসলাম আমি, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলে। পাঁচ-ছখানা গাড়ি চলল সার বেঁধে প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন তাদেরই আসতে বলেছিলাম। দ্বিতীয় দিনও ঐ রকম—পাঁচ-ছ'খানা গাড়ি লেগেছিল।

স্টুডিও ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে। সাজঘরও তৈরী। ছুতোরের কাজ করার জন্য যে চালাটির পরিকল্পনা করেছিলাম সেটিও শেষ হয়ে গেছে। মাল নিয়ে রাখলাম বাঁশবাগানে। চালাঘরে রাখা যাবে না, রাখতে গেলে সারা ঘর ভরে যাবে, কাজও হতে পারবে না। স্টুডিওর জায়গাটা থেকে দুটো গ্রাম পরেই এক ছুতোর থাকত আবদুল তার নাম, আগে থাকতেই কাজকর্ম করার আগ্রহ প্রকাশ করে গেছে। তাকে এবার আনালাম ডেকে। এলো সে। বললাম—কোথায় রাখবে এত কাঠ?

সে দেখেশুনে ভেবে বললে—একটা চালায় হবে না আরেকটা চালা চাই। দেয়ালে দরকার নেই, ওপরে একটা চাল থাকলেই যথেষ্ট হবে। ওখানে মাল তৈরি হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে গুদামে এনে তুলব।

আবদুল লেগে গেল তার কাজে। প্রয়োজনবোধে দু'একজন সহকারীও নিয়ে আসত। সে হচ্ছে পেশাদারী মিস্ত্রী কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশে সে যেন বদলে গেল। নতুন রকমের একটা কাজ পেয়েছে সে হাতে, তাই তার আগ্রহের আর সীমা পরিসীমা ছিল না, একাগ্রচিত্তে প্রচুর উৎসাহ নিয়েই সে তার কাজ করে যেতে লাগল। আমাদের উৎসাহ যেন তার মধ্যে ক্রমশ সংক্রামিত হয়ে গেল। যে-সে কর্মী এসে পড়েছিল আমাদের মধ্যে এই সংক্রামণের আবর্তে তারা সবাই শুধু আত্মনিয়োগই নয়, আত্মত্যাগ করেই কাজকর্ম করেছিল বলতে হবে। সুবিধা হলো সকল দিক থেকেই। অসুবিধার মধ্যে হলো এই, যে সমস্ত দৃশ্যপটের পরিকল্পনা এযাবৎ হয়েছিল গোকুলবাবু ও নেড়ুবাবুতে মিলে যে সব পটাদি এঁকেছিলেন, তা আর কাজে লাগল না। কারণ, এই যে সব কাঠ পেলাম, এগুলি সবই প্রায় তৈরি জিনিসের মাপে মাপে করতে পারলে তবেই সুবিধা হতো। কিন্তু তা ত হবার নয়। ওসব থাম-টামগুলি যদি ভেঙে নতুন করে আবার করা যায়, তবেই হতে পারে। কিন্তু সে হচ্ছে বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। অথচ থামটামগুলি যা আছে, তাই রেখে যদি মনের মতো একটু অলংকরণ করিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে অতি সামান্য খরচে হয়। অতএব, দৃশ্য-পরিকল্পনা আবার একেবারে বদলে ফেলতে হলো। সারাদিন আবদুল বেহালায় বসে কাজ করে, আর আফিসে বসে সারাদিন তার কাজ করে যান গোকুলবাবু আর নেড়ুবাবু। ওদের কাছ থেকে নক্সা নিয়ে যাই স্টুডিওতে, আবদুলকে দেই, আর সেইমত কাজ চলে।

ইণ্ডো-বৃটিশ কোম্পানীর কথা আগেই বলেছি। তাদের প্রথম ছবি 'বিলাত ফেরত' বার হয়ে যায় ঐ একুশ সালেই। এর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি এইজন্য যে, এটাই বাঙালীদের প্রথম ছবি। ধীরেনবাবু পরিচালনার কাজ ছাড়া, এতে অভিনয়ও করেছিলেন প্রধান ভূমিকায়। ছবিটা দেখান হয়েছিল 'রসা থিয়েটার'-এ। ভবানীপুরে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে 'পূর্ণ' সিনেমা, 'রসা' ছিল ওখানেই, তেলেনীপাড়ার বাঁড়ুজ্যেদের জমির ওপরে। ঐ যে আগে প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলেছি, সেই প্রবোধ ছিল তেলেনীপাড়ার বাঁড়ুজ্যেদের দুর সম্পর্কের আত্মীয়। যাইহোক ঐ 'রসাই ক্রমশ রূপ-পরিবর্তন করতে করতে আজ 'পূর্ণ'তে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এটিই হচ্ছে বাঙালীদের প্রথম সিনেমাগৃহ। রাজশাহীর মৈত্র—কাশীনাথ মৈত্র-র ছেলেরা সবাই ছিলেন ব্যবসাদার, রমেশ মিত্র রোডের ভিতরে ঢুকেই ডানহাতি ছিল তাঁদের ব্যাঙ্ক। মৈত্রদের এক-একজন এক-এক ব্যবসায়ে ছিলেন লিপ্ত। কাশীবাবুর বড় ছেলে মহেন্দ্র মৈত্র-র সঙ্গে পরে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। ইনি এবং আর সব অংশীদার মিলে লিমিটেড কোম্পানী করে 'প্যারিস সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটিজ লিমিটেড' নাম দিয়ে সিনেমা গৃহটি চালাতেন। সিনেমাগৃহটির আসল মালিক অবশ্য ছিলেন ঐ তেলেনীপাড়ার বাঁড়ুজ্যেরা। তাঁরাই তাঁদের জমির ওপরে প্রেক্ষাগৃহটি তৈরী করেছিলেন এবং 'প্যারিস সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটিজ'রা লেসী হ'য়ে 'রসা থিয়েটার' চালাতে লাগলেন।

'বিলাত ফেরত' হাস্যরস-প্রধান বই। চার্লি চ্যাপলিন-প্যাটার্নের কমিক। বিলেত থেকে ফিরে এসে নায়ক সাহেব হয়ে গেছেন, কলকতার সঙ্গে আর খাপ খাওয়াতে পারছেন না, এই হলো বিষয়বস্তু। এই ছবির নায়িকা ছিলেন সুশীলাসুন্দরী বলে এক মহিলা, যিনি তৎকালে যথেষ্ট প্রগতিশীলা ছিলেন, মোটর চালাতে পারতেন, ঘোড়ায় চড়তে পারতেন, ইংরেজীও জানতেন ভালো। এই একটি ছবিতেই কাজ করেছিলেন তিনি, আর নামেন নি। আর ছিলেন এই ছবির এক বিশিষ্ট ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা—হাঁদু বাবু। ছবি উপভোগ্য হয়েছিল, কিন্তু অসুবিধা এই, একই গৃহে দীর্ঘদিন ধরে ছবি চলবার রেওয়াজ তখনো হয়নি। 'রসা'র পর এ ছবি ওঁরা আর দেখাবেন কোথায়? মাঝে মাঝে বাংলা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে, মেসিন বসিয়ে দেখানো হতো। পরে মিনার্ভাতেও এটি একবার দেখানো হয়েছিল। আসল কথা, বাঙালী সিনেমা-গৃহ সেদিন যদি তৈরি না হতো, ত, এঁদের ছবি দেখানো হতো না, এবং সেজন্য বাঙালীদের ছবিও সম্ভবত প্রস্তুত হতো না। সিনেমা ও সিনেমা-গৃহ ছিল ম্যাডানদের একচেটিয়া। এদিক দিয়ে 'রসা' এক অধ্যায়েরই সুচনা করেছিল বলতে হবে।

ওর পরে শুনলাম, ইণ্ডো-বৃটিশ কোম্পানী 'যশোদানন্দন' বলে একখানা ছবি করবার চেষ্টা করছেন। আমরা কিন্তু আমাদের কাজ যথানিয়মে করে চলেছি। আমাদের কাজের কথা গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে বাইরেও প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে, অফিসে অনেকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করতে আসতে আরম্ভ করলেন। একদিন এলেন—হীরালাল সেন। নিজের সিনেমা আছে, ভ্রাম্যমাণ সিনেমা। বাইরে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখিয়ে বেড়ান। আমাদের নাম শুনে এলেন

আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে। আর এলেন গোকুলবাবুর বন্ধু—দীনেশরঞ্জন দাস, পরে বিখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক। এলেন সাহিত্য-রসিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। এলেন চিত্রশিল্পী অলিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে এর আঁকা ছবি আমি বহু দেখেছি। বিখ্যাত শিল্পরসিক ও. সি গাঙ্গুলী (অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)-র ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বললেন—কেমন কাজ হচ্ছে ? বোঝাতে লাগলাম। তখন ফিল্ম যা পাওয়া যেতো তা প্যানক্রোমাটিক নয়, অর্থোক্রেম্যাটিক। এগুলি প্রথমটির মত অত রঙের টোন ধরতে পারত না। তাই, সাজপোশাকের এফেক্ট বোঝবার জন্য রঙের চার্ট ধরে ধরে বহু স্টিল ফটো তৈরি করে রেখেছিলাম। যাতে করে, অন্তত কিছুটা আন্দাজ করা যায়, বিভিন্ন রঙের সাজপোশাক ছবিতে কোন্‌টা কীরকম ভাবে আসবে।

অলিন্দ্রবাবুকে এসব দেখাতে, উনি ওতে বেশ আগ্রহান্বিত হলেন। দেখলেন আমাদের নক্সা-টক্সা। ব্যাপারটা ওঁর এতো ভালো লেগে গেল যে, ঘন ঘন আসতে আরম্ভ করলেন উনি।

—আসবাবপত্র কীভাবে সব সাজাবো বলুন দেখি ?

উনি আমার মুখে একদিন এ-প্রশ্ন শুনে বলে উঠলেন—সে ভার আমি নিচ্ছি।

ক্রমে ক্রমে ইনি হয়ে গেলেন আমাদের আর্ট ডিরেক্টার। বললেন—কাপড়-চোপড়ের ডিজাইন চাই অজন্তার আর্টের মত।

—বেশ ত।

উনি এ কে এঁকে সব দেখাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে একদিন এলেন এক ভদ্রলোক, বেয়ারা কার্ড এনে টেবিলে রাখতেই চমকে উঠলাম। জে. সি. সরকার, সিনেমাটোগ্রাফার। স্বনামধন্য জ্যোতিষ সরকার মশাই। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এলাম। সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার মিনে-করা বোতাম, হাস্যময় পুরুষ, দেখেই ভালো লাগল। মাঝারি চেহারা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। এই দাড়ির জন্য বন্ধুরা এঁকে ডাকতেন 'চাচা' বলে।

বসে গল্পসল্প করতে লাগলেন জ্যোতিষবাবু। বেশ সদালাপী লোক। আমাদের সিনারিও খানিকটা দেখলেন. দেখলেন আমাদের সেট্-সিনের নক্সা-টক্সা। বললেন—আমরা করছি 'যশোদানন্দন'। এতে নতুন জিনিস দেখাবো। এদেশে রঙীন ছবি হয় না, আমি রঙীন ছবি দেখাবো।

ধৃষ্টতা হলেও আমি প্রশ্ন করে বসলাম—কেমন করে ?

—পদ্ধতি জানা আছে। আমি ফিল্মকে টোনিং-টিন্টিং করে বিচিত্র বর্ণের খেলা দেখাবো।

আমি চুপ করে রইলাম। 'টোনিং-টিন্টিং'-এর ব্যাপার আমার মাথায় কিছু ঢুকল না।

সেদিনই ক্রীড সাহেবকে ব্যাপারটা বললাম। সে বললে—ও তো প্রসেসিং-এর সাহায্যে হতে পারে। নতুন আবিষ্কার কিছু নয়। কিন্তু, মিঃ সরকার সমস্ত ছবিখানাই ঐরকম করবেন ?

—হ্যাঁ।

সমস্ত ছবিখানাই যদি ঐ প্রসেসে হয় ত দেখবার পক্ষে একটু কষ্টকর হবে। খানিকক্ষণ পরে আর ভালো লাগবে না। অবশ্য সে উনি যা-ই করুন, আমাদের ছবিতেও কোনো কোনো দৃশ্য আমি করব।

খুবই আনন্দ হলো কথাটা শুনে। এর জন্য আলাদা চার্জও সাহেব কিছু করবে না বললে।

এইভাবে কাজ আমাদের দ্রুত এগিয়ে চলেছে, শুটিং আরম্ভ হয় হয়, এমন সময় একদিন শুনলাম, থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। সময়টা বাইশ সালের মার্চ মাস, তারিখটা ঠিক মনে নেই। আমরা তখন ভয়ানক ব্যস্ত, কেন যে তিনি ছাড়লেন, বিশেষজ্ঞ কাউকে তা যে জিজ্ঞাসা করে জানব এমন অবসরটুকু পর্যন্ত নেই। শিশিরবাবু 'আলমগীর' ছাড়া ওখানে 'রঘুবীর' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'-ও করেছিলেন। ঐ সময় 'মিনার্ভা'তেও একটা প্রচণ্ড রদবদল ঘটে। দুজন শৌখীন অভিনেতা, নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল এবং রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, যিনি সিমলায় ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এসে যোগ দেন 'মিনার্ভায়। ওঁরা মিনার্ভা'য় ধরলেন চন্দ্রগুপ্ত। 'চাণক্য' সাজলেন নরেশবাবু, অ্যান্টিগোনস—রাধিকাবাবু। বই বেশ জমে গেল। ওদিকে শিশিরবাবুদের মঞ্চে 'আলমগীর' ও 'রঘুবীর' ভালোই চলছিল, কিন্তু মিনার্ভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সম্ভবত এঁরাও ধরলেন—'চন্দ্রগুপ্ত'। তখনকার সমস্ত সংবাদ খুঁটিয়ে যে সংগ্রহ করব, সেরকম মনের অবস্থা নয়। যা সব কানে আসত, আজ তাও আবার সঠিক মনে নেই। মিনার্ভায়—রাধিকাবাবুর 'আন্টিগোনস'—চমৎকার হতো। পুরানো 'চন্দ্রগুপ্ত'এর তুলনায় ওঁদের দৃশ্যসজ্জা অনেক ভালো হয়েছিল, এবং অনেক নূতনত্বও ছিল এতে। অমরবাবু ছিলেন শিল্প নির্দেশক। 'চন্দ্রগুপ্ত'র অনেক পরে নরেশবাবুরা করলেন 'সাজাহান' আর ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'। ঐ বাইশ সালের জুন মাসের কথা।

সাজাহান—নরেশবাবু, ঔরংজেব—রাধিকাবাবু। আর দ্বিতীয় বইটিতে, সাহেবের ভূমিকায়—নরেশবাবু, প্যালারাম—রাধিকাবাবু। তারপরে শুনলাম, এঁরাও থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন। কারণটা ঠিক বুঝলাম না। তবে একটু বুঝলাম যে, পেশাদারী মঞ্চের দুর্গ পুরাতন এবং জীর্ণ হয়ে গেলেও তাকে দু'একজন গিয়ে জয় করতে পারবে না। দুর্বল ও একক হলেও এ-দুর্গ জয় করা অসম্ভব। এ-দুর্গ জয় করতে গেলে সংঘবদ্ধ নূতন শক্তি চাই। নূতন দল যদি আসে, নূতন দল যদি কিছু করতে পারে, এককের পক্ষে টিঁকে থাকা মুশকিল।

কথায় কথায় আবার এগিয়ে এসেছি কিছুটা দূরে। অতএব ফিরে যাই আমাদের পুরানো কথায়। পুরানো দিনে, বাইশ সালের গোড়ার দিকে। ফেব্রুয়ারীতে কাজ আমাদের এত এগিয়ে গেল যে, শুটিং এবার আরম্ভ করলেই হয়। ক্রীডকে জিজ্ঞাসা করলাম—এবার ফ্রেমে কাপড় জড়িয়ে রঙ করা শুরু করি?

ক্রীড ভেবেচিন্তে বললে—কাপড় জড়ালে ত হবে না!

—কেন!

বললে—পাথর দেখাতে হলে, ওভাবে হবে না। ক্যামেরার চোখে পাথর দেখাবে না।

—তাহলে ?

ক্রীড একটা সহজ পরামর্শ দিলে। বললে—'বার্ন্ট্ অ্যাম্বার' (burnt amber) রঙের বুক-কভারের কাগজ যোগাড় করো। সেই কাগজ মেরে দাও ফ্রেমের ওপরে। তার ওপরে যা আঁকবার—আঁকো।

লেগে গেলাম সারা রাধাবাজার খুঁজে কাগজ বার করতে। শেষ পর্যন্ত পেলামও একটা দোকানে। কিনে কিনে স্টক্ করলাম প্রচুর। এই দোকানে বসেই শুনেছিলাম, 'অযোধ্যার বেগম' ও 'আলমগীর'-এর তুলনামূলক সমালোচনা। গোকুল কাগজ দেখে বললে—ঐ কাগজে রঙ করব কী করে ?

তারপরে, সে নিজেই একটু চিন্তা করে নিয়ে করলে কী, 'চারকোল' আর খড়ি দিয়ে ঐ কাগজের ওপরে শেড ও হাইলাইট্ টানলে। মূর্তি, লতাপাতা, ফুল, কলস প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্করণ করলে সামান্য সামান্য টাচ্ দিয়ে রেখায় রেখায় ফুটিয়ে। স্টীল ক্যামেরায় ফটো নিয়ে দেখলাম, চমৎকার হয়েছে। কে বলবে, আসল পাথরের ওপর খোদাই করা মূর্তি ওগুলি নয় !

খুশী হয়ে কাজে লেগে গেলাম। অলিন্দ্রবাবু বললেন—সেট হল, এবার আসবাব। দাঁড়ান, আসবাবের ব্যবস্থা আমিই করছি। আপনি এক কাজ করুন, রবিবার সকালে আমাদের বাড়ি আসুন, দেখিয়ে দেবো আসবাব।

গেলাম। বড়বাজারের বিখ্যাত গাঙ্গুলী-বাড়ি। ও. সি. গাঙ্গুলী মশাই তখন পৈতৃক বাড়িতেই থাকতেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট আর রসা রোডের মোড়ের বাড়িটা তখন করেন নি। গিয়ে দেখি, ও. সি ফরাসের ওপর বসে তাঁর কাজ করছেন। বিখ্যাত অ্যাটর্নী ইনি, ততোধিক বিখ্যাত শিল্পরসিক। শিল্প-সঙ্গত কাজই করছিলেন, অসংখ্য 'ল্যাণ্টার্ন স্লাইডস্' সব বাছছেন, আর সাজাচ্ছেন। 'রূপম' বলে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও করেন তিনি তখন। এঁর বক্তৃতাও কিছু কিছু শুনেছি আগে। যাদুঘরের ওপরতলার হলে 'ল্যাণ্টার্ন লেকচার' দিতেন, আগ্রহভরে শুনলাম। এঁর সঙ্গে আলাপ-সালাপ এবার হয়ে যাবার পর অলিন্দ্রবাবু বললেন—আসুন, দেখিয়ে দি আসবাব।

গেলাম পাশের একটা ঘরে। দেখে চমৎকৃত হলাম। তিব্বত, নেপাল থেকে দক্ষিণ ভারত, সব জায়গায় আসবাবপত্র ও ব্রোঞ্জের মূর্তি সংগ্রহ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোনটা রেখে কোনটা বাছব ? এ যেন বাঁশবনে ডোম কানা-র অবস্থা। কোন্ বাঁশটা পাকা, তা ডোম, যার বাঁশ নিয়ে কারবার সর্বক্ষণ, সে-ও বুঝতে পারে না বাঁশবনে এসে।

অলিবাবু বুঝলেন আমার অবস্থাটা। বুঝেই বললেন—ঠিক আছে, আমিই বেছে দেবো।

নিশ্চিন্ত হলাম। অলিবাবু আনলেন আসবাবপত্র। অপূর্ব সব দীপাধার। ধুপদানী। কতগুলি ওপর থেকে ঝোলানো, কতগুলি দাঁড় করানো। আর ছিল পানপাত্র ও শঙ্খ। সব অদ্ভুত আকারের। ভাবলাম, এগুলির ছবি দেখালেই লোকে যথেষ্ট নূতনত্বের আস্বাদ পাবে। খুবই আনন্দ হলো মনে।

পোশাক-আশাকের ডিজাইনও আঁকা হয়েছিল। এঁকেছিলেন গোকুল ও অলিবাবু। এবার

আমরা কাপড় কিনে আনলাম পোশাকের জন্য। পুরুষদের জামা ত ছিলো না, ছিল চারণের কাপড় আর উত্তরীয়, মেয়েদের ছিল শাড়ী, অঙ্গরাখা, কুচবন্ধ আর কোমরবন্ধ। তারপরে ছিল পাহাড়ী ও দাসব্যবসায়ীদের সাজ। কাপড় চাই পাড় বসানো, জামাও চাই। এসব কাজ দর্জির। কিন্তু ফ্যান্সী পোশাক দেখে দর্জিও ফ্যান্সী দর হাঁকলে। প্রফুল্ল বললে—এ যে বড্ড দাম চাইছে রে। ঠিক আছে, আমিই করে দেবো।

—তুই করবি কী রে!

ও বললে—আমার বাড়িতে সেলাইয়ের মেসিন আছে। সেলাইও করতে জানি। ওসব ভাবিস না, ঠিক করে দেবো।

—ভালো কথা।

দৃশ্যপট যা তৈরি হয়েছে সে-সব বার করে স্টুডিওতে সাজাচ্ছি শুটিংয়ের জন্য, এমন সময় আকাশ কালো করে এলো প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। তোল সব তোল, রাখ, রাখ।

কালবৈশাখীর সময়। এ তো হবেই। তাহলে শুটিং হবে কী করে? মহা দুর্ভাবনা।

সবাই মিলে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, স্টুডিওর কাজ এখন থাক, বহির্দৃশ্যের কাজ, যা পাহাড়-অঞ্চলে গিয়ে করতে হবে, সে-সবগুলি সেরে ফেলা যাক সবার আগে। কিন্তু পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, অথচ বহু দূরে না যেতে হয়, এমন স্থান কোথায়? শুধু স্থানেই হবে না, মানুষও চাই। এক্সট্রা সাজবার লোক পাওয়া চাই, হাতি-ঘোড়া-উট, এসবও পাওয়া চাই। কোথায় এমন জায়গা?

চিন্তিত হলাম। অবশেষে উদ্ধার করলেন আমাদের জ্যোতিষ মিত্র মশাই। বললেন—ঠিক আছে, আমি একবার ঘুরে আসি।

—কোথায়?

বললেন। ঝাঁঝাঁ থেকে সীতারামপুর। এ ছিল ওঁর এলাকা। অর্থাৎ এ অঞ্চলের রেলওয়ে স্টাফদের সঙ্গে ওঁর সবিশেষ পরিচয় ছিল। ওসব অঞ্চলে উনি থিয়েটার করেছেন এবং করিয়েছেন। সেই সূত্রেই রেলওয়ে-কর্মচারীদের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব। জিজ্ঞাসা করলাম—কত দেরি হবে?

—এক সপ্তাহ! উনি বললেন—কাল রাত্রে যাচ্ছি, সাতদিনের মধ্যেই আসছি ফিরে।

গেলেন তিনি। শুধু ব্যাগারই নয়, গাঁটের পয়সা খরচ করে ওঁর এই যাতায়াত। ফিরে এলেন সত্যিই ঠিক সাতদিন পরে। বললেন—স্থান ঠিক হয়ে গেছে। বেস্ ক্যাম্প করা হবে সালানপুর স্টেশনে। সেখান থেকে সাইডিং লাইন আছে তিন মাইল দামুক গড়িয়া কলিয়ারী পর্যন্ত। কলিয়ারীর বাঁক অবধি ট্রলি যাবে। সেখানে ট্রলি রেখে আরও মাইল খানেক হাঁটা পথে যাবার পরে—কল্যাণেশ্বরী মন্দির—বরাকর নদীর কাছে। মন্দিরের নীচেই একটা ঝর্ণা আছে, মিশেছে গিয়ে বরাকর নদীতে। আরও একটু আগে গেলে দেখা যাবে ঝর্ণাটা ছোট নদীর রূপ পেয়েছে, তার ওপর আছে একটি ঝুলন্ত সেতু। সেতুর ওপারে—কতগুলি পাহাড়।

বর্ণনাটা ভালোই লাগল, উপযুক্ত মনে হলো আমাদের কাজের। এখন যেখানে মাইথন বাঁধ হয়েছে, আমাদের লোকেশন হয়েছিল—তারই দিকে।

জ্যোতিষবাবু বললেন—প্রচুর বেলগাছ দেখলাম মশাই। সুপক্ক বেল ধরে আছে থরে থরে।

—আর কী আছে?

জ্যোতিষবাবু বললেন—কলিয়ারীর সাহেব-ম্যানেজার আছে। কথা বলে এসেছি, সাহেবদের ঘোড়া পাওয়া যাবে একেবারে সহিস সুদ্ধু।

—হাতি আর উট?

—হ্যাঁ, তা-ও পাওয়া যাবে। দেবেন জামতাড়ার জমিদার।

—এবার রইল সাধারণ লোক—গ্রামবাসী। বললেন—তা-ও আছে। রেলওয়ের স্টাফেরা প্রচুর উৎসাহী, কাজে ছুটি নিয়ে শুটিং দেখতে আসবেন সব। প্রয়োজন হলে সাজতেও রাজী আছেন অনেকে, যাঁরা অভিনয়-টভিনয় করতে পারেন এবং করে থাকেন।

এ যোগাযোগ দৈবেরই বলতে হবে। সব ব্যবস্থাই ওখানকার রেলওয়ে স্টাফ করে দিলেন জ্যোতিষবাবুর কথায়। সব বন্দোবস্তই হয়ে গেল। আমরা যেদিন যাবো তার আগের দিন চলে গেলেন জ্যোতিষবাবু। বৈশাখের প্রচণ্ড গরম, একদিন রাত্রিবেলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, আয়না, রিফ্লেক্টর, এসব নিয়ে একটা থার্ডক্লাশ কামরায় উঠে বসলাম আমরা দুজনে, আমি আর প্রফুল্ল। গাড়ি অবশ্য ফাঁকা ছিল। পৌঁছলাম গিয়ে সালানপুরে—ভোরবেলা। তাকিয়ে দেখি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতিষবাবু। গাড়ি এখানে অল্পক্ষণই দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলি হাতাহাতি নামিয়ে ফেললাম। জ্যোতিষবাবু বললেন—খালি একটা রেলের কোয়ার্টার পাওয়া গেছে। ওখানেই বসবেন চলুন গিয়ে।

গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা বললাম,—বসে থাকতে পারব না। চলুন শুটিংয়ের জায়গাটা দেখে আসি।

—এই রোদ্দুরে?

—তা হোক।

বুধবার রওনা হয়ে বৃহস্পতিবারে পৌঁছেছি। হাতে মাত্র দুটি দিন, শুক্র আর শনি। রবিবারে শুটিং হবে স্থির হয়ে আছে। ঐ দিনটিই মাত্র হেমবাবুর ছুটি, ঐ একদিনের মধ্যেই যতটা পারা যায় শুটিং করে নিয়ে রাতারাতি তাঁকে ফিরে যেতে হবে। সবই ঠিকঠাক। এর মধ্যে, হঠাৎ এক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। বৈশাখের গরম সহ্য করতে না পেরে নায়িকা জ্বরে পড়েছেন, আছেন তিনি প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে। জ্বর অবশ্য ততদিনে সেরে গেছে, কিন্তু বড় দুর্বল। এ অবস্থায় তিনি আসেন কী করে? হাসপাতালও ছাড়তে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, হেমবাবু হাসপাতালে জামীন লিখে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

যাই হোক, আমরা ত ঐ দুপুর বেলাতেই প্রচণ্ড রোদ্দুর মাথায় করে বেরিয়ে পড়লাম। যতীশ সেনগুপ্ত হচ্ছে পি-ডাবলিউ-ডির একজন ওভারসিয়ার, জ্যোতিষবাবুর পরিচিত ব্যক্তি। তাঁরই ট্রলি করে, তিনি, জ্যোতিষবাবু, আমি আর প্রফুল্ল, এ চারজনে রওনা হলাম। ট্রলিতে বড়ো-বড়ো তিনটি মাটির কুঁজোতে করে জল নেওয়া হলো। গরমে বুক শুকোবে, আর ক্রমাগত জল খাবো। আকাশ থেকে তখন যেন আগুন ছড়াচ্ছে। সে যে কী প্রচণ্ড উত্তাপ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এলাম অবশেষে লোকেশনে। ঘুরে-ঘুরে সব দেখে সত্যই খুব ভালো লাগল। তারিফ করলাম জ্যোতিষবাবুর পছন্দের। ঠিক করলাম, শুটিংয়ের আগের রাত্রে, অর্থাৎ, শনিবার রাত্রে আমরা কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে এসে থাকব।

ফিরে এলাম আস্তানায়। কাগজপত্রের কাজ আমি করি, প্রফুল্ল করে তার সেলাইয়ের কাজ। তার হাত-মেসিনটা সে সঙ্গেই এনেছে। পোশাকও কম দরকার নয়!, পাহাড়ীদের পোশাক, দাসব্যবসায়ীদের পোশাক, যথেষ্ট পোশাকেরই প্রয়োজন। কাজ চলতে লাগল। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। শুক্রবার সকালে এলেন ক্রীড সাহেব তাঁর ক্যামেরা প্রভৃতি নিয়ে। কোথায় রাখা যায় সাহেবকে? এই ছোট্ট কোয়ার্টারে বেচারীর খুবই অসুবিধা হবে। তখন সালানপুর স্টেশনের নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছিল। ছাত তৈরি হয়ে গেছে, দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে, তখনো কোনো ঘরের কোনো ব্যবহার আরম্ভ হয়নি, আর হয়নি তৈরি মেঝেটা। মেঝেতে খোয়া বিছানো, সিমেণ্টের প্রলেপ তখনো পড়েনি। তাতেই খাট পেতে রইলেন ক্রীডসাহেব।

শনিবারে এল গোকুল আর নেড়ুবাবু। সঙ্গে গোকুলবাবুর বন্ধু—দীনেশবাবু। দীনেশবাবু আগেই বলে রেখেছিলেন—শুটিং দেখতে যাবো কিন্তু মশাই।

—নিশ্চয়ই আসবেন।

শনিবার দিন খুবই কাজের তাড়া পড়ল। ট্রলি ছুটল দু ট্রিপ। বিকালের দিকে—জিনিসপত্রসমেত সবাই এসে জড়ো হলাম কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে। বহু রেলের কুলি রয়ে গেল, তাদের ভোরবেলায় ডিউটি। কথা হলো, ভোরবেলা যতীশ সেনগুপ্ত চলে আসবেন তাঁর ট্রলি নিয়ে। যখন সারাদিনের শুটিংয়ের পরে সন্ধ্যা হয়ে আসবে, তখন সেই ট্রলি করে মেমসাহেব, হেমবাবু ও ক্রীডকে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এইসব স্থির করে জিনিসপত্র নিয়ে উঠলাম গিয়ে আমরা নাটমন্দিরের ছাতে। ক্রীডকে ত আর মন্দিরে ঢোকানো যাবে না, তাই বাইরের রোয়াকে তাকে বিছানা করে দেওয়া হলো। সাহেব বিছানার কাছে আলো জ্বেলে রাখবে, কাঁকড়া বিছের বড়ো ভয় এখানে।

রাত্রে, আমরাও সব শুয়ে পড়েছি। আজই রাত্রে হেমবাবু আসবেন মিসেস উইথকে নিয়ে আসানসোল হয়ে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিক নেই, জেগে উঠে হঠাৎ শুনি মোটরের হর্ন বেজে চলেছে। ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। সবাইকে ডেকেডুকে মোটরের কাছে এসে দেখি, রোগাক্রান্ত

মেমসাহেব পথশ্রমে আরও কাতর হয়ে পড়েছে। সমস্যা হলো, ওঁদের এখন রাখি কোথায়? যে-কারণে ক্রীডকে রাখা যায়নি মন্দিরের মধ্যে, ওঁকেও রাখা যাবে না সেই কারণে। ওদিকে ড্রাইভারও আর থাকতে চায় না। তাকে অনুনয়-বিনয় করে, অতি কষ্টে রাখা হলো। মেমসাহেব রাত্রিটা কাটালেন ঐ মোটরের গদীতে শুয়েই। আমরা আর কী করি? বাকি রাতটা গল্প করে কাটালাম। বলতে ভুলে গেছি, রাত্রেই হাতি, উট আর ঘোড়া এসে গিয়েছিল। পাঁচটি ঘোড়া সোয়ারসহ পাঠিয়েছেন সাহেবরা।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো শুটিংয়ের কাজ। ১৯২২-এর সেটা ৩০শে এপ্রিল, অক্ষয়তৃতীয়ার দিন। মন্দিরে আমরা পুজো দিয়েছিলাম। এদিকে আমাদের চেষ্টা, যতটা শুটিং শেষ করে ফেলা যায়। হাতির মাথায় মাঝে মাঝে ঘি দিতে হচ্ছে, নইলে গরমে হাতির মাথা তেতে উঠতে পারে। কাজ চলল পুরোদমে। ক্রীড সাহেব একবারমাত্র বললেন টিফিন করবার জন্য, নইলে সে যা পরিশ্রম করলেন সারাদিন ধরে, তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মেমসাহেবকে যতটা সম্ভব সুখ-সুবিধা দেওয়া হলো, তবুও রোগদুর্বল শরীরে সে বেচারী কাতর হয়ে পড়ছে। অথচ, কাজের সময় তার হাসিমুখ।

সারাদিনে অবশ্য আমাদের মুখে গেলাস গেলাস জল ছাড়া আর কিছুই পড়েনি। ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলাম মন্দির-চত্বরে। উট-হাতি-ঘোড়া, যে-যার সব চলে গেল। আমরা রাতটা মন্দিরে থাকব কথা আছে। শুধু মেমসাহেবকে নিয়ে চলে যাবেন হেমবাবু। ক্রীডও যাবে। মেমসাহেব তখন সত্যিই রীতিমত শ্রান্ত। তবে কোনক্রমে ধরে ধরে আমরা একমাইল পথ হেঁটে সেই ট্রলি থামবার জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। যতীশবাবু হাঁক দিলেন—ট্রলি? এই ট্রলি?

কিন্তু কোথায় ট্রলি! গ্রামের লোকগুলো ছিল এধারে-ওধারে। তারা বললে—সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে কুলিরা ট্রলি নিয়ে চলে গেছে।

জানা গেল, কুলিদের উপায়ও ছিল না চলে না গিয়ে। কুলিগুলি সবাই রাতকানা, রাত্রে ট্রলি নিয়ে লাইন দিয়ে ওরা যাবে কী করে?

কেন? রাতকানা কেন সবাই?

যতীশবাবু বললেন—দিনে লাইনের ওপর দিয়ে ট্রলি ঠেলবার সময়, লাইনের ওপরে যে রোদ্দুর ঝকঝক করে, তার ঝলক ক্রমাগত ওদের চোখে লেগে লেগে ওরা রাতকানা হয়ে পড়ে।

কিন্তু, তা'ত হলো, এখন উপায়? এই তিন মাইল পথ মেমসাহেবকে নিয়ে যাই কী করে? আর সবাই না হয় হাঁটলেন, কিন্তু মেমসাহেব?

ক্যাম্পে রয়ে গেছেন দীনেশবাবু, গোকুলবাবু। আমি, প্রফুল্ল, নেড়ুবাবু, জ্যোতিষবাবু এসেছিলাম এঁদের এগিয়ে দিতে। যতীশবাবু, হেমবাবু, ক্রীডসাহেব আর মেমসাহেব একসঙ্গে স্টেশনে চলে

যাবেন কথা ছিল। কিন্তু, এমত অবস্থায় আমাদের আর ফিরে যাওয়া হলো না। খালাসী ক'জনকে খবর দিয়ে আনালাম। তারপরে সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা করলাম মেমসাহেবকে নিয়ে যাবার। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত ধরলাম মুঠো করে। সেই হাতের দোলনায় মেমসাহেবকে বসিয়ে আমরা শুরু করলাম চলা। কিছুদুর যাই, হাঁপিয়ে উঠি, আবার বদল হয়ে আসেন অন্য দুইজন লোক। এইভাবে লোক বদলে বদলে তিনমাইল সুদীর্ঘ পথ চলে এলাম আমরা মেমসাহেবকে নিয়ে। কাতর হয়ে পড়লেও মেমসাহেবের মুখের হাসিটুকুর বিরাম নেই। ট্রেনে উঠে বললে— থ্যাঙ্ক্স্।

চলে গেলেন ওঁরা ট্রেনে। সকালবেলা, গরুরগাড়ি নিয়ে আমরা ফিরে এলাম মন্দিরে। গোকুল আর দীনেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে, জিনিসপত্র গাড়িতে উঠিয়ে আবার ফিরে এলাম কোয়ার্টারে। সে রাত্রে সবাই চলে গেল কলকাতায়, আমি আর জ্যোতিষ মিত্র ছাড়া। জ্যোতিষবাবু আমাকে বললেন— আপনি থেকে যান।

—কেন ?

—যাঁরা আমাদের এতো সাহায্য করলেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে একবার ধন্যবাদ জানাবেন না ? কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। স্টেশন থেকে আধমাইলের মধ্যেই সাহেবদের কোয়ার্টার। পরদিন সকালে ওঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে বিকেলে চলে গেলাম মধুপুর।' সেখানে ছিলেন পি-ডবলিউ-আই—শরদিন্দু মজুমদার। তখনকার দিনে ঐরকম পোস্টে বাঙালী ছিল না বলিলেই হয়, ছিলো সব সাহেব নয়তো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা। শরদিন্দুবাবুর নাটকের শখ প্রচুর। নিজে অভিনয় করেন না বটে, তবে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। খুব অমায়িক ব্যক্তি। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা যা করলেন, তা এক সমারোহেরই ব্যাপার। রাতটা মধুপুরে কাটিয়ে সকালে চলে এলাম যশিড়িতে, প্রিয়নাথ মল্লিক মশাইয়ের বাড়িতে, জ্যোতিষবাবু যার তত্ত্বাবধায়ক। এখান থেকে গেলাম জামতাড়ায় রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে। জামতাড়ার কুমারবাহাদুর নিজে এসেছিলেন আমাদের শুটিং দেখতে। বললাম—একদিনে শুটিং সব হলো না। আরও আসতে হবে।

—যখন খুশি, যতবার খুশি আসবেন, সাহায্য যা করবার অবশ্যই করব।

অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করলাম, তারপরে ফিরে এলাম কলকাতা। একাই অবশ্য।

ছাব্বিশে এপ্রিল বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, ফিরলাম পাঁচই মে। জ্যোতিষবাবু তুলে দিয়েছিলেন গাড়িতে। ভিড় তখনকার দিনে কমই থাকত। থার্ড ক্লাশের কাঠের বেঞ্চে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটানোর জন্য, ঘুম কিন্তু কিছুতেই এলো না। যত গাড়িটা কলকাতার

দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তত মনের মধ্যে জাগছে একটা অস্থিরতা, একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। তিরিশে এপ্রিল শুটিং করেছি, দারুণ বৈশাখের গ্রীষ্ম সাঁওতাল পরগণার মতো জায়গা—সবাই মিলে যে পরিশ্রমটা করলাম, তার ফলটা কী হলো? ভালো, না, মন্দ? সাফল্য, না ব্যর্থতা?

এক-এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শুটিংয়ের টুকিটাকি ঘটনাগুলো, সেই রবিবার ভোররাত্রি থেকে সোমবার পর্যন্ত আহার-নিদ্রা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, টের পাইনি। শুটিংয়ের জায়গা ঠিক ক'রে দেওয়ার পর, স্থানীয় পি-ডাবলিউ-আই-এর বাবুরা কুলিদের দিয়ে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন সেই সকালবেলাতেই। ঘিরে দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট সীমানাটুকু। গাছতলায় একটি টেবিল, একটি বেঞ্চিও শোভা পাচ্ছিল। সেখানে বসেই মিসেস উইর্থকে মেক-আপ করে দেওয়া হলো। মেক-আপের পর মেমসাহেব গেলেন তাঁবুর মধ্যে পোশাক পরবার জন্য। যখন বেরিয়ে এলেন, চেহারার দিকে তাকিয়ে সত্যিই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যেতে হয়! সুন্দর, সুগঠিত দেহশ্রী। পোশাকটাও এমনভাবে পরিকল্পিত যে, ওপর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এসেছে সেটা, আর ঊর্ধ্বাংশে হাত দুটি সম্পূর্ণ বার করা। এতে যে চরিত্র তিনি রূপায়িত করছেন, সেই চরিত্রানুযায়ী দেহসৌষ্ঠবসম্পন্না অপরূপা রূপসীতে পরিণত হলেন তিনি।

দাস-ব্যবসায়ীদের সর্দারের সাজে এবার সাজাতে হবে জ্যোতিষ মিত্র মশাইকে। মেক-আপে গোকুলবাবু-নেড়ুবাবু সাহায্য করেছিলেন, চুলের কাজটা ক'রে দিলাম আমি। প্রাথমিক কাজ সব একরকম প্রস্তুত, এবার শুটিং করার পালা। পাহাড়ের একটা ধার দিয়ে কলকল ছলছল করে উচ্ছল ঝরনা নেমে গেছে, নায়িকা সেখানে জলে পা ডুবিয়ে খেলা করছে, তার পাশে রাখা রয়েছে তার জলের পাত্রটি। এই দৃশ্যটি আগে তোলাই ঠিক হলো।

মুখুজ্যে মশাই আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন—কোথায় বসবে-টসবে, একটু দেখিয়ে দিন।

দেখিয়ে দিতে হলো। স্টীড ছবি নিলেন।

পরের দৃশ্যটিও নায়িকার। পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে সে আসছে, ঝরনার জলে জল ভরছে এই দৃশ্য। চিত্রনাট্যের কাগজটা আমার হাতে দিয়ে মুখুজ্যে বললেন—কাজটা চালিয়ে নিন। আমি আছি। দেখছি। এটিও তোলা হলো। এবার একটা লং শটের ব্যাপার। দাস-ব্যবসায়ীরা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে পার্বত্য পথে। মেগাফোন-গোছের একটা টিনের চোঙা তৈরি করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, যার মধ্য দিয়ে কথা বললে দূর থেকে শোনা যায়। ওঁরা ঘোড়ায় চ'ড়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেগাফোনে বললাম—আবার আসুন।

ক্যামেরা চালু হয়ে গেছে। ঘোড়াও সব ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সর্দার-রূপী জ্যোতিষবাবুর ঘোড়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ছুটল না। কাট-কাট।

ক্যামেরা বন্ধ হলো। কী ব্যাপার? জ্যোতিষবাবু বললেন—এত করলাম, ঘোড়ার কী মর্জি, একেবারেই ছুটল না। কী হবে! কোথায় সর্দার ছুটবে আগে আগে, সেখানে আর সবাই চলে গেল,

সর্দার নিজেই রইল পড়ে? জ্যোতিষবাবু বললেন—আমি ত হাত দেখিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি।

কথাটা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু সেটা ত আমরা চাইনি। অতএব দৃশ্যটা আবার নেওয়া হলো। এবার অবশ্য নিখুঁত হ'লো ঘোড়া-ছোটার ব্যাপার, কিন্তু জ্যোতিষবাবুকে বাদ দিয়ে তুললাম আমরা দৃশ্য। জ্যোতিষবাবুকে উটে চড়িয়ে ভিন্ন একটা দৃশ্য নেওয়া হবে, সেটা ঐ ঘোড়া ছোটার সঙ্গে জুড়ে দিলেই কাজ চলে যাবে।

পরের দৃশ্যটা আবার মেমসাহেবকে নিয়ে। ঘোড়ার জিন-লাগাম সব ফেলে দিয়ে, এমনি রাখা হ'ল। তার ওপরে সওয়ার হয়ে, পুরুষের মতো দুদিকে দুটো পা ঝুলিয়ে দিয়ে মেমসাহেব সত্যিই ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন চমৎকার।

এর পর জ্যোতিষবাবুর উটে-চড়ার ব্যাপার। এক উটে—উনি, অন্য উটে—ওঁর সহকারী। সহকারী যাকে সাজানো হয়েছে, সে উটের খিদমদগার, সুতরাং তাকে নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, চিন্তা জ্যোতিষবাবুকে নিয়ে। ওঁকে নিয়ে উট যখন জোর কদমে চলছে, উনি অস্বস্তি বোধ করছেন, আর বলছেন—এ যে বড়ো টলমল করছে।

উটে চড়া সত্যিই কঠিন। আমরা চেঁচিয়ে বললাম—ভয় নেই। বসবার সিটটা আঁকড়ে ধরে থাকুন।

নেওয়া হলো সট্।

মধ্যাহ্নে, ঐ টেবিলের ওপরেই খাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া গেল। খাবার কিছু ওঁরা এনেছিলেন আসানসোল থেকে, কিছু ফলটল যোগাড় করে রেখেছিলাম আমরা। এসব করেছিলাম, কিন্তু ভাবিনি নিজেদের কথা। নিজেরা কি খাবো? কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরে দেবীর কাছে উৎসর্গ করার জন্য ফেনী বাতাসা, খই, এসব পাওয়া যেতো দোকান থেকে। ছোলাভাজা, মটরভাজাও পাওয়া যেতো। সেই সব যার-যার ইচ্ছামতো কিনে, তাতেই আমরা চালিয়ে দিলাম। খাওয়ার পর শুটিং কিছু হলো, কিন্তু চারটের পর ছায়া পড়ে এলে, শুটিং করা আর চলল না। কিন্তু যে কাজটুকু করা হলো, তাতে প্রত্যেকেরই কষ্ট হয়েছে সাংঘাতিক। প্রচণ্ড গরম। যে যতো পারছে খালি জল খাচ্ছে। ক্রীড ত ক্যামেরা চালিয়েছেন, কিন্তু লোকজন জড়ো করে, সব-কিছু দেখিয়ে দেওয়া, এই করবে—ঐ করবে, এ-ও কম পরিশ্রমের কাজ নয়, দেখলাম! আমার ভাগ্য ভালো, আমার নিজের শুটিং সেদিন ছিল না। থাকলে কোন্ দিক ফেলে কোন্ দিক দেখতাম? এর পরে, প্রত্যাবর্তনের সময়ে কী হলো, তা বলেছি।

ট্রেনে শুয়ে শুয়ে একা-একা ঘটনার রোমন্থন করতে করতে একথাই ভাবছি, এতগুলি লোকের এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, সব যেন আমার পরিচালনার মধ্যে এসে পড়ল হঠাৎ। যা করেছি, তা ত আমার করার কথা নয়, তবু এ কাজের মধ্যে কোন্ অদৃষ্ট শক্তি যেন আমাকে জোর করে ঠেলে দিলে!

এই সব ভাবতে ভাবতে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু তন্দ্রার ঘোরের মতো লেগেছিল চোখে, ঘুম ভাঙতেই দেখি হাওড়া স্টেশন। সঙ্গে মোটঘাট কিছু নেই, একেবারে ঝাড়া হাত-পা। এ আমার তখন অভ্যাস ছিল, বহুদিন ওভাবে চালিয়েছি। একেবারে এক-কাপড়ে, বলা যেতে পারে।

স্টেশন থেকে সোজা বাড়ি না গিয়ে, গেলাম আগে প্রফুল্লর বাড়ি! রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—ছবি কেমন হলো?—তা ত বলতে পারি না!—প্রফুল্ল বললে—সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়নি আর।

এলাম বাড়ি। মনে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা। ছবিটা উঠল কেমন? বাড়ির পঞ্জিকাটা বার করে দিনটা একবার দেখে নিলাম। দেখি, অদ্ভুত যোগাযোগ! তিরিশে এপ্রিল, যেদিন আমরা শুটিং করেছি সেটি অতি শুভ দিন—অক্ষয়তৃতীয়া।

ঠাণ্ডা হলো মন! যাক, ভালো দিনেই কাজটা শুরু করা গেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখুজ্যেমশাইয়ের অফিসে গেলাম। কুশলেই আছেন। মেমসাহেবও ভালো হয়ে উঠেছেন, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম—ছবি কেমন হলো?

—জানি না। ক্রীড আসে না অনেক দিন।

ওখান থেকে গেলাম আমাদের অফিসে। নেড়ুবাবু আর গোকুলবাবু। বিকেলে প্রফুল্লও এলো। গল্পসল্প করলাম বসে বসে খানিকক্ষণ। তারপরে ছটা নাগাদ গেলাম পিকচার হাউসে। ক্রীড সেদিন এসেছে। দেখা হলো। সেই এক প্রশ্ন—ছবি কেমন হয়েছে?

সাহেব বললে—ডেভেলপ করেছি। ভালোই হয়েছে।

বললাম—আমাদের দেখবার কী হবে?

—তা দেখিয়ে দেবে'খন।

বললাম—নেগেটিভ দেখে ত আমরা কিছু বুঝব না!

সাহেব বললে—এখন আর প্রিণ্ট করব না। হাতে আরেকটু জমুক।

—তবু, ঐটুকুই প্রিণ্ট করা যায় না? কেমন হয়েছে, দেখতাম।

সাহেব অভয় দিয়ে বললে—কিছু ভয় করো না। তোমরা পরের কাজগুলো শুরু করে দাও দেখি।

এবার আমাদের স্টুডিওতে সেট্ লাগানো হলো। ডোবার ওপরে আমাদের সাঁকো তৈরি করাই ছিল, বাগানও ছিল, সুতরাং একটা দৃশ্য এরই পটভূমিকায় তোলা হতে পারে। সেটে তৈরি প্রাসাদের অংশ, আর এই স্বাভাবিক উদ্যান। আলোছায়ার খেলাটা পেলাম চমৎকার। কোথাও ছায়া কোথাও আলো। ধর্মপাল দেখেছে, রমলা উদ্যানে পরিভ্রমণ করছে একা একা। ধীরে ধীরে রমলার কাছে এলো সে। দুজনারই মন দুজনার কাছে জানা। চত্বরের সিঁড়ির ওপরে বসল দুজনে। কেউ কারুর মুখের ভাষা বোঝে না, বোঝে মনের ভাষা, বোঝে চোখের ভাষা। মেয়েটি খেলাচ্ছলে ধর্মপালের মাথার ওপর একটি একটি করে ফুল গুঁজে দিচ্ছিল।

আমার ফিরে আসার পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে এ কাজটা হয়ে গেল। তারপরে, অন্য সেট্ সাজানোর ব্যাপার। অলিবাবু যা যা বলেছিলেন, অর্ধেন্দুবাবুর অনুমতি নিয়ে সেই সব আসবাবপত্র একটা ঠিকে গাড়ি করে নিয়ে এলাম ওদের বাড়ি থেকে। সাজিয়ে দিলাম। সব মিলিয়ে সেটের রূপ হলো যেন সত্যিই রাজপ্রাসাদ! আর ওপরে নিয়ন্ত্রিত আলোকসম্পাত! চমৎকার লাগছিল দেখতে! কিন্তু কাজ কিছুটা এগুতে না এগুতেই নামল হঠাৎ ঝরঝর ঝমঝম করে হাওয়া আর বৃষ্টি। সে হাওয়ায় সেট রাখা মুশকিল। তার ওপরে বৃষ্টিরও এত জোর যে, কাপড়চোপড় তুলে নিয়ে এসে সেট্ ছেড়ে আমরা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এলাম। ঝাড়া এক ঘণ্টা হলো বৃষ্টি। থামতেই তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখি, আঁকা কাগজগুলি কাঠের গা থেকে খুলে আসেনি বটে, তবে অধিকাংশই ঢিলে হয়ে গেছে। সেগুলো আঠা দিয়ে আবার আমরা জুড়ে দিলাম। সেগুলো ক্রমশঃ ঢোলকের চামড়ার মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘেঁষ-দেওয়া মেঝে,জল অবশ্য দাঁড়ায়নি, তবু মনে হলো এরকম বৃষ্টির দিনে শুটিং করা যাবে না। বিছানা-পত্র আসবাব—সব চেয়ে-চিন্তে আনা, এসব নষ্ট হতে দিলে চলবে না। তাছাড়া একদিনের শুটিংয়ের খরচ, যদিও তা খুব কম, তবুও তা বিফলে গেলে আমরা সহ্য করতে পারব না। প্রফুল্লর বাড়ি থেকে লুচি, আলুর দম, মিষ্টি, এসব নিয়ে আসত ওর ভাই ভোলা আর অমূল্য সে-সব খেতাম আমরা ভাগাভাগি করে। চা কিছু হতো তৈরি। তার ভার ছিল আবদুলের ওপরে। এছাড়া ছিল, পার্শ্ববর্তী গাঁ থেকে আনা মুড়ি আর ফুলুরী। আর তা খেতাম আমরা পরমানন্দে। তবু এ খাবারটুকুও নিরর্থক গেলে, আমাদের কাছে হয়ে পড়তো সহ্যাতীত। বৃষ্টির জন্য এভাবে মাঝপথে শুটিং বন্ধ হলে ক্ষতির কারণ ঘটবে। অতএব থাক বন্ধ, এখন সেট সাজিয়ে স্টুডিওর সুটিং। বাইরে গিয়ে বরং শুটিং করলে কেমন হয়? সেরেই ফেলা যাক না বাইরের কাজ, যতটা পারি?

মুখুয্যে বললেন—আসুন কাল আমার অফিসে আলোচনা করা যাবে।

পরদিন দুপুর বেলা। গেলাম আমি একাই। দেখি, ওর টেবিলের সামনে একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। মুখার্জি আলাপ করিয়ে দিলেন। মুসলমান, হানিফসাহেব, কি ঐ ধরনের কোনো নাম হবে, আজ ঠিক মনে নেই, ও'দের একজিবিটার। বাড়ি হচ্ছে ধানবাদে। তরুণ বয়স, খুব স্মার্ট, কর্মঠ লোক বলে মনে হলো। খাকি হাফ প্যাণ্ট ও সার্ট পরনে, বেশ বলিষ্ঠ গঠন শরীরের। ভ্রাম্যমাণ দল আছে ও'র। কলিয়ারীতে-কলিয়ারীতে, সাহেবদের ইনস্টিটিউটে, কাত্রাসগড়, ঝরিয়া, এসব এলাকায় ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ান। বললেন—শুটিং করবেন ত আমাদের ওখানে চলুন না!

—বেশ কথা। কিন্তু আপনাদের ওদিকে পাহাড় হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু ভালো ঝরনা আছে?

—আছে বই কী!—ভদ্রলোক বললেন—জানা আছে সে রকম জায়গা। কাছেই পড়বে আমাদের।

বললাম—ঘোড়া ও উটের কাজ আমদের হয়ে গেছে, এবার হাতির দরকার, পারবেন দিতে?

উত্তর দিলেন—না, সেটা পারব না। তবে আপনাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

—বেশ, তাই হোক।

মুখুজ্যেমশায় ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বাইরে যাবার কথাই স্থির হলো। এবার আগে গেলাম আমি আর গোকুল। উঠলাম গিয়ে সেই হানিফসাহেবেরই বাড়ি। তাঁর অফিসঘর ছিল দোতলায়, সেটাই হলো আমাদের আস্তানা। কিন্তু খাবার আয়োজন আর তার যা তাগাদা, তাতে আমাদের অস্থির হয়ে উঠবার যোগাড়! মোগলাই খানা এক আধদিন ভালো লাগে, কিন্তু রোজ দুটি বেলা, এইরকম গুরুভোজন! এ-অত্যাচার, তবে স্নেহের অত্যাচার। ভদ্রলোকের আতিথেয়তায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না! যেরকম পাহাড়-ঝরনা চেয়েছিলাম, সেই রকম জায়গায় নিয়ে গেলেন তাঁর মটোরে করে। ধানবাদ স্টেশন থেকে মাইল সাতেক গেলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মোড় পাওয়া যায়। সেই জায়গাটাকে বলে—গোবিন্দপুর। ওখানে থানা আছে, ডাকবাংলো আছে। কয়েক ফার্লং দূরে কয়েকটি পাহাড় ঢলে পড়েছে। কলকাতার দিকে আসতে ধানবাদের পরবর্তী যে-স্টেশন পড়ে, তার নাম—প্রধানখন্তা। প্রধানখন্তা থেকে শুরু করে ঐ মোড় পর্যন্ত গিয়ে পাহাড় মিশেছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, পাহাড়ের ঢল নেমেছে। সেই পাহাড়ের নিচে একতলা একখানা ঘর আছে, তাতে আছেন ডাকাতে কালী। পূর্বে ওখানে নরবলি হতো বলে শোনা যায়। বিরাট এক বটগাছের নিচে ঐ ঘরখানা। সপ্তাহে একবার ঘটা করে পুজো হয়, পশুবলি হয়, গাঁ থেকে সব লোকজন আসে। আমরা চারিদিকে সব ঝরনা-টরনা দেখে ফিরে আসছি, এমন সময় নামল ভীষণ বৃষ্টি। ছুটে ঐ ঘরখানায় পৌঁছতে-না-পৌঁছতে একেবারে ভিজে স্নান করে গেলাম। বাড়ি যখন এসে পৌঁছলাম, তখন ঠাণ্ডায় কাঁপছি ঠক-ঠক করে। ভাবলাম জ্বর হবে নাকি! তাহলেই চিত্তির! কিন্তু হানিফ সাহেবের কাছে ছাড়ান পাবার জো নেই, আবার সেই খাওয়াদাওয়ার এলাহি কাণ্ড! রাত্রের মেলে এলেন হেম মুখুজ্যে, ক্রীড, মেমসাহেব ও প্রফুল্ল। রাতটা ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে ভোরে এলেন আস্তানায়। গাড়ির অভাব নেই। ঠিকে-গাড়ি আছে, ভাড়ার ট্যাক্সিও আছে। আমরা বললাম—লোকেশন যা দেখে এসেছি, তাতে শেষ দৃশ্যটি সুন্দর তোলা যাবে। ধর্মপাল সেখানে দেখছে, মেয়েটি পার্বত্য পথে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আমি সেই জায়গাটার কথা বলছি। পাহাড়ের গাছগুলিও ওখানে ছোট-ছোট। পারিপার্শ্বিক অতীব সুন্দর!

কিন্তু শুটিং আরম্ভ হবার আগে আবার একপশলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। তাতে ফল হলো এই, ওখানকার ঝরনাগুলি বৃষ্টির নতুন জল পেয়ে আরও ফুলে-ফুলে উঠেছে চমৎকার! লোভ হলো ক্রীড সাহেবের। বললে—নায়িকা ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে যেখানে খেলা করছে, সে দৃশ্যটি এখানেই খুলবে সুন্দরভাবে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের কাছে যেটি তোলা হয়েছিল, সেটি বাদ দেবো। ঐ দৃশ্যটি আবার এখানে তোলা হোক।

তাই হলো। আরও টুকিটাকি কয়েকটা দৃশ্য হলো, কিন্তু শেষ দৃশ্যটি আর হলো না। দিনটা ঠিক রবিবার—দশহরার দিন—৪ঠা জুন। ফিরে এলাম কলকাতায়। ততদিনে বৃষ্টি নেমে

গেছে ; শুটিং আর হবে না, শুটিং বন্ধ। সাহেবকে অনুরোধ করলাম, এবার প্রিণ্ট করে দেখাও, যা হয়েছে তোলা।

সাহেব প্রিণ্ট করলেন। দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। কম্পোজিশন আর ফ্রেমিং-এর গুণে অতি বাস্তব জিনিসও এতো চমৎকার হয়ে ফুটে উঠে! মনে হলো, সত্যিই নতুন কিছু একটা আমরা দেখাতে পারব। সাধারণ পৌরাণিক ছবি নয়, সামাজিক স্তরেরও কিছু নয়, এ-এক নতুন পরিবেশ—নতুন বস্তু।

তারপর। কাজ নেই বসে-বসেই দিন কাটছে। স্টুডিওতে একটু যাই, অফিসেও গিয়ে বসি, নতুন সব সেটে কী হবে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। বর্ষা শেষ হয়ে পুজো আসন্ন হয়ে আসছে, শুটিং আবার আরম্ভ করব ভাবছি, এমন সময় অন্য কাজ এসে দাঁড়ালো সামনে। উত্তরবঙ্গে তখন প্রবল বন্যা হয়ে দেশের বহু ক্ষতি হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একটি আর্তত্রাণ ভাণ্ডার খুললেন। বহু জায়গা থেকে চাঁদা এসে পড়তে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা গান গাইছে, কাপড় পাতছে, তাতে এসে জমা হচ্ছে কতো কাপড়—কতো জামা!

এদিকে হলো কী, ঐ যে বলেছি রসা থিয়েটারে 'বিলাত-ফেরত' ছবি দেখানো হয়েছে, সেই রসার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন রাজশাহীর মহেন্দ্র মৈত্র। ইনি উদ্যোগী হলেন। অভিনয়-অনুষ্ঠান করে কিছু টাকা ঐ ভাণ্ডারে তুলে দেবার জন্য। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বোধহয় অন্যতম পরিচালক ছিলেন ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজরা রোডে ওঁর বাড়ি ছিল। ইনি নাট্যকার ভূপেন্দ্রবাবু নন, তবে কোনো এক সম্পর্কে এঁরা ভায়রাভাই ছিলেন শুনেছি। মহেন্দ্রবাবু ভূপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন সমস্ত নামকরা অপেশাদার অভিনেতাদের একত্র করে সম্মিলিত অভিনয় করাবেন। তিনকড়িদা অপেশাদারীদের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতা, সুতরাং অচিরেই তিনি জড়িয়ে পড়লেন এর মধ্যে। এবং পড়েই ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন—'চন্দ্রগুপ্ত' হবে, ঠিক হয়েছে। শিশির, নরেশ, আর আমরা, আর কলকাতার সঙ্গীতসমাজের কয়েকজন সভ্য আমরা সবাই মিলে এই অভিনয় করব। তোমাকে করতে হবে সেলুকসের পার্ট।

—না, তা কেন করব?

—তার মানে!

বললাম—তুমি ইভনিং ক্লাবের অভিনয়ে এত ভালো অভিনয় করো, তুমি ওটা করবে না কেন?

তিনকড়িদা বললে—না, আমি ওটা এবার করব না, আমি সাজব ভিক্ষুক। ভিক্ষুক হয়ে গান গাইব। তুই করবি—সেলুকস। ইন্দু করবে—অ্যান্টিগোনস। আর বিধু সরকার—হেলেন।

—আচ্ছা। রিহার্স্যাল বসবে কোথায়?

—সোমদেবের বাড়ি।

অর্থাৎ বেণীমাধব গাঙ্গুলী মশাইয়ের বাড়ি। সোমদেববাবু বিজয়বাবুর অবসর গ্রহণ করার পর

জুওলজিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলেন। নিজে অভিনয় করতেন না বটে, কিন্তু এসব নিয়ে মেতে ওঠবার বড়ো শখ ছিল। বেণীমাধব গাঙ্গুলী ছিলেন সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। তাঁর ডিক্‌সনারী, ইংরেজী-বাংলার তর্জমার বই ছিল। সোমদেব ছিলেন বেণীবাবুর দ্বিতীয় পুত্র, গণদেব—তৃতীয় পুত্র। তিনকড়িদার বাড়িতে আমরা কজনে মহলা দিতাম। কিন্তু যেদিন বাইরের ওঁরা আসতেন, সেদিন মহলা দিতাম সোমদেববাবুর বাড়িতে। নরেশবাবু এলেন একদিন। দেখলাম, তবে আলাপ হলো না। অশ্বিনী বিশ্বাস—তখনকার বিখ্যাত ফিমেল প্লেয়ার গানও করতেন অপূর্ব, ইভনিং ক্লাবের অভিনয়ে ছায়ার ভূমিকায় মাত করে দিয়েছিলেন, তিনিও এলেন, তাঁকে দেখলাম বলা বাহুল্য, এখানেও 'ছায়া' করলেন তিনি। রিহার্স্যালে আসেননি শিশিরবাবু—তিনি 'চাণক্য' করবেন, কিন্তু তাঁকে একদিনও দেখলাম না।

যাই হোক, এক শনিবার ত রসা থিয়েটারে হয়ে গেল 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়। সে রাত্রিটির কথা বেশ মনে আছে। চারিদিকে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। অসম্ভব ভিড় টিকিট-ঘরের সামনে। কতো লোক যে দেখতে এসেছিলেন তা বলা যায় না। দৃশ্যপট দিয়েছিলেন 'স্টার' থিয়েটার, প্রবোধচন্দ্র গুহ স্বয়ং এসে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সবকিছু। স্টেজের লোকজনও সেখান থেকে, পোশাক-পরিচ্ছদও সেখান থেকে। কেবল গ্রীক পোশাকগুলির মধ্যে সেলুকস অ্যান্টিগোনস আর হেলেন এই তিনটি পোশাক এনে দিয়েছিলেন য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের গিরিন সেন মশাই, ইনি ছিলেন শিশিরবাবুরই সহাধ্যায়ী। বড়ো শখ ছিল প্রাচীন পোশাক-আশাকের। নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন বলা যায়। ভাড়া পাওয়া যায় না সে-সব নিখুঁত পোশাক, যাকে বলে পুরোপুরী গ্রীক পোশাক। গ্রীক দৃশ্যপটের পরিকল্পনা যা করেছিলেন, বাঘ ছাল-টাল ইত্যাদি সে-সব আগে বলে রেখেছিলাম তিনকড়িদাকে। উনি বলেছিলেন—ঠিক আছে, যোগাড় হয়ে যাবে। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন এসব ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহী, প্রকৃত নাট্যরসিক। তাঁকে বলে আমাকে তিনকড়িদা একদিন পাঠিয়ে দিলেন তাঁর বাড়িতে ঐসব বিশেষ আসবাবপত্রাদি নিয়ে আসবার জন্য।

গিয়ে তো চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কতো জিনিস! বেছে-বেছে, গুণে-গেঁথে, নিয়ে এলাম সব। একটা জিনিস ব্যবহার করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। সেটি হলো বিলেতী 'ফেনসিং' করবার সরু তরবারি। সেটি এমনই ইস্পাতের তৈরি যে, বাঁকালে ধনুর মতো হয়ে ওঠে, ছেড়ে দিলে সোজা হয়ে যায়। চন্দ্রগুপ্ততে গ্রীক দৃশ্যগুলির এক জায়গায় আছে, যেখানে কন্যা হেলেন পিতা সেলুকসকে বলছে—"বাবা, আপনার সেনাপতি আমার অপমান করেছে।" সেখানে ক্রুদ্ধ হয়ে অ্যান্টিগোনসকে শাস্তি দিলেন সেলুকস। তিনকড়িদার অনুমতি নিয়ে আমি সেই দৃশ্যে করলাম কী, টেবিলে রাখলাম ঐ তরবারি, কন্যার অভিযোগ শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে টেনে নিলাম তরবারি, যেন নিজেই আঘাত করতে যাচ্ছি অ্যান্টিগোনসকে, এমনি ভাবপ্রকাশের মুহূর্তে তরবারিটি বাঁকিয়ে আবার সোজা করলাম, তারপর রক্ষীদের আজ্ঞা দিলাম—বন্দী করো।

যদিও ঐরকম তরবারি ব্যবহার করা আমার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ হয়নি, কারণ প্রাচীন গ্রীসে ঐ ধরনের তরবারি ছিল না, ব্যবহার করত না ঐরকম তরবারি। তবু তখন তা মানছে কে?

অভিনয়ের দিন। বেশ মনে আছে, আচার্য এসে বসেছেন মঞ্চের ওপরে তাঁর চেয়ারে, অভিভাষণ তাঁর শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় মঞ্চে প্রবেশ করলেন অভিনেতৃমণ্ডলীর পক্ষথেকে শিশিরবাবু। অভিনয়ের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ দিয়ে যে থলি বাঁধা হয়েছিল সেই থলি নিয়ে আচার্যের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন শিশিরবাবু, ধীরে ধীরে তাঁর হাতে তুলে দিলেন থলিটি, আর আচার্য স্মিতহাস্যে তাঁর মাথায় হাত রেখে জানালেন তাঁর আশীর্বাদ।

তারপরে শুরু হলো অভিনয়ের অনুষ্ঠান। অভিনয় দেখতে-দেখতে জমে গেল প্রথম দৃশ্য থেকেই। পরের দৃশ্যে 'চাণক্য' রূপী শিশিরবাবু, সঙ্গে কাত্যায়নের বেশে নরেশবাবু, অভিনয় খুবই জমাট বেধে গেল। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ছিল সেলুকাসদের দৃশ্য। দৃশ্যটা হ'য়ে যাবার পর হঠাৎ কান পেতে শুনি, সমবেত হাততালি পড়ল দর্শকদের মধ্যে, এবং বেশ কিছুক্ষণ ধ'রেই চলল সেটা। অবাকই হলাম, ঠিক এরকমটা কখনো ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতায় হয়েছে বলে মনে পড়ল না। আসলে দৃশ্যটি সাজিয়েছিলাম সুন্দর করে, তার ওপরে অভিনও হয়েছিল ছবির মতো। সব মিলিয়ে দর্শকদের ভালো লেগে থাকবে, সম্ভবত তাই করতালি। এর পরে, আবার আমাদের গ্রীকদের দৃশ্য এলো, অর্থাৎ অ্যান্টিগোনসের সম্মুখে পরাজিত সেলুকস ও হেলেনের বিচার হলো, এবং তার ফলস্বরূপ অ্যান্টিগোনস "এ সিংহাসন তোমার" বলে দ্রুত প্রস্থান করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো অঙ্কের যবনিকা। বেরিয়ে এসে মঞ্চ নেপথ্যের একদিকে চুপচাপ বসে আছি, কাউকেও বিশেষ চিনি না, আলাপও নেই অনেকের সঙ্গে, এমন সময় সাজঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাদের সঙ্গে যেন আলাপ করছিলেন শিশিরবাবু, আলাপ শেষ করে ফিরে আসবার মুহূর্তে আমাকে দেখে বলে উঠলেন খুশী-হওয়া-কণ্ঠে—বেশ হচ্ছে মশাই আপনার অভিনয়। নরেন ডাক্তার বলে গেলেন।

কে নরেন? চিন্তা ক'রে ক'রে কোনো কূল পেলাম না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলাম তিনকড়িদাকে। তিনকড়িদা বললেন—কে জানে! প্রবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা কর দেখি?

আমরা দুজনে এইসব কথা বলছিলাম, আমাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটিকে আগে থাকতেই দেখছিলাম, তত্ত্বাবধান করছিলেন মঞ্চের। হাসি-হাসি মুখে তিনি এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে। মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ি—পরনে—কোট প্যাণ্ট আর টাই এবং তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী ওয়েস্ট কোট-পরা। বললেন—নরেন ডাক্তারের কথা বলাবলি করছিলেন না? উনি হচ্ছেন কারমাইকেল মেডিক্যোল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার নরেন বোস। নাট্যরসিক ব্যক্তি। ডাক্তারদের ক্লাবে অভিনয় করান, নিজেও করেন।

ভদ্রলোক একথা বলে সরে যেতে, ইনি কে, একথা জানবারও কৌতূহল হলো। তিনকড়িদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনি কে?

—চিনিস না !—তিনকড়িদা বললেন—প্রবোধচন্দ্র গুহ।

এক কথায় চিনতে পারব, অতটা পরিচয় আমার পাওয়া তখনো হয়নি। ভদ্রলোক সারাক্ষণ ছিলেন, অভিনয় ভেঙে যেতে যে-যার চলে গেলেন, উনি কিন্তু রয়ে গেলেন, জিনিসপত্র, দৃশ্যপটাদি তত্ত্বাবধান ক'রে স্বস্থানে পাঠাবার প্রয়াস করতে লাগলেন। প্রবোধবাবুর কথা বহু বলতে হবে, আপাতত তাই ওঁ'র কথায় যবনিকা টেনে অন্য প্রসঙ্গে সরে যাওয়া যাক।

পরদিন সকালে তিনকড়িদার বাড়ি গিয়ে দেখি, বিরাট মজলিশ বসেছে। অভিনয় ভালো হওয়ায় তিনকড়িদা ভয়ানক খুশী। ভালো গাইতেন তিনকড়িদা। 'চন্দ্রগুপ্ত'-ভিক্ষুকের ঐ দুখানি গান এবং দ্বিজেন্দ্রলালের আরও ক'খানি গান ইভনিং ক্লাবের মাধ্যমে উনি ইতিপূর্বেই রেকর্ড করিয়েছিলেন। ওঁ'র রেকর্ডের মধ্যেবিশেষ করে, 'যখন সঘন গগন গরজে' এবং 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' গানটি খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিল সে সময়। ওঁর চেনাশোনা লোকও প্রচুর। তারা সব আসছে, বসছে, আলোচনা করছে, চলে যাচ্ছে। সবাই চলে যাবার পর আমি আর ইন্দুও উঠে আসছি, এমন সময় তিনকড়িদা পিছন থেকে ডেকে বললেন—এই, শোন ?

কী ?

বললেন—কাজ হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বললাম—কী কাজ ?

—নিজেদের থিয়েটার।

—সে কী !

—হ্যাঁ। এখন বলব না। পরে বলব'খুনি সব।

ইন্দু আর আমি, বলা বাহুল্য, কিছুই বুঝলাম না। চলে এলাম। পরে আরও কিছু খোঁজখবর করার অবকাশ আমার রইলই না, মেতে গেলাম আবার আমাদের ফিল্মের কাজ নিয়ে। তখন শরৎকাল। আবার কাজে লাগবার সময়। কিন্তু কাজে লেগে পড়ব, লেগে পড়ব, করতে-না-করতেই এক বিভ্রাট ঘটে গেল। আগেই বলেছি, যে ফিল্ম করছি ও যেভাবে করছি, তা' বহু রসিকজনেরই কানে গেছে, বহু ব্যক্তি আমাদের কাজকর্মে আগ্রহপ্রকাশ করেছিলেন। যথাসময়ে ম্যাডানদের কানেও উঠেছিল আমাদের কথা। তাঁরা ভিতরে-ভিতরে সব খবরাখবরই নিচ্ছিলেন আমাদের। খোঁজ নিয়ে ঠিক জানতে পেরেছেন, আমাদের ফটো তুলছে কে। একদিন তাঁরা ডেকেও পাঠালেন ক্রীডসাহেবকে। দেখতে চাইলেন ছবি। ক্রীড যা' যা' তুলেছিল, তা' সবই তাঁদের দেখালো। এমন কি ম্যাডানদের একদিন বেহালায় নিয়ে গিয়ে আমাদের স্টুডিওটাই দেখিয়ে দিয়েছিল। আমরা অবশ্য এর বিন্দুবিসর্গও তখন জানতে পারিনি। পরে শুনেছিলাম জাহাঙ্গীর ম্যাডান নিজে গিয়েছিলেন আমাদের স্টুডিও দেখতে। অচিরেই এই দেখাশোনার ফল ফলল। মহা উৎসাহভরে ক্রীডকে মাসিক সাতশো টাকা বেতনে ওঁরা ওদের কোম্পানীতে নিযুক্ত করে ফেললেন। তখন ওদের ফিল্ম উঠছিল—"নূরজাহান।"

নাম ভূমিকায় ছিলেন—পেসেন্স কুপার। জাহাঙ্গীর সাহেবের ইচ্ছা হলো "নূরজাহান"-এর দু'চারটে সিন তুলবেন আমাদেরি স্টুডিওতে। ক্রীড তখন বললেন—এটা ওঁদের না জানিয়ে করা সম্ভব নয়, ওদের অনুমতি নিতেই হবে।

এই অনুমতি নেওয়ার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করেই সব প্রকাশিত হয়ে পড়ল আমাদের কাছে, নইলে, এর আগে এ' সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। যেমন অফিসের পর ক্রীডের কাছে যাই, তেমনি গেছি, ক্রীড একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথাই বললে খুলে। শুনে, আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

ক্রীড বললে—না-না ভেবো না, যতদিন না তোমাদের 'সোল অফ এ স্লেভ' শেষ হচ্ছে, ততদিন তোমাদের ওখানে কাজ করবার অনুমতি আমাকে দিয়েছে ম্যাডান কোম্পানী। কিন্তু এ ছবির পর আর আমি তোমাদের কাজ করতে পারব না। চুপ করে রইলাম আমরা। পায়ের নীচে মাটি যেন সরে যাচ্ছে, দুটি চোখ ভ'রে যেন নেমে আসছে অন্ধকার। কী তবে আমাদের ভবিষ্যৎ? আমাদের এতো শ্রমের, এত সাধের 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট'-এর তাহলে কী হবে দশা, ক্রীড চলে গেলে? ক্রীড অবশ্য আমাদের একটা আশ্বাস দিলে। বললে—ওদের বড়ো ল্যাবরেটরী, ভালো মেসিন, তোমাদের কাজ ওখানে করব, কাজ ভালো হবে। আমার ছিল ছোট যায়গা, অসুবিধা হতো। এখন যা' বন্দোবস্ত করলাম, একদিক থেকে ভালো হলো। তোমাদের ছবির টোনিং-টিন্টিং ওখানে করতে পারব ভালোভাবেই। তাছাড়া, আরও একটা সুবিধের কথা আছে।

—কী?

—তোমাদের ছবির ব্যাপারে ম্যাডানদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা ও ছবির পরিবেশন বা ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়েছে, তোমরা বললেই রাজী হয়ে যাবে।

আমরা চুপ করে রইলাম।

ক্রীড বললে—এ' সুবিধে ছাড়বে কেন? এ'ত মস্ত সুবিধে! এছাড়া, ম্যাডানরা আমাদের স্টুডিওতে দু'চারদিন শুটিংও করতে চায়। তোমাদের কী মত?

কী আর মত? মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম আমি আর প্রফুল্ল। ক্রীডএর হাতে আমাদের সব-কিছু, ক্রীডের মতের বিরুদ্ধে হঠাৎ আমরা যাই-ই বা কী করে? এ যেন পরম প্রতাপশালী কোনো মহারাজের অনুরোধ তার প্রজার কাছে। 'না'-করা কী সম্ভব?

তাই বললাম—ঠিক আছে।

মুখে বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে দুঃখ হলো ভয়ানক। এবং সে দুঃখের প্রতিক্রিয়ায় ঘটল এই যে, যে কয়দিন ম্যাডানরা শুটিং করল আমাদের স্টুডিওতে, আমরা কেউ যেতে পারলাম না সেখানে। ওদের শুটিং দেখার কৌতুহল যে না ছিল এমন নয়, তবু শেষ পর্যন্ত ক্ষোভ, দুঃখ আর অভিমানই মনটাকে ছেয়ে রইল বেশী করে, যেতে আর পারলাম না। আবদুলের কাছে চাবি রেখে দিয়েছিলাম। সত্যি

কথাই, আমাদের এত সাধের স্টুডিওতে অপরে এসে ছবি তুলছে, এ' সইবার মতো মনের অবস্থা তখনো হয়নি। জাহাঙ্গীর ম্যাডানের লোভ ছিল আমাদের স্টুডিওর প্রতি, তা আমি আগেই জানতাম, কারণ ওতে তোলা ছবিগুলো তিনি দেখেছিলেন ক্রীডের কাছ থেকে। ওঁদের নিজেদের স্টুডিওতে এলাহি কারবার অনেক থাকতে পারে, কিন্তু এরকম প্ল্যান-করে গড়ে-তোলা জিনিসটি ত ওঁদের ছিল না তাই ছবি তোলার এতো সুবিধাজনক অথচ সহজ উপায়ও ওঁদের ছিল না।

যাই হোক, নিজেদের কাজ নিয়ে চিন্তা করতে করতে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো গেল যে, সামনের শীতে স্টুডিওতে কাজ হবে। আর যে-সব বহির্দৃশ্যের কাজগুলি বাকী পড়ে আছে, সে-সব কাজ পুজোর পরেই শেষ করে ফেলব। কোনগতিকে পুজোর সময়টা কাটিয়ে আমি লক্ষ্মীপুজোর দিন রাত্রে, তারিখটা ছিল পাঁচই অক্টোবর, একাই বেরিয়ে পড়লাম—মধুপুর। জ্যোতিষবাবু ওখানে এবার একটা পাহাড়ে জায়গা স্থির করে রেখেছিলেন। আমাদের যাত্রা-ক্লাবের যতীন সিংহও আমাদের স্টীল ফটোগুলি তুলত, সে-ও তখন ছিল মধুপুরে। মধুপুর রেলওয়ে ইনস্টিটিউট তখন তৈরী হয়ে গেছে, থিয়েটার হবে ওখানে, ও তার দৃশ্য-পটাদি আঁকছে। থাকে ঐ ইনস্টিটিউটের ঘরেই। আমি উঠলাম গিয়ে ওরই ওখানে। জ্যোতিষবাবুর মাধ্যমে রেলওয়ে স্টাফের সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়ে গেছে। তাই মেন লাইনের ওপরেই ট্রলি চেপে লোকেশন ঠিক করবার জন্য যায়গা দেখে বেড়ালাম। যশিডির দিকে যেতে বাঁকের মুখে একটা পাহাড় দেখে বড়ো ভালো লাগল, সে যায়গাটাই ঠিক ক'রে এলাম। জ্যোতিষবাবুকে বলে এলাম,—জামতাড়ায় খবর দিয়ে রাখতে, যাতে হাতি-টাতি ঠিক সময়ে আসে।

কলকাতায় ফিরলাম এগারো তারিখে। ফিরে এসে যা শুনলাম, তাতে মনটা খুব খুশী হলো না। শুনলাম আমাদের সঙ্গে ম্যাডানরাও যাবে মধুপুরে বহির্দৃশ্যের কাজ করতে। ঐ ক্রীডই ছবি তুলবে। আমাদেরও তুলবে, ওদেরও তুলবে। প্রফুল্লর সঙ্গে সঙ্গে মুখুজ্যেও বললেন—এ' সাহায্যটুকু করা ভালোই, এতে আমরা উপকৃতই হবো, দেখবেন।

হলো তাই। আবার চৌদ্দই সদলবলে বেরিয়ে গেলাম মধুপুর। পনরোই সারাদিন ধরে শুটিং হলো। হবার পর, আমাদের দলের সবাই চলে গেছে, রয়ে গেলাম শুধু আমি। যতীন সিংহ বা টাবু ছাড়লে না আমাকে, বললে থেকে যা' দু'দিন।

জ্যোতিষবাবুও চাপাচাপি করলেন। বললেন—থেকে যান।

কী ব্যাপার? না, ওদের ওখানে, ঐ ইনস্টিটিউটে 'চন্দ্রগুপ্ত' হবে, দু'দিন থেকে ওদের মহলাটা একটু দেখে দিতে হবে, এবং শুধু তা-ই নয়, 'চাণক্য'র ভূমিকাটিও করে দিতে হবে। রাজী না হয়ে উপায় নেই, কারণ এটা ভদ্রতা। যাঁরা আমাদের এত সাহায্য করেন, তাঁদের জন্য এটুকুও না করলে চলবে কী করে? থেকে গেলাম।

টাবু বসে বসে সিন আঁকে, চেয়ে চেয়ে দেখি। সন্ধ্যার পর লোকজন জড়ো হলে, রিহার্স্যাল দেই।

আশ্বিনের শেষ—কার্তিক পড়েছে—সকালবেলা বেশ শীত-শীত করে। পাশেই বাজারে বসে ক্ষৌরকারদের আড্ডা, তাদের একজন এসে বেশ করে তেল মালিশ করে দিতো আমাকে। টাবুর ছিল তামাক টানার অভ্যাস। ভোরবেলা, ঘুম ভেঙে গেছে, শুয়ে শুয়ে শুনছি, টাবুর তামাক টানার ঘড়ঘড় শব্দ। পরক্ষণেই আমাকে এসে ডাকছে—ওঠ-ওঠ, কতো ঘুমোবি? তামাক খা।

সামনের কম্পাউণ্ডটাতে তখনো বাগান হয়নি, ফাঁকা রয়েছে। সামনের সাঁকোমতন জায়গাটিতে রোদে পিঠ দিয়ে বসে তামাক খাবার পর, তেল মালিশের কাজটা সেরে নিতাম। ঐ রকম একদিন তেল মালিশ করছি, টাবু ভিতরের দিকে বসে তামাক টানছে, আর কাগজ পড়ছে। সে চীৎকার করে ব'লে উঠল—ওরে, মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে গেছে।

—সে কিরে? কী করে?

সেসব কিছু লেখেনি। অবশ্য খবরটা বাসী। এটা হচ্ছে মফস্বল সংস্করণের কাগজ। একদিন পরের খবর পাওয়া যায় এতে। কলকাতার লোকেরা আগেই পেয়ে যায় খবর।

তা যাক, কিন্তু মিনার্ভা পুড়ে গেছে শুনে মনের ভিতরটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। কতো ভালবাসতাম যে থিয়েটারটিকে, কতো থিয়েটার দেখেছি ওখানে একটা যুগেরও ওপর—সে থিয়েটারটা কিনা পুড়ে গেল! দৌড়ে গিয়ে কাগজটা দেখলাম, কিন্তু যেটুক খবর দিয়েছে, তাতে পুড়ে যাওয়ার কারণটা যে কী, তা কিছু জানতে পারলাম না।

মধুপুর থেকে চলে এসেছিলাম বাইশ তারিখ, তখনো সিন আঁকা চলেছে, অভিনয় হতে তখনো অনেক বাকী, ফিরে এসে শুনলাম ১৮ই অক্টোবর মিনার্ভা পুড়ে গেছে। দিনটা ছিল শ্যামাপূজার আগের দিন—বুধবার। থিয়েটারে তখন 'শকুন্তলা' নাটক হবে বলে জোর মহলা চলেছে। অমরবাবু দৃশ্যপট আঁকবেন, বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, অমর-বাবুর তখন খুব নাম-ডাক। শুনলাম মহলা যখন চলেছিল, তখন সকালে কী রকম করে যেন আগুন লেগে যায়—মঞ্চ; প্রেক্ষাগার—সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সামনের টিকিট ঘরটার কিছু অংশ আধপোড়া হয়ে বেঁচে আছে দেখে এলাম। কিন্তু আগুন লাগবার কারণটা যে কী, তা কেউ সঠিক বলতে পারল না। পরে পেশাদারী হয়ে যখন মিনার্ভায় আসি, তখনও জিজ্ঞাসাবাদ করে এর সদুত্তর পাইনি। প্রত্যক্ষদর্শী ছিল রাধা-বরণ ভট্টাচার্য। মেয়েদের নাচ শেখাচ্ছিল সে তখন, সে-ও তেমন কিছু বলতে পারল না। সে বললে—হঠাৎ দেখলুম লকলক করে উঠেছে আগুনের শিখা! ভয় পেয়ে মেয়েরা হাউমাউ করে ছুটে বেরিয়ে এলো, আমিও বেরিয়ে এলুম। কী করে যে লাগল, তা জানি না।

কেউ বললে—বিজলীবাতী ফিউজ হয়ে এই কাণ্ড ঘটেছে।

আবার কেউ বললে—ওপরের ঘরে কারা যেন বাজী তৈরী করছিল।

কিন্তু এসবই অনুমান। আসল কারণটা কেউ ব্যক্ত করতে পারল না। ১৮৯৩ সালে মিনার্ভা

খোলা হয়েছিল 'ম্যাকবেথ' দিয়ে, তারিখটা ছিল ১৮ই জানুয়ারী। সেই মিনার্ভার বাড়ি পুড়ে গেল বাইশ সালে। এরপর হলো কী, মিনার্ভা সমস্ত দলবল নিয়ে বাইরে বাইরে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। কলকাতায় থিয়েটারের মধ্যে রইল স্টার, মনমোহন, আর বেঙ্গলী থিয়েটার কোম্পানি। শিশিরবাবু চলে যাবার পর আরেকজন শক্তিশালী শৌখিন অভিনেতা—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ইনি অভিনয় করতেন, ওল্ড ক্লাবে, ওঁকে ওঁরা নিয়ে এসে 'প্রতাপাদিত্য' 'রত্নেশ্বরের মন্দির' এসব বই অভিনয় করাচ্ছেন। কিন্তু বেঙ্গলী থিয়েটার তেমন জমজমাট কিছুতেই হচ্ছে না।

থিয়েটারের ত এই অবস্থা! আমরা আমাদের কাজে লেগে গেলাম। বাকী কাজ যা ছিল, স্টুডিওর কাজ, শীতকালে ঘন ঘন শুটিং করে সেসব শেষ করে ফেলা গেল। ছবি শেষ। সাহেব ফুট মেপে-মেপে টাকা নিয়ে ছবির ডেলিভারী দিয়ে দিলে। আর দিয়ে দিলে এডিট করার জিনিষপত্র। কী করে কাজ করতে হয়, তা-ও দেখিয়ে দিলে। তারপরে বললে—এইভাবে করে যাও।

অফিসে বসে এডিটিং-এর কাজ করা শুরু করলাম। গোকুলবাবু-নেড়ুবাবু কোনদিন এলেন কি না এলেন, একাই বসে বসে কাজ করে চলেছি। বিকেলে আসে প্রফুল্ল তার অফিস থেকে। জ্যোতিষবাবু-যুগলবাবু এখনো আসেন প্রায় নিয়মিত! একদিন হলো কী, ফিল্ম-ড্রামে কেটে-ফেলা বহু ফিল্ম গাদা করা পড়ে রয়েছে, কাজের গুলি রয়েছে চাকায় গুটানো, অথবা বাইরে গুছানো। প্রফুল্ল ঘরে ঢুকে ব্যাপারটা ভালো করে লক্ষ্য করলে। তারপরে বললে—ফিল্মগুলো ওভাবে ড্রামে ফেলে রেখেছিস, দাগ লেগে যাবে যে?

—লাগুক।

সবিস্ময়ে প্রফুল্ল বললে—লাগুক! তুই বলিস কী!

বললাম—ওগুলি বাতিল হয়ে গেছে।

বাতিল! মানে?

—মানে, কাজে লাগবে না। ওগুলি ফালতু। ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

ও একেবারে বসে পড়ল ধপ করে চেয়ারে। বললে—ফালতু! এত ফিল্ম ফাল্‌তু, এ কী করে হলো! এতো ফিল্ম বাদ গেল! বললাম—এ আমি কী করে বলব। ক্রীডের কথামতো স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে মিলিয়ে দেখে, ভালোগুলি রেখে, বাজে এবং বাড়তিগুলি বাদ দিয়ে চলেছি!

—তা বলে—অতো!

—উপায় কী!

প্রফুল্ল মহা অসন্তুষ্ট হলো। বললে—টাকা কোথা থেকে আসবে?

গজগজ করতে লাগল। আমি বাড়ি এলাম। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে আছে। এই যে এডিটিং করলাম, এ কী কম কষ্টের ব্যাপার! কম পরিশ্রমের ফল! অথচ প্রফুল্ল এমন করলে, যেন আমি অপরাধী। পরদিন আর অফিসে গেলাম না।

পরে ব্যাপারটা শুনেছি; প্রফুল্ল পরদিন এসে দেখে, অফিস বন্ধ, আমি নেই। ও চলে গেল একেবারে ক্রীডের কাছে। বললে—সাহেব, এত ফিল্ম নষ্ট হয়েছে!

সাহেবের সঙ্গে সেদিন মুখুজ্যেসাহেবও ছিলেন। ও'রা ব্যাপারটা বুঝে বলে উঠলেন—এডিটিং-এ ওই রকমই হয়। কারও দু লক্ষ ফিট গিয়ে আট হাজার দাঁড়িয়েছে। কারুর বা লাখ গিয়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

প্রফুল্লও ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিলে। কিন্তু ওর তহবিলে ওদিকে টাকার টানাটানি, ওর মাথায় অজস্র দুশ্চিন্তা। বিশেষ করে, ক্রীডে-এর বিল চুকিয়ে দিতে হয়েছে দশ হাজার টাকার ওপর, ওর ভাঁড়ার নিঃশেষ বললেই হয়।

পরদিন অফিসে গিয়ে দেখে, সেদিনও আসিনি আমি অফিসে। ও জানে এখন বাড়ি এলে আমাকে পাবে না, আমি কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে গেছি। তাই আমাদের বাড়িতে এলো তারও পরদিন সকালবেলা। আমার কাছে এসে একেবারে কেঁদে ফেললে প্রফুল্ল। বললে—দুরবস্থার কথা সবই ত জানিস। পরামর্শ করব, এমন আর কে আছে। সেই তুইও মুখ ফিরিয়ে বসে আছিস! খেয়ে নে। অফিসে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

অভিমানের উত্তাপ তখন শান্ত হয়ে গেছে। ওর অবস্থা দেখে দুঃখ হলো। বললাম—যা তোর অফিসে। আমি যথাসময়ে যাচ্ছি অফিসে।

গেলাম। লেগে গেলাম আবার আমার কাজে। কিন্তু অর্থের অভাবটাকেও অস্বীকার করা যায় না। ইজিচেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, কোথায় টাকা পাবো কোথা থেকে আসবে টাকা! এমন অবস্থা। দুজনে আমরা দু' হাজার ক'রে-চারহাজার দিয়েছি, চণ্ডীবাবুও দুহাজার দিয়েছেন, আর কানাই দিয়েছে বারো হাজার। কিন্তু সেসব ত গেছে, এরপর? এরপর টাকা না হলে আমাদের ছবি যে আর বেরুবে না বাজারে—আমাদের 'সোল অফ এ স্লেভ' আর দেখাবে না মুক্তির আলো!

এই ত পরিস্থিতি অর্থের ব্যাপার নিয়ে। সে যে এক কী দিন গেছে, আজও মনে পড়লে বিভীষিকা দেখি! ওদিকে, আমাদের সহ-নায়িকা জুন রিচার্ডসকে নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিল অতর্কিতে। সে এসে একদিন নোটিশ দিলে, ব্যাণ্ডম্যানের সঙ্গে কনট্রাক্ট তার শেষ হয়ে যাচ্ছে, দুমাসের মধ্যেই সে চলে যাচ্ছে ইংলণ্ড। এর মধ্যে তার যা-যা টুকরো কাজ আছে, সব শেষ করে নিতে হবে। কিছু টাকা তার আগেই নেওয়া ছিল, কাজের পর বাকী টাকা শোধ করে দিতে হবে। মুখুজ্যেও তাড়া দিলেন—শেষ করে ফেলুন কাজ।

মেমসাহেব নিজে অফিসে এসেও তাগাদা দিয়ে গেল। বললে—আর দু' মাস সময়। তোমাদের কাজ শেষ না করেই যেতে হবে যেটা আমি পেশাদারী আর্টিস্ট হয়ে কখনই করতে চাই না।

আমরা 'এই হচ্ছে এবার' বলে কিছুদিন স্তোক দিয়ে রাখলাম। শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লই বাকী টাকা কোনক্রমে জোগাড় করে ওর সব চুকিয়ে দিলে। ওকে চুকনো হলো বটে, কিন্তু ওর এই

কাজের জন্য বাড়তি যে 'ফুটেজ,' তার জন্য ক্রীড সাহেবের হবে আরও পাওনা। তার কী হবে? শুরু হলো শুটিং। জুনের চেহারাটি ভালো, লম্বা, হাল্‌কা চেহারা, একটা ব্যক্তিত্ব আছে দেহ-সৌষ্ঠবে। পোশাক-টোশাক পরলে রানীর মতো দেখায়। কাজ করতে করতে দেখলাম, জুন রীতিমতো সুদক্ষা অভিনেত্রী। যেখানে লাস্যভাব প্রদর্শন করার কথা সেখানেই চাল-চলনে, মুখের ভাবে চোখের ইঙ্গিতে নিখুঁত অভিনয় করলে বলা যায়। আবার যেখানে ঈর্ষা সেখানেও তার ভঙ্গিমার প্রকাশ হলো যথাযথ। যেখানে প্রতিশোধের দৃশ্য, সেখানেও কী হাঁটাচলায়, কী হাতের ভঙ্গিতে, কী মুখ-চোখের ভাবপ্রকাশে অভিনয় হলো অপূর্ব। জুনের মধ্য দিয়ে 'ইলা' চরিত্রটি যেন সত্যিই প্রাণবন্ত হয়ে উঠল! রমলা-বেশী উইলিসন উইর্থ তার মুডটাই করেছিল দুখিনীর মতো, সব কিছুতে ঠিক মানিয়ে যেতো। কিন্তু জুন তা নয়, জুন অভিনয় জানত, ওর মধ্যে আর্ট ছিল।

ওর কাজ শেষ হতে, ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করিয়ে দেখে নিলাম—সুন্দর হয়েছে কাজ। জুন নিজেও দেখল ছবি। দেখে খুশীই হলো। মুখুজ্যেমশাই চুপিচুপি আমাদের বললেন—টাকা ত দিলেনই, সঙ্গে একটা উপহারও দিয়ে দেবেন।

তা, সত্যি কথা বলতে কী, উপহার পাবার মতো কাজও সে করেছে। আমরা করলাম কী বড়ো একটা রুপোর বাটি দিলাম তাকে। বাটির চারপাশে বাংলার গ্রাম্যচিত্র। আঁকা নয় খোদাই করা নয়, তোলা-কাজ করা। অর্থাৎ ছবিগুলি যেন গা থেকে খানিকটা উঠে আছে। পাত্রের গায়ে প্যানেল করা। ধান চাষ হচ্ছে, গরুর গাড়ি যাচ্ছে, গ্রামের কুটীরগুলি রয়েছে সারি সারি, এই সব আর কী। আমাদের কাঁসারী পাড়ায় এসব তৈরী হতো তখন, সাহেব-মহলে খুবই সমাদর এসবের। তারা কিনে নিয়ে এসে হোমে পাঠাতো। তখনকার দিনে মেমসাহেবেরা আবার গাউনের ওপরে বেল্ট পরতেন। সেই বেল্ট হতো এই রুপো দিয়ে তৈরী, রুপোর ওপরে নানা চিত্র, সেই খণ্ডিত চিত্রফলকগুলি পরপর সাজান—জোড়া দেওয়া। আমরা অবশ্য বেল্টের থেকে রুপোর বাটিই পছন্দ করলাম বেশী। তাতে খোদাই করে দেওয়া হলো জুনের নাম। লেখা হলো—'ইলা'র ভূমিকার জন্য—প্রেজেণ্টেড বাই 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট'। পিকচার হাউসের লনে নিজেদের মধ্যেই ছোট একটি চা-চক্র করে জুনকে দেওয়া হলো সেই উপহারটি। এসেছিলেন আমাদের কর্মীরা মোটামুটি সবাই, মিস্টার ও মিসেস উইর্থও ছিলেন। সেদিনকার খুশীভরা সন্ধ্যার শেষে প্রফুল্ল হঠাৎ জনান্তিকে আমাকে বলে উঠেছিল একটি কথা, যা আমার আজও মনে আছে পরিষ্কার। বলেছিল—রাজসূয় ত আজ হলো, ওদিকে কাল ত অন্ন নেই। ক্রীডকে যে দিতে হবে, তার কী হবে এবার?

অর্থকৃচ্ছ্রতার ব্যাপারে আমরা দুজনে ঠিক করেছিলাম, কাউকে কিছু জানতে দেওয়া হবে না, এমন কি সহকর্মীদেরও না। ওদিকে বিরাট একটা কাজ পড়ে রয়েছে, সে হচ্ছে টাইটেল তৈরী করার কাজ। টাইটেল তখন আমরা বিলিতী ছবিতে দেখতাম, দুরকম হতো। এক, যেগুলি ছোট টাইটেল, অ্যাকশনের সঙ্গে পর্দায় চট করে ফুটে উঠত। এগুলো হাতে লিখতে হতো চাইনীজ

কালি দিয়ে। অন্য টাইটেলও হতো ঐ কালি দিয়ে, তবে তার ব্যাপারটা ছিল আলাদা। এগুলি কোনো বিশেষ মুখবন্ধ বা পরিচিতি দেবার জন্য ব্যবহৃত হত। ফেড ইন্ হয়ে ফেড আউট হয়ে যেতো এগুলি। এগুলি বিলাতী ছবিতে আর্ট টাইটেলরূপে তৈরী করা হতো। একটা কোনো ডিজাইন, যেটা অস্পষ্টরূপে পটভূমিকায় আঁকা থাকত, আর তার ওপরে ফুটে উঠত—টাইটেল বোল্ড লেটারে। বিলেতী ছবির এ পদ্ধতিটা আমাদের ছবিতে কাজে লাগাবার লোভ হলো। বলেও রেখেছিলাম ক্রীডকে সে কথা। সে বলেছিল—করে দেবো।

সেকাজ করতেও টাকা চাই। ক্রীড-এর বন্ধু প্যারেরা-সাহেব ভালো আর্টিস্ট ছিলেন, এ-কাজ তাঁর জানাও ছিল, তিনিই কাজটা আমাদের করে দিচ্ছেন। ডিজাইন ও লেটারিং দুই-ই। প্রেমের দৃশ্য এবং পানভোজনের দৃশ্য, যেখানে ধর্মপাল তাঁর দোলায়—বসে ধীরে ধীরে দুলছেন এবং রমলা তাঁর-হাতের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে পানপাত্র, সেখানে হেমবাবু বেছে দিয়েছিলেন ক্যাপশন—ওমরের রুবাইৎ—ফিট্জেরাল্ডের তর্জমা থেকে। ওমর আর সাকীর প্রতীক যেন আমরা দুজনে। এই ধরণের আরও সব দৃশ্যের জন্যও হয়েছিল অনুরূপ কবিতার ক্যাপশন। এগুলি ফেড-ইন হয়ে ক্রমশঃ ফেড-আউট হয়ে যাবে। ডবল-একস্‌পোজারে ক্যামেরার কাজ করে তোলা হয়েছিল এসব। পটভূমিকায় একটা কিছু ডিজাইন অস্পষ্ট রেখায় ধূসর ভাবে ফুটে রয়েছে, তার ওপরে পড়ল ঐ রুবাইৎ। প্যারেরা সাহেবও প্রচুর খেটে কাজটা করে দিলেন। এবার ওঁকে পেমেণ্ট করার প্রশ্ন। বন্ধুদের জানাইনি, জানালে, নিয়মিত যাঁরা আসেন, তাঁরা কেউ-কেউ দু-চার শো কি জোগাড় করে দিতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু ওভাবে খুচরো নিয়ে আমাদের কী লাভ? উলটে, টাকা নেই—টাকা নেই—এই রবটা উঠে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঐ প্রফুল্লই টাকার একটা কিনারা করলে। নিজে দিলে হাজার আমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এলো হাজার, চণ্ডীবাবু দিলেন হাজার। এই তিন হাজারে অভাব আর রইল না। ছবি অতঃপর রেডী হয়ে গেল। মাঝে মাঝে টোনিং-টিন্টিং করেচেন ক্রীড সাহেব, তাতে ফল ফলেছে চমৎকার। তিন রকমের ব্লু টোন করেছেন একবার হলদে রঙের টিন্টিং করে' আরেকবার পিঙ্ক দিয়ে, অন্যবার গ্রীন দিয়ে। আর এনেছেন পুরো সেপিয়া রঙের টোন। এ আরও দু-চার রকমের ছিল। জায়গা বুঝে, হিসাব করে চমৎকার এ জিনিসটা ব্যবহার করেছে ক্রীড সাহেব। যেখানে নগ্ন কর্কশ পর্বত দেখানোর কথা, পাহাড়ের ওপরে যেখানে গাছপালার চিহ্ন নেই, সেখানে সেপিয়া টোনে কী যে ভয়াবহ দৃশ্য ফুটে উঠেছিল, তা বলার নয়। আবার যেখানে দেখানো হচ্ছে জ্যোৎস্না রাত্রি, সেখানে ব্লু টোনের ওপরে সামান্য একটু সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের আকাশ দেখিয়েছেন ক্রীড ঐ ব্লু টোনেরই ওপর পিঙ্ক টিণ্ট করে। গভীর রাত্রি—থমথম করছে, অথবা গহন অরণ্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাতেও ব্লু টোনের কাজ সবুজ রং টিণ্ট-করা।

এইভাবে আমাদের ছবির কাজ শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গে বাইশ সালও বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে বাইশ সালকে বিদায় দিতে পারছি না। সে একটি কথা হলো, তাজমহল

ফিল্ম কোম্পানীর কথা, যাঁরা শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পটি তুলছেন সিনেমার উপযোগী করবার জন্য গল্পটিকে আরও একটু বাড়িয়ে নিয়ে। ইণ্ডো-বৃটিশের কথা আগে বলেছি. তাজমহল কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঐ বাইশ সালেই। আর্থিক ভিত্তিভূমি তৈরী করেছিলেন, অর্থাৎ ফাইনান্স করেছিলেন ব্যারিস্টার বি কে ঘোষ, ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত বি সি ঘোষের ইনি ছোট ভাই। আমাদের পাড়ারই লোক। বি সি ঘোষকে চিরকাল আমরা বিমলদা বলে ডেকে এসেছি। বিমলদা বিপদে-আপদে আমাদের ছিলেন অন্যতম পরামর্শদাতা। আর, বি কে ছিল আমাদেরই সমবয়সী, আমরা তাকে ডাকতাম 'কাকু' বলে। দু ভাই-ই ভালো ফুটবল খেলতেন, অবশ্য ব্যারিস্টার হবার আগে। কাকুর সঙ্গে আমরাও ফুটবল খেলেছি কতো। সেই কাকু করলে এক অভাবনীয় ব্যাপার। নরেশবাবু আগে থাকতেই লেগেছিলেন' শুনলাম, শিশিরবাবুও ম্যাডান ছেড়ে এখানেই এলেন ছবি করবার জন্য। ম্যাডানদের কলা-কুশলীদের মধ্য থেকে এখানে এসে যোগ দিলেন—ননী সান্যাল তাঁর জনকয়েক সহকারী নিয়ে। খুব লম্বা ছিল ননী সান্যাল মশাইয়ের চেহারা। ইনি ক্যামেরা ও ল্যাবরেটরীর কাজ করবেন তাঁর দলবল নিয়ে। আর এলেন ম্যাডানদের টাইটেল লিখতেন যিনি চাইনীজ কালি দিয়ে, সেই দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই সেই পরবর্তী কালের খ্যাতনামা অভিনেতা—দুর্গাদাস।

দমদম রোড চলে গেছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে দমদম স্টেশনের পাশ দিয়ে রেল-পোলের নীচ দিয়ে। গিয়ে মিশেছে নাগেরবাজারে যশোর রোডের সঙ্গে। এই যে দমদম রোড, এর ওপর একটা বাগানবাড়ি নিয়ে তৈরী হলো তাজমহলের অফিস ও স্টুডিও। নায়ক সত্যেন্দ্রর ভূমিকায় ছিলেন শিশিরবাবু। নায়িকা বিজলীর ভূমিকায় ছিল দুর্গারানী বলে একটি নতুন মেয়ে, সুন্দর চেহারা আর বয়সও অল্প ছিল। এর বড় বোন দেখতে ছিল আরও সুন্দর—বড়ো বলে তাকে মনে হতো না, কিন্তু সে কখনো ফিল্ম বা থিয়েটারে অভিনয় করেনি। দুর্গারানীও এর পরে বোধহয় একখানি মাত্র ছবিতে অভিনয় করেছিল, পরে আর তাকে দেখা যায়নি। তবে থিয়েটার দেখতে সে ভালোবাসত, আমরা উত্তরকালে যখন সাধারণ মঞ্চে এসেছি, সে আসত অভিনয় দেখতে, কিন্তু অভিনয় করতে কখনো চাইত না। 'আঁধারে আলো'র বিশেষ এক কূট চরিত্রে নেমেছিলেন—নরেশবাবু, নামটা ঠিক মনে নেই কী 'কালী' যেন। গল্পের বাড়ানো অংশে ছিল এই ভূমিকাটা। ছবি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল, এমন সময় ঘটল এক দুর্ঘটনা। কোম্পানীর বাস ছিল, বাস-এ করে নিয়ে যাওয়া হতো সকলকে। একদিন দমদম রোডের ভিতরে খানিকটা ঢুকে বাসটা করল এক অ্যাকসিডেণ্ট। শিশির বাবুর বুকের পাঁজরে লেগেছিল প্রচণ্ড আঘাত, তিনি বেশ কিছুদিন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন, নরেশবাবুর ফাঁড়া কেটেছিল অবশ্য সামান্য কিছু কাটাকুটির ওপর দিয়ে। ফলস্বরূপ হলো এই "আঁধারে আলো"'র বাকী অংশ শিশিরবাবুর পরিবর্তে নরেশবাবুর পরিচালনায় সমাপ্ত হলো। দুর্গাদাস এতে জমিদারবাড়িতে বাঈজীর নাচ হচ্ছে, সেই দৃশ্যে আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন।

অভিনয়ের ভয়ানক শখ ছিল দুর্গাদাসের, তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে বা অঞ্চলে বহু অ্যামেচার থিয়েটার করেছেন তাই কলকাতায় এসে, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ খুঁজতেন অভিনয়ের।

এরপরে এঁরা করলেন 'মানভঞ্জন'। রবীন্দ্রনাথের গল্প। 'গোপীনাথ' করলেন নরেশবাবু। তিনকড়িদাও এতে যোগ দিয়ে করলেন গোমস্তার পার্ট, ইন্দুও যেন কী একটা ছোট পার্ট করেছিল। নায়িকা ছিল সোনা বলে নতুন একটি মেয়ে, খুবই সুন্দরী। সহ-নায়িকাটি অবশ্য পাবলিক থিয়েটারে কিছু-কিছু কাজ ইতিমধ্যে করেছে, নাম—লীলা। এ বইয়েরও সমবেত দৃশ্যে জনতার একজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—দুর্গাদাস। পরিচালনা—নরেশবাবুর। তাজমহলের কথা পরে আরও বলতে হবে।

তেইশ সালে এসেছি। ম্যাডানের সঙ্গে এইবার আমাদের বন্দোবস্ত হয়ে গেল ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে, অবশ্য যেখানে-যেখানে দেশী ছবি দেখাবার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই শুধু দেখাবেন, এই শর্ত হলো। নিশ্চিন্ত হলাম। ইণ্ডো-বৃটিশ বা তাজমহল যাঁরাই এসেছেন, দাঁড়াতে পারেন নি, কারণ ঐ ছবি দেখানোর অসুবিধা। এক রসা থিয়েটার ছাড়া আর দেশীছবি দেখানোর তেমন সুবিধা কই ওঁদের পক্ষে? ম্যাডানকে ডিষ্ট্রীবিউশন দিয়ে তবেই আমরা সুবিধা পেলাম কয়েকটি ছবিঘরে ছবি দেখাবার। ম্যাডান অবশ্য আমাদের ছবি নিজেরা দেখে নিয়ে, তবেই পছন্দ করে প্রদর্শনের কাজটা হাতে নিলেন। ক্রীডের মধ্যস্থতায় ম্যাডানদের সঙ্গে আমাদের ক্রমশ বেশ ঘনিষ্ঠইতাই হয়ে গেল। আমরা তারপরে ছবির পাবলিসিটির জন্য বুকলেট, স্টিলছবি ছাপানোর জন্য ব্লক, এসব করতে লেগে গেলাম। পোস্টারও কিছু-কিছু ছাপিয়েছিলাম আমরা, ডিজাইন করে দিয়েছিলেন গোকুলবাবু। লাইন ব্লকের ওপরে ছাপানো। ওপরে নীচে—ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষাতেই ছাপানো। সবাই বলতেন—ভালো করে বাংলায় ছাপাও, লোকে আবার বিদেশী ছবি বলে ভুল না করে!

অনুমানটা একেবারে মিথ্যে নয়, এ ভুল তখন কেউ কেউ যে না করেছিলেন এমন নয়। আবার অবশেষে দোলের দিন—শনিবার—তখন শুক্রবারে নয়, শনিবারে বই রিলিজ হতো—তেইশ সালের তেসরা মার্চ—বই খোলা হলো কর্নওয়ালিস থিয়েটারে। মেছুয়াবাজারের আগে যেখানে বীণা থিয়েটার ছিল, সেটা ভেঙে তখন হয়েছে রিপন থিয়েটার, ম্যাডান হয়েছে তার লেসী, সেখানে এবং ভবানীপুরে—এমপ্রেস থিয়েটারে (এখন যেটা রূপালী) দেখানো হতে লাগল আমাদের "সোল অফ স্লেভ্"। ভবানীপুরের অনেকেই দেখতে লাগলেন ছবিটা। ভবানীপুরের ছেলেরা সব নেমেছে, এ এক কৌতূহল ছিল তাঁদের পক্ষে! নানান গুজব ছড়াতো, ঠাট্টাও করত অনেকে।—আরে দূর, সেদিনকার সব ছোকরা, জানেই বা কী, শোনেই বা কী, ওরা করবে বায়স্কোপ!

সব-কিছুর নিরসন হলো পর্দায় তা প্রত্যক্ষ করে। তাঁরা চমকে গেলেন। বলতে লাগলেন—না হে, চমৎকার ছবি করেছে!

এমপ্রেসে তখন বাগানে কনসার্ট বসতো। ছবি শুরু হবার আগে, তারা বাগান থেকে আসত অডিটোরিয়ামে—পর্দার সামনে বসে আবার বাজাতো কনসার্ট, কর্নওয়ালিস থিয়েটারেও এ রীতি ছিল,

এখানেও তাই। এরপর ছবি গেল খিদিরপুর সিনেমায়, এখন বোধ হয় তার নাম—চিত্রপুরী। তারপরে গেল হাওড়া সিনেমায়। যেখানে যখন ছবিটা দেখানো হয়, সেখানেই ছুটে যাই, ঘুরে ঘুরে ছবিটা দেখি বারবার। এরপরে এলো মফস্বলে দেখাবার পালা। স্থির হলো, পাঠাবার আগে, টাইটেল বদলে, উর্দু-হিন্দী-বাংলা, এই তিন ভাষায় ব্যবহার করতে হবে। ম্যাডানও করত তাই। করলাম আমরাও।

যাই হোক, ততদিনে এটুকু বুঝলাম, ছবিটা রসিকজন নিয়েছেন, লোকের ভালো লেগেছে, সুখ্যাতিও হয়েছে ছবির। বিশেষ করে ছবির সাজসজ্জা ও গল্পের নূতনত্ব। পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশেষ করে, গহনা সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি । এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতাম আমি নিজে। চিত্রশিল্পীরা ঘাড় নেড়ে পাস করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি ছাড়ি নি। গয়নার অবস্থান ঠিকঠিক হয়েছে কি না, পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে কি না, এসব দেখে, তবে ছেড়ে দিতাম। কোমরবন্ধ, হাতের বাজু, নীচের হাতের বালার মতো গয়না, গলার হার, পৈতের মতো করে মুক্তার মালা, যা দেখেছিলাম সব প্রাচীন প্রস্তরমূর্তিতে, সব ঠিকমতো পরা হয়েছে কি না, এ না দেখে নিলে আমার স্বস্তি হতো না। অতি কষ্ট করে পাটোয়ার ডাকিয়ে এসব আমি তৈরি করেছিলাম—বাজারে অনেক শাঁখের মালা। আধ ইঞ্চির মতো ছোট-ছোট শাঁখ—সেই শাঁখ জাফরির মতো করে পরস্পর সংলগ্ন করা ছোট্ট-ছোট্ট পুঁতি দিয়ে গলার কাছ থেকে বুক পর্যন্ত ঝুলত। দেখতেও চমৎকার, ক্লোজ-আপ সটে বাহারও খুলেছিল অপূর্ব।

এসব ঠিক ছিল, কিন্তু গোল বেধেছিল মাথার চুল নিয়ে। আমাদের শুটিং হবার মাস দু-তিন আগে থেকেই ডিজাইন করতে দিয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিল, চুল এমন হবে, যেন যাতে করে মনে না হয়, মাথা থেকে ওটা আলগাভাবে বেরিয়ে আছে। অর্থাৎ পরচুল বলে না মনে হয়। তখন কলকাতায় সবচেয়ে ভালো চুলের কাজ করতেন—বাবু হোসেন। চীৎপুরের রাস্তায়—লালবাজারে পুলিস- অড্ডার পূর্বদিকে ছাতাওয়ালা গলির মুখে ছিল বাড়িটা—দোতালায় উঠতে হতো ছাতাওয়ালা গলির মধ্য দিয়ে। হেয়ার-কাটিং সেলুন ছিল বাবুহোসেনের নামকরা, কলকাতার যতো বড়ো শৌখীন লোক এখানে আসতেন চুল ছাঁটতে। অবশ্য যাঁরা ইয়ুড কোম্পানি বা ওয়াট্সন অ্যাণ্ড সামারস্ কোংতে গিয়ে না ছাঁটাতে পারতেন। প্রায় সমস্ত থিয়েটারগুলির চুলই ভাড়া যেত এখান থেকে। আরও দোকান ছিল, কিন্তু এঁরাই ছিলেন এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এঁদের এই বাড়িটা ছিল ভবানীপুরের এক জমিদারের সম্পত্তি, সে-বাড়ির একটি ছেলে ছিল আবার আমাদের খুবই পরিচিত, তাই আমরা আগে-আগে যত যাত্রা-থিয়েটার করেছি, সব চুল নিয়েছি এখান থেকে, সস্তায় দিত আমাদের। বৃদ্ধ বাবুহোসেন নীচের রকে বসে থাকতেন চেয়ারে। শুভ্র কেশ—শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রসন্ন মুখখানি। ওপরে তাঁর কাজকর্ম দেখতেন তাঁর ম্যানেজার—আবদুল বারি। ছোকরা বয়স, দাড়ি আছে, অতি বিনয়ী। এর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ১৯১২-১৪ সাল থেকে। আজ বারি সাহেব আমার মতো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বাবু

হোসেন মারা যাবার পর ইনি সর্বময় কর্তা হলেন—মুনসী আবদুল বারি নাম নিয়ে—চালাতে লাগলেন ব্যবসা, সেই বাড়িটা অবশ্য নেই, বদলে গেছে। একবার নয়, দু'বার বদলেছে। বাড়ি বর্ধমান জেলায়। চুলের কাজ যারা করে সবাই ওর আপন সম্প্রদায়ের লোক এবং সবাই বাঙালী। আমাদের ব্যাপারে সেদিন আবদুলকে ডেকে বলেছিলাম—চুল দাও। এমন জিনিস দেবে, যেন দেখে মনে হয়, সত্যি সত্যি মাথা থেকে গজিয়েছে।

বারি অনেক চেষ্টা করলেন। ওঁর হেড মিস্ত্রী—বড়ো মিজ্জা—রীতিমত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—হাত কাঁপে। সে এসে মাপ নিয়ে একের পর এক, দিনের পর দিন ট্রাই করে দেখলে, কিছুতেই হয় না যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমনটি। এদের-এ প্রতিষ্ঠানে যারা বরাবরই বড়ো হয়েছে, তাদের সবার সঙ্গেই ছিল আমার ঘনিষ্ঠতা, আজও আছে।

যাই হোক, কিছুতেই আমার আর পছন্দ হয় না চুল। আমি আর প্রফুল্ল ছিলাম। বললাম—আয় প্রফুল্ল, আমরা মাথায় চুল রাখি। মাস দুই সময় আছে, চুল রাখলে, বড়ো হয়ে যাবে, লম্বা হয়ে যাবে, তখন আর ভাবনা নেই।

তাই করেছিলাম আমরা দুজনে। আর সবাই অবশ্য ঐ বাবুহোসেনের চুল নিয়েই কাজ চালিয়েছে। এক গোকুলবাবু ছাড়া কারণ তাঁর বড়ো চুল ছিল। তবে পরচুল যত ভালোই হোক না কেন, নিজের চুলের কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না। পোশাক-টোশাক পরে যখন বসে থাকতাম ফ্লোরে, মনে হতো, আমরা আর এ-যুগের নই, আমরা হয়ে গেছি সেই পুরাতন যুগের মানুষ।

ছবির খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কিছু খ্যাতি হলো। আমার আত্মপ্রসাদের দিকটা হলো এই, আমি অভিনয় করেছি, সিনারিও করেছি, গল্প তৈরি করেছি, পরিচালনা করেছি, সম্পাদনাও করেছি। সিনারিওটা মনের মধ্যে এত গেঁথে গিয়েছিল যে রাস্তা চলছি, আর অন্যমনস্কভাবে গল্পের পারম্পর্যের ধারাবাহিকতার কথাই ভেবে চলেছি। ভাগ্যিস তখনকার দিনে এখনকার মতো যানবাহনের আধিক্য ছিল না, নইলে গাড়িচাপা পড়েই মারা যেতে হতো। হাতে-নাতে এই যে কাজের শিক্ষাটা পেয়েছিলাম, এর জন্য আমি ঋণী ক্রীড সাহেবের কাছে। প্রত্যহ ঐ যে ঘুরে-ঘুরে আমাদের ছবিখানা দেখে বেড়াতাম, তাতে ছবির প্রতিটি কম্পোজিসন, অভিনয়ের ভঙ্গি, সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল, আমার হাত দিয়ে যা বেরিয়েছে, তাকে একটি খাঁটি রোমান্টিক স্টাইলের ছবি বলা যেতে পারে। তখন আমি মনেপ্রাণে সত্যিই রোমান্টিক স্টাইলের লোক। গল্প যা রোমান্টিক তাই ভালো লাগে। অভিনয়ের দিক থেকে আমি ভঙ্গিমা-বিলাসী, পরিবেশ-প্রসাধনেও চিত্রধর্মী (পিক্‌টোরিয়াল)। আমার পারিপার্শ্বিক আমাকে এই-ই তৈরী করে দিলে।

সাত

১৯২৩-১৯২৩

ইতিমধ্যে আর এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। অবশ্য আগে থাকতেই এর সূচনা চলছিল, ততটা গা করিনি। তিনকড়িদা এর মধ্যে একদিন ডেকে বললেন, স্টার নেওয়া হয়েছে। আমরা সব অভিনয় করব, প্রস্তুত থেকো। ব্যাপারটা বছরের গোড়াতেই হবে। ফিল্মের এডিটিং নিয়ে তখন ব্যস্ত ছিলাম। দু'চারটি প্রশ্ন করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানবার মতো অবকাশই ছিল না। তাই প্রশ্ন করেছিলাম—কারা করছে থিয়েটার?

—ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেই ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়? সেই তিনি আর তাঁর কয়েকজন ধনী বন্ধু স্টারের লীজ নিয়ে নিচ্ছেন, আমরা গিয়ে অভিনয় করব।

—বই কি বাছা হয়েছে? ভূমিকা-নির্বাচন কাদের ওপর? অর্থাৎ, কর্তৃত্ব করবে কারা?

তিনকড়িদা বলেছিল—আরে, ওসব আমাদেরই হাতে থাকবে। তোমাকে ভূপেন-বাবুর কাছে নিয়ে যাবো, সামনাসামনি কথা হবে। তিনি তোমায় ডেকেছেনও বটে।

এক রবিবার হাজরা রোডে ওঁর বাড়ি গেলাম, সঙ্গে ইন্দুও ছিল। বললেন সব পরিকল্পনার কথা, লীজ নেওয়ার কথা। বললেন—লীজ পাল্‌টে দিচ্ছেন অপরেশবাবু। অপরেশবাবুই ম্যানেজার থাকবেন, প্রবোধ গুহ থাকবেন—সেক্রেটারি। আর ডাইরেক্টর বোর্ডে থাকবেন—অ্যাটর্নী সতীশ-চন্দ্র সেন, আহিরীটোলার কুমারকৃষ্ণ মিত্র, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। তাছাড়া, আমি ত রইলামই।

এদের বন্ধুবান্ধবরাই সব-শেয়ারহোল্ডার। অভিনেতাদের মধ্যে শুনলাম—আসছেন—শিশিরবাবু, নরেশবাবু। আর ভাবানীপুর থেকে যাচ্ছি আমরা—তিনকড়িদা, আমি আর ইন্দু। অবশ্য নরেশবাবু ভবানীপুরে বাস করতেন। এছাড়া, এরা তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীটাও নিয়ে নেবেন। ছবি করা হবে। কিন্তু, তার আগে, থিয়েটারের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

—কী বই হবে?

ভূপেনবাবু বললেন—বেছে নিতে হবে। বেশ ত, তুমিও ভাবো না?

বললাম—তিনকড়িদার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখতে পারি।

রাস্তায় যেতে-যেতে সেই পরামর্শই করতে লাগলাম তিনকড়িদার সঙ্গে। ম্যাথিসন ল্যাং-এর যে "মিস্টার উ" বলে ছবিটা দেখেছিলাম, তার গল্পটা সংক্ষেপে বললাম, ওঁকে। তারপরে বললাম—ওটা নাটক করলে কেমন হয়?

উৎসাহিত হলেন উনি, বললেন—খুব ভালো হয়।

—লিখবে কে নাটক ?

তিনকড়িদা বললেন—লোক আছে লেখবার। এর মধ্যে সকালে কবে আসতে পারবি আমার বাসায় ? তাকেও আসতে বলব সেদিন।

বললাম, দু'তিনদিন পরের কথা। তাই হলো। গেলাম। দেখা হলো সাহিত্যিক সতীশ ঘটকের সঙ্গে, ভবানীপুরেই বাড়ি—বলরাম বসু ঘাট রোডে। ওকালতীও করেন, সাহিত্যচর্চাও করেন।

তিনকড়িদা বললেন—হাতের বইটা পড়ো, সতীশ।

লেখা ছিল ওঁর নাটক। সেটাই পড়লেন। নাম দিয়েছেন—"মথুরায়"। কংসের কাহিনী আর কী। চমৎকার চরিত্রসৃষ্টি, বিশেষ করে 'উগ্রসেনটি' যা হয়েছে, চমৎকার। চল্‌তি পৌরাণিক ধরণের নাটক নয়, এমন কি পৌরাণিক ধাঁচেরও নয়। সংলাপও চমৎকার। বেশ মিষ্টি। শুনে লোভ হলো। বললাম—এই বইটাই ত চমৎকার। এটাই ধরিয়ে দাও না কেন ?

শুনলাম, ধীরেন মিত্র মশাই 'রিফর্মড্ থিয়েটারে' এটা করবার জন্য ধরেছিলেন, সতীশবাবু নিজে গিয়েই মহলা চালনা করেছিলেন দিনকতক। কিন্তু তৈরী হতে দেরী হবে বলে, "মতফরক্কা" নামের নিজেরই লেখা একটি বই তাড়াতাড়ি ধরিয়ে দিয়েছিলেন ধীরেনবাবু। তারপর, সে থিয়েটার আর টিকল না, এ বই-ও আর হলো না।

সেদিনের সভাভঙ্গ হয়ে গেল। পরে তিনকড়িদা আমাকে বলেছিলেন—নতুন থিয়েটার খোলা হচ্ছে। ওসব পৌরাণিক বই-টই এখন ধরা ঠিক হবে না। তোর "মাস্টার উ"-র গল্পটা ওকে বলেছি।

অতঃপর সতীশবাবুর সঙ্গে আলোচনাও হলো গল্পটা নিয়ে। বললেন—লিখছি।

শুনিয়েও গেলেন একদিন। বেশ হচ্ছে। কিন্তু ওদিকে আমাদের ছবির তখন রিলিজ করার ব্যাপার চলেছে। ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বেশ কিছুদিন কেটে গেল আমাদের ছবির কাজেরই মত্ততা নিয়ে তারপরে একদিন ইন্দু এসে হঠাৎ বললে—তোমায় স্টার-এ যেতে হবে।

তখন কলকাতার এখানে-ওখানে আমাদের ছবি দেখানো চলছে। ঘুরে-ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছি। তাই ততটা উৎসাহিত বোধ না করেই বললাম—কেন ?

—ভূপেনবাবু যেতে বলেছেন। নতুন থিয়েটার। যাতায়াত করা ঠিক নয় কী ?

শিরে সংক্রান্তি। সত্যি সত্যিই যে এটা হয়ে উঠবে, তা ভাবতে পারিনি। কেমন একটা ভয় জাগল ভিতরে। বাড়িতেই বা বলব কী ? ওখানে কি যাওয়া ঠিক হবে ? ঠিক হবে কি সাধারণ মঞ্চে যোগদান করা ? কথার কথা বলে এসেছিলাম তিনকড়িদাকে সেটা যে এরপরে এমনভাবে ঘাড়ে চেপে বসবে, আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি। চিন্তা করছি। কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারি না। ইন্দু রোজ আসে ডাকতে। আজ যাবো কাল যাবো করে কাটিয়ে দেই। আবার

তাগাদা করতে আসে ইন্দু। আমি থাকি লুকিয়ে। মা সেটা লক্ষ্য করছে, একদিন বললে—ইন্দু এলে অমন লুকিয়ে থাকিস কেন? কী হয়েছে?

—থিয়েটারে যোগ দিতে বলছে। যাবো না আমি।

মা কী বুঝল কে জানে, বললে—এ আর শক্ত কথা কী। বললেই হবে—যাব না। এর এতো লুকোছাপার কি আছে?

বারান্দা থেকে ইন্দুকে সেদিন আসতে দেখে আমি করলাম কী, একেবারে ছুটে গিয়ে লুকোলাম ছাদে—চিলেকোঠায়। তখনো আমরা আছি সেই ভাড়া বাড়িতে—কাঁসারীপাড়ায় আমাদের নতুন বাড়ি হচ্ছে যেখানে, তার সামনে।

ওপর থেকে শুনতে পাচ্ছি ইন্দু ডাকছে আমাকে। আমার সাড়া না পেয়ে উঠে এসেছে। মাকে ডাকছে—মাসিমা? কোথায় সে?

মা বোধ হয় হাত দিয়ে ওপরটা দেখিয়ে দিয়ে থাকবে। ইন্দু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে খ্যাঁক করে আমার গলা চেপে ধরলে, বললে—লুকিয়ে আছ কেন?

যাব না থিয়েটারে।

কেন?

—ভয় করছে।

হিড়হিড় করে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। ভালো কাপড়-জামা পরিয়ে নিয়ে গেল আমাকে স্টারে। ওপরে গেলাম। বক্স খুলে দিলে। কী-একটা প্লে হচ্ছিল। শুনলাম—ভূপেনবাবুরা এখুনি আসবেন।

খানিকক্ষণ বসে বসে প্লে দেখছি, এমন সময় এলেন তিনি, সঙ্গে তিনকড়িদা। ইন্দু বলে দিলে—জানেন, ওর থিয়েটারে আসতে ভয় করছে।

—কীসের ভয়?

—বাড়ীতে কী বলবে?

—তিনকড়িবাবু রয়েছেন, ইন্দু রয়েছে, সে কথা এঁরাই বলে দেবেন বুঝিয়ে। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

এলেন প্রবোধবাবু। দোতলায় যেটা ছিল অমৃতলাল বসু মহাশয়ের ঘর—সে ঘরে তখন বসছেন উনি। ঘরের একদিকে বেশ বড় ছাদ, আর স্টেজের দিকে বারান্দা, সেখান থেকে বেশ প্লে দেখা যায়। স্টারের বাগানের দিকে পাঁচিলটা উঁচু করে গাঁথা। যাতে ভিতরের সব দেখানো যায়। ছাদ দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। ছাদের পুবদিকে কোনো প্যারাপেট্ নেই—ন্যাড়া ছাদের মত দেখায়। পুবদিকের সাজঘরগুলি তখন তৈরী হয়নি। অমৃতবাবুর ঘরটার মেঝে ছিল কাঠের। সমগ্র স্টারের দোতলাটাই কাঠের। এ ঘরটাও তাই, এর দেয়ালও ছিল কাঠের। থিয়েটারের কাজে তখন

কাঠই ব্যবহৃত হত বেশী। কতদিন হলো থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন অমৃতবাবু, তবু তাঁর ঘরের সৌষ্ঠব এখনো বজায় আছে। দেয়ালে-দেয়ালে আয়না, আয়নার নীচে শ্বেত পাথরের ব্রাকেট। অমৃতবাবু যে শৌখীন ছিলেন, স্টারের বাগান দেখে তা বোঝা যেত, এখন তাঁর ঘর দেখে আরও তা বোঝা গেল। ক্রস্ট্যাল কেবিন বলে কেবিন ছিল, চা-খাবার-দাবার বিক্রি হত। কেবিনের সামনে কুঞ্জমতন করা ছিল—সেখানে তিনি বসতেন। কেবিনের ভিতরটাও ছিল খুব বাহারের। সমস্তই কাচ দেওয়া বলে, ক্রস্ট্যাল কেবিন বলত সবাই।

ভুপেনবাবু আমাদের সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে এলেন। ঘর থেকে ছাদে এলুম। শুনতে পেলুম, নীচে কারা যেন কথা কইছে। উঁকি দিয়ে দেখি, ছেলেমেয়েরা সব বেড়াচ্ছে আর গল্প করছে। পাছে দেখতে পায় তাই সেখান থেকে সরে এলাম।

গ্রীষ্মকাল। ছাদে চেয়ার পাতা। বসে বসে প্রবোধবাবুর সঙ্গে নানান গল্প হচ্ছিল। বললেন—অমৃত মিত্র মরণাপন্ন ব্যাধি নিয়ে এখানেই ছিলেন। এই ছাতেই তিনি মারা যান। ক্যান্‌সারে ভুগছেন, প্রাণ আর বেরোয় না। গিরীশচন্দ্র তখন মিনার্ভায়। কে যেন গিয়ে খবর দিলে তাঁকে। সে-সব অনেক ঘটনা। গুরু-শিষ্যের মনকষাকষি। কিন্তু, অমৃত মিত্র কষ্ট পাচ্ছেন, উনি শুনে আর কি চুপ করে থাকতে পারেন? এলেন চলে দেখতে। অনেক লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে। উনি বসলেন, গায়ে হাত দিলেন নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলেন। বললেন—ভয় নেই, আর কষ্ট পাবে না।

তারপরের দিনই অমৃত মিত্র করলেন মহাপ্রয়াণ। গুরুর আশীর্বাদটুকু মাথায় না নিয়ে তিনি যেন ইহলোক ছাড়তে পারছিলেন না। এটা হয়ত ভাবেরই কথা। কারণ, গোপাল শীলের কাছ থেকে বোনাস্‌স্বরূপ ষোল হাজার টাকা পেয়ে সেটা বাড়ি করার জন্য দান করে যে শিষ্যবর্গকে তিনি স্টারের মালিক করে দিয়েছিলেন, সেই শিষ্যবর্গই একদিন তাঁকে দিলেন কর্মচ্যুতির নোটিশ। এটা তাঁর মনে আঘাত করাই স্বাভাবিক। এবং চারজন স্বত্বাধিকারীর মধ্যে অমৃত মিত্র তাঁর হাতে-গড়া শিষ্য, তাই গুরুর অভিমান এই শিষ্যটির ওপর প্রচণ্ড হওয়া আদৌ আশ্চর্যের ছিল না। এই অভিমান মুছে নিয়ে চলে গেলেন শিষ্য, অমৃতলোকে গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে—যাকে বলে ডঙ্কা বাজিয়ে।

এই আরম্ভ। এর পর থেকে কত পুরানো গল্প শুনেছি কয়েক বছর ধরে, যা·কখনো আগে শুনিনি, পড়িও নি। ফেরবার সময় হরিশ মুখুজ্যে রোড থেকে কাঁসারীপাড়া পর্যন্ত একসঙ্গে আসতে আসতে ইন্দু বলত—যাবে ত রোজ? পালিয়ে বেড়াবে না ত? আমি তোমার বাবাকে বলব।

ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা আছে ষোল আনা, তবু মনের কোণ থেকে কে যেন বলে উঠতে চায়—না-না, কাজ নেই।

পরদিন। ইন্দু এল। গেলাম আবার। ডিরেক্টাররা ছিলেন, আমরাও ছিলাম। আলোচনা চলতে লাগল কর্মপদ্ধতি নিয়ে। আমি ত চুপ করে বসে আছি। কী যে করব ঠিক নেই। বাড়ির বাধাই মস্ত বাধা। শেষে ইন্দুর কাছে শুনেছিলাম, বাবাকে ও বলেছিল। শুনে বাবা বলেছিলেন—যায়গা

খুব ভালো নয় ইন্দু, আমি জানি স্থানটা। বড় অল্প বয়স তোমাদের। এক তিনকড়িবাবু আছেন মাথার ওপর, এটাই ভরসা।

আর কিছু বলেন নি।

ইন্দু যথারীতি ঠিক ধরে নিয়ে আসে আমাকে। ঘুরে ঘুরে বেড়াই। অভিনয় দেখি। হাঁদুবাবু—গোবিন্দলাল, লক্ষ্মীকান্তবাবু—কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণভামিনী—ভ্রমর। রোহিণী—নিভাননী। অভিনয় কিন্তু ভাল লাগেনি। বিশেষ করে যে অভিনয় দেখেছিলাম ভবানীপুর ক্লাবের, এই স্টারমঞ্চেই, সে অভিনয়ের সঙ্গে এর বুঝি তুলনাই হয় না! সে-ও এই "কৃষ্ণকান্তের উইল।" তিনকড়িদা ছিলেন গোবিন্দলাল। ইন্দু ছিল রোহিণী। ভূজঙ্গবাবু ছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

এরপরে, আরও এক অভিনয় হল। "দুটি প্রাণ।" তার সঙ্গে আরও একখানি কী বই ছিল যেন, মনে নেই। অভিনয় ভাল লাগেনি। আমরা দোতলায় ঘুরতাম। ডিরেক্টাররা এসে সদরের দিককার ঘরে জড়ো হতেন। এবার শুরু হয়েছে ডিরেকক্টারদের মিটিং।

—কীসের মিটিং?

—বই ঠিক হচ্ছে।

—বই ত রয়েছে। 'মিস্টার উ'র গল্প।'

তিনকড়িদা বললেন—ওটায় গান-নাচ যা আছে. তা এখন চলবে না। ওটা অপেরা হিসাবেই ভাল চলবে। কিন্তু অপেরা এখন ধরা ঠিক হবে না।

—তবে কী হবে, স্থির হলো?

—পল্লীসমাজ। শরৎচন্দ্রের। হরিদাসবাবুর ভয়ানক ইচ্ছা। উনিই ড্রামাটাইজ করেছেন।

বলে, একটু থেমে, আবার বললেন তিনকড়িদা—দেখ দেখি কাণ্ড! বুড়ো বয়সে এখন আমি "রমেশ" সাজি কী করে? ওঁরাও ছাড়বেন না, আমিও চাই না সাজতে।

—আর-আর ডিরেক্টাররা কী বলছেন?

—তাঁদের সকলেরই ঐ একমত। করতেই হবে।

কিন্তু যতটুকু শুনলাম এবং বুঝলাম, রাজী নন তিনকড়িদা নিজে। প্রথম থেকেই কথা ছিল, হবে "পল্লীসমাজ", আসবেন শিশিরবাবু, এবং তিনিই করবেন নায়কের ভূমিকা—'রমেশ'। বেণী করবেন তিনকড়িদা, জ্যেঠাইমা—তারাসুন্দরী। হরিদাসবাবুর দেওয়া নাট্যরূপ, হরিদাসবাবু নিজে ছিলেন পুরাতন ইভনিং ক্লাবের প্রখ্যাত অভিনেতা, আর তাছাড়া তিনি মান্যও ছিলেন যথেষ্ট। শিশিরবাবুও তাঁকে সম্ভ্রম করতেন। এবং শিশিরবাবুর সঙ্গে তাঁর আসা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল প্রধানত হরিদাসবাবুরই মাধ্যমে। এই নিয়ে ডিরেক্টরদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনাও হয়ে গেছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত আসা হলো না শিশিরবাবুর। সুতরাং 'রমেশ'-এর কী হবে? ওর ভার পড়ল তিনকড়িদারই ওপরে। তিনকড়িদার বয়স তখন প্রায় ছেচল্লিশ, বললেন—

দেখ দেখি এই বয়সে 'রমেশ' করি কী ক'রে? প্রথম নামছি পাবলিক থিয়েটারে, প্রথম নেমেই হেয় হয়ে যাবো লোকের কাছে। তা হয় না, কিছুতেই হয় না।

দিনকতক এই চলেছিল, তাঁরাও ছাড়বেন না, ইনিও রাজী হবেন না। শেষ পর্যন্ত বজায় থাকল তিনকড়িদারই জেদ। তখন কর্তারা "পল্লীসমাজ"কে সরিয়ে রেখে, নতুন কী বই করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এবং সে আলোচনা একদিন-দুদিনেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়নি, চলেছিল বেশ কিছুদিন ধ'রে।

আমি যাই সন্ধ্যার দিকে। রুদ্ধদ্বারকক্ষে ওদিকে মিটিং হয় পরিচালকদের, আর আমরা ওপরে উঠে ঘুরে বেড়াই। অভিনয় তখনো হয়, চৈত্রমাসের শেষাশেষি তখন, চৈত্রমাসের শেষ কটা দিন ওঁরা অভিনয় চালিয়ে যাবেন শুনলাম। ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে প্রেক্ষাগারে লোক খুঁজি। লোক আর দেখতে পাই না। খুঁজে খুঁজে দেখি, এদিকে একটি-কি-দুটি লোক বসে আছে, ওদিকে একটি-কি-দুটি অথচ, অভিনয় চলেছে। অবাক হয়ে ভাবতাম, এ'অবস্থাতেও ওঁরা অভিনয় করে যাচ্ছেন কেমন করে? ওদিকে চৈত্রের শেষে, নতুন ব্যবস্থায়, কে থাকবেন কে থাকবেন না জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ, দর্শকদের ঐ অবস্থা, এর মধ্যে এই অব্যবস্থিত চিত্তে অভিনয় স্বভাবতই ভালো হয় না। মিটিংয়ের শেষে প্রবোধবাবুও আমাদের কাছে আসেন, আলোচনা হয় তাঁরও সঙ্গে। অভিনয়ের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে মনে একটা আতঙ্কও হয়।

অভিনয় ভালো দেখেছিলাম—ওরই মধ্যে-একটি বই—"সুদামা"। এই বইয়ে দর্শকও ছিল কিছু সংখ্যক। 'সুদামা' ছিলেন হাঁদুবাবু। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিনয় করে ভূমিকাটি বেশ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। দেখে মনে হতো ভূমিকাটি অপরেশচন্দ্র যেন ওঁরই জন্য লিখেছিলেন। ওঁর স্ত্রীর ভূমিকায় ছিলেন নিভাননী। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কৃষ্ণভামিনী, কী গানে কী অভিনয়ে এ ভূমিকাটি তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন বলা চলে। রুক্মিণী ছিলেন—নীহারবালা। "সুদামা"র দৃশ্যপটও মোটামুটি ভালো হয়েছিল। একটি দৃশ্যের কথা আজও বেশ মনে আছে। সুদামা খুবই দরিদ্র। বন্ধু মথুরায় গিয়ে রাজা হয়েছে, দেখা করবার বড়ো ইচ্ছা হলো। স্ত্রী বললে—নাড়ু খেতে বড়ো ভালবাসতেন। দুটো নাড়ু নিয়ে যাও সঙ্গে করে।

—নাড়ু!

বিস্মিত-বিহ্বল মন নিয়ে সুদামা ভাবছেন, শ্রীকৃষ্ণ এখন রাজা, তাঁকে আমি ওই সামান্য-তুচ্ছ ক্ষুদের নাড়ু নিয়ে গিয়ে কী করে দেবো?

—তবু তুমি নিয়ে যাও।

সরলা স্ত্রীর আকুতি ঠিক পরিহার করতে পারলেন না সুদামা, নাড়ু নিয়ে চললেন দেখা করতে সখার সঙ্গে মথুরায়।

পথে পড়ল এক নদী। এই নদী পার হতে হবে, অথচ ঘাটে মাঝি নেই। নদীও বিরাট। সুদামা ভাবতে ভাবতে বসে-পড়লেন ঘাটের ওপরে।—তাই ত, পার হবো কী করে?

পরক্ষণেই মনে আরেক ভাবের উদয় হলো। হায় ভগবান, যাচ্ছি স্বয়ং ভবসমুদ্রের যিনি কর্ণধার, তাঁর কাছে। সুতরাং নদী পার হতে ভয় করছি? পার হবার ভাবনা কী? কোমরের কাপড়ে বেশ করে বেঁধে নিলেন নাড়ু। স্থির করলেন সাঁতরেই পার হবেন, তা নদী যতোই বিশাল হোক না কেন। এমন সময় ভেসে এলো একটি গান, দেখা গেল নদীর বুকে ছোট্ট একটি নৌকা বাইতে বাইতে আসছে কিশোর বয়সী এক মাঝির ছেলে।

সুদামা ডাকলেন তাকে।—ছোট্ট নৌকা, মানুষটিও তুমি ছোট, তুমি কি ওতে করে পার করে দিতে পারবে নদী?

সে হেসে বললে—কেন পারব না! পার করাই যে আমার কাজ! এসো।

নদীর দৃশ্যে যে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল তা চমৎকার। বক্স থেকে দেখে, একেবারেই বুঝতে পারলাম না, দৃশ্যটি করল কী করে? ছুটে গেলাম প্রবোধবাবুর ঘরের বারান্দায়। সেখান থেকেও কৌশলটা সঠিক ধরতে পারলাম না। কাপড়ের ওপর আলো ফেলার কৌশলটা লক্ষ্য করলাম বটে, কিন্তু তাতেও সবটা বোধগম্য হলো না। বুঝলাম তখন, যখন দৃশ্যটি শেষ হলো। পিছনের উইংস থেকে নৌকো নিয়ে বার হয়েছিল মাঝির ছেলে। একটা তৈরি গাড়ির ওপর নৌকো বসানো, শিফটাররা টেনে-টেনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা ঘোরানো অথচ নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে টেনে নিয়ে আসছে ঘাটের দিকে। আর নদীর অথৈ জল? জল আঁকা হয়েছে কাপড়ের ওপরে। বেতের সব ঘোরানো ফ্রেম, সেই ফ্রেমের ওপর কাপড়টা ফেলে দেওয়া. ফ্রেমগুলো রোলারের মতো করে একের পর এক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল নেপথ্য থেকে আবশ্যক মতো। তার ফলে, তা ফুলে ফুলে উঠছে আর নামছে, যেন তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে নদীর ওপর দিয়ে। এছাড়া নৌকোর সামনে কাপড় পিছনে কাপড়। যত এগুচ্ছে নৌকো তত পিছনের কাপড় ছেড়ে দিচ্ছে, সামনের কাপড় গুটিয়ে আনছে। এ গুটানো আর ছেড়ে-দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থা ছিল নৌকোর গাড়ির সঙ্গে বন্দোবস্ত করা। তাই নৌকো নির্দিষ্ট পথ ধ'রে এগুলে অথবা পেছুলে যে ফাঁকের সৃষ্টি হবার কথা, সে ফাঁকটা জলআঁকা কাপড়ে বুজে যাচ্ছে তৎক্ষণাৎ। এর ওপর রয়েছে আলো ফেলার কৌশল। আলো ফেলার এতো যান্ত্রিক উন্নতি হয়নি তখন, সাজ-সরঞ্জামও ছিল অল্প। কিন্তু যা ছিল, তা দিয়েই যা' বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে, তাকে তারিফ না করে পারা যায় না। জাতে এটি পৌরাণিক গীতিনাট্য, তাই এতে ছিল বহু মায়া দৃশ্য (Illusions)। সেগুলিও সুন্দর হয়েছিল। তখনকার বাংলা থিয়েটারে মায়াদৃশ্য অবশ্য খুবই দেখানো হতো।

৩১শে চৈত্র—চড়কের দিন—পুরাতন দলের হলো শেষ অভিনয়, এদিন হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এদিনের অভিনয় আর দেখলাম না। তবে এদিনের অভিনয়ে লোকজন কিছু হয়েছিল। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দিকে স্টারের গাড়িবারান্দার ওপরকার ছাদে চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন সব ডিরেক্টারেরা।

আমরাও ছিলাম। আলোচনা হচ্ছিল বই নিয়ে, অর্থাৎ কী বই ধরা যায়, ইত্যাদি। কাল পয়লা বৈশাখ—শুভ দিন—আর্ট থিয়েটারের আরম্ভ। ওঁরা আমাদের বললেন—কাল থিয়েটারে আসা চাই কিন্তু।

অপরেশবাবু নীচেই ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে প্রবোধবাবুও গেলেন নীচে বিদায়ী অভিনেতৃদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। বিদায়ীদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন হাঁদুবাবু, আর লক্ষ্মীবাবু।

কিছুক্ষণ পরে এ' সভাও ভঙ্গ হলো। আমরা ভুপেনবাবুর গাড়িতে করে চলে এলাম ভবানীপুর। সারা রাস্তা তিনি কিছু বললেন না, বললেন যখন গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছি। বললেন—কাল থেকে থিয়েটার হলো আমাদের, মনে থাকে যেন।

পরদিন সন্ধ্যায় গেলাম দুজনে, আমি আর ইন্দু। তিনকড়িদা আলাদা যেতেন। গিয়ে সেদিন অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। দেখি প্রেক্ষাগার বন্ধ—দরজায় চাবি দেওয়া। আমরা ওপরে গেলাম। বক্সের পাশ দিয়ে প্রবোধবাবুর ঘরের দিকে যাচ্ছি, অন্ধকার। উঁকি দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখি, যেন প্রগাঢ় অন্ধকারের এক গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবোধবাবুর ঘরে বসেছিলেন অনেকে। আর নীচে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জমায়েত হয়েছেন। স্টারের পুরাতন যাঁরা হয়ে গেছেন, আমি তাঁদের কথা বলছি, জনকয়েক আবার নবাগতও ছিলেন।

বসে আছি, খানিকক্ষণ পরে এলেন নরেশবাবু, এলেন তিনকড়িদা। প্রবোধবাবু বললেন—তাহলে এবার নীচে যাওয়া যাক। বলে হেঁকে বললেন—স্টেজে আলো দে। তারপরে আমাদের সবাইকে নিয়ে যাচ্ছিল নীচে। মঞ্চে কিছু চেয়ার পাতা, আর পাতা শপ্ (মাদুর)। শুনলাম এই শপে বসেই মহলার রীতি ছিল তখন। গিরীশবাবুও মহলা দিয়েছেন এইরকম শপে বসে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মশাই প্যাণ্ট পরতেন, তাঁর এতে বসবার অসুবিধা হবারই কথা। কিন্তু কাজের সময় তিনি বসতেন না, চনমন করে ঘুরতেন, সেটাই ছিল তাঁর স্বভাব। একটা স্ট্যাণ্ড থাকত, তাতে ছোট্ট একটা তক্তা দেওয়া, অনেকটা বক্তার বক্তৃতা দেবার স্ট্যাণ্ডের মতো, যাতে কাগজ বা বই রেখে বক্তা পাঠ করেন। সাহেব তাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিতেন। অপরেশবাবুও বসতে পারতেন না বলে, তাঁরও একটা উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ার ছিল।

ভুপেনবাবু নেমে এসে সব দেখে-শুনে বলে উঠলেন—শপ কেন? শপ গুটিয়ে ফেলো।

বেয়ারাদের বললেন—চেয়ার কই? সব চেয়ার পেতে দাও। চেয়ারে এঁরা বসুন সবাই। আর অতো চেয়ার না থাকে, ত বেঞ্চি নিয়ে এসো, বেঞ্চি পেতে দাও।

বেয়ারারা শপ গুটিয়ে ফেলে চেয়ার বেঞ্চিই নিয়ে এলো। সেইসব কাষ্ঠাসন অবলম্বন করে আমরা চার চৌকো হয়ে বসলাম। পুরাতন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রায় সবাই রয়ে গেছেন—বড়োরা ছাড়া। ডিরেক্টররা নতুন মনিব, তাঁদের সঙ্গে এঁদের পরিচয়টা হয়ে গেল। কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়েছিল, সবাইকে দেওয়া হলো সেই প্রসাদ, আর কপালে টিকার মতো লাগিয়ে দেওয়া হলো—

সিঁদুর। কালীঘাটের প্রসাদ-রূপ কাঁচাগোল্লা ছাড়াও ভীমনাগের সন্দেশ দেওয়া হলো সবাইকে। প্রথম পদক্ষেপের দিনে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করে অনুষ্ঠান-পর্ব শেষ হলো। এবার থেকে সমস্ত খরচের দায়ও দাঁড়ালো গিয়ে নতুন পরিচালকবর্গের ওপরে। ঝাড়ুদার থেকে আরম্ভ করে, পোস্টার মারার যে লোক, সহিস, কোচোয়ান, ফিমেল সীটের ঝি, গার্ড সবাইকে মাইনে দিতে হবে, কাজ হোক বা না হোক। আর অভিনয় আরম্ভ না হলে এদের কাজই বা কী? মহলায় না হয় অভিনেতৃমণ্ডলী ব্যস্ত থাকতে পারে এরা করবে কী? সুতরাং তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করে দেওয়াই হলো এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত। কর্তৃপক্ষের চিন্তা হলো সেটাই। ওঁরা বলাবলি করলেন, কাল মিটিংয়ে যাহোক একটা বই ঠিক করে ফেলতে হবে, অযথা কালক্ষেপ করা নয়।

তিনকড়িদা আমাদের বললেন—কাল এসো।

বললাম—কাল আর কী করতে আসব? তোমরা বসে কী বই হবে, না হবে সব ঠিক করে ফেলো তারপর আসব। তোমরা মিটিং করবে আর বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা কী করব শুধু শুধু? অভিনেতৃবর্গের সঙ্গেও পরিচয় হয়নি যে, বসে-বসে আলাপ-আলোচনা করব। সুতরাং গেল দোসরা বৈশাখ কেটে। তেসরা বৈশাখ সকালেই গিয়ে হাজির হলাম তিনকড়িদার বাড়িতে। আমি একাই গেলাম। তাঁর বৈঠকখানাটিতে বসে একা-একা তামাক খাচ্ছিলেন তিনকড়িদা। জিজ্ঞাসা করলাম—কী হলো?

বললেন—ভেস্তে গেল।

—কেন?

—বই আর খুঁজে পাওয়া গেল না, কোন বই-ই হাতে তৈরী নেই।

—তাহলে?

বললেন—প্রবোধবাবু একটা পরামর্শ দিলেন। ওঁদের নাকি একটা বই তৈরী আছে। ওঁদের কাছেই আছে। তার পার্ট লেখাও মজুদ। এমন কি সেটা হবে বলে তার সিনসিনারীও প্রস্তুত হয়ে আছে। সুতরাং সেদিক দিয়ে কোনো খরচা নেই। পোস্টারও পড়ে গিয়েছিল, বইখানা হবে বলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কী বই?

—পৌরাণিক বই। অপরেশবাবুরই লেখা। কর্ণার্জুন।

বলে উঠলাম—হ্যাঁ-হ্যাঁ, রাস্তায় একবার পোস্টার দেখেছিলাম বটে।

তিনকড়িদা বললেন—একমত হয়েছেন ডিরেক্টররা। বললেন—কর্ণার্জুনই হোক তবে। যত সত্বর সম্ভব খোলা হোক বই। তাই ঠিক হলো। বইখানা অমনি আনিয়ে তার থেকে বেছে বেছে দু'তিনটি দৃশ্য পড়াও হলো।

বললাম—বই কেমন?

তিনকড়িদা বললেন—ঐ যে যাত্রা করতাম যেরকম বই-টই নিয়ে, বইখানা সেরকমই, তবে অনেক ভালো ভালো দৃশ্য আছে।

(একটি নাটকীয় পত্রের অনুলিপি : পত্রলেখক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

My dear Ahin,

শ্রীমান কুমুদের মুখে আমার পরমায়ু বৃদ্ধির কথা শুনিলাম। থিয়েটারের সকলে ইহাতে আনন্দাশ্রু ফেলিয়াছিল তাহাও শুনিলাম, শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। যাই হউক আগামী সপ্তাহে একদিন সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমার চেয়ে তোমরা ভাল আছ। আমি এখনও বড় দুর্বল। আমার স্বহস্ত লিখিত এই পত্র পাইলে, আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় আর কোন সন্দেহ থাকিবে না! ইং ১২/১২/২৬

yours affectionately
শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মণঃ

—কী রকম ?

কিছু-কিছু বর্ণনা শুনলাম তিনকড়িদার মুখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পৌরাণিক ? যাত্রা করেছি পৌরাণিক বই নিয়ে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এসে সেখানেও ঐ পৌরাণিক ? মনটা তেমন খুশী হলো না। ১৪ই এপ্রিল শনিবার—১লা বৈশাখ—আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলাম, আর বই ধরা হচ্ছে ৬ই বৈশাখ —বৃহস্পতিবার—১৯শে এপ্রিল ১৯২৩ সাল।

তিনকড়িদা বললেন—ঐদিন আসিস্। ইন্দুকেও বলিস। ঐদিন পার্টও বিলি করা হবে।

তাই হলো। গেলাম। দিনটা আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। অক্ষয় তৃতীয়া বলতে মনে পড়ে গেল 'সোল অফ এ স্লেভ'-এর প্রথম শুটিং-ও হয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। আশ্চর্য যোগাযোগ।

প্রথমেই গেলাম প্রবোধবাবুর ঘরে। সেখান থেকে ডাক পড়তে গেলাম নীচে, মঞ্চের ওপরে। অপরেশবাবুর কাছেই সব পার্ট। তিনিই বিলি করছেন। তিনকড়িদা—কর্ণ। নরেশবাবু—শকুনি। আমি—অর্জুন। ইন্দু—শ্রীকৃষ্ণ। তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—দুঃশাসন। কালীপ্রসন্ন পাইন—দ্রোণাচার্য। শিশির-শিষ্য তুলসীবাবুর কথা আগে বলেছি, কালীপ্রসন্নবাবু সাধারণ মঞ্চে আমাদেরি মতো নবাগত। তবে শৌখীন অভিনেতারূপে ওঁর বিশেষ খ্যাতি দেখে বহু থিয়েটার-ক্লাবে শিক্ষকতাও করতেন। বেশ ভালো চেহারা, সুদৃশ্য গোঁফ, মাথায় বড়ো বড়ো চুল। এ'ছাড়া আর সব ভূমিকা বণ্টন করে দেওয়া হলো পুরাতনদেরই মধ্যে। দ্রৌপদী—নিভাননী। নিয়তি—নীহারবালা। পদ্মা—কৃষ্ণভামিনী ; ইত্যাদি। অপরেশবাবুকে, হাতে পার্ট নিয়ে সবাই একে একে প্রণাম করলেন। আমিও করলাম। এটি ছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের নিয়ম। পার্ট হাতে করে থিয়েটারের ম্যানেজার বা নাট্যাধ্যক্ষই দেন। এ' নিয়ম গিরীশবাবুর আমল থেকেই চলে আসছে। আরও একটি নিয়ম লক্ষ্য করলাম। মঞ্চের পাশে, যেখানে অভিনেতৃরা এসে বসেন, সেখানে দেয়ালে দুটি বড়ো-বড়ো ছবি রাখা আছে, একটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের, অপরটি গিরীশচন্দ্রের। আর তাঁদের মাঝে আছেন কালীঘাট থেকে আনা—মাটির কালীমূর্তি। আর ছিল গণেশ-মূর্তি, সেটি রাখা হয়—টিকিট ঘরে। দুটি ঠাকুরই প্রতি পয়লা বৈশাখ নিয়ে এসে স্থাপনা করা নিয়ম। আসবার সময় প্রণাম ত সবাই করেই, যাবার সময়ও করে। কারুর হয়ত শিবপুর, অথবা দূরান্তরে বাড়ি, কাজের শেষে তাড়াতাড়ি ট্রাম ধরতে হবে, জামা খুলতে খুলতে এবং নিজস্ব জামা পরতে পরতে অমনি প্রণামের পালাও সেরে নিচ্ছেন তাঁরা। এছাড়া আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। থিয়েটার থাকুক, বা না থাকুক, থিয়েটারের জন্য মালাকর ব্যবস্থা করা থাকত। যেমন থাকতেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর প্রতিদিন ধুনো গঙ্গাজল দেবার জন্য। আর অভিনয়ের দিন—অভিনয়ের জন্যও যেমন ফুলের মালা-ফুল ইত্যাদি প্রয়োজন হতো, তেমনি কয়েক গাছি মালাও মালাকর দিয়ে যেতো—ঐ ঠাকুরদের জন্য। মালা বাসি হওয়া মাত্রই তা জমা হতো একটা ব্রাকেটের ওপর। একমাস বা দেড়মাস পরে সেই শুকিয়ে যাওয়া মালাগুলি এক সঙ্গে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসা হতো

গঙ্গায়। যাই হোক প্রণামের ব্যাপারগুলো দেখতে দেখতে আমাদেরও মধ্যে এসে গেল। তাছাড়া মঞ্চ প্রবেশের পূর্বে মঞ্চে হাত ঠেকিয়েও প্রণাম করত সবাই, বিশেষত মেয়েরা।

পার্ট ত নিলাম। বেরিয়ে আসবার সময় দেখি, যতো সীট ছিল বেঞ্চি ও চেয়ার দেওয়া, সবগুলি তুলে নিয়েছে। চেয়ারগুলি রেখেছে বারান্দায়, বাগানে রেখেছে গাদা করে বেঞ্চিগুলি। প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি, গ্যালারীও ফেলছে খুলে।

অনেক খোলা হয়ে গেছে, কিছু বাকী রয়েছে। ভূপেনবাবুকে গিয়ে বললাম—কী ব্যাপার?

উনি একটু হেসে বললেন—দেখছ কী, অর্ধেক বদলে যাবে।

অতঃপর ঘোষণা হলো, রোজ সন্ধ্যা সাতটায় বসবে রিহার্স্যাল।

চলল মহলা। নিয়মমতই আসি। তিনকড়িদাও আসেন প্রত্যহ। নরেশবাবু প্রত্যহ না হলেও প্রায়ই আসেন। উনি তখন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী নিয়ে ব্যস্ত। ওঁদের ছবি শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ" উঠছে, কিম্বা ওঠবার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন।

মহলা চলতে চলতে আমাদের আলাপও হতে লাগল অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে। ভদ্রতার আলাপে ওঁরা খুবই অমায়িক। মার্জিতও বটেন। একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, অভিনেতারা পদস্থ বা বয়োজ্যেষ্ঠদের 'স্যার' বলেন। আমাদেরও বললেন অনেকে। মেয়েরা বলে—"মশাই।"—মশাই, শুনছেন?

আর, বলবার সময়, শুধু 'অমুক' বাবু নয়, 'অমুক বাবুমশাই'। যেমন—'প্রবোধবাবু' শুধু নয়—'প্রবোধবাবু মশাই।'

এ সবই কানে নতুন ঠেকছে। আমাদের মধ্যে কখনো 'স্যার' বলাবলির ব্যাপার ছিল না। সে ত থাকবার কথা—অফিস-টফিসে! ভাবতাম, এখানেও আপনা-আপনির মধ্যে 'স্যার' কেন? যেমন—আপনি জানেন না স্যার! আহা, আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার!

অভিনেতাদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, তাঁরা কিন্তু বেশ শৌখীন, বেশবাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোঁচানো ধুতির ওপর আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবি, চাদর পাকিয়ে বুকের ওপরে বেঁকিয়ে ফুল করে বাঁধা, পায়ে পাম্প-সু, হাতে ছড়ি। চুলে রীতিমত টেরী, ঘাড় ছাঁটা। গ্রীষ্মের সময় হলে, হাতে ফুলের মালা জড়ানো। বয়স্করা অবশ্য ছিলেন সাধারণ গৃহস্থের মতোই বেশভূষাধারী। সংসারের চাপে, এক উৎসবাদি ছাড়া, অন্য সময়ে শৌখীন সজ্জা ধারণ করা তাঁদের হয়েই উঠত না। এঁদের মধ্যে আমি ছিলাম একেবারে বেমানান। আমি তখন খদ্দর পরতাম। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, চাদর। অনেককে থান কাপড় পরতে দেখতাম, কিন্তু খদ্দরধারী তখন ওখানে একজনকেও দেখিনি। বয়স্কদের মধ্যে কোট পরতেন অনেকে, গলাবন্ধ কোট। এঁদের মধ্যে বেমানান হলেও কিছুদিন পর্যন্ত চালিয়েছিলাম খদ্দর পরে। সেই অসহযোগ আন্দোলনের কাল থেকেই খদ্দর পরছিলাম। অবশ্য, বেশীদিন আর রাখতে পারিনি এই পোশাক।

থিয়েটার ত তখন বন্ধ। কিন্তু থিয়েটারের পাশের বড়ো-বড়ো ছুটো পানের দোকান ঠিকই চলে যাচ্ছে। ছোকরা 'বাবু' অভিনেতার দল—সবাই নয়—দেখি, সেই পানের দোকান থেকে শরবত খাবার মাটির ভাঁড় চেয়ে নিয়ে পকেটের শিশি বার করে, সেই ভাঁড়ে ঢেলে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মদ্যপান করছে! এ-দৃশ্য কিন্তু আগে দেখিনি। বাঙালী ভদ্রলোক এভাবে প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে আগে সাহস করতেন না বলেই জানি। শুধু ফুটপাথেই যে এই ব্যাপার দেখলাম তা নয়, যতদিন থিয়েটার করেছি, দেখেছি, এর ভাণ্ডার অফুরন্ত। থিয়েটারেরই চারিদিকে পাওয়া যেতো এসব। আমরা এসব দেখে-টেখে প্রথম-প্রথম কিছুটা সংকোচের সঙ্গে থাকতাম, কী বলতে কী বলবো, কে কী মনে করবে, তাই যতো কম কথা বলতে পারি, তারই চেষ্টা করতাম। অবশ্য এখানে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক; বাইরে যাই হোক, থিয়েটারের ভিতরের চেহারা কিন্তু ভিন্ন। মদ্যপান করে এসেছে, এ যদি টের পান অপরেশবাবু বা প্রবোধবাবু, তাহলে তাঁদের চাকরি টিকে যাওয়া দুষ্কর হবে। তাই, যাঁরা যা করবার, তা বাইরে বাইরেই করে বেড়াতেন।

ওদিকে স্টারের দোতলা ত কাঠের ছিল, সেই সব কাঠ দেখি খুলে ফেলছে, বক্সের রেলিঙ অপসারিত। রয়াল বক্সের পর্যন্ত সব গেল। নীচে, প্রেক্ষাগৃহে, মাটির ওপর যে কাঠের পাটাতন ছিল যার ওপর চেয়ার-বেঞ্চি সাজানো থাকত, তা-ও উঠিয়ে দিল। চারিদিকেই যেন একটা 'ভাঙ্গ-ভাঙ্গ' রব! কী যে হয়ে দাঁড়াবে এর নতুন রূপ, জানি না। সারাটা দিন এ-কাজে লেগে থাকতেন প্রবোধবাবু, বাড়ি যেতেন সেই রাত্রে। কী যেন বড়ো চাকরি করতেন পোস্টাফিসে। কিন্তু, এই সময় তিনি আর সে অফিসে বেরুতেন না, ছুটি নিয়েছিলেন, কী অফিসের কর্ম ত্যাগ করেছিলেন, তা জানি না, দিবারাত্র যে থিয়েটার নিয়ে কাজে ডুবে আছেন, এটাই দেখেছি। আমি চলে আসতাম বিকেল বেলাতেই, তিনটে-চারটের সময়। এসে দেখতাম, কোথায় কী হচ্ছে। প্রবোধবাবুও একজন কথা বলার লোক পেতেন সম্ভবত। কিছু কিছু বলতেন প্ল্যানের কথা।

দেখতে দেখতে প্রবোধবাবুর ঘরখানাও গেল। ইতিমধ্যে অপরেশবাবু চলে গেলেন ভুবনেশ্বরে —তারাসুন্দরীকে আনতে। তারাসুন্দরীকে নিয়ে আসার ব্যাপারে একটা গুরুতর কারণ ছিল, যার সামান্য একটু আভাষ ইতিপূর্বে দিয়েছি, এখানে একটু বিস্তৃতভাবে দেওয়া আবশ্যক। 'কর্ণার্জুন'-এর কুন্তী একটি জটিল ভূমিকা বলা চলে। কুন্তী হবেন চিরযৌবনা, এবং অর্জুন ও কর্ণ, এই দুই পরস্পর-বিরোধী আত্মজের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের যে মর্মবেদনা ফল্গুর মতো অন্তরের অন্তরাল দিয়ে বয়ে চলেছে, তা বেশ সুন্দরভাবেই ফুটিয়ে তুলতে হবে তাঁকে এবং তা আদৌ সহজসাধ্য নয়। বিশেষত, রাজপুত্রদের অস্ত্র-পরীক্ষার দৃশ্যে যখন মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন কুন্তী, তখন সেই সভা অকস্মাৎ ভেঙে গিয়ে জনশূন্য হয়ে যায়। তারপর সোপান বেয়ে নীচে নেমে এসে সেই স্তব্ধ জনহীন, আলো-আঁধারের পটভূমিকায় কুন্তীর ছিল এক মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশ স্বগতোক্তির আকারে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা গেল যে, যে-অভিনেত্রীটির ওপরে 'কুন্তী'কে

ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, কিছুতেই সফলকাম হতেই পারছেন না তিনি। আসল কথা, যে অভিনয়-দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব থাকলে এই কুন্তীকে জীবন্ত করে তোলা যায় মঞ্চে, ততখানি শক্তি ছিল না ঐ অভিনেত্রী—সরযূর। যদিও ইনি ঠিক নবাগতা নন, ইতিপূর্বে ইনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন মীরকাশিমের বেগমরূপে 'অযোধ্যার বেগম'-এ, এবং আরও বহু নাটকে তাঁর আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটেছিল। এই সরযূ কিন্তু পরবর্তী যুগের সরযূবালা নন, এবং আলোচ্য সরযূর পূর্বে স্টারে ছিলেন আরও একজন সরযূ। যিনি অমৃতলাল মিত্রের সঙ্গে অভিনয় করতেন; ইনি তিনিও নন। অগত্যা কর্তৃপক্ষেরা স্থির করলেন, 'কুন্তী'র জন্য তারাসুন্দরীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করা যাক। কিন্তু একটা অন্তরায় ছিল সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করার পক্ষে। স্টার ভেঙে গিয়ে নবরূপে এই যে আর্ট থিয়েটার গঠিত হলো, এর জন্য তাঁর মনে ছিল এক প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ। কেননা, তিনি ছিলেন স্টারের অন্যতম সংগঠনকারিণী। অবশ্য একথা আগেই বলেছি যে, তিনি তখন গিয়ে বাস করছিলেন ভুবনেশ্বরে। পত্রযোগে আহ্বান জানালে পাছে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাই কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করলেন স্বয়ং অপরেশচন্দ্রকে যেতে। অপরেশচন্দ্রের তাই এই যাত্রা। এদিকে মহলায় অবশ্য তিনকড়িদা থাকতেন, সবাই থাকতেন। আমরা সমালোচনা করতাম, কিছু কিছু 'সাজেশন'ও দিতাম। তিনকড়িদা, নরেশবাবু ত বলতেনই, আমিও বলতাম। সবই এক রকম হলো কিন্তু 'নিয়তি'কে কিছুতেই হজম করতে পারছি না। আমাদের সেই 'অভিমন্যু-বধ'-এও নিদ্রাদেবী ছিল, 'আলিবাবাতে'ও 'নিয়তি' ছিল, কিন্তু এ যে ধরনের বই, এতে 'নিয়তি' ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কী পোশাক হবে নিয়তির? কীভাবে সে আসবে, কীভাবে যাবে? পায়ে হেঁটে, না শূন্যপথে? সবচাইতে প্রাণান্তকর অবস্থা হলো —নীহারবালার। এক-একজন এক-একরকম বলে। নরেশবাবু শেষ পর্যন্ত বললেন—আচ্ছা, কাল বোঝাবো'খন, আজ থাক। আমি বলি, পোশাক-আশাক নিয়েই বেশী। এইভাবেই চলে। কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পড়লেন অপরেশবাবু। ডিরেক্টররা বললেন—অপরেশবাবুর ওপরেই ভার। যা করবার, তিনিই করবেন, তিনকড়িবাবু-নরেশবাবু তাঁকে সাহায্য করবেন।

গোলমাল মিটে গেল। ওদিকে অপরেশবাবুর সঙ্গে তারাসুন্দরী এসে পড়লেন বটে, কিন্তু তিনি আর অভিনয় করতে কিছুতেই রাজি হলেন না, বললেন—আমি অবসর নিয়েছি।

কী আর করা যায়। ওদিকে তখনো রয়ে গেছে দৃশ্যপটের কথা। সেসব পটলবাবু আগেই করে রেখে গিয়েছিলেন। মায়া-দৃশ্যও ছিল। ভালোই ছিল। কিছু কিছু দৃশ্যের সংযোগ আমরা একটু ঘুরিয়ে দিলাম অভিনয়ের সুবিধার জন্য। অর্জুনের পার্টটা পেয়ে পড়ে দেখি, কেমন যেন হাল্কা-হাল্কা। মাত্র কখানা পাতা। নাটকের নাম 'কর্ণার্জুন' কিন্তু তার সঙ্গে অর্জুনের নামটা কেন যে যুক্ত হয়েছিল, বুঝলাম না। বোধহয় এই নাটকে কর্ণই সব, তবে অর্জুন না হলে কর্ণ সম্পূর্ণ হয় না, তাই অর্জুনের নাম; যাই হোক, না দমে গিয়ে বারবার পড়তে লাগলাম পার্ট। মনে হলো, কোথায় কী আছে, আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। ফলে ক্রমশ দেখতে পেলাম, মোক্ষম-মোক্ষম কয়েকটি জায়গা আছে,

অর্জুনের বেশ ভাল সিন সেগুলি। নিজের মতের সুবিধামতো প্রতি দৃশ্যপটের সংস্থাপনা প্রবোধবাবুকে বলে করে নিয়েছিলাম।

প্রতি সন্ধ্যায় সমবেতভাবে মহলা দিয়ে চলেছি। ক্রমশ পার্ট মুখস্থও হয়ে গেল। শেষ দৃশ্যে ছিল, রথে অর্জুন বসে তীর সংযোজনা করছে, শ্রীকৃষ্ণ সারথি। অপর পক্ষে, তাঁর রথের চক্র মেদিনী গ্রাস করছে দেখে কর্ণ নেমে এসেছেন রথ থেকে, বলছেন—ক্ষণেক অপেক্ষা করো—রথটা তুলে নি।

কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না অর্জুন, তীর মারতে লাগল। তখন কর্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে দ্বিগুণ বেগে তীর চালনা করলেন অর্জুনের প্রতি—অর্জুন মূর্ছিত হয়ে রথ থেকে পড়ে গেল, এবং সেই অবসরে, কর্ণ আবার তার রথ ঠিক করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মূর্ছাভঙ্গ হলো অর্জুনের, সে তীর মেরে এবার ধরাশায়ী করল কর্ণকে।

এখন এই যে অর্জুন মূর্ছিত হয়ে রথ থেকে পড়ে গেল, এটা অভ্যাস করি কী করে? রথ ত নেই। থিয়েটারের যা নিয়ম, থিয়েটারের আগে রথ পাওয়া যাবে না। অথচ করি কী? জিনিসটা ত করতে হবে। খুঁজে খুঁজে পেলাম একটা জায়গা। ওপরে মেয়েদের বসবার জন্য একটা গ্যালারির মতো ছিল। সেটা ভেঙ্গে ফেলেনি। আমি করলাম কী, রথ থেকে পড়াটা এখানে এসে অভ্যাস শুরু করলাম। তীর খেয়ে প্রথমে একটা থাকে, তারপরে গড়িয়ে আরেকটা থাকে পড়তাম, এবং দেহটা শিথিল করে নিঃসাড়ে পড়ে থাকতাম। দিন কয়েক একা-একা গিয়ে এটা অভ্যাস করতেই ব্যাপারটা আয়ত্তে এসে গেল। এর ফলে কতো যে গায়ে ব্যথা হয়েছিল, এবং কাপড়-চোপড় ছিঁড়েছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রবোধবাবু কিন্তু আমাকে খুঁজতেন। বলতেন—এই দেখলাম এখানে বসেছিল, আবার অদৃশ্য হলো কোথায়?

ওঁকে খুলে বললাম সব। উনি একটু বুঝি অবাকই হলেন। তারপরে বললেন—তা ঐ ভূতুড়ে জায়গায় যাবার দরকার কী? স্টেজেই যাও, আমি না-হয় করতে দিচ্ছি রথটা তাড়াতাড়ি।

বললাম—বেশ। তাহলে ত ভালোই হয়।

সেই আমাদের যাত্রায় যেরকমভাবে তীর-ধনুক তৈরি করেছিলাম, ঠিক সেভাবে করিয়ে আনলাম এখানকার জন্য। আহার্য-সংগ্রাহক তখন যে ছিল, তার নাম গোপাল। তখন সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। সে ছিল যাকে বলে টিপিক্যাল থিয়েটারের লোক। প্রপার্টিম্যান অনেক দেখেছি, ঠিক এমনটি আর দেখিনি। জিনিসপত্র সব তার থাকে—গোছানো—পরিপাটি। কাউকে সে জিনিস ধরতে দেবে না। নিজে নিয়ে এসে দেবে নিজের হাতে, বলবে—নিয়ে যান।

আবার কাজ হয়ে গেলে, গুছিয়ে-সাজিয়ে রেখে দেবে।

এরপর ছিল্ তীর-ধনুকের কিছু ব্যবহারের কৌশল। 'কলির অর্জুন' বলে একটা 'ভ্যারাইটি পারফরম্যান্স' ছিল বিমল দাশগুপ্তের রচনা। ইনি এই 'কলির অর্জুন' হয়ে খেলা দেখাতেন নানান জায়গায়, নানান কৌশল দেখাতেন তীর-ধনুকের চালনার। বহু মেডেলও পেয়েছিলেন এটা করে।

অথচ আসলে ইনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ—'এইচ এম ভি' গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনার ছিলেন। ওঁর ভাইও সঙ্গীতজ্ঞ কমল দাশগুপ্ত। কাছেই বাড়ি বিমলবাবুর। ডেকে একদিন আলাপ করলেন, ব্যবস্থাও করা গেল কৌশলে জেনে নেবার। বললেন—আচ্ছা, এস দেখাবো।

ভাবতে লাগলাম, কোন্ কোন্ জায়গায় এই তীর-ধনুকের 'কৌশল'গুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। দ্রোণকে প্রণাম করছে গিয়ে অর্জুনের তীর, এক জায়গায় আছে। অর্থাৎ গায়ে লাগবে না, তীর পায়ের কাছে গিয়ে গেঁথে যাবে। এটি করতে হবে। হলো ব্যবস্থা। আমি ওপাশ থেকে তীর ছোঁড়ার ভঙ্গি করব, আমার তীরটা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং ওপাশের—উইঙ্গসের পাশ দিয়ে প্রম্পটার ছুঁড়ে দেবে অন্য একটা তীর দ্রোণাচার্যের পায়ের কাছে। এখন, কৌশল হচ্ছে আমার ধনুকের তীরটিকে অদৃশ্য করাটা। এর কায়দাটা হচ্ছে ধনুকের ছিলায় এক বিশেষ অ্যাঙ্গেলে তীরটা বসাতে হবে। সেটা শিখে নিলাম বিমলবাবুর কাছ থেকে।

শুধু এই-ই নয়, আরও কয়েকটা কৌশল শিখে নিলাম বিমলবাবুর কাছ থেকে। বিমলবাবু ও আমি দুপুরবেলায় বসে কথা বলছি, তিনকড়িদাও এক-একদিন এসে পড়তেন তীর-ধনুকের কৌশল জেনে নেবার জন্য। এইভাবে এ শিক্ষা শিখেই চলেছি, অন্য দিকে পোশাক-আশাকের চিন্তা। আমি দুপুরবেলায় আসছি বলে প্রবোধবাবুর সুবিধাই হলো। কী কী পোশাক করা যায়, কী ধরনের গয়না। প্রবোধবাবু ও আমার ওপর এর ভার পড়াতে আমরা দুজনে অতঃপর এই কাজটি নিয়ে মেতে গেলাম।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হতো পোশাক নিয়ে প্রবোধবাবুর সঙ্গে। ঠিক হল, আচরিত প্রথানুযায়ী চোগা-প্যাণ্টলুনের সাজ করব না, করব ধুতি-পরবার ব্যবস্থা। প্রবোধবাবুরও সায় ছিল এতে। বললেন—মিনার্ভায় অপরেশবাবু যখন ম্যানেজার, সঙ্গে আমিও আছি, তা হবে সেটা ১৯১৫-১৬ সাল। ধরা হয়েছিলো নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের লেখা 'লক্ষ্মণসেন' নাটক। তাতে আমরা প্রথম করেছিলাম ঐ ধুতি-পরার ব্যবস্থা। ধুতি আর ভেলভেটের হাফজামা।

বললাম—হ্যাঁ, আপনাদের ওখানে 'উর্বশী'তে ওরকম পোশাক দেখেছিলাম বটে। তার আগে, ১৯১৮ সালের কথা, আপনাদেরই কর্তৃত্বে চলছে তখন মিনার্ভা, দেখেছিলাম "কিন্নরী'। তাতেও ঐ ধুতি আর ভেলভেটের হাফজামা। কিন্তু এখন ঐ হাফজামাটা আর চলবে না।

—কী করা যায় বলুন দেখি?

'সোল অফ এ প্লেভ' তখন মাথায় ঘুরছে। বলে ফেললাম—ধুতি আর উত্তরীয় করুন। খালি গা।

প্রবোধবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। প্লের দিন সারা গায়ে তাহলে অভিনেতাদের রঙ্ মাখতে হয়। যাদের দেহসৌষ্ঠব আছে, তাদের দেখাবে সুন্দর, কিন্তু যাদের তা নেই? পুরানো যাঁরা আছেন, অভিনয় করছেন বহুদিন ধ'রে, তাদের একটু বয়সও হয়েছে, সেই কারণে দেহসৌষ্ঠবও সবার নেই। প্রবোধবাবু বললেন—ভেবে দেখি।

গয়নার কথায় 'সোল অফ এ শ্লেভ'-এর ব্যাপার যা' বললাম, তা-ই অবশ্য প্রবোধবাবু গ্রহণ করলেন, অমত করলেন না। বললেন—দাঁড়াও, কালই ডিজাইন করে তোমাকে দেখাচ্ছি। আসবে কাল দুপুরে?

—নিশ্চয়ই।

পরেশ বসু (পটলবাবু) তখন স্টেজের সঙ্গে আর সংশ্লিষ্ট নেই, তিনি যা' করবার করে রেখে চলে গেলেন। এখন আছে নারায়ণ, তা, সে-ই ডিজাইন-টিজাইন করে। আর ছিল মানিকলাল দে স্টেজ-ম্যানেজমেণ্টে। অতি উৎসাহী যুবক। প্রবোধবাবু তাকেই ডেকে পাঠালেন, বললেন—মানিক, কাল নারায়ণকে সকাল-সকাল আসতে বলো ত? ইনি আসবেন। কাজ আছে।

যথারীতি গেলাম পরদিন দুপুরবেলা। প্রবোধবাবু বললেন—তুমি যেমন বলেছিলে, গয়নার ডিজাইন তেমনি করে দু'চারটে আঁকিয়ে রেখেছি, এই দেখ।

—সুন্দর হয়েছে।

প্রবোধবাবু বললেন—কিন্তু, জামার কী করি?

বললাম এক কাজ করুন। পাতলা কাপড়ের জামা করুন। তাতে গায়ে পেণ্ট্ করার হাত থেকে বাঁচা যাবে। একরঙা জামা হবে সব। গলায় আর হাতায় দিন জরির পাড়, না দিলেও ক্ষতি নেই।

—মন্দ নয়।

এই সব আলোচনায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রবোধবাবু তখন বললেন—আচ্ছা, তুমি রিহার্সালে যাও, আমি একটা নমুনা হিসাবে করিয়ে দেখছি, কী দাঁড়ায়?

বসলাম গিয়ে রিহার্সালে। দেখি বসে আছেন অপরেশবাবু। এক সময় নরেশবাবু এসে ওঁর কানে কানে কী যেন বললেন। উনি উত্তরে মাথা নেড়ে জানালেন—আচ্ছা।

বেরিয়ে গেলেন নরেশবাবু, এবং কিছুক্ষণ পরেই ঢুকলেন তিনি, সঙ্গে এক সুদর্শন যুবক। মধ্যম দৈর্ঘ্য। গায়ে একটা ডোরাকাটা ছিটের শার্ট, হাতে ছাতা। জিজ্ঞাসা করলেন অপরেশবাবু—থিয়েটার করেছ?

আমতা আমতা করে উত্তর দিল যুবকটি—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে গ্রামাঞ্চলে। অ্যামেচার।

নরেশবাবু বললেন—আমাদের ফিল্ম 'চন্দ্রনাথ'-এ নায়কের পার্ট করছে।

—কী নাম?

যুবকটি বিনীতভাবে বললে—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপরেশবাবু ওকে দিয়ে একটু বলিয়ে দেখলেন। কণ্ঠস্বর ভালো। পছন্দই হল তাঁর। বললেন—বেশ। কাল থেকে এসো। আসবে ত বটে, কিন্তু পার্ট করবে কী? প্রায় সব পার্ট ত বিলি হয়ে গেছে। ছিল ছোট একটা পার্ট—বিকর্ণ। ঠিক হল, ঐ বিকর্ণ-র পার্টই ও করুক।

তা-ই হয়েছিল। ঐ 'বিকর্ণ' হয়েই প্রথম রঙ্গাবতরণ দুর্গাদাসের। এবং ঐ ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়েই সে জয় করে নিয়েছিলো দর্শক-চিত্ত। কিন্তু, যেদিনকার কথা বলছিলাম, সেদিনকার কথাতেই ফিরে যাই। রিহার্স্যালের পর—তখুনি বাড়ি না গিয়ে—ওপরে উঠে এলাম। রাত হয়ে গেছে। তা হোক, আমাকে পেয়ে বসেছে তখন কাজের নেশায়। দেখি, জামার ডিজাইন নারায়ণ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। খুবই ভালো লাগল।

প্রবোধবাবু বললেন—এইবার মেয়েদের কথা। মেয়েদের কী হবে? তোমার আইডিয়া মতো নীবীবন্ধ, কুচবন্ধ, মেখলা, উত্তরীয়, অথচ জামাটামা নেই—এ পরতে চাইবে না মেয়েরা। শাড়ি, কাঁচুলি,—এসবই করতে হবে।

মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হল। হবে না সেই মূর্তি, হাঁটু পর্যন্ত মেখলা, কোমরে নীবীবন্ধ, আর বক্ষদেশে শোভা পাচ্ছে কুচবন্ধ শুধু?

প্রবোধবাবু বললেন—কালও দুপুরে এসো। বাজারে বেরুতে হবে। কেনাকাটা আছে।

পোশাকের সরঞ্জামাদি কেনার যে-সব ঘাঁটি ছিল, তার খবর বিলক্ষণ জানতেন প্রবোধবাবু। যাত্রার আমল থেকে ফিল্ম করার সময় পর্যন্ত আমিও ও-বিষয়ে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা-ও এখন কাজে লাগলো। দুজনে মিলে, একদিন নয়, উপুরি-উপুরি তিন-চার দিন বাজারে ঘুরে বেড়িয়ে কিনে আনলাম সব কাপড়-চোপড়। মেয়েদের জন্য সিল্কের কাপড়। ছেলেদের জন্য অর্গ্যাণ্ডির থান। আর আনলাম নানারকম জরির পাড়—দিল্লী, হায়দারাবাদ, লক্ষ্ণৌর কামদানি। জরির ঝালর, জরির বল-ফ্রিঞ্জ—নানান আকারের। গয়নার জন্যে নিয়ে এলাম মুক্তো। চুনী-পান্না-হীরের মতো দেখতে এক ধরনের পাথর। পাথরগুলোর নীচে ধাতুনির্মিত 'Cone'—তার আঁকড়ি দিয়ে পাথরটাকে আটকে রাখা। এবং ঐ পাথরের সেটিংগুলি সরু চেন দিয়ে গাঁথা—কাটা যেত যেখানে খুশি। এগুলোকে বলত—'কলেট'। এগুলিকে কেটে, মনের মতো করে গয়না তৈরি করা কঠিন ছিল না। শুধু ভেলভেটের গোল চাকতি কেটে তার ওপর বসিয়ে দিলেই হল। কাপড়ের ওপরেই হোক, কিম্বা পিজবোর্ডের ওপরে ভেলভেট মুড়ে, নানান আকারের, নানান রকমের কারুকার্যসম্বলিত। আরও একটি দ্রব্য কিনেছিলাম, সেটি 'টুইঙ্ক' রঙ, কাগজের বাক্স-করা খাপের ভিতর সাজানো অবস্থায় বিক্রি হত, বিচিত্র সব রঙের। এত রঙের পাওয়া যেতো যে বলবার নয়! গরম জলে ঢেলে নাড়তে নাড়তে—মিশে যেতো। যে কাপড় রঙ করা হত, ঠাণ্ডা জলে তা ভিজিয়ে নিয়ে তারপরে বেশ করে নিংড়ে, সেটা রঙের মধ্যে ছুপিয়ে নেওয়া হত। তাতে ফল পাওয়া যেতো চমৎকার। যে-সব অর্গাণ্ডির থান এনেছিলাম, সেগুলি মনের মতন করে নানান রঙে ছুপিয়ে নেওয়া গেল। হাত-কাটা জামা, চাদর—পরস্পর রঙের কমবিনেশন করে মিলিয়ে নিয়েছিলাম, অর্থাৎ কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রঙ মানায়, এটার প্রতি লক্ষ্য রেখে রেখে। কোমরের জন্য ছিল সিল্ক ও ভেলভেটের জরির ঝালর-বসানো কোমরবন্ধ।

রিহার্স্যালের পর প্রবোধবাবু আর আমি মেতে যেতাম এই রঙ-করার কাজ নিয়ে। অর্থাৎ

রাত এগারোটা-বারোটার পর আমাদের শুরু হত এ-সব কাজ। কাপড় রঙ-করা, এবং তারপর ছাদে শুকুতে দেওয়া। মেয়েরাও দেখি উৎসাহিত হয়ে বসে গেছে ছাদে গয়না তৈরি করতে। হঠাৎ দেখলে মনে হতো ছাদে যেন এক কারখানা বসে গেছে। অক্লান্ত কর্মী ছিলেন প্রবোধবাবু। সারাটি বেলা আর রাত্রে—সমানে খেটে চলেছেন। সকালে কোনো কোনোদিন চলে আসতাম একেবারে নটা-দশটার সময়। সেই থেকে রাত তিনটে চারটে পর্যন্ত। ইন্দু বসে বসে ঝিমুতো, আর মাঝে মাঝে বলে উঠত—এবার চলো না, কাল অফিস আছে।

বলতাম—তুমি তিনকড়িদার সঙ্গে চলে গেলেই পারো?

না, তা ও যাবে না। সেই যে যাত্রার সময় থেকে অভ্যাস, ও আমার নিত্য সঙ্গী। যেখানেই একসঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে বাড়ি ফেরা চাই। কিন্তু যা বলছিলাম। প্রায়-ভোরে বাড়ি এসে ন'টা সাড়ে-ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে আবার চলে আসব। এই ত চলেছে। খাওয়া হতো প্রবোধবাবুর খাবারের ভাগ থেকেই। কাজের চাপে উপর্যুপরি তিন-চার দিন স্নানই করতেন না প্রবোধবাবু। পোশাকের ওপরে, গলায় তোয়ালেটা জড়িয়ে নিয়ে মাথায় জল ঢেলে নিতেন শুধু। শুনলাম, এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস—সেই অফিসের কার্যকাল থেকেই। তাঁর খাবার আসত টিফিন ক্যারিয়ার করে।

সকালেও মহলা দিচ্ছি, একক মহলা বলা যায়। রাতের মহলাই হতো সদলবলে। ধনুর্বিদ্যাটা আমার আয়ত্তে এসেছে, কিন্তু ঐ রথ থেকে পড়ে যাওয়াটা ঠিক সাবলীল হচ্ছে না এখনো। 'পতন ও মূর্ছা' কথাটা উচ্চারণ করা যতো সহজ, দেখানোর ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এবং আমার মতে, অবহেলার বস্তুও নয়। অবশ হয়ে, অর্থাৎ সর্বাঙ্গ শিথিল করে অপূর্ব পড়ে-যাওয়ার একটি দৃশ্য আমি দেখেছিলাম—দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় সামাজিক নাটক 'বঙ্গনারী'তে। অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা—১৯১৬ সালের কথা—ঐ মিনার্ভাতেই। পরিবারের প্রথমা 'বিনোদিনী'র ভূমিকায় নেমেছিলেন—তারাসুন্দরী। বিনোদিনী ছিল বাল বিধবা—এবং সুন্দরী। তার ওপরে দৃষ্টি পড়ে একজন প্রৌঢ় ধনী ব্যবসাদারের—নাম তার যজ্ঞেশ্বর। বিনোদিনীর জ্যেঠামশাই ছিলেন যাকে বলে এক 'ভক্ত-বিটেল গুরু'। তাঁকে টাকা খাইয়ে কৌশলে একদিন উক্ত ভক্ত-বিটেলেরই বাড়িতে বিনোদিনীকে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ জ্যেঠামশাই নিজেই বিনোদিনীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে, ঘরে বসে কথা কইতে কইতে হঠাৎ বাইরে গিয়ে ঘরের শিকল দিয়ে দিলেন। বিনোদিনী আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, দরজায় ঘা মারতে লাগলেন। এমন সময় সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করলেন যজ্ঞেশ্বর, ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিলেন। অত্যাচারীর সামনে ভয়ে কাঁপতে লাগলো বিনোদিনী। যজ্ঞেশ্বর ওর হাত ধরে টানলেন—বিনোদিনী এগিয়ে গেলেন দু-পা। তারপরে একটা লতাকে হঠাৎ কেটে দিলে যেমন সে ধীরে নেতিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি করে নেতিয়ে পড়লেন তারাসুন্দরী। যজ্ঞেশ্বর সাজতেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। নগেন্দ্রবাবুর হাতের ওপরে অবশ্য ওর দেহের

কতখানি ভার ছিল জানি না, কিন্তু এমন সাবলীলভাবে পড়ে-যাওয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করবার মতো। সারা শরীরের ওপর অদ্ভুত কণ্ট্রোল, সর্বাঙ্গ শিথিল করে দেবার অপূর্ব ভঙ্গিমা! দেহের সমস্ত পেশী আর স্নায়ু রীতিমতো আয়ত্তে।

বার বার মনে পড়ছে, কিন্তু নিজে ঠিক সেরকমটি এখনো পারি না বলে আক্ষেপ হচ্ছে মনে। বইতে পড়েছিলাম, বিলাতী থিয়েটারেও মিসেস সারা সিডনস-এর কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হবে সময়টা। উনি ছিলেন তখনকার দিনের সুবিখ্যাত লেডী ম্যাকবেথ। সম্ভবত 'রো'-এর 'ট্যামারলেন' (বাংলায় নামটাকে 'তৈমুরলঙ' বলতে পারি)-এর নাটকেরই ঘটনা। মিসেস সিডনস আর তাঁর প্রণয়াস্পদকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছে অত্যাচারী 'ট্যামারলেন'-এর সামনে। 'ট্যামারলেন' বিজয়ী যোদ্ধা, তিনি আজ্ঞা দিলেন সিডনসের সামনেই তাঁর প্রণয়াস্পদকে হত্যা করা হবে। সেকথা শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন সিডনস,ব্যাকুল হয়ে বিজয়ী যোদ্ধার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন প্রণয়ীর। দেহ তাঁর থর থর করে কাঁপছে, দেখতে দেখতে সারা শরীর শিথিল করে দিয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। দৃশ্যটি এতো জীবন্ত হয়েছিল যে, দর্শকবৃন্দ, সিডনস সত্যি-সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে করে, উঠে দাঁড়িয়ে "পর্দা ফেলো—পর্দা ফেলো, ডাক্তার ডাকো, উনি সুস্থ আছেন কিনা দেখো। ম্যানেজারকে ডাকো"—বলে কলরব করতে করতে মঞ্চের সামনে এসে জমায়েত হলেন। অগত্যা পর্দা ফেলে দিয়ে ম্যানেজার এলেন দর্শকদের সামনে। এসে বললেন—'সুস্থই আছেন। তবে হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এই যা।' নিশ্চিন্ত হলেন দর্শকবৃন্দ।

এই সব আদর্শ আমার সামনে, কিন্তু আমার ধারণামতো সেই যথার্থ শিথিল ভাব কিছুতেই আসছে না। চেষ্টা করতে করতে একবার হয়ত হলো, কিন্তু আবার হলো না, যেন কৃত্রিম হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু তাহলে ত চলবে না। এটা আমাকে অচিরেই আয়ত্ত করতে হবে।

ওদিকে, অন্যান্য ভূমিকার মহলাও চলছে। তার মধ্যে 'কুন্তী'-সমস্যার কথা কিছু বলেছি, সবটা বলা হয়নি। সরযূও যখন পারল না, তখন তারাসুন্দরীকে নিয়ে এলেন অপরেশচন্দ্র, কিন্তু তিনিও করলেন না। অপরেশচন্দ্র পুরাতন এবং অভিজ্ঞ থিয়েটার-ম্যানেজার, তিনি তদানীন্তন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-দক্ষতা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বললেন—মোনা এখন কোথায়? কাপ্তেন মোনা? সে এ-পার্ট পারবে।

কাপ্তেন মোনার নাম আসলে—মনোরমা। মনোরমার দিদিমা ছিলেন পয়সাওয়ালা মানুষ। তদুপরি মনোরমা নিজেও অনেক টাকা করেছিলেন বহু রাজা-মহারাজাদের সেবা করে, কিন্তু এ-টাকা সে দুহাতে ব্যয় করত বলে তার নামের আগে 'কাপ্তেন' শব্দটি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মিনার্ভায় আগে সে অভিনয় করতো। হাবুল তাকে দেখেছে। এই হাবুল, অর্থাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কথা পরে আরও বলতে হবে। আর্ট থিয়েটারের সাফল্যের মূলে তার নেপথ্য অবদানও কম নয়।

খবর গেছে যথারীতি মনোরমার কাছে। এলো সে। দেখলাম হ্যাঁ সুন্দরী। অন্তত অল্পবয়সে

সে রীতিমত সুন্দরী ছিল, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। এখন দেহে ঈষৎ স্থূলতা এলেও সে সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়নি। 'চিরযৌবনা কুন্তী' মানাবে বটে একে। অপরেশবাবু দেখলেন ভালো করে। বললেন—দুপুরবেলায় এসো। পার্টটা একটু বলিয়ে দেখব।

তারপর সে চলে যেতে, আমাদের দিকে ফিরে বললেন অপরেশবাবু—এতো বড়োটা ও পারবে না, পার্টটা একটু কেটে বাদ দিয়ে বলাতে হবে।

তাই হলো। 'কুন্তী'র ব্যবস্থা ত হলো, এবার দাঁড়ালো এসে 'বিদুর'-এর সমস্যা। বিদুর বয়স্ক ব্যক্তি, চেহারা হওয়া দরকার—শান্ত ও সৌম্য। তার ওপরে 'গান' আছে, তাঁকে হতে হবে সুকণ্ঠও। ঠিক এরকম লোক কোথায়? কিছু খোঁজাখুঁজির পরই নজর পড়লো জানকীনাথ বসুর ওপরে। ইনি কলকাতা কারেন্সীর দেওয়ান রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর পুত্র। বৈকুণ্ঠবাবু নিজে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, ভালো পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। জানকীবাবুও সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এই জানকীবাবুই দিয়েছিলেন 'কর্ণার্জুন'-এর সব সুর। অপরেশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ইনি। নাটক লেখার ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের লিপিকার যেমন ছিলেন অবিনাশবাবু, অপরেশবাবুর তেমনি লিপিকার ছিলেন ইনি। আমাদের প্রস্তাবে ইনি প্রথমে ত 'না-না' করতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন সবার অনুরোধে। বললেন—রাজী আছি, তবে একটি শর্ত।

—কী?

—দুই বুড়োই তাহলে একসঙ্গে নামব।

বিপুল অভিনন্দনধ্বনির মধ্যে সম্মতি দান করলেন অপরেশচন্দ্র। বললেন—জামদগ্ন্য বা পরশুরামের ভূমিকাটি অভিনয় করবো'খন।

আমরা এতে সবাই খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত হলাম।

আরেকটি ক্ষুদ্র অথচ কঠিন ভূমিকা ছিল 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ।' এটার জন্য হাবুলই তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু ডিরেক্টররা দেখে-টেখে শেষ পর্যন্ত বললেন—এ-দৃশ্যে শকুনি ত নেই, নরেশবাবু ঐ পার্টটিও করে দিন না কেন?

তা করেছিলেন নরেশবাবু প্রথম অনেক রাত্রি ধরেই। খুবই ভালো করেছিলেন। পরে অবশ্য হাবুলই আবার ওটা করতে লাগল।

এইভাবে মহলা যখন জম-জমাট অবস্থায় চলছে, আমি হঠাৎ একদিন ঘটিয়ে বসলাম এক বিভ্রাট। দৃশ্যটা ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য। তুলসী দুঃশাসনের ভূমিকায় যে ক্রূর অভিব্যক্তি এবং ভঙ্গিমায় দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল ধরে টানবে, সেই পোজ্ অর্থাৎ কোথায় দাঁড়াবে, কীভাবে টানবে, এটা ঠিক পারছিল না বলে, অতি উৎসাহের বশে নিজেই উঠেছিলাম দেখিয়ে দিতে। দ্রৌপদীর ভূমিকায় ছিল নিভাননী এবং পরনে সেদিন তার ছিল একটি দামী ঢাকাই শাড়ি। তখনকার শাড়ি-পরার ধরন অনুযায়ী তার আঁচলটা ছিল কাঁধের সম্মুখভাগে ব্রোচ্ দিয়ে আটকানো। আমি সে-সব খেয়াল

না করে যথাযথ 'পোজ' দিয়ে উৎসাহের আবেগে আঁচলটা টানতে গেছি, অমনি সেটা ব্রোচের পিনে টান পড়ায় ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল—বেশ খানিকটা! আমি ত মহা অপ্রস্তুত। তার ওপরে নিভাননী আমার প্রবোধবাবুর কাছে গিয়ে রহস্যচ্ছলে বললে—আপনাদের অর্জুন, দুঃশাসন হলে বলার কিছু ছিল না, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে গিয়ে আমার শাড়ি দিয়েছেন ছিঁড়ে! আমি ত লজ্জায় পড়লাম আরও। মেয়েদের সঙ্গে তখনো আলাপ-সালাপ হয়নি আমার। এক নীহারবালা আমাদের গয়না-টয়না তৈরি করার ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতেন বলে, ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ হয়েছিল। সুতরাং নিভাননীর কথায় মেয়েরা যখন একযোগে হেসে উ:ল সকৌতুকে, হেসে উঠলেন প্রবোধবাবু, তখন আমার মনে হলো, হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি পাতালের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ করি!

এ তো গেল অভিনয়াংশের ব্যাপার। নাচ এবং গানের সুরের কথাও আছে। স্টারে যেরকম অবস্থা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে নতুন আর্ট থিয়েটারের উদ্ভব, সে অবস্থায় এসব দিক দিয়ে তেমন ভালো লোক ছিলেন না তখন। স্টেজ-ম্যানেজার পটলবাবু নেই। অপেরা মাস্টার ভূতনাথ দাসও চলে গেছেন; তাঁর কাজ চালিয়ে নেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য। সুর অবশ্য জানকীবাবুর। কিন্তু নাচ? নাচের ভালো মাস্টারও নেই, যিনি ছিলেন, তাঁর নাম—ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শখের দলটলে নাচ দিয়েছেন, নিজেও নেচেছেন, সেদিক থেকে যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে, কিন্তু, কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। দেখে শুনে অগত্যা এই আমরা স্থির করলাম, একখানা গানে একটু নাচে থাকবে, এছাড়া—অন্যান্য গানের সঙ্গে—পুরামাত্রায় নাচ না দিয়ে, নাচের ভঙ্গিমা মাত্র দেওয়া হোক। তা না'হলে, এই যে চলতি থিয়েটারের নাচ, এর সঙ্গে পৌরাণিক আবহাওয়া ও সুরের সঙ্গে কিছুতেই সামঞ্জস্য থাকছে না। আমরা পায়ের কাজের থেকে, হাবভাব ও অঙ্গসঞ্চালনের ওপরেই জোর দিতে বললাম বেশী করে।

প্রস্তুত হলো মহলা। সেটের দিক থেকে পটলবাবু সব-কিছু করে যাওয়া সত্ত্বেও, যা টুকরো কাজ বাকী ছিল, তা দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল। আলোর ব্যাপারে ইলেকৃট্রিশিয়ানরা ছিল তখন মাত্র চারজন, অল্পবয়স, কিন্তু প্রচুর উৎসাহী। তখনো আর্ট থিয়েটার শুরু হয়নি, পুরোনো স্টারেরই শেষ অবস্থা, আমরা আসি প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তখন দেখতাম, এই ছেলেমানুষ ইলেকৃট্রিশিয়ানরাই ট্রেতে প্লেট বসিয়ে চপ-কাটলেট্ দিয়ে যেতো।

প্রবোধবাবুকে বলতাম—রোজই যে এভাবে খেয়ে যাচ্ছি, এর অর্থ কী?

—অর্থ কী?—প্রবোধবাবু একটু হেসে বলতেন—আমাদের টিফিন ক্লাব হয়েছে। চাঁদা দিয়ে চলে। হোটেলের খবার-দাবার ত বিষ, তাই এই ব্যবস্থা। বেটাছেলেরা অবশ্য এ ক্লাবের খাবার খায় না, তবে মেয়েরা খায়। আর খাই আমরা, থিয়েটারের কর্মীদল।

বলতাম—তা' বলে আমরাও রোজ এসে এভাবে বিনা পয়সায় খাবো?

প্রবোধবাবু বললেন—এখন ত খাও। যখন দলে আসবে পাকাপোক্তভাবে, তখন ত মেম্বার হবেই, তখন চাঁদা দিও।

মনে পড়ল এইসব পুরোনো কথাগুলি। দলে ত এখন আছিই পাকাপাকিভাবে, তবে এখনো ঠিক এরকমটা চলছে কেন? খাওয়া-দাওয়া চলেছে, কিন্তু কই, চাঁদা ত কেউ এসে নেয় না। পরে বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে প্রবোধবাবুরই খরচা, চাঁদার ব্যাপারই নেই। খাবার গুলি তৈরি করতো ঐ উৎসাহী ইলেকট্রিশিয়ানরা নিজেরাই। পরে দেখেছি, প্রবোধবাবু নিজের হাতেও মাঝে মাঝে করতেন। কতরকম খাবার যে শখ করে রেঁধে খাওয়াতেন, সে তখনকার যাঁরা আমার মতো বেঁচে আছেন, তাঁরাই মনে করতে পারবেন।

আলোকসম্পাতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তখনকার দিনে আজকের মতো সুযোগ সুবিধা ছিল না। রঙীন বাল্ব ও জিলেটিন কাগজ তখন পাওয়া যেত না। ল্যাকারের রঙ খুব পাওয়া যেতো, এইটুকু ছিল সুবিধা। রঙ কিনে এনে তাতে বাল্ব চুবিয়ে রঙ করে নিতে হতো। রঙে বাল্ব চুবিয়ে দিয়ে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে নিতে হতো সর্বক্ষণ ধরে, যাতে জমে না যায়। ফুট্‌লাইটে সাজানো হতো লাল নীল, সবুজ আর অ্যামবার (ঈষৎ লালচে হলুদ)। মাথার ওপরে আলো সাজাবার জন্য যে 'ঝারী' থাকত, তাতেও থাকত অনুরূপ রঙের বাল্ব। গ্রুভ্-এর থাকত এক সার আলো। প্রসেনিয়ামের ধারে—সরাসরি—অর্থাৎ দাঁড়াভাবেও থাকত আলোর সারি। প্রত্যেক সারিতেই রঙীন বাল্ব। যখন যে দৃশ্যে যে রঙ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো, সুইচ বোর্ডে সুইচ টিপে মাত্র সেই রঙের বাল্বগুলিই জ্বালানো হতো। তাছাড়া, আরও আলো ছিল। মাটিতে শুইয়ে রাখা আলো, নানারকম আলো। টিনের কেস করা ছিল সিনের পিছনে রাখার জন্য। যাতে করে, জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে, আলো আসছে, এটা বোঝানো যায়। কেসে ব্যবহার করা হতো সাধারণত বেশী পাওয়ারেরই বাল্ব। প্রসেনিয়ামের পাশে ছিল 'ব্রীজ', সুইচ বোর্ডে রাখবার জন্য। আর্ক ল্যাম্পও ছিল। বাংলা থিয়েটারে সম্ভবত এর প্রথম প্রচলন হয় ১৯১৬ সালে মিনার্ভাতে—অপরেশবাবুর "রামানুজ" নাটকের সময়ে। ঐ দিয়েই ফোকাস্ করা হতো। তখন অবশ্য অল্পই ব্যবহৃত হতো। আর্ট থিয়েটারের আমলেই দেখা গেল এর বহুল ব্যবহার। স্পটলাইটের কাজ সিনেমার ক্লোজ আপের কাজ করে। কিন্তু মুশকিল হতো এই যে, ভিতরের দুটি কার্বন মুখোমুখি হবার আগেই একটা 'হিস' শব্দ হতো। তার ফলে নাটকীয়তা হতো নষ্ট। বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তটি নাটকীয়ভাবে এসে চমক দেবার আগে ঐ 'হিস' শব্দই সমস্ত প্রস্তুতিটিকে মাটি করে দিতো। তারপরে আলোও হতো বড্ড জোর, চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। আমরা ঐ অত্যুজ্জ্বল সাদা আলোর ফোকাসে আপত্তি করলাম। বললাম—দৃশ্যের রঙ অনুযায়ী ফোকাস্ করতে হবে। তখন কনডেনসারের সামনে একটা ভেনেস্তার টিন দিয়ে ঢাকা দেওয়া রইল, যাতে করে আলো প্রক্ষেপটাকে স্থির রেখে—ভেনেস্তার ঢাকা তুলে নিলেই অবজেক্ট-কে সোজাসুজি হিট্ করতে পারে। আর ওরা করল কী, বাড়ির শার্সীর জন্য তখন যে-সব রঙীন কাচ বিক্রি হতো বাজারে, তা মাপ মতো কিনে এনে ওখানে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতে সুবিধা হলেও বিপদও ছিল একটা। কাঁচ তেতে উঠে দু' এক দিন পরে ফট্ করে ফেটে যেতো। ঠিক কখন ফাট্‌বে

জানা নেই, নীচে মানুষ থাকলেই মুশকিল। তাই ওরা করল কী, কনডেনসারের নীচে, সামনের দিকে বার-করা ব্রাকেট তৈরী করল, তাতে জাল দিয়ে ছাওয়া। কাঁচ ভেঙে গেলে আটকে থাকবে ঐ জালে।

যাই হোক, আমরা ত এদিকে প্রস্তুত হয়ে গেছি। ডিরেক্টরেরা বললেন—আর দেরি কিসের? বই খুললেই ত হয়। কিন্তু বাড়িটা তখনো হয়নি। মেঝে অবশ্য তৈরি হয়ে গেছে। তখন বাংলা থিয়েটারে কনসার্ট বাজাবার পীট ছিল না। প্রায় সব থিয়েটারের ছিল থাম ও খিলেনওয়ালা প্রসেনিয়াম। তখনকার দিনে স্টেজের সামনে একটা পাকা বিরাট প্রসেনিয়াম গাঁথা থাকত। সেই পাকা প্রসেনিয়ামের দু' পাশে দুটি খিলান থাকত পাটাতনের ওপর, দু'দিকে দুটি থাম দিয়ে অলঙ্কৃত করা এবং পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা—আবশ্যক হলে প্রবেশ-প্রস্থানও করা যেতো। এরই মাথার ওপর ছিল একটি ডিম্বাকৃতি হাফ-বারান্দা, তার পিছনেও আবার ছিল খিলেন। আবার সে খিলেনগুলিও অনুরূপভাবে থাম দিয়ে অলঙ্কৃত করা এবং সর্বোপরি ছিল দু'তিন থাকের কার্নিস দিয়ে শোভামণ্ডিত করে রাখা। এবং তারও ওপরদিকে মূল প্রসেনিয়ামের খিলেনটি ডানদিক থেকে উঠে বাঁদিকের প্রসেনিয়ামে গিয়ে মিশেছে। তার ওপরের স্থানটুকু সোনার জল দিয়ে নক্সা করা। ঐ যে হাফ-বারান্দা ওরই পিছনের খিলেনে বসে কনসার্ট বাজাতো। ঐ খিলেনও পর্দা দিয়ে মালার আকারে সাজিয়ে রাখা। মনোমোহনে দোতলা প্রসেনিয়াম ছিল না বলে, কনসার্ট বাজাতো বাজিয়েরা প্রেক্ষাগৃহের এক পাশে বসে। আমাদের এখানে এবার হলো পীট।

আমাদের হলো কী, দুধারে হলো সোজা সাজানো, তার পিছন থেকে আগাগোড়া, একেবারে শেষ সারিটি পর্যন্ত 'টিপ-আপ' চেয়ার বসানো, সামনের গুলিতে গদী আঁটা, পিছনের গুলিতে শুধু কাঠ। সিট্ রিজার্ভ করে রাখা চলত আগে থাকতে। এটি হলো নতুন নিয়ম। ওপরেও মেঝে তৈরি হয়ে গেচে। ঢালাই হয়ে গেছে বক্সের জায়গাগুলি। রয়্যাল বক্সের পিছনে যে লবীমতন ছিল, সেটা অবশ্য কাঠেরই রয়ে গেল। বক্সের সামনে রেলিং বসিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি, কিন্তু তাতে যে ভেল-ভেটের হাতল ইত্যাদি করার কথা ছিল, তা তখন আর হলো না। কিন্তু পরের সপ্তাহে হয়ে গিয়েছিল। তেতলার পরিবর্তন অবশ্য বিশেষ কিছু হয়নি। বাড়ি রং করা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যস্থলে—মাথার ওপরে—গোল ডুম ছিল, প্যানেল করা। টিনের ছাঁচ দিয়ে খরমুজার মতো করে ভাগ করা। এক-একটি প্যানেলে এক-একটি বিলাতী ছবি আঁকা ছিল, কিন্তু বহু দিন কেটে যাওয়ায়, ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তারা। সেগুলিকে আবার রং দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। পটুয়া দিয়ে আঁকানো হচ্ছে সেগুলি। তারা ভারা বেঁধে মাচা করে, ওসব এঁকে চলেছে। এ' ঠিক তাড়া দেবার কাজ নয়। যতোরকম শিল্পকলা আছে, তারই ছবি 'নাইন মিউজ' বা ৯টি শিল্পের ৯ জন গ্রীক দেবী।

কথা ছিল ৩০শে আষাঢ়—১৫ই জুলাই রথযাত্রার দিন বই খোলা হবে। এই দিন যদি খোলা হতো, তাহলে বাড়ির কাজ সবই যেতো শেষ হয়ে। কিন্তু ডিরেক্টররা অভিনয়ের সব তৈরি দেখে আর

দেরি করতে চাইলেন না, দিন স্থির করেছিলেন—১৫ই আষাঢ়—৩০শে জুন (১৯২৩), শনিবার। ক্রমাগত ছ'মাস ধরে মহলা চলবার পর এইবার অভিনয়। আমরা ভিতরে-ভিতরে যথেষ্ট উত্তেজিত বোধ করছি। বাড়ির যে সব জায়গায় খামতি ছিলো, সেখানে-সেখানে নানান রঙের কাপড় দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের তরফ থেকে কেবল হলো না, মাথার মুকুট। ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনের মুকুট হয়েছিল আর কারুর মুকুট হলো না তাড়াতাড়িতে। যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন ছিল মুকুটের, কিন্তু হলো না। পায়ের জুতো কিন্তু হয়েছিল, বাকীগুলি না হওয়ার দরুণ খুব লম্বা শুঁড়ওয়ালা নাগরা কিনে আনা হলো। থিয়েটারের যা আচরিত ব্যাপার, যা প্রথম হয় না, তা আর হয় না কোনও দিন। মেয়েরা তৈরি করে দিয়েছিলো পাথরের খামি সুদ্ধু মুক্তোর বেড় তাতে ছোট ছোট পালক গোঁজা, কোনটি পাটির আকারের, কোনটি অন্য ডিজাইনের—এ সবই আমরা মাথায় পরেছিলাম। কোথাও-বা সাদা মুক্তোর বদলে নীল-লাল পাথর দিয়ে সাজানো। মুক্তোও অবশ্য আসল মুক্তো নয়। কানেও পরলাম পাথর। কানে-পড়ার পাথর কিছু হয়েছিল আমাদের কাঁসারী-পাড়ার তৈরী পেতলের ক্লিপ দেওয়া স্ক্রু সাহায্যে। অবশ্য, ও-জিনিস বেশী তৈরি করতে তখন পারেনি, ৫।৬টা করিয়েছিলাম মাত্র 'সোল অব এ স্লেভ-'এর মতো আমরাই পরলাম ও'গুলি। আর বাড়তির মধ্যে আমি পরলাম 'সোল অব এ স্লেভ'-এর 'ধর্মপাল'-এর পরা সেই শাঁখের মালাখানি। প্রফুল্লকে বলে নিয়ে এসেছিলাম ওটা। মেয়েদের মধ্যে 'নিয়তি' রূপিণী নীহারবালার অবশ্য সাজসজ্জার আড়ম্বর কিছু ছিল না। যেহেতু চরিত্রটি অনেকটা 'প্রতীকী' চরিত্র, সেই হেতু ওর পোশাক নিয়ে "নানা মুনির নানা মত" দেখা দিয়েছিল। কারুর মত—এই অবাস্তব চরিত্রটিকে ফোটাতে হলে 'ম্যাকবেথের' ডাইনিদের মতো পোশাক পরিধান করানো কর্তব্য। কেউ টেনে আনলেন—'ফাউস্ট'-এর উদাহরণ। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করলেন অপরেশচন্দ্রই। তিনি স্থির করলেন বাসন্তী রঙের লালপাড় শাড়ী পরবে নিয়তি। সে থাকবে নিরাভরণ। হাতে মাত্র শাঁখা আর লাল কড়। নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি। কুন্তল থাকবে না বেণীবদ্ধ, মুক্ত কেশকলাপ থাকবে তার পৃষ্ঠদেশে ছড়ানো।

হলো সবই এরকম, শুধু হলো না অর্কেস্ট্রা। অর্থাৎ দেশী অর্কেস্ট্রা। বাঁশী এবং কর্নেটওয়ালা বাজনা আমরা দেবো না ঠিক করেছিলাম, খুঁজছিলাম, স্ট্রিং ইন্‌স্ট্রুমেণ্টর অর্কেস্ট্রা। তাড়াতাড়িতে সুবিধামতো কাউকে না পাওয়ায়, নিযুক্ত করা হলো বউবাজারের বিখ্যাত অর্কেস্ট্রাবাদক সি-লোবোকে। সি-লোবো বহু ইংরেজী হোটেলে ও প্রীতি অনুষ্ঠানে বাজিয়ে সেই সময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জনবিশেক লোক নিয়ে গঠিত এই দল যখন দর্শকের সম্মুখস্থ অর্কেস্ট্রাপীটে বসে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতে ঝংকার তুলতেন, তখন, কী দর্শকের মধ্যে, কী অভ্যন্তরস্থ অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অদ্ভুত এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হতো।

অবশ্য একদিক থেকে দেখতে গেলে, এ হলো এক সামঞ্জস্যহীন ব্যাপার। নাটক-পৌরাণিক,

সি লোবো—গোয়ানীজ। যদিও তারা দেশী সুরই বাজাচ্ছিল, তবুও তার মধ্যে একটু-আধটু বিদেশী গন্ধ থাকায় নাটকের সুর ব্যাহত হচ্ছে বলে মনে হতে লাগল। তার ফলে এক মাস ধরে সি-লোবো বাজিয়ে যাবার পর, তাঁর জায়গায় এলেন বিখ্যাত দক্ষিণাবাবুর দেশী কনসার্টের দল। দক্ষিণারঞ্জন সেন।

কিন্তু সে-ও ত পরের কথা। উদ্বোধন রজনীর কথা ত কিছুই বলা হয়নি। ইতিমধ্যে ম্যাডানদের বিখ্যাত জে. এফ. ম্যাডান মারা গেছেন। আমরা কাজে-কর্মে ব্যস্ত, উৎসাহে ভরপুর। এসেছে ৩০শে জুন, আমাদের "কর্ণার্জুন-এর প্রথম অভিনয়-রজনী।

আজ ১৫ই আষাঢ়, ১৩৩০ সাল—৩০শে জুন। ঘুম থেকে যখন উঠলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। অত রাত্রে আসতাম বলে পাখার নীচে পড়ে পড়ে দশটা পর্যন্ত ঘুমোতাম। তারপর চানটান ক'রে উঠে খানিকক্ষণ বসে খবরের কাগজটা পড়তাম। খেয়ে-দেয়ে উঠতে উঠতে—যার নাম একটা। এই ছিল তখনকার নিত্য রুটিন। এরপরে চলে যেতাম থিয়েটারে।

কাল রাত্রে প্রবোধবাবু বললেন—কাল ওপ্‌নিং নাইট। দুপুরে এসো না। জিরিয়ে-টিরিয়ে বিকেলে এসো।

প্রবোধবাবুর কথামতো শুয়ে পড়লাম। কিন্তু, এপাশ আর ওপাশ। ঘুম আর আসতে চায় না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছি। থিয়েটারে এতক্ষণে কী হচ্ছে কে জানে! এসব ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত উঠেই পড়লাম একসময়। পোশাক বদলে—চলে এলাম থিয়েটারে। এসপ্লানেডে ট্রাম চেঞ্জ করে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে যেতাম হাতিবাগানের মোড়ে, এতে ভিড়টা পেতাম সাধারণত কম। আজও ধরলাম সেই পথ। মন বললে—প্রবোধবাবু যাই বলুক, কীরকম কী হচ্ছে-টচ্ছে, তা নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত প্রাণটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

হাতিবাগানের মোড়ের কাছাকাছি গ্রে স্ট্রীটের ট্রাম-স্টপেজে নামামাত্রই কানে এলো—সানাই বাজছে। তাড়াতাড়ি মোড়ে এসে দেখি চুড়ো থেকে গাড়িবারান্দার লোহার রেলিং পর্যন্ত লাল-নীল বাল্‌ব দিয়ে সাজানো হয়েছে—গেটে ফুলের মালা, আর চুড়োর ওপরে উড়ছে নিশান। স্টারের যে বিখ্যাত বড়ো 'তারা'র কথা আগে উল্লেখ করেছি, সেই তারা স্টারের শেষ অবস্থায় আর জ্বালানো হতো না, বেশী কারেন্ট পুড়ে খরচা বাড়বে বলে। সেই খুলে-রাখা তারাটিকে সাবানজল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছিল, তা কালই দেখে গিয়েছিলাম। আজ দেখি, সেই তারা আবার উঠছে স্টারের মন্দিরের মাঝখানটিতে—পরিষ্কার, ঝকঝকে-তকতকে। গাড়িবারান্দার থাম তখন ছিল লোহার। সেই থামগুলি মুড়ে দেওয়া হয়েছে দেবদারু পাতা আর ফুলে। গেটে—কলাগাছ, মঙ্গলকলস আর আম্রপল্লব। গাড়িবারান্দা পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখলাম প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবার যে প্রধান দরজা, তাতে ঝুলছে ভেলভেটের পর্দা। আর, বাঁদিকে চেয়ে দেখি, টিকিট বিক্রি করার যে কাউণ্টার সেখানে বসে আছে—হাবুল। এই হাবুল অর্থাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ছিল যাকে বলে

থিয়েটারের "গোল আলু"। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, সবেতেই গোল আলু কাজে লাগে। হাবুলও তাই। কী না করছে! টিকিট বিক্রি করেছে কাউণ্টারে বসে, মেক-আপ নিয়ে স্টেজে নেমে পার্টও করেছে, 'সাট' ধ'রে প্রম্প্‌টও করেছে। তখন পার্ট ও সাট লেখবার জন্য মাইনে-করা একজন লোক থাকত থিয়েটারে। ও তার সঙ্গে বসে দরকার মতো পার্টও লিখছে। এইরকম আরও একজন 'গোল আলু' বিজয় মুখোপাধ্যায়। তার কথা যথাসময়ে বলব। আমাকে দেখে হাবুল হেসে বিক্রির চার্ট দেখালে। ফাঁকা নেই, সব ঘর কাটা। মানে, সব আসনই বিক্রি হয়ে গেছে। ওদিককার কাউণ্টার বন্ধ করে দিয়ে, এদিকে এসে, কালকের টিকিট বেচ্‌ছি। তা-ও সব শেষ হয়ে এলো। প্রবোধবাবু দেখে-দেখে বলে দিয়েছেন—সামনের সপ্তাহের 'প্ল্যান' খুলে দিতে। এবার তাই নিয়ে বস্‌ছি।'

ডানদিকে উঠতে পড়ে কাঠের সিঁড়ি—তাতে রঙ ত করা হয়েছিলই, এখন দেখি—আগাগোড়া কার্পেট পাতা। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই প্রথম যে চাতাল, তার দু'পাশে পেতলের জার্ডিনিয়ারে পামগাছ বসানো। ওপরে উঠে দরজা পেরুলেই রয়াল বক্সের লবী। নিচের লবীর ঠিক ওপরে চৌকো একটা ফাঁকা জায়গা। চারিদিকে সরু বারান্দা সেখান দিয়ে নিচে তাকানো যায়। পরে অবশ্য সিমেণ্ট দিয়ে ওটাকে বুজিয়ে ফেলে—ঘর করে ফেলা হয়, অফিস ঘর। দুখানি বড়ো ছবি শোভা পেতো সিঁড়ির একতলার চাতালে। একখানি অমৃতলাল মিত্রের, অন্যখানি 'লেডী ক্যাথরিন'রূপী এলেন টেরীর। হ্যামলেট-এর রূপসজ্জায় স্যর হেনরী অর্ভিং-এরও কোমর পর্যন্ত বিরাট একটা ছবি ছিল অমৃতলাল বসুর ঘরে। শুনেছি, এরকম আরও বহু ছবি ছিল স্টারে, খোয়া গেছে। দোতলায় কাঁচের ঘর ছিল, ডিরেক্টরদের মিটিং হতো সেখানে। এই কাঁচের ঘরটি ছিল স্টারের আমলে সঙ্গীতাচার্য ৺রামতারণ সান্ন্যালের ঘর: আর, ওপরের লবীতে—সাজানো ছিল কার্পেটের ওপরে সোফা-কাউচ, মাথার ওপর পাখা। ওটা বিশ্রামের স্থান, বক্সের দর্শকদের জন্য। এরই সামনে—রঙ্গমঞ্চের ঠিক মুখোমুখি ছিল 'রয়্যাল বক্স'। দেখি, এখানটায়ও ফুলটুল দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে।

বক্স ছিল তখন দু'রকম। এক, তক্তাপোশের ওপরে নারকেল ছোবড়া বা 'কয়ের' পুরু করে বিছিয়ে তার ওপরে রেক্সিন দিয়ে মোড়া। খদ্দের বুক করলে, তার ওপরে চাদর পেতে দিয়ে—তাকিয়া সাজিয়ে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় বক্সটা ছিল যাকে বলে—চেয়ারের ওপরে গদী-আঁটা বক্স। দর্শক যদি আসনের সামনে পর্দা চাইতেন তো ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, বাহারে নেটের পর্দা। প্লের সময় এই পর্দা উঠিয়ে দিতেন দর্শক নিজেরাই। অডিটোরিয়ামে আলো জ্বলে উঠলে আবার দিতেন তাঁরা পর্দা ফেলে। এছাড়া ছিল, স্টেজের লাগোয়া দুপাশে দুটি বড়ো বক্স—সে দুটিকে বলা হতো—স্টেজ বক্স। যার চিহ্ন এখনো 'বিশ্বরূপা' বা 'মিনার্ভা' থিয়েটারে আছে।

লক্ষ্য করে দেখি, বক্সের সামনের হাতলগুলি কাপড় দিয়ে মুড়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভিতরটা নতুন রং করেছে। ভিতরের ডোমটাও রং-করা। বাদবাকি—তখনো সাজানো হচ্ছে। যেন—ইন্দ্রভবন।

অর্কেস্ট্রা-পীটের ·রেলিং তখনো হয়নি। ভিতরে চেয়ার পেতে দিয়ে—বাইরে থেকে লাল সালু দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে ডিম্বাকারে। পাদপ্রদীপের ওখানে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে, যেমন আজকের দিনেও হয়ে থাকে। তখনো থিয়েটারের কোনো 'ওপ্‌নিং নাইট' দেখিনি, বলতে পারবো না, এর আগে এরকম ফুল দিয়ে পাদপ্রদীপ সাজানোর রীতি ছিল কিনা।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর, ভিতরে এই সাজসজ্জা, মনটা যেন আপনিই মেতে উঠতে চায়। বেশ খুশী আর উৎসাহিত অন্তর নিয়েই ভিতরে গেলাম। দেখি, ড্রেসারদের নিয়ে প্রবোধবাবু তখন ভীষণ ব্যস্ত। পিস্‌বোর্ডের বাক্সে করে পোশাকগুলি সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এক-এক জনের দুবার-তিনবার করে পোশাক পরিবর্তন আছে, সেই হিসাবে প্রতি বাক্সে—সবার নাম আর পোশাকের নম্বর লিখে লিখে রাখা হচ্ছে। যার যটা চেঞ্জ, তার ততটা নম্বর করা বাক্স। সে-সবগুলি উনি তখন ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ড্রেসারদের। তখন ড্রেসার ছিল—চারজন। এই পোশাক বাছাইয়ের ব্যাপারটা আমরা দুদিন আগে থাকতে নিজেরাই সেরে রেখে দিয়েছিলাম। প্রবোধবাবু, ইন্দু, নীহার, বিজয় ও আমি। ইন্দু সে সময় নানান্ চুট্‌কি গল্পে আমাদের মাতিয়ে রাখত। প্রবোধবাবু আমাকে, ইন্দুকে আর দুর্গাকে ডাকতেন—শ্রীমান বলে। আমাদের তিনজনের একসঙ্গে উল্লেখ করতে হলেই বলতেন—শ্রীমানদের।

আমাকে তখন কাছে আসতে দেখে, প্রবোধবাবু মুখ তুলে তাকালেন। একটু হেসে বললেন—কী? শ্রীমানের ঘুম হলো না বুঝি? পালিয়ে এলে?

—থাকতে পারলাম না।

—বুঝেছি।

তখন ওঁর ঘরখানা ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কাঠের বদলে হয়েছে পাকা মেঝে, পাকা দেওয়াল। অর্থাৎ অমৃতলাল বসুর কাঠের ঘর এখন পাকা। ঘরের একপাশে একটা ছোট খাট ছিল। বললেন—কোথায় আর ঘুর ঘুর করে বেড়াবে? যাও, আমার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ো। একটু গড়িয়ে নাও। বিশ্রামটা হয়ে যাবে আর কী!

বললাম—একটু দেখে-টেখে আসছি চারদিক।

গেলাম সাজঘরের দিকে। আমাদের সাজঘর যে-ভাবে তৈরি হবার কথা ছিল, তা হয়ে ওঠেনি। পুরানো সাজঘরের সামনে পড়ে আছে কাঁচা উঠোনটা। সেই উঠোনের ওপরে ঘর ওঠাবার প্ল্যান ছিল, তা' হয়নি, দুটো হলঘর রয়েছে পুরানো। একটা—মেয়েদের। আরেকটা—ছেলেদের। বাগানের দিকটা দেওয়া হয়েছিল মেয়েদের, আর অন্যটা—ছেলেদের। ছোট-ছোট টেবিল, আয়না-বসানো। ড্রেসাররা এসে টেবিলে রঙ রেখে দিয়ে যেতো। হোয়াইট জিঙ্ক, ভারমিলিয়ন, পিউড়ী, কাজল, মিনে ইত্যাদি।

তখনও পেনসিল দিয়ে ভ্রূ আঁকার পদ্ধতি চালু হয়নি। যে-যার টেবিলে বসে বসে সেজে যাও, এই আর কী। আমি যখন গেলাম, দেখি,—আয়না ফিট্ করা হচ্ছে টেবিলগুলিতে। মেঝেতে, যেখানে পোশাক রাখা হয়েছে, তার নিচে দুখানা শপ্ পাতা। টেবিলগুলির সামনে চেয়ার নেই, পাতা রয়েছে বেঞ্চি।

উঠে এলাম ওপরে। প্রবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের সাজঘরটা কবে হবে?

বললেন—কিছু ভেবো না। একমাসের মধ্যেই করে দেবো।

আমি আর কিছু না বলে, ওঁর সেই খাটখানার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। দিনটা শনিবার। অফিস ছুটি হয় সকাল-সকাল। অভিনেতাদের মধ্যে যাদের অফিস ছিল এবং যাদের অফিস ছিল না, তারা দেখি, বেশ আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে। শুয়ে-শুয়ে শেষ পর্যন্ত বোধহয় একটু তন্দ্রা মতন এসে থাকবে। এক সময় প্রবোধবাবু দেখি তাড়া দিচ্ছেন—ওঠো এবার। সাজতে যাও। কাঁটায় কাঁটায় ড্রপ তুলব।

উঠলাম। প্লে আরম্ভ হবে সাতটায়। তখন শনিবারে প্লে হতো সাড়ে সাতটায়। আর ম্যাটিনী হতো পাঁচটায়। বাংলা থিয়েটারের এই যে ম্যাটিনী, এর একটা ইতিহাস আছে, তা' পরে বলব।

সাজঘরে গিয়ে ত সবাই বসেছি। ড্রেসাররা বললে—নিজেদেরই রঙ করে নিতে হবে।

একটু উদ্বিগ্নই হয়ে পড়লাম মনে মনে। রঙ যে করতে জানি না। যদিও একজন এক্স্ট্রা ড্রেসার নেওয়া হয়েছিল আমাদের জন্য, কিন্তু এতগুলি লোকের যে কাজ, তার কতটুকু আর সে করতে পারবে? পুরানো-নতুন সব মিলে হাতাহাতি করে নিজেরাই রঙ-করার কাজটা সেরে নিলাম। পুরাতন অভিনেতারা বললেন—'পাবলিক থিয়েটার' করতে হলে নিজেদেরই রঙ করে নিতে হবে। ড্রেসাররা শুধু পোশাক এগিয়ে দেবে। পরে নিতে হবে নিজেদেরই। ওরা শুধু পিন দিয়ে আটকে দেবে। পাগড়ি-টাগড়ি পরিয়ে দেবে, কোমরবন্ধটা লাগিয়ে দেবে। এর বেশি কিছু না। আর সব করতে হবে নিজেদেরই, কী মেয়ে, কী ছেলে! ওরা আসবে সকালবেলা, পোশাকের তদ্বির করবে। সেই ওদের কাজ। পোশাক শুকুতে দেওয়া, পোশাক দরকার মতো ইস্ত্রি করা, পাট করে রাখা, ইত্যাদি।

বললাম—ঠিক আছে। দুদিনেই শিখে নেবো রঙ-করা। নিজেদের কাজ নিজেরাই ত করব, ক্ষতি কী?

তারপরে, রঙ-করা, পোশাক-পরার পালা শেষ করে সবাই যখন প্রস্তুত হয়ে সাজঘরে বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়ালাম তখন নিজেদেরই নিজেদের কাছে অপূর্ব মনে হতে লাগল। স্টেজের লবীতে চেয়ারে বসে আছেন অপরেশবাবু। সবাই এগিয়ে গিয়ে একে একে তাকে প্রণাম করতে লাগল। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করা। সমবয়সীদের মধ্যে পরস্পরে আলিঙ্গন-করা। মেয়েরা এসে বড়োদের

সবারই পায়ের ধুলো নিলো। বাজিয়ে, আলোক-সম্পাতকারী, সিফ্টার, ড্রেসার—সবাই এসে এই প্রণাম আর শুভেচ্ছার উৎসবে মেতে গেল। যেন বিজয়ার পরে সম্মিলন হচ্ছে সবার। অপরূপ লাগল কিন্তু রীতিটা। এই যে আশীর্বাদ বা শুভেচ্ছা নিয়ে কার্যারম্ভের সূচনা, এখানে পরস্পরের প্রতি রেষারেষি, ঈর্ষা, এসব দূরে গিয়ে মুহূর্তে বড়ো হয়ে ওঠে অপূর্ব এক প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ, এর মূল্য কি কম? দলে ছোট ছেলে নেই, কিন্তু ছোট মেয়ে ছিল। তারা যেন আনন্দে মত্ত হয়ে উঠেছে। একজনকে হয়ত ভুলে তিনবারই প্রণাম করে গেল। সাজসজ্জা শেষ করে তারা লবীতে সাজঘরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সে-ও এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! বিবাদ নেই—বিরোধ নেই—যেন সব একই পরিবারের। এ হচ্ছে বাংলা থিয়েটার-জগতে ঐতিহ্য, যা ফিল্ম-জগতে কোনদিনই গড়ে উঠল না।

এর পর চলতে লাগল ঠাকুর-প্রণামের পালা। তারপরে, রঙ্গপীঠকে প্রণাম। যে যখন প্রথম মঞ্চপ্রবেশ করছে, প্রণাম করছে মঞ্চপীঠকে। ঠাকুর ও পীঠ-প্রণাম, এ ছিল বারোমাসের ব্যাপার এ রীতি কেন হয়েছিল, তাও শুনেছিলাম। সেটা পরে যথাসময়ে বলব।

ইতিপূর্বে বাঙলা থিয়েটারে ড্রপ তোলার আগে ছিল পেটা-ঘড়ি বাজাবার প্রথা। কিন্তু, এই প্রথম সে প্রথা ভেঙে শুরু হলো ইলেকট্রিক বেল বাজাবার ব্যবস্থা। তবে, "কর্ণওয়ালিশ" যখন "বেঙ্গলী থিয়েটার" হলো, তখন, ওটা ত আসলে সিনেমা-হলই ছিল, তাই ওখানেও ছিল ইলেকট্রিক বেলের ব্যবস্থা। এ ছাড়া, সর্বত্রই ছিল পেটা-ঘড়ি। আরও একটি নতুন ব্যবস্থা হলো 'কর্ণার্জুন'-এর সময় থেকে। সেটা হলো ড্রপের ঠিক পরেই ভেলভেট-কার্টেনের ব্যবহার। এর আগে বাংলা থিয়েটারে কার্টেনের রেওয়াজ ছিল না, ড্রপ উঠতেই দর্শকদের দৃষ্টি সোজাসুজি নাট্যালোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতো।

যাই হোক, বাজল প্রথম ওয়ার্নিং বেল। তারপরে, দ্বিতীয় বেল। দ্বিতীয়টির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো—কনসার্ট। কনসার্ট থেমে যাবার পরে—একটুক্ষণ বিরতি। তারপরে "থার্ড বেল"। দ্বিতীয় কনসার্ট। আমরা উইংসের পাশে রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছি। আর প্রথম দৃশ্যের শিল্পীরা যথাস্থানে মঞ্চ মধ্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। প্রথম ঐকতানের পরেই ড্রপ উঠে গিয়ে কার্টেনকে দৃশ্যমান করে রেখেছে। কনসার্ট থামামাত্রই, ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি শাঁখ বাজিয়ে দিলো মেয়েরা। কার্টেন আস্তে আস্তে, খাঁজে খাঁজে উঠে যাচ্ছে। অবশ্য, "কর্ণার্জুন" ছাড়া এরকম শাখ বাজিয়ে কার্টেন তোলার সুবিধা অন্য নাটকে ছিল না। কারণ, এই নাটকের প্রথম দৃশ্য,—নদীতীর। ঊষাকাল। গঙ্গা স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীরা ঘাটে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘাটের চত্বরে কর্ণ বসে আছেন স্থির হয়ে—সূর্যধ্যান করছেন তিনি। অন্ধকার থেকে একটু-একটু করে উদিত হচ্ছেন সূর্যদেব। স্টেজ প্রায় অন্ধকারই ছিল। যেমন-যেমন সূর্য উঠছে, তেমনি-তেমনি আলোও হচ্ছে, লাল্‌চে-লাল্‌চে আলো। আর ভিতরে বেজে উঠেছে মৃদু সঙ্গীত-ঝঙ্কার! মঞ্চে স্নানার্থী-স্নানার্থিনীর দল সূর্য-বন্দনা করলো এই গান দিয়ে—

'নব নব রবি ছবি গগন-বিহারী।
উজ্জ্বল তপন,ভুবন নয়ন
সকল তিমির অপহারী!'

এই প্রত্যুষকালটা দেখাচ্ছিল ভারি সুন্দর! দূর বনানীর পিছনে সূর্যোদয় হচ্ছে। আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে সার্থক হতো এই উদয়-দৃশ্যটি। এসবই পটলবাবুর করা, ছোকরা ইলেকট্রিশিয়ানরা খেটে তার প্ল্যানকে কার্যকরী করে তুলেছে।

গান গেয়ে ত ওরা চলে গেল। কর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য দিলেন জবাফুলের। তারপরে আছে এক স্বগতোক্তি। কর্ণরূপী তিনকড়িদা শুরু করলেন—"অপূর্ব আলোকচ্ছটা উদয় অচলে।"

প্লে আরম্ভ হয়ে গেল। সিনগুলি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল যে, সবগুলিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল —"সেট্ সিন"। দু-একটা ম্যানেজ করা গেলেও, সব ক'টি পারা গেল না। মাঝে মাঝে কার্টেন ফেলে সেট্ সাজিয়ে নিতেই হতো। এবং এইরকম ঘন ঘন কার্টেন ফেলার ফলে দারুণ সমালোচনাও হলো। সমালোচকরা বললেন—এতে রসভঙ্গ হয়।

কিন্তু নবীন উৎসাহে সে-সব ব্যাপার আগে আমরা বুঝতে পারিনি, পরে গ্রাহ্যও করিনি। অপরেশ-বাবু ছিলেন খুঁতখুঁতে লোক, আমাদের সেট-এর এসব বাড়াবাড়ি দেখে রাগারাগিও করতেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অনেকগুলি সিন পটে-আঁকা করে নিতে হলো। সিন তখন থাকত গ্রুভে বসানো। মাথার ওপর ঝারী কাঠের ফ্রেম করা। মাঝখানে পর পর কয়েকটি সমান্তরাল খাঁজ-কাটা, যার ওপর দিয়ে সিন সরসর করে সরে যেতে পারে। লিফটাররা দুপাশ দিয়ে সিন ঠেলে নিয়ে গিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় দুটোতে জুড়ে দিলে। যাকে বলে—"সাটার সিন।" কিন্তু এত করেও সবগুলি দৃশ্য ম্যানেজ করা গেল না, কতগুলির ব্যাপারে পর্দা ফেলে নিতেই হতো।

কিন্তু, যা বলছিলাম। ফার্স্ট অ্যাক্টের ড্রপের আগের সিনে কার্টেন ফেলতে হলো। এর আগেও একটা কার্টেন পড়েছিল অবশ্য। এবারে মল্লভূমি। কার্টেন ওঠবার আগেই ধনুক হাতে স্টেজে ঢুকে যথাস্থানে গিয়েই দাঁড়িয়েছি, অর্জুন পক্ষীর চক্ষুভেদ করছে, এই ছিল দৃশ্য। মল্লভূমিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে বসে আছেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আচার্যেরা। দৃশ্যটি ছিল দোতলা। সেখানে মেয়েরাও বসে অস্ত্রক্রীড়া দেখছেন। মঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় খিলেন-করা। সেই খিলেনের পিছনে আছে গাছ। গাছের ডালে পাখি বসে আছে। আমি তীর ছুঁড়ব, আর পাখির একটি চোখে ঠিক গিয়ে তা বিঁধে যাবে। লোকে অবাক হয়ে যেতো এ-দৃশ্যটি দেখে, ভাবত—এটা কী করে দেখায়?

শখের দলের সব উৎসাহী ব্যক্তিরা স্টেজের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করত ব্যাপারটা জানবার জন্যে। সিফটারদের সঙ্গে ভাব-সাব করে পরে তারা জেনে নিলে ফাঁকির ব্যাপারটা। আসলে ওটা ফাঁকিই ছিল। আমি দৃশ্যারম্ভের আগেই হাঁটু গেড়ে বসতাম ঠিক ফুটলাইটের কাছে, দর্শকের দিকে পিছন ফিরে। ধনুকে তীর নেই, ধনুকের ছিলাটা টেনে বসে আছি পাখির দিকে মুখ করে। পাখির

চোখ তীরবিদ্ধ অবস্থায় থাকত গোড়া থেকেই। ধীরে ধীরে কার্টেন উঠছে আমার পিছনে। মল্লভূমির সবাই বলে উঠলেন—সাধু-সাধু! যেন আমি ইতিমধ্যেই পাখির চক্ষু বিদ্ধ করে ফেলেছি। যবনিকা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ধনুকের ছিলা আকর্ণ টেনে হাত ছেড়ে দিতাম। কার্টেন পূর্ণ দৃশ্যটি তখনো উন্মুক্ত করেনি, অর্জুনের ওপর ফোকাশ। 'সাধু সাধু' বলার সঙ্গে সঙ্গেই—কার্টেন পূর্ণভাবে উঠে গেছে—ফোকাশ পড়েছে পাখির ওপর—দেখা যাচ্ছে চক্ষুতে তীর বেঁধা পাখিটি রয়েছে গাছের ডালে। ওটা অত্যন্ত নিখুঁত টাইমিং-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিভ্রম-সৃষ্টিতে বাধা পড়ে যাবে। সুতরাং কুশলতা এখানে সময়-সমন্বয়ের ওপর সবিশেষ নির্ভরশীল।

অভিনয় চলতে লাগল। কী যে করে যাচ্ছি আমরা, কে জানে! উৎসাহ আর উদ্দীপনায় আমরা প্রমত্ত। কি করছি বিচার করবার সময় নেই। সিন থেকে বেরিয়ে আসছি, সবাই পিঠ চাপড়াচ্ছে, মায় ডিরেক্টররা পর্যন্ত, বলছেন—বেশ হচ্ছে।

মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহের দিকে তাকিয়ে দেখেছি—কী বিপুল জনসংখ্যা! তেতলায়, দোতলায়—একতলায়—সর্বত্র লোকারণ্য। এ-জনসমাবেশ দেখে অভিনেতার রক্ত গরম না হয়েই পারে না। যেখানে দর্শকের ভালো লাগছে, সেখানেই করতালি। আর, ড্রপ পড়লেত কথাই নেই। বহু লোক উৎসাহের আতিশয্যে ভিতরে এসে বলে যেতে লাগলেন—চালিয়ে যান এভাবে। চমৎকার হচ্ছে।

আবার এর আরও একটা দিক আছে। দুটি-তিনটি দৃশ্যে যেখানে সমবেত অভিনয়ের অবকাশ আছে, আমরা পরস্পরের সঙ্গে মূকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম, যাকে বলে—'বাই-প্লে'। অন্য চরিত্র দুজনে একত্র 'অ্যাক্টিং' করছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। আমরা তখন করব কী! একে অপরের সঙ্গে হাত বা মাথা নেড়ে, মুখের ভাব প্রকাশ করে, নিঃশব্দে অভিনয় করে যাচ্ছি। যাতে করে, অভিনয়টা সর্বক্ষণ সজীব থাকে, কখনো না ঝিমিয়ে পড়ে অভিনয়ের প্রাণধারা। তারপর দেখতে লাগলাম এইরকম দৃশ্যে প্রাচীনেরাও আমাদের দেখাদেখি বাই-প্লে শুরু করে দিয়েছেন। এর ফলাফলটা যে কী হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে, তা ঠিক না বুঝলেও লোকে বললে—বাঃ বেশ হচ্ছে। এ-এক নতুন জিনিস দেখছি!

এটা বলার একটা কারণও আছে। আগে আগে অভিনেতা সংলাপ যখন করতেন, তখন তা যথার্থ ভাবের সঙ্গেই প্রকাশ করতেন। এবং তাঁর সহযোগী অভিনেতা ভাবের প্রতিরক্ষা করতেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু আর যাঁরা মঞ্চে থাকতেন তাঁরা নির্দেশের বাইরে গিয়ে কোনো ভাব প্রকাশ না করে পুতুলের মতো দণ্ডায়মান থাকতেন। বানিয়ে যে কোনো অ্যাকশন করবেন, তা নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দোষ যা হয়েছিল, তা আমরা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে সমালোচনাতে এটা বোঝা গিয়েছিল। কেউ কেউ লিখলেন—মূকাভিনয়ের কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

যাই হোক আমাদের অভিনয় ত সে রাত্রে চলেছে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তখনো পর্যন্ত। কিন্তু দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায় এসে এক অঘটন ঘটে গেল। প্রথম থেকেই বলি। অর্জুন মাথার ওপরে

ধনুক উঠিয়ে নিচে জলের দিকে তাকিয়ে মৎস্যটি তীরবিদ্ধ করে নিচে ফেলবে। এটা আমার পক্ষে একটু ভয়েরই দৃশ্য ছিল। কারণ তীর যদি-না শূন্যে সোজা উঠে যায়, তাহলে মাছটা যখন পড়বে, তখন তা হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উঠে যদি বেঁকে যায় বা ছিলা থেকে খসে যায় তা সত্ত্বেও পূর্ব ব্যবস্থামতো তীরবিদ্ধ মৎস্যটি ঠিক পড়বেই। লোকে হেসে উঠবেই। সেইজন্য এই দৃশ্যটি আমি অত্যন্ত সতর্কভাবে করে যাবো বলে প্রস্তুত ছিলাম।

তীর ছোঁড়ার কৌশলটা রীতিমতো আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। সেইজন্য এসব ধরনের ভুল জীবনে আমার কখনো হয়নি। এরপরে দীর্ঘদিন 'কর্ণার্জুন' হয়েছে, দুর্যোধন বা অন্য যে অর্জুন করেছে, তাদের মাঝে মাঝে অসুবিধা হয়েছে, কেউ কেউ উঠেছে হেসে। আমি আগেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলে রেখেছিলাম—তুমি আমার হাতে ধনুক দিও, কিন্তু তীর দিও না, তীর আমি নিজে বেছে নেবো।

স্ফটিক-আধারটি ছিল চারপাশে পাথর আঁকা, অবশ্যই একটু উঁচু, তার মাঝখানটায় ছিল জাল বা নেটের ওপরে জল-আঁকা। নিচে লুকানো 'গ্রীন-ব্লু' লাইট। ফলে সত্যিকার স্বচ্ছ জলের বিভ্রম সৃষ্টি হতো। তারই পাশে রাখা থাকত—কয়েকটি তীর। তার থেকে বেছে মোটা দেখে একটা তীর নিয়ে ওপরে ছুঁড়তাম, কোনো ভুল হতো না। মাছ পড়ত ঠিক সময়ে। হাততালি পড়ত চড়বড় করে। সেদিনও তাই হয়েছিল। দ্রৌপদী এগিয়ে এসে গলায় মালা দিল পরিয়ে। শঙ্খধ্বনি হলো, হলো পুষ্পবৃষ্টি, দর্শকরাও দিলেন হাততালি। তার পরের ঘটনা হচ্ছে, কৌরব ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ব্রাহ্মণ যুবককে বধ করে দ্রৌপদীকে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যাকুল হয়ে বললে—কী হবে! "পাঞ্চালনগরী বুঝি ভস্ম হয়ে যায়!"

অর্জুন বললে—

"দেহ মোরে অস্ত্রপূর্ণ রথ একখান
দেখি এই ক্ষত্রমাঝে বীর আছে কেবা
রহে স্থির সম্মুখে আমার।"

তার পরে ভীম বলবে—

"রথে কিবা প্রয়োজন?
ভুজদ্বয় কার্মুক আমার
শালবৃক্ষ যোগ্যবান তাহে।"

এ কথাটা বলতে গিয়ে, দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে উঠিয়ে পেশীর দৃঢ়তা দেখাতে পারলেই হলো। কিন্তু, আমাদের ভীম—ননীগোপাল করলো কী, "রথে কিবা প্রয়োজন" বলেই ডানদিকের উইংসের ভিতরে ঢুকে গেল। আমরা চমকে গেলাম। এ কী হলো? ভীম চলে গেল কেন? তাকিয়ে দেখি, কাটা একটা গাছের ডালকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ভিতর থেকে। তার পরে,

সেই ডালটা আবার টেনে তুলবে। দর্শকের কথা বলব কী, আমাদের পক্ষেই হাসি চেপে রাখা দুষ্কর হলো। এর পর শ্রীকৃষ্ণের কথা ছিল। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমি রথ দিচ্ছি। করো যুদ্ধ। সেটা আর বলা হল না। হৈ-হৈ। কার্টেন।

তারপরেই উঠল দ্রোণের দৃশ্য। কিন্তু হাসির প্রাবল্যে ভাঁটা পড়তে পড়তে দৃশ্যটিও শেষ হয়ে গেল। 'দ্রোণ' অভিনয় করলে ভালো, অথচ হাসির জন্যে তেমন জমতে পারল না দ্রোণের অ্যাক্টিং। পরের দৃশ্য—কর্ণ ও পদ্মাবতী। এ-দৃশ্যটি জমল। এর পরেই ড্রপ। ড্রপের পর অপরেশচন্দ্রের কাছে গেছি। তিনি ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন—কী হলো? কী ব্যাপার? হাসি কেন অমন?

বললাম আমরা হাসতে হাসতে ননীগোপালের কীর্তি। উনি ত শুনে, ভীমকে ডেকে খুবই বকলেন। ভীম বললে—কিন্তু, বইতে লেখা রয়েছে যে?

—কী লেখা?

বললে—"শালবৃক্ষ যোগ্যবান"। শালগাছ পাইনি, গাছ ত পেয়েছি। মালীকে বলে ডাল কেটে আনিয়ে রেখেছিলাম। কী অন্যায়টা হলো?

তার ব্যথাটা কোথায়, বুঝলাম। নতুনদের কাছে সে হারতে চায় না। বলেই ফেললে—ওরা নতুন নতুন কায়দা দেখাচ্ছে। আমিও বা দেখাবো না কেন?

এরকম আরও আছে। দুঃশাসনের রক্তপানের দৃশ্যটি যেমন। দুঃশাসনের বুকের উপর বসে, তার হৃদ্‌পিণ্ডটি ছিঁড়ে বার করে রক্ত লেহন করতে করতে ভীম প্রস্থান করবে। দু রাত্তির পরেই তুলসী বললে—আমি পারব না। এই রাত্রে সারা গায়ে রঙ মাখা। স্নান না করলে ওঠে না। ওকী কম ঝামেলা! কোথায় রাত হয়ে গেছে, বাড়ি যাবো, তা না—?

তুলসী ছেড়ে দিতে তখন সে ঐ দৃশ্যের জন্য 'অ্যাপ্রেন্টিস' ধরলে। একে তার ঐ ভারী শরীর, তার ওপরে তার আবার 'ফিলিংস' বেশী, যে অ্যাপ্রেন্টিসকে ধরে, সে-ই দুদিন পরে—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' করে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অ্যাপ্রেন্টিসদের মধ্যে একটি আতঙ্কই দেখা গেল। "ঐরে—ননীদা আসছে—দুঃশাসনের স্ট্যাণ্ড-বাই সাজতে বলবে। পালা—পালা।"

শেষ পর্যন্ত বেচারীর লোকই আর জোটে না ঐ দৃশ্যে দুঃশাসন সাজবার। মানিক বললে—ডামি নাও না?

তা সে পুতুল-ডামিতে খুশী নয়। অপরেশবাবুর কাছে গিয়ে খুত-খুঁত করে—শুধু আমার বেলাতেই কিছু হয় না।

ধমক দেন অপরেশবাবু—তা ডামি নাও না?

অগত্যা ডামির ওপরই তার 'ফিলিংস' প্রকাশ করতে লাগল ভীম তারপর থেকে।

শেষ দৃশ্যে—কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ। পরস্পরের পাশ দিয়ে তীর ছাড়ছি, শরীরের এক ইঞ্চি-দু

ইঞ্চি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, গায়ে লেগে দুর্ঘটনা ঘটছে না। যেমন চেয়েছিলাম তেমনটিই হলো। কিন্তু, রথ থেকে আমার অজ্ঞান হয়ে পড়ার ব্যাপারটা মনোমত হয়েছিল কিনা, স্মরণ করতে পারছি না। তবে দেহটা যখন অবশ করে ফেলেছিলাম তখন মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, মনে হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে, তখনো দুর্বল ঠেকছে দেহ। শেষে কার্টেনের পর—প্রচুর হাততালি পড়ল। স্টেজের সামনে পর্দা উঠিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। কিন্তু বাংলায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই 'কার্টেন জ্ঞান' গ্রহণ করেনি। নতুন নাটকের প্রথম রজনীতে এটা কোথাও-কোথাও হয়েছিল। 'কর্ণার্জুন'-এও চতুর্থ রাত্রি পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু দর্শক তখন গাড়ি বা বাস ধরে বাড়ি ফেরবার তাড়ায় অস্থির, তখন কি আর এসব ভালো লাগে তাদের?

তাই চালু হলো না এ-রীতি।

যাক্, অভিনয় ত হলো। কেমন হলো, এর ভালো, এর মন্দ, সবই জানতে হবে। পরিচিত বন্ধুরা এসে সুখ্যাতি করে গেলেন। এমন কি, যে-সব 'ট্রিকসিন' নিয়ে ভাবনা ছিল, তা-ও উতরে গেছে। দুটো শক্ত ট্রিকসিন নিয়েই ছিল ভাবনা। প্রথমটি হলো, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্য। এই দৃশ্যটি পার্শী কোরিন্থিয়ান থিয়েটার যেরকম দেখাতো, তার সঙ্গে যাতে আমাদের মিল না থাকে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল সবার। পার্শীদের নাটকে ছিল কৌরবদের আমন্ত্রণে সভায় এসেছেন পাণ্ডবেরা। বিলাস-সঙ্গিনীরা নৃত্য-গীত করে গেল। তার পরে কথা-প্রসঙ্গে কৌরবদের তরফ থেকে কৌশলে এলো পাশা-খেলার আহ্বান। কিন্তু অপরেশচন্দ্রের আঙ্গিক হলো অন্যরকম। দৃশ্য উত্তোলিত হলেই দেখা গেল যে, শকুনি পাশা খেলছে, আর কৌরব পক্ষ থেকে জয়সূচক প্রবল অট্টহাস্য উঠল।

এই অ্যাকশন দিয়ে দৃশ্যের শুরু। বোঝা গেল পাণ্ডবরা রাজ্যপাট সব হারিয়ে বসে আছেন পাশা খেলায়। তার পরেই রাখা হলো দ্রৌপদীকে পণ। এই দৃশ্যে—দোতলা দেখানো হতো, দোতলার অলিন্দে বসে আছেন মেয়েরা। অভিনেতা-অভিনেত্রী মিলিয়ে এই দৃশ্যে সাজানো হতো প্রায় পঞ্চাশ-জনকে। এই বস্ত্রহরণের কথাটা বলা যাক। পার্শী থিয়েটারে 'দ্রৌপদী'-রূপিণী গহর বিভিন্ন রঙের শাড়ি পরতেন। দুঃশাসনের আকর্ষণে একটি শাড়ি খুলে গেল, দ্রৌপদী ঘুরে গেলেন। এগিয়ে গিয়ে দুঃশাসন আবার ধরলেন তাঁকে। খুলে এলো আরেকটি শাড়ি, আরেক রঙের। এইভাবে স্টেজময় ছুটোছুটি চলতো শ্রীমতী গহরের। কিন্তু আমাদের এখানে দুঃশাসন তাঁর আঁচল ধরবার পরই দ্রৌপদী আর না নড়ে জোড়হাতে কৃষ্ণের স্তব করতেন। 'দ্রৌপদী-রূপিণী' নিভাননীর পিঠে ইস্ত্রি-করা চল্লিশ গজ পাতলা শিফন কাপড়ের শাড়ি ঠিক পিঠের মাপে ভাঁজ করে একটা পাতলা তামার বাক্সে আঁটা থাকত। দুটি রোলারের সাহায্যে সেই বাক্স থেকে শাড়ি যাতে ঘুরে ঘুরে একটানাভাবে খুলে বেরিয়ে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা ছিল। দুঃশাসন এমন কৌশলে শাড়ি টানতো এবং হাতেটানার এমন কৌশল করা হয়েছিল যে, দেখা যেতো সেই শাড়ি সারা স্টেজময় ফুলেফেঁপে ছড়িয়ে আছে। যেন স্তূপাকার শাড়িতে রঙ্গমঞ্চ ঢেকে গেছে। তার পরে দেখা যেতো, শাড়ি

টানতে টানতে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে মঞ্চের ওপর বসে পড়েছে দুঃশাসন এবং পিছনে—এক জায়গায় —হঠাৎ আলো উঠত জলে—দেখা যেত শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন স্মিতহাস্যে বরাভয় মূর্তিতে।

এই দৃশ্যের জন্য নিভাননীকে বিশেষভাবে সাজতে হতো। একে তার এলোচুল, দ্বিতীয়ত, থাকত একটি ওড়না। মাথার ওপর থেকে ওড়নাটা নেমে এসে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, তার দুটি প্রান্ত থাকত দুটি কাঁধের ওপরে ফুলের মতো পিন আঁটা। ফলে বাক্সটা আর দেখা যেতো না। দুটি কাঁধের যে ফুলের থুবনী, তার ডান দিকটা থেকে বাক্সের একরঙা শাড়ির প্রান্ত দু ইঞ্চি বেরিয়ে এসে ফুলের সঙ্গে মিশে থাকত। সেই প্রান্তটিকে ধরে টানলেই বাক্সের রোলার ঘুরে গিয়ে কাপড় বেরিয়ে আসত। সবটাই পটলবাবুর পরিকল্পনা, কার্যকরী করা হয়েছিল চমৎকারভাবে।

আর-একটি শক্ত ট্রিকসিন ছিল বৃষকেতুর দৃশ্যটি। বৃষকেতুকে বসানো হতো একটি রিভলভিং চেয়ারে। চেয়ারটি ছিল ঘন নীল—বা প্রায় কালো ভেলভেট দিয়ে মোড়া। আর তার পিছনের খিলানের পর্দাটিও ছিল কালো পর্দায় ঢাকা। চেয়ারের ওপর শুধু একটা হাইলাইট ফেলা থাকত। মস্তক বিচ্ছিন্ন হবার দৃশ্যে, ঐ যে হাইলাইট ছিল তা নিভিয়ে দেওয়া হতো। কালোয় কালো যেতো মিশে। চেয়ারটা অর্ধেক করা। সামনে আসল বৃষকেতু। পিছনে—নকল বৃষকেতু আছে বসে। মুহূর্তের অবসরে চেয়ারসুদ্ধ 'বৃষকেতু'রূপী মিস লাইটকে দেওয়া হতো ঘুরিয়ে; সে চলে যেতো পর্দার আড়ালে, আর পেছনে সাজানো থাকত যে নকল বৃষকেতু, সে এসে পড়ত সামনে। এই 'নকল' বৃষকেতুকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে, তার শরীরটা ঢেকে মাথার ওপরে একটা 'পুতুল বৃষকেতুর' মস্তক বসিয়ে দিলে তাকে দেখাবে আসল বৃষকেতুর সমান। এই 'পুতুল বৃষকেতু'র মস্তকটি পেপার ম্যাঁপি দিয়ে কুমারটুলীর শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। মস্তকচ্ছেদের পর দেখা যেতো, পাঁঠা কাটবার পর ঘাড়ে যেমন থোকা-থোকা মাংস ঝুলে থাকে, ঠিক তেমনি ঝুলে আছে, এ-ও শিল্পীর মূর্তিকর্মের মুনশীয়ানা। এর পিছনেই একটি ছোট সিরাপ পাম্প ফিট করা থাকত এবং রবারের নল যুক্ত থাকত সেই ছিন্নমস্তক কাঁধটার সঙ্গে, তাই দিয়ে ঘনলাল রং পাম্প করে ছিটিয়ে দেওয়া হতো; দর্শক দেখতেন, ফিনকি দিয়ে রং উঠছে। ইতিমধ্যে 'আসল বৃষকেতু'রূপী মিস্ লাইটকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ওপরে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বৃষকেতু চিৎকার করে বলত—"বাবা, কে এসেছেন দেখ!"

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎপটটি এমন কৌশলে এসে আধখানা স্টেজের ওপর ভেঙে পড়ত যে, তার আড়ালে "নরমাংস লোলুপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ" ও 'নকল বৃষকেতু' প্রভৃতি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যেতো। করোগেটেড আয়তনের সেই স্ল্যান্টিং বেয়ে ছুটে এসে কর্ণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত বৃষকেতু।

'নকল বৃষকেতু' করা হয়েছিল চারুবালা নামের একটি ছোট মেয়েকে। সন্দেহ ছিল, মুখঢাকা অবস্থায় ঐ গরমে অতটুকু মেয়ে ঠিক বসে থাকতে পারবে কি না। ভয়ে ভয়ে মানিক দে গরমের মধ্যেও ওখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকত। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে, ঠিক মতো অভিনয় করে যেতো মেয়েটি। তার হাত-পা ছোঁড়ার কায়দাটিই ছিল দেখবার মতো। ছিন্নমস্তক হয়ে দেহের যে

নিঃশব্দ আক্ষেপ হয় তাই ফুটিয়ে তুলত সে যথাযথ। পরবর্তী জীবনে এই ছোট মেয়েটিই নাম-করা অভিনেত্রী হয়েছিল। 'মহানিশা'র অন্ধ 'ধীরা'র ভূমিকাভিনেত্রীই হচ্ছে সেদিনের এই চারুবালা। তার ঐ বৃষকেতুর দৃশ্যে দু'তিনটি সিফটারকে সমানে কাজ করে যেতে হতো। সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ।

আলোকসম্পাতের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন নরেশ মিত্র। বিশেষ করে 'নিয়তি'রূপিণী নীহারবালা যখন "কাল প্রবাহ চলে ধীরে ধীরে" গানখানি গাইতেন, তখন আলোর খেলা দেখাবার জন্য মত্ত হয়ে যেতেন নরেশবাবু। 'অ্যামবার' রঙ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কারণ, এর বর্ণ খুব উজ্জ্বল এবং এই বর্ণের মধ্য দিয়ে শিল্পীর ভাবাভিব্যক্তি সুন্দররূপে দেখতে পান দর্শক। সেইজন্য আলোর ভুল হলে নরেশবাবু মাঝে মাঝে মত্ত হয়ে সব ভুলে 'অ্যাম্‌বার অ্যাম্‌বার' বলে চীৎকার করে উঠতেন। নিজের সিন না থাকলেই তাঁকে দেখা যেতো আলোর ব্রীজের নীচে—উইঙ্গসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। যথাযথ আলোক-প্রক্ষেপনের জন্য করে চলেছেন অদ্ভুত পরিশ্রম।

যাই হোক, শেষ হয়ে ত গেল প্রথম রজনীর "কর্ণার্জুন"। অভিনন্দন পাওয়া গেল। দেখা করতে এলেন ভবানীপুরের বন্ধুরা। এলেন ভবানীপুরের এক ভদ্রলোক, সতীশবাবু, পদবীটা মনে নেই, কোন এক ইংরেজী কাগজের সাংবাদিক। তাঁকে আমাদের ভূপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কর্ণার্জুন' ক'রাত্রি চলবে বলে আপনার মনে হয়?

—তা' ৩৫।৪০ রাত্রি খুব চলবে।

—ব্যস্ ব্যস্ তাহলেই হলো!—ভূপেনবাবু খুশী হয়ে উত্তর দিলেন—চল্লিশ রাত্রি চলা কি সোজা কথা! প্রায় চার মাসের ব্যাপার। এর মধ্যে নতুন বই একটা ঠিক করে নেওয়া যাবে।

ভাগ্য এইভাবে সেদিন আমাদের জীবনে তার স্বাক্ষর রেখে গেল। ভাগ্য-পরীক্ষাই হোক আর উৎসবই হোক, এর মধ্য দিয়ে আমাদের পথ যেন স্থির হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আর, ঐ যে বৃহৎ দর্শক-গোষ্ঠী, ওঁদের সঙ্গেও যেন পরিচয়ের পর্বটা সমাধা হয়ে গেল আমাদের।

পরদিন, রবিবার পাঁচটায়, দ্বিতীয় অভিনয়। টিকিট ত আগেই শেষ, এখন পরের সপ্তাহের টিকিট হচ্ছে বিক্রি। এর কারণ হচ্ছে, রিজার্ভড সিট রাখার ব্যবস্থা। তখনকার দিনে টিকিটের হার ছিল সাধারণত ॥০, ১৲, ২৲, ৩৲। কিন্তু আমাদের হলো ১৲, ২৲, ৩৲, ৪৲, ৫৲। সর্বাগ্রে সাজানো থাকত এক সার সোফা-সিট, ৬৲ ছিল প্রতি আসনের মূল্য। এছাড়া বক্স হচ্ছে ২০৲—২৫৲। স্টেজ বক্স—৫০৲। মেয়েদের সিট তেতলায়—১৲ ও ২৲। থিয়েটারে এ ব্যাপার আগে হয়নি। একেবারে প্রথম সারির আসনগুলি অবশ্য তখনো রিজার্ভ করা চলত, কিন্তু অন্য সব আসনের জন্য ভিড় করে টিকিটের জন্য হৈ-হৈ করা, কিংবা দরজা খুললে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়া। কিন্তু, এবার, রিজার্ভের ব্যবস্থা হওয়ায় সে সব করার আর দরকার হয় না। ভিড় হচ্ছে, কিন্তু শৃঙ্খলা আছে।

আরও একটি কথা। তখন প্রমোদ-কর ছিল, কিন্তু আর্ট থিয়েটার এর দরুন কোনো বাড়তি

পয়সা খদ্দেরদের কাছ থেকে নিতেন না, নিজেরাই দিয়ে দিতেন। সেইজন্য, এক টাকা দু' আনা কি, দুটাকা চার আনা এরকম হার তাঁরা টিকিটের করেন নি।

অভিনয় যখন আরম্ভ হলো, তাকিয়ে দেখি, লোক বসেও আছে, দাঁড়িয়েও আছে। (—"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না হয় দেখব মশাই"—বলে একস্ট্রা টিকিটও লোকে কিনত)। কিন্তু নিস্তব্ধ। তখন ভিড় হলে বইয়ের প্রথম দিকে কলরব থামতে-থামতেই দুটো-একটা দৃশ্য চলে যেত। তাই পর্বটর্ব উপলক্ষে ভিড় যে হবেই, এটা ধরে নিয়ে, মূল বইয়ের আগে, কোনো ছোট-খাটো হালকা বই-টই দেওয়া হতো।

যাই হোক, দেখছি হাততালির পরিমাণ কালকের থেকেও আজ বেশী। বিশেষ করে তৃতীয় অঙ্কের ড্রপের সিনে, অর্থাৎ পাশা-খেলার দৃশ্যে। দৃশ্যটি মাত্র সবে উঠেছে, তা দেখামাত্রও লোকে হাততালি দিয়েছে, এ আমি বহুদিন পর্যন্ত দেখেছি। ঐ দৃশ্যে মঞ্চের পাটাতন লাল কার্পেটমোড়া। তার ওপরে এক ধাপ সিঁড়ি উঠিয়ে দিয়ে করা হয়েছে একটা 'ডায়াস্'-এর মতো। ডায়াসটি মূল পাটাতন থেকে দেড় ফুট উঁচু। সেই ডায়াসটি মোড়া সবুজ ভেলভেটে। তার ওপর বসে কৌরব আর পাণ্ডবদের নিয়ে পাশা খেলছেন—শকুনি। তারও উঁচুতে—দুপাশে—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এঁরা রয়েছেন বসে তাঁদের সিংহাসনে। তারও একটু ওপরে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানো রাজ-সিংহাসন। তার পিছনে একজন রাজছত্রধারী। ছত্রের তলায় বসে আছেন ধৃতরাষ্ট্র। এক পাশে, তাঁর একটু সামনের দিকে—সঞ্জয়। পিছনের দিকে, সিংহাসনের দুপাশে দুটি সুসজ্জিত চামরধারিণী। তারও ওপরে, দোতলার অলিন্দে সূক্ষ্ম নেট-এর আড়ালে, অন্তঃপুরচারিণীরা বসে আছেন, উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করছেন পাশাখেলা। আর, মঞ্চের ওপরে, অন্য পাশে, কয়েকটি সারি সারি সিংহাসন সাজানো, তাতে বসে আছেন—রাজন্যবর্গ। তারই কাছাকাছি একটি সাধারণ আসনে—বিদুর।

সব মিলিয়ে এমন একটা সাজানো-গোছানো বর্ণাঢ্য রূপ ফুটে উঠত যে, লোকের মন উঠত খুশীতে ভরে। তারপরে, দ্রৌপদীকে পণ রাখবার কথা যখন উঠছে, ধৃতরাষ্ট্র বারণ করছেন, কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা। প্রতিবাদে বিদুর করলেন সভাত্যাগ। অমনি চড়চড় করে পড়ল হাততালি। যে বিরুদ্ধ কথা বলে, সেই পাচ্ছে হাততালি। অর্জুনের ত দুটো বাঁধা 'ক্ল্যাপ'ই থাকত। তারপরে—বিকর্ণ। বিকর্ণ দ্রৌপদীকে আনবার আদেশ না শুনে যখন সভাত্যাগ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখন তার সুন্দর চেহারা, তার দৃপ্ত ভঙ্গী—এতেই ভালো লেগে যায় তাকে প্রথমে। তারপরে সে যখন কথা বলতে শুরু করে—"আমি এখনো বুঝতে পারছি না, এ সভাস্থলে অভিনয় হচ্ছে, না এসব সত্য? কুরুরাজ! সত্যই কি আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে?—' তখন ত আর কথাই নেই। তার সাকুল্যে দেড় পাতা অ্যাকটিং, এর মধ্যে তিন-তিনটে 'ক্ল্যাপ' তার বাঁধা। তারপরে, দ্রৌপদী যখন ধিক্কার দিচ্ছে, তখন 'ক্ল্যাপ', শকুনি যখন "ঋণশোধ-ঋণশোধ" বলে পাশা ফেলে দিয়ে চলে যেতেন, তখন ক্ল্যাপ, এমন কি দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর শাড়ি টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে মঞ্চের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, তখনো ক্ল্যাপ। একজন 'ভিলেন' পর্যন্ত ক্ল্যাপ পেয়ে গেল। অবশ্য,

সেটা তার খানিকটা অভিনয়ের গুণ, এবং তার শাড়িটানার কায়দাতে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হতো, তার জন্য।

এইভাবে ত প্লে হয়ে গেল। কঠোর সমালোচক ছিলেন হরিদাসবাবু। প্রথম দিন অভিনয়ের পরেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমরা—কেমন দেখলেন?

—প্রথম দিন, আজ কী বলব?

ধরলাম তাঁকে আমরা। বললাম—আজ ত দ্বিতীয় দিন, আজ কিছু বলুন?

বললেন—ভালো হয়েছে, লোকে সুখ্যাতি করছে। তবে, এইবার বেরুবে কাগজে কাগজে—সমালোচনা। অবশ্য, আমার কাছে বেশ রুচিসম্মত অভিব্যক্তিই মনে হলো সবার। বিশেষ, আপনারা যখন পোশাক পরে এসে দাঁড়ান, এমন কি সামান্য উত্তরীয়র অবস্থান নিয়েও নানান সুকুমার সঞ্চালন দেখান, তখন বাস্তবিকই একটা মায়ার সৃষ্টি হয়। তবে, অ্যামেচার প্লে করে এসেছেন, নিজেদের সুখ্যাতিই শুনে এসেছেন কেবল। এবার সুখ্যাতি-কুখ্যাতি—দুই-ই শুনতে হবে।

শুরু হলো সমালোচনা তার পরের সপ্তাহ থেকে। ইংলিশম্যান ও ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ ছোট্ট সমালোচনা বার করলেন। ইংলিশম্যানে আশি রাত্রি অভিনয়ের পরও সমালোচনা বেরিয়েছে। কবে যে কে আসছেন দেখতে, তার ঠিক নেই। 'আশি রাত্তির হয়ে গেছে, তোমাদের আর কী ছাপবো?' —এ মনোভাব তখন ছিল না। সার্ভেন্ট পত্রিকা তেইশে জুলাই লিখলেন—

"Mr. Naresh Ch. Mitra, B. L. who appeared in the role of Shakuni, left nothing to be desired in representing the part in a masterly way. Karna and Arjun, represented by Mr. Tinkowri Chakravorty and Mr. Ahindra Chowdhury respectively deserve to be mentioned next. And it is difficult to say who was the better of the two."

Amritabazar—"The main characters were ably represented. Shakuni, Karna and Arjun deserve special notice."

'শিশির' লিখলেন—"স্টার থিয়েটার যে নূতনত্ব দেখাইতেছেন, ভরসা করি, চিরদিনই তাহা দেখাইতে পারিবেন। জগতের সর্বত্র রুচি ও ভাবের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, এদেশের চিরাচরিত মলিন, নিষ্প্রাণ ভাবধারাকে বিদায় দিয়া যাঁহারা নূতনত্বের সূচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

তখন ত বলেছি, এক কাগজই এক বইয়ের বহুবার সমালোচনা বার করতেন। অমৃতবাজার আবার একদিন লিখলেন—As the performance was of a high order, it will not be out of place, we think, to make some suggestions for making the performance still better. First of all, the falling of the curtain after every scene towards the

beginning of the play disturbs the continuity of the play. And in our opinion, curtain should not fall before the end of the First act...Another great defect was that the concert all along played foreign tunes."

এই রকম বহু কাগজ লিখত। নিন্দাও হতো। 'বিজলী'তে একজন পত্রপ্রেরক লিখলেন—"একদল ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের হঠাৎ খেয়াল চাপিল, স্ফূর্তি ও পয়সা দুই-ই চাই। তাহাদের কেহ ব্যাঙ্কের সর্বেসর্বা, কেহ মহাত্মাজীর প্রধান চ্যালা ও নন-কো-অপারেশনের মুরুব্বি এবং কোষাধ্যক্ষ, কেহ সমাজনীতিচালক জমিদার ধুরন্ধর। ইঁহারা সকলেই ব্যবসায়ী এবং মা লক্ষ্মী ইহাদের অঙ্কবদ্ধ।"

এই হচ্ছে সূত্রপাত, তারপরে ক্রমান্বয়ে বসবার আসনের নিন্দা—অভিনয়ের নিন্দা—নাটকের নিন্দা ইত্যাদি। কৃতী সাহিত্যিক ও সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায় 'বাসন্তী'তে লিখলেন—"কর্ণার্জুনের অভিনয় আমি দু'বার দেখেছি এবং ভালো না লাগলে বিনি পয়সাতেও বোধ হয় কেউ দুবার অভিনয় দেখতে যায় না। তবে অভিনয় যে নির্দোষ হয়নি, একথা বলা বাহুল্য। একেবারে সকল ভূমিকার আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় কোনো দেশেই কেউ কখনো দেখেছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং কর্ণার্জুনও যে দোষে-গুণে জড়িয়ে অভিনীত হয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে, আর তা নিয়ে তিলকে তাল করবারই বা দরকার কী?···কর্ণার্জুনের অভিনয়ে অনেক নটকে এই প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখলুম এবং তাদের মধ্যে অনেকে আবার নবীনও বটে। বিলাতের এক নামজাদা নট বলেছেন—"পঁচিশ বছর অভিনয় না করলে কোনো অভিনেতার শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ হয় না। এবং তিনি আপনাকে ভালো অভিনেতা বলেও দাবী করতে পারেন না। এত বড়ো শক্ত একটা আর্ট যে নবীন নটরা প্রথম চেষ্টাতেই পুরোপুরি দখল করে ফেলবেন, এমন যুক্তিহীন আশা করাই অন্যায়। নবীনের প্রধান দোষ, অলঙ্কারবাহুল্য। কর্ণার্জুনের কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয়ের সে দোষটা আছে। অলঙ্কার খুব সাবধানে, বুঝেসুঝে, মাঝে মাঝে, ব্যবহার করতে হয়, এখানে তা হয়নি।···এই নবীন দলের অভিনয়ের মধ্যেও এমন একটা তাজা নূতনত্ব, উচ্চশ্রেণীর রসসৃষ্টির জন্যে এমন একটা উপভোগ্য প্রয়াস, আপন আপন ভূমিকাকে জীবন্ত ও সফল করবার জন্যে এমন একটা প্রচেষ্টা দেখলুম, যা অবহেলা করা অসম্ভব। এবং যার জন্য টাকা খরচ করলেও সে টাকা জলে পড়ল বলে অনুতাপ হবে না। এঁরা কেউ গড্ডলিকাপ্রবাহে সাঁতার কাটেন নি। এঁদের অনেকের মধ্যেই শক্তির অঙ্কুর আছে, আধুনিক বাংলা রঙ্গালয়ের 'প্ল্যাকার্ড-সাহিত্যে' বিখ্যাত অনেক তথাকথিত প্রতিভাবানদের মধ্যেও অত্যন্ত দুর্লভ। এঁরা কেউ মরা মানুষ বা কাঠের পুতুলের মতন রঙ্গমঞ্চের উপরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন না। এঁরা প্রস্ফুটিত পুষ্প না হলেও, কাগজের ফুল নন। এ ফুলের গন্ধ আছে, তবে তা পরিপূর্ণতার সৌরভ নয়।"

ঐ 'বাসন্তী'তেই নাট্যামোদী বলে ছদ্মনামে কেউ লিখেছিলেন—"যে নূতন সাজসজ্জা, বসিবার আসন! এই বলিলেই হইবে যে, দুই টাকা ব্যয় করিয়াও পূর্বেকার গ্যালারী অর্থাৎ ছত্রীর নিম্নে

বসিতে হয়। আর চেয়ারগুলিতে বসিয়া উঠিবার কালে দেহ অর্ধপিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক। তবে মাংসহীন লোকের পক্ষে অন্য কথা।”

এতে ছিল অভিনয়ের সর্বপ্রকার নিন্দাই বেশী। শেষের দিকে লিখেছেন—“বাংলায় যৌথ কারবার কিছুই টেঁকে না। আশা করি আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ভবিষ্যতে পুস্তক নির্বাচন এবং অভিনয়ে মনোযোগী হইবেন।”

এর উত্তর দিয়েছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব।—“আর্ট থিয়েটারের পরিচালনাধীন হয়ে স্টার থিয়েটার নবকলেবর ধারণ করেছে এবং কর্ণার্জুন নাটকাভিনয়ে তাদের রঙ্গমঞ্চে নাকি অনেক নূতনত্বের অবতারণা হয়েছে এ খবরটা অনেকের মুখে শুনেও আমি দেখতে যেতে ইতস্তত করেছিলাম কেবল ‘বাসন্তী’ পত্রিকায় ‘শ্রীনাট্যামোদী’ লিখিত কর্ণার্জুন অভিনয়ের সুদীর্ঘ সমালোচনাটি পড়ে! তারপর যেদিন দেখে এলাম—এসেই ভেবেছিলাম যে ‘নাট্যামোদী’ মহাশয়ের সমালোচনার একটা প্রতিবাদ লিখে পাঠাতে হবে, কারণ তাঁর নিছক অসত্য সমালোচনা পড়ে আমি দেখবার মতো অভিনয় না দেখে ঠকতে বসেছিলাম।…শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর এই শকুনির ভূমিকায় যে অসাধারণ অভিনয় দেখিয়েছেন, বাংলার রঙ্গমঞ্চে সে এক অদৃষ্টপূর্ব অতুলনীয় ছবি। কর্ণের ভূমিকায় শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী এবং অর্জুনের ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী যে অপূর্ব নটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই বিস্ময়কর। এইরূপ শক্তিশালী অভিনেতাগণের সমাবেশে বাংলার রঙ্গমঞ্চের যে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না।”

এরই পাদটীকায় সম্পাদক লিখেছেন—আমাদের নিজস্ব মন্তব্য এই সংখ্যাতেই মুদ্রিত করা হইল। এ সম্বন্ধে আর কোনো বাদানুবাদ বাসন্তীতে প্রকাশ করা হইবে না।”

বাসন্তী-সম্পাদক-এর নিজস্ব মন্তব্য—“বাসন্তীতে স্টারের কর্ণার্জুনের যথেষ্ট বিরুদ্ধ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। নূতনের অভিযানে যে এমনই একটা বিরুদ্ধতা সাধারণের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, আমরা জানিতাম এবং এই বিরুদ্ধতা চিরদিনই নূতনকে মলিন না করিয়া উজ্জ্বল করে বলিয়াই আমরা সে আলোচনায় বাধা দিই নাই। আমাদের আরও বিশ্বাস ছিল, যে নূতন সম্প্রদায়ে যে সকল ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা দোষগুণ বিচারপূর্ণ সমালোচনাকে শত্রুভাবে না গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবেই গ্রহণ করিবেন এবং যথাসম্ভব দোষ বর্জনের চেষ্টা করিবেন। আহ্লাদের বিষয়, আমাদের সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।…কর্ণার্জুন এখানকার প্রথম নাটক। ইহাতেই তাঁহারা যে নূতনত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি।”

আমাদের নিন্দাও যথেষ্ট হয়েছিল। যথা, নূতন যারা এসেছে তারা স্টেজে দাঁড়াতে জানে না, পিছন থেকে কথা শোনা যায় না, মেয়েলী ঢং, অর্জুন হিস্টিরিয়া-রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়ছে, ইত্যাদি। ‘অবতার’ বলে একটি পত্রিকা ছিল, তাঁরা নূতনদের দেখতে পারেন না, প্রায় একটি বছর ধরে সমানে বিরূপ সমালোচনা চালিয়ে গেছেন। কতো এক পয়সার কাগজ, আর ছোট পত্রিকা যে আমাদের

গালাগালি দেবার জন্য গজিয়ে উঠতে লাগল, তার আর ইয়ত্তা নেই। গজিয়ে ওঠে, আবার ২।৩ মাসের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এরকম বহু। আজ সেদিন থেকে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর পরে, কেউ যেন মনে না করে থাকেন, আমরা এসেই দিগ্বিজয় করেছিলাম। পদে পদে বাধা পেয়েছি। হিংসাত্মক আক্রমণও ছিল। তবু চলতে লাগল কর্ণার্জুন, তবু জনসমাগম হতে লাগল। আমার ধারণা, কর্ণার্জুন যে নাটক হিসাবে খুব উঁচুদরের, তা নয়। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, সেই প্রথমদিকে তিনকড়িবাবু এ বই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'যেমন আমাদের যাত্রার বই-টইগুলো হতো; এ' অনেকটা তা-ই আর কী ; তবে গুটিকতক ভালো দৃশ্য আছে।"

নাটকটি জমে যাবার কারণ, এই "ভালো দৃশ্য"-এর সমাবেশ। থিয়েটারী ভাষায় যাকে বলে —"জমাটি সিন।" এসব সিন তৈরী করবার জন্য নাট্যকার রীতিমত সাধনা করতেন সে যুগে। গল্প শুনেছি, গিরিশচন্দ্র যখন নতুন নাটক পড়ে শোনাতেন, তখন সেখানে অভিনেতাবর্গই শুধু নয়, সিফটাররা পর্যন্ত থাকত। এই সব সিফটার তখন বেশীর ভাগ আসত "ঘরামী" শ্রেণী থেকে। পরে আলফ্রেড-ফেরত মুসলমান সিফটার কিছু কিছু আসতে থাকে। সিফটারদের হেডকে বলতো—সর্দার। আমাদের সময়ে স্টারে ছিল, হারু সর্দার, রোগামতন পাতলা চেহারা। তা' এই রকম লোকদের তিনি কাছে ডেকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করতেন—কীরে কেমন শুনলি ?

বড়বাবু, তেমন জমাটি হলো না।

গিরিশবাবু তক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলে দিতেন সে দৃশ্য। তাঁর লিপিকার ছিলেন অবিনাশবাবু। তিনি উঠতেন 'হাঁ-হাঁ' করে। বলতেন ওকী বোঝে ? ওর কথায় যে ছিঁড়ে ফেললেন একেবারে !

গিরিশচন্দ্র বলতেন—ওরাই আসল বোদ্ধা। সাহিত্য বুঝবে না—সূক্ষ্ম রস বুঝবে না—তবে স্থূল জিনিসটা বুঝবে। দর্শকের মধ্যে বারো আনা ত ঐ স্থূল জিনিস বোঝবারই লোক। আর সূক্ষ্ম রসবেত্তা যদি এতে কিছু রস পান ত, সে আমার সৌভাগ্য।

এহেন জমাটি সিন অঙ্কে অঙ্কে ছিল ছড়ানো 'কর্ণার্জুন' বইটিতে। আমি তেইশ সাল থেকে তেপ্পান্ন সাল পর্যন্ত 'কর্ণার্জুন' করেছি, অর্জুন, কর্ণ ও শকুনি, তিনটি ভূমিকাই করেছি, নানা থিয়েটারে। যেমন, স্টার, নাট্যনিকেতন, রঙমহল, মনোমোহন, মিনার্ভা, কালিকা। দেখেছি, নাটকটি সব-সময়ই পয়সা দিয়েছে, অভিনয়ও জমেছে। শুধু কলকাতা নয়, বিদেশেও, বহু স্থানে। রেঙ্গুন থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত, প্রায় প্রতিটি বড়ো থেকে ছোট শহরে। এবং শখের দলে সে যুগে একটা বাতিকই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, যে দল 'কর্ণার্জুন করলে না, সে দল 'দল'ই নয়। কোন সংস্থাই বিফল হয়নি, অভিনয় যতো নগণ্য ও আয়োজন যতই দীন হোক না কেন ! স্টার তখন পোস্টারে যে লিখত, 'স্টারের বিজয় বৈজয়ন্তী', সে কথা অতিশয়োক্তি নয়। এই রকম হয়েছে যে, 'কর্ণার্জুন' দেখতে দলে দলে মুসলমান দর্শকও এসেছে। তখন "ঈদ" বা অন্যান্য মুসলমান পর্বদিনে থিয়েটারে "বিশেষ রজনী"র আয়োজন করা হতো, এবং বেশীর ভাগই সেটা মুসলমানী নাটক দিয়ে। কিন্তু স্টার করলে

ঈদুজ্জোহার দিন—বুধবার—৯ই শ্রাবণ ১৩৩০ (২৫শে জুলাই '২৩)—অভিনয়ের বিশেষ 'শো'র বন্দোবস্ত করলেন। বিজ্ঞপ্তি দিলে—"মুসলমান ভ্রাতৃগণের বিশেষ অনুরোধে।" কী? না, ঐ "কর্ণার্জুন"। এবং এলো প্রচুর মুসলমান দর্শক। তাঁরা আসতেন পৌরাণিক বলে নয়, "দেখবার জিনিস" আছে বলে।

এর পঁচিশ বছর পরে যখন 'কর্ণার্জুন' করেছি, সে বাহারের দৃশ্যপট নেই, কিছু নেই, ভাড়া করা সাধারণ পোশাক, সে নতুন স্টাইলও আর নেই, পুরানো হয়ে গেছে, দলে পুরানোদের দু'তিনজন থাকলেও, নতুনতর শিল্পীরই হয়েছে সমাবেশ, 'ব্ল্যাঙ্ক-ভার্স' বলতে পারে না, এমন লোকও আছে,—তবু দেখেছি, অভিনয় জমে গেছে, নাটক পয়সা দিয়েছে। এ ব্যাপার চর্মচক্ষে দেখে কী করে বলি যে, একটা নূতনত্বের মোহতেই তখন কর্ণার্জুন কেটে গিয়েছিল?

এ' নাটক খোলবার আগেও অপরেশবাবু কিছু নাটক লিখেছিলেন, 'কর্ণার্জুন'-এর পর লিখেছিলেন আরও বহু নাটক। কিন্তু 'কর্ণার্জুন'-এর মতো অন্য কোনো বই এত দীর্ঘদিন চলেওনি, এত পয়সাও দেয়নি তাঁকে। আমার কাছে যে বইটি আছে, সেটি ১৩৪০ সালের বৈশাখে প্রকাশিত, লেখা আছে "দ্বাদশ সংস্করণ।" তাহলে, দশ বছরে, বারোটি সংস্করণ, নাটকের পক্ষে কম কথা নয় এটা!

কিন্তু এ নাটকই হয়ত স্টেজে তাঁর শেষ নাটক হয়ে যেত। কারণ 'আযাধ্যার বেগম'-এর পর, যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল স্টার। আর চলে না। স্থির করেছিলেন, থিয়েটার ছেড়ে দেবেন। এবং এটি যদি ছেড়ে দেন, তাহলে তাঁকে আর অন্য থিয়েটারে গিয়ে মাত্র বেতনভুক কর্মচারীরূপে থাকতে হবে। স্টারে থাকতে আগে বহু সম্মানজনক আহ্বান উনি গ্রহণ করেননি, স্টারের মায়ায়। কিন্তু যেদিনের কথা বলছি, সেদিন তাঁর অন্য জায়গায় যাবার স্থান আর নেই। মনোমোহনে রয়েছেন—দানীবাবু। মিনার্ভা ত পুড়ে গেছে, নতুন বাড়ি যদিই বা হয়, ত উনি যেতে পারবেন না সেখানে। কারণ উপেন্দ্র মিত্রর সঙ্গের একরকম বিবাদ করেই চলে এসেছিলেন সদলবলে। সুতরাং 'এই শেষ' ভেবে সর্বশক্তি দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন—কর্ণার্জুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের পরম ভক্ত ছিলেন উনি। সেই ঠাকুরকে স্মরণ করে একান্তভাবে প্রার্থনা করেছিলেন—এই শেষ, ঠাকুর আমায় শক্তি দাও।

এই আকুলতা ঠাকুর বোধহয় শুনেছিলেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণও করেছিলেন তাঁর। তাই এ নাটকের জন্য তিনি পেলেন নতুন একটি দল, নবাগত ধনীদের অর্থভাণ্ডার, এবং এর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন সসম্মানে এবং পূর্ণ মহিমায়। এ যোগাযোগ দৈব নির্দেশ ছাড়া হয় না। দিনের পর দিন এর অভিনয় করেছি, আর লক্ষ্য করেছি এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা! বহু সুধিজনের সমাদর পেয়েছিলেন তিনি। এক ধনী ব্যক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন—সোনার দোয়াত-কলম। যে সার্থক কলম ধরেছিলেন, তা যেন সোনা হয়ে গেছে!

আট

১৯২৩—১৯২৩

ওদিকে, তিনমাস হয়ে গেল, সময়াভাবে আমাদের 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট'-এর সঙ্গে তেমন সংযোগ রক্ষা করতে পারিনি। আমি থিয়েটারে ঢুকেছি শুনে প্রফুল্ল আর কানাই বাবার কাছে ধর্ণা দিয়েছিল—ও যে থিয়েটারে গেল, আমাদের সিনেমার কাজকর্মের কী হবে? বাবা কিছু বলেন নি। শুধু এইটুকু বলেছিলেন—রাতে থিয়েটার, দিনে তোমাদের কাজকর্ম করবে। এর আর অসুবিধা কী?

তারপরে, হেমবাবু, জ্যোতিষবাবু, গোকুলবাবু, প্রফুল্ল সব বন্ধুরা এসেই থিয়েটার দেখে গেছে। ঐ যে ঈদের দিনের অভিনয়ের কথা বলেছি, সেটি ছিল 'নবম অভিনয় রজনী'—সেদিন সকালে প্রফুল্ল আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে, 'সোল অফ এ শ্লেভ'—প্যারিসে পাঠালে, ডিস্ট্রিবিউটর যোগাড় হবে পৃথিবীব্যাপী সার্কুলেশনের জন্য। বাবার সঙ্গে এসেছে সেই সম্পর্কে টাকার কথা নিয়ে। কাকে প্যারিসে পাঠান যায় ছবি দিয়ে, এও তার চিন্তার বিষয়। আমাকে দেখে বললে—তোর ত ন'রাত্রি প্লে হতে চলল, থিয়েটারের ঝামেলা নিশ্চয় কম। এবার অফিসে যাবি না?

—যাবো।

বললে—আজ তোর থিয়েটার। আজ দরকার নেই। কাল আয় আমার অফিসে বিকেলের দিকে। সেখান থেকে 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট'-এর অফিসে নিয়ে যাবো। নতুন বাড়ি তুই চিনবি না। দশ নম্বর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে এখন আর অফিস নেই, স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। অনেক ভাড়া এখন আর দেবার ক্ষমতা নেই।

লালবাজার-বেন্টিক স্ট্রীটের মোড়ে—দক্ষিণ দিকে—যে বড়ো বাড়িটা আছে, যাতে 'গ্রেস ব্রাদার্স' বলে এক অ্যামেরিকান সওদাগরী কোম্পানী এসে অফিস করেছিল, সেই বাড়ির পিছন দিক দিয়ে, অর্থাৎ "ব্যাক ইয়ার্ড" দিয়ে ওর সঙ্গে পরদিন বিকেলে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠলাম। জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরাজী, জাপানী, কতো বিদেশী সওদাগরী অফিস তখন ছিল, কিন্তু নাম করবার মতো আমেরিকান বড়ো সওদাগরী অফিস সেই প্রথম।

যাই হোক, ছোট্ট ঘর। সেই আলমারি আর টেবিল আর চেয়ার আছে, আর কিছু নেই। অল্প ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে। বারান্দা দিয়ে উঠতে হয়। দক্ষিণে একটি জানালা, আর দরজা, এ ছাড়া তিনটে দিক একেবারে চাপা। প্রফুল্ল বললে—কাজকর্ম নেই—এতো বড়ো অফিস বাড়ি রেখে কী হবে? তাছাড়া, টাকাই বা কোথায়?

একে একে আসতে লাগলেন বন্ধুরা সবাই। নেংটিদা, জ্যোতিষবাবু, গোকুলবাবু। পরামর্শ-সভা বসল। বই একটা নতুন করতেই হবে। এবং সেটা তাড়াতাড়ি। কারণ, প্রফুল্ল শীগ্‌গিরই বোম্বে যাবে বলে ঠিক হয়েছে। ম্যাডানরা তাকে বলেছে—বম্বেতে আমাদের নিজস্ব কোনো দেশী হাউস নেই, যা আছে, তাতে ইংরেজী ছবিই দেখানো হয়। এক, তোমরা যদি নিজেরা এসে ব্যবস্থা করতে পারো, ত, করো।

তা প্রফুল্ল স্থির করেছে, যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম—জানিস কাউকে ওখানে? মুরুব্বি কই? কী করে কী করবি?

প্রফুল্ল অবশ্য করিৎকর্মা লোক, কষ্টসহিষ্ণুও বটে। ও বললে—তবু দেখি।

পরবর্তী বই ঠিক করার প্রস্তাব হলো। প্রফুল্ল বললে—তোরা সব পরামর্শ করে ঠিক কর। স্টুডিও বন্ধ, চাবি আমার বাড়িতে আছে, দরকার হলে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবি। আবদুলকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। কাজ-কর্ম নেই, মিছিমিছি স্টুডিও খোলা রেখে কী হবে? জিনিসপত্র সব সরিয়ে এনে রেখেছি বাড়িতে, ওখানে আছে শুধু দেয়াল ক'টি আর কিছু কাঠ-কাঠরা। কানাইয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাইরে থেকে একটু-আধটু দেখাশোনা করে।

শুনলাম। শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম—না, আমি যাবো না। ঐ স্টুডিও, যেখানে আমরা অতো প্রাণপাত করে কাজ করেছি, সকাল থেকে সমানে খেটেছি, বাড়িতে খেতে আসতে পর্যন্ত পারিনি, মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি, জঙ্গল সাফ করিয়েছি, বাঁশঝাড়ের গোড়া উপড়ে ফেলে বাগান তৈরি করিয়েছি, সেখানে গিয়ে কী দেখবো? না, যে বাংলো প্যাটার্নের মাটির বাড়িগুলো তৈরি করিয়েছিলাম, সে মাটি ধ্বসে গেছে, চারিদিক সব আবার ভরে গেছে জঙ্গলে। সুতরাং ও-চাবি-টাবি আমি আর নেবো না, তুই ফিরে আয়, তারপর দেখা যাবে।

ও বললে—অপিসে আসিস অন্তত। বেয়ারা আছে, সে সাড়া পেলেই এসে দরজা খুলে দেবে।

যাবার সময় মুখ কাঁচুমাচু করে বেয়ারাটা কাছে এলো, সেই আমাদের পুরোনো বেয়ারা। বলল—বাবু লোগ কোই নেহি আতা।

বললাম—হাম আয়েগা।

তারপর থেকে, অবশ্য অপিসে একবার করে যাওয়া শুরু করলাম। গিয়ে বসি। তারপরে, ওখান থেকে চলে আসি থিয়েটারে। বিকেলের দিকে বন্ধুদের কেউ-কেউ আসেন। সোমবার পরামর্শ সভা বসবার কথা আছে। গোকুলবাবুকে বললাম—দীনেশবাবুকেও নিয়ে আসবেন।

এলেন দীনেশবাবু সোমবারে। বললেন—ভালো একজন লেখকের সামাজিক বই এবার করলে কেমন হয়?

বললাম—খুবই ভালো হয়। কিন্তু, যা আমাদের আর্থিক অবস্থা, তাতে করে সামাজিক কোনো

বই করতে গেলে নতুন সেট্ করতে হবে, পোশাক-পরিচ্ছদও করতে হবে, তাতে বাড়তি খরচা আছে। অথচ, যা আমাদের আছে, পোশাক বা দৃশ্যপট, তা-ই বহুলাংশে ব্যবহার করে, সঙ্গে কিছু-কিছু অবশ্য নতুন সংযোজনাও করতে হবে, করে, ঐ আগের মতনই যদি কোনো বই ধরি, তাহলে অল্প খরচায় হয়ে যায়। তারপরে ধরুন, ক্রীড সাহেব। আমাদের ছবির ব্যাপারে আধাআধি নয়, তার টাইটেল, তার ফটোগ্রাফী, ইত্যাদি ধরে, সাফল্যের মূলে বারো আনা অংশই তার অবদান বলা যায়। সেই লোককে এখন পাবো না। অবশ্য বাঙালী ফটোগ্রাফার হয়ত যোগাড় করা যায়। এমন কি, ইন্দো-বৃটিশের জ্যোতিষ সরকার, আমার থেকে যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছে, তাঁকেও বলতে পারি। কিন্তু, স্বয়ং তিনি এ-কাজ হাতে নিলেও আমার মন তেমন সায় দেবে না। ক্রীডকে দিয়ে যা হতে পারত ওঁকে দিয়ে ঠিক ততখানি কী হবে?

ওঁরা বললেন—আপনি যদি রুস্তমজীকে বলেন ত কেমন হয়? ম্যাডান ত আমাদেরই পরিবেশক। যদি খাতিরে ক্রীডকে দেয়।

—তারা ব্যবসাদার, এ-প্রস্তাব গ্রাহ্য করবে না। তবে এ-ও বলে রাখছি, এই ত তার 'নুরজাহান' হয়ে গেল, বেরিয়েছে ছবি, কিন্তু আমাদের এখানে যা করেছিল, তার অর্ধেকও সাহেব করতে পারেনি ওখানে। এখানে যে পোশাকাদি ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সে তুলেছে, তা হয়ত তেমন জাঁকজমকপূর্ণ নয়, কিন্তু কলাসম্মত হয়েছিল। আর ওখানে, জমজম-করা জরির পোশাকের এত সমাবেশ যে, তাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে, আলোর মায়া যেন মরে গেছে, যেন সব সময় সব ছবিগুলি কেবল ঝকমক করছে, আলোছায়ার তেমন খেলা কোথায়? আসল কথা, ওখানে সে চাকরি করেছে। এখানে দিয়েছে প্রাণ। ম্যাডানে সে যে খুব সুখ্যাতি অর্জন করবে তা নয়, তবে একথাও ঠিক, আমরাও তাকে আর পাবো না।

এর পরে উঠল গল্পের কথা। বললাম—ভেবেছি গল্প নাম, "বার্থ অফ মিউজিক।"

—শোনান। শোনাতে শুরু করলাম। একটি আঁকা ছবি দেখে আইডিয়াটা এসেছিল আমার মনে। তখন ছবির এগজিবিশন দেখার অভ্যাস আমার ছিল প্রচুর। বিশেষ করে, ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি থেকে যেসব খ্যাতনামা চিত্র বেরুতো, তা তখন 'প্রবাসী' প্রেস থেকে 'চ্যাটার্জিস অ্যালবাম' হয়ে প্রকাশিত হতো। বারোখানি করে ছবি থাকত এক-একটি অ্যালবামে, তার মধ্যে রঙীন ছবিও থাকত অনেক দু' টাকা করে দাম। বহু কিনেছিলাম তখন। আজ দেখছি, হারিয়ে গেছে সব, একখানিও তার নেই। সেই সব অ্যালবামে থাকত আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি, নন্দলাল বসুর ছবি, অসিত হালদারের ছবি, আবদার রহমান চোগতাই-এর ছবি এবং আরও অনেকের ছবি। এই চোগতাই সাহেব এখান থেকেই লাহোর আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। এঁর এক নিজস্ব ধারা ছিল। ছবিতে এমন একটা 'ওয়াশ' থাকত যে, তাঁর ফলে ছবিটা জুড়ে অদ্ভুত এক রহস্যময় এবং 'মিস্টিক' পরিবেশ গড়ে উঠত, যা খুব ভালো লাগত আমার। যে-ছবিটার কথা এখন উল্লেখ করতে যাচ্ছি, সেটি এঁদেরই

কারুরই আঁকা হবে, তবে ঠিক যে কার, তা মনে নেই। চোগতাই-এর হওয়াও সম্ভব। ছবিটার নাম ছিল—"বার্থ অফ মিউজিক।" ঐ রকম 'মিস্টিক' পরিবেশের মধ্যে এক শিল্পী তাঁর হাতের ওপর বীণা-যন্ত্রটি এলিয়ে দিয়ে এমনভাবে বসে আছেন, যেন দেখে মনে হয়, সুর এসে গেছে, ঠিক এইবার তিনি শুরু করবেন বাজাতে। তাঁর চোখ দুটির দৃষ্টি যেন অন্য এক জগতে গিয়ে মিলে গেছে। ছবিটা সুন্দর, রঙের অমন বর্ণফলন যে, মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এই ছবিটিকে ভেবে-ভেবেই গল্পের কাঠামো করেছিলাম, তবে লিপিবদ্ধ করিনি তখনো। আজ অবশ্য সে-গল্পের কিছুই আমার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, গল্পের সংঘটন-স্থান ছিল উজ্জয়িনী-তক্ষশিলা নয়। গল্পের কাঠামো শুনেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন দীনেশবাবু, বলেছিলেন—বেশ হবে। লিখে ফেলুন।

বললাম—দাঁড়ান, প্রফুল্ল ফিরে আসুক আগে। আসর যাতে আবার জমে ওঠে, তার জন্যই প্রফুল্ল বলে গেল—গল্প দাও হে! কিন্তু আমি জানি, টাকা নেই। ও আসুক, টাকা আগে যোগাড় করুক। এর মধ্যে গল্প নিয়ে আমরা আলোচনা সেরে রাখতে পারি।

চুকল সেদিনের পালা। ওঁরা আসেন, আলোচনাও চলে। ইতিমধ্যে বোম্বে থেকে চিঠিও দিয়েছে প্রফুল্ল। অনেক ঘুরে-ঘুরে ছোট একটা সিনেমা হাউস পেয়েছে সে। ছবি এখানে দেখানো হবে। তবে শহরের একেবারে উপকণ্ঠে। নাম নভেলটি সিনেমা। প্রফুল্লর কাছে পরে শুনেছি ও তো গিয়ে হাজির হলো নভেলটিতে। বললে—ছবি আছে। দেখবে?

—দেখাও।

দেখে হলো তাদের পছন্দ। এখান থেকে ছাপা পোস্টার ইত্যাদি সব নিয়ে গিয়েছিল প্রফুল্ল। অতএব, অচিরেই হলো ওখানে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা। নভেলটির মালিক—'মামা ওয়ারেরকর'। এঁর এদিকে শখ আছে, নাটক-ফাটকও লেখেন। বাংলা নাটকও ইনি অনেক দেখেছেন। আমাকে তখন পর্যন্ত চাক্ষুষ না দেখলেও, ছবি উনি দেখেছেন। নাম-টামও যে কানে না গেছে এমন নয়। বহু পরে, এই মামাজীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দিল্লীতে, দু-তিন-বছর আগে। 'ড্রামা সেমিনার'-এ গেছি. শচীন সেনগুপ্ত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—মামা ওয়ারেরকর, বিখ্যাত মারাঠী নাট্যকার।

আর ইনি—

মামাজী বললেন—চিনি।

—আপনি কী করে চিনলেন?

বললেন—অহীন্দ্রবাবু, 'সোল অফ এ স্লেভ' মনে পড়ে? আমারই 'নভেলটি'তে সেটি প্রথম দেখানো হয় বম্বেতে।

সবিস্ময়ে ও সহর্ষে বলে উঠলাম—আপনিই সেই মামাজী! নমস্কার—নমস্কার।

বললেন—কতবার আমি কলকাতায় গেছি, আপনাদের থিয়েটার দেখেছি। এযুগেরও দেখেছি।

আর দেখেছি সেই পূর্বতন যুগ। আজকের লোক কি আমি? গিরিশবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে বসেও আলাপ-আলোচনা করেছি। ইত্যাদি বহু বাক্যালাপ করলেন মামাজী।

এদিকে প্রফুল্ল ফিরে আসবে, তাহ'লে গল্প নিয়ে এবার সত্যি সত্যিই বসতে হয়। গল্পে মনঃসন্নিবেশ করেছি, এমন সময় এক মহাসঙ্কট উপস্থিত হলো থিয়েটারে। একদিন বৃহস্পতিবারে গিয়ে শুনলাম, তিনকড়িদার ভীষণ জ্বর, আজ পর্যন্তও আশা ছিল ছেড়ে যাবে, কিন্তু এখনো উঠতে পারছেন না। এ অবস্থায় তিনি বলে পাঠিয়েছেন—শনিবার তিনি প্লে করতে পারবেন না। শনি রবি, পর পর দুদিন অভিনয়। সেটা ছিল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ অভিনয় রজনী, ৪টা ও ৫ই আগস্ট। এখন, কে করবে 'কর্ণ'? প্রধান ভূমিকা নাটকের। অথচ কেউ তৈরি নয়। আমার নিজেরই ভয়ানক দুর্ভাবনা হলো, এমন চালু বই, হঠাৎ থমকে থেমে যাবে? প্রবোধবাবু রীতিমত চিন্তিত। অপরেশবাবুর কাছে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। ডিরেক্টররাও আসছেন।

এলেন সবাই একে একে যথাসময়েই। সবাই পড়লেন মহা দুর্ভাবনায়। প্লে বন্ধ করে দিলে হবে না, প্লের কোমর ভেঙে যাবে। অপরেশবাবু তাই বললেন—আমার অভিজ্ঞতায় বলে চলবার মুখে একবার বন্ধ দিলেই মার খেয়ে যাবে বই। বরং কোনক্রমে চালু রাখতে পারলে, এ-বই আরও চলতে পারবে কিছুদিন।

পরামর্শটা সমীচীনই মনে হলো সবার কাছে। তাঁরা বললেন—অন্য লোক দিয়ে করাতে হবে ঐ পার্ট।

কিন্তু করবে কে? ঐ অতো বড়ো পার্ট। প্রবোধবাবু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—শ্রীমান কী বলো? পারবে না? রিহার্স্যালের সময় ত দিবারাত্র থাকতে থিয়েটারে।

চুপ করে আছি। ভূপেনবাবু বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই পারবে। রাজী হয়ে যাও।

বললাম—রিহর্স্যাল অবশ্য সবই দেখেছি। দেখতে-দেখতে পার্টও মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এতো বড়ো পার্ট, সাহস হয় না।

ওঁরা তখন চেপে ধরলেন—তোমাকেই করতে হবে। লেগে যাও তুমি। এখন থেকেই স্টেজে গিয়ে পার্ট বলা শুরু করো। রাজ বৃহস্পতিবার—রাত্রিটা আছে। তারপরে শুক্রবার দিনটা আছে, রাতও আছে। প্লে শনিবার।

'হাঁ' ও 'না' কিছুই বললাম না। কিন্তু তারপরে সমস্যা দাঁড়ালো, অর্জুন তাহলে করবে কে? অপরেশবাবু বললেন—কালী এসেছে হে, কালী? কালী পাইন পারবে। ব্রজেন্দ্র বরং দ্রোণ করুক।

ব্রজেন সরকার বলে অল্পবয়সী একটি ছেলে ছিল, পুরোনো দলের। গলাটা অবশ্য ভালো। পরে অনেক ভালো ভালো পার্টও সে করেছে। যখন ওঁদের ঐ পুরোনো দলে বইটা করবার কথা হয়েছিল তখন ও-ই 'দ্রোণ'-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সুতরাং 'দ্রোণ' ওর জানা।

যাই হোক, আমি ত ওদিকে আটকা পড়ে গেলাম। স্টেজে গেলাম হাবুলকে নিয়ে। স্মারক

ছিল যুগল নামে একটি লোক, কিন্তু প্রয়োজন মতো হাবুলও স্মারকের কাজ করত। আমি ছাড়া, আরও যাদের দরকার তাদের খবর দিয়ে আনানো হলো। কালীবাবু এলেন, তাঁকে বলতে লাগল, যুগল, আমাকে—হাবুল। গেল কেটে বৃহস্পতিবারের রাত্রি। শুক্রবারে আর সবাইকে আনানো হলো পদ্মাবতী প্রভৃতিকে। তারা এসে সব দেখে শুনে বললে—বাঃ! এখনই বাধা পড়ল।

কালীবাবুর মুশকিল হলো এই যে, ভালো গোঁফ ছিল ওঁর, বড়ো শখের– বড়ো তদ্বিরের। সেটি কামাতে হলো শনিবার—প্লের দিন। অর্জুনের গোঁফ ছিল কিনা, সেটা তর্কসাক্ষেপ, কিন্তু যেহেতু আমরা, যারা অভিনয় করছিলাম, সবাই গোঁফ-কামানোর দলে, সেই হেতু অর্জুন হিসাবে ওঁকেও গোঁফ বিসর্জন দিতে হলো। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সবাই আমরা গোঁফ কামানোর দল, গোঁফ ছিল কালীবাবুর আর যুধিষ্ঠির যিনি করছিলেন সেই হেমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর। ছেলে-ছোকরা দু-একজনেরও ছিল, আর ছিল বিজয় মুখুজ্যের বেশ বড়ো এবং সুদৃশ্য গোঁফ। কিন্তু অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণের ভূমিকা করবার জন্য তাঁকেও গোঁফ কামাতে হয়েছিল।

শনিবার এসে গেল। সাজগোজ শেষ করে কালীবাবু অপরেশবাবুকে প্রণাম করতে এলেন। কালীবাবুর গোঁফ দেখতেই সবাই অভ্যস্ত ছিল। তাই গোঁফ-কামানো কালীবাবুকে দেখে অবাক হলো সবাই। মেয়েরা তাই কালীবাবুকে গোঁফ-কামানো অবস্থায় দেখে মুখ টিপে হাসল, বললে—তেমন মানাচ্ছে না।

শুনে আরও মুষড়ে পড়লেন কালীবাবু, একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল তার মুখ। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—আজই ত কামিয়েছেন। ওরা নতুন দেখছে। তাই বলছে। ওতে কান দেবেন না।

যাই হোক, অভিনয় ত শুরু হলো। কী আশ্চর্য আমার ভাগ্য, এই ত সেদিন হয়ে গেল আমার পরীক্ষা, তারপর এলো এই কর্ণ। ভেবে দেখছি, এই আমার নিয়তি। যতদিন কর্মজীবন ছিল একের পর এক পরীক্ষাই দিয়ে গেছি। 'কর্ণ' করতে অবশ্য আমার তেমন অসুবিধা হলো না। তিনকড়িদার আবৃত্তির অনুরূপ পথেই আমি অগ্রসর হলাম, শুধু এই দুদিনের মধ্যে কয়েকটা জায়গায় 'পোজ' বা 'অ্যাকসন'-এর বদল করে নিয়েছিলাম। এবং এই 'অ্যাকসন'-এর দিক থেকে দেখতে গেলে সেই রাত্রে একটা পরীক্ষা আমার হয়ে গেল অকস্মাৎ। যেখানে জামদগ্ন্যর সঙ্গে অভিনয় ছিল, প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য—জামদগ্ন্য জেগে উঠে কর্ণর অদ্ভুত সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করলেন। কর্ণর উরুতে কীট দংশন করেছে, উরুদেশ ভেদ করে দিয়েছে বজ্র কীট, রক্ত ঝরে পড়ছে দেখে অবাক হয়ে তিনি বললেন—তুমি কে, পরিচয় দাও। ব্রাহ্মণের এত বড়ো সহ্য-শক্তি ত নেই। দ্বিজকুলে তোমার জন্ম নয়। এইজন্য তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন—

"কহ সত্য—
কোন্ শক্তি সহিয়াছে
দুর্বার যন্ত্রণা এই,
ইন্দ্র যাহা সহিতে অক্ষম ?"

কর্ণ জড়িত কণ্ঠে বললেন—"প্রভু! জড়িত রসনা মোর, কী দিব উত্তর, আমি নহি দ্বিজ!"

জামদগ্ন্য বললেন—নহ দ্বিজ!

তার পরে ক্রোধে আগুন হয়ে পৈতে স্পর্শ করে বলে উঠলেন—কোন্ জাত তুমি বলো? অসত্য আচরণ করেছ। অভিসম্পাত দেবো।

কর্ণর তখন আছে প্রায় বিশ লাইন সংলাপ, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কর্ণ বললেন—

"দেব! সম্বর এ ক্রোধ!
শিষ্য বলি একবার পদাশ্রয় দিয়েছ দাসেরে,
নিষ্ফল কোরো না প্রভু, করুণা তোমার।"

তিনকড়িদা বলতেন মাঝারী গতিতে, আমি ধরলাম আর একটু দ্রুত। আমার উচ্চারণ স্পষ্ট ছিল, তাই দ্রুত বললেও লোকের বুঝতে কষ্ট হয়নি। শেষে নিজের পরিচয় দিয়ে "আমি সুতপুত্র" বলে ওঁর পায়ের উপর পড়লাম। প্রথমে হাঁটু গেড়ে, তারপরে লতিয়ে পড়লাম পায়ের ওপর। তার পরেই মনে হলো, মাথাটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, বড়ো দুর্বল লাগছে, কী যে হচ্ছে-না-হচ্ছে টের পাচ্ছি না। করতালির ধ্বনি কানে আসছে এইমাত্র।

সাষ্টাঙ্গে ত পড়েছিলাম শেষের দিকে, যখন—"দেব! আশীর্বাদ তব শাপক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা আমার!—বলছি, তখন, এক হাতে ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে দিতে হতো, কারণ মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন উনি। এতে সুন্দর একটা ছবি হতো দেখতে। যখন ঐভাবে আস্তে আস্তে উঠছিলাম, তখন কানে যাচ্ছে না ওঁর কথা; যেন দূর থেকে ভেসে আসছে ওঁর কণ্ঠস্বর! চোখেও যেন স্পষ্টভাবে দেখছি না সব! সংলাপ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে উদ্দীপনা জেগে উঠেছিল, তা একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছবার পর মাথাটা যেন হঠাৎ হালকা হয়ে গেল, মনে হলো যেন দেহ থেকে সমস্ত শক্তিটা দূরীভূত হয়ে গেল, তার পরে আমি যে পড়লাম, নিজেকে ইচ্ছা করে পড়তে হলো না, আমার আর শক্তি নেই বলে দেহটা স্টেজের ওপরে আপনিই লুটিয়ে পড়ল।

এর পরে কার্টেন। হাততালি পড়ল। স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, কারণ এক্ষুনি সিন সাজাবে সিফটাররা। বলতেও পারছি না নিজের অবস্থা, কোনক্রমে উঠে বেরিয়ে এলাম। সবাই তারিফ করলে, বললে—বেশ সিন জমিয়েছ। লোকেও নিয়েছে।

কিন্তু তার থেকেও বেশী তৃপ্তি পেলাম অন্তরে এই কথা ভেবে যে, যা আমি এযাবৎ খুঁজছিলাম, তা হঠাৎ পেয়ে গেছি। অবশ্য রোজ এটা হতো না। আরও কতো 'কর্ণ' করেছি, কিন্তু রোজ হতো না।

'বন্দিনী' নাটকে অ্যামোসিস্ : অহীন্দ্র চৌধুরী
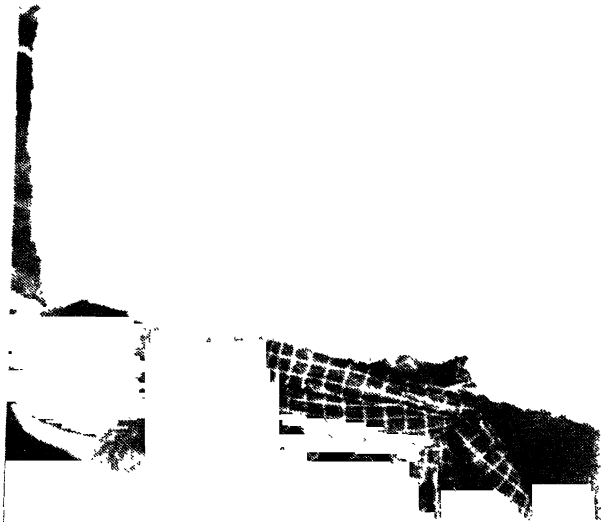
গোকুল নাগ

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নরেশ মিত্র

তখন আমার ভিতরে ভিতরে এ চেষ্টা হলো যে, এই অনুভূতিটা কী করে ধরে রাখা যায়। মাঝে মাঝে অনুপ্রেরণা আসে, কিন্তু সব দিন হয় না।

যাই হোক, সেদিনের অভিনয়ে এ-দৃশ্যই মোক্ষম দৃশ্য হয়ে গেল। এর পর যা করছি, তা দেখে দর্শক যেন সেদিন উন্মাদনায় ভরে গিয়েছিল। তিনকড়িদার বয়সটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। আমি আকারে দীর্ঘ, গঠনে বলিষ্ঠ, বয়সেও নবীন। তাতে আমাকে কর্ণ বলে যেন আগেই তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল।

কর্ণর অভিনয় শনির পরে রবিবারও করতে হলো। শনিবারের অভিনয়ের কথা শুনে তিনকড়িদা রবিবারে চলে এলেন দেখবার জন্য। একটু সুস্থ হলেও পুরোপুরি সুস্থ তিনি হননি। বললাম—এ অবস্থায় এলে কেন? আবার যদি অসুখে পড়ো?

বললেন—নারে, থাকতে পারলাম না। ভালো অভিনয় করেছিস শুনলাম। তাই দেখতে এলাম।

এত গেল ৪ঠা আর ৫ই-এর অভিনয়। কাগজে এর সমালোচনা বেরুতে আরম্ভ হলো আট তারিখ থেকে। আট তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ-এ এক পত্র বেরুলো 'নিউ কর্ণ' হেডিং দিয়ে। পত্রলেখকের নাম—মিস্টার বি. এল. সরকার। সুখ্যাতি করেছে কর্ণর এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখেছে—

Kunti and Karna offer a filling climax in the finale, where Mr. Chakravarty was left miles behind."

পড়ে বড়ো দুঃখ হলো। এটা লেখা ভদ্রলোকের উচিত হয়নি। আমি তিনকড়িদার পথেরই অনুসরণ করছি মাত্র, যদি জয় হয়ে থাকে ত সেটা যৌবনের জয়। প্রবীণকে এভাবে আঘাত করা সেদিন উচিত হয়নি। তিনকড়িদাও খুব আহত হয়েছিলেন।

'নিউ কর্ণ' হেডিং দিয়ে আরও পত্র চালাচালি হতে লাগল। আর একজন লিখলেন—

"Much that Mr. Sircar has said by way of comment or criticism on the respective merits of these actors is perfectly sound, but he might have been less severe on such veteran as Mr. Chakravarty, I take exception in particular, to the statement that Mr. Chowdhury leaves Mr. Chakravarty miles behind. This is exaggeration."

ইনি একথাও বললেন—"আরেক সপ্তাহ চৌধুরীকে দিয়ে করানো হোক, আমরা দেখি।"

তারপরে জে মিত্র বলে এক ভদ্রলোক আবার পরামর্শ দিলেন—'শনিবার একজন করুক, রবিবার আরেকজন করুক, আমরা বিচার করে দেখি।'

'শিশির' পত্রিকা লিখলে—"এইদিন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক অভিনীত কর্ণর ভূমিকা দেখিয়া আসিলাম। পূর্বে তিনকড়িবাবুর কর্ণও দেখিয়াছি, কিন্তু কোন্‌টা যে ভালো, কোন্‌টা যে মন্দ, এ বিচার বিতণ্ডা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।"

এর থেকে বোঝা যায়, দর্শকরা অভিনয় সম্পর্কে কতো আগ্রহশীল ছিলেন। সামান্য ঘটনা, কে যে কখন কোন্ ভূমিকায় বদল হচ্ছে এখনকার দিনে সে বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা হয় কী? তখন সমালোচকরা কি করতেন, তুলনা করতেন, মন্তব্য করতেন। এতে হতো এই, দর্শকের মনে একটা সাড়া জাগত, দেখবার জন্য এতে আগ্রহ বাড়তো দর্শকদের। শুক্রবারের সিনেমা-পেজ-এই নয়, এমনিতেও বেরুতো। কাগজের প্রতিনিধি যখন যেতেন, তখনই লিখতেন, কাগজ পরিসর সম্বন্ধে উদার ছিলেন।

ইতিমধ্যে একটা দুঃসংবাদ দেবার আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন পাইন হঠাৎ জ্বরে পড়লেন। এবং তারপরে মাত্র দুদিন পরেই মারা গেলেন। তাঁর তখন মাত্র আঠাশ বছর বয়স। মেয়েরা বললে—গোঁফের শোকেই গেলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, এ আমাদের মধ্যে প্রথম নক্ষত্র-পতন। অবশ্য 'কর্ণার্জুন' চলতে লাগল অব্যাহত গতিতে, দ্রোণের ভূমিকায় ব্রজেনকে নামিয়ে।

তারপরে আরও একটা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে মনোনিবেশ করলেন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ভেবে দেখলেন, এবার থেকে বুধবারে বুধবারেও একটা প্লে দেওয়া দরকার। শুধু দর্শক টানবার জন্যই নয়, ব্যবসা-পরিচালনার একটা নীতির দিক থেকেও এটা দরকার হয়ে পড়েছিল। প্রতি বুধবারে যে প্লে হতো তাতে সব 'প্ল্যাকার্ড-পাশ' দেওয়ার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাদের বাড়ির দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড-পোস্টার লাগানো হত, তাদের 'পাশ' দিতে হত। বুধবারের অভিনয়টাই ছিল প্রধানত এঁদের জন্য। রামধনু রঙের লম্বা-লম্বা সব হ্যাণ্ডবিল ছাপা হত, ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে লেখা হতো সেগুলি। মুদী-দোকানে, মনিহারী দোকানে, পানের দোকানে, সেগুলি করতো কী, পেরেক খাটিয়ে ঝুলিয়ে রাখত। এই দোকানদারদেরও দিতে হত পাস। সম্প্রতি ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে, 'কর্ণার্জুন' খোলা ইস্তক ওঁরা কেউ পাশ পাচ্ছেন না। ফলে, তাঁরা আর পোস্টার-প্ল্যাকার্ড লাগাতে দেবেন না, এমন হয়ে গেছে পরিস্থিতি। অথচ 'কর্ণার্জুন'-এর যেরকম বিক্রি, তাতে করে অতগুলো পাশ দেওয়া চলতে পারে না। এইরকম সাত পাঁচ ভেবে বুধবারে অন্য কোন বই খুলে দেওয়াই সাব্যস্ত হল। তবে, এ-ও ঠিক হল, পুরনো বই চলবে না, এবং যা তা নাটকও ধরা হবে না। হরিদাসবাবু প্রস্তাব করলেন—কবির বই করা হোক। 'রাজা ও রানী' অনেকদিন হয়নি, ওটা হোক।

'রাজা ও রানী' পূর্বে—প্রথম অভিনীত হয়েছিল গোপাললাল শীলের "এমারেল্ড" এ। তারপরে আমাদের ধরবার আগে চারপাঁচ বছর পূর্বে কয়েক রাত্রের জন্য হয়েছিল—মনোমোহনে, তবে সে অভিনয় ভালো হয়নি। এমারেল্ডে অবশ্য হয়েছিল চমৎকার অভিনয়। আমাদের অভিনয়ে ভূমিকা বণ্টন হয়েছিল। এইভাবে :—রাজা—তিনকড়িদা, শঙ্কর—নরেশবাবু, দেবদত্ত—অপরেশবাবু, কুমার সেন—আমি, চন্দ্রসেন—প্রফুল্লসেনগুপ্ত, ত্রিবেদী—নন্দগোপাল মল্লিক, রানী—কৃষ্ণভামিনী, রেবতী—গোলাপ-সুন্দরী (ছোট), ইলা—নীহারবালা, নারায়ণী—নিভাননী, প্রথম গায়িকা—সিন্ধুবালা। 'রাজা ও রাণী'

তিনকড়িদার করা বই, যৌবনে এটা করেছিলেন তিনি, তবে তখন ছিল তাঁর 'কুমার সেন'-এর ভূমিকা।

আমাদের এ বই খোলা হল—২৯শে আগস্ট ১৯২৩ সাল—১২ই ভাদ্র বুধবার রাত সাড়ে সাতটায়। ভালোই হয়েছিল আমাদের অভিনয়। সমস্ত দৃশ্যপট আর অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের আবহাওয়া সৃষ্ট করা হয়েছিল। পোশাক-আশাক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ফরমাশ মতো তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। পাগড়ী বেঁধে দিতেন এসে নিজের হাতে। জালন্ধরী বিপদ হত আমাদের। অভিনয় আরম্ভ হবে, আমাদেরও বাড়ছে উদ্বেগ, বারে বারে দরজার দিকে তাকাচ্ছি, রাখালদা এলেন কিনা। পাগড়ি বেঁধে দেবে কে?

দৃশ্যপটাদির দিক থেকে কিছু বলবার ছিল না, অভিনয়ের ব্যাপারে, মহলার সময় থেকেই প্রবীণেরা বলাবলি শুরু করেছিলেন, কুমারসেন এমারেল্ডে করতেন মহেন্দ্রনাথ বসু—মহেন্দ্র মাস্টার ছিল যাঁর চল্‌তি নাম। অমৃতলাল মিত্রের জুড়ি ছিলেন ইনি, কৃতী গিরিশ-শিষ্য। এঁকে বলা হত 'ট্রাজেডিয়ান অব বেঙ্গল'। অতি সুন্দর ছিল গলা। অমৃতবাবুর গলাও ছিল সুন্দর, কিন্তু একটু সুরেলা। মহেন্দ্রবাবুর গলা একটু গম্ভীর, সুর-বর্জিত, মানিয়ে যেত কুমারসেনে অদ্ভুতভাবে। তাঁর—"ইলা—ইলা—ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া"—যাঁরা শুনেছেন,তাঁরা বলতেন,আজও যেন তা কানে বাজে।

শুনে শুনে ভয় হত আমার। যাঁরা শুনেছেন তাঁদের বেঁচে আছেন অনেকেই। এই একটা জায়গায় কোন ত্রুটি হলেই লোকে নস্যাৎ করে দেবে। সেইজন্য, বড় সতর্ক হয়ে আর বড় ভয়ে-ভয়েই অভিনয় করেছিলাম। তিনকড়িদা ত আগে 'রাজা' করেন নি, সমস্ত পার্টটাও মুখস্থ হয়ে ওঠেনি, তাই জায়গায়-জায়গায় একটু আটকে গেলেন। কিন্তু, অভিনয় যা করলেন, তা অনবদ্য। আনন্দবাজার লিখলেন—"রাজা ও রানী"-তে পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রের অভিনয়ই ভাল হইয়াছে। বিক্রমদেব, কুমারসেন, দেবদত্ত, ইলা, সুমিত্রা, রেবতী প্রভৃতির অভিনয় ভাল হইয়াছিল।"

বসুমতী নাট্যকলা ও রীতি সম্পর্কে নানান কথা লিখে মন্তব্য করলেন—"বাঙালীর সৌভাগ্য আর্ট থিয়েটার এই ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা বাঙালার অভিনয় জগতে নূতন যুগ আনয়ন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্তী সে ভাবধারার অগ্রদূত। কর্ণার্জুনে যে অভিনবত্ব দেখিয়াছিলাম, রাজা ও রানী-তে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।"

রাজা বিক্রমদেব-রূপী তিনকড়িদার প্রতিটি দৃষ্টিপাত, প্রতিটি পদচারণা, প্রতিটি ভাবব্যঞ্জনা, প্রতিটি রসঘন অভিনয়-মুহূর্ত দর্শকের হৃদয় জয় করেছিল এবং তা সহজভাবেই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবার কাছে। সুমিত্রা-ইলারও সুখ্যাতি হয়েছিল। আর হয়েছিল 'রেবতী'র ক্ষুদ্র ভূমিকার জন্য 'ছোট গোলাপসুন্দরী'র। গোলাপসুন্দরী, এই ছোট ভূমিকাটির মধ্যে যে দ্বৈত-ভাব অন্তর্নিহিত ছিল, তাকে বাস্তবিকই ফুটিয়ে তুলেছিলেন চমৎকার। বহুদিনের অভিনেত্রী এই গোলাপসুন্দরী, "বেঙ্গল থিয়েটারে" 'দেবী চৌধুরাণী'র নাম-ভূমিকায় ইনি যে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন, তার ফলস্বরূপ তাঁকে দর্শকরা নাম দিয়েছিলেন—'দেবী গোলাপ।' তখন সাফল্যমণ্ডিত

ভূমিকা-আশ্রয় করে এক-একটা নাম গড়ে উঠত শিল্পীদের। যেমন, 'বিষাদ-কুসুম।' যাই হোক, গোলাপসুন্দরী সম্বন্ধে 'বসুমতী' লিখলেন—"শ্রীমতী তিনকড়ির লেডি ম্যাকবেথ-এর অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা 'রেবতী-অভিনয়ে' তাহার সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইবেন।'

'কুমারসেন'-সম্পর্কে 'বসুমতী' লিখেছিল—"শেষ অঙ্কে ত্রিচুড়ে প্রত্যাখ্যানের কালে কুমারসেন "ইলা-ইলা" বলিয়া যে বিফল আহ্বানে অন্তরের রুদ্ধ যাতনা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে কোন্ পাষাণের হৃদয় না সমব্যথায় উদ্বেল হইয়া ওঠে! বনভূমিতে ভাই-ভগিনীর হৃদয়দ্রাবী অভিনয় বহুদিন শ্রোতার কানে বাজিতে থাকিবে।" এইসব সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়ে ক্রমে-ক্রমে ভয় ভেঙে যেতে লাগল। এমন দিনে সংবাদ এল, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসছেন। "সার্ভেন্ট্" পত্রিকা আমাদের "রাজা ও রানী"র অভিনয়ের সংবাদের সঙ্গে এ-ও লিখলেন—Mr. Rabindranath Tagore will grace the occasion.

তাহলে, দাঁড়ালো এই, বিশ্বকবি অচিরেই দেখবেন আমাদের 'রাজা ও রানী' অভিনয়।

শুধু "সার্ভেন্ট" কেন, "ইংলিশম্যান"-ও ২৭শে আগষ্ট লিখলে যে, কবি আসছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবি আসেননি। তা সে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধনও হতে পারে, আবার ভিন্নতর কার্য ব্যপদেশেও হতে পারে। কিন্তু, কথা হচ্ছে, আজ যদি কেউ খবরের কাগজের এই বিজ্ঞপ্তিকে নিয়ে সে যুগের থিয়েটারের ইতিহাস লেখেন, বলেন যে, অমুক তারিখে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন স্টারে—"রাজা ও রানী" দেখতে, তাহলে ত সেটা সত্যের অপলাপ হবে! ব্যাপারটা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, খবরের কাগজকে অবলম্বন করে থিয়েটারের ইতিহাস লিখতে গেলে এ বিড়ম্বনা ঘটা আশ্চর্যের কিছু না। আগেও অনেকে তাই করেছেন, অর্থাৎ খবরের কাগজ দেখে থিয়েটারের ইতিহাসে লিখেছেন, আজও কেউ কেউ লিখছেন লক্ষ্য করছি। তারিখ নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, তার কারণটা বোধহয় এই-ই। বিজ্ঞপ্তিতে যথারীতি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও অভিনয় হলো না, এ আমাদের জীবনে বহু হয়েছে। থিয়েটারের সংলগ্ন পোস্টারটিতে হয়ত কাগজ এঁটে দেওয়া হলো, তাতে লেখা,—'আজ অভিনয় বন্ধ', কিন্তু, এ ঘোষণাটা যে সঙ্গে সঙ্গে কাগজেও দেওয়া দরকার, সেটা তখন ততটা রেওয়াজের মধ্যে ছিল না।

যাই হোক, 'রাজা ও রানী'র অভিনয় ত চলেছে, সুখ্যাতিও হলো প্রচুর। যখন আমি ৪ঠা আগস্ট প্রথম 'নতুন কর্ণ' করি 'কর্ণার্জুন'-এ, তার ঠিক আগের দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা' এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। তাঁর তখনকার আবাস—জু-গার্ডেন থেকে ২রা আগস্ট গোকুল নাগ লিখেছেন আমাকে চিঠি। তাতে জানতে পারলাম, প্রফুল্ল বোম্বে যাবার আগেই তাকে একটি নোটিশ দিয়ে গিয়েছিল যে, 'এখন কাজকর্ম নেই, অতএব আপনাদেরও আর দরকার নেই।'

একথা গোকুল তক্ষুনি আমাকে না জানিয়ে, জানালেন আমাকে এতদিন পরে, পত্রে। গোকুলবাবু লিখেছিলেন—"প্রিয় অহীন্দ্রবাবু, আপনাদের ফোটো প্লে সিণ্ডিকেট থেকে আমাকে

'তালাক' দেওয়া হয়েছে।" 'আপনাদের শব্দটা লক্ষণীয়। আপনাদের ফোটো প্লে সিণ্ডিকেট কখনো তিনি বলতেন না, বলতেন 'আমাদের ফোটো প্লে সিণ্ডিকেট'। শব্দটার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলাম, এবং বুঝতে পেরেছিলাম, কতখানি অভিমান তাঁর হয়েছে, এবং হওয়াটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও। কিন্তু কার্যগতিকে আমার এমনটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তারপর একটি মাস কেটে গেল, আমি আর ফোটো প্লে সিণ্ডিকেটে গিয়ে কোনো খোঁজখবরই করতে পারিনি। প্রফুল্ল এলো কিনা, সে-ও আমার জানা নেই। আমি তখন 'নতুন কর্ণ', ও তারপরে নতুন বই 'রাজা ও রানী'র প্রস্তুতি, তার নতুন দৃশ্যপটাদি নতুনভাবে করা এসব নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

গোকুলবাবুর চিঠিতে অন্য আর বিশেষ কিছু ছিল যে এমন নয়, ছিল তাঁর নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা, আর ছিল বাকী বেতনের কথাটার উল্লেখ। ওঁর চিঠিতে জেনেছিলাম, এপ্রিল থেকে জুলাই, এই চার মাসের কর্মকালে তাঁর মাসিক বেতনের হিসাবটা ধরে ১৬০৲ হয়। কিন্তু প্রফুল্লকে বলে পেয়েছেন মাত্র কুড়ি টাকা। লিখেছেন, বাকী ১৪০৲ টাকা যদি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয়, ত, তিনি বিশেষ উপকৃত হন। আর্থিক দুরবস্থার কথাও লিখেছেন। লিখেছেন এক জায়গায়, "উপস্থিত আমার যা অবস্থা, তাতে আত্মসম্মান বলে কোনো-কিছু মনে থাকা উচিত নয়।" একথা বলে স্টারে কোনো কাজকর্ম পাওয়া যায় কি না তা-ও জানতে চেয়েছেন। আর লিখেছেন—"বইগুলোও দিয়ে আসব।"

"বইগুলো"-র অর্থ হচ্ছে, ঐ যে 'চ্যাটার্জীর অ্যালবাম' বলে আগে কতগুলি ছবির বইয়ের কথা উল্লেখ করে গেছি, সেগুলি ওঁকে দিয়েছিলাম, সেট্ ইত্যাদি পরিকল্পনার একটা আভাস ওর থেকে পাওয়া যেতে পারে, মনে করে। শিল্পী মানুষ, যদি এর থেকে কোনো শিল্প-কল্পনার উদ্রেক হয়!

কাজে ব্যস্ত, কিন্তু গোকুলবাবুর কথাটা মনে মনে চিন্তা করি। স্টারে কীভাবে উনি আসবেন? সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু, প্রফুল্লের ব্যাপারটাই বা কী? টাকা নেই তা জানি, কিন্তু টাকার যোগাড়ও তার করা কর্তব্য ছিল। ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন একটা বিরক্তিই অনুভব করতে লাগলাম ফোটো প্লে সিণ্ডিকেটের ওপর! তাই, প্রফুল্ল যখন বোম্বে থেকে ফিরে এলো কলকাতায়, সেটা হবে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিক, আমি যাইনি দেখা করতে। ও নিজেই একদিন এলো—বাড়িতে। বললে—অফিসে যাও না কেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম—ব্যস্ত। বুঝতেই ত পারছ?

বললে—বিশ্রী লাগছে। লোকজন কেউ আসে না অফিসে।

—কেন? গোকুলবাবু, নেড়ুবাবু?

বললে—ওঁদের দুজনকে বোম্বে যাবার আগেই নোটিশ দিয়ে গিয়েছিলাম।

বললাম—বেশ করেছ। কাজের লোকই চলে গেল!

ও বললে—কাজ যখন হবে, তখন ডাকব। এখন কেন মিছিমিছি বসিয়ে বসিয়ে—

বাক্যটা সম্পূর্ণ না করেই ও থেমে গেল। গোকুলবাবুর কথাটি ঠিক সোজাসুজি না বলে,

অন্যভাবে পাড়লাম কথাটা। বললাম—ওদের টাকাকড়ি সব দিয়েছ? ভদ্রসন্তান, আপন কাজ মনে করে ওঁরা প্রাণপাত করে পরিশ্রম করে গেছেন!

—সে কি আর বুঝি না!—প্রফুল্ল বললে—বাকী আছে। দেখি, টাকার যোগাড় করি! দিতে হবে বই কী?

সেদিনকার মতো চলে গেল প্রফুল্ল। তারপরে আর বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। জ্যোতিষবাবু আর নেংটিদা ছিলেন বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি, ওঁরা প্রায়ই থিয়েটারে আসতেন আমার সঙ্গে গল্পসল্প করতে। তাই, ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগটা রইল অব্যাহত।

'রাজা ও রানী' চলছে। কিন্তু বুধবারের বই খুব বেশী দিন চলে না। কয়েক সপ্তাহ চলবার পর, দশই অক্টোবর খোলা হলো আমাদের "চন্দ্রগুপ্ত" বই। এ বই ত আমরা আগে করেছিলাম, তার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এর দৃশ্যপট ও অভিনয়ের সৌকর্যের দিকটাও ভেবে রেখে-ছিলাম। বই খোলার আয়োজনে, সে চিন্তায় আরও ডুবে যেতে হয়েছিল। মোট কথা 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর ব্যাপারে আমাকে কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। চাণক্য করলেন—তিনকড়িদা। কাত্যায়ন—নরেশ মিত্র। সেলুকাস—আমি। অ্যান্টিগোনস—ইন্দু। চন্দ্রগুপ্ত—দুর্গাদাস। বাচাল—সন্তোষ দাস (ভুলো)। চন্দ্রকেতু—হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। নন্দ—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। ছায়া—কৃষ্ণভামিনী। হেলেন—নীহারবালা।

বইটা শুধু আমারই নয়, আমাদের সবারই করা! নতুন মাত্র—দুর্গাদাস। 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর ভূমিকা ঠিক প্রথমেই দেওয়া হয়নি। ওর জন্য তদ্বির করেছিলেন হরিদাসবাবু। ওর নাট্যস্পৃহা নিদারুণ, প্রচণ্ড ওর উৎসাহ! কর্ণার্জুনে করল—বিকর্ণ, রাজা ও রানীতে অপরেশবাবুকে গিয়ে বললে —এ বইতে পার্ট আমার নেই। তবু আমি নামব।

একটু অবাক হয়েই অপরেশবাবু ওকে প্রশ্ন করেছিলেন—কিসে?

ও বললে—দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের একজন হয়ে। কথা যারা বলছে বলুক, আমি কথা বলব না, আমি নির্বাকই থাকব।

—বেশ।

তা', নেমেছিল দুর্গাদাস, 'রাজা ও রানী'র প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে, জনতার মধ্যে একজন হয়ে। খাদ্যের অভাবে প্রজারা উত্তেজিত হয়ে নানান কথা বলছে, 'তড়পাচ্ছে' বললেও চলে। কিন্তু, ওদের মধ্যকার জনৈক দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা হয়ে, অদ্ভুত একটি মেক-আপ নিয়ে নামলে দুর্গাদাস, যাতে তাকে আগাগোড়া শীর্ণ, খেতে-না-পাওয়া লোক বলেই মনে হয়। মুখে কথা নেই, কিন্তু আর সবাই যখন উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা কইছে উচ্চগ্রামে, ও তখন করলে কী, মঞ্চের ওপর বসে পড়ে, কোথা থেকে কী সব শাকপাতা তুলে এনেছিল, সেগুলি এমনভাবে চিবুচ্ছিল, যেন দেখলে মনে হয়, আহা! কতকাল খায়নি গো লোকটা!

আসলে চিত্রশিল্পী ত, রূপ ওর চোখে সব সময়ই ভাসে! এই রূপকে দর্শন করতে পারত বলেই ওর পক্ষে ঐটুকু ভূমিকা, তা-ও নির্বাক ভূমিকা, তাতে এমন করে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভবপর হয়েছিল! এবং দর্শকদের মধ্যে অদ্ভুত সাড়াও জেগেছিল। সকলের মধ্যেই জেগে উঠল অদম্য কৌতূহল—কে এই রূপদক্ষ শিল্পীটি?

এমন কি, দু'এক রাত্রি এ অভিনয়ে ও হাততালি পেয়েছিল।

এইসব কারণে, অর্থাৎ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়ার পরই, হরিদাসবাবু অপরেশচন্দ্রকে বললেন ওর কথা। বললেন—চন্দ্রগুপ্ত দুর্গাদাসকে দিলে কেমন হয়?

অপরেশচন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—বেশ। ভালো কথা। তাই হবে।

এইভাবে দুর্গাদাসের হলো সর্বপ্রথম বৃহত্তর ভূমিকায় অবতরণ। সাতক্ষীরের ছোট তরফের জমিদার হেমেন্দ্রবাবুর কথা আগেই উল্লেখ করেছি, ইনি ছিলেন শৌখীন ব্যক্তি, এবং ধীর স্থির লোক। যুধিষ্ঠির একে যেমন মানিয়েছিল, তেমনি অভিনয়টিও করেছিলেন চমৎকার। 'রাজা ও রানী'তে এর ভূমিকা ছিল না, কিন্তু 'চন্দ্রগুপ্ত'তে দেওয়া হলো। করলেন উনি 'চন্দ্রকেতু।' নিজস্ব ল্যাণ্ডো গাড়িতে করে তিনি আসতেন, থিয়েটারের পিছনে 'স্টার লেন'-এ রাখতেন গাড়িটা। তারপর যখন মটর গাড়ী কিনলেন, তখনো তা রাখতেন ঐ স্টার লেনে। ও'র সঙ্গে আসত ও'র নিজস্ব খানসামাটি। প্রবোধবাবু আমাদের সাজঘর করে দেবেন কথা ছিল। তা' তিনি কথা রাখলেন, যদিও মাসখানেকের মধ্যে হলো না, একটা মাস পার হয়ে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই করে দিয়েছিলেন। আমাদের সাজঘর হলো, উঠোনের পূর্ব দিকে, স্টার লেনের ওপরই একেবারে। সাজঘরের লাগোয়া ছিল চাকরদের ঘর। তারপরে ছিল সাজবার জন্য বড় ঘর একটি, তার পাশে একটি বড় হল ঘর, সেটিকে পার্টিশন করে তৈরি হলো একটা প্যাসেজ বড় করে যাবার জন্য, আর হল-এর বাকী অংশটা হলো পার্টিশন করে তিন ভাগে ভাগ করা। এর একটাতে হেমেন্দ্রবাবু, মাঝেরটিতে আমি, ও অপর দিকটাতে সাজতেন তিনকড়িদা ও নরেশবাবু। বড় ঘরটিতে সাজত—তিনজন—ইন্দু, দুর্গাদাস ও তুলসী।

স্টেজ থেকে ঢুকতে প্রথম ঘরখানাই হেমেন্দ্রবাবুর, পাশেই আমি, তাই ওঁর সঙ্গে সাজতে-সাজতেই আলাপ হতো। তামাক খাবার শখ ছিল তাঁর। নিজের গড়গড়াতে তাঁর খানসামা তামাক সেজে এনে দিতো। থিয়েটারের চাকর ছিল দুজন, একজন চা ও তামাক দেবার জন্য। আর একজন নানাবিধ ফাইফরমাশ খেটে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে মেয়েদেরই বেশী। এই আলু চপ নিয়ে এসো, পান নিয়ে এসো, এ ধরনের বহুবার বহুরকমের ফরমাশ।

কিন্তু বলছিলাম আমি হেমেন্দ্রবাবুর কথা। চাকর তামাক সেজে দিয়ে গেলেই কণ্ঠস্বর ঈষৎ উচ্চে তুলে ডাকতেন—কই, আসুন? যেতাম তখন ওঁর ঘরে। বসে বসে তামাক খাওয়াও চলত, গল্পও হতো হরেকরকম। তখনকার দিনে লোকের তামাক খাওয়া ও খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল বেশী। এখন যেমন সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে সিগারেট অফার করার রীতি আছে, তখন ঐ ধরনের ছিল

তামাক খাওয়ানোর রীতি। অপরেশবাবুর ছিল—গড়গড়া। কাছে গেলে উনিও তামাক 'অফার' করতেন। ব্রাহ্মণ মানুষ উনি, তায় যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ, সেইজন্য ওঁর গড়গড়ার নলে মুখ না দিয়ে, নিজে নিজে একটি হুঁকো করে নিয়েছিলাম থিয়েটারের একটি চাকরকে দিয়ে। সেই হুকোতে বসিয়ে নিতাম অপরেশবাবুর 'অফার-করা' গড়গড়ার কল্‌কে। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি, আমার সঠিক বয়স বোধহয় অপরেশচন্দ্র জানতেন না। পরে, যখন দানীবাবুর সংস্রবে আসি, তখন তিনিও বোধহয় বুঝতে পারেন নি। কারণ, এঁরা দুজনেই আমাকে বরাবর 'আপনি' করে কথা বলতেন। ওঁরা ছাড়া, আর যে-সব ডিরেক্টর এসেছেন, তাঁরাও তাই। শুধু ভূপেনবাবু ও নির্মলচন্দ্র ছাড়া। এর কারণ, আমি আমার সমসাময়িকদের তুলনায় বেশ লম্বা ও চওড়া ছিলাম বলে কী? অথচ, ইন্দু ও দুর্গাকে ওঁরা তুলনায় নাবালক মনে করে 'তুমি' করে কথা বলতেন। যদিও প্রবোধবাবুর কাছে আমি ছিলাম 'তুমি' সম্পর্কের মানুষ এবং ওঁর সম্বোধনে ছিলাম—'শ্রীমান',—তাহলেও অন্য সব কর্তাব্যক্তিরা সাধারণত আপনি করেই বলতেন আমাকে, মুরুব্বিগোছের ভারিক্কী লোক মনে করে। অথচ, সত্যি কথা বলতে কী, ইন্দু ছিল আমার থেকে পাঁচ বছরের বড়, দুর্গাদাস দেড় থেকে দু'বছরের বড়। এ পার্থক্যের কথা কেউ তখন ভাবেনি। সবার পরে তিনকড়িদা আর নরেশবাবুর পরেই—যেন 'সিনিয়রম্যান' আমি। হেমেনবাবুর কাছে ছেলে-ছোকরার দল বেশী ঘেঁষতো না, গম্ভীর লোক ছিলেন তিনি, অথচ, মিষ্টভাষী। ছ্যাবলামি পছন্দ করতেন না, কেউ করলে বেশ বিরক্ত হতেন, তবে, বাক্যে তা' প্রকাশ করতেন না, প্রকাশ পেতো তাঁর মুখের ভাবে। ওঁর সম্বন্ধে একটি গল্প আমার আগে থাকতেই জানা ছিল। পরিচিত হবার আগের কথাই বলছি আমি। ওঁর অভিনয়ের শখ ছিল প্রচুর, দক্ষতাও ছিল। অ্যামেচারে প্রফেশনালে করেওছেন অনেক অভিনয়। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে—চুনীলাল দেব মহাশয়ের আমলে—উনি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একবার 'গোবিন্দলাল' সেজে-ছিলেন। ফলে হ্যাণ্ডবিলে ওঁর নাম বেরুলো। সে সম্পর্কে অমর দত্ত মশায়ের 'থিয়েটার' বলে এক পয়সা দামের যে সাপ্তাহিক পত্রটি ছিল তাতে টিপ্পনি কাটলে—সাতক্ষীরের ছোট তরফের বাবু যে থিয়েটার করতে এলেন তা' এঁর উপার্জনটি, এক জমিদার-তহবিলে জমা হবে, না কী—শৌখীন প্রয়াস? হ্যাণ্ডবিলে 'অ্যামেচার' লেখা নেই।

এটা অবশ্য হ্যাণ্ডবিলে উল্লেখ করতে ভুলই হয়ে গিয়ে থাকবে। 'থিয়েটার পত্রিকা' যতদূর মনে পড়ে, দু'সীটের ছোট্ট কাগজ ছিল মাত্র। অনেক সময় এস্‌প্লানেডে অম্‌নি বিলি করে দিতে দেখেছি। সম্ভবত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ থেকে থাকবে, যা বিক্রি হবার হবে, বাকীগুলি বিলিয়ে দিও।

যাই হোক, যুধিষ্ঠিরটি সুন্দর হলো, কিন্তু চন্দ্রকেতুটি তেমন জমল না। বয়স একটু হয়েছে, যুবকদের মতো অতো প্রাণশক্তি তখন তাঁর নেই, যেটা কিনা চন্দ্রকেতুর পক্ষে প্রয়োজন। এরপর ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে, বড় বড় একটা পার্ট করতেন না আর। বুঝেছিলেন নবীনদের মতো যৌবনের দীপ্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য তাঁর নেই। তবে, অভিনয়-সম্পর্কে শখ ও আগ্রহ পূর্ণ মাত্রায়

বিদ্যমান, তাই আসতেন ঠিক থিয়েটারে। নিজের ঘরে এসে একটু বসতেন, বা প্রবোধবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন। তামাক খেতেন বসে-বসে, তারপরে এক সময় নীরবেই চলে যেতেন। তবে এটুকু অবশ্যই বলব, 'চন্দ্রকেতু'টি ছাড়া আর সব ভূমিকাই তিনি করেছিলেন চমৎকার।

আর চমৎকার হয়েছিল 'ছায়া' রূপিণী কৃষ্ণভামিনীর গান। অভিনয় সে যে চমৎকার করবে, এ আমাদের জানাই ছিল, কিন্তু, গানও যে সে সমভাবেই সুন্দর গাইবে, সেটা আমরা আগে থাকতে ঠিক ধারণা করতে পারিনি। বই যখন রিহার্স্যালে পড়েছে, তখন ইভনিং ক্লাবের বিখ্যাত 'ছায়া', যে আমাদের সঙ্গেও 'ছায়া' করেছিল, সেই অশ্বিনী বিশ্বাস আসত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। হরিদাসবাবু বলতেন—তুমি এসেছ অশ্বিনী? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমাকেই নামিয়ে দেই।

লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকত অশ্বিনী, কোন উত্তর করত না।

আরও একটি পার্ট ভালো হতো, সেটি নীহারবালার 'হেলেন'। যদিও আমার মতে, তাকে তেমন মানায় নি, আর একটু দীর্ঘাঙ্গিনী হলে ভালো হতো এবং আর একটু কম রোগা, কিন্তু অভিনয় করত সে দেখবার মতো। এমন একটি পোজ বা ভঙ্গিমা তার হতো যে একেবারে ছবির মতো। ওর এই পার্টটির জন্য আমাকে একটু খাটতেও হয়েছিল। আমার সঙ্গেই ওর পার্ট, সেইজন্য আমরাও গরজ ছিল ওকে যথাযথ রূপে তৈরি করে নেবার। তা' খেটেছিল বটে নীহার। রিহার্স্যালে তার কখনো ক্লান্তি দেখিনি, শিখবার আগ্রহেরও অভাব দেখিনি বিন্দুমাত্র। হয়তো একটু তামাক খেতে বসেছি, অমনি এসে ডাকল নীহার—দাদা, এসো।

"দাদা বলে ডাকত আমাকে। নিয়ে যেতো টেনে রিহার্স্যালে। কেমন করে দাঁড়াবে, কোন্ ভঙ্গিমা কোথায় করবে, কোথা থেকে ঠিক ক'পা এগিয়ে যাবে, কেমন করে এসে কাঁধ ধরে দাঁড়াবে, সব সে জেনে নিতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, এবং জেনে নিয়ে রীতিমত অনুশীলন করতো তার। একথা বলব, তুলে নেবার ক্ষমতাও তার ছিল অসাধারণ। যেমন শেখবার চাড়, তেমনি নিষ্ঠা। অন্য অভিনেত্রীরা এতো শিখতে আসত না, তাদের ধারণা ছিল যে—ওসব হচ্ছে নতুনদের পাগলামি, ওর মধ্যে আবার তুলে নেবার আছে কী?

নীহারের কিন্তু সে মনোভাব ছিল না। অভিনয়ের রীতিমত সুখ্যাতি হয়েছিল। কাগজ থেকে কতো আর উদ্ধৃতি দেবো তুলে? আমার কাছে সে সব দিনের কাগজগুলোর কাটিং আজও রয়েছে, পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে মনে করে সে-সব আর দিলাম না।

দেখতে দেখতে 'পুজো' এসে গেল। পারও হয়ে গেল 'পুজো।' যা দেখছি, 'চন্দ্রগুপ্ত' আরও কিছুদিন চলবে বলে মনে হচ্ছে। কর্ণার্জুন ত চলছেই। এর মধ্যে হলো কী, দর্শকদের মধ্যে মেয়ে-ছেলেদের ভিড় বাড়তে লাগল হু-হু করে। ফলে, স্টেজ-বক্স ভেঙে যে-সব নতুন সীট্ হয়েছিল দোতলায়, রূপান্তরিত করা হলো মেয়েদের আসনে নেটের পর্দার ব্যবস্থা করে। দাম হলো—তিন টাকা। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই চালু হলো এ ব্যবস্থা।

এর মধ্যে মনের দুঃখে আর ফোটো প্লে সিণ্ডিকেটে যাইনি। কী যে ওরা করলে কে জানে? থিয়েটারের ব্যাপারে মেতে আছি, যাবার অবসরই বা কোথায়, তেমন? এর মধ্যে একদিন আবার এলো প্রফুল্ল বাড়িতে। গোকলবাবুর শরীর আরও খারাপ হয়েছে, তিনি দার্জিলিং গেলেন, এ খবরও পেলাম। ভদ্রলোকের জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রফুল্লকে বললাম—টাকার কী করলি? মাইনে-টাইনে সব দিসনি কেন? সবাই বলছে! কেউ কেউ এ-ও বলছে, আপনি থিয়েটার নিয়ে মেতে যাওয়াতেই এটা হয়েছে।

প্রফুল্ল বললে—সে ত আমারও কথা। তুই যাস না কেন?

—কী করতে যাবো? কাজকর্ম হবে তার টাকা কোথায়? বকেয়া টাকাই পড়ে রয়েছে।

প্রফুল্ল সখেদে বললে—কী যে করব? টাকা ত এক আধলা নেই! নতুন কাজ আরম্ভ করতে গেলে টাকা চাই, কোথায় পাবো এখন টাকা? কে দেবে? আবার, কাজ না হলে, অর্থাৎ কাজের দৌলতে টাকা পয়সার চলাচল না হলে, ওদের টাকাই বা দিই কী করে?

প্রফুল্ল ভেবে বললে—ও, রুস্তমজীর কাছে যাই। ছবির পরিবেশনার দরুন যে পাওনা আমাদের হয়েছে, তা' যদি তাড়াতাড়ি দেয় ত বকেয়া টাকাগুলো অন্তত—

বললাম—অতো বড়ো ম্যাডান কোম্পানী, ওদের আবার সব নিয়মকানুন আছে। নিয়ম মতো যথাসময়ে তোমার হিসেব আসবে, আগে থাকতেই দেবে কী?

—তবুও চল না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাম ওর সঙ্গে। রুস্তমজী আমাকে দেখেই বললে—কী, প্রফেশন্যাল থিয়েটার করবে না, বলেছিলে যে? কথাটার তাৎপর্য ছিল। বহু পূর্বে রুস্তমজী একটা প্রস্তাব করেছিলেন। যখন আমি ফিল্ম করি, তখন ত মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতে হতো, তখনই একবার তিনি বলেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলির রাইট্ আমাদের নেওয়া আছে। ওর পুরাতন নাট্যরূপও আছে, তবে তুমি যদি নতুন ভাবে নাট্যরূপ দিতে চাও ত নিয়ে নাও! নিয়ে থিয়েটার করো। যোগদান করো আমাদের বেঙ্গলী থিয়েটারে।

তখন উত্তর করেছিলাম—প্রফেশন্যাল থিয়েটার করব না।

এবার উত্তর করলাম—কী করব, বন্ধুদের জন্য, ওদেরই পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত—

সাহেব কিন্তু উৎসাহিতই করলে। বললেন—বেশ বেশ।

তারপরে উঠল টাকার কথা। সাহেব জানালে—টাকা তো যথাসময়েই আসে। কিন্তু অ্যাকাউন্টের একটা ব্যাপার আছে। বোঝোই ত? অ্যাকাউন্ট্ ডিপার্টমেণ্টে টাকার হিসাব হবে, আমাদের কমিশন তা' থেকে কাটা হবে। তারপরে, অডিট্ আছে। তারপর পেমেণ্টের ব্যবস্থা। তা' হিসেব ছ'মাস, কি, এক বছরও পড়ে থাকে। তবে, টাকা তোমাদের মার যাবে না। ভাবনা কী অতো?

—কিন্তু এদিকে টাকা না হলে যে নতুন ছবির কাজে হাত দিতে পারছি না।

রুস্তমজী বললে—দুঃখ কী? আমাদের এখানে এসো, আমাদের ষ্টুডিওতে কাজ করো, ভালো ফটোগ্রাফার পাবে, সবই পাবে, আমাদের হয়ে কাজ করো দেখি?

চুপ করে রইলাম আমরা দুজনে। তারপরে, কিছুক্ষণ পরে বললাম—আর সব শেয়ারহোল্ডার আছে, তাদের সব জিজ্ঞাসা করে দেখব।

বেরিয়ে আসামাত্রই প্রফুল্ল বললে—শুনলে ত? বুঝলে ত সাহেবের মনোগত অভিপ্রায়? কিন্তু আমি বলি, নিজের শক্তিই শক্তি, পরের ছবি করবো কেন?

তা' ত বুঝলাম। করবি কী করে?

প্রফুল্ল বললে—চেষ্টায় আছি। অনেক রকম ফন্দী-ফিকির করছি, দেখি কী হয়। কিন্তু, তুই যেমন আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস, তাতে আর উৎসাহ পাই কী করে? আসা-যাওয়াটা শুরু কর, গল্পটাও শেষ কর, দেখবি সব একদিন ঠিক হয়ে যাবে।

সখেদে বললাম—আর ঠিক হয়েছে! লোকজন দিয়েছ ছাড়িয়ে, কাজের মানুষগুলিই চলে গেল, এখন অফিসও তুলে দাও। এস্‌টাব্লিশমেণ্টের খরচটা কমবে।

চলে এসেছিলাম। প্রফুল্ল, যতদূর মনে পড়ে, কিছু টাকা গোকুলবাবুকে যোগাড় করে দিয়েছিল, কিন্তু সব দিতে পারেনি। কোত্থেকেই বা দেবে? বোম্বেতে ছবি দেখিয়ে যা সামান্য-কিছু পেয়েছিল, তা' এস্‌টাব্লিশমেণ্টে বুঝি খরচা হয়ে গেছে। নেড়ুবাবু, প্রফুল্লরই সে আত্মীয়, তারও যথেষ্ট অভাব, তাকেও সব দিতে পারেনি সে। ওদিকে গোকুলবাবু অসুস্থ, যতদূর মনে পড়ছে কলকাতায় তিনি আর ফেরেননি, দার্জিলিঙ-এই দেহরক্ষা করেছিলেন। অতোটা আমরা কেউ ভাবিনি। উনি যে এভাবে হঠাৎ চলে যাবেন, এ আমাদের ধারণারও অতীত ছিল। যখন খবরটা পেলাম, তখন চোখে জল আসেনি, কিন্তু মনে হচ্ছিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে মুহূর্তে। ওঁদের 'কল্লোল'-এর গ্রাহক করে দিয়েছিল আমাকে, সে কল্লোল আজও আছে আমার কাছে, তাতে পড়তাম তাঁর ধারাবাহিক রচনা—'পথিক।' বেশ লাগত।

বড়ো বেদনাদায়ক ওঁর এই আকস্মিক নীরব প্রস্থানটুকু! আজ অবশ্য সঠিক স্মরণ হচ্ছে না, কলকাতায় ফিরে, তারপরে মারা গিয়েছিলেন তিনি, না, দার্জিলিং-এই ঘটেছিল তাঁর ইহজীবনের পরিসমাপ্তি?

কেউ জানে না, তিনি, শিল্পী মানুষ, অল্পদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। তিনি চলে যেতেই মনে হলো, এ'যেন একজনের মাত্র হারিয়ে যাওয়াই নয়, সুরে-বাঁধা যন্ত্রের একটি তার বুঝি অকস্মাৎ ছিঁড়ে গেল! বাইরে গেছি, শুয়েছেন এসে আমারই পাশটিতে, শুয়ে শুয়ে কতো গল্প, কতো আশা-নিরাশার কাহিনী, কতো স্বপ্নলোকের বর্ণাঢ্য কল্পনা! ঘটনাবলীর কথা তত স্মরণ নেই যত মনে আছে ভাবটা! আজও মাঝে মাঝে বেজে ওঠে সেই ছিন্ন তারখানি রীণ্‌ রীণ্‌ করে, আজও তার রেশ লেগে আছে স্মৃতির গভীরে।

স্টারে যেসব বন্ধু আসতেন দেখা করতে আমার সঙ্গে, তারা শুনলেন আমার কাছ থেকে—গোকুলবাবু আর নেই। হেমবাবুও এলেন একদিন, দুঃখ করে বললেন—অনেক আশা ছিল, কিন্তু ক্রীড চলে গেল ম্যাডানে, কর্মীরা ছিটকে পড়ল এধারে-ওধারে, গোকুলবাবুও চলে গেলেন চিরতরেই। দল ভেঙে গেল অহীনবাবু, কী করেই বা ভরসা করি ভবিষ্যতের? বলতে-বলতে একটা সংবাদ তিনি দিলেন—আমেরিকান চিত্র প্রযোজক উইলিয়াম ফক্সের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং দূর প্রাচ্য পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে ফিরে যাবেন। এখানে কীরকম ছবির চাহিদা, কাদের ওপর পরিবেশন-এর ভার দেওয়া যায়, এসব সম্পর্কে রিপোর্ট দেবেন। ডুকাসরা ওঁদের ছবি দেখাতেন, তাই এসেছিলেন আমাদের অফিসে। আমাদের ফোটো প্লে সিণ্ডিকেটের কথা বলেছি, উনি এখন ছবিটা দেখতে চাইছেন। প্রফুল্লকে বলে তার ব্যবস্থা করতে বলবেন।

পরদিনই খবর দিলাম প্রফুল্লকে। বললাম, শীগ্‌গির মুখুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করো। সাহেবটির যদি ছবি ভাল লাগে, অনেক কিছুই তিনি করে দিতে পারেন, ক্ষমতা আছে করবার।

উৎসাহিত হলো প্রফুল্ল, উৎসাহিত হলাম আমরাও। প্রফুল্ল যথাসত্বর সব ব্যবস্থা করলে। ছবিটা এক দ্বিপ্রহরে পিকচার হাউসে দেখানো হলো সাহেবকে, তারপর চা-চক্র এবং আলোচনা। সাহেব বললেন ছবিটি ত বেশ, নতুনত্ব আছে, কিন্তু বড্ড বড়ো, ছবিকে এডিট ক'রে কেটে ছোট করো।

—কত ছোট?

বললেন—প্রায় দশ হাজার আছে ত, ওকে ছয় হাজারে আনতে হবে। এবং যতদূর বুঝলাম, অতোটাই করা যায়।

সাহেব বললেন বটে, কিন্তু আমাদের অতো যত্নের, অতো চিন্তা-ভাবনা করে তৈরি করা ছবি, ওকে একেবারে আধাআধি কেটে দেওয়া—সে কি সহজ কাজ? অবশ্য, বাড়তি জিনিস অনেক আছে, কিন্তু তা বলে এতখানি?

সাহেবকে আমরা বললাম—আমাদের স্টুডিও দেখবেন? আপনাদের ফক্সেরই ফার্নডেল স্টুডিও-র মডেলে তৈরি করেছি। আগ্রহান্বিত হলেন সাহেব। দিন স্থির করে প্রফুল্ল আমাকে বললে—ঐ দিন ঐ সময় তৈরি থাকিস, তুলে নিয়ে যাবো।

আমি বললাম—নারে, আমার বড় মন কেমন করে! গিয়ে ত দেখব, চারিদিক জঙ্গলে ভরে গেছে, অগোছালো লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা!

প্রফুল্ল বললে—তোর ভয় নেই। এক্ষুনি লোক লাগিয়ে সাফসুতরো করে নিচ্ছি।

শুনল না, টেনে নিয়ে গেল আমাকেও। দু তিন দিন পরে একটা ট্যাক্সী করে সাহেব, হেমবাবু, আমি আর প্রফুল্ল এই চারজন গেলাম স্টুডিওতে। দেখলাম—জঙ্গল-টঙ্গলকে সত্যিই সাফ করিয়েছে প্রফুল্ল এবং ঘরামি লাগিয়ে ঘরদোরগুলো-বেশ করে মাটি দিয়ে নিকিয়ে দিয়েছে, এধার-ওধার একটু মেরামতও করে দিয়েছে।

সাহেব ত ঘুরেফিরে সব দেখে—অবাক। বললেন—এই এতে, অমন ছবি তুলেছ? লাইট-টাইট কিছু নেই?

আমরা বললাম—লাইট কোথায় পাবো? ঐ দিনের আলোতেই ছবি তুলেছি আমরা।

সাহেব রীতিমত খুশী হলেন আমাদের ওপর। আমরা ঐ ট্যাক্সিটা করেই ফিরে এসে, একটা ফোটোগ্রাফরের দোকানে ফোটো তুললাম চারজন মিলে। তারপরে আমি করলাম সাহেবকে নিমন্ত্রণ স্টারে এসে কর্ণার্জুন দেখবার জন্য। সাগ্রহে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন সাহেব। হেমবাবু ও প্রফুল্ল তাঁকে নিয়ে এলেন পরবর্তী অভিনয়ের সন্ধ্যায়। অভিনয়ের পর ভিতরে এলেন সাহেব ওদের সঙ্গে। বললেন—ভালোই দেখলাম থিয়েটার। তবে তুমি কি থিয়েটার করাই স্থির করেছ?

জানি না প্রফুল্লরা সাহেবকে আমার থিয়েটার করার বিরুদ্ধে কিছু লাগিয়েছে কিনা, নইলে ও প্রশ্ন কেন হঠাৎ সাহেবের মুখে? সাহেব বললেন—থিয়েটারটা না করাই ভালো, তোমার ফিল্ম-ক্যারিয়ার নষ্ট হবে।

চলে গেল সাহেব। কথাটা দু তিনবার মনের মধ্যে তোলপাড় করে ছেড়ে দিলাম। ওদিকে সাহেবেরও চলে যাবার সময় হলো। সেই যে ফোটো তুলিয়েছিলাম, তার একটি কপি দিতে গেলাম সাহেবকে। আর বললাম, আমার কপিটাতে একটা অটোগ্রাফ দিতে। সাহেব ছবিটার কার্ডবোর্ডের ওপর লিখে দিলেন—

"To Asia's Thespian par Excellence A. B. Chowdhury with sincerest wishes for continuing screen"—Joseph S. MacHenry, Nov. 1. 1923."

থিয়েটারের বিজ্ঞপ্তিতে আমি অহীন্দ্র চৌধুরী, কিন্তু নাম ত অহীন্দ্রভূষণ, তাই সাহেব লিখলেন এ. বি. চৌধুরী।

কথাপ্রসঙ্গে সাহেবকে বললাম—যদি আমেরিকা যাই ত কাজকর্ম কিছু হতে পারে?

সাহেব উত্তর দিলেন—হতে পারে না কেন বলব? এশিয়া-আফ্রিকার বহু অভিনেতাই ত হলিউডে কাজ করেন। চাইনীজ, জাপানীজ, মালয়ান প্রভৃতি বহু লোক আছে ওখানে। তবে বেশী কাজ ত তোমাদের থাকবে না। এশিয়ার পটভূমিকায় যেসব গল্প চিত্রায়িত হয় তাতেই কাজ হতে পারে তোমাদের, অন্য যেসব সাধারণ ছবি হয় ইয়োরোপীয়ান সেটিং-এ, তাতে কেমন করে হবে? অবশ্য একটা ছবিতেই যে টাকা পাবে তাতে দু বছর বসে খেতে পারবে বলে মনে হয়। বহু লোক ওখানে এভাবে জীবিকা অর্জন করেও থাকে।

এইখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা কর্তব্য, মহীশূরের এলিফ্যাণ্ট বয় 'সাবু' তখনো হলিউডে যায়নি।

কিন্তু যা বলছিলাম। আমেরিকা যাবার অভিলাষস্বরূপ মাথার পোকা বহুদিনই চঞ্চল হয়েছিল, সাহেব তাতে আরও প্রেরণা জুগিয়ে গেলেন অবশ্য। তখন আমেরিকার ছবি ক্রমাগত দেখার ফলে আমেরিকা আমাদের কাছে তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে গেছে। কতো স্বপ্ন সেদিন দেখেছি হলিউডে

যাবার! এমনকি আমি আর প্রফুল্ল দুই পাগলে মিলে পাসপোর্টের ফোটো পর্যন্ত তুলিয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, একটি পয়সাও না নিয়ে অতো যে আমরা আমাদের ছবিটার জন্য খাটলাম, তার পয়সা যদি কিছু উঠে আসে, তাহলে সেই পয়সা দিয়ে আমেরিকা চলে যাবো দুজনে! কিন্তু, সে আশা এখন সুদূরপরাহত। তবে, আকাঙ্ক্ষা ত মানুষের একেবারে মরে না, তাই ওটা মনের মধ্যে ঢুকেই রইল। ফোটো প্লে সিণ্ডিকেটের অফিস উঠিয়ে প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুললে। আলাদা করে অফিস ভাড়া দেবার সামর্থ্য আর কই? সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা। তবু ঝাঁপ বন্ধ না করে, বাড়িতে অফিসরূপী টিমটিমে আশার আলোকটুকু জ্বালিয়ে রাখতে চায় প্রফুল্ল, যদি কোনো সুবিধা হয় ভবিষ্যতে!

এর পরে, আমার আছে থিয়েটারের কাজ। নভেম্বরের কথা। 'কর্ণার্জুন' চলছে, বুধবার 'চন্দ্রগুপ্ত'ও চলছে। এবারে ঐ বুধবারের জন্য আবার একটা বই খোলার ব্যবস্থা হলো। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত জয়দেব। এবং তারপরেই ডি এল রায়ের 'পুনর্জন্ম' প্রহসনটিও হয়েছিল। নরেশবাবু পুনর্জন্মে সাজবেন যাদব, আর জয়দেবে— জয়দেব কে? না, আমি। ওঁদের প্রস্তাব শুনে ত আমি হতবাক হয়ে গেলাম! ভক্তিরসের পার্ট, ওটা কিনা শেষকালে এলো আমার ওপর? এটা কী রকম হলো? প্রবল আপত্তি করলাম আমি। প্রবোধবাবু জনান্তিকে বললেন—আপত্তি করো না হে, হলোই বা ভক্তিরস? নাট্যশিল্পী যদি সব রকম রসই না অভিনয় করতে পারে, তাহলে তার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হলো কোথায়? আর একটা কথা। দর্শকের সামনে থেকে কখনো অন্তর্হিত হয়ো না, যত সুযোগ পাবে, যেভাবে পাবে, দর্শকের চোখের সামনে থাকবার চেষ্টা করো সব সময়। উদীয়মানদের ত খুবই উচিত প্রতিটি রাত্রে দর্শকের সম্মুখীন হয়ে থাকা।

এর ওপর আর কথা নেই। সত্যিই উদীয়মান তখন আমরা, যিনি যা ভালো উপদেশ বা পরামর্শ দেন, মেনে চলবার চেষ্টা করি। কিন্তু, নিজের মনে মনে এই চিন্তাই চলল, মাস দেড়েক যেতে না যেতে এ আবার কী নতুন পরীক্ষা! সর্ব মনঃশক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম 'জয়দেব'-এর জন্য। বিখ্যাত অভিনেতা চুনীলাল দেব তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্বপ্রথম 'জয়দেব' করেছিলেন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯১২ সালে। তারপরে এই এগারো বছরে কত লোক যে জয়দেব করেছে, খ্যাতনামা আর অখ্যাতনামা, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, আমরা ভাবব চুনীবাবুরই কথা। শহর একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিলেন চুনীবাবু তাঁর 'জয়দেব' দিয়ে। একে জয়দেবের ঐ সব প্রাণ-মাতানো গান—ভূতনাথবাবুর দেওয়া সুর, তার ওপরে 'জয়দেব' হচ্ছে চুনীবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পরিচিতি-বাহক ভূমিকা! গল্প শুনেছি, চৈতন্যর ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য অভিনয়ের দিন বিনোদিনী গঙ্গাস্নান করতেন, হবিষ্যান্ন আহার করতেন, এক কথায় সর্বপ্রকার শুদ্ধাচার অবলম্বন করতেন। শুনেছি চুনীবাবুও তদ্রূপ করতেন 'জয়দেব'-এর জন্য। এই সেদিনও তাঁকে স্টারে দেখা গেছে, 'অযোধ্যার বেগম'-এ মীরকাশিম যখন করেন, তখন প্লে আরম্ভ হবার ঠিক এক ঘণ্টা আগে থাকতে সাজসজ্জা ও রূপসজ্জা-ধারণ সম্পূর্ণ

করে বসে আছেন উইংসের ধারে একখানা চেয়ার নিয়ে—চুপচাপ—একা একা। ভিতরে পাখা আছে, ওখানে ত নেই, মুহুর্মুহু হাতপাখাখানা নাড়ছেন। এ ছিল নাকি তাঁর প্রতিদিনের কাজ। এমনই নিষ্ঠা! সুতরাং, অমন নিষ্ঠাবানদের ঐ সব অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক অভিনয়, তখনো কিন্তু চুনীবাবু বেঁচে, তাঁর কাছে আমাকে সুনাম এবং কৃতিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এ এক পরীক্ষা নয় ত কী? ভগবানের স্মরণ নিয়ে প্রস্তুত হতে লাগলাম অভিনয়ের জন্য। ইত্যবসরে একটা কথা বলে নি। শনিবার রাতে—থিয়েটার ভেঙে যাবার পর—দর্শকদের ভবানীপুর-কালিঘাট অঞ্চলে ফিরে আসতে ভয়ানক অসুবিধা হতো। সেটা বুঝেই, স্টারের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন, অভিনয়ান্তে একখানি করে বাস থাকবে অপেক্ষমান ও-অঞ্চলের দর্শকদের জন্য। কর্নওয়ালিস-কলেজ স্ট্রীট-ধর্মতলা-চৌরঙ্গী-রসা রোড হয়ে হাজরা মোড় পেরিয়ে একেবারে কালিঘাট ডিপো পর্যন্ত যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ততদিনে শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। তার পিছনে একটা মজার ইতিহাসও বিদ্যমান। মহাত্মাজীর আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ ইত্যাদি একের পর এক যে-সব ঘটেছে, তার ফলে চারিদিকে মিটিং আর হরতাল খুবই হতো। ট্রাম কোম্পানীর ধর্মঘট ত লেগেই ছিল। এক সময়, সালটা ঠিক আজ মনে নেই, ট্রাম-ধর্মঘট বেশ দীর্ঘস্থায়ীই হয়েছিল। ফলে, অফিসে যাতায়াত করার কষ্ট হতে লাগল মানুষের। সেজন্য যে-সব অফিসের মাল-বওয়া-লরী ছিল, তাতে বেঞ্চি পেতে তাদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল তাদের—সে-সব জায়গায় বাবুরা এসে-এসে জড়ো হতেন, আর তাদের উঠিয়ে নিয়ে যেতো ঐ সব লরী। মালবাহী লরী, উঁচু তার পাটাতন ছেলেছোকরারা লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু মধ্যবয়সী যাঁরা, একটু বা মোটা হয়েছেন, ভুঁড়ি হয়ে গেছে বেশ, তাঁদেরই হতো অসুবিধা। অমন ভারী শরীর নিয়ে উঠবার চেষ্টা করছেন, আর ওপর থেকে ২।৩ জন তাঁদের টেনে তোলবার প্রয়াস করছে, এমন কি নীচে থেকেও ঠেলেছে,—সে এক দেখবার মতো দৃশ্য হতো বটে! মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার, তারা পুলিস-কমিশনারের অনুমতি নিয়ে এ এক ব্যবসাই চালু করলে। বাসের মতো টিকিট করলে তারা। লরীর ওপরে বেঞ্চি পাতা, একটা কাঠের মই থাকত, সেটা নামিয়ে দিতো যাত্রীদের ওঠা-নামার দরকার হলে। দিনকতক পরে দেখলাম, সেগুলির আবার মাথায় একটা চটের চাঁদোয়ার মতো টানিয়ে দিয়েছে। এই করে প্রচুর পয়সা পিটেছে তারা তখন। এই সব দেখে পুলিস কমিশনার বাস-এর লাইসেন্স ছাড়তে লাগলেন। দেখতে দেখতে, কলকাতার রাস্তায় বিচিত্র সব নামধারী বাস-এর আমদানী হয়ে গেল। জাহাজ-স্টীমার-নৌকোর নাম থাকত দেখেছি, এর পর দেখছি—বাসের নাম। আর কী সব নামের বাহার! "উর্বশী", "মেনকা", "কিন্নরী", "মা" "পথের বন্ধু", "চলে এসো"। একটা বাস চলেছে, দেখি, তার নাম তার গায়ে লেখা—"আমি যাচ্ছি"। তারপরে বেরুলো লাল রঙের সব বড়ো বড়ো বাস—ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর। এই এক কোম্পানীরই বাস ছিল অনেকগুলি। বেন্টিক স্ট্রীটের পূর্বদিকে—লালবাজার মোড়ে পৌঁছবার কিছু আগে—একটা ডিপো মতন ছিল, সেখানেই প্রধান আড্ডা হলো

বাসগুলির। এরাই প্রথম দোতলা বাস আনলে কলকাতায়। ডবল ডেকার বাস, আজকাল যা দেখা যায়, তার মত ছাদওয়ালা নয়। বৃষ্টিতে সব ছাতা মাথায় বসে আছে দোতলায়, আর বাস চলছে। গ্রীষ্মের সময় প্রচুর হাওয়া। লোকে হাওয়া খেতেও বাসে উঠত। কালিঘাট থেকে এক বাসে শ্যামবাজারে গিয়ে, আবার ঐ বাসেই কালিঘাট ফিরে আসা, এ তখন ছিল বহু লোকের শখ। ঐ যে আমাদের থিয়েটারের বাসের কথা বললাম, ওটা চালু হলো নভেম্বরের প্রথম থেকে। বলা বাহুল্য, খুবই সুবিধা হলো লোকের। একদিন হয়েছে কী, ঠিকাদার যেন কী-এক অসুবিধায় পড়ে, বাস না রেখে, লরী এনে রেখেছে, ঐ রকম বেঞ্চি পাতা। অসন্তুষ্ট হলো লোকে, এমন কি কাগজে লেখা-লেখিও একটু-আধটু করলে। তাঁরা বলেছেন—বাস-এর লোকদের কাছ থেকে টিকিট কিনব না। আপনারা থিয়েটারের টিকিটের সঙ্গে বাস-ভাড়াও অমনি ধরে নেবেন, তাতে আমাদের বহু ঝঞ্চাট বাঁচবে।

প্যাসেঞ্জারও বেড়ে যাচ্ছে। তাই স্টারের কর্তৃপক্ষ ওয়ালফোর্ড-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। একশ' সীটের বাস। বিজ্ঞপ্তি দিতেন—'একশ আসনের দ্বিতল বাস'। স্টার একে ত প্রমোদকর নিতেন না, তার ওপর বাস-এর ব্যবস্থা, যাঁরা বলতেন—বাস-এ ফিরব, বাস-ভাড়া সুদ্ধ টিকিট দিন,—তাঁদের তাই দেওয়া হতো। তাতে করে দর্শকরা সাধারণভাবে স্টারের প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে পড়েছিলেন।

যাই হোক, ২৮শে নভেম্বর—খোলা হলো জয়দেব। পার্ট তখনো সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসেনি, তদুপরি কথাগুলি ভাব দিয়ে বলতে হবে। খুব সচেতন আছি। অভিনয়ের দিন একটা অঘটন ঘটে গেল। সেটা বলতে গেলে আগে ভূমিকালিপির কথা বলে নেওয়া কর্তব্য। রাধাচরণ ভট্টাচার্য সাজল পরাশর, পুরাতন অভিনেত্রী হরিপ্রিয়া সাজল 'বিমলা'। রাজগুরু—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। পদ্মাবতী—বোধহয় কৃষ্ণভামিনী। শ্রীকৃষ্ণ—নীহারবালা। যদিও 'জয়দেব' এ সর্বপ্রথম 'শ্রীকৃষ্ণ' যিনি করেন, সেই লীলাবতী তখন স্টারেই কাজ করছেন, কিন্তু তাকে ত আর তখন 'বালক শ্রীকৃষ্ণ' সাজানো যায় না! এইবার অঘটনের কথাটা বলি। উড়িষ্যারাজ বলে একটি পার্ট আছে, সেটি করছিল—বিজয় মুখোপাধ্যায়। একটা দৃশ্য আছে, যেখানে জয়দেব আর পরাশর শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে বাঙলায় চলে আসছেন, আর জয়দেবের ওপর পাণ্ডারা অত্যাচার করায় উড়িষ্যারাজ নিজে এসেছেন ক্ষমা চাইতে। একটা ফ্ল্যাট সিন পিছনে ফেলা রয়েছে। আমরা স্টেজের বাঁদিক থেকে বেরিয়ে মাঝামাঝি জায়গায় এসে অ্যাক্টিং শেষ করে আবার ডানদিক দিয়ে প্রস্থান করব। সেইমত বেরিয়েছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, উড়িষ্যারাজ পিছনেই পড়ে আছে, সে আর এগুচ্ছে না। বুঝলাম, বিজয়ের পার্ট মুখস্থ হয়নি, প্রম্পট্ শুনে শুনে সে পার্ট বলতে চায় আর কী! প্রম্পটার 'উড়িষ্যারাজ' বলে ধরিয়ে দিয়েছে, আর সে গড় গড় করে বলে চলেছে। আমার কথাটাও বলে দিলে, তারপরে কথা ছিল, তার কথাও বলে দিলে। আমরা হতভম্ব! ব্যাপার কী, আমাদের মুখ খুলতেই দেবে না, নাকি?

কিন্তু একটু পরেই বোধ হয় ওর খেয়াল হলো ব্যাপারটা। অমনি করলো কী, সোজা 'প্রভু' বলে এসে পড়ে গেল আমার পায়ের ওপরে। এবং সেই যে পড়ল, আর ওঠে না। রাধাচরণ পুরানো লোক, বোধ হয় বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে বললে—বেলা হলো অনেক, এবার চলুন।

আমিও বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলে গেলাম উড়িষ্যারাজকে যে আমি ক্ষমা করেছি, তাঁর যে এতে কোন দোষ নেই, এ সবই ছিল আমার সেই বানানো কথার অর্থ। কিন্তু, বিজয়ের ছিল তখন ঐ ব্যাপার, পার্ট মুখস্থ করবে না, অথচ স্টেজে নামবে! কর্ণার্জুনে—ছোট ছোট ৩।৪টা পার্ট করত সে। বেঞ্চিতে যেখানে পোশাক সাজানো থাকত, তার সন্নিহিত দেয়ালে পেরেক ঠুকে বিভিন্ন ভূমিকানুযায়ী তার মাথার পরচুলগুলি সারি সারি সাজানো থাকত। গেরুয়া, কি অন্য রঙের কাপড় একটা পরাই থাকত, তার ওপরে জামাও থাকত। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে সে স্টেজের বাইরে ঘুরছে, কখনো বুকিং-এ যাচ্ছে, কখনো অফিসঘরে যাচ্ছে, আর পার্ট এসে গেছে জানতে পেরেই, উর্ধ্বশ্বাসে গ্রীনরুমের দিকে দে ছুট। তাড়াতাড়ি গায়ের চাদরটা ফেলে দিয়ে, একটা চুল টেনে মাথায় পরে নিয়ে একেবারে স্টেজে এসে হাজির। সে পার্টটা সেরে—আবার একটু ঘুরতে বেরুলো। তারপরে আবার পার্ট আসতে আবার দৌড়ঝাঁপ! 'স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীট'-এর ওষুধের দোকানে দিনের বেলা কাজ করত, সন্ধ্যায় থিয়েটার। নানান অভিনেতা-অভিনেত্রীর নানারকম টুকিটাকি ফরমাস সে অম্লানবদনে গ্রহণ করছে, অফিসের পর ঐ সব কিনে নিয়ে সে বাড়ি চলে যেতো, বাড়ি থেকে আসত থিয়েটারে। একদিন এই তাড়াহুড়োর মাঝে 'কর্ণার্জুন'-এর একটা সিনে সে বেরুতে পারল না, সিনটা মিস্ করল। তবে পাবলিক থিয়েটারের অভিনেতা, আর তার পাকা প্রম্পটার, এ দর্শককে বুঝতে দিত না যে, একটি ছোট চরিত্র দৃশ্যে প্রবেশ করল কি না! তা সেদিন ওর সিন মিস্ করার জন্য ওকে অপরেশবাবু খুব বকেছিলেন। আর সেই বকাবকি থেকেই আমি সেদিন বুঝতে পারলাম যে, যে কাজের জন্য ও প্যারিশ্রমিক পায় অর্থাৎ স্টেজে অ্যাক্টিং করা, সেটাতেই ফাঁকি দেয়, আর যেগুলি বেগার তাতেই তার মনঃসংযোগটা বেশী।

যাই হোক, 'জয়দেব'-এ বিজয়ের ঐ ব্যাপারে এই শিক্ষাটা হলো যে, নিজের প্রস্তুতিই অভিনেতার সব কথা নয়, সহশিল্পীর প্রস্তুতিও তার লক্ষ্যের বস্তু হওয়া উচিত। আর থাকা উচিত—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিত-বুদ্ধি। রাধাচরণ তখন বানিয়ে ওভাবে না বলে, আমার কী দশা হতো!

'জয়দেব'-এর পরে ধরা হলো অযোধ্যার বেগম ৫ই ডিসেম্বর। কিন্তু 'তারাসুন্দরী' ত অবসর-জীবন যাপন করছেন, স্টেজের সঙ্গে যুক্ত রইলেন না; তাই প্রধান ভূমিকা এবার করলেন—হরিপ্রিয়া। তেমনটি হলো না, আবার একেবারে 'দূর ছাই'ও হলো না। এতে পুরোনো দলই বেশী, নতুনরাও রইলাম। অপরেশচন্দ্র করলেন তার পুরানো পার্ট—হাফেজ রহমৎ। এতে ওঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হতে হলো। যেমন রোহিলাদের উত্তেজিত করছেন তিনি অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের

শেষাশংটুকু—'এ পৃথিবীতে ধন ঐশ্বর্য যাহা কিছু পার্থিব সম্পদ হারালে আবার পাওয়া যায়, কিন্তু ইমান একবার হারালে আর ফেরে না!' এখানে 'ইমান' বলে কণ্ঠস্বর উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে একেবারে 'তারা'য় তুলে আবার তাকে নামিয়ে আনলেন সাবলীলভাবে, যা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়! একে ত ভরাট গলা, তার ওপরে কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা! নিছক চীৎকার নয়, চমৎকার সুরেলা স্বর-প্রক্ষেপণ!

প্রফুল্ল সেনগুপ্ত করলে তার পুরানো পার্ট—ফৈজুল্লা। রাধাচরণেরও সেই ভূমিকা, সেই 'সোনার কমল ভাসিয়া দিয়ে, আমি, ভাসছি নয়ন জলে' গান! সন্তোষ দাস (ভুলো)-এরও পুরানো পার্ট—আসফউদ্দৌলা। তিনকড়িদা—মীরকাশিম। ব্যাস রায়—নরেশ মিত্র। আমি—সুজাউদ্দৌলা। ইন্দু—সাদৎ আলি। ছায়া—কৃষ্ণভামিনী। জিন্নৎ—নীহারবালা প্রভৃতি।

এরপর হলো আমাদের 'কর্ণার্জুনে'-এর জুবিলি—৮ই ডিসেম্বর। পঞ্চাশৎ অভিনয়। বাংলা থিয়েটারের নাটকের জুবিলি উৎসব সেই প্রথম। দিনটা শনিবার, সন্ধ্যা সাতটায়। ঠিক সেই আগের বারের মতো বাড়ি সাজানো আলো আর ফুল দিয়ে, ঠিক সেই রকম সানাইয়ের সুর বেজে চলা। এছাড়া 'চিত্রে কর্ণার্জুন' বলে একটা পুস্তিকা ছাপিয়ে দর্শকদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে, তাতে ব্লক করা সব কর্ণার্জুনের ছবি, তার মধ্যে একখানি কি দুখানি আবার ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করা। আর, ছাপানো হয়েছে তাতে কর্ণার্জুনের সব গানগুলো। এখনকার আমলে যেমন শিল্পী ও কর্মীদের মধ্যে প্রাইজ দেওয়া হয়, তখন তা দেওয়া হতো না। তখন ছিল বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্য থেকে মেডেল প্রভৃতি ডিক্লেয়ারের ব্যাপার। সেটা কেউ কেউ পেয়েছেন ইতিমধ্যে, কিন্তু পরে সে নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল। চল্লিশ রাত্রি চলবার পর স্থির হয়েছিল, যার যা দেবার, তা জুবিলীর দিন দিতে হবে। জুবিলীর উৎসবের বিজ্ঞপ্তি থেকেই এ উপহারের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা যাক। 'অদ্য রজনীতে বাংলার সর্ব সৎকার্যের অগ্রণী ও উৎসাহদাতা কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীমান মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহোদয় আমাদের সুযোগ্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে এবং গ্রন্থকারকে সুবর্ণ পদক উপহার দিবেন। এবং অন্যান্য নাট্যশিল্পানুরাগী মহোদয়গণ কর্তৃক নিম্নলিখিত অভিনেতৃবর্গ সুবর্ণ পদক উপহার পাইবেন—শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী নিভাননী।'

ইতিপূর্বে তিনকড়িদাকে একটি স্বর্ণ পদক আর-নরেশবাবুকে তিনটি সোনার পদক উপহার দিয়েছিলেন নিবারণ দত্ত মশাই। আর অপরেশচন্দ্রকেও তিনি দিয়েছিলেন সোনার দোয়াত কলম।

জুবিলীর দিন শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে মিষ্টান্ন ভোজনেও আপ্যায়িত করা হলো। শত রজনীতে হয়েছিল অন্য ব্যাপার। একদিন ভোজও হলো গদাধর মল্লিক মহাশয়ের বাগানবাড়িতে। অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধবাবুর বন্ধু এই গদাধর মল্লিক ছিলেন আর্ট থিয়েটারের একজন শেয়ার হোল্ডার, পরে ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। যশোর রোডের ওপর এঁর ছিল বিস্তৃত ও সুন্দর করে সাজানো এক বাগানবাড়ি। এখানে প্রায়ই গিয়ে থাকতেন অপরেশচন্দ্র, জানকীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নাটক লেখবার

সুবিধে হবে বলে। গদাধরবাবু ছিলেন অপরেশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি, এঁকে তিনি তাঁর 'ইরাণের রাণী' বইখানা উৎসর্গও করেছিলেন। 'ইরাণের রাণী'র ব্যাপারটা একটু পরেই বলছি। ভোজের ব্যাপারে অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধবাবু দুজনেই খুব উৎসাহী ছিলেন। অপরেশচন্দ্রও রাঁধতে পারতেন বহুরকম। তাঁর বাবা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ও ভালো রাঁধতে জানতেন। তাঁর বই 'পাক প্রণালী' খুবই বিখ্যাত ছিল। ওদিকে রান্নার আয়োজন হচ্ছে, বাগানের মাঝখানে স্নিগ্ধসলিলা এক মনোরম সরোবর, তার চারিদিকে আমরা শিশুর মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি, দোলনায় দোল খাচ্ছি, সে এক আনন্দের দিনই গেছে বটে! রাত্রে এলেন সব ডিরেক্টররা। খেতে খেতে ঠিক হলো, নাটক চলাকালীন প্রত্যেক দশ রাত্রিতে এক একজন ডিরেক্টরের পড়বে খাওয়াবার পালা। রাজি হলেন তাঁরা। এই অনুপাতে আরও পাঁচ রাত্রি ভোজ হয়েছিল আমাদের, ঐ 'কর্ণার্জুনের' সূত্র ধরেই অবশ্য।

তারপরে শুরু হলো অন্য কথাবার্তা। সোমবার ভোজ হলো, ঠিক হলো বুধবারের জন্য নতুন বই পড়বে। এবং তার কাজ বুধবার থেকেই শুরু হবে, মাঝে মঙ্গলবার, মঙ্গলবারেই সকলকে থিয়েটারে যেতে বললেন অপরেশবাবু। আমাকে বললেন—অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডাচেস অফ পাডুয়া'কে অবলম্বন করে নতুন এক নাটক লিখেছি। ভালো পার্ট আছে আপনার।

খুশী হলাম। ভুপেনবাবুর গাড়িতেই ফিরে এলাম খুশী মনে। পরদিন গেলাম থিয়েটারে। অপরেশবাবু বসে আছেন, পার্ট সব দেওয়া হলো। আমাকে দিলেন 'দারা'র পার্ট। বললেন নাটকের নামকরণটা এখনো হয়নি, দুয়েক দিন পরে জানাবো নাম।

নাটকের শেষের দিকে সবটা লেখা হয়নি। বললেন—মহলা চলুক, দু এক দিনের মধ্যেই শেষ করে দিচ্ছি।

অপরেশচন্দ্র হাতব্যাগে পাণ্ডুলিপি চাবি দিয়ে রাখতেন। যতক্ষণ সাট হচ্ছে, ততক্ষণ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকতেন তিনি। এর কারণ থিয়েটারের বই বড্ড চুরি হয়। একটা বই কোনো থিয়েটারে মহলায় পড়েছে, অমনি লোকজন ধ'রে, গোপনে, ঘুষ দিয়ে, প্রতিপক্ষ থিয়েটারের লোক পাণ্ডুলিপি বার করে নিয়ে তাকে রাতারাতি কপি করিয়ে নিয়ে আবার তখ্‌খুনি যথাস্থানে রেখে গেছে, এরকম ঘটনার কথাও শোনা যায়। প্রমথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা' যখন মিনার্ভায় চলছিল, তখন চুনীবাবুর ন্যাশনালে 'নীলসর্পী' নাম দিয়ে ঐ একই বিষয়বস্তুর এবং ঐ একই ধরনের নাটক অভিনীত হয়েছিল, অবশ্য সে নাটক বেশী দিন চলেনি।

তারপরে বুধবার ত অভিনয় ছিল, বৃহস্পতিবার থেকে লেগে যাওয়া গেল নতুন নাটক নিয়ে। এদিকে বড় দিন এসে গেছে—পর পর ক'রাত্রি প্লে—সে'সব বজায় রেখে, তবেই না নতুন নাটকের প্রস্তুতি! তার পোশাক আছে : সেট আছে। এসবই নতুন করতে হবে, নতুন না হলে আর্ট থিয়েটার করতে চাইত না। ঠিক হয়েছিল—বড়দিনেই নতুন বই খুলতে হবে। অতএব, ব্যস্ত হয়ে পড়ল রীতিমত। কাহিনীর পরিবেশ ও কাল অনুযায়ী সেট ও পোশাক করতে হবে, আমি তার জন্য বই-টই

নিয়ে এসে হাজির করলাম। এবার নতুনত্বের মধ্যে হলো এই, মধ্যে মধ্যে ঐ যে কার্টেন ফেলে নেওয়া, ওটা যথাসম্ভব পরিহার করা হল, যদিও একেবারে বাদ দেওয়া যায়নি ব্যাপারটা। অপরেশবাবু খানিকটা হিসেব করেই এবার নাটক লিখলেন। আমরাও সিন সাজালাম সেইভাবে। এখন ত আমাদের হয়েছে দক্ষিণাবাবুর স্ট্রিংকনসার্টের ব্যাণ্ড, তাঁরা সখীদের নাচের সঙ্গে বাজালেন, অবশ্য এটাও নতুন কিছু নয়, এর আগে কোহিনূরে এঁরাই বাজিয়েছিলেন। নতুনত্ব হলো, এঁদের আবহ সঙ্গীত বাজানো। অ্যাকটিং-এর অ্যাকসনের সঙ্গে উপযুক্ত বাজনা বাজিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করা।

যাই হোক, নতুন নাটকের ভূমিকালিপি হয়ে দাঁড়ালো এই—রাজা দায়ূদসা—অপরেশচন্দ্র, দারা—আমি, পিতৃবন্ধু নাদের সা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, দারার গ্রাম্যবন্ধু ইয়ুসুফ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কাজী—দুর্গাদাস। দিনেরাত্রে মহলা চলেছে। থিয়েটারেই থাকি বলা যায়। এই নাটকে আঙুর ক্ষেতের দৃশ্যটা দুর্গাদাস এঁকে ছিল। দেখতাম, রাত্রিবেলা, বড়ো বড়ো আলো সাজিয়ে নিয়ে, দুর্গাদাস স্টেজের একধারে একমনে বসে বসে আঙুরের ক্ষেত আঁকছে, শরীরটা তখন ওর সুস্থ ছিল না, কাজের তাগিদে বাড়ি যায় না, প্রবোধবাবুর ঘরেই থাকে।

এ নাটকের গানের সুর দিয়েছিলেন—পেয়ারা সাহেব। মেটিয়াবুরুজের মস্ত গাইয়ে, বহু রেকর্ড ছিল তাঁর। মেয়েদের মতো গলা, বিখ্যাত ওয়াজেদ আলি সা'র বংশধর। ঠুংরিতে ওস্তাদ ছিলেন। নাটকের সুরও দিয়েছিলেন ঠুংরিভাঙা। মিনার্ভায় ছিল সুবাসিনী, মিনার্ভা তখন বাইরে বাইরে ঘুরে থিয়েটার করে বেড়াচ্ছে, ও আর ঘুরতে পারছে না বলে মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে আমাদের স্টারে এলো। সাজলো এসে 'গুলরুখ'—চাষীর মেয়ে—আঙুর ক্ষেতের রানী। এঁর মুখে গান ছিল। গানগুলির অমন সুর, তার ওপরে ও গাইতও ভালো, যেন মাতিয়ে দিতো। সখীদের নাচ আমাদের এত ভালো হতো না, কিন্তু নীহারবালা 'নর্তকী' সেজে রাজদরবারের একটি 'তাম্বুরীণ নৃত্য' যা প্রদর্শন করলে তা দেখবার মতো! 'রানীরূপিণী কৃষ্ণভামিনীকে' অপরেশচন্দ্র সুন্দর তৈরি করিয়ে ছিলেন, আমি তাকে সিঁড়ি দিয়ে ভঙ্গি ভরে ওঠা আর নামা, চলা আর ফেরা, এসব দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

মহলা ত পুরো দমে চলেছে। তার ওপরে বড়দিন এসে গেল—দিনে মহলা—রাতে প্লে। তখন নিয়ম ছিল, বড়দিনে বই খুলতেই হবে। চেষ্টা চলেওছে বড়দিনে নতুন বই দেবার। নাচের মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঐ স্টেজেই। হৈ-হৈ ব্যাপার। গাঁদা ফুল—দেবদারু পাতা—নিশেন—আলো—এসব দিয়ে চতুর্দিক সাজনো। বাল্‌বগুলিতে প্রয়োজনমতো আবার ল্যাকার দিয়ে রঙ করা হচ্ছে। সেই যে কর্ণার্জুন খোলবার সময় ল্যাকার দেওয়া হয়েছিল, তারপর আর হয়নি, বহু বাল্‌বের রঙই বিবর্ণ অথবা ফিকে হয়ে গেছে।

এর মধ্যে আমার মেয়ে মীরা ভূমিষ্ঠ হয় আমার শ্বশুরবাড়ি ইটালিতে—২৯শে ডিসেম্বর, শনিবারে। মা বললেন—মেয়ে হয়েছে দেখতে যাবি না?

বললাম—দাঁড়াও, অশৌচ কাটুক।

বড়দিনে ৮।১০ দিন উপরি-উপরি প্লে, দিনে নতুন বইয়ের মহলা, একে 'অশৌচ' ছাড়া আর কী বলব?

এত চেষ্টাতেও নতুন বই বড়দিনে খোলা গেল না, খোলা হলো—১লা জানুয়ারী, ১৯২৪। নাটকের নাম, অপরেশচন্দ্র অতঃপর ঘোষণা করলেন—"ইরাণের রানী"।

নয়

১৯২৪—১৯২৪

তেইশ সাল এমনি করেই চলে গেল। এই তেইশ সাল আমার জীবনে স্মরণীয় বৎসর। এই সালেই আমার প্রথম অভিনীত প্রথম সিনেমায় আত্মপ্রকাশ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই সালেই আমার প্রথম অবতরণ, এবং এই সালেই আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। যেদিনের কথা বলছি, সেদিন পয়লা জানুয়ারী—মঙ্গলবার—'ইরাণের রানী'র উদ্বোধন রজনী। যথাসময়ে অভিনয় শুরু হলো। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। 'কর্ণার্জুন'-এর উদ্বোধন থেকে শুরু করে এই যে ছ' মাস গত হয়ে গেছে, এর মধ্যে স্টারের নিজস্ব এক দর্শকমণ্ডলী গঠিত হয়ে গেছে। তাঁদের উৎসাহ, এবং তার ওপরে আর্ট থিয়েটারের নতুন নাটক, সবাই একেবারে উদ্গ্রীব হয়ে আছেন! অভিনয়ে মুখ্য-চরিত্রে আমরা জনা ছয়েক, আর সব খুচরো। পরদিন বুধবার। আর 'ইরাণের রানী' বুধবারেরই বই, সেইজন্য পর-পর দু'দিন অভিনয় হলো, দ্বিতীয় দিনও অডিটোরিয়াম লোকে লোকারণ্য। অভিনয় সকলেই খুব প্রাণ দিয়ে করেছিলাম, মনে আছে। কর্ণার্জুনে যত রিহার্স্যাল দিয়েছি, এতে ততটা দিতে পারি নি, তবু কোনো ভয় বা সংকোচ ছিল না। 'অর্জুন'-এ গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ ছিল, চলাফেরা একেবারে 'মাপা' ছিল, এতেও খানিকটা তাই, তবে সেবার চলাফেরার ব্যাপারটা যেভাবে মাথায় রাখতে হয়েছিল, এবার ততটা নয়। এবারে ওটা যেন অভ্যাসগত হয়ে গেছে, ও আর মনে রাখার তেমন দরকার নেই, অথচ আপনিই সব হয়ে গেছে। এই সাবলীলতা 'দারা'র অভিনয়ে এত এসে গিয়েছিল যে, নিজেই খুশী হচ্ছিলাম নিজের কাজে: এ আত্মতৃপ্তি অভিনেতার পক্ষে কম কথা নয়! প্রথম দৃশ্য—ইস্পাহান—অগ্নিমন্দির-সম্মুখস্থ চত্বর, পাথরের বেদী, তার সামনে দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে, এই নির্বাক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যবনিকা উন্মোচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় কনসার্ট, যেটা পর্দা ওঠবার সময় থেমে যাবার কথা, সেটা না থেমে তখনো বেজে চলেছে, তবে খুব মৃদু ঝংকারে! এমন সময় একদিক থেকে 'দারা' ও 'ইয়ুসুফ' রূপী আমি ও ইন্দু প্রবেশ করলাম, দুজনেই গ্রাম্যযুবক, প্রথম গ্রাম থেকে শহরে আসবার দরুন যে সংকোচ, সেটা রয়ে গেছে, অথচ অন্তরে আছে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা, যার বশবর্তী হয়ে বেরিয়ে

পড়েছি দুজনে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। ইয়ুসুফ ক্লান্তি অনুভব করে বসে পড়ল পাথরের ওপর, এবং সেই থেকে যে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল, কোথায় আর আটকায়নি তার সাবলীল স্রোতধারা, অনিবার্য সমাপ্তিতে গিয়ে ঠিক তার পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে!

তারপরে দেখা গেল, দারা মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে, অধুনা রাজার সভাসদ এবং দারার পিতৃবন্ধু নাদের সা, এসে দারাকে বলে গেলেন, এই রাজ্যের রাজাই হচ্ছে তার পিতৃহন্তা, তাকে হত্যা করতে হবে। পিতৃহন্তা! দারা হাতে ছোরা নিয়ে একাকী সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল, প্রতিশোধ নিতেই হবে, করতেই হবে রাজাকে হত্যা! এমন সময়, মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এক অলোকসামান্য রূপসী, সঙ্গে তার লোকজন, সখিবৃন্দ। অগ্রসর হয়ে প্রস্থানপথের দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন সেই রূপসী, অতর্কিতে মিলন হল চারি চক্ষুর। এমনি করে এক অপূর্ব বিস্ময়ের সঞ্চার হলো দারার মনে। রানীর মনে কী হয়েছিল কে জানে! তাদের দু'জনের সেই মুগ্ধবিস্ময়কে মুখর করে আবহসঙ্গীত বাজতে লাগল দ্রুত লয়ে! তারপরে, অপূর্ব ভঙ্গিমায়, তার দিকে দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছেন সেই সুন্দরী, আর ঠিক সেই সময়ে দারার হাত থেকে তার অজ্ঞাতসারেই খসে পড়ল ছোরাখানা। অস্ফুট কণ্ঠে দারা বলে উঠলেন—কে! ইনি কে?

পার্শ্ববর্তী জনৈক নাগরিক উত্তর দিলে—ইরানের রানী।

কার্টেন পড়ে গেল।

অতঃপর, সেই সভাসদ নাদের সা'র গোপন ষড়যন্ত্র বলেই দারা হয়ে দাঁড়ালেন রাজার পার্শ্বচর। এবং পার্শ্বচর হয়ে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠলেন রাজার প্রিয়পাত্র। তারপরে এলো সেই দৃশ্য, যেখানে দারা গোপনে রাজাকে হত্যা করতে যাবেন। আট-দশ ধাপের একটা উঁচু সিঁড়ি বেয়ে রাজার কক্ষে প্রবেশ করা যায়। এই কক্ষটা গভীর অন্ধকার দেখাবার জন্য—আগাগোড়া কালো রঙ্-করা। যখন কালো রঙ্ করার প্রস্তাব হলো, প্রবোধবাবু অবাক হয়ে বললেন—সিন আবার আগাগোড়া কালো রঙ্ করা হবে কী। তিনি রাজী হলেন না। তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। নতুন একটা সিনকে কালো রঙ্ করে নষ্ট না করে পুরানো সিনের উল্টো পিঠে এঁকে নাও।

তাই হলো। একটা সিনের উল্টোপিঠ কালো রঙ্ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই আগাগোড়া কালো-রঙ্-করা দৃশ্যপটের পটভূমিকা—মঞ্চে কোনো আলো নেই, শুধু ফোকাসে ধরে নেওয়া আছে পাত্র-পাত্রীদের। ঐ যে উঁচু সিঁড়ি বললাম, সিঁড়ির ওপরে একটা চত্বর, তারপরে একটা খিলেন, সেখানে পর্দা দেওয়া, পর্দাটা নীলরঙের। তার ওপরে অঙ্কিত রয়েছে সোনালী রাজদণ্ড। পর্দার অন্তরালস্থিত কক্ষটিই হচ্ছে রাজার শয়নকক্ষ। কালো আঙ্‌রাখা পরা—সেখানেই উঁচু করে টেনে নিয়ে মুড়ি দিয়ে সন্তর্পণে একাকী মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন দারা, ছোট্ট একটা ফোকাস্ তাঁর ওপরে এসে পড়েছে মাত্র। দেয়াল ঘেঁষে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগুচ্ছেন তিনি—আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আবহ-সঙ্গীতের মূর্ছনা—একটু করে এগুচ্ছেন—আর যেই মনে হচ্ছে 'কার যেন পদশব্দ শুনলাম'—অমনি সঙ্গে

সঙ্গে আসছেন পিছিয়ে। সচকিত হয়ে দেখছেন চারিদিক। তারপরে যখন মনে হচ্ছে, না—কেউ না—ও মনেরই ভ্রম, তখন একটু আশ্বস্ত হয়ে আবার এগিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চত্বরে পৌঁছলেন। এইভাবে মিনিট দুই ধরে চলল সেই মূকাভিনয়। চত্বরে যখন পৌঁছেছেন, তখন ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা! রক্তাক্ত ছুরিকা হাতে পর্দা ঠেলে—রাজার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন, কে? না, স্বয়ং—রানী। তাঁকে দেখামাত্রই দু'তিন ধাপ নেমে এসেছিলেন দারা। দারা এবার একটু নীচে, রানী চত্বরে। একটু থেমে দুজনেই দুজনকে দেখলেন নির্বাক বিস্ময়ে! তারপরে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে নেমে এলেন রানী, জানালেন, দারার জন্যই এ সর্বনাশ করেছেন তিনি, দারার প্রতি দুর্নিবার প্রেম অনুভব করার ফলেই সম্ভব হয়েছে এই অভূতপূর্ব সংঘটন! বলা যায়, রানী স্পষ্টত প্রেম-নিবেদন করলেন দারার কাছে। কিন্তু ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল দারার নাসিকা, বললেন—তুমি স্বামীহন্তা!

—তোমারই জন্য।

কিন্তু সে প্রেম প্রত্যাখ্যান করলেন দারা। এবং সেই প্রত্যাখ্যাত প্রেম প্রতিহিংসার দাবানল হয়ে জ্বলে উঠল মুহূর্তেই। রানীর ইঙ্গিতে চারিদিক থেকে বল্লম-হস্তে ছুটে এলো প্রহরীর দল। রানী জানালেন রাজা খুন হয়েছেন।

—কে খুন করেছে?

রানী দারার দিকে হাত তুলে দেখালেন—ঐ লোকটা। রানী তখন ছিলেন সিঁড়ির ওপরে, দারা নীচে সিঁড়ির ধারে। অমনি সমস্ত উদ্যত বল্লম চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল দারাকে। রানীর মুখে ক্রুর হাসি।

এর পরে এলো বিচারের দৃশ্য। তিন থাক গ্যালারীর মতো সাজানো, ওপরে রানী বসে আছেন, পাশে মন্ত্রীকে নিয়ে। মাঝের থাকে লাল পোশাক পরা—প্রধানতম কাজী বা বিচারক। তাঁর পাশে অন্যান্য বিচারক। এবং নীচে, আদালতের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। বাঁ পাশে কাঠগড়ার মতন—তার মধ্যে কিউবের মতো একটা বসার মতো স্থান—পাশে দারার পিতৃবন্ধু সর্দার নাদের। অন্যদিকে প্রহরী ও দর্শক। এক কথায় সমস্ত দৃশ্যটিতে ওপর থেকে শুরু করে পাদপ্রদীপ পর্যন্ত, লোকে লোকারণ্য। প্রহরীরা কারাগার থেকে নিয়ে এলো দারাকে। রানী দোষারোপ করতে লাগলেন, এবং অপরাধীর কোনো কথা না শুনে তাকে এই মুহূর্তেই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হোক, এই হলো তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। অর্থাৎ দারাকে তিনি একেবারেই মুখ খুলতে দিতে চান না, দারা মুখ খুললেই সর্বনাশ! যদি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে! কিন্তু এ যুক্তি সমর্থন করতে পারছেন না প্রধান কাজী। তিনি বলছেন—আমাদের আইন অনুযায়ী নিকৃষ্টতম অপরাধীকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়।

রানী বললেন--কিন্তু তা' বলে,—রাজহন্তাকেও?

এইসব কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত প্রধান কাজীর দৃঢ়তার জন্যই দারা কথা বলবার সুযোগ পেলেন। এবং দারা যখন বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন কাঠগড়ার মধ্যে, তখন রানীর মুখ একেবারে

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সেইদিকে তাকিয়ে দারা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন এক মুহূর্ত। কাজী তখন আদেশ করছেন—বলো তুমি। কোনো ভয় নেই।

দারা বলে যেতে লাগলেন—আমার পিতৃহন্তা ছিলেন ঐ রাজা। আমি তার প্রতিশোধ নেবার জন্য গ্রাম থেকে এসেছিলাম তাঁকে হত্যা করবার জন্য। সুযোগ মতো ঐদিন রাত্রে, তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমি গোপনে প্রবেশ করেছিলাম তাঁর শয়নকক্ষে। একটু থামলেন দারা। মনে পড়ছে, রানীর হাতের সেই রক্তাক্ত ছোরাখানার কথা। রাজ-নামাঙ্কিত ছোরা সেখানা। দারা এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবার বললেন—ঐ রাজ-নামাঙ্কিত ছোরাখানা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম রাজারই শয়নকক্ষে। পেয়ে ছোরাখানা আমূল বসিয়ে দিয়েছিলাম রাজার বক্ষদেশে।

বলা মাত্র, আর্তনাদ করে উঠলেন রানী। দর্শকমণ্ডলীতে দেখা গেল বিপুল উত্তেজনার আভাষ। একটা কলরব উঠল বিচার-কক্ষে। প্রধান কাজী হাতুড়ির মতো একটা দণ্ড টেবিলের ওপর ঠুকে দৃঢ় এবং উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন—চুপ করো, চুপ করো!

দারা ততক্ষণে দেহটা এলিয়ে দিয়েছিলেন কাঠগড়ার ওপরে, কাঠগড়ার রেলিং-এর ওপরে হাত দিয়ে মাথাটা রাখলেন এলিয়ে। আবহসঙ্গীত আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপরে দারা দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে দ্রুত বলে যেতে লাগলেন—আমিই দায়ূদ শার হত্যাকারী। হজরৎ, আমার শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এ পৃথিবী আমার চোখে এখন অন্ধকার-কারাগার! আমায় হত্যা করুন, আমি অন্ধকারে আলো দেখি!

এ দৃশ্যের সর্বাঙ্গীণভাবে সবার অভিনয়ই হতো চমৎকার। আমার করণীয় যা কিছু ছিল, সব আমি ওজন মতোই করে যেতাম। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অভিনয় হয়ে যাবার পর একদিন হলো কী, অভিনয় করতে করতে সংলাপের শেষের দিকে পৌঁছে গেছি, বলছি, 'এ পৃথিবী আমার চোখে'—ইত্যাদি! কথাগুলো আমি উচ্ছ্বাসপূর্ণভাবে বলতাম, হাততালিও পড়ত। সেদিন ঐ কথাগুলি বলতে বলতে কী রকম একটা মনের ভাব হয়ে গেল, যেন সম্বিৎ নেই, একটা পা আসনের ওপর, আরেকটা পা উঁচু করে রেলিং-এর ওপর রেখেছি, দুটি হাত প্রসারিত করে দিয়েছি। ফোকাস তখন আমার ওপরেই থাকত। সেদিন যেন সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো হয়ে গেল! কী বলে একে প্রকাশ করব, কীসের এ প্রেরণা? ইংরেজীতে যাকে বলে "ইলেকট্রিক কোয়ালিটি" অথবা "ইন্সপায়ার্ড মোমেন্টস" অথবা "স্পার অব দি মোমেন্ট" সচরাচর এ জিনিস আসে না, কিন্তু যখন আসে, একেবারে ভাবোদ্বেল করে দিয়ে যায়। রুদ্ধ ভাবাবেগকে প্রকাশ করবার জন্ম যে উদ্বেলিত অভিব্যক্তি তখন বাঁধাধরা ঝরনার মতো বেরিয়ে পড়ে, কোনো বাঁধাধরা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। পরবর্তীকালে অনেক নাটকে অভিনয় করতে করতে এরকমটা হয়ে যেতো, যা কিনা, 'আনরিহার্স্ড!' 'আনপ্রাকটিস্ড!'

তারপরে শেষ দৃশ্যের কথা। কারাগারে দারা, রানী এসেছেন কারাগারে তাঁকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু রানীর বহু আয়াসেও যখন দেখা গেল, দারা অনড়, তখন অকস্মাৎ বিষপান করে মৃত্যুকে

বরণ করলেন রানী, বিয়োগান্ত-মর্মান্তিক সে দৃশ্য! আবহসঙ্গীত তখন ভাবোপযোগী অদ্ভুত করুণ এক সুর-মায়া বিস্তার করে চলত!

দারার পক্ষে এই চারটিই ছিল মোক্ষম দৃশ্য। পিতৃবন্ধু নাদের সা যখন তাঁকে জানালেন, সে কৃষক পুত্ররূপে লালিতপালিত হলেও কৃষকপুত্র নয়। সে এক ওমরাহের পুত্র, সে ওমরাহকে ঐ রাজা গোপনে হত্যা করেছিলেন। এবং সেই সময় শিশু দারাকে নিয়ে নাদের সা গ্রামে কৃষকদের কাছে রেখে দিয়ে এসেছিলেন। এই যে তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল দারার কাছে, সেই থেকে শুরু হলো তাঁর জীবনের নাটকীয় মুহূর্ত, যার সমাপ্তি নাটকের যবনিকা পতনে। অভিনয়টা করে গেলাম সাবলীলভাবে, ছবির মতো চলে গেল সব। অভিনয়ের সুখ্যাতিও হলো প্রচুর। "দারা ও রানীর অভিনয়", লোকে বললে, "খুব ভালো হয়েছে, এর আগে এমনটি দেখিনি।"

দায়ুদ শানাদের শা—এমনকি ঐ একটি দৃশ্যের কাজী—অনবদ্য অভিনয় করতেন ও সবাই। এমন কি 'বিস্কুট-খেকো' ভুলো বা সন্তোষ দাস সেই যে তার কথার মাত্রা হিসাবে 'বাজী রাখো' বলতো কথায়-কথায়, সেই 'বাজী রাখো' কথাটা চালু হয়ে গেল মুখে মুখে! আর জনপ্রিয় হয়েছিল এ বইয়ের ৫।৬ খানি গান। বিশেষ করে দুটি গানের সুর ত এখনো কানে বাজে! গুলরুখ-বেশিনী সুবাসিনীর গান। 'বলো তারে ভুলি কেমনে'; 'মিলনের গীতি গাহিব বলিয়া বেঁধেছিনু সুখে ঘর!' শেষোক্ত গানখানিতে আশোয়ারী সুর বসানো, এমন প্রাণ-ব্যাকুল-করা হতো এই গানটি যে, দর্শকরা নায়িকাকে ছাড়তে চাইত না, অন্তত বার দুয়েক 'এনকোর' পড়ত।

মোট কথা ভালোই হলো "ইরাণের রানী"। দু' রাত্রি অভিনয়ের পর তৃতীয় দিনটিতে ছুটি মিলল। তার মানে, বড়দিনের অভিনয় আর এই অভিনয় নিয়ে ক্রমাগত দশ দিন—দিবারাত্র পরিশ্রমের পর—মিলল একটু অবসর। বড়দিনের দশদিনের অভিনয়, 'ইরাণের রানীর' উদ্বোধন তার ওপরে আরও এক পরিশ্রমের ব্যাপার হয়েছিল সে সময়। "মুক্তির ডাক" নাটিকার প্রথম মুক্তির ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে অনেক বলার অবসর আছে, পরে বলব। যাই হোক, এই অবসরের সুযোগে ইটালীতে গিয়ে প্রথম সন্তান—নবজাতিকা ঐ কন্যাটির মুখদর্শন করে এলাম। পরের দিন ৪ঠা জানুয়ারী, অতো বড়ো একজিবিশন হচ্ছে ইডেন গার্ডেনে—বড়দিনে যেতে পারিনি—এইদিন গেলাম। গেলাম আমরা চারজন, আমি, ইন্দু, প্রবোধবাবু আর গণদেববাবু। কোনোখানে যাতায়াত করতে গেলে এই চার-জনই হতাম আমরা সঙ্গী। হেমেন্দ্রবাবু তখন মোটর করেছেন, সেই গাড়িতে করে আশেপাশের শহর বা শহরতলীতে রাসের মেলা দেখতে গেছি। গণদেববাবু ভবানীপুরেরই লোক—আমার থেকে তিনি বয়সে বড়ো হলেও, এমন হৃদ্যতা জন্মে গিয়েছিল যে, 'গণদেব' বলে ডাকতাম। আবার আদর করে নাম বানিয়ে নিয়ে ডাকতাম—'গাণ্ডীব' বলে। তা প্রায় বারো বছরের বড়ো ছিল সে আমার থেকে। তিনকড়িদাও আমাদের থেকে বয়েসে যথেষ্ট বড়ো, আদর করে আমরা "দাদা" থেকে ডাকতাম "দদ্র" বলে। গণদেব—বয়স হলে হবে কী—শিশু স্বভাবের ছিল—ইভনিংক্লাবের কৃতী অভিনেতা—আর্ট

থিয়েটারের শেয়ারহোল্ডার, 'এমারল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস' ছিল—তাদের। ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের, সব তখন ছাপা হতো ঐ এমারেল্ডে। গণদেব ছিল হরিদাসবাবুর ভগ্নীপতি। ওর বড় ভাই স্থরদেববাবু—আমাদের কী আদরই না করতেন। ওঁদের বাড়ি ছিল নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেনে, সেটা এখন হয়েছে, ডি-এল-রায় স্ট্রীট। কতো গেছি সে বাড়িতে! আমার অভিনয় খুব ভালো লাগতো তাঁদের!

যাই হোক, একজিবিশন ত ঘুরে-ঘুরে দেখে এলাম। শিশিরবাবু এই একজিবিশনেই অভিনয় করছেন—ডি-এল-রায়ের "সীতা"। খুব বড়ো একজিবিশন, আলোকমালায় চমৎকার সাজানো। দেখতে-দেখতেই এগারো সাড়ে এগারোটা বেজে গেল—সেদিন অবশ্য অভিনয় হয়েছিল কিনা জানি না—অভিনয় দেখিনি। বড়দিনের আগে থেকে প্রায় সমস্ত মাসটা পর্যন্ত ছিল এগজিবিশনটা। একজিবিশনের যে আমোদ-প্রমোদ-এর উপ-সমিতি ছিল, তাঁর কর্মকর্তারা ভাবছিলেন, যাত্রা বা থিয়েটার বা কী ধরনের প্রমোদ-স্থচীর বন্দোবস্ত করা যায়। বড়দিনের সময় পাবলিক থিয়েটার নিজেদের কাজেই ব্যস্ত। অথচ, শিশিরবাবুর কোন দল তখন না থাকলেও, তাঁরা গিয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, অভিনয় করা যায় কিনা। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কিছু টাকা তুলে শিশিরবাবু একটি দল গঠন করে, অভিনয় করেছিলেন। কর্ণার্জুনের অসামান্য সাফল্যের পর—নাটমঞ্চে একটা পৌরাণিক যুগই এসে গেছে বলা চলে। সম্ভবত যুগধারার গতির দিকে লক্ষ্য করে শিশিরবাবুও পৌরাণিক বই ধরলেন তখন। এবং সেটি হচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রলালের—সীতা। চারদিন অভিনয় করার কথা ছিল, কিন্তু উনি প্রায় দশ-বারো দিন অভিনয় করেছিলেন সবার আগ্রহাতিশয্যে, এবং করেছিলেন ঐ 'সীতা'ই। শিশিরবাবু যেমন শৌখীন দল গঠন করে একজিবিশনে অভিনয় করলেন, ঐরকম আরও অনেক শখের দল ছিল, যারা পাব্লিক থিয়েটার খোলবার জন্য মাঝে মাঝে ঝুঁকত, কিন্তু, 'মঞ্চ' নেই, স্থানাভাব, তাই আর তাদের আসরে নামা শেষপর্যন্ত হতো না। এইরকম একটি দল ছিল 'মডার্ন থিয়েটার', এঁদের কথা পরে বলব, এঁরা নবীন সেনের 'রৈবতক' করেছিলেন।

শিশিরবাবু ম্যাডানদের থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলেন ১৯২২-এর গোড়ার দিকে। সেই থেকে বসেছিলেন এই প্রায় পৌণে দু'বৎসর। এর মধ্যে প্রকাশ্য কোনো রঙ্গালয়ে আর অভিনয় করেন নি, যদিচ আর্ট থিয়েটারে যোগদান করার ওঁর কথা ছিল, এবং শুনেছি আসবার আগ্রহও ছিল প্রচুর। কেন যে শেষ পর্যন্ত এলেন না, তার কারণ জানি না, কেউ তা ব্যক্তও করেন নি আমার কাছে। তবে অনুমান করছিলাম ব্যাপারটা। দু-পক্ষই আগ্রহশীল ছিল, কিন্তু কথা হচ্ছে, ওঁকে আনা হবে কোন 'পদ'-এ? কারণ, তিনকড়িদা বয়সে প্রবীণ, এবং প্রখ্যাত শৌখীন অভিনেতা, তিনি এখানে রয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা হিসাবে। অপরেশবাবু রয়েছেন, ম্যানেজার। সাধারণ অভিনেতা হিসাবে উনি আসতে পারবেন না, আসা উচিত নয়। একমাত্র পদ ছিল নাট্যাচার্যের পদ। কিন্তু সেটাও ত সম্ভব

ছিল না। অপরেশবাবু রয়েছেন, তার ওপরে আরেকটা কথা এই যে, এক তাঁর শিষ্য তুলসী ছাড়া, নতুন দলের আর সব অভিনেতা এটা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন কেন? এই অনুমানটা কেন যে করলাম, তার একটা কারণ আছে। এইরকম একটা ঝড় পরে উঠেছিল, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি ঐ অনুমানটা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু, সেকথা বলব যথাসময়ে। আপাতত এটুকু লক্ষ্য করলাম, মিলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু না মিলতে পেরে যে কেউ বিশেষ দুঃখিত হয়েছিল, এমন নয়। টাকা বেশী দেবার প্রশ্ন নয়, আসলে, প্রশ্নটা উঠেছিল উপযুক্ত 'পদ' বা সম্ভ্রম নিয়ে।

৫ই জানুয়ারী, শনিবার কর্ণার্জুনের ৬০ রাত্রি—ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসবের অভিনয় হলো। সেই যে সাজানো হয়েছিল স্টার বড়দিনের সময়ে, সেই সাজসজ্জা, শুধু ফুলসজ্জাগুলি বদ্‌লে বদ্‌লে, তখনো রয়ে গেছে। 'চিত্রে কর্ণার্জুন' আবার উপহার দেওয়া হলো দর্শকদের।

ওদিকে, 'ইরাণের রানী'র সমালোচনা বেরুতে লাগল পরের সপ্তাহ অর্থাৎ ৪।৫ তারিখ থেকেই। এবং এই যে শুরু হলো, এ চলল সেই এপ্রিল মাস পর্যন্ত। সার্ভেণ্ট, নায়ক, অমৃতবাজার, বৈকালী এবং আরো সব কাগজ প্রভৃত সুখ্যাতি করলেন। যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনো থিয়েটারে আসতেন না, তাঁরাও আকৃষ্ট হতে লাগলেন থিয়েটারের প্রতি। আমাদের ছবি তুলিয়ে তা ব্লক করে রাখতাম, হ্যাণ্ডবিলে ছাপা হতো। পত্র-পত্রিকাগুলি সেই সব ছবিতে আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন, ছাপতেও লাগলেন সে-সব। থিয়েটারের সামনে নামলে, বা ট্রামে-বাসে গেলে, লোকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, গুঞ্জন ওঠে, ফিস্‌ফাস্ কথা বলাবলি করে। বুঝলাম, আর বোধহয় আমি অখ্যাত নই।

এই সমস্ত সুখ্যাতির ভিতরে—আনন্দবাজারে—তারিখ হচ্ছে ১৫ই মার্চ, ১৯২৪—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্থাৎ আমাদের রাখালদা—'বাঙলার রঙ্গালয়' বলে দেড় কলমের এক প্রবন্ধ লিখে নিদারুণ সমালোচনা করলেন 'ইরাণের রানী'র। অন্য কোনো কিছু বিশেষ নয়, দৃশ্যাবলী ও পোশাক নিয়েই আক্রমণটা বেশী, কতগুলি ঐতিহাসিক হয়েছে, কতগুলি হয়নি, এই ছিল প্রধান অভিযোগ। অথচ 'ইরাণের রানী' আমরা বিজ্ঞাপিত করেছিলাম রোমান্টিক নাটক বলে, ঐতিহাসিক নাটক বলে নয়। লক্ষ্য করা গেল, অপরেশবাবুর ওপরেই কটাক্ষপাত যেন বেশী। লিখেছেন—"নাটককার অপরেশবাবুর ইচ্ছা, তিনি প্রাচীন পারস্য দেশের একটি চিত্র দেখান, কারণ "শিপিয়ে" ও "পেরো" রচিত প্রাচীন পারসিক শিল্পের ইতিহাস নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একখানি ইংরাজী অনুবাদ দুই-চারি দিনের জন্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।"

প্রসঙ্গত, বলা প্রয়োজন, রাখালদা অপরেশবাবুকে বইখানি পড়বার জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু ওটা পড়েই যে নাটক লেখবার অভিলাষ হয়েছিল এমনও বোধহয় না, এটি ছিল 'ডাচেস অফ প্যাডুয়া'র নাট্যরূপান্তর।

রাখালদা তারপরে লিখলেন—সুতরাং অভিনয়কালে ইরাণের রানী অর্ধপক্ক খিচুড়িতে পরিণত

পরে আরও লিখলেন—'ফরাসী গ্রন্থকারের বইয়ের ছবি দেখিয়া আর্ট থিয়েটারের পটুয়ারা ভাল ভাল দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন, সুন্দর সাজপোশাক তৈয়ারী হইয়াছে, নর্তকীরা ভাল নাচিয়াছে ও গাহিয়াছে, কিন্তু নাটকটা তবু কবন্ধ রহিয়া গিয়াছে, কারণ ইহাতে মুণ্ডের অভাব।' তবে অভিনয়ের সুখ্যাতি করেছেন। শেষ প্যারায় লিখলেন—"অভিনয় হিসাবে আর্ট থিয়েটার কোম্পানির কোনো দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু নাট্যকার ও প্রডিউসারের অজীর্ণ রোগে ইরাণের রানী বইখানির অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই।"

এর আবার উত্তরে, ২৮শে এপ্রিল '২৪ সালে "বৈকালী"তে "রাখালের কোদাল" বলে বড়ো প্রবন্ধ বেরুলো, তাতে নানা রকম বক্রোক্তি। আসল কথা হচ্ছে, রাখালদা "দনুজমর্দনদেব" বলে একটি নাটক লিখেছিলেন, (ওর আগে তিনি 'মহীপাল' ও 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' নামে দুটো নাটক লিখেছিলেন বলে জানতাম) সেটি নিয়ে এসেছিলেন আর্ট থিয়েটারে। হরিদাসবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন রাখালদা, 'দাদা' বলে ডাকতেন। নাটকটি হরিদাসবাবুর কাছে আনতে উনি বললেন—ও নিয়ে আমি ত ঘাঁটাঘাঁটি করি না, অপরেশবাবুকে গিয়ে বলো।

আবার অপরেশবাবু কখনো অপর নাট্যকারদের বই ছুঁতেন না, বিশেষ করে নতুন নাট্যকারদের। তার কারণও আছে। থিয়েটারের জন্য যাঁরা নাটক লিখতেন, তাঁরা সচরাচর অন্য লোকের লেখা নাটক স্পর্শ করতেন না, যদি চৌর্যাপবাদ আসে! তবু কলঙ্ক ছিল, কোথাও কিছু মিল দেখলেই লোকে বলবে চুরি করেছে। এ অপবাদ শুধু ওঁকে কেন, স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকেও একদিন সহ্য করতে হয়েছে বলে শুনেছি। অপরেশবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, সেইজন্য বন্ধুর একটি নাটক প্রযোজনা করেছিলেন অপরেশবাবু, এ ছাড়া অন্য কারুর নাটক তিনি ধরেননি বললেই চলে। তিনি রাখালদার নাটক যথারীতি ছুঁলেন না, বললেন—নাটক ঠিক করেন ত ডাইরেক্টররা! ওঁরা ত সব আপনার বন্ধুও। ওঁদের বলুন।

রাখালদা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তারই প্রতিক্রিয়া, সম্ভবত ঐ চিঠি। আর তারও প্রতিক্রিয়ায় ঐ "বৈকালী"র "রাখালের কোদাল।" তাতে আরও লিখলেন—"নাটকের সমালোচনা ত খুব লিখচো, কিন্তু লোকে যে ঐ দনুজমর্দন আর মহীপালের কথা নিয়ে কানাকানি করে হাসছে। আবার প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়াও আছে। জ্যেঠা আমার সদরালা ছিলেন, বাবার নাম আমার অমুক ছিল; বলিহারী বুদ্ধি! বাহবা রাখালবাবু! কে বলে তুমি আকার সদৃশ্য প্রাজ্ঞ, কে বলে তোমার বুদ্ধি নাই?"

এইরকম বাদ-প্রতিবাদ তখনকার কাগজগুলিতে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না, এরকম প্রায়ই দেখা যেতো।

যাই হোক, শনি-রবিবারে 'কর্ণার্জুন' হচ্ছে, বুধবারে ইরাণের রানী। এই সময় স্টারে সিনেমা দেখানোরও ব্যবস্থা হলো। বিশেষত 'তাজমহল সিনেমা কোম্পানীর 'চন্দ্রনাথ' তখন তৈরী

হয়ে গেছে, 'রসা থিয়েটারে' দেখানোও হয়ে গেছে সেই 'চন্দ্রনাথ'। আবার স্টারে দেখানোর ব্যবস্থা করা হলো। বৃহস্পতি-শুক্রবার—চন্দ্রনাথ, সোম-মঙ্গল—বিলাতি ছবি, বেশীর ভাগই সিরিয়াল ছবি, পার্ট বাই পার্ট দেখানো হতো। অনাদিনাথ বসুর সঙ্গে "মনোমোহনের" যে সম্বন্ধ ছিল, স্টারের সঙ্গেও তাই ছিল। চন্দ্রশেখর বর্ণিত সেই গঙ্গাবক্ষে 'প্রতাপ-শৈবলিনী'র ছবিটি; সেটি সিনেমায় তুলে থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে আরম্ভ করলেন 'স্টার'। সেই সম্বন্ধের সূত্র ধরে প্রবোধবাবুর সঙ্গে মিলে আবার স্টারে ছবি দেখাতে শুরু করলেন অনাদিবাবু। মেসিন-টেশিন সব তাঁরই—ওসব ব্যপারে লোকজনও তাঁর। লাভ লোকসানের দিকে তাঁর ঝোঁক নেই, দেশী ছবির প্রচার হোক, এটাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। 'চন্দ্রনাথ'-এর পর 'মানভঞ্জন' দেখানো হলো। কিছুদিন যাবৎ এভাবেই চলেছিল, যতদিন না কর্তৃপক্ষ আবার বৃহস্পতিবারেও নাটক দেখানো শুরু করলেন। সিনেমার বেলায়, সামনের সোফা সব ঢেকে রেখে বাকী সব ঢালাও টিকিট—আট আনা করে।

ওদিকে, একৃজিবিশনে অভিনয় করে শিশিরবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি একটি মঞ্চ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শোনা গেল, তিনি ঐ দ্বিজেন্দ্রলালেরই 'সীতা' নিয়ে আসরে নামবেন। অপরেশবাবুর কাছে বসতাম ত মাঝে মাঝে? তাঁর বন্ধুরা আসতেন, সবাই প্রবীণ ব্যক্তি, শুনতাম তাঁদের কথা। অপরেশবাবু শিশিরবাবুর কথা শুনে বললেন—পৌরাণিক বেছে নিলেন যখন শিশিরবাবু, তখন ডি. এল. রায়ের "সীতা" কেন? রায় মশায়ের পৌরাণিক নাটক কি দর্শকরা গ্রহণ করবেন? রায় মশায়ের ঐতিহাসিক নাটক বা রোমান্টিক নাটক (উপাখ্যান-মূলক, যেমন সোরাব-রুস্তম), সামাজিক নাটক ও প্রহসন সবই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে, হয়নি কেবল তাঁর সীতা, পাষাণী ও ভীষ্ম। কারণ ওঁর পৌরাণিক নাটকের সুর আর কাশীরাম কৃত্তিবাসের মহাকাব্যের সুর নীতিগত তথ্য পরস্পরের সঙ্গে মেলে না। আর যা মেলে না, তা এদেশের দর্শক নিতে চান না। মাইকেলের ছিল কবি-খ্যাতি এবং মেঘনাদ-বধ-কাব্য ছিল মহাকাব্যবিশেষ। তার কাব্যরস রসিকের চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু নাট্য কাহিনীতে যখন ওটা পর্যবসিত হয়েছিল তখন সেটা পর্যন্ত লোকে তেমন নেয়নি। গিরিশবাবুই ত "মেঘনাদ-বধ" নাটকাকারে গ্রথিত করে অভিনয় করেছিলেন, বেশী দিন চলেনি।

অপরেশবাবু এ-ও অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—ঐ "সীতা" খুললে, তরুণরা যাবে, অভিনয় দেখবে, প্রবীণ ধর্মপ্রবণ নরনারী তেমন যাবেন বলে মনে হয় না।

শিশিরবাবুর তখন সবই আছে, নেই রঙ্গমঞ্চ। যে-কোনো মঞ্চ পেলেই হয়। আলফ্রেড তখন হঠাৎ পাওয়া গেল, সে কাহিনীও সময় মত বলব, তখন শিশিরবাবু ভাবলেন—আলফ্রেড ত আলফ্রেডই সই।

আলফ্রেডে বাংলা থিয়েটার জমে না। ওর পিছনেই কলাবাগান বস্তি। রাত এগারো-

বারোটায় থিয়েটার ভাঙলে, মেয়েছেলে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়াও বিপদের কথা। তাছাড়া, রাহাজানি ইত্যাদি ত তখন লেগেই ছিল ও'অঞ্চলে। হিন্দী থিয়েটার অবশ্য চলত। পার্শী থিয়েটার যখন ছিল, তখন মেয়েরা যেতো না, মেয়েদের বসবার স্থান ছিল না। কোরিন্থিয়ানেও ঐ ব্যাপার, মেয়েদের বসবার জায়গা ছিল না। আলফ্রেডে ওপরে থাকত গ্যালারী। যারা ফ্যাশনেবল্ মহিলা, তারা বসত সামনের দিকে—মূল্যবান আসনে।

এহেন যে আলফ্রেড, সেখানেই শিশিরবাবু তোড়জোড় করতে লাগলেন তাঁর "নাট্যমন্দির"-এর উদ্বোধন করতে। আমাদের তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় স্টার ছেড়ে চলে গেল তার "বড়দার" কাছে। তুলসী গেল, কিন্তু এলেন রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী। সেদিন দোতলার অফিস-ঘর থেকে বক্সের লবীটা পার হয়ে চলে আসছি স্টেজের দিকে, হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ল, লবীর সোফায় বসে আছেন এক ভদ্রলোক, মাথায় টুপী। কেমন যেন চেনাচেনা লাগল। থমকে দাঁড়ালাম। তারপরে বলে উঠলাম—কে, নির্মল না?

ও বললে—হ্যাঁ।

—কী ব্যাপার? মাথায় টুপী?

—বাবা নেই। তাই—

বলে উঠলাম—এখানে?

—খাতায় নাম লেখাবো, তাই এসেছি।

—বেশ বেশ। বললাম—তা দেখা হয়েছে কর্তাদের সঙ্গে?

—খবর পাঠিয়েছি।

—বোসো তাহলে।

নিজের কাজে চলে গেলাম। রাধিকাবাবুর যাতায়াত ছিল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের ওখানে। যোগেশ চৌধুরীও যেতেন, আমি যেতাম মাঝে মাঝে। কথায় কথায় একদিন যামিনীবাবু বলেছিলেন—রাধিকাবাবু কোনো থিয়েটারে এখন নেই, তাঁকে নেওয়া যায় না আপনাদের ওখানে?

বললাম—উনি কি যাবেন?

রাধিকাবাবু 'গজদানন্দ প্রহসন'খ্যাত ভবানীপুরের অভিজাত ব্যক্তি জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের লোক। এঁরা চিরকেলে অভিজাত, নজরও খুব উঁচু।

রাধিকাবাবু বললেন—আপত্তি কী? থিয়েটার করব বলে যখন সিমলে পাহাড়ের বড়ো চাকরি ছেড়ে এলাম, তখন বসে থেকেই বা কী করব?

—বেশ। জানা রইল।

প্রবোধবাবুকে গিয়ে সব বললাম। উনি শুনে বললেন—আচ্ছা।

এই হলো সূত্র, যা থেকে রাধিকাবাবুর আসবার পথ সুগম হলো। কিন্তু সাজঘরের ব্যাপারে

যা অনুমান করেছিলাম, তাই হলো। উনি সব ঘুরেটুরে দেখে এসে বললেন—আপনার ঘরে বসে যদি সাজি ত আপনি আপত্তি করবেন? ছেলেছোকরাদের দলে ঠিক যেতে চাই না।

মনে মনে হাসলাম, আমাকে উনিও মুরুব্বি ঠাউরেছেন। মুখে বললাম—সাজুন না? কোন আপত্তি নেই।

২২শে মার্চ ১৯২৪, শনিবার যে অভিনয় হলো তাতে নির্মলেন্দু ও রাধিকানন্দ—উভয়েরই স্টারে 'প্রথম' রজনী কর্ণার্জুন নাটকে। অপরেশবাবু কিছুদিন আগে শারীরিক অপারগতার জন্য 'পরশুরাম' ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'ধৃষ্টদ্যুম্ন' ছিল অমূল্য নাগের, সে করতে শুরু করে দিয়েছিল দুটো পার্ট, পরশুরাম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন। এবার থেকে 'পরশুরাম' করতে থাকলো নির্মলেন্দু। রাধিকানন্দ দুঃশাসন; এই নতুন ভূমিকালিপির হুবহু প্রতিলিপিটা এখানে তুলে দিলাম:

STAR THEATRE

Direction—The Art Theatre Ltd.

Saturday the 21st March at 7-30 P. M.

KARNARJUN

Grand 82nd & 83rd Performances

Karna—Mr. Tinkari Chakravarty

Sakuni—Mr. Naresh Ch. Mitter

Arjun—Mr. Ahindra Choudhury

Dushashan—Mr. Radhikananda Mukherjee

Parashuram—Mr. Nirmalendu Lahiri

Padma—Miss Krishnabhamini

Niyati—Miss Niharbala

Seats are reserved in advance

এর আগের দিন ছিল দোল, ২১শে মার্চ, ৮ই চৈত্র, ১৩৩০ সাল, শুক্রবার—অ্যালফ্রেডে ছিল শিশিরকুমারের 'নাট্যমন্দির'-এর প্রতিষ্ঠা-দিবস। হলো উদ্বোধন নাট্যমন্দিরের, কিন্তু 'সীতা' দিয়ে নয়, যে-নাটক দিয়ে শুভারম্ভ হলো, তার নাম—"বসন্ত-লীলা।" সীতা নিয়ে ইতিমধ্যে ঘটে গেছে এক পর্ব, শিশিরকুমারের "সীতা" হরণ হয়ে গেছে।

এগজিবিশনের সাফল্যের পর শিশিরবাবুদের একটা ধারণা জন্মালো যে, 'সীতা' নিয়ে পাবলিক থিয়েটার খুললে জমবে। 'সীতা' করে দল সংগঠন করা তাঁর হয়ে গেছে, কিন্তু মঞ্চ কই? কলকাতার এই স্বল্পসংখ্যক থিয়েটারগুলির মধ্যে একটি দল গৃহহারা হয়ে সারা বাঙলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনোমোহন

যদিও তখন খুব ক্ষীণ, তবু তাদের মঞ্চ রয়েছে বলে কোনক্রমে চলছে। আর এক মুমূর্ষু দল, বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোং, কর্নওয়ালিস ছেড়ে আলফ্রেডে গেছেন। যে দু-তিনদিন কর্নওয়ালিসে থিয়েটার করেছিলেন ম্যাডান কোম্পানি, সে দু-তিনদিনই বা সিনেমা বন্ধ থাকে কেন? যেখানে সিনেমাতে লাভ থাকছে, অথচ থিয়েটার তেমন জমছে না! এইভাবে টাকার ক্ষতির কথা ভেবে থিয়েটারটাকে ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন অ্যালফ্রেডে। এখানে এসে ওঁরা ধরলেন "সতীলীলা"। এটি হিন্দী সতী "অনুসূয়া" নাটক অবলম্বনে গঠিত বাঙলা নাটক, রচনা ডাঃ হরনাথ বসুর, যাঁর লেখা "বেহুলা" নাটক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টারে অভিনয় করেছিলেন। 'সতী অনসূয়া' করাতে ওঁদের সুবিধা হয়েছিল এই যে, পার্শী থিয়েটারের যাবতীয় সিন-টিন ওঁরা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত ঐসব সিন, সবগুলিই আবার 'ম্যাজিক সিন।' 'সতীলীলা' আমি দেখেছিলাম। অত্রি ঋষির পত্নী অনুসূয়ার সতীত্বের মহিমাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। সঙ্গে আবার অন্য এক সতীর কাহিনীও জুড়ে আছে। ইনি তাঁর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে পিঠে করে—ঝোলায় বসিয়ে—বারবনিতার গৃহে নিয়ে গিছলেন। কিন্তু যখন ওভাবে তিনি স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্বামীর পা অনবধানবশত মাণ্ডব্য ঋষির গায়ে লেগে গিয়েছিল। রাত্রে অন্ধকারে ঠিক করতে পারেনি সতী। ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার স্বামীর প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

তার উত্তরে, সতী নারীও দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি যদি যথার্থ সতী হই, তাহলে বলছি, সূর্য আর উঠবে না।

ফলে, প্রকৃতির রাজ্যে এলো এক বিশৃঙ্খলা—অনিয়ম। সতীর কথা ত আর মিথ্যা হতে পারে না, তাই সূর্যও উঠতে পারছেন না, আর সূর্য না উঠলে সবকিছুই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অতএব, দেবতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন স্বর্গে। তাঁরা এলেন একযোগে সতীর কাছে। অনুরোধ করতে লাগলেন—তোমার বাক্য ফিরিয়ে নাও, নইলে সৃষ্টি যে রসাতলে যাবে!

সতী বললেন—কী করে ফিরিয়ে নিই বাক্য? স্বামীর প্রাণ চলে যাবে!

তখন মাণ্ডব্য ঋষি বললেন—শাপ প্রত্যাহার করছি।

সতীও বললেন—তাহলে, সূর্যদেব উঠতে পারেন।

পরক্ষণেই—সূর্যোদয় হলো—সপ্তাশ্ব রথে সূর্যদেব উঠে এলেন, সতী নারী ও তাঁর স্বামী দিব্য-দেহে সূর্যের রথে করে ধীরে ধীরে উঠে গেলেন ওপরে—দিব্যধামে।

এই 'ট্রান্সফরমেশন সিনটা' ছিল দেখবার মতো। সতী নারী সাজতেন—নীরদাসুন্দরী। তাঁর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামী সাজতেন—সত্যেন্দ্রনাথ দে। অত্রিমুনি যিনি সাজতেন, তাঁর নাম—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পুরাতন কালের মিনার্ভার অভিনেতা, ইনিই ছিলেন 'সাজাহানে'-এর ওরিজিন্যাল যশোবন্ত সিংহ।

এতো গেল এক সতীর কথা, কাহিনীর নায়িকা যে সতী, তিনি হচ্ছেন অনসূয়া। এঁর সতীত্বের

মহিমা এমনভাবে দিকে দিকে প্রচারিত হলো যে, ইন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চ-দেবতা একদিন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের বেশে পরীক্ষা করতে এলেন তাঁকে। যখন এলেন, তখন মুনি ছিলেন না। সতী অনসূয়ার কাছে এসে তাঁরা প্রার্থনা করলেন—আশ্রয়। তাঁরা বললেন—আমরা পথশ্রমে শ্রান্ত ও ক্ষুধিত।

অনসূয়া সাদরে গ্রহণ করলেন তাঁদের। অতিথি সৎকারে উদ্যত হলেন। প্রার্থনা করলেন—অন্ন গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু দেবতারা তা চাইলেন না। অনসূয়া তখন বললেন—সেবা যদি না গ্রহণ করেন ত আমাকে ত বটেই, আমার স্বামীকেও পাপ স্পর্শ করবে। একান্ত অনুরোধ, অন্ন আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে।

তাঁরা বললেন—পারি, কিন্তু এক শর্তে।

—বলুন। সকল শর্তেই সম্মত আছি।

তাঁরা প্রস্তাব করলেন—ভোজনার্থে যখন আসন গ্রহণ করবো, তখন তোমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আমাদের অন্ন পরিবেশন করতে হবে।

চমকে উঠলেন অনসূয়া। কিন্তু তবু তিনি বললেন—তাই হবে।

তারপর, পাদ্যর্ঘ্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মণবেশী দেবতাবৃন্দ আসনে বসলেন অন্ন গ্রহণ করবার জন্য। অনসূয়া বললেন—আমি অন্ন পরিবেশন করছি, কিন্তু আমার নগ্নরূপ যাতে আপনারা দেখতে না পান, সেজন্য দুগ্ধপোষ্য শিশু হয়ে যান। সতীর বাক্য মিথ্যা হবার নয়। বলামাত্রই দেবতারা যার-যার আসনে অবিলম্বে হয়ে গেলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। আর শিশু যখন হয়ে গেলেন, তখন অন্ন গ্রহণ করার সামর্থ্যও তাঁদের রইল না। ফলস্বরূপ, অনসূয়াকেও আর বাস পরিত্যাগ করতে হলো না, দেখা গেল, তিনি পঞ্চ শিশুকে একে একে তুলে দোলনার ওপরে শুইয়ে দিলেন।

এই পরিবর্তন-দৃশ্যটি, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশুতে পরিণত হওয়া, এটা হতো একেবারে ইন্দ্রজালের মতো। তখন প্রেক্ষাগৃহে বসে বুঝতে পারিনি, এর অন্তর্নিহিত কৌশলটা কী! পরে, এধরনের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন পটলবাবু মিনার্ভাতে। পরবর্তীকালে যখন আমিও 'আত্মদর্শন'-এ অভিনয় করেছিলাম, সেই সময় এর কায়দাটা দেখে নিয়েছিলাম, যথা সময়ে তা বর্ণনা করা যাবে। এতে 'অনসূয়া'র ভূমিকায় যিনি নামতেন, তাঁর নাম—শ্রীমতী মালিনী। নাটক নগণ্য হলেও, অভিনয় ভালো হতো, বিশেষ করে কয়েকজনের অভিনয় ত অতি চমৎকার! অনসূয়া-চরিত্রের মর্যাদা বা গাম্ভীর্য, পুরোমাত্রায় বজায় রাখতেন শ্রীমতী মালিনী। আরেকটি নতুন অভিনেত্রীও চোখে পড়বার মতো অভিনয় করলে। অল্পবয়সী মেয়েটি, ছিপছিপে গড়ন, অভিনয় করেছিল একটি চটুল ভূমিকায়। সুন্দর মানিয়েছিল তাকে, তার ওপরে নাচে-গানে, লঘু সংলাপে রীতিমত চিত্তাকর্ষকও হয়েছিল ভূমিকাটি। এঁর নাম শ্রীমতী প্রভা, উত্তরকালে যিনি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীরূপে প্রখ্যাতা হয়েছিলেন বাঙলার রঙ্গমঞ্চে। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বণিক' সাজতেন, হাস্যরসাত্মক একটি ভূমিকা, তারই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সাজতেন প্রভা। মনে হচ্ছিল যেন মানিকজোড়। অভিনয়ের ব্যাপারে আর সবাইকে মামুলী ধরনের

মনে হয়েছিল, তার মধ্য থেকে দু'ধরনের দুই ভূমিকায় ঐ মালিনী আর প্রভা যে চমক দিয়েছিল, তা ভোলবার নয়। অথচ, নাট্যবস্তু তেমন জোরালো না থাকায়, 'সতীলীলা' নাটক চলল না। তারপরে যতদূর মনে পড়ে, ধরেছিলেন তাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক—'বিদূরথ'। তারিখটা ঠিক মনে নেই, সম্ভবত এটিই ছিল ম্যাডানের বেঙ্গল থিয়েটারের শেষ বই। নাম ভূমিকায় ছিলেন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। বইটা দেখিনি, এবং প্লে সম্বন্ধে তেমন কিছু শুনিওনি। তখন ওঁদের থিয়েটারের এমন অবস্থা যে, এঁদের সংবাদ কেউ বিশেষ রাখত না, সাপ্তাহিক যে প্লাকার্ড-পোস্টার পড়ার কথা, তা-ও নিয়মিত পড়ত না। নতুন বই খোলবার সময় এ বিষয়ে একটু চাড় দেখা যেতো, তারপরে সব যেতো মিইয়ে। এমনি করে করে কখন যে ও-থিয়েটার একদিন মিলিয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল, জানতেও পারলাম না। লক্ষ্য রেখেছিলেন শিশিরবাবু, ওঁদের থিয়েটার উঠে যেতেই, উনি গিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিলেন আলফ্রেড মঞ্চ। শুনলাম, নামকরণ করাও হয়ে গেছে। নাম হলো—নাট্যমন্দির। এইবার প্রয়োজন নাটক। 'সীতা' ত করাই আছে, এখন শুভদিন দেখে তাকে মঞ্চস্থ করলেই হয়। এদিকে 'সীতা' নিয়ে ব্যাপার হয়েছে এই যে, এগজিবিশনে উনি যে চার দিনের বেশী অভিনয় করেছিলেন, সেটা দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র দিলীপকুমারকে উনি জানান নি। ভেবেছিলেন, 'ও নিয়ে ভাবতে হবে না, যখন আমরা অভিনয় করব তখন যথাস্থানে জানিয়ে অনুমতি নিলেই হবে।' কিন্তু সেটিই হলো ভুল। এবারে 'সীতা'র রাইট-এর ব্যাপারে সচেষ্ট হতে গিয়ে শুনলেন, 'সীতা' বেহাত হয়ে গেছে। এ-ও শুনলেন, ওটি আর্ট থিয়েটার সংগ্রহ করেছেন অভিনয় করবার জন্য।

প্রায় মাথায় হাত দিয়ে পড়বার মতো অবস্থা। থিয়েটার নিয়ে নেওয়া গেছে, তার নিয়মিত ভাড়া গুণে যেতে হবে, সামনের দোলের দিনে নতুন নাটক দিয়ে 'নাট্যমন্দির'-এর উদ্বোধন হবে, স্থির হয়ে গেছে। এখন উপায়? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত ঐ দোলের দিনেই নাট্যমন্দিরের উদ্বোধনের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু ঠিক কোনো নাটক দিয়ে নয়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-সঙ্কলিত কতগুলি গানের সঙ্কলনকে নাট্যাকারে গ্রথিত করে, নাম দিলেন—'বসন্তলীলা।' অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ওতে সুর-সংযোজনা করেছিলেন। কৃষ্ণবাবুর নিজের মুখে গাওয়া কতকগুলি গানও এতে ছিল, তার মধ্যে দু-একখানা গান বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। 'বসন্তলীলা'র অন্যতম আকর্ষণও ছিলেন কৃষ্ণবাবু। বলা কর্তব্য, এই 'বসন্তলীলা'র মাধ্যমেই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। নৃপেন্দ্রনাথ বসু মশাই ছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে, তিনিও এসে যোগদান করলেন ওঁর দলে। তিনিই দিলেন 'নাচ' বসন্তলীলায়। নেপথ্য সঙ্গীতের জন্য এসেছিলেন গুরুদাসবাবু বলে এক সঙ্গীতজ্ঞ ভদ্রলোক, বিলাতী সুর-টুর তাঁর খুব আয়ত্তে ছিল। যাই হোক, যথা-বিজ্ঞাপিত দিবসে ত উদ্বোধন হলো 'নাট্যমন্দির'-এর। ওঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন 'সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গীতিনাট্য' বলে, যার আবার কাগজে প্রতিবাদ জানালেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ২৯শে মার্চ, ১৯২৪ তারিখের হিন্দুস্থানে তিনি যা লিখেছিলেন, তার মোটামুটি তাৎপর্য হলো এই যে, 'বসন্তলীলা,' 'নূতন ধরনের' গীতিনাট্য, এটা বলা ভুল। 'কামিনীকুঞ্জ,'

'মনচোরা' প্রভৃতি এই ধরনের বই এর আগে অভিনীত হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বছর আগে উনিই 'কামিনীকুঞ্জ'-এ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'বসন্তলীলা' চলল না। ওঁরা তখন পুরনো বই 'আলমগীর' প্রভৃতি মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। লোকপরম্পরায় শুনলাম, 'সীতা' করবারই তোড়জোড় করছেন শিশিরবাবু, নতুন কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' আর্ট থিয়েটার নিয়েছে একথা যখন শুনলাম, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ভাবছিলাম, আর্ট থিয়েটার ও-বই কেন করবে? ও-বইটি সম্পর্কে অপরেশবাবুর যে কী মত, আমি তা জানতাম। অপরেশবাবুর বন্ধু যাঁরা আসতেন, সবাই তাঁরা প্রবীণ এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন, যেমন—বউবাজারের শ্রীশ মতিলাল মশাই, বৃদ্ধ কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্মা (বিখ্যাত 'শ্বাশারী' ওষুধের আবিষ্কর্তা যিনি। আমরা বলতাম—'শ্বাশারী-দাদা'), পুলিনবিহারী মিত্র (যিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য, এবং নিজেও ছিলেন ভালো গাইয়ে, অনেক গান রেকর্ড করিয়েছিলেন) —শ্রদ্ধেয় সবারই মতামত শুনতে পেতাম বসে বসে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র অভিনয় সম্বন্ধে এঁদের কারুরই মত অনুকূল ছিল না। তবে আর্ট থিয়েটার ঝপ্ করে 'সাতা' নিলো কেন অভিনয় করবার জন্য? কথাটা এক সময় প্রবোধবাবুর কাছে গিয়ে পাড়লাম। উনি শুনে বললেন—ঠিকই শুনেছ 'সীতা' করব আমরা। নির্মলেন্দু 'রাম' করবে।

এইবারে যেন অন্ধকারে একটু আলো দেখা গেল। মনে হলো, এটা হওয়া সম্ভব। নির্মলেন্দু যখন আমাদের স্টারে এলো তখন 'কর্ণার্জুন' ও 'ইরানের রানী' ছাড়া নতুন বই নেই, যোগ্য ভূমিকা নিয়ে ও নামবে কোন্ বইয়ে? 'কর্ণার্জুনে' কোনো ভূমিকা নিতে প্রথমটায় সে অস্বীকারই করেছিল, বলেছিল—ও-বই ত অনেকদিন ধরে চলছে, ওতে আর আমি কী করব? আমায় নতুন কিছু দিন। এই নির্মলেন্দু আর দিলীপকুমার হচ্ছেন মামাতো-পিসতুতো ভাই, ভাবলাম, এ-যোগসূত্র থেকে এ অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। আমার এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়েছিল, যখন নির্মলেন্দু আর্ট থিয়েটার ছাড়বার পর এক বিবৃতি দিয়েছিল এখানে 'সীতা' অভিনয় না হবার জন্য। 'সীতা' ছিল নির্মলেন্দুর অতি প্রিয় বই। 'রাম'-এর ভূমিকাটি করবার জন্য ওঁর মধ্যে তীব্র বাসনাও আমি লক্ষ্য করেছিলাম। আর্ট থিয়েটারের সাপ্তাহিক অভিনয়পুঞ্জের দিনগুলি যখন বেড়ে গিয়েছিল, সেই সব দিনে মাঝে-মাঝে নির্বাচিত নৃত্যগীত প্রদর্শন করাই তখন রেওয়াজ ছিল, নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় ব্যাপারটা নতুন। 'সীতা' থেকে নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় হতো, তাতে 'রাম' সাজতো নির্মলেন্দু। এবং এ-ঘটনার বহু পরে, যখন ছায়াচিত্রের জগতে প্রথম হল টকীর আবির্ভাব, ম্যাডান তখন ছোট-ছোট নির্বাচিত দৃশ্য তুলতেন, তার মধ্যে একটি ছিল 'সীতার নির্বাচিত দৃশ্য' তাতেও—রাম—নির্মলেন্দু। এসব ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য ক'রে আজ মনে হয়, হয়ত সেদিনের সেই অনুমানই সত্য হবে, নির্মলেন্দুর জন্য 'সীতা' নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারুর মত না হওয়ায়, 'সীতার' অভিনয়টা আর হলো না।

ওদিকে, মার্চ মাস শেষ হয়ে এলো। মার্চের শেষ থেকেই স্টারে সিনেমা দেখানো শুরু হয়, যার কথা আগেই বলেছি। শনি-রবি-বুধবারে—নাটক। আর বাকী চারটি দিন—সিনেমা।

পড়ল এপ্রিল মাস। কর্ণার্জুন আশী রাত পেরিয়ে গেছে, আরও চলবে। ইরাণের রানীও যেমন বিক্রি, তাতে করে আরও দু-তিন মাস চলবে আশা করা যায়। বুধবারের বইয়ের পক্ষে বেশ আশাজনক অবস্থাই বটে। প্রসঙ্গত বলি, আশী রাত্রি 'কর্ণার্জুন' অভিনীত হবার পরও ইংলিশম্যানে সমালোচনা বেরিয়েছিল। ১লা এপ্রিল ইংলিশম্যান যা লিখেছিলেন,তার মধ্যে সুখ্যাতির অংশটা বাদ দিলে বিরুদ্ধ মত যা ছিল, তা হচ্ছে এই যে, অনেক অনেক অভিনেতার মেক-আপ মাঝে মাঝে 'রি-টাচ্' করা দরকার, ঘামে রঙ উঠে যায়। এবং অনেকের পোশাক মাঝে-মাঝে আরও পরিবর্তন করা দরকার। পদ্মাবতীর বাবা যিনি সেজেছিলেন, যদিও তিনি রাজা, তাঁর পোশাকটা ছিল ময়লা—পাট-ভাঙাও নয়। প্রতিহারীর মতো, কী দু-একজন প্রতিহারীর থেকেও নিকৃষ্ট।

কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। অখ্যাতনামা অভিনেতা বলে যত্ন করে ইস্ত্রী করে দেয়নি, যা দিতো ওরা বড়োদের এই রকমই ছিল দস্তুর। খ্যাতনামাদের জন্য যত্ন আর আতিশয্যের অন্ত নেই, আর অন্যদের বেলায় অবহেলার অবধি ছিল না বেশ-সজ্জাকরদের। আর রঙ সম্বন্ধে ইংলিশম্যান যে ত্রুটি ধরেছেন তা-ও যথার্থ। আমরা নতুনরা রঙ-করার ব্যাপারে যতটা যত্নশীল ছিলাম, সত্য কথা বলতে কী, পুরনোরা ততটা ছিল না। আমরা মুখের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা-ও রঙ করতাম। পুরনোরা কেউ কেউ ফাঁকি দিতেন, তাঁদের অভ্যাসও ছিল না পায়ে রঙ দেবার। পায়জামা পরে অভিনয় করবার রেয়াজও ছিল পূর্বে, তাই মোজা পরতেই হত সঙ্গে। পা রঙ-করার প্রশ্নও তখন ছিল না, অতএব সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল আর কী! আমাদের ডিরেক্টর ভূপেনবাবু আবার স্টেজ-বক্সে বসে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন, কে পায়ে রঙ করেনি, কে করেছে। কোনো ত্রুটি হলেই ছুটে আসতেন সাজঘরে। রঙ হয়নি কেন?

অমনি তারা পায়ে তাড়াতাড়ি রঙ করে নিতো। এইভাবে রীতিমত ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ভূপেনবাবু। ইংলিশম্যানের সমালোচক যেদিন দেখতে এসেছিলেন সেদিন হয়ত ভূপেনবাবু আসেননি থিয়েটারে, নইলে, এ-ত্রুটি করবে কেন?

গুডফ্রাইডের দিন—১৮ই এপ্রিল, ১৯২৪—কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রোগ্রাম দিলেন—'মুক্তির ডাক', বড়দিনের সময় দুইদিন যার অভিনয় হয়ে গিয়েছিল। 'মুক্তির ডাক' পুরো নাটক নয়, নাটিকা। এক অঙ্কের নাটিকা—একটি দৃশ্যে। অভিনয় ভালো হয়েছিল, লোকে নিয়েওছিল তখন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় একে? 'কর্ণার্জুন' বা ইরাণের রানীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় না। তাই বড়দিনের পর আর হয় নি এ- নাটিকাটি। গুডফ্রাইডে প্রভৃতি উৎসবের দিনে বহু অবাঙালীও আসতেন থিয়েটারের ভিড় করে। তাই গুডফ্রাইডের দিন 'মুক্তির ডাক'-এর সঙ্গে দেওয়া হলো অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট।' এবং মধ্যখানে সুবিখ্যাতা নর্তকী ও বাঈজীগহরজানের নৃত্যগীত। গহরজান তখন ঐসব

জলসায়—বয়স হয়ে যাওবার ফলে—আর উঠে দাঁড়াতেন না বা নাচতেন না। বসে বসেই গাইতেন তিনি, তাঁর দুপাশে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে থাকত, তারাই উঠে-উঠে নাচত বা গাইত। এই গহরের সঙ্গে আমাদের সেই হেম মুখোপাধ্যায়ের খুব জানাশোনা ছিল। গহর হেমবাবুকে 'দাদা' বলতেন, আমাকে বলতেন—'ভাইয়া'। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হবার একটা কারণও ঘটেছিল। উনি আমাদের 'সোল অফ এ স্লেভ' ছবিটা দেখেছিলেন এবং দেখে এত উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, আমাদের স্টুডিও দেখতে এসেছিলেন উনি এবং ওঁর একটু আগ্রহও ছিল ফিল্মে অভিনয় করবার। ও'রই সারেঙ্গীবাদক ছিলেন ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র মশাই। মাঝে-মাঝে স্টারে আসতেন ইনি। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে ছিল গহরজানের বাড়ি। দোতলায়—বড়ো হলঘরে—নবাব-বেগমদের মতো দরবার করে বসতেন—আতরদান—পিকদান এসব নিয়ে। আর তাঁর আশেপাশে থাকত—যারা শিখতে আসত—সেই সব মেয়ে। গহরের গান শুনতে ঐ দরবারে আসতেন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সেযুগের জগৎবিখ্যাত নর্তকী ছিলেন গহরজান—এমন রাজা-মহারাজা তখন ছিলেন না, যাঁরা তাঁর নাম না জানতেন। বিলেতে গিয়ে পর্যন্ত নাচ দেখিয়ে এসেছিলেন। উচ্চমেজাজের মহিলা, সবিশেষ ধনবতী। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের বাড়ি-খানা ছাড়া চিৎপুর রোডের ওপর ছিল দু-তিনখানা বাড়ি, বহু টাকা ভাড়া পেতেন সে-সব থেকে। তাছাড়া হায়দরাবাদেও তাঁর বাড়ি ছিল। স্বামী ছিলেন মিস্টার আব্বাস। তাঁকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে, বাকী সম্পত্তি দান করে গিয়েছিলেন গহরজান।

অতএব, এহেন গহরজানের প্রোগ্রাম, সেদিন স্টারে ছিল বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। তার সঙ্গে হবে 'মুক্তির ডাক' অভিনয়। এই 'মুক্তির ডাক'-এর এক ইতিহাস আছে। বড়দিনের কিছু আগে—এক অভিনয়ের দিনই হবে সেটা—হরিদাস বাবু আমাকে ডেকে বললেন—একখানি নতুন নাটক পড়বেন ?

আগ্রহান্বিত হলাম। বললাম—নতুন নাটকের খোঁজে ত সব সময়ই থাকি, যদি ভালো লাগে, যদি অভিনয় করা যায়।

হরিদাসবাবু বললেন—এটি নাটক নয়, নাটিকা বলতে পারেন।

—তা হোক।

হরিদাসবাবু আমার হাতে দিলেন কাগজে গোল করে মোড়া—সুতো দিয়ে বাঁধা—একটি প্যাকেট। বললেন—পড়ে দেখে বলবেন—কেমন লাগলো ?

এক অঙ্কের বই। কতক্ষণ আর লাগল পড়তে ? পরদিন ওটা ওঁকে ফেরত দিয়ে বললাম—পড়েছি। বড়ো ভালো লেগেছে।

প্রথম প্রশ্নই তিনি করলেন—কী ভালো লাগল ?

বললাম—সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জিনিস। এক অঙ্ক, একটি দৃশ্য। এ এক নতুন ব্যাপার। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে এক অঙ্কের গম্ভীর ভাবের নাটক হয়নি, যা হতো—সব হাল্কা রসের—

প্রহসন জাতীয়। তা-ও আবার হুটি-তিনটি গর্ভাঙ্ক বা অন্তদৃশ্য থাকত। এক দৃশ্যের নাটক এই প্রথম দেখলাম।

হরিদাসবাবু বললেন—আর কী লক্ষ্য করলেন?

বললাম—সংলাপের নতুনত্ব। লেখার ঢঙ্‌টাই দেখছি আলাদা। এরকম ডায়লগ আমাদের দেশে ছিল না আগে, আইডিয়ারও তফাত আছে।

—কী রকম আইডিয়া?

যেন জেরা করতে আরম্ভ করেছেন হরিদাসবাবু। বললাম—প্রাচীনপন্থীদের কাছে ভালো লাগা মুশকিল।

—কেন?

বললাম—এ হচ্ছে মা ও মেয়ে নিয়ে একটি উপাখ্যান, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নায়ক। দোষনীয় না হলেও, আমাদের সমাজধারার নীতিবিরুদ্ধ, যদিও নাট্যকার বৌদ্ধ সমাজকে বেছে নিয়েছেন—বুদ্ধের জীবিত কালের ঘটনা এটি। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, লোকে কেমন নেবে জানি না।

—সেকথা অবশ্য আলাদা।

বললাম আরেকটি নতুন জিনিস দেখলাম। নায়িকা হচ্ছেন নগরীর বিখ্যাত নর্তকী, নটী। তাঁর রূপমুগ্ধ রাজা বিম্বিসার যখন তাঁর সতীত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করে হাসলেন, বললেন—তোমার সতীত্ব! তখন, নটী (অম্বা) বললেন—হ্যাঁ, আমার সতীত্ব। চমকে উঠো না রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম নয়—আত্মার একনিষ্ঠতাই তার প্রকৃত প্রাণ। —এখন এই যে কথাবার্তা, এসবে প্রবীণেরা সায় দেবেন কী? তবে নবীনেরা দেবেন।

হরিদাসবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—পারবেন কথাগুলি যথাযথ রেখে অভিনয় করতে? ভার নিতে পারবেন ঐ নাটকের?

—কেন নয়?

উনি বললেন—তাহলে লাগিয়ে দিন বড়দিনের সময়।

তখন এতো কাজ, সে-সব কাজ বজায় রেখেও হয়ে উঠবে কি এর মধ্যে? হরিদাসবাবু শুনলেন না, প্রবোধবাবুকে সব কথা বলে, বইখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলেন। প্রবোধবাবু বললেন—যা দরকার বোলো, সিন-টিন, জিনিসপত্র, সবেরই ব্যবস্থা করে দেবো।

আবার পড়লাম বইটা। একবার কেন, বার হুয়েক পড়লাম। মাত্র চারটি মুখ্য চরিত্র, আর একটি ছোট চরিত্র। হরিদাসবাবুকে গিয়ে বললাম ভূমিকালিপির কথা। ওঁর ইচ্ছা ছিল, 'বিম্বিসার' আমি করি। কিন্তু ভরসা পেলাম না এতো কাজের চাপের জন্য, সামনে 'দারা' রয়েছে দাঁড়িয়ে 'ইরাণের রানীর'। বললাম—ভূমিকা থেকে আমাকে বাদ দিন। আর সবই আম করে দেবো।

অতএব, 'বিম্বিসার' করলেন প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। দৃশ্যটি সুন্দর সাজানো হয়েছিল—সুদৃশ্য এবং

দ্বিতল। শ্রেণীবদ্ধ সোপান চলে গেছে দ্বিতলের অলিন্দে। নাচে, উদ্যানের অংশ। উদ্যানের দিকে—বাতায়ন। 'ইরাণের রানী'তে যেমন আবহসঙ্গীত ছিল, এতে ব্যবস্থা করলাম অনুরূপ আবহসঙ্গীতের। প্রফুল্ল ছাড়া আর যারা ছিল, তারা হচ্ছে, সুন্দরম—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। অম্বা—কৃষ্ণভামিনী। সুন্দরমের স্ত্রী এবং অম্বার কন্যা—পদ্মা—নীহারবালা। অপরেশবাবুর কথা আগে বলেছি, নতুন নাট্যকারদের বই তিনি ছুঁতেন না। তাই উনি এ-বই ধরলেন না, এবং সেই সঙ্গেই বোধহয় এর দায়িত্ব এসে পড়েছিল আমার ওপরে। নাট্যকার তখন নতুন এবং অখ্যাত। ঢাকায় আইন অধ্যয়ন করছেন তিনি। তাঁর নাটিকাটি পড়ে ভালো লেগে যায় তাঁর শিক্ষক সাহিত্যিক ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের। তিনি পড়ে, হরিদাসবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পড়বার জন্য। সেই থেকে এই নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব। হরিদাসবাবু নাট্যকারকে চিঠি লিখেছিলেন—নাট্যকার এসে অভিনয় দেখেছিলেন কিনা মনে নেই, তবে তখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। নাট্যকারের নাম—মন্মথ রায়, এম-এ, আজকের দিনে যিনি প্রখ্যাতনামা নাট্যকার। বলা কর্তব্য, বড়দিনের সেই অভিনয়ে নাটকখানির সৌভাগ্য, সুখ্যাতি পেয়ে গেল। হরিদাসবাবু নিজে ছিলেন তীক্ষ্ণ সমালোচক, তাঁর সুখ্যাতি ত অর্জন করলেই, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল—এঁদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করল 'মুক্তির ডাক' নাটক। কাগজে-কাগজেও বেরুলো—অজস্র সুখ্যাতি। কিন্তু নাটকখানির দুর্ভাগ্য হলো এই যে, কার সঙ্গে একে জোড়া যায়, এটা ভেবে কোনো কুল-কিনারা পাওয়া গেল না। এতদিন পরে, সুযোগ পেয়ে একে আবার 'পুনরুদ্ধার' করা গেল। এই পুনরভিনয়ের সময় তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল না, কিন্তু তাঁর অভিনীত 'সুন্দরম'-এর ভূমিকাটি যে কে করেছিল, ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ইন্দুই করেছিল ঐদিন—ঐ ভূমিকা। কিন্তু তারপর? কীভাবে কার সঙ্গে ওকে জোড়া যায়। তাই এ-অভিনয়ের পরও ওটা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল।

'বিবাহ-বিভ্রাট'—যেটি 'মুক্তির ডাক' ও গহরের জলসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল, সেটি একটি প্রহসন—১৮৮৪ সালের লেখা—পুরনো বই। কিন্তু পুরনো হলেও বড়ো সজীব। ভূমিকালিপি ছিল এই: কর্তা গোপীনাথ—তিনকড়িদা, ঘটক—নরেশ মিত্র, মিঃ সিন্‌হা—রাধিকানন্দ। গোপীনাথের পুত্র নন্দলাল—ইন্দু মুখোপাধ্যায়। গৌরীকান্ত কারফর্মা, বিস্কুট-খেকো ভুলো—সন্তোষ দাস। মিসেস কারফর্মা—নীহারবালা। ঝি—কৃষ্ণভামিনী।

অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট"—লোকের ধারণা ছিল নিতান্তই একখানি প্রহসন-বিশেষ। আগেকার অভিনয় অবশ্য দেখিনি, তবে গল্প শুনেছি অনেক। তারপর থেকে যতবার অভিনয় হয়েছে, প্রহসনরূপেই হয়েছে, হালকাভাবে। আর্ট থিয়েটারে কিন্তু ঠিক তা হয়নি। এখানে ভালো-ভালো অভিনেত্রী দিয়ে ভালোভাবে অভিনয় করানোর চেষ্টা হয়। আসলে বইখানা প্রহসন হলেও এর মধ্যে একটিবিয়োগান্তের সুর আছে। 'এল-এ' পাশ (আজকের আই-এ বা আই-এস-সি) ছেলেকে কেন্দ্র করে ছেলের বাপের যে 'বরপণে'র অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপরে গড়ে উঠেছে এই

নাটক। মূল ঘটনাস্রোত চলেছে সামাজিক পরিবেশের উপর ব্যঙ্গোক্তি পরিবেশন করে, কিন্তু শেষ দৃশ্যে এসে এক করুণ পরিণতিতে পৌঁছেছে এই নাটক। নাটকের এই বিয়োগান্ত সুরটিকে ধরেই নাটক প্রযোজনার নীতি নির্ধারিত হয়েছিল আর্ট থিয়েটারে। এবং এই প্রয়াসটা ছিল বলেই হরিদাসবাবু কৃষ্ণভামিনীর মতো অভিনেত্রীকে 'ঝি'-এর ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। কৃষ্ণভামিনী তখন বড়ো-বড়ো ভূমিকায় কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে, বিশেষ করে 'ইরাণের রাণী'তে তার খুবই নাম হয়েছে। এই অবস্থায় হরিদাসবাবু যখন তাকে ডেকে বললেন—কেষ্ট, তুমি ঝি-এর পার্টটা করো, তখন সে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণভামিনীর অভিনয়-কৃতিত্বে হরিদাসবাবু মুগ্ধ ছিলেন, খুবই স্নেহ করতেন তাকে। আমাদের রাখালদা বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে 'বাবা' বলতো, সেই হিসেবে, যেহেতু রাখালদা হরিদাসবাবুকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করতেন, সেই হেতু হরিদাসবাবুকে কৃষ্ণভামিনী ডাকত 'জ্যেঠামশাই' বলে। ভক্তিও করত খুব। গুরুর মতো মান্য করত। এবং হরিদাসবাবুর খুব প্রভাবও ছিল ওর ওপর, এটা দেখেছি। বললেন—তুমি 'ঝি' করো, ঘটকের পার্ট নরেশবাবু করছেন। ফলে, সব কটি ভূমিকা আমাদের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়েই করানো যাবে। যদিও উত্তরে কৃষ্ণভামিনী নীরব ছিল, তথাপি তার মনের কথা বুঝতে কষ্ট হয়নি হরিদাসবাবুর। একটু হেসে বলেছিলেন, ঝি-এর পার্টটা 'ছোটখাট' পার্ট নয়, এ পার্ট কে করেছিল জানো? ক্ষেত্রমণি। যার তুল্য চরিত্রাভিনেত্রী এযাবৎ হয়নি। কথা প্রসঙ্গে অপরেশবাবু বললেন—ক্ষেত্রমণি কতো বড়ো অভিনেত্রী জানিস? 'ঝি'-এর পার্টটা এমন চমৎকার করেছিল যে, সুখ্যাতি আর লোকের মুখে ধরে না! তাহলে একটা গল্প শোন্। সুপ্রসিদ্ধ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যখন অভ্যর্থনা-লাভ করবার জন্য বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও লেডী ডাফরিন এসেছিলেন, তখন আমোদ-প্রমোদের নানাবিধ সূচীর মধ্যে 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয়ও ছিল। তদানীন্তন স্টার থিয়েটার অভিনীত 'বিবাহ-বিভ্রাট!' মিঃ সিন্‌হা সেজেছিলেন নাট্যকার স্বয়ং অর্থাৎ নাট্যাচার্য রসরাজ অমৃতলাল বসু। মিসেস কারফর্মা—বিনোদিনী। ঝি—ক্ষেত্রমণি। ক্ষেত্রমণির সেই 'ঝি' দেখে তাঁরা বলেছিলেন—এমন শক্তিময়ী অভিনেত্রী আজকের দিনে বিলাতের থিয়েটারেও কম দেখা যায়।'

বস্তুত, লেডী ডাফরিন ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার পর তাঁর স্বদেশে বসে যে আত্মকথা লিখেছিলেন ('আওয়ার ভাইস্‌রিগ্যাল লাইফ ইন্ ইণ্ডিয়া') তাতে তিনি এই অভিনয়ের কথা লিখেছিলেন এবং ঝি-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এইসব সুখ্যাতির গল্প-সল্প তখন থিয়েটারমহলে খুব প্রচলিত ছিল। সে-সব শুনেই সম্ভবত শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় উক্ত পুস্তকখানি সংগ্রহ ক'রে, তা' থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী, সোমবার তারিখের যে দিনলিপি আছে, সেটি উদ্ধৃত করেছেন, তাঁর "ইণ্ডিয়ান স্টেজ"—তৃতীয় খণ্ডে। যাঁরা আগ্রহশীল, তাঁরা তা আনুপূর্বিক প'ড়ে দেখতে পারেন।

যাইহোক, এইসব কথাবার্তা শুনে কৃষ্ণভামিনী রাজী হয়েছিলেন অবশেষে উক্ত 'ঝি'-এর পার্ট

করতে। অভিনয় চমৎকারই হলো। তবে, অমৃতলালের যুগে সেই যে অভিনয় হয়ে গেছে, এবং তার যে বর্ণনা শুনতে পাই তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে, সেই অনুপাত অনুযায়ী হলো না এ অভিনয়। অবশ্য, একা রাধিকাবাবু মিঃ সিন্‌হার ভূমিকায় একেবারে মাত করে দিলেন। তাঁর সেই পুরো ফিরিঙ্গী কায়দায় চলাফেরা করা,—তাঁর সেই ফিরিঙ্গিসুলভ চালচলন সুন্দর হয়েছিল। দশমাস বিলেতে থেকে বাঙলা ভুলে যাওয়া চরিত্রটিও অদ্ভুত!

—কতদিন বিলেতে ছিলেন?

—যাওয়া-আসা নিয়ে দশমাস।

ফিরিঙ্গি কায়দায় ইংরেজী উচ্চারণের ধরনে হিন্দী ও বাংলা বলার সে কী কায়দা, তাঁর সেই বলার ঢংটি আজও মনে পড়ে, 'স'কে 'ভ'এর মতো উচ্চারণ করে বলতেন। আমাদের 'বিবাহ-বিভ্রাট' এর সব থেকে বড়ো আকর্ষণই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—রাধিকাবাবু। পরে, যখন রাধিকাবাবু স্টার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন নরেশবাবুও করেছিলেন এই পার্ট।

যাইহোক, 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর তবু একটা হিল্লে হলো, সাধারণ নাটকগুলির সঙ্গে অভিনয় হতে লাগল মাঝে মাঝে। কিন্তু 'মুক্তির ডাক?' এক অঙ্কের একটি দৃশ্যের গুরুগম্ভীর নাটিকা—লোকে তখনো দেখতে ঠিক অভ্যস্ত হয়নি। যদিও একাঙ্ক নাটিকা পাশ্চাত্যের সকল দেশেই ইতিমধ্যে হয়েছে, তাঁদের বিখ্যাত লেখক যাঁরা, তাঁরা প্রায় সবাই অল্পবিস্তর একাঙ্ক নাটক লিখে গেছেন। শেখভ, অন্দ্রেয়েভ, মেতারলিঙ্ক্ থেকে শুরু করে স্ট্রীণ্ডবার্গ, অস্কারওয়াইল্ড, সুডারম্যান,—এঁরা সকলেই একাঙ্ক নাটক বা একাঙ্কিকা (শব্দটি মন্মথ রায় দ্বারা প্রবর্তিত) লিখে গেছেন। পেশাদারী মঞ্চে সেগুলি অভিনীত হয়নি, হয়েছে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে। ১৯১৯ সালে ইংরাজী ড্রামার ক্ষেত্রে এলো এক বিবর্তন। জিওফ্রে হুইটওয়ার্থ করলেন 'বৃটিশ ড্রামা লীগ' বা সুপরিচিত নাম—"বি-ডি-এস"-এর প্রবর্তনা, যাঁদের কাজ ছিল, দেশের সমস্ত শখের নাট্য সম্প্রদায়গুলিকে একীভূত এবং কেন্দ্রীভূত করা। এই কার্যেরই ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯২০ সালে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম আরম্ভ হলো একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। এর দেখাদেখি স্কট্ল্যাণ্ডে হলো "এস্-সি-ডি-এ" বা স্কটিশ কমিউনিটি ড্রামা অ্যাসোসিয়েশন। এইসব আন্দোলনের সময় থেকেই জনসাধারণ একাঙ্ক গুরুগম্ভীর নাটিকা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। যেটা ওদের হলো ১৯২০ সালে, সেটি আমাদের হলো ১৯২৩ সালের বড়দিনের সময়। তাহলে দেখা যাচ্ছে মাত্র তিনটি বছরের ব্যবধান; 'যা' বৃটিশ নাটিকা করল, তা আমরা করলাম মাত্র তিনটি বছর পরে। এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় কী? এর পর থেকে বিলেতে খুবই একাঙ্ক নাটক বেরুতে লাগল। আমার কাছে সে-সব কিছু আছে। বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক 'গোলাঞ্জ'-এর একটি সংকলন বেরিয়েছিল ১৯৩৪ সালে, যাতে ছিল পঞ্চাশখানি বাছাইকরা একাঙ্ক নাটক, সবই বিখ্যাত লেখকদের রচনা। তার মধ্যে একটি নাটিকা পড়ে বড়ো আগ্রহান্বিত বোধ করলাম। নাটিকাটির নাম 'দি জাজমেণ্ট্ অব ইন্দ্র' ('ইন্দ্রের ন্যায়বিচারও বলতে পারি)। লিখেছেন কে? না, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। বিদেশী

লেখকদের মধ্যে হঠাৎ এক ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী লেখকের নাম পেয়ে মনটা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল! উদগ্র কৌতূহলও হয়েছিল ধনগোপাল সম্বন্ধে! কে এই ধনগোপাল? শুনলাম কিছুদিন ইনি বসবাস করেছিলেন আমেরিকায়। সেখানে গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের ইংরাজী তর্জমা করে 'চিন্তামণি' নাম দিয়ে প্রকাশও করেছিলেন। 'নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী'তে যে নাটকের তালিকা আছে, তাতে এই গ্রন্থখানিও স্থান পেয়েছে। ধনগোপাল, শুনেছিলাম, সে যুগের এক বাঙালী বিপ্লবী। সে যুগের বিপ্লবীদের যা ভাগ্য ছিল, এঁকেও তা ভোগ করতে হয়েছে। বিদেশে যেতে হয়েছে, কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে এইসব বই লিখে কিছুদিন ধ'রে অর্থ উপার্জন ক'রে দৈনন্দিন জীবন চালাতে হয়েছে ধনগোপালকে। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে ঘটল অবস্থা বিপর্যয়। অর্থ নেই—তদুপরি অসুস্থ দেহ—উপার্জনের ক্ষমতাও ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে গেল। শুনতে পাই, আর কোনো দিকে কোনো আশার অরুণোদয় দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। একথা যদি সত্যি হয় ত, এই লজ্জা ও গ্লানি রাখবার স্থান আমাদের কোথায়? সেদিন দেশের মুখ বিদেশে তিনি যেভাবে রেখেছিলেন, তাতে করে ও দেশবাসী যে-কেউ তাঁর কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। ধনগোপালবাবুর মতো লোক দরকার আজকের দিনে, যিনি তাঁর মতো আমাদের যেসব নাটকের রত্নরাজি আছে, সেগুলি যথোপযুক্তভাবে তর্জমা করে বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রচার করবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের নাটকও করবেন আমাদের ভাষায় অনূদিত। এইভাবে ইংরেজী ত বটেই, অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাও বটে,—চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের নাটক পর্যন্ত আমাদের ভাষায় অনূদিত হওয়া চাই। ধনগোপালবাবু যখন ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন আমরা পরাধীন ছিলুম। নিজের জীবন দিয়ে তিনি সম্ভবতঃ পরাধীনতারই মূল্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু আজকের ধনগোপালদের সম্বন্ধে সে ভুল হলে চলবে না। যেভাবে শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে ধনগোপাল চলে গেছেন, সেভাবে যেন আর কাউকে না যেতে হয়।

কিন্তু, যাই হোক, পূর্বেকার সূত্রে আবার ফিরে যাই। ১৯২৩ সালে বড়দিনের সময় দুদিন আর গুডফ্রাইডেতে একদিন—এই যে 'মুক্তির ডাক' হয়ে গেল, সেই হলো শেষ, অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গেল 'মুক্তির ডাক,' যদিও প্রমথ চৌধুরী, নরেশ সেনগুপ্ত, নজরুল প্রভৃতি বহু রসিকচিত্তকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল এই নাটক।

ওদিকে কিন্তু 'কর্ণার্জুন' স্টারের বিজয়-বৈজয়ন্তী হয়ে চলেছে। প্রতিবার পুরনো দল যে হুল ফোটাতেন মাঝে মাঝে, তা' এতদিনে একটু বুঝি কমে এসেছে! যদিও আঘাত করতে তখনো কেউ কম না! ৯১,৯২ অভিনয়ের সময় পর্যন্ত রঙ্গ-পত্রিকা 'অবতার' বক্রোক্তি এবং টিকা-টিপ্পনী কেটে বসল 'কর্ণার্জুন' সম্বন্ধে। 'আর্টের বাহার'—নামে নিবন্ধের নামকরণ করে লিখলেন—"নূতন দলে আর্টের বাহার দিন দিন খুলিতেছে। তাহাদের কর্ণকে মার্কিনের লোক এবং অর্জুনকে আর্জেনটাইনের অধিবাসী বলিয়া মনে হইল। ইহা কি আর্টের কম বাহাদুরী? কী বলেন? তবে অহীন্দ্র

চৌধুরী বাবাজীবনকে দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইল। তিনি আর্টের দলের মধ্যে আশাপ্রদ বটে, কিন্তু বেচারী কোণঠাসা হইয়া আছেন। তিনকড়িবাবুর অভিনয় তাঁহার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তিনকড়িবাবু ভূতপূর্ব যাত্রাদলের আসরের বিখ্যাত অভিনেতা, তাই তাঁহার স্থান উচ্চে আর অহীন্দ্রবাবুর নীচে। নতুবা অহীন্দ্রবাবু ও তিনকড়িবাবুর—দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।···শুনিতেছি সীতা হরণের পরই, সীতা লজ্জায় একেবারে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আর জনসমাজে মুখ দেখাইবেন না। (৪ঠা বৈশাখ ১৩৩১) 'সীতার উল্লেখ সম্ভবত এই জন্য যে, 'সীতা' আর স্টার থিয়েটারে অভিনীত হবে না, 'অবতার' এ সংবাদটি সংগ্রহ করেছেন।

যাই হোক, তারপর, ১লা মে—১৯২৪ সালে—সুবিখ্যাত অভিনেত্রী কুসুমকুমারী এলেন স্টারে। স্থির হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' অভিনীত হবে। শনি-রবি-বুধ ত বই চলছে, বৃহস্পতিবার চলবে—মৃণালিনী। এবং যেহেতু থিয়েটারের দিন বাড়িয়ে দেওয়া হলো, সেই হেতু সিনেমা দেখানোও গেল বন্ধ হয়ে। দেখতে-দেখতে 'মৃণালিনীর মহলার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। এখানকার বায়োস্কোপ বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু তবু অনাদিবাবু স্টারে আসতেন, তাঁর ঘোড়ার গাড়িটি করে, প্রবোধবাবুর কাছে। সেই একুশ সালে প্রথম আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে, এখন সেই আলাপ পরিণত হয়েছে রীতিমত ঘনিষ্ঠতায়। ওদিকে "চন্দ্রনাথ" করবার পর 'তাজমহল ফিল্মস' আর কোনো কাজ করতে পারছে না, নানান কারণে সে কোম্পানি ওঠে যাবার মতো হয়েছে, স্টার নিলেন না 'তাজমহল' এবং যা হয়, 'তাজমহল' উঠে গেল। এই তাজমহলের স্টুডিওর যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন অনাদিবাবু, সেই সূত্রে নরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন অনাদিবাবু। অনাদিবাবুর নিজের কারখানা ছিল বাগবাজারে—রাজবল্লভ পাড়ায়—সেখান থেকে টুরিং কোম্পানি বেরিয়ে যেতো ছবি দেখাতে দূর দূর দেশে। কারখানা ছিল বলেই অনাদিবাবু ইতিমধ্যে 'রত্নাকর' ছবি তুলেছেন, 'ডাবুর কেলেঙ্কারী' বলে একটি প্রহসন ততদিনে তুলেছেন, কি, তুলছেন। তাজমহলের ঐ সব যন্ত্রপাতি যদি উনি পান ত, ওঁর কাজের আরও সুবিধা হবে। এটা তার একটা খেয়ালও ছিল বলা যায়। বায়োস্কোপ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি, যেখানে বা পেতেন, কিনে নিতেন। এবং তাঁর কারখানায় সেগুলিকে পুনর্যোজনা করে নতুনের মতো গড়ে অনেক কাজ চালিয়ে নিতেন। কিন্তু 'তাজমহল'-এর অন্যতম কর্ণধার আমাদের 'কাকু' আর্থাৎ বি. কে. ঘোষ—আবার জে-এফ-ম্যাডানের মধ্যম পুত্র ফ্রামজী ম্যাডানের সহপাঠী ছিল সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে। সেই পরিচিতির ফলেই বোধহয় ম্যাডানদের সঙ্গে কথা কয়ে যন্ত্রপাতি সব ম্যাডানদের দিয়ে দিলে আমাদের 'কাকু' অর্থাৎ বি. কে. ঘোষ। ওদিকে, আমি কিন্তু ততদিনে ফিল্মের ব্যাপারে আবার একটু জড়িয়ে পড়েছি। 'ইরাণের রানী'র সুখ্যাতি শুনে ম্যাডানরা দেখতে এসেছিলেন থিয়েটার। নিজেরা দেখে, তারপর পাঠিয়েছিলেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশাইকে। তিনি বসে বসে একদিন অভিনয় দেখলেন, এবং অভিনয়-শেষে দেখা করলেন চুপিচুপি আমার সঙ্গে। জানা গেল 'ইরাণের রানী' ছবি হিসাবে তুলতে ওঁরা

আগ্রহশীল। আমার দিক থেকে আপত্তির কী থাকতে পারে? সম্পূর্ণ সম্মতিই ছিল। শুধু ছিলই নয়, ছবি তোলার প্রাথমিক কাজে আমি একটু জড়িয়েই পড়ে ছিলাম বলা যায়। এদিকে এই ব্যস্ততা, অন্যদিকে, ৮ই যে 'মৃণালিনী'র অভিনয় হলো স্টারে। দুর্গাদাস এতেও অভিনয় করেনি, শুধু সিন এঁকেছিল। তিনকড়িদা করলেন পশুপতি। নির্মলেন্দু—হেমচন্দ্র। মৃণালিনী—নীহারবালা। গিরিজায়া—সুবাসিনী। মনোরমা—কুসুমকুমারী।

অভিনয়ের প্রভূত সুখ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই হলো। ফরোয়ার্ড লিখলেন—'A thing of beauty is joy for ever. Bankimchandra can never be old with the literate' public of Bengal'

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কে 'ফরোয়ার্ড'-এর উক্তি অতি সত্য। শুধু রঙ্গমঞ্চের আদি যুগ থেকে নয়, আমাদের যুগেও যে বঙ্কিমের কী বিপুল প্রভাব ছিল, তা' পরবর্তী অবকাশে বলা যাবে।

এই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মনমোহন থিয়েটার উঠে গেল। এই উঠে যাবার পিছনে নানান কারণ আছে। আর্ট থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে থাকতেই, একটা ব্যাপার দেখা গিয়েছিল, সেটা এই যে, বাঙলা দেশে যতগুলি থিয়েটারের কাগজ ছিল, সেইসব সপ্তাহিক, —তার অধিকাংশই ছিল মনমোহনের ওপর বিরক্ত। দানীবাবু যখন নামেন, তখনই একটু সাড়া পাওয়া যায়, নইলে 'মনমোহন'-এর আসর দীপ্তিমান হয়ে ওঠে না; তাছাড়া, দানীবাবুর সঙ্গে ওখানে যেসব পুরাতন শিল্পীরা ছিলেন, চুনীবাবু, ক্ষেত্রবাবু, হীরালালাবাবু—এঁদের কাছে থেকে বহু আশা ছিল দর্শকদের যে, নতুন আরও কিছু পাবো, তা' আর হলো না। তার ওপর গিয়ে গোপনে'কর্ণার্জুন-এর জনপ্রিয়তার ঢেউ। 'কর্ণার্জুন' খুলেছিল ৩০শে জুন ১৯২৩ সালে—ওঁরা সেই দেখে তাড়াতাড়ি করে ১৮ই আগস্ট খুললেন 'আলেকজাণ্ডার' বলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি নাটক। কিন্তু আলেকজাণ্ডার-রূপী স্থবির দানীবাবুকে দর্শক নেবে কেন? 'আলেকজাণ্ডার' হবেন প্রদীপ্ত তরুণ, সেখানে দানীবাবু বৃদ্ধস্থবির, মানাবে কেন ওঁকে? তারপরে নাটকখানিও তত সুবিধার ছিল না। আছে কতকগুলি চমকপ্রদ 'সিচুয়েশন' মাত্র কিন্তু তা-ও কে যে কখন কোথায় ঢুকছে, তার কোনো ধারাবাহিকতা নেই, পারম্পর্যও নেই। তবে একটা ভাব অবশ্য ছিল নাটকে, সেটি—স্বাদেশিকতা। সে যুগের তক্ষশীলা ও পুরু—স্বদেশিকতার আবেগ প্রকাশের সুযোগও ছিল। তাতেও মুশকিল হয়েছিল এই যে, বহু স্থানে 'সেন্‌সর' কেটে দিয়েছিল। যেগুলি কাটা, বইতে সে-সব স্থানে শূন্য লাইনের ওপর তারকাচিহ্নিত করা আছে। তাতে, পুরো সংলাপগুলি যে কী তা-ও সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। বইখানিও তেমন জমে উঠল না। তখন পুরানো নাটকের পুনরাভিনয় করে চালাতে লাগলেন ওঁরা। তারপর, চব্বিশ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারী 'ললিতাদিত্য' খুললেন, তা-ও তেমন চলল না। মনমোহনবাবু ত বহুদিন থেকেই তুলে দেবো-দেবো করছিলেন তাই, মনমোহনবাবু যখন এই সময় গেলেন বেড়াতে দার্জিলিং, ভাদুড়ী মশাই একেবারে নিজেই চলে

গেলেন সেখানে। তারপর যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তা আগেই লিখেছি। শিশিরবাবু ফিরে এলেন বিজয়ী হয়ে। দানীবাবু হতবাক। তাঁকে জিজ্ঞাস না করেই 'মনমোহন' তুলে দিলেন মনমোহনবাবু। ওদিকে শিশিরবাবুর তখনো বই তৈরী হতে দেরী। তাঁর 'সীতা' তখন লেখানো হচ্ছে যোগেশদাকে দিয়ে। সেইজন্য, শিশিরবাবু 'মনমোহন' নিয়ে, মঞ্চ কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দিলেন 'মিনার্ভা'কে অভিনয় করবার জন্য। 'মিনার্ভা' কিছুদিন আবার এখানেই করতে লাগলেন অভিনয়।

তারপর আমাদের 'কর্ণার্জুন-এর শততম রজনীর কথা। এ' আমার নট জীবনের এক বিরাট 'স্মারক-চিহ্ন' বলা যেতে পারে।

তারিখটা মনে আছে—২৪শে মে, ১৯২৪। কর্ণার্জুনের শততম রজনী। যেমন জুবিলীতে সাজানো হয়েছিল, তেমনি সাজানো হলো সব, তেমনি 'চিত্রে কর্ণার্জুন' বিলি করা হলো। অধিকন্তুর মধ্যে হয়েছিল এই যে, ঠিক অভিনয়ের আগে একটি সভা হয়েছিল, সভাপতিত্ব করেছিলেন—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁর ভাষণ, যা কাগজে বেরিয়েছিল, তার কিছুটা উদ্ধৃত করি,—শ্রীযুত বাবু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কর্ণার্জুন' নাটক পড়িয়া ও তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। মহাভারতে কর্ণের চরিত্র সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, অপরেশবাবু তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন। অভিনয়ে কর্ণের চরিত্র দেখিয়া না মুগ্ধ হইয়াছেন, এমন লোকই বিরল। তাই কর্ণার্জুন উপরি-উপরি একশত রাত্রি অভিনয় হইয়াও আজো পুরানো হয় নাই। নাটকখানিতে গ্রন্থকার প্রায়ই মহাভারতের অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল শকুনির চরিত্রটি বদলাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে নাটকখানি আরও খুলিয়াছে। শকুনি যে কুরুবংশের শনি, সেটা সকলেই জানিত। কিন্তু শকুনি যে সত্যসত্যই প্রতিহিংসা লইবার জন্যই কুরুকুলে বাস করিয়াছিল, এটা অপরেশবাবুর নিজস্ব।

সেদিনকার সভায় উপস্থিত ছিলেন—নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু, রায় জলধর সেন বাহাদুর, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় (ইনি এঁর বক্তৃতায় অপরেশচন্দ্রকে 'নাট্যবিনোদ' উপাধি প্রদান করেন), ললিতমোহন গুপ্ত ও অন্যান্য সুধিবৃন্দ। এর পরে, রবিবার ১০১ রাত্রি অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর, সোমবার স্টার মঞ্চে একটি প্রীতিভোজ ও সান্ধ্য সম্মেলন আহুত হয়েছিল। সেখানে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অন্যান্য থিয়েটারের শিল্পী,ডাঃ নরেন বসু প্রভৃতি ডাক্তারবাবুরা, বিশিষ্ট কবিরাজ, বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হয়েছিল, বলা যায় প্রেক্ষাগৃহ ভরে গিয়েছিল এবং এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ পিয়ারা সাহেবের গান। প্রসঙ্গত বলে রাখি, সম্প্রতি এক ভদ্রলোক আমাকে ফোনে জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে আমি যে লিখেছিলাম, পিয়ারা সাহেব নবাব পরিবারের লোক, সেটা সত্যি নয়। ইনি মেটিয়াবুরুজেই থাকতেন এবং বাল্যকালে বেশ বাবুয়ানী ছিল বলেই আমার অনুরূপ ধারণা হয়েছিল আর কী। শুনলাম, পিয়ারা সাহেব আজও বেঁচে আছেন, এবং ঐ অঞ্চলের কোনো এক সিনেমা-গৃহের ম্যানেজাররূপে কাজ করছেন। ইনি ছিলেন বিশেষরূপে কাওয়ালী গানের ওস্তাদ। সেদিন উনি ছাড়া আরও সব গাইয়ে ছিলেন উপস্থিত। গানের পর যেমন চা ও পানটান দেওয়া হয়,

তেমনি দেওয়া হবে বলে মনে করেছিলেন অভ্যাগতবৃন্দ। তাই যখন 'দয়া করে আপনারা একটু ওপরে আসুন' বলে আহ্বান জানানো হলো, তখন তাঁরা একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। তখনো টেবিলে খাওয়ার রেওয়াজ হয়নি, তাই পাতা পেড়ে একেবারে যাকে বলে যজ্ঞি-বাড়ির অয়োজন, তারই ব্যবস্থা হয়েছিল থিয়েটারে। আসল কথা, কর্তৃপক্ষ আয়োজনে কোনও কার্পণ্য করেননি শততম রজনী উৎসব বলে। এর আগে বাংলা দেশে কোনো নাটকের একাদিক্রমে চলবার রেকর্ড হিসাবে শততম রজনী অতিক্রান্ত হয়নি, একাদিক্রমে পঞ্চাশ রাত্রিই হয়নি। এদিক থেকে দেখতে গেলে এ তো এক ইতিহাসেরই সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। তার সাফল্যের জন্য কর্তৃপক্ষের মনে উৎসাহ আসা স্বাভাবিক, আনন্দও হওয়া স্বাভাবিক।

ওদিকে প্রতি বুধবারে ত 'ইরাণের রানী' চলেছে, বৃহস্পতিবারের বই 'মৃণালিনী'ও শেষ হয়ে এলো, এবং শেষ পর্যন্ত ২৩শে জুলাই রাত আটটায় খোলা হলো বৃহস্পতিবারের নাটক হিসাবে 'কপাল-কুণ্ডলা।' ভূমিকালিপি ছিল—চাটুজ্যে—অপরেশচন্দ্র। নবকুমার—তিনকড়ি চক্রবর্তী। অধিকারী—অহীন্দ্র চৌধুরী। কাপালিক—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। মতিবিবি—কুসুমকুমারী। পেশমন—সুবাসিনী। কপালকুণ্ডলা—নীহারবালা। শ্যামা—নিভাননী। মেহেরউন্নিসা—পান্নারানী। এই পান্নারানীও ছিল এক সুগায়িকা, ভবানীপুরের অধিবাসিনী, ভবানী থিয়েটারে অভিনয় করতো এবং গান করতো, পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে রাধিকানন্দবাবু স্টার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে একলা থিয়েটার করবেন বলে চেষ্টা করছিলেন তখন, এবং তার একটা সম্ভাবনাও হয়েছিল। শহরের বিখ্যাত ধনী কীর্তিচন্দ্র দাঁ-মশাই তাঁকে অর্থ-সাহায্য দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল।

আমাদের ত হলো ওদিকে 'কপালকুণ্ডলা'। এর একটা ইতিহাসও আছে। এ' বই বহুদিন থেকেই মঞ্চে অভিনীত হয়ে আসছে, বলা চলে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ-প্রতিষ্ঠার সেই আদিকাল থেকেই। কিন্তু যখন আবার নতুন করে ক্লাসিক থিয়েটারে 'কপালকুণ্ডলা' খোলবার ব্যবস্থা হলো গিরিশচন্দ্রের করা নাট্যরূপ, সেই সময় তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী দুজনেই রয়েছেন ক্লাসিকে। গিরিশচন্দ্র ব'সে নিজের হাতে সবাইকে পার্ট দিলেন, সবাই নিয়মমাফিক তাঁকে প্রণাম করে পার্ট হাতে নিয়ে সরে যাচ্ছে। কুসুমকে উনি দিলেন—কপালকুণ্ডলা। আর তারাসুন্দরীকে দিলেন—মতিবিবি। কুসুমকে পার্ট দেবার পরই তিনি বুঝতে পারলেন, কুসুম একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ভিতরে-ভিতরে, যদিও মুখে কিছু বলছেন না। সে-ভাবটা টের পেয়েই গিরিশচন্দ্র বললেন—তোর করার ইচ্ছে 'মতিবিবি', না?

কুসুম চুপ করে আছেন। গিরিশচন্দ্র বললেন—দেখ, বিনোদিনী যখন ন্যাশনালে 'কপালকুণ্ডলা' করে, তখন তাকে পার্ট দেওয়ার সময় তার কথায় বা হাবে-ভাবে একটুও ক্ষুণ্ণ ভাব প্রকাশ পায়নি। বরং তার ঐকান্তিকতায় মতিবিবির থেকেও সজীব হয়ে উঠেছিল 'কপালকুণ্ডলা'। আসল কথা, পার্ট কিছু নয়রে, যে করবে, তার শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে যে-কোনো পার্টই সজীব হয়ে উঠতে পারে।

কুসুম ঈষৎ মুখভার করে বললে—আমি কি তাই বলেছি বাবা ?

কিন্তু কুসুমের মন থেকে তখনো ক্ষুন্নভাব দূর হয়নি দেখে গিরিশচন্দ্র একটু হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা, আমি একদিন ছোট ছোট পার্ট করে তোদের দেখাবো'খন।

তা তিনি করেছিলেন দু-তিন রাত্রি ধরে একসঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা পার্ট। অধিকারী, চটিরক্ষক, মাতাল, মুটে ও প্রতিবেশী।

কথাটা হয়েছিল বহু পূর্বে, আমার এটা শোনা কথা। কিন্তু তখন ওটা প্রযুক্ত হলো। আমার ওপর। ভূমিকাগুলিকে প্রবল করবার জন্য অপরেশচন্দ্র নিজে নিলেন ছোট পার্ট – চাটুজ্যে, আর আমায় দিলেন—অধিকারী। এটাও খুব ছোট পার্ট, মাত্র এক সিনের। আমি বলেছিলাম—আমি ত ছুটিছাটা পাই না তেমন। থাক না, না-ই বা রইল আমার পার্ট।

অপরেশচন্দ্র তখন মৃদু হেসে আমাকে বলেছিলেন গিরিশচন্দ্রের ঐ গল্পটা। এর ওপর আর কোনো কথা নেই। আসলে পার্ট ছোট বলেই আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু রিহার্স্যাল দিতে দিতে মনে হলো, পার্ট ছোট হলেও—ভালো পার্ট। পার্টটা করতে করতে ঋষি কণ্বের কথা মনে হলো। সেই শকুন্তলা। আজীবন যাকে লালন-পালন করলেন, তাকে বড়ো করে যখন শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছেন, তখন মনটা তাঁর কেঁদে উঠল। তিনি বললেন—গৃহী না হয়েও আমার মনটা যখন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন গৃহী হলে না-জানি কতো বেদনা পায় মানুষ!

কণ্বের মতো অধিকারীও গৃহহারা—মায়ের সেবক তিনি। শিশু বয়স থেকেই তাঁর আঙিনায় দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে যে খেলা করেছে, তার প্রতি মমতা আসা স্বাভাবিক। সেই শিশু আজ বড়ো হয়েছে। পালিয়ে এসেছে সে নবকুমারকে নিয়ে। উনি নবকুমারকে লুকিয়ে রাখলেন, লুকিয়ে ওদের বিবাহ দিলেন, কিন্তু বললেন—ওখানে তোমাদের থাকা হবে না। কাপালিক খুঁজতে খুঁজতে ঠিক এখানে এসে পড়বে।

বলে, ওদের মেদিনীপুরের দিকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ব্যবস্থা ত করলেন, কিন্তু বিদায় দিতে মন সরে কই ? গৃহীর মতো কেঁদে ফেললে চলবে না, চোখে জল আসবে না, কিন্তু মায়া-মমতা-স্নেহের প্রকাশ দেখাতেই হবে। তাছাড়া, অধিকারীর সংলাপগুলি ছিল বড়ো ভালো, সেই সংলাপ ও ভাবাভিব্যক্তিকে সম্বল করে চরিত্রটিকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সেলুকাস করেছিলাম, সে-ও প্রৌঢ় এবং এ-ও প্রৌঢ়, কিন্তু এ হচ্ছে সামাজিক। তখন যুবকের ভূমিকাই করতাম সাধারণত, তাই দর্শকদের মধ্যেও একটা আগ্রহ সঞ্চারিত হলো আমাকে প্রৌঢ়রূপে দেখে। অর্থাৎ, যাকে দেখেছি আমরা—অর্জুন, কুমারসেন, দারা সাজতে—সে সাজছে অধিকারী ? দর্শকদের মনের ভাব অনেকটা এই রকম হয়েছিল আর কী! সার্ভেণ্ট লিখলে—

Mr. Aparesh Ch. Mukherjee as "Chatterjee"—a typical Kulin Brahmin of the past was unique. Mr. Ahindra Chowdhury as "Adhikary" was marvellous."

দৃশ্যপটের মধ্যে বালিয়াড়ির দৃশ্যটি হয়েছিল সব থেকে সুন্দর। শিশির পত্রিকা লিখেছিল—"বিশেষত বালিয়াড়ির দৃশ্যটি আমাদের বড়ই স্বাভাবিক বোধ হইয়াছে। শুধু আমাদের কেন, যাঁহারা সমুদ্রের তীরবর্তী কণ্টক-লতাবৃত বালিয়াড়ি দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আমাদের মতের সমর্থন করিতে হইবে।"

অভিনয়-সম্পর্কে 'শিশির' লিখেছিল—"কাপালিকের অভিনয় করিয়াছিলেন প্রফুল্লবাবু। নবকুমারকে লতার দ্বারা বন্ধন, দাঁড়কাকের কা-কা-এর মত অমঙ্গলপূর্ণ 'আয়-আয়' ডাক সত্যই দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। এই জাতীয় ভূমিকায় ইহা অপেক্ষা কৃতিত্বের কথা আর কি থাকিতে পারে? চাটুজ্যের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র যে হাস্যরসের স্রোত বহাইয়া ছিলেন, তাহাতে অনেকের পেটে যে খিল ধরিয়াছিল—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। চরম হইল যখন থুথু ও গামছা দিয়া চটি জুতাটি মুছিয়া, সেই গামছাটি দ্বারা আবার গাত্র মার্জনাপূর্বক সেটাকে মস্তকে স্থাপন করিলেন।"

বালিয়াড়ীর দৃশ্যে মঞ্চমায়া দেখবার মতো হতো। দৃশ্যের পিছনটি অন্ধকার। বালি আঁকা র‍্যাকগুলি স্টেজের ওপর পাতা রয়েছে, তার ওপর দিয়ে চলাফেরা করা যায়। র‍্যাকের ওপর আমাদের মালী রোজ এসে বালিয়াড়ীর ওপর যে ধরনের লতাগুল্ম বা গাছ হয়, সেইরকম ধরনের গাছ এনে পুঁতে দিতো, গাছগুলি তাতে সজীব দেখাতো। তার সামনে—স্টেজের মাঝামাঝি জায়গায় বসে থাকতেন কাপালিক। মাথার ওপরকার ঝারি থেকে নীল আলো এসে মঞ্চময় বিচ্ছুরিত হয়ে আছে। তার থেকে একটু দূরে জ্বলছে লাল আলো। সেই লাল আলোটা কাঁপছে আর ওর জটাজুটের ওপর এসে পড়েছে তার আভা, সত্যিই বড়ো ভীষণ দেখাতো—পরিবেশ আর কাপালিক। মঞ্চের মধ্যখানে যে গর্ত ছিল, যেখান থেকে লিফ্‌টের মতো কোনো বস্তু বা মানুষকে নিয়ে নেমে যাবার ব্যবস্থা ছিল, যাকে বলে, 'স্টেজ- ট্র্যাপ'—সেখানকার কাঠটি খুলে নিয়ে, সেস্থানে লোহার পাতলা জাল দিয়ে তৈরী একটা বাক্স বসানো আছে। বাক্সটা এমন যে, আগাগোড়া জাল, কিন্তু তার ঘেঁষে ঘেঁষে সরু কাঠ দিয়ে জালগুলি আটকানো তারই গায়ে গায়ে হলদে-লাল সব সিল্কের টুকরো পর-পর কেটে বসানো রয়েছে। সিল্কের টুকরোগুলি এমনভাবে মোটা থেকে সুরু করে কাটা, যেন অগ্নিশিখা বলে ভ্রম হয়। ভিতরের জালের সঙ্গেও সংলগ্ন ছিল সিল্কের কাটা বড়ো বড়ো টুকরো,—লকলকে অগ্নিশিখার মতো; লাল-হলদে আর ঈষৎ নীল,—এগুলি থাকত জালের সঙ্গে বাঁধা। বাক্সের ঠিক নীচে, একটা টুলের ওপরে, একটা টেবিল-ফ্যান থাকতো শোয়ানো, ওপরের দিকে মুখটা উঁচু করা। সেটা চালানো মাত্রই অগ্নিশিখারূপ সিল্কের ছোট বড়ো টুকরোগুলি আগুনের জিভের মতো লকলক করে উঠে ওপরের দিকে উড়ে উড়ে কাঁপতে থাকত। এরই ফলে ঘটত ঐ অগ্নিকুণ্ডের বিভ্রম। তার পাশেই থাকত বাক্স-করা একটা লালচে আলো সেটা থেকেই আলো এসে পড়ত ঐ শিখা পার হয়ে ওঁর মুখের ওপরে, ফলে, আলোটা ওঁর মুখে পড়ে কাঁপছে মনে হতো। সপ্তগ্রামের বাড়ি বা বাড়ির সদর ইত্যাদি ভালোই হতো, কিন্তু ঐ বালিয়াড়ীর দৃশ্যের কোনো তুলনাই হয় না! আর, অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষ করে মতিবিবি যে

দৃশ্যে নবকুমারকে প্রত্যাখান করছেন, সেখানে কুসুম ও তিনকড়িদা, উভয়ের অভিনয় হতো অনিন্দ্যসুন্দর! তারাসুন্দরীর 'মতিবিবি' আমি দেখিনি, কিন্তু গল্প যা শুনেছি, তা থেকে অনুমান করতে পারি, কী অপূর্ব হতো সেই অভিনয়। কুসুমেরও খারাপ হতো না।

বঙ্কিমের বইয়ের যেন মা'র ছিল না। থিয়েটারের পুরাতন যুগে, মধ্যযুগে, আমাদের যুগে, যখনই বঙ্কিমচন্দ্রের বই অভিনীত হয়েছে তখনই একটা সাড়া পড়ে গেছে। আমাদের 'কপালকুণ্ডলা'ও কম আলোড়ন তোলেনি। ওঁর কতো বই যে আমরা অভিনয় করেছি, তা ইয়ত্তা নেই। প্রায় সব বই-ই বলতে গেলে। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরানী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ থেকে শুরু করে যায় 'রজনী' পর্যন্ত। সে যুগে ওঁর বইয়ের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, এই এঁরা। আমাদের সময়েও নাট্যরূপ দিয়েছেন—শচীন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র ভদ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি নাট্যকাররা। কাজেই, দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘকাল ব্যাপী বঙ্কিমচন্দ্র মাতিয়ে রেখেছেন বাংলার মঞ্চ। এতকালব্যাপী কোনো নাট্যকার নাকি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। বঙ্কিমের বই-ই এমন, যুগের রুচি অনুযায়ী ওকে নাট্যরূপান্তরিত করা যায়। ভবিষ্যতেও যদি কেউ নতুন করে ওঁর বইগুলির নাট্যরূপ দেন, তাতেও আবার নতুন করে চলবে ওঁর বই, আমার এই ধারণা। এমন গল্পের বাঁধুনি, এমন রোমান্টিক ধরন, এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, এ আর পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের উপন্যাসের নাট্যরূপ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলিই ক্লাসিকের দাবি করতে পারে। ১৯৫০ পর্যন্ত যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছে, সেগুলিকে বিচারের মধ্যে টেনে এনে প্রশ্ন করতে পারি, আর কোনো নাটক এ দাবি করতে পারে কী? আমার ত মনে হয়, অমন যে জনপ্রিয় নাটক—গিরিশের প্রফুল্ল আর দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান এ-ও অতোটা পারে না। ১৮৭৩ থেকে ১৯৫০ প্রায় আশী বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র মাতিয়ে রেখেছেন রঙ্গমঞ্চ। এই আশী বছরে যার ব্যাপ্তি, সে সব নাটকই ত ক্লাসিক! বঙ্কিমকে আমরা বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট বলে খুব সম্মান দেখিয়েছি, কিন্তু, তাঁর ভাবের গভীরতা, এবং লেখার স্টাইল এমন যে, বিলিতী সাহিত্যে গভীর জ্ঞান আমার না থাকা সত্ত্বেও বলতে পারি যে-সব বিদেশী রোমান্টিক উপন্যাসকার ওদেশে আছেন, ইংরেজ ও ফরাসী, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মান তাঁদের সমান ত নয়ই, বরং উর্ধ্বে।

কিন্তু, কী কথায় কী কথা এসে পড়ছে! আমাদের স্টারের পরবর্তী ঘটনা হলো, দানীবাবুর স্টারে আগমন। কেমন করে ঘটল, সেটা বলি। 'মনোমোহন' উঠে যাবার পর বসে আছেন দানীবাবু। ওঁর সমধর্মী—যাঁরা অন্তরঙ্গ—তাঁরা ওকে জপাচ্ছেন,—নিজেই থিয়েটার খুলুন না মশাই?

দানীবাবুর টাকাও আছে। তাই প্রায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন আর কী! রীতিমত ভাবছিলেন —তা' করলে মন্দ হয় না?

কোন কাগজেও যেন টিপ্পনী করে,—শিশিরবাবু চেষ্টা করছেন দানীবাবুকে তাঁর মঞ্চে নেবার জন্য।

এমত অবস্থায় একদিন দেখি, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এসে বসে আছেন স্টারে।

গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর অবিনাশবাবু ঐ পরিবারের মধ্যেই বসবাস করতে থাকেন, দানীবাবুর বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। মনোমোহনে বসে নাটক পড়া শুনতেন, দানীবাবুকে দেখাশোনাও করতেন। এহেন অবিনাশবাবুকে স্টারের অফিসে এসে বসে থাকতে দেখে, কেমন যেন মনে হলো। অপরেশচন্দ্র আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও করিয়ে দিলেন।

কানাঘুষোয় শুনলাম, দানীবাবু শিশিরবাবুর ওখানে যাবেন না, এখানেই আসছেন।

একটা অভিনয় দিনে, আমাদের যে ড্রেসার ছিল কুঞ্জ, সে এসে বললে—ম্যানেজারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন এখানে এসে।

চমকে উঠলাম। বললাম—সে কী রে! এখান কেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই ত যেতাম। কুঞ্জ বললে—আমায় বললেন, ওনার আশেপাশে যখন কেউ থাকবে না, তখন আমাকে ডেকে আনিস।

বললাম—দাঁড়া, সিন থেকে ঘুরে আসি, তারপরে সব বলিস।

কুঞ্জ বাল্যকাল থেকেই ড্রেসারগিরি করছে, ওর মামাও ড্রেসার ছিল। জাতিতে ওরা ব্রাহ্মণ। কুঞ্জই দেখত আমাদের পোশাক-টোশাক। কত বকুনিই যে খেয়েছে, তবু আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। একদিন কী কারণে যেন রেগে গিয়ে তেড়ে গিয়েছিলাম ওর দিকে, বলেছিলাম—আজ মারবই তোকে।

তা' ও করেছিল কী, ভয়ে আমার সাজঘরের সঙ্গে যে ফিট্ করা তক্তপোশটি ছিল একেবারে তার তলায় সেঁধিয়ে গেল।

আমি নীচু হয়ে ওর পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে ওকে বার করেছি, আর ও প্রাণপণে তক্তপোশের পায়া জড়িয়ে ধরে আছে। আমাদের ঘরের একটু উঁচুতে ছিল গরাদ-বিহীন জানালা। বলছিলাম —তোকে ঐ জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দেবো। আর সেই শুনে ভয়ে ও কাঁপছে!

ড্রেসার যারা ছিল, তাদের গুণের কথা কখনো ভুলতে পারি না। বিশেষ করে, এই কুঞ্জ। মাত্র পোশাক পরিয়েই কর্তব্য সমাধা সে করত না। কীসে আমরা খুশী থাকব, কীসে আমাদের মেজাজ ভালো থাকবে, এই ছিল তার চিন্তা। একদিন হয়ত বললাম,—এই কুঞ্জ, শরবত আনিয়ে দে, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

তা বলতো—না স্যার, শরবত খাবেন না, গলা ধরে যাবে।

সেই কুঞ্জ, সেদিন যখন সিন থেকে ঘুরে এলাম, আমাকে দেখে হাঁক দিয়ে বেয়ারা কাশীকে ডাকলো। বললে—এই কাশী, ম্যানেজার মশাইয়ের গড়গড়াটা এখানে এনে দে।

কৌতূহল হলো। বৃদ্ধ যে একেবারে গড়গড়া নিয়ে আমার ঘরে বসেছেন, ব্যাপারটা কী?

এলেন অপরেশচন্দ্র একটু পরেই। দুটো একটা মামুলী কথা বলবার পরই, বলে উঠলেন আসল কথাটা,—দানীবাবু আসছেন শুনেছেন বোধহয়?

—হ্যাঁ, কানাঘুষো শুনেছি, স্পষ্ট কিছু জানি না।

—ঠিকই শুনেছেন। আসছেন। তিনি এলে পুরানো বইগুলো আমরা অভিনয় করতে পারি, কী বলেন? তার আসা এখানে মঙ্গলজনক নয়?

—নিশ্চয়ই !—বলে উঠলাম—অতো বড়ো অভিনেতা আসবেন, কতো শক্তি বেড়ে যাবে আমাদের। কিছুদিনের মধ্যেই শিশিরবাবু থিয়েটার খুলছেন শুনেছি, এ অবস্থায় ওঁকে পেলে আমাদের ত খুবই ভালো হবে।

অপরেশচন্দ্র বললেন—ওখানে উনি ছিলেন মান্যপদে, ম্যানেজার। এখানে আমি ম্যানেজার হিসাবে রয়েছি, তাই ওকে ত আর এখানে ম্যানেজার করা যায় না, তাই ওঁকে আমরা আনছি, নাট্যাচার্য হিসাবে—শেখাবেন না কিছুই, ওসব ঝঞ্ঝাটে উনি যান না, তবে, একটা পদ ত দরকার। আপনার আপত্তি নেই ত ?

—সে কী ! আমি বললাম—আপত্তি কেন হবে ! শেখান না উনি ? ওঁর অভিনয় দেখে-দেখে কতো জিনিস শিখছি দূর থেকে, এখন ওঁকে কাছে পেলে ত, আরও কতো শিখতে পারব ! আমার আপত্তি থাকতে পারে, এটা ভাবলেন কী করে ?

অপরেশচন্দ্র এইবার হেসে ফেললেন, বললেন—সেইরকম শুনেছি।

—কে বললে !

—থাক, না-ই বা শুনলেন।

চলে গেলেন অপরেশচন্দ্র। গেলাম প্রবোধবাবুর কাছে। বললাম গিয়ে সব। বললাম —অপরেশবাবু ও-কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন ? অর্থ কী ?

প্রবোধদা বললেন—কথা উঠেছে বলে, দানীবাবুকে আনায় তোমার নাকি মস্ত আপত্তি।

—সে কী ! কে বলেছে !

উনি বললেন—কে বলতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

—বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই আমার কোনো অন্তরঙ্গ লোক।

—হ্যাঁ, খুব পাকা মাথা।

হেসে ফেললাম। নামটা অবশ্য পেটে এলেও মুখে বলতে পারলাম না। ঘটনাটা তখন দাঁড়িয়েছিল, যেন, আমরা নতুনরা একটা দল বেঁধেছি। দুর্গা, ইন্দু. এরা সব নাকি আমার কথায় ওঠে বসে। অতএব, এরা বিগড়ে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

যাক, এভাবে যে ব্যাপারটা মিটে গেল, এতেই শান্তি পেলাম আমি।

এর পরে, দানীবাবু একদিন বেড়াতে এলেন স্টারে। অপরেশবাবু বললেন—এলে, দেখা করবেন।

—নিশ্চয়ই যাব। আমি বললাম—আপনি পরিচয় করিয়ে দেবেন।

মনে মনে বললাম—সর্বনাশ, ওসব কথা দানীবাবুর কানেও গেছে নাকি !

স্টেজের উত্তর দিকে, যেখানে সিনটিন রাখা হতো, সেখানে একটা ঘর ছিল। বাইরে, আস্তাবলের ধার দিয়ে এলে সেই ঘরে সোজাসুজি আসতে পারা যায়। ওখানে, একটা দরজা ছিল

বাইরের দিকে যাবার। দানীবাবুর সঙ্গে লোকজন দেখা করতে আসবে, সেইসব ভেবেই ও ঘরখানা সংস্কৃত করে দেওয়া হলো দানীবাবুকে।

এলেন উনি। অপরেশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। দানীবাবুর কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। সেই ভঙ্গীতে বললেন—নাম শুনেছি। অবিনাশবাবু বলছিলেন। বেশ বেশ। আপনি ভালো অভিনয় করেন।

—জানি না। যথাসাধ্য করি আর কী!

তারপরে ক্রমশ ওঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপই হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। দুজনে বসে কতো গল্পই না করেছি। উনি তামাক খেয়ে নলটা দিতেন আমার দিকে বাড়িয়ে, বলতেন—খান।

না এলে, না তামাক খেলে, দুঃখ করতেন। আর, গল্প হতো অবিনাশবাবুর সঙ্গে দানীবাবুরই ঘরে বসে। পুরোনো দিনে কতো গল্পই যে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই।

দানীবাবুর স্টারে আসার ব্যাপার নিয়ে যখন প্ল্যাকার্ড পড়লো, তখন ছাপার ব্যাপারে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ওঁর নামের সঙ্গে ছাপা হয়ে গিয়েছিল ইংরাজীতে—"The great Tragedienne!"

শব্দটা ফরাসী, স্ত্রীলিঙ্গ। এই নিয়ে হাসাহাসি, সারা শহরময় একটা চাঞ্চল্য আর কৌতুকের বন্যাই বয়ে গিয়েছিল।

এখন, উনি এলেন, কী অভিনয় হবে? না, প্রথমেই চন্দ্রগুপ্ত, বৃহস্পতিবারের নাটক হিসাবে। আমাদের এটা আগেই করা ছিল, তবু মহলা দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। হরিদাসবাবুর ছিল 'কিওরিউ' সংগ্রহ করার ঝোঁক। কোথায় কোন এক সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন, পায়ের—হাতের-বুকের-বর্ম,—প্লেটের। গ্রীক্ হেলমেট্ও সংগ্রহ করেছিলেন, লাল পশম দিয়ে ছাঁটা। আমাকে দেখিয়ে একগাল হেসে বললেন—কীরকম? সেনাপতি সুন্দর মানাবে।

সেলুকাস সাজছি। চুল পরতাম না, নিজের চুলই সাদা করে নিতাম। হেলমেট্টা পরতে গিয়ে দেখি, মাথায় লাগছে। প্যাড করে নিলাম। দানীবাবু আমাকে বললেন—ওখানে যখন 'আলেকজাণ্ডার' করেছি, ওরা তখন একজোড়া গ্রীক জুতো তৈরী করিয়ে দিয়েছিল। সেটা নিয়ে এসে আপনাকে দেবো, পরে দেখবেন।

উৎসাহিত হয়ে বললাম—দেখি ত, আপনার জুতো আমার পায়ে মাপসই হয় কি না?

হলো। তবু বললাম—না হয় না হবে, একটু লাগলেও ক্ষতি নেই। আপনি আনবেন।

আনলেন সেই স্যাণ্ডেলের মতো গ্রীক্ জুতো। ভালো হলো আমার পোশাক-আশাক। মেক-আপও হলো নতুন। এক ভদ্রলোক তখন বিলেত থেকে মেক-আপ শিখে এসে, আমার ওদিকে ঝোঁক আছে শুনে, আলাপ করে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তিনি বললেন—আমি আপনার মেক-আপ করে দেবো। প্রৌঢ় গ্রীক্।

—পারবেন?

—দেখুন না ট্রাই করে ?

বললাম—বৃহস্পতিবার প্লে, আপনি বুধবারে আসুন। 'ইরাণের রানী' আছে সেদিন। শো শেষ করে মেক-আপের রিহার্স্যাল দিয়ে নেবো। নইলে, বৃহস্পতিবার প্লের আগে যখন মেক-আপ করে দেবেন, সে মেক-আপ যদি পছন্দ না হয় ? তখন ত তুলে ফেলবারও অবকাশ থাকবে না।

অবশ্য, মেক-আপ খুব ভালোই হয়েছিল। আমি তখন সেলুকাসে মোটা ভুরু ও 'হুইস্‌কার' নিতাম। সিন্ধুনদ তটের দৃশ্যটি দেখতে খুব সুন্দর হলো। সেকেন্দার স্তব্ধ হয়ে দেখছেন পর্যন্ত। আমি দাঁড়িয়ে আছি,আমার পাশে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে হেলেন, তখন ওটা সেট্ সিন ছিল। তাঁবুর সামনে বারান্দা মতো করা। ডিভান বসানো। দূরে-দূরে ঘুরছে সব বডিগার্ড।

দানীবাবু 'চাণক্য'রূপে অভিনয় করলেন, যাকে বলে, প্রাণপণ, চোখে ভালো দেখতেন না তখন। বলতেন—আমাকে ঐ ফোকাস্-টোকাস্ আলো-ফালো বেশী দিস না রে, চোখে সইতে পারব না।

কিন্তু, স্টেজে যখন নামলেন, তখন অন্য মানুষ। আলোও পড়ছে চোখে মুখে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। চলাফেরা চমৎকার, পদক্ষেপ একেবারে—মাপা। বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি, স্টেজে একবারে সাবলীল অভিনয় করে চলেছেন। অথচ, 'একজিট্' নিয়ে উইঙ্গসের বাইরে এলে, আর চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, ওঁকে তখন ধরতে হতো গিয়ে।

আমি-নীহার-ইন্দু হচ্ছি গ্রীক, ও আমাদের বহু রিহার্স্যালে দেওয়া জিনিস। তবু, প্রাণ দিয়ে অভিনয় করার চেষ্টা করে চলেছি। চন্দ্রগুপ্ত সেজেছিল—দুর্গাদাস। নন্দ এবার করলে দানীবাবুরই ভাগ্নে—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। ছায়া—সুবাসিনী। হেলেন—নীহারবালা। মুরা—নিভাননী। কাত্যায়ন —নরেশবাবু। আরেকজন ননীবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে, তাঁর নাম ছিল—গাইয়ে ননীবাবু। তিনি সাজলেন—ভিক্ষুক। তিনকড়িদা এবারকার 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ কোনো পার্ট করলেন না। আমাদের এবারকার 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর প্রথম রজনীর তারিখ হলো—২৪শে জুলাই, ১৯২৪।

দশ

১৯২৪—১৯২৪

'চন্দ্রগুপ্ত' ত হয়ে গেল চব্বিশে জুলাই। বৃহস্পতিবারের অভিনয় হিসাবে ঐ যে 'কপালকুণ্ডলা' হচ্ছিল, তার শেষ অভিনয় রজনী হয়ে গিয়েছিল গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে—সতরোই। সেই অভিনয়-তালিকার মধ্যে যুক্ত ছিল 'বিবাহ-বিভ্রাট'-ও। এই 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ 'মিঃ সিং'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নরেশবাবু। রাধিকাবাবু স্টার ছেড়ে দিয়ে তাঁর নতুন 'মডার্ন থিয়েটার'-এর উদ্বোধন-ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা' সেদিনকার ঐ অভিনয়ে এমন আশাতিরিক্ত দর্শক-সমারোহ হলো

যে, কর্তৃপক্ষ শুক্রবার দিন, অর্থাৎ পঁচিশে জুলাই তারিখে "কেবল আর এক রাত্রির জন্য"—দিলেন—'কপালকুণ্ডলা' এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সোদন হলো অভূতপূর্ব জনসমাগম। ফলে 'কপালকুণ্ডলা' চলতে লাগল প্রতি শুক্রবারে।

অভিনয়ের সময় ও দিন-সম্পর্কে কিছু বলব বলে আগে লিখেছিলাম, পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে। সেটা এই অবকাশে সংক্ষেপে বলে রাখি। বহু পূর্বে, সেই যখন প্রথম পেশাদারী অভিনয়ের প্রবর্তনা হয়েছিল, তখন অভিনয় হতো শনিবার-শনিবার মাত্র, রাত্রি ন'টায় আরম্ভ হয়ে শেষ হতো বারোটা নাগাদ। এক কথায় তিন ঘণ্টা অভিনয়কালের নাটক ছিল সেগুলি। এবং শনিবার ছাড়া আর কোনদিন অভিনয় হতো না তখন। সপ্তাহের মধ্যে অভিনয়ের জন্য শনিবার দিনটি যে বেছে নেওয়া হয়েছিল, তার কারণ ছিল। অবশ্য, সেযুগে শনিবারটা ছিল বাবুদের যাকে বলে—"মেল-ডে।" কেরানীবাবুদের "মেল-ডে'র মতোই আর কী! কেরানীবাবুদের "মেল-ডে" ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন তাদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না, কেউ ফিরছেন অফিস থেকে আটটায়, কেউ ন'টায়। কারণ, বৃহস্পতিবার ছিল বিলেতের মেল যাবার দিন। হাওড়া থেকে মেল ছাড়বে রাত্রে, লেট-ফী দিয়ে হলেও বিলেতের চিঠি যাবে সেদিন। তা' বাবুদের মেল-ডে শনিবার—কেন? না, সকাল-সকাল সেদিন অফিসের ছুটি, পরের দিন রবিবার পুরো ছুটি। এই ছুটির অবকাশে 'মেল-ডে' করবেন বাবুরা। শনিবার চলে যাবেন বাগানে, রবিবার দিন সেখান থেকে হয় রাত্রে, নয়ত সোমবার সকালে ফিরবেন। জমিদার, বড়-বড় অ্যাটর্নী, উকিল, ব্যবসাদার,—এঁদেরই মধ্য থেকে দেখা দিতো সব 'বাবু'র দল! ওঁদের কাছে শনিবার ছিল একটা আমোদের দিন। ওদিন থিয়েটার দেওয়ায় অসুবিধা হতো কেরানীকুলের। আজকের দিনের মতো তখন ডেলি প্যাসেঞ্জারীর সুযোগ ছিল না সেদিন, তাঁরা বাড়ি যেতেন 'উইক্-এণ্ড-এ' বড়বাজারে বাজার সেরে—আমের সময় আম—কপির সময় কপি—ওইসব পুঁটুলী বেঁধে, কেউ-কেউ শেয়ালদা'র দিকে, কেউ-কেউ হাওড়ার দিকে ছুট দিতেন। শনিবার দিন জামাইয়ের দলও আবার 'ফ্রী' নেই। জামাইয়ের দল আসে, অপেক্ষাকৃত নতুন জামাই যারা, তারা আর কী! দিব্যি ফিট্‌ফাট্ হয়ে—'বাবু' সেজে—হাতে 'কোঁচা' ধ'রে শ্বশুরবাড়ি চলেছেন শনিবারে, রবিবারে থাকবেন, সোমবার সকালে ফিরবেন অফিস করতে। অতএব, দেখা যাচ্ছে, সাধারণত সেই সব বাবুরাই তখনকার দিনে আসতেন থিয়েটারে যাঁদের বাগান নেই অথবা বাগান-বাড়িতে পার্টি দেবার তেমন সামর্থ্য নেই, এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল আমোদ-প্রমোদও নির্বাহ করতে পারতেন না। অবশ্য মাঝে মাঝে দু'চারজন বড়োলোকও যে থিয়েটারে না আসতেন এমন নয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত কেরানীকুল একেবারে বঞ্চিত হতেন বলা যেতে পারে। ওঁরা সপ্তাহ-শেষে দেশে না গিয়ে নিশ্চয়ই বসে থাকবেন না থিয়েটার দেখবার জন্য? তাই, ক্রমশ ওঁদের জন্য বুধবার রাত্রি ন'টায় অভিনয়ের দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু, এর কিছুদিন পরে, যখন গোপীচাঁদ শেঠী (কেঁইয়া) ন্যাশনাল থিয়েটারে সাব-লীজ গ্রহণ করেছিলেন,'তা' সে হবে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিককার কথা, তখন তাঁর

ম্যানেজার এবং অধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশচন্দ্র কর বলে এক ভদ্রলোক। এই অবিনাশবাবুর আমলে শনি-বুধ ত অভিনয় হতোই, তদুপরি হঠাৎ এক দিন রবিবার—রবিবারও 'শো' আরম্ভ হয়ে গেল। এই 'হঠাৎ' হওয়ার পিছনে ছিল মাত্র একটা খেয়াল। তখন ওঁর হ্যাশনালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-রচিত "কামিনীকুঞ্জ" গীতিনাট্যটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, খেয়ালের বশে বা শখ করে অবিনাশবাবু একদিন রবিবারে দুপুরবেলা—ছুটোর সময়—'কামিনীকুঞ্জ' অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন, দেখা গেল, খুব টিকেট বিক্রি হলো। সেই থেকে চালু হলো রবিবারে অভিনয়। কিন্তু সেটা দুপুরে বা ম্যাটিনী আর রইল না, দাঁড়ালো গিয়ে রবিবার সান্ধ্য অভিনয়ে। আমাদেরও অল্প বয়সে—থিয়েটারের বিজ্ঞাপন হাতে এলে লক্ষ্য করে দেখেছি, লেখা থাকত,—"সাণ্ডে অ্যাট্ ক্যাণ্ডল্ লাইট!"

এই 'ক্যাণ্ডল-লাইট' শীতকালে হতো ছটায়, গ্রীষ্মকালে বদলে গিয়ে হতো—সাতটায়।

তারপরে, নাটকের দৈর্ঘ্য যখন একটু-একটু করে বড়ো হ'তে আরম্ভ করল, তখন ত 'উইক্‌ডেজ'-এর অভিনয় নেমে এলো নটা থেকে আট-টায়। বিশেষ করে যখন থেকে আবার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আইন জারী করলেন, রাত একটার পর অভিনয় করলে জরিমানা হবে।

এরপরে, আমাদের সময় ত ম্যাটিনী ইত্যাদি রীতিমত চালু হয়ে গেছে। রাত্রিবেলা আট-টা বা ন'টায় অভিনয় করবার অনেক কারণ ছিল। প্রথম, দর্শকদের খাওয়া-দাওয়া ক'রে বেরিয়ে থিয়েটারে আসতে আসতে যে সময়টা লাগবে, তাতে করে অভিনয়ের সময় নটা, নিদেন পক্ষে আটটার কম করলে চলে না। এবং বাবুরা, যাঁরা কিনা থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের থিয়েটারে আসা ত ছিল উৎসব-বিশেষ! তখন আলো জ্বলেনি অথচ থিয়েটার দেখতে যাওয়া, কিম্বা সন্ধ্যের সময় থিয়েটার দেখা, এসব ত রেওয়াজই ছিল না। দিব্যি রাত হবে—থিয়েটার বাড়ি আলোয়-আলোয় ঝলমল করবে—একেবারে ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠবে—উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হবে, তবেই না উৎসাহ হবে থিয়েটারে আসবার! থিয়েটারে আসা হবে, এ-খবরটা যেই বাড়ির মধ্যে ঘোষণা হয়ে গেল, অমনি পড়ে গেল সাজসজ্জার ধুম, যেন উৎসব। এই মনোবৃত্তিটা ছিল কিন্তু সেই আদিকাল থেকেই। অভিনয়টা ছিল উৎসব-বিশেষ। উৎসবের প্রাণ নিয়েই দর্শকেরা আসতেন থিয়েটারে। এবং আদিযুগে কেন, মিশরযুগে, গ্রীকযুগে, এমন কি ঊনবিংশ শতকে—ইয়োরোপে, আমেরিকায় এবং আমাদের দেশেও, ঐ উৎসবের মন নিয়ে সবাই আসতো অভিনয় দেখতে। সেইজন্যই প্রয়োজন হতো, এত আলোকমালার, এতো সাজবেশের! অবশ্য তখন ও হয়ে দাঁড়িয়েছে সব বাবুলোকের কাণ্ড, তাই তাদের হৈ-হল্লোড় করবার সুবিধার জন্যও রাত্রের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকবে। অবশ্য একেবারেই অস্বীকার করতে পারি না, আমাদের সময়েও কিছু-কিছু দেখছি এই 'বাবু' সম্প্রদায়ের রকম-সকম। 'বাবু' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তার থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই ব্যাপারটা বোধগম্য হবে। তিনি লিখেছেন—"যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ 'হ্যাশনাল থিয়েটার'—তিনিই বাবু।"

বঙ্কিম মাত্র ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু তারপরে যতো থিয়েটার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার প্রায় সবগুলিই 'বাবু-অধ্যুষিত' বলা যায়।

ইতিহাস ছেড়ে এবারে ফিরে আসি আমাদের কথায়। আমাদের সময় ত দেখতে-দেখতে সপ্তাহে পাঁচদিন থিয়েটার হয়ে দাঁড়ালো দেখা যাচ্ছে। আরম্ভ করেছিলাম শনিবারে—কর্ণার্জুন দিয়ে, এখন হয়ে দাঁড়ালো সোম-মঙ্গল বাদ দিয়ে বাকী পাঁচদিনই থিয়েটার। অভিনয়ে—'চন্দ্রগুপ্ত'তে দানীবাবু এসে 'চাণক্য' করছেন শুনে, শহরময় যেন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। চারিদিকেই আলোচনা, কেমন করবেন দানীবাবু 'চাণক্য' এই বৃদ্ধ বয়সে, নতুন দলের সঙ্গে? কেমন মেলে তাঁর অভিনয়? কেমন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন তিনি?

অভিনয়-সম্পর্কে সমালোচনাও যা বেরুতে লাগল, তা' দেখা গেল মূলত দানীবাবুকে কেন্দ্রকরেই। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধবাদী- তাঁরা ত কলম ধরতে ছাড়লেন না। বিশেষ করে 'নাচঘর'তাকে রীতিমত আক্রমণই করেছিলেন বলা চলে। অবশ্য 'নাচঘর'-এর মন্তব্যের বিরুদ্ধেও আবার লেখালেখিও হতে লাগল প্রচুর।

এ' গেছে একদিক, অন্যদিকে তাঁর সুখ্যাতিও হতে লাগল খুব। দোসরা আগস্ট 'শিশির' লিখলেন—"আমরা দানীবাবুর চাণক্য অভিনয় মিনার্ভায়, পরে মনোমোহনে বহুবার দেখিয়াছি। মিনার্ভায় অভিনয় প্রাণবন্ত ছিল, কিন্তু ইদানীং মনোমোহনে তাঁহার অভিনয় নিষ্প্রাণ বলিয়া মনে হইত। কারণও যথেষ্ট ছিল। অভিনয় কখনও সহ-অভিনেতার সাহায্য ভিন্ন ফুটিতে পারে না। মনোমোহনে দানীবাবুর অভিনয় এই সহ-অভিনেতার যোগ্যতার অভাবেই প্রতিপদে প্রত্যাহত হইত। এখানে স্টারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নূতন দলের অভিনেতারা সকলেই যোগ্য, তাঁহারা অভিনয় সজীব করিবার প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেখিলাম, নূতন দলের সহিত খাপ খাওয়া—ইহার জন্য দানীবাবু অভিনয়ে অনেক নূতনত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন।…সেই চেষ্টা সর্বথা এবং সর্বতোভাবে সফলতা লাভ করিয়াছিল সেলুকসের অভিনয়ে। এমন সুন্দর সজ্জাসৌষ্ঠব, এমন মনোজ্ঞ অভিব্যক্তি অধুনা খুব কমই দেখিয়াছি। অহীন্দ্রবাবুর সেলুকসের তুলনা নাই।"

শুধু 'শিশির' কেন বহু কাগজই তখন প্রশংসা করেছিলেন। পত্রযোগেও বহু ব্যক্তি বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন। নাচঘরের সমালোচনায় 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর সমালোচনা হয়নি, হয়েছিল মূলত দানীবাবুর সমালোচনা। 'বৈকালী'তে তারই প্রত্যুত্তরে শৈলেন্দ্রনাথ বিশী বলে একজন লিখলেন ৬ই আগস্ট :—'দানীবাবু কোথাও অস্বাভাবিক বা বিকৃত মুখভঙ্গী করেন নাই। অভিনয়ের সময় প্রত্যেক ভাব তিনি মুখ চোখ ও সর্বাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করেছেন।"

বিশী তারপরে লিখেছিলেন—'চাণক্যের' পরেই সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের কথা মনে হয়। তিনি চেহারায় পুরা গ্রীক সাজিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রত্যেকটি অভিনয়ই তাঁহার পদমর্যাদা, অপরিসীম বাৎসল্য, বীরত্ব ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাংলার রঙ্গমঞ্চে সত্য-সত্যই একজন ক্ষমতাশালী অভিনেতা হইয়া উঠিয়াছেন।"

ঐ সময় থেকে লক্ষ্য করেছিলাম, লোকে আর আমাকে উদীয়মান ইত্যাদি না বলে পাংক্তেয় করে নিচ্ছেন।

'বৈকালী'তে এক ভদ্রলোক—প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ লিখছেন—

"গত ১৬ই শ্রাবণ প্রকাশিত ১১শ সংখ্যা 'নাচঘর'-এ দানীবাবুর চাণক্যের ভূমিকা অভিনয়ের যে সমালোচনা বেরিয়েছে তা' পড়ে সমজদার লোকমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। 'নাচঘর'-এর সম্পাদকদ্বয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যিক এবং উচ্চশিক্ষিত সমাজেই মেলামেশা করেন। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে উচ্চ অঙ্গের সমালোচনাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু সে বিষয়ে সকলেই হতাশ হয়েছেন।...দানীবাবুর চাণক্যের ভূমিকার অভিনয় একেবারে অপূর্ব। হয়ত তিনি স্থান বিশেষে 'তোমাকে'র উপর ঝোঁক না দিয়ে "হত্যা করব"র উপর ঝোঁক দিয়েছেন কিংবা মোটেই ঝোঁক দেননি, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? উপযুক্ত 'ঝোঁক' দিয়ে পার্ট বলাটাই অভিনয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। চাণক্যের সে সজীব মূর্তি, সেই নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণের যে সুস্পষ্ট ছবি দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, তা যে একবার দেখেছে সে আর জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না। এ রকম অপূর্ব অভিনয় বাংলাদেশে এক দানীবাবুর দ্বারাই সম্ভব।...তবে একটা দেখে বড়ো সুখী হয়েছি,"নাচঘর" অহীন্দ্রবাবুর সেলুকাসের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।...এমন সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে খুব কমই দেখা যায়। অহীন্দ্রবাবু অর্জুনের ভূমিকায় যখন প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, তখনই সকলে বুঝেছিলেন যে ইনি একজন অসাধারণ অভিনেতা। তাঁর সেলুকাসের ভূমিকার অভিনয় দেখে সে বিষয়ে সমজদার দর্শকের মনে আর কোন সন্দেহ নেই। সেলুকাসের চরিত্রকে এমনভাবে সজীব সরস করে তুলতে আর কোনো অভিনেতা পারতেন কিনা সন্দেহ। অহীন্দ্রবাবুর সেলুকাসের ভূমিকা দেখতে আমাদের মনে হ'চ্ছিল প্রথম শ্রেণীর অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে শুধু দানীবাবু—শিশিরবাবুরই একচেটে নয়। অহীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে বিশেষ বলবার কথা এই যে,—বাংলাদেশের অভিনয়ের মধ্যে তিনি একটি নতুন সুর এনেছেন। তিনি পুরানো ধাঁচের অভিনেতা নন, শিশিরবাবুর ধরনও তার ভিতরে নেই; তাঁর ধরনটি সম্পূর্ণ অভিনব।" এসব ত গেল পত্র ও পত্রিকার অভিমত। দানীবাবুর 'চাণক্য' সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু পর্যালোচনা করবার আছে।

দানীবাবু-অভিনীত "চন্দ্রগুপ্ত"কে কেন্দ্র ক'রে বাইরে এই যে এ-পক্ষে ও-পক্ষে তুমুল আলোচনা তা' শুধু নাট্যকলার উৎকর্ষসাধনের জন্য নয়। বেশ বুঝতে পারা গেল, এর মধ্যে তিনটি দল হয়ে গেছে। একদল দাঁড়িয়েছেন দানীবাবুর পক্ষে, আরেক দল রীতিমত বিরক্ত ও উত্যক্ত বোধ করেছেন এই লক্ষ্য করে যে, অহেতুক এরকম ঈর্ষাপ্রণোদিত আক্রমণ কেন? আরেক দল, দল-হিসাবে অবশ্য বিশেষ পুষ্ট তাকে বলা চলে না, 'নাচঘর' পত্রিকা ও আর দুএকজন মাত্র,—এঁরা দানীবাবুকে 'স্থবির', 'আর পারেন না তেমন কিছু করতে' বলে আখ্যা-ব্যাখ্যা ইত্যাদি ক'রে চলেছেন। পক্ষে যাঁরা, তাঁরা বলতেন, প্রতিযোগিতার তেমন অভাব ছিল বলেই হালে কিছুকাল তাঁর অভিনয়ে দীপ্তি তেমন দেখা যাচ্ছিল না,

কিন্তু আর্ট-থিয়েটার-পরিচালিত 'স্টারে' এসে পার্শ্ব অভিনেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে আবার তিনি সজীব হয়ে উঠেছেন, জাড্য জয় করেছেন ইত্যাদি।

দানীবাবুর অভিনয় আমি আগেও দেখেছি। এবং মুগ্ধ বিস্ময়েই দেখেছি। আজ অতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেলাম। যে উইঙ্গস থেকে বেরুতেন, তাঁর পিছনে পিছনে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতাম দেখার জন্য। এক-দুই রাত্রি নয়, কয়েক রাত্রিই গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বয়স হয়ে যাবার দরুন—ওঁর যৌবনের অভিনয়ের সঙ্গে আজকের অভিনয়ে কিছু পার্থক্য অবশ্যই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কিন্তু সে পার্থক্যও খুব প্রকট হয়ে উঠছে না এই কারণে যে, যখন উনি ২৪ সালে আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করতে এলেন, তখন ওঁর বয়স,—ছাপান্ন বছর। একজন অভিনেতা ষাটের কম বৃদ্ধ হন না। অতএব এ পার্থক্যটুকু ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ওঁর কণ্ঠ তেমনি রয়েছে মেঘমেদুর। বলা যায়, মেঘ গর্জনের মতো। যেখানে-যেখানে কণ্ঠ উচ্চে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হতো, সেখানে অনায়াসে আজও নিয়ে যাচ্ছেন কণ্ঠস্বর। যেমন বিখ্যাত অভিসম্পাতের দৃশ্যে যখন বলছেন,—ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা হও! তখন এমন বাজ-ডাকার মতো স্বর-প্রক্ষেপণ করতেন যে, আমরা পর্যন্ত কেঁপে উঠতাম।

বাচালকে যে-দৃশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন,—নন্দের পরিবারবর্গ কোথায়?

বাচাল তখন সত্য গোপন করে বললে—মলয় পর্বতে।

উনি বলে উঠলেন—মিথ্যা কথা!

এই 'মিথ্যা কথা',—এমনভাবে বলে উঠতেন যে, তাতে আর বাচালকে ভয় পেয়ে যাবার 'অভিনয়' করতে হতো না, আপনিই ভীতকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে ফেলত সে,—মিথ্যা কথা।

কোমল-কঠোরে মিশ্রিত, তাঁর কণ্ঠস্বর যেন শরতের মেঘের মতো নিকটে-দূরে গর্জন ক'রে বেড়াতো। কণ্ঠস্বর কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো নিকটে আসছে, কণ্ঠস্বরের সে এক অদ্ভুত লীলা বলা যেতে পারে।

ভালো কণ্ঠধারী ছিলেন শুনেছি অমৃতলাল মিত্র। মহেন্দ্রলাল বসু এঁরা। তাঁদের কণ্ঠ নিজে শুনিনি, তুলনা করতে পারব না, কিন্তু দানীবাবুর কণ্ঠস্বরের লীলা বৈচিত্র্যই শুধু লক্ষ্য করবার নয়, তাঁর স্বাভাবিক স্বর-প্রক্ষেপণের মধ্যে অসাধারণ গাম্ভীর্য এবং অসাধারণ মাধুর্য, দুইয়ের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। যাকে বলে গম্ভীরে মধুর। তাই বোধ হয় সে কণ্ঠ এমন মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখত। যখনকার কথা বলছি, কণ্ঠস্বরের সেই গুণ তখনো বিদ্যমান রয়েছে। ছিল শুধু উচ্চারণের ঈষৎ ত্রুটি। ছেলেবেলা থেকেই ভয়ানক আদুরে ছিলেন—মা মরা ছেলে—পিসীদের আদরের মধ্যে থেকে—একটু আদুরে কথা বলার ধরন গ'ড়ে উঠেছিল শৈশবে। বাল্যেও সেটা ছিল, যৌবনে উঠেছিল প্রকট হয়ে। তারপর ক্রমে ক্রমে সাধনার দ্বারা সে দোষটা দূর করবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, একেবারে নির্দোষ হয়নি।

অভিনেতারূপে দানীবাবুর আরেকটি সম্পদ ছিল, সেটি হচ্ছে তাঁর গতিভঙ্গি। যদিও ইদানীং তাঁর চোখে একটু দোষ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা, স্টেজের প্রখর আলোতেও তাঁর

চলাফেরায় কোনো ত্রুটি হতো না। দৃপ্ত ছিল তাঁর গতিভঙ্গি, সজীব ছিল চলাফেরার ভঙ্গিমা,—কোথাও কোনো জড়তা নেই, সাবলীল, সচ্ছন্দ।

অবাক হতাম বিশেষ করে তার একটি দৃশ্যের অভিনয় দেখে। 'চাণক্য'-বেশী দানীবাবু নন্দকে অভিসম্পাত দিয়ে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করছেন। "সেইদিন দেখবে, আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যায় শক্তি" থেকে শুরু ক'রে আরও পাঁচ ক্রম স্বর তুলে শেষ কথাটি বলে যাচ্ছেন—"ব্রাহ্মণের দুর্জয় প্রতাপ" ইত্যাদি। এখানে যখন তিনি প্রস্থান করছেন, তখন দেখবার জিনিস এই ছিল যে, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করতেন না। পৈতেটা হাতে করে যখন অভিশাপ দিচ্ছেন, সারা শরীরটা তখন তাঁর থরথর করে কাঁপত! এবং এই কাঁপতে কাঁপতেই সারা দেহটা পিছু হটতে থাকত। পিছু হটতে হটতে কেমন করে যে হঠাৎ উইঙ্গস-এর ভিতরে ঢুকে পড়তেন, ঠিক ধরতে পারতাম না। এই দৃশ্যে, সে যুগে, যখন প্রথম ওঁর 'চাণক্য' দেখেছিলাম,প্রচুর হাততালি পড়ত এবং তখন ওটা ধরব কী, আবেগে ভাসিয়ে দিতেন একেবারে! এইবার উইঙ্গসের পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখলাম, এবং অভিনয়ের ক্ষমতার স্বরূপটা যে কী, তা' বুঝবার অবকাশ পেলাম, এবং পেয়ে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আজও সেইভাবে কাঁপতে কাঁপতে পিছু হটে বেরিয়ে এলেন। সত্যিই কাঁপছে সারা শরীর। ধীরে ধীরে পা টানছেন, কাঁপুনিটা,সমানে বজায় রেখে অবশ্য। এবং ঐ পা-টানাটা চোখে দেখা যায় না,এমনি সাবলীল। অনেক সময় টেবিল অ্যালার্ম ঘড়িটা অ্যালার্ম বাজবার সময় আপনিই কেমন কাঁপতে কাঁপতে ঈষৎ সরে যায় ভাইব্রেশনের দরুন,সে যেন ঠিক তাই ছিল,ভাইব্রেশনের দরুন দেহটা যেনআপনিই সরে সরে যাচ্ছে!

অভিনয়-কৌশলের এ'এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কী ক'রে হয়? নিজেও অভ্যাস করতে শুরু করেছিলাম গোপনে। করতে গিয়ে দেখি একটা পা টানতে আরেকটা যায় না, কিংবা কাঁপুনিটাই মাঝপথে থেমে যায়। তাঁর এই কৌশলটা যখন পর্যবেক্ষণ করি, তখন ১৯২৪ সাল। আর দেখেছিলাম এই সেদিন, ১৯১৯ সালে, একজন ফরাসী "Mime" (যারা নির্বাক অভিনয় করেন) এসেছিলেন এদেশে। তিনি একসঙ্গে তিনজন লোকের ভুমিকা অভিনয় করেন। যেমন আরেকজনকে দেখেছিলাম এ'বছরেই—অর্থাৎ ১৯৬০ সালে—তাঁর নাম বললে অনেকে বুঝতে পারবেন—অনেকে দেখেছেনও তাঁর অভিনয়-চাতুর্য—মার্সেল মার্শো—নিউ এম্পায়ারে শো দিয়েছিলেন। ইনি প্রখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু প্রথমজন যাঁর কথা বললাম, তিনি ততটা খ্যাতনামা নন। আমাদের অনুরোধে আমাদের সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমীর স্টেজে একদিন দেখিয়েছিলেন তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার নিদর্শন। অনেক কিছু দেখালেন, তার মধ্যে একটা জিনিস বড়ো ভালো লেগেছিল, সে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়নো। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে দৌড়নোর ভঙ্গী করছেন, অথচ এগুচ্ছেন না। একটা পা পিছন দিকে টেনে গতিরোধ করছেন। এক কথায় অগ্রগতির তালটাকে রোধ করছেন।

ওঁর এই কৌশলটা দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে গেল দানীবাবুর সেই পা-টানার কথা। ছাত্রদের বললাম—ভালো করে দেখে নাও।

ওঁর ফিল্ম রেখে গেলেন, সে ফিল্মও দেখলাম আমরা।

তারপর, এ'বছরের জুলাই মাসে, এলেন জগদ্বিখ্যাত "Mime"—ইনিও ফরাসী—মার্সেল মার্শো। ইনি ফ্রান্স থেকে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে দিল্লী ও কলকাতায় দুদিন শো করে গেলেন। এখানে সব ব্যবস্থা করেছিলেন 'অ্যালায়াস ফ্রাঁসে।' আমাকেও ডেকেছিলেন তাঁরা, আমাদের অ্যাকাডেমীর ছাত্ররাও গিয়েছিল। খুব নামকরা লোক, কাগজে-কাগজে ওঁর কথা পড়েছি। ওঁকে অ্যাকাডেমীতে আনবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু বিনা পয়সায় আসবেন কী? ছাত্ররাই গেল। এবং আশ্চর্য, উনি রাজী হয়ে গেলেন। অ্যাকাডেমীর স্টেজেই শো হবে। দিন স্থির হলো ১৬ই জুলাই —অপরাহ্নে। কিন্তু আসাম দিবসের জন্য ওদিন হরতাল হয়ে যাওয়ায় বারণ করেছিলাম যে, না হবে না। ভদ্রলোক যেন বিপদে পড়লেন। কখন হবে? সকালে?

—না। ওদিন কোনো সময়েই নয়।

অথচ তিনিও আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর যাবার সময় স্থির ছিল যে! পরদিন সকালেই প্লেনে চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়া, এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে এ' পথে আর ফিরছেন না, প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে আমেরিকা চলে যাবেন। কিন্তু রওনা হবার আগে, ওঁর অভিনয়ের দু'রীল ষোলো মিলিমিটার ফিল্ম রেখে গেলেন, তার মধ্যে একটি রীল ছিল রঙ-করা ছবি-সম্বলিত। আগস্টের বারো তারিখে আমাদের প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে আমরা তা' দেখলাম। ওঁরও ঐ রকম কৌশল আছে। এবং আরও নানারকম আছে।

আজ পুরানো কথা বলতে গিয়ে এই কথাই ভাবছি, দানীবাবু সে যুগে ওটা কী করে অভ্যাস করেছিলেন!

যাই হোক, অভিনয়ে আগের থেকে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হলেও তুলনায় একটুও ম্লান হয়নি দানীবাবুর অভিনয়। স্টারের আমলের আগের কথা বলছি। অভিনয়টি তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিমুখ হয়ে তাঁকে ততটা 'অ্যাকটিভ' করতে পারেনি, উদ্দীপনা ততটা ছিল না, আর কিছুটা হয়ত আয়েসী হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা তাঁর ত অভাব কিছু ছিল না। কাজেই কোনো জিনিসের জন্য কোনো চেষ্টা তিনি করতেন না। 'এণ্টারপ্রাইজ' যাকে বলে, তা' তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত, একটু অহিফেন সেবন করতেন। এখনো বহুলোক করেন, কিন্তু তখনকার দিনে একটু বয়স হলেই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের মধ্যে অনেকেরই ওটা অভ্যাসে পরিণত হতো। বাঙালীর সব থেকে বহুল-অর্জিত ব্যাধি হচ্ছে পেটের গোলমাল। সেই পেটের গোলমালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাঙালীকে সকাল-সন্ধ্যা তরিবৎ করতে হয়। কখনো মিছরির সরবৎ, কখনো মাছের ঝোলের সঙ্গে নেবুর রস, আর ডাব। বাঙলা দেশে যত ডাব হয়, তার অধিকাংশই কাঁচা খেয়ে ফেলা হয়, ঝুনো নারকেল আমদানি করতে হয় অন্য প্রদেশ থেকে।

যাই হোক, যা বলছিলাম। অহিফেন সেবন করলে একটু ঝিমুতে হয়। ঘন দুধ চাই তখন,

মিষ্টি চাই। তারপরে তাকিয়া আর গড়গড়া হয়ে পড়ে নিত্যসঙ্গী। এসবের জন্য দানীবাবু আয়েসী বা আরামী হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু স্টারে এসে এক কথায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সে সব। ফলে এখানে এসে অভিনয় করবার পর তাঁর পূর্ব অভিনীত চরিত্রগুলি আবার তাঁর সেই আগেকার যুগের অভিনয়ের মতো সজীব হয়ে উঠেছিল। এই সময়ও খুব হাততালি পড়তে দেখছি স্টারে। কিন্তু 'নাচঘর' ছিল এই হাততালির বিরুদ্ধে। তখন নাচঘর দু'তিন মাস হলো সবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁরা হাততালির বিরুদ্ধে অনেক কথাই লিখলেন। এবং বিশেষ করে এক জায়গায় লিখলেন—'হাততালি-ভক্তদের আমরা নিম্নশ্রেণীর লোক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারব না।'

ফল হলো মারাত্মক। বহু কাগজে এর প্রতিবাদের ঝড় উঠল। 'জাগরণ' প্রভৃতি পত্রিকা এর বহু প্রতিবাদ করলেন। ৩১শে জুলাই 'জাগরণ' 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক নিবন্ধে লিখলেন—"সহযোগী নাচঘর হাততালি বর্জন প্রসঙ্গে কয়েকটি এমন রূঢ় কথার অবতারণা করিয়াছেন যাহার ভাবা চমকপ্রদ হইলেও অত্যন্ত তিক্ত এবং ভদ্রতালেশ পরিশূন্য।"

নাচঘরের কেন এ' উদ্যম বলতে পারি না। অবশ্য অভিনয় চলবার সময় হাততালি পড়লে অভিনেতাদের অনেক সময় ক্ষতি হয়, ভাব কেটে যায়। কিন্তু দৃশ্য-সমাপ্তিতে হাততালি পড়লে ক্ষতি কী? দেশাচার, ওর বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। অনেকে বলেন—ভাদুড়ী মশাই হাততালির পক্ষপাতী নন। এমনও শুনেছি যে, লোকে বলেছে, অভিনয়কালীন হাততালি পড়লে তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি নাকি বলতেন—"আমার থিয়েটারে হাততালি নিষিদ্ধ। ওতে অভিনয়ের ব্যাঘাত হয়।"

কিন্তু আমি যতদিন তাঁর থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছি, ততদিন তাঁকে একথা বলতে শুনিনি। দর্শক হাততালি দিয়েছে, দর্শকদের তিনি কিছু বলেনওনি। অভিনয়-কালীন হাততালি আমরাও যে পছন্দ করি, এমন নয়, কিন্তু সে নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও ত কোনো ফল নেই! তবে কথা এই যে, তিনি সম্ভবত তখন হাততালি দেবার রেওয়াজটা ভুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তার কিছুদিন পরেই খুলছে তাঁর থিয়েটার।

শিশিরবাবুর "সীতা" অভিনয়ের কথা এবার বলতে পারি। 'সীতা' বলেই প্রথম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, নাট্যকারের নাম প্রথম-প্রথম প্ল্যাকার্ডে থাকতো না। 'সীতা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার অ্যালফ্রেডে 'মডার্ন থিয়েটার'-এর পোস্টার পড়ল। কিন্তু মডার্ন থিয়েটারের বিপদ হলো এই যে, ৩১শে জুলাই বই খুলবে, কিন্তু হঠাৎ ওঁদের অর্থ-প্রদায়ী পৃষ্ঠপোষক কীর্তিচন্দ্র দাঁ মারা গেলেন। সুতরাং রাধিকাবাবু স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন বলতে হবে। কিন্তু তাতেও ওঁরা নিরুদ্যম হননি। ওঁরা অভিনয় করবেন নবীন সেনের 'রৈবতক'-এর নাট্যরূপ। তারিখ বদলে হলো ২১শে আগস্ট। কিন্তু বই খোলবার আগেই শোনা গেল, মতান্তরের দরুণ রাধিকাবাবু ছেড়ে দিয়েছেন মডার্ন থিয়েটার। সঙ্গে চিত্রশিল্পী যামিনী রায় এবং আরও যে দু' একজনকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন রাধিকাবাবু তাদের নিয়ে আবার চলে এসেছেন। যামিনীবাবু অবশ্য গিয়েছিলেন দৃশ্যপট পরিকল্পনার

জন্য। তখন মডার্ন থিয়েটার চালাবার ভার নিলেন 'আনন্দ পরিষদ'-এর সভ্যারা। ওদিকে শিশিরবাবুর 'সীতা' খুলে গেল ৬ই আগস্ট, বুধবার, ১৯২৪ সালে—পুরাতন মনোমোহন মঞ্চে 'নাট্যমন্দির' নাম নিয়ে। ভূমিকালিপি হলো—রাম—শিশিরবাবু। লক্ষ্মণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। ভরত—তারা-কুমার ভাদুড়ী। শত্রুঘ্ন—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। বশিষ্ঠ—ললিতমোহন লাহিড়ী। বাল্মীকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শম্বুক—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। লব—জীবনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। কুশ—ননীগোপাল সান্ন্যাল। ননীবাবু ছিলেন বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার। প্রথমে ছিলেন ম্যাডানে, তারপরে—তাজমহলে, তারপরে—ইণ্ডিয়া কিনেমা আর্টস—অরোরাতে কালী ফিল্মসে—দীর্ঘবয়স পর্যন্ত ফটোগ্রাফারের কাজ করেছিলেন। ইনি শিশিরবাবুর থিয়েটারে আসেন আলোকসম্পাতের জন্য—তাও চাকরী নয়, শখ করে। শখ ছিল তখন অভিনয়েরও। তাই নিলেন কুশের পার্ট। কিন্তু তখন সুবিধা করতে পারলেন না, একরাত্রি করেই ছেড়ে দিলেন। দ্বিতীয় রাত্রি থেকে 'কুশ' করতে লাগলেন—রবীন্দ্রমোহন রায়। দুর্মুখ—অমিতাভ বসু। বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে। ব্রাহ্মণ—নৃপেশনাথ রায়। কৌশল্যা—পান্নারানী। সীতা—প্রভা। উর্মিলা—উষারানী। তুঙ্গভদ্রা—নীরদাসুন্দরী। আত্রেয়ী—নিরুপমা

সেদিনটা ছিল বুধবার, আমাদের এখানে 'ইরাণের রানী'র অভিনয়, সেইজন্য 'সীতা' কেমন হচ্ছে, তা দেখতে যেতে পারছি না, কিন্তু মনটা ঔৎসুক্যে ভ'রে রয়েছে! হরিদাসবাবু নিমন্ত্রিত হয়ে দেখতে গেছেন অবশ্য কিন্তু তিনি ত আজ রাত্রে আর ফিরে আসছেন না যে, টাটকা-টাটকা খবরটা শুনব! ওঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে কাল। কিন্তু দেখা হলেই বা কী, বিশেষ কিছু পরিষ্কারভাবে জানা যাবে না। পরের সমালোচনা নিয়ে উনি থাকেন না। 'ভালো হয়েছে' তাছাড়া আর কিছুই শোনা যাবে না। এটাই ওঁর স্বভাব, পুরানো মনোমোহনের সমালোচনাও কখনো শুনিনি ওঁর মুখে; ওঁর নিজের জিনিস বলে আমাদের ছিলেন অবশ্য কঠোর সমালোচক। তাও দেখেছি, কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দিতেন না। বলতেন এই দোষ হয়েছে; ব্যস। সে দোষ কী করে শুধরে নেওয়া যাবে বা কী করা উচিত, তা উনি বলতেন না কখনো। সেইজন্য খবরের আশায় ওঁর দিকে ততটা না তাকিয়ে অপর এক ভদ্র-লোকের আশা করছিলাম আমরা। ভদ্রলোকটি সেই ইভনিং ক্লাবের যুগ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের পরম ভক্ত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্নেহপাত্রও ছিলেন তিনি, সকল সভাই জানতেন ওঁকে বিশেষভাবে। আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির, উভয় থিয়েটারের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল, দুটি থিয়েটারেই যাতায়াত করতেন; মহলাতেও যেতেন। সেইজন্য ওঁর মারফত আমরা নাট্যমন্দিরের রিহার্স্যালের খবরও জানতাম। হরিদাসবাবুর ছিলেন উনি বিশেষ জানাশোনা ব্যক্তি। আমরা ওঁর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতাম মাঝে মাঝে। দেখে একদিন হরিদাসবাবু, বললেন—এঁর সঙ্গে আলাপ করছেন?

বললাম—হ্যাঁ। উনি থিয়েটার জগতের নানান খবর রাখেন দেখেছি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হরিদাসবাবু বললেন—তাত রাখবেনই। ওঁর নাম কী জানেন? গুজব-সম্রাট।

আমরা একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কী রকম?

হরিদাসবাবু বললেন—গুজবের ছোটখাটো ব্যাপারী বা খুচরো কারবারী ইনি নন। মহাজনও নন, এমন কি আমীর ওমরাহও নন উনি, একেবারে সম্রাট। যাঁদের কথা বসে-বসে শুনছেন, তাঁরা আবার শুনবেন আপনাদের কথা কাল সকালেই।

আমরা ভদ্রলোকটাকে ধ'রে বসলাম, বললাম—কী মশাই?

উনি ততক্ষণে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন, বললেন—হরিদাসবাবুর কথা শোনেন কেন, উনি আমাকে স্নেহ করেন, তাই এমন বলে থাকেন।

বলে, চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।

হরিদাসবাবু বললেন—গণদেবকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে বলবে'খন। তখনো উনি সম্রাট হননি, যুবরাজ ছিলেন, আমরা তখন ওঁর নাম রেখেছিলাম—কাবলেশ খাঁ।

'কাবলেশ খাঁ' কথাটা আজকের পাঠক বুঝেছেন ত? দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটকের একটি চরিত্র। শম্ভাজীর অনুগ্রহ-ভাজক জনৈক অনুচর। এদিকে খুবই সেবা করছেন শম্ভাজীকে, ওদিকে গোপনে ঔরংজীবের কাছ থেকে টাকা খেয়ে, নারীর প্রলোভন দেখিয়ে মত্ত অবস্থায় শম্ভাজীকে দুর্গ থেকে বাইরে টেনে নিয়ে আসেন, যার বলে শম্ভাজী ধরা পড়ে যান মোগল-সৈন্যর হাতে।

হরিদাসবাবু উক্ত ভদ্রলোকের নাম করে বললেন—দ্বিজেন্দ্রলালের খুবই স্নেহভাজন ছিলেন উনি, কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও ছাড়েননি, এমন কি ক্ষতিই করেছিলেন তাঁর। সেইজন্য আমরা ঐ নাম দিয়েছিলাম ওঁর। তবে হ্যাঁ, সময় বেশ কাটে ওঁকে নিয়ে। তাই আমরা ওঁকে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছি, আপনারাও হিসেব করে প্রশ্রয় দেবেন। এহেন কাবলেশ বা গুজব সম্রাট আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ইরাণের রানী ত তেমন বড়ো নয়, সীতার আগেই ভাঙবে। ভাঙলেই আমরা যেন চলে না যাই, ওঁর জন্য একটু অপেক্ষা করি। উনি এসে সব খবরাখবর দিয়ে যাবেন।

আমি আর ইন্দু প্রবোধবাবুর ওখানে তাই কিছুক্ষণ বসে রইলাম। আজ আর ভদ্রলোকের নামটি উচ্চারণ করব না, যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝে নিন, আর যাঁরা জানেন না তাঁরা ধরে রাখুন নামটা—গুজবসম্রাট।

এলেন কিছুক্ষণ পরে। বললেন সব কথা। বললেন—খুব লোক হয়েছে। লোকের উৎসাহও দেখলাম খুব। কিন্তু অভিনয় তেমন হয়নি। মানে, নাটকটা তেমন জমেনি, কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া মনে হচ্ছে, একের পর আরেক অঙ্ক আসছে, মনে হচ্ছে যেন অন্য জিনিস।

প্রবোধবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে ওঁর অলক্ষ্যে চোখ টিপলেন। আমরা তারপরে চলে গেলাম ওঁর কথা কিছুই গ্রহণ করলাম না মন দিয়ে। ভাবলাম, কাগজেই দেখা যাবে কী লেখে।

এবং সত্যি কথা বলতে কী, অতঃপর শুরু হয়ে গেল কাগজের যুদ্ধ। সপক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ—তিন রকম। সপক্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তাঁরা ত খুব ভালো বলবেনই, স্থানে-স্থানে অতিরঞ্জিত

করেই বলবেন। বিপক্ষের কথাও ছেড়ে দিলাম, তাঁরা ত ভালো দেখবেনই না, অতিরঞ্জিত করে খারাপ বলবেন। নিরপেক্ষ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে দেখলাম, যুদ্ধটা নাটক নিয়েই বেশী হলো! অভিনয়ের অবশ্য খুবই সুখ্যাতি করলেন। শুধু দু'চার জায়গায় তাঁরা আপত্তি করেছিলেন। চরিত্রের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি নাকি পৌরাণিক পরিবেশ কোথাও-কোথাও ব্যাহত করেছে। যেমন, কথা বলতে বলতে আসনের ওপর পা রেখে দাঁড়ানো ইত্যাদি সব বিলিতি কায়দা। কোথায় এক জায়গায় শিশিরবাবু দাঁড়ানো অবস্থায় ঈষৎ-উচ্চাসনের ওপর একটা পা তুলে দিয়েছিলেন, সেইসব ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতির কথা আর কী!

তা' পরে এসব সংশোধন করে নিয়েছিলেন শিশিরবাবু। যেটা আলোচনার মূল লক্ষ্যবস্তু, সেটা কিন্তু নাটক নিয়ে। সেসব পড়তে পড়তে মনে হতে লাগল, নাট্যকার নাটক লিখতে গিয়ে যে বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন, সেটা একটা দুরূহ কর্ম। নাটক-বিন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট জটিলতা-সম্পন্ন। এই বিষয়বস্তু নিয়ে নাকি লিখতে গিয়ে স্বয়ং ভবভূতিও এই জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। অর্থাৎ, রামকে অনেক বাঁচাবার চেষ্টা করেও নিষ্কলঙ্ক করতে পারেননি। রামায়ণের তিনি অনেক কিছুই নেননি, স্বাধীন কল্পনার যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন, এমন কি, নাট্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র মানতে গিয়ে তাঁকে মিলনান্তক পর্যন্ত করতে হয়েছে। তবু রামের সীতাকে বনবাস দেওয়ার পিছনে জোরালো যুক্তি দিতে পারেননি তিনি, সেখানে রাম-চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ রয়েই গেছে।

আসলে এই বিষয়বস্তু দুরূহ হয়ে দাঁড়ায় এইখানেই। সীতাকে বনবাস দেওয়ার 'জাস্টিফিকেশন' যতো দেওয়ার চেষ্টাই হোক না কেন, ওটা গ্রহণ করতে দর্শকের মন সহজে চায় না! কারণ যা দৃশ্য-কাব্য তার নাট্যক্রিয়া পড়েও যেমন অনুভব করবার, তেমনি চোখের সামনে সেই অনুভূতির সম্যক বিনাশ প্রত্যক্ষ করার প্রশ্নটাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাম নাটকের নায়ক, খলনায়ক নয়। দ্বিতীয়ত, রাম-চরিত্রকে প্রথম বয়স থেকে যেভাবে অগ্রসর হতে দেখি রামায়ণে, কিশোর-বয়সে তাড়কা-বধ, তারপরে বিবাহের পরে, পিতৃসত্যরক্ষার্থ বনগমন। একের পর এক কতো ঘটনা! সীতাহরণ, সীতার পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ওসবের মধ্য দিয়ে রাম আমাদের হৃদয়ের সমস্ত সমবেদনা কেড়ে নিয়েছেন। রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে পুনর্বার অধিষ্ঠিত দেখলেও, ভুলতে পারি না তাঁর বিগত জীবন-সংগ্রাম কথা। সে-সব দিনের দুঃখ ও যাতনার ছবি যেন রাম ও সীতার সঙ্গে অনুক্ষণ ঘোরাফেরা করতে থাকে। সেইজন্য রাম-কর্তৃক সীতাকে বনবাসে প্রেরণ, এ প্রসঙ্গ নাট্যরসের মাধমে যখন বিশ্লেষণের মুহূর্তগুলিতে দেখতে থাকি, অর্থাৎ রাম যখন সাধারণ এক মানুষের মতোই দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ মন নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন দেখা যায়, তখন দর্শকমন সে অনুভূতির সঙ্গে সমব্যথী হয়ে উঠতে পারে না, এবং পারলেও, সহজেই তা পারে না। তাই, নাট্যকারের পক্ষে এই 'মুহূর্তগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়ে পড়ে অত্যন্ত কঠিন কাজ।

গিরিশচন্দ্র তাঁর সীতার বনবাস-এ রামকে কিন্তু আদর্শপুরুষ বলেই দেখিয়ে গেছেন, অর্থাৎ

অতিমানবরূপে। অতিমানব কেন, স্বয়ং নারায়ণের অবতার রূপে। তবুও স্থানে স্থানে কিছু যুক্তি প্রয়োগ করতে তাঁকেও দেখা গেছে, যদিও তিনি পৌরাণিক নাটকে কখনো নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করেন না। কিন্তু যুক্তি দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাঁচাতে পারেননি রামকে কলঙ্ক থেকে। তবু, তাঁর পক্ষে বলার কথা এই যে, রাম স্বয়ং নারায়ণ, এবং আদর্শপুরুষ, তাঁর জীবনের এই যে ত্রুটি, এ তাঁর লীলারই নামান্তর, লোকশিক্ষার জন্যই এটা করতে হয়েছে রামরূপী নারায়ণকে। অর্থাৎ সাধারণ ধর্মপ্রাণ নরনারী যে-চোখে রামকে দেখে থাকেন, গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের ভিত্তিভূমি স্থাপনা করেছেন সেই বিশ্বাসেরই ওপরে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রামকে দেখেছেন তাঁর নাটকে যুক্তিবাদী মন দিয়ে। এ এক অভিনব দৃষ্টিপাত বটে, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে ঐ যে 'ক্রাইসিস'—যার কথা আগে বলেছি, সে 'ক্রাইসিস' অতিক্রম করতে দ্বিজেন্দ্রলালও ততটা সক্ষম হননি। রাম যে নির্দোষীকে শাস্তি দিয়ে অন্যায় করেছেন, এ অন্যায়ের 'জাস্টিফিকেশন' হবে কী উপায়ে? সমস্ত অপরাধ তিনি চাপিয়েছেন বাশষ্ঠের নির্দেশের ওপরে, তা সত্ত্বেও রাম অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পান না। সীতার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা পর্যন্ত করেছে দ্বিজেন্দ্রলালের রাম, তবু কি তিনি কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন? সীতাকে যখন বনবাস দিলেন রাম, তখন, তিনি যে নির্দোষ, নিষ্পাপ,—এ সত্য তিনি ছাড়া আর কে বেশী জানে? এ'ত বিশ্ববিদিত ঘটনা, এর ওপর আর চুনকাম চলে না। এ অপরাধ, অপরাধই। এক, ঐ যে বললাম, যদি ধরা যায় রাম—অবতার স্বরূপ, জগতকে শিক্ষা দিতে এসেছেন, পূর্ণ আদর্শবাদ প্রদর্শনই তাঁর উদ্দেশ্য সেই ভাব ও বিশ্বাসকে নাটকে যদি সঞ্চারিত করতে পারা যায়, তাহলেই কিছুটা পার পাওয়া সম্ভব। গিরিশচন্দ্র যেভাবে নিয়েছিলেন আর কী। অর্থাৎ বাঙালী যেভাবে নিয়েছে। বাঙালীর কাছে রামও আদর্শ ছিল, সীতাও আদর্শ। সেজন্য সীতার মুখ দিয়ে গিরিশচন্দ্র এক জায়গায় বলিয়েছেন—

"যেন জন্মজন্মান্তরে
হয় মম রামসমস্বামী
সীতা নারী না হয় তাহার।'

অতো কষ্ট পেয়েও সীতা বলেছেন, রামের মতো স্বামী যেন আমার জন্মজন্মান্তর হয়। তাঁর হাহাকার হচ্ছে ঐ কথার মধ্য দিয়ে—'সীতা নারী না হয় তাহার!' অর্থাৎ সীতার মতো দুর্ভাগ্য নিয়ে কেউ যেন তাঁর স্ত্রী না হয়। কিন্তু, যা বলছিলাম, জনপ্রিয় বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে ততই যুক্তি দিয়ে নতুন রঙ্ করা হোক না কেন, তা সহজেই গ্রাহ্য হতে চায় না। লৌকিক সীতা ও রামকে ধরলে এই বিপদ। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যাক। ভবভূতির "উত্তর রামচরিতে" আছে, শম্বুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য যখন রাম দণ্ডকারণ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন, তখন সীতার পূর্বতন বান্ধবী বাসন্তীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। এই 'বাসন্তী' ভবভূতির নিজস্ব চরিত্র। সীতাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বে যখন বনবাসে এসেছিলেন রাম, এই বাসন্তী ছিলেন সীতার সঙ্গিনী। এবার যখন দেখা হলো, বাসন্তী রামকে নিয়ে সেই সব স্মৃতিচিহ্ন আকীর্ণ পূর্বপরিচিত স্থানগুলি দেখাচ্ছেন একে-একে, এবং সে সব দেখে কাতর

হয়ে পড়ছেন রাম। তখন বাসন্তী বলছেন—"তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় মন, তুমি চক্ষুর কৌমুদী, অঙ্গের অমৃত,—এই সব প্রিয়বাক্যে সেই সরলা সীতাকে বিমুগ্ধ করে—যাক, আর বেশী কথায় কাজ নেই।"

বাসন্তীর বাক্যাংশের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে পড়েছে রচয়িতার অন্তরের ক্ষোভ, এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে ভবভূতির তিরস্কার।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র যতটুকু পারেন, তা গ্রহণ করেছেন যোগেশবাবু, এবং যতটা কোমল করা সম্ভব, তা করেছেন। এত সত্ত্বেও, অর্থাৎ আপোষ করা 'সীতা' হওয়া সত্ত্বেও, গুঞ্জন কম উঠল না, তাই ভাবছি, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' হলে না জানি কী হতো! এর থেকে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক আর্ট থিয়েটার শিশিরবাবুকে অসুবিধায় ফেলবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র অভিনয়-স্বত্ব সংগ্রহ করে থাকলেও, তাতে করে আর্ট থিয়েটারের কোনো লাভ হয়নি। আর্ট থিয়েটার 'সীতা'র অভিনয়-স্বত্ব সংগ্রহ করেও তা যখন অভিনয় করবার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না, তখন লোকের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, শিশিরবাবুকে অসুবিধায় ফেলবার জন্যই তারা এটা করে থাকবেন। জনসাধারণ এ বিষয়ে যে ধারণা করেছিলেন, তাই যদি সত্যি হয় ত, আর্ট থিয়েটারের সে উদ্দেশ্য একেবারেই সিদ্ধ হয়নি। সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে এই যে যোগেশবাবু নাটক করে দিলেন, আমি ত মনে করি, এতে শিশিরবাবুর শাপে বর হয়েছে। যে অসুবিধার কথা ভেবেছিল সেদিন স্টার, সে অসুবিধায় তাঁরা ফেলতে পারেননি শিশিরবাবুকে।

যাই হোক, এ তো গেল নাটকের কথা। এবার অভিনয়ের কথা ধরা যাক। অভিনয় নিয়েই বা এত মতবিরোধ কেন? একদিন ছুটি নিয়ে দেখতে গেলাম, তখনো 'ওরিজিন্যাল কাস্ট' বা 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ'—এই অভিনয় চলছে ওঁদের। ভূমিকালিপি মোটামুটি আগেই দিয়েছি, সংগঠন-কারীদের মধ্যে প্রধান যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সম্পাদক বা সেক্রেটারী—সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমার পূর্ব-পরিচিত। চিত্রশিল্পী ছিলেন চারুচন্দ্র রায়। এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পরে, এবং সে আলাপ আজও অক্ষুণ্ণ আছে। আর আলাপ ছিল ওঁর সহকারী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবু)-র সঙ্গে, যার কথা পরে আরও বলতে হবে।

অভিনয় আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগল। শিশিরবাবুর কথা বাদ দিলে, সবচাইতে যাকে ভালো লাগল, তিনি হচ্ছেন—বাল্মীকি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এমন ভঙ্গিতে উনি কথাবার্তাগুলি বললেন, এমন হাবভাবের সঙ্গে উনি অভিনয় করলেন যে, আমাদের চোখে তা নতুন লাগল। মনে হলো, এরকম বিশেষ বচনভঙ্গীতে ত আমরা অভিনয় করি না! সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হয়েছিল, তাঁর প্রতিটি কথা এবং চলাফেরা, তাঁর অভিনয় চরিত্রটির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে গেছে। এগজিবিশনে যখন শিশিরবাবু 'সীতা' করেছিলেন, তখন সে 'সীতা' দেখিনি, বলতে পারব না সে অভিনয়ের 'বাল্মীকি'র কথা, কিন্তু, এখানে 'বাল্মীকি' যা দেখলাম, তাতে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। এমনই

ছাপ উনি দিয়েছিলেন, সেই থেকে মনোরঞ্জনবাবুর থিয়েটারমহলে নামই হয়ে গেল—'মহর্ষি।' এরকম অভিনয়ে চরিত্রের নামে নাম হয়ে যাওয়ার রীতি অবশ্য প্রচলিত ছিল আগেকার থিয়েটারে। মহর্ষির 'বাল্মীকি' এমনি এক সৃষ্টি যে, মনে হচ্ছিল উনি ছাড়া 'বাল্মীকি' ওঁর থেকে বড়ো অভিনেতাও অমনভাবে করতে পারতেন না। আর ভালো লেগেছিল ললিতমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের 'বশিষ্ঠ।' এমন গাম্ভীর্যসম্বলিত, ধীর স্থির ভাব, এমন ব্যক্তিত্বের আরোপ, 'বশিষ্ঠ' হয়েছিল দেখবার মতো জিনিস। এছাড়া, দুর্মুখরূপী অমিতাভ বসুকেও খুব ভালো লেগেছিল। লব-কুশের মধ্যে কুশ-রূপী রবীন্দ্রমোহন রায়-কেই লেগেছিল বেশী ভালো। প্রভার সীতা অতি সুন্দর। ছোটখাটো ভুমিকাগুলির মধ্যে পুত্রশোকাতুর ব্রাহ্মণ বেশী নৃপেশনাথ রায় মশাইও বেশ চোখে পড়েন। আর বাকী রইলেন শিশিরকুমার স্বয়ং। প্রতিটি দৃশ্যে দর্শক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে তাঁর অভিনয়। অভিনেতার ভালো অভিনয়ের মধ্যেও সব জায়গায় যে চমকৃপ্রদ হয়, তা নয়। সেটা নিয়মও নয়। তাহলে ত চমকৃটাই সাধারণ পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো! চমক আসে বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ স্থলে, তা-ও সব দৃশ্যে নয়। সব থেকে বড়ো চমক পেয়েছিলাম সেই দৃশ্যে, যে দৃশ্যের আরম্ভ হচ্ছে রামের এই স্বগতোক্তি দিয়ে—"সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী, আমার প্রাণের দুঃখ কেহ বুঝিবে না, মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়—?"

এই দৃশ্যটিতে আমরা সব বসেছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বিশেষ করে সেই বিশেষ সময়টিতে, যখন লব এসেছে রাজধানীতে। রাম যখন পুনঃ প্রবেশ করছেন—"কার কণ্ঠস্বর, কার কণ্ঠস্বর!"

তারপরে লবকে দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠছেন—"সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি!"

মানুষ যেন তখন বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে উঠত!

তারপরে আরও আছে। লব যখন দ্রুত বেরিয়ে গেল, তখন পিছন থেকে রামের চীৎকার—"ভরত, লক্ষ্মণ, ফিরাও—ফিরাও বালকে!'

বলে, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন রাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ি যেন ভেঙে পড়ল হাততালিতে। যদি হাততালি দেওয়া এই থিয়েটারে নিষিদ্ধই হয়ে থাকে, ত কোনো দর্শকই তা মানলেন না।

এসব ছাড়া, আর ভালো-লাগার বস্তু ছিল 'সীতা' নাটকের গানের সুরগুলি। নাচও অতি সুন্দর হয়েছিল। এবং হয়েছিল নতুন রকমের। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এই ত সেই, যা আমরা এই যুগে চাইছিলাম। পরিচয়-পত্রে ছিল—নৃত্যশিক্ষক—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং তাঁর সহকারী—ব্রজবল্লভ পাল। এঁরা নাচে হয়ত সখীদের তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু শুনেছি, আসলে এই নৃত্যভঙ্গীর পরিকল্পনা করেছিলেন—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আর গানগুলি? যোগেশবাবু 'সীতা' নাটকের বই-এ যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তাতেই আছে—'কয়েকটি গান' রচনা করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এর থেকে কী বুঝব? কয়েকটি গান মাত্র হেমেন্দ্রকুমার-রচিত মনে হচ্ছে, সব-কটি গান নয়। বাকী গানগুলি তাহলে কার? যোগেশবাবুর নিজের?

গানগুলির সুর যেমন ভালো হয়েছিল, তেমনি গেয়েছিলেন বটে কৃষ্ণচন্দ্র দে! লোকের মুখে মুখে

ফিরত তখন কৃষ্ণবাবুর 'সীতা'র গানগুলি! বিশেষ করে, "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে!" গানখানি ত যাকে বলে, 'হিট্!' এরকম 'হিট আবার দেখা যায় না। যেখানে-সেখানে অলিতে-গলিতে, বাড়িতে-বাড়িতে, ঐ গান—'অশ্রুবাদল ঝরে'।

যাই হোক, যত সমালোচনাই হোক না কেন, 'সীতা' শুরু করল তার জয়যাত্রা। আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর এক বছর দেড়মাস পরে—১২৩ রাত্রি অভিনয়ের পরে—'সীতা' এলো আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে।

এরপরে, আবার ফিরে আসা যাক আমাদের থিয়েটারের কথায়। 'কর্ণার্জুন', 'ইরাণের রানী' ত চলেছে, 'চন্দ্রগুপ্ত'-ও চলছিল সুসমারোহে, তার কিছুদিন পরেই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন, 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর জায়গায় হবে—'প্রফুল্ল'। গিরিশচন্দ্রের যুগান্তকারী নাটক। অপরেশচন্দ্র আমাকে জানিয়ে দিলেন —আপনি কিন্তু করবেন 'রমেশ।'

রমেশ! শুনে মনে আনন্দই হলো। 'প্রফুল্ল' যখন প্রথম অভিনয় হয়—সেই ১৮৮৯ সালে——এই স্টারেই হয়েছিল সেই অভিনয়—তাতে 'রমেশ' করেছিলেন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। ওঁর পরে আরও বহু লোক 'রমেশ' করেছে, সেসব তেমন গা করি নি, মনে মনে ভাবছিলাম অমৃতলালেরই রমেশ-এর কথা। ভাবতে ভাবতে একটু ভয়ও যে না হচ্ছিল এমন নয়। পার্টটা ভালো করে পড়তে লাগলাম। চরিত্রের একটা ছবি মনে মনে এঁকে ফেলতে লাগলাম, আর জানতে চেষ্টা করতে লাগলা'ম, 'রমেশ' কেমন করেছিলেন অমৃতলাল সে যুগে? তাঁর সে অভিনয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে রেখেছে, এমন আছেন কে-কে? সে ত আজকের নয়, পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। দানীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, অপরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, জিজ্ঞাসা করি হরিপ্রসাদ বসু মশাইকে। এর কথা আগে বলেছি, হাতিবাগানে সেই যে 'স্টার'-এর পতন হলো গিরিশচন্দ্রের আনুকূল্যে, সেই স্টারের যে চারজন অংশীদার হয়েছিলেন, সেই চারজনের একজন হচ্ছেন এই হরিপ্রসাদবাবু। ইনি মায়ার বশে এখনো আসেন স্টারে। এসে বসে থাকেন, যেখানে তার ঘরটি ছিল, তার সামনে, চেয়ার নিয়ে। এঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, ব্রাহ্মণ দেখলেই পায়ের ধুলো নেবেন। এক টুকরো ন্যাকড়া থাকত পকেটে পাট-করা, সেটি দিয়ে পায়ের ধুলো নিতেন। লোক দেখলেই নাম জিজ্ঞাসা করতেন। আর, যেই শুনতেন—ব্রাহ্মণ, অমনি পায়ের ধুলো নেবার প্রয়াস! হাবুল বসে থাকে বুকিং-এ, ব্রাহ্মণ, তার পায়ের ধুলো তার নেওয়া চাই-ই। বৃদ্ধ ব্যক্তি হাবুলের পক্ষে সংকোচ বোধ করা স্বাভাবিক। ইন্দু ব্রাহ্মণ, ইন্দুরও হতো ঐ অবস্থা। দুর্গারও হতো। থিয়েটারে এসেই খোঁজ নিতেন—অপরেশ এসেছে?

এসেছেন শুনলেই চলে আসতেন ভিতরে। এসে অপরেশবাবুর পায়ের ধুলো নিতেন। পায়ের ধুলো নিলে ব্রাহ্মণকে হাত উঠিয়ে আশীর্বাদ করতে হয়। অপরেশবাবু তা না করে, প্রতিনমস্কার জানাতেন হাত জোড় করে। বৃদ্ধের তাতে কিন্তু ঘোরতর আপত্তি। আশীর্বাদ কেন পাবেন না তিনি?

আমিও ব্রাহ্মণ হলে অনুরূপ বিপদে পড়তাম। নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন—চৌধুরী? ব্রাহ্মণ, না কায়স্থ?

—কায়স্থ।

বেঁচে গেলাম।

এ হেন হরিবাবুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম অমৃতলালের 'রমেশ'এর কথা। তা বললেন—ও বাপু আমার কি মনে আছে? তুমি অপরেশকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো।

বললাম—উনি দু'একবার দেখেছেন, মনে আছে কী? আপনি বলুন।

মনে করে করে দু'একটি জায়গার কথা বললেন। তারপরে বললেন—আর মনে নেই। তুমি এক কাজ করো না? যাও না চলে ভুনিবাবুর কাছে?

ভুনিবাবু অর্থাৎ অমৃতলাল! না-না সে ভরসা হলো না। যা সংগ্রহ করতে পারলাম, তার ওপরে ভিত্তি করেই 'রমেশ'কে দাঁড় করাবার চেষ্টা করব ঠিক করলাম, সঙ্গে নিজস্ব কল্পনা ত আছেই! খট্‌কা লাগল এসে একটি জায়গায়। শেষ দৃশ্যে, যেখানে রমেশ তার স্ত্রী—প্রফুল্লকে যাদবের শয্যাপার্শ্ব থেকে সজোরে সরিয়ে এনে খুন করছে, সেই দৃশ্যের ঐ নাট্যকর্মটির পরিকল্পনা তেমন মনে লাগল না। উনি করতেন এইরকম :—

যাদব শয্যায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে প্রফুল্ল বসে। যাদবের বালিশের তলায় আলতা ভিজিয়ে দুটি বা 'গোলা' করা থাকত। যখন রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলছে—সরে যা, নইলে তোকে খুন করব। তখন, 'না' যাব না' এই কথা বলে যাদবকে আট্‌কাবার জন্য নীচু হতো প্রফুল্ল। এবং এই সময়েই সেই আলতার দুটিটা লুকিয়ে মুখে পুরে দিতো। রমেশ তখন প্রফুল্লকে ধরে গলা টেপার অভিনয় করেই ঠেলে ফেলে দিতো। দেখা যেতো, প্রফুল্ল যখন মেঝেতে পড়ে গেছে, তখন তার মুখের কস বেয়ে রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। মুখে রাখা আলতার দুটিটাতে দাঁতের চাপ দিলেই ওটা হতো আর কী।

বরাবর এই ব্যবস্থাই চলে আসছে প্রফুল্লর শেষ দৃশ্যে, রমেশ-প্রফুল্লের অভিনয়ে। আমার কিন্তু ব্যাপারটা তেমন মনঃপূত হলো না, আমি চিন্তা করতে লাগলাম। গলা টিপলে মানুষ হয়তো মরে যায়, কিন্তু স্টেজে ওটা ভালো দেখায় কী? 'ভালো' অর্থে—যথাযথ। যথাযথ হত্যা করার বিভ্রম সৃষ্টি করা তেমন যায় কি ওতে! অথচ, নাটকের দিক থেকে দেখতে গেলে ওখানে একটা আতঙ্কের অনুভূতি দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া দরকার ভাবতে ভাবতে দু'তিন দিনের মধ্যেই একটা কল্পনা মাথায় এলো। সেটা ঠিক করে নিয়ে আমাদের প্রফুল্ল অর্থাৎ নীহারকে গিয়ে বললাম। বললাম একান্তে ডেকে নিয়ে—একটা কাজ করতে পারবে?

কী?

বললাম—দেখ, যদি সাহস করো ত, অ্যাক্‌শনটা করব। সাহস না হয়ত, তা-ও বলো।

—সাহস করব না কেন ?—নীহার বললে—তুমি বলেই দেখ না !

বললাম শেষ দৃশ্যের কথাটা। বললাম—তুমি যখন আলতার মুটি-টা মুখে পুরে দেবে, তখন আমি তোমার হাত ধরে টেনে এনে গলা টিপে ফেলে দেবো, এই ত ? এটা কী করে করব জানো ? তুমি আমার বাঁদিকে পজিশন নেবে, নইলে হবে না। আমি প্রথমে বাঁ-হাত দিয়ে তোমার ঘাড়ের পিছনে শক্ত করে ধরব, তারপরে অনুরূপভাবে ধরব ডান হাত দিয়ে। তখন দাঁড়ালো কী ? আমার দুটি হাতের আঙুলগুলো গেল তোমার ঘাড়ের পিছনে। শুধু বুড়ো আঙুলদুটো এগিয়ে এনে রাখব তোমার চেয়ালের হাড়ের নীচে। আমার হাত দুটি দেখতে হবে, ঠিক যেন 'প্যারালাল বার।' তুমি তখন তোমার দুটি হাত দিয়ে আমার সম্মুখ-বাহু বা ফোর-আর্ম দুটি শক্ত মুঠোয় ধরবে। তখন সেই অবস্থাতেই তোমাকে ধরে আমার সামনে নিয়ে আসব। অর্থাৎ, তোমার পিছনটা থাকবে দর্শকদের দিকে, আর আমার মুখটা থাকবে দর্শকদের দিকে। তারপরে তোমার ঘাড়ে আমার হাতের চাপের ইঙ্গিত পেয়ে তুমি তোমার পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর চাপ দিয়ে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। যতটুকু পারো ততটুকু উঠো, আমি ঠিক তোমাকে উঠিয়ে নেবো। তোমার ভর আমি ঠিক রাখতে পারব। প্রায় একহাত ওপরে তুলব তোমাকে। তারপরে ঐ অবস্থায় তোমাকে বার দুই তিন ওঠা-নামা করিয়ে, তারপরে ছেড়ে দেবো। তুমি একটা আর্তনাদ করতে থাকবে, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে তোমার। তারপরে আমি ছেড়ে দেবার পর তুমি লুটিয়ে পড়বে স্টেজের ওপরে। গালের কস বেয়ে নামবে দুটি রক্তের ধারা। বুঝলে ? কাজটা সহজ নয়। প্র্যাকটিস করতে হবে।

নীহারের অদ্ভুত গুণ দেখেছি, নতুন কিছু করতে নতুন কিছু শিখতে ওর উৎসাহের অন্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ও রাজী হয়ে গেল। বললাম—কাউকে জানতে দিও না। লুকিয়ে লুকিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। একেবারে প্রথম রাত্রে এই অভিনয় করে আমরা সবাইকে চমকে দেবো।

তাই হতে লাগল। কিন্তু যতোই এগিয়ে আসতে লাগল প্লের তারিখ, ততই ভয় হতে লাগল মনে! কী জানি কাউকে ত জানতে দিলাম না, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে! আমি যদি ওর দেহের ভার দুহাতের ওপর না রাখতে পারি বা নীহার যদি ঠিকমতো লাফাতে না পারে ত, বিপদ হতে পারে!

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম কথাটা। প্রবোধবাবু তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বোধহয় ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন—তা ঠিক আছে, দু'জনে মিলে ওটা ঠিক করে নাওনা—রিহার্সাল দিয়ে ?

যাক, আমি বলে খালাস। প্রস্তুত হয়ে রইলাম, ঐ সিনের আগে যেন খোঁপা খুলে নিয়ে একটা এলো খোঁপা করে রাখে। এলো চুল করে থাকার রেওয়াজ তখন ছিল না বউদের, না হলে ঐ সিনে এলোচুল থাকলে সুবিধা হতো। কিন্তু, সেটা করা যাবে না, বিসদৃশ ঠেকবে। তাই, পরামর্শ দিলুম ঘাড়ের কাছে চুলে একটা ফাঁস দিয়ে রাখতে। যাতে করে ঐ বিশেষ নাট্যিক ক্রিয়ার মুহূর্তে ওর চুলটা খুলে গিয়ে এলো হয়ে যায়, তাতে 'এফেক্ট' হবে চমৎকার!

আসলে, এ হলো সম্মিলিত অভিনয়। দুজনের সঙ্গে সম্যক বোঝাপড়া না থাকলে এসব এফেক্ট আনা সম্ভব নয়! যে-অভিনয়টা ঐ দৃশ্যে আমরা করব, তাতে বিভ্রম হবে এই যে, দম বন্ধ করা শুধু নয়, আমি একটা মানুষের ঘাড়ের পিছনের 'মেডুলা'তে চাপ দিয়ে ভেঙে দেবারও চেষ্টা করছি।

যাই হোক, আমরা প্রস্তুত হয়ে রইলাম। অভিনয়ের তারিখ হলো—আটাশে আগস্ট, ১৯২৪। যোগেশ করলেন—দানীবাবু। রমেশ—আমি। প্রফুল্ল—নীহার। সুরেশ—ইন্দু। শিবনাথ—দুর্গাদাস। ভজহরি —নির্মলেন্দু। মদন ঘোষ—অপরেশচন্দ্র। কাঙালীচরণ—সন্তোষ দাস (ভুলো)। পীতাম্বর—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। জ্ঞানদা—কুসুমকুমারী। উমাসুন্দরী—কোহিনূরবালা। যাদব—ফুল্লনলিনী।

হলো অভিনয়। দানীবাবুর 'যোগেশ' কোনোদিন দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। খুবই ভালো এবং কণ্ঠস্বর ওঁর যেমন তাতে চমৎকার মানিয়ে গেল। কিন্তু, স্মৃতিতে যে ছাপ রেখে গেছেন গিরিশচন্দ্র, তাতে মনে হলো এর থেকে সে যোগেশের ছবিটা আরও বড়ো। অবশ্য যে বয়সে সে-যোগেশ দেখেছিলাম, তখন অভিনয় ততটা বোঝবার যোগ্যতা হয়নি, কিন্তু সে-ছাপ মুছবারও নয়, অস্বীকার করবারও নয়!

তাহলেও বলব, বিস্ময়কর অভিনয় করলেন স্থানে-স্থানে দানীবাবু। বহু দৃশ্যই একসঙ্গে করতে হয়েছে, তাতে ওঁর অভিনয় শক্তিকে অভিনেতা রূপেও অনুভব করবার সুযোগ হয়েছে। আমি যে দৃশ্যে যাদবকে বকছি আর সে কাঁদছে, এমন সময় পিছন থেকে মত্ত অবস্থায় এলেন উনি, বললেন—'উকিল কী চীজরে!'

—'কী মাতলামো করেন!'—বলে আমি তাড়াতাড়ি চলে যেতেই উনি যখন বলে উঠলেন—'যেদো, ধর-ধর—তোর কাকাকে ধর!'—তখন, চড়চড় করে পড়ে গেল হাততালি।

গম্ভীর দৃশ্যেও ওঁর অভিনয় দেখবার মতো হতো। জ্ঞানদার সঙ্গে সেই দৃশ্য,—যখন বলছেন—'মরছ, মরো। রাস্তায় মরছ!' তখন উৎকণ্ঠিতচিত্তে আমরা দেখেছি তাঁকে উইঙ্গসের পাশ দিয়ে।

তারপর, শেষ দৃশ্যটি তো হত মর্মান্তিক! রমেশকে হাতে হাতকড়ি দিবাব পর, যখন পাগলের মতো প্রবেশ করছেন, বলছেন—'এই যে, মড়া পুড়িয়ে আমার বাড়িতেই এসে সব জটলা করছ।'

তারপর, ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকিয়ে,—'এই যে যেদো, এই যে মা!'

'এই যে রমেশ'—বলে যখন আমার দিকে তাকালেন, সে অদ্ভুত চোখের দিকে আমি তাকাতে পারলাম না।

উনি ততক্ষণে বলে চলেছেন—'দেখছ? আরও দেখবে!' ইত্যাদি।

তারপরেও আছে। আস্তে আস্তে, হেঁটে মঞ্চের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে যাচ্ছেন আর বলছেন—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'

দু'তিনবার বলতেন কথাটা। তারপরেই—যবনিকা।

দানীবাবুর অভিনয় ত ভালো হলোই, সবার অভিনয়ই ভালো হলো। নীহার 'প্রফুল্ল' যা করলে, তা এক কথায়—চমৎকার। তার সেই প্রথম দৃশ্যের আবদারী কথা থেকে শুরু করে শেষ দৃশ্যে যাদবকে বাঘিনীর আগলে রাখবার চেষ্টা, সে এক সত্যিই দেখবার মতো জিনিস হয়েছিল। তারপরে, আমাদের সেই দৃশ্যটি। হত্যার পরেই ত পীতাম্বর ঢুকবে সবাইকে নিয়ে। তাই তারা দাঁড়িয়ে আছে উইঙ্গসের পাশে। সেখান থেকে দেখছে তারা অবাক হয়ে, আর ভাবছে, ওরা দুজন করছে কী! বাস্তবিকই, নীহারের সাহস ও সহযোগিতা না পেলে ঐ 'প্রজেক্ট' আমি আনতেই পারতাম না! একেই বলে অভিনয়ের 'কো-রিলেশন'।

দৃশ্যটি দেখতে দেখতে দর্শকেরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রুখে উঠেছিল রমেশকে মারবে বলে। ভাগ্যিস ওটা হ'ল মঞ্চের ওপর। নীচে থাকলে, হয়ত কেউ কেউ ছুটে এসে আমাকে মেরেই ফেলত!

দৃশ্যটির শেষে ড্রপ পড়লে, কত লোক গ্রীনরুমের দরজায় এসে প্রশ্ন করছেন—শ্রীনীহারবালার লাগে নি ত?

ডাঃ নরেন বোসের কথা আগেই বলেছি। তিনি তাতাড়ি ভিতরে এসে আমাকে—চোখ পাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কী করলেন ওটা?

বললাম—ওটা ট্রিক্।

আরেকবার দেখিয়েও দিলাম ওকে ব্যাপারটা। উনি বললেন—ট্রিক্ যে বেট্রিক হয়ে যাবে। ওতে যে ফাঁসি হয়ে যায়। হয়ে গেলে হাতে যে দড়ি পড়বে মশায়! খবরদার, এটা কখনো করবেন না।

ডঃ নরেন বসু মশাইয়ের কথায় একটু যে দমে না গেলাম এমন নয়, মনে একটু ভয়ও হলো। ভাবলাম না হয়, থাক ও ব্যাপারটা। কিন্তু পরবর্তী অভিনয়ের দিন, অর্থাৎ 'ইরাণের রানী'র দিন, বুধবার, অভিনয়ের শেষে নীহার বললে—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? ওদের কথা কানে নিও না। ও'জিনিসটা বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না। তুমি বরং বারকতক রিহার্স্যাল দিয়ে জিনিসটা ঠিক করে নাও। আমি আছি।

নীহারের এইটেই ছিল বিশেষত্ব। নতুন কিছু জানবার নতুন কিছু শিখবার যে অদম্য প্রেরণা ছিল ওর মধ্যে, তা এই এত দীর্ঘদিনের অভিনেতা-জীবনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, খুব সুলভ নয়। ওর উৎসাহে আমারও মনের দ্বিধা দূর হয়ে গেল। বার কতক রিহার্স্যাল দিয়ে জিনিসটা আরও বসিয়ে নিলাম দুজনে। এবং তারপরে অভিনয়ের দিন, যথারীতি জিনিসটা করে গেলাম, কোনো বিপত্তি ঘটল না, ঠিক হয়ে গেল দৃশ্যটা। 'প্রফুল্ল' নাটক স্টারে ছাব্বিশ সাল পর্যন্তও করেছি, বরাবর আমরা ওটা করে গেছি, কখনো কোনো বিপদ ঘটে নি, অসুবিটা হয়নি, কখনো বিফল মনোরথও হইনি। এর পরে, পরবর্তী কালে, কতোবার কত জায়গায় 'প্রফুল্ল' হয়েছে, আমি বহুবার 'রমেশ' করে গেছি, কত মেয়ে 'প্রফুল্ল' চরিত্রটি করেছে, প্রভা করেছে, রানী করেছে, সরযূ করেছে, নীহারের সঙ্গে ঐ যে বিশেষ মুহূর্তের অভিনয় যে

করতাম, তা আর করা হয় নি। সত্যি কথা বলতে কী, নীহার ছাড়া কেউ ওটা তুলে নিতে চায়নি, সাহস করেনি বললেও চলে। শুধু মনে পড়ে, রানী, অর্থাৎ রানীবালা একবার আগ্রহান্বিত হয়েছিল, বলেছিল—শিখিয়ে দিন, আমি নীহারদির মতো ঠিক করব।

একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে বলেছিলাম—তোমার শরীর ভারী, তোমাকে দু'হাতের ওপর রাখতে আমি পারব না।

—দেখুনই না চেষ্টা করে।

—না।

—কেন?

বলেছিলাম—না। তুমি সাহস করলেও আমি করি না।

অতএব, নীহারের পর সে জিনিসটা আর করা হয়নি। ওদের সঙ্গে ঐ দৃশ্যটা আমি সাধারণভাবেই করতাম।

'প্রফুল্ল' অভিনয়ের আর একটা লক্ষণীয় দিক হলো যে, কাগজগুলোতে বিপক্ষে কেউ কিছু লেখেনি, সবাই করেছে সুখ্যাতি। শুধু রাখালদা ছাড়া। সুখ্যাতিতে আনন্দ হয়, উৎসাহও আসে। সেদিনকার সেই আনন্দ আর উৎসাহের স্বাদ আবার একটু পাবার জন্য আমাদের সে সুখ্যাতির কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"Jogesh was superbly rendered by that incomparable artist, Danibabu, the author's son. Indubhusanbabu in the role of Suresh was simply charming. The part of Ramesh was very able depicted in Ahinbabu's acting. Bhajahari, represented by Nirmalendubabu and the part of Madan Ghosh were able to provide sufficient wit to the audience. Prafulla, was very aptly represented by Srimati Niharbala." ("The Bengali"—13. 9. 24)

'নায়ক' লিখেছিলেন—"যোগেশের ভূমিকায় দানীবাবু যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন, তাহার তুলনা নাই। নবযুগের উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী রমেশের ভূমিকায় অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করেছেন। আর অভিনয় দেখিলাম শ্রীমতী নীহারবালার—প্রফুল্লের ভূমিকায়। আর সুন্দর হয়েছিল শিশু যাদবের অভিনয়।"

এইভাবে, যখন দানীবাবু অভিনীত পুরানো বইগুলির আবার অভিনয় হতে লাগল একে একে, তখন দর্শকদের মধ্য থেকে একটা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল,—দানীবাবুর 'ঔরংজেব' একটি বিখ্যাত ভূমিকা, সুতরাং 'সাজাহান' এরা অভিনয় করছেন না কেন? ক্রমে ক্রমে নানা গুজবও ছড়াতে লাগল, লোকে বলতে লাগল' স্টার—'সাজাহান' ধরছে। এমনকি কাগজেও লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। চব্বিশ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা যা লিখলে, তা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়—"শুনতে

পাচ্ছি, এর পর স্টার নাকি অভিনয় করছেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান', যা অতীতে খুবই গৌরব অর্জন করেছিল পুরানো মিনার্ভায়। 'সাজাহান'-এর নামভূমিকা সে-যুগের প্রখ্যাতনট প্রিয়নাথ ঘোষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শুনছি, স্টারে এই ভূমিকা করবেন অপরেশচন্দ্র, আর দানীবাবু করবেন পুরানো ভূমিকা। যাঁরা প্রিয়নাথবাবুর সাজাহান দেখেছেন, তাঁরা অপরেশবাবুর চরিত্রাঙ্কন দেখে তুলনা করতে পারবেন। কিন্তু আমরা জানতে চাই কী-কী চরিত্র তিনকড়িবাবুকে, অহীন্দ্রবাবুকে, নির্মলেন্দুবাবুকে ও দুর্গাদাসবাবুকে দেওয়া হলো।"

এই ধরনের লেখালেখি হচ্ছে কাগজে, গুজবও শুনছি নানারকম, কিন্তু, স্টার যে সত্যিই 'সাজাহান' ধরবে, এটা যেন অনুমান করেও সঠিক বুঝতে পারছি না। থিয়েটার-জগতে 'মন্ত্রগুপ্তি' বলে একটা কথা আছে, বিশেষ করে তখনকার দিনে ওটা খুবই মানা হতো, একটা কিছু ভিতরে-ভিতরে সম্পূর্ণ স্থির না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরও অনেক সময় জানতে দেওয়া হতো না। আমাদের তখন বুধবার থেকে শুরু করে রবিবার পর্যন্ত—সপ্তাহে পাঁচদিন অভিনয় চলেছে। এরজন্যে শুক্রবারটা আমাদের কাছে ছিল 'ফানফ্রাইডে।' ও-কথাটা আমারাই তৈরি করে নিয়েছিলাম। শুক্রবার সব হাসি-ঠাট্টা—রঙ্গ-ব্যঙ্গের বই দেওয়া হতো। যেমন—বিরহ, পুনর্জন্ম, বিবাহ-বিভ্রাট, কৃপণের ধন, রাতকাণা ইত্যাদি। এসব বইগুলিতে আমার অবশ্য কোনো ভূমিকা ছিল না, ঐ দিন অভ্যেসমতো থিয়েটারে যেতাম বটে, কিন্তু আসলে ওটা ছিল আমার ছুটির দিন। অবশ্য ও-ছুটি আমাকে বেশীদিন ভোগ করিতে হয়নি, কর্তৃপক্ষ শীগ্‌গিরই একদিন আমাকে ঠেললেন অমৃতলাল বসু-বিরচিত 'রাজা-বাহাদুর' নাটকে। চব্বিশ সালেরই দোসরা অক্টোবর প্রথম আমাদের স্টারে অভিনীত হলো ও-বই। এতে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—অপরেশবাবু। অবশ্য প্রথম কযেক রাত্রি করার পরেই ছেড়ে দিলেন তিনি, তারপর ওটা করতে লাগল ননীগোপাল মল্লিক। আমি করলাম—মিস্টার ফিশ্‌। কুসুমকুমারী করলেন—মনসা ঠাকুরুন।

এসব প্লে-টে চলছে, এমন সময় ঘোষণা শোনা গেল, 'সাজাহান' খোলা হবে অবিলম্বে। কিন্তু সাজাহানের ভূমিকা নিয়ে প্রথমেই একটা অসুবিধার সৃষ্টি হলো। অপরেশবাবুর বয়স হয়েছে, তার ওপরে ওর ঘাড়টা গেছে শক্ত হয়ে। এ অবস্থায় স্থবির সাজাহান অবশ্য ওঁকে মানিয়ে যেতো, কিন্তু উনি শেষ পর্যন্ত পার্টটা করতে চাইলেন না। এবং উনি যখন সত্যিই অপারগতা জানালেন, তখন ও-পার্টটা পড়ল গিয়ে নরেশবাবুর ঘাড়ে। ঐ চব্বিশ সালেরই কথা। ২৩শে অক্টোবর কাগজে স্টারের আগামী অবদান হিসাবে 'সাজাহান'-এর প্রথম বিজ্ঞপ্তি বেরুলো :

ঔরংজেব—নাট্যাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
দারা—তিনকড়ি চক্রবর্তী
সাজাহান—নরেশচন্দ্র মিত্র
জাহানারা—কুসুমকুমারী।

আর কারুর নাম প্রথম দিন বেরোয় নি। আমার এ বইতে কোনো ভূমিকা রইল না, আমার এ-বইতে হয়ে গেল ছুটি।

২৪শে অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি বেরুলো এই বলে যে, ৩০শে অক্টোবর—বৃহস্পতিবার রাত আটটায় 'সাজাহান' হবে। ভূমিকালিপিতে যা বেরিয়েছিল তার সঙ্গে নতুন নাম যোগ হলো—'দিলদার'—নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

২৩শে, ২৪শে দু'দিনই প্লে ছিল, ২৫।২৬শে—শনি-রবিবার—'কর্ণার্জুন'। নরেশবাবু যথানিয়মে অভিনয় করে বাড়ি চলে গেলেন। ২৭শে তারিখ—সোমবার হলেও—কালীপুজো বলে—ম্যাটিনী চারটেয় হ'লো—'অযোধ্যার বেগম'। ম্যাটিনী হতো পাঁচটায়, কিন্তু, মাত্র ঐদিনটির জন্য হলো চারটেয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'অযোধ্যার বেগম' তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে, রাত্রে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, তাতে—'সাজাহান'-এর রিহার্স্যাল দেওয়া। রাত্রি ৮টা-৮॥ টায় প্লে ভেঙে যাবার পর, রিহার্স্যাল বসতে বসতে ন'টা বাজল বটে, কিন্তু, দেখা গেল, আসল লোকই আসেন নি—নরেশবাবু। কর্তৃপক্ষ বেশ চিন্তিত হলেন নরেশবাবু না আসায়। নরেশবাবুরই বেশী করে মহলা দেওয়া দরকার। কেননা, তিনি বলেছিলেন—'আমি ও পার্ট কখনো আগে করিনি।'

পরদিন—মঙ্গলবার। রিহার্স্যালের জন্য মাত্র এইদিনটিই পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, পরদিন—বুধবার—'ইরাণের রানী'র অভিনয়, এবং তার পরদিন—বৃহস্পতিবার—'সাজাহান'। কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার, মঙ্গলবারও এলেন না নরেশবাবু। অবশ্য খবর পাঠালেন, তিনি অসুস্থ, তবে পার্টটা ভালো করে পড়ে সব দেখে নিচ্ছেন, কোনো চিন্তা নেই।

সুতরাং, ওঁকে বাদ দিয়েই রিহার্স্যাল হলো। কুসুমকুমারী একটু আপত্তি করলেন, বললেন—আমার সঙ্গে আগাগোড়া পার্ট, একটু দেখে না নিলে কেমন করে হবে?

মঙ্গলবারের সেই রাত্রিতেই প্রবোধবাবু আমাকে ডাকলেন, বললেন—তোমার ত সাজাহান করা আছে, পার্টটা একটু দেখে রেখো। অবাক হলাম কথা শুনে। দেখে রাখব, এটা উনি কী বলছেন? অবশ্য পার্ট আমার মুখস্থ, অ্যামেচারে বহুবার করেছি, নিজেদের ক্লাবেও করেছি, বাইরে-বাইরেও করেছি। কিন্তু, সে ত পেশাদারী মঞ্চের ব্যাপার নয়, এতে যে দায়িত্ব অনেক। রীতিমত ভাবতে হবে, 'সাজাহান' চরিত্রে নতুন কী করা যায়। হুট্ করে বললেই কি অম্নি করা সম্ভব? তবু, বলছেন যখন, তখন মনে মনে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

উনি বললেন—অতো ভেবো না, হয়ত করতেই হবে না—নরেশ করবে ঠিক।

তবু, ভাবতে লাগলাম। বলা যায় না কিছুই, যদি নামতে হয়? বুধবার—অর্থাৎ ২৯শে, সকালবেলা উঠেই তাড়াতাড়ি কাগজ দেখলাম। দেখি 'সাজাহান'-এর পাশে নরেশবাবুর নামটা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি নাম বেরুলো—পিয়ারা—আশ্চর্যময়ী। আশ্চর্যময়ী মডার্ন থিয়েটারে যোগ দেবেন বলেই ঠিক ছিল। কিন্তু, রাধিকাবাবু যখন ও'থিয়েটার ছেড়ে চলে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে

আশ্চর্যময়ীও চলে এসেছেন। এসে, উনি যোগদান করলেন স্টারে। মনোমোহনে 'পিয়ারা' ওর করাই ছিল, সেইজন্য ওঁর এতে কোনো অসুবিধাই হলো না। বৃহস্পতিবার 'সাজাহান'-এ পিয়ারা করার পর, শুক্রবার স্টারে 'মৃণালিনী' অভিনয়ে সুবাসিনীর অনুপস্থিতিতে ইনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন গিরিজায়ার ভূমিকায়।

আমি ত ওদিকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক্, আজও যখন ওঁর নাম পড়েছে, তাহলে আমাকে আর বোধহয় করতে হলো না। অবশ্য, এসব ভাবলাম বটে, মনে-মনে কিন্তু 'সাজাহান'-এর প্রস্তুতি চলেছেই। খালি এই চিন্তা, নতুন কী করা যায়? বুধবার থিয়েটারে গেলাম, 'ইরাণের রানী' প্লে আছে। প্লের পর রঙ তুলছি, হাবুল এসে দাঁড়ালো কাছে, বললে—কী? একটু রিহার্স্যাল দিয়ে নেবেন নাকি? মানে, নরেশবাবু করবেন ঠিকই, তবু থিয়েটারের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না—হাবুলের মনের ভাবটা এইরকম।

ওকে বললাম—তা'হলে একটু থেকে যাও, আমি আসছি।

স্টেজে এলাম একটু পরেই। ওকে বললাম হাবুল, একটা নতুন জিনিস ভেবেছি, সেটা করলে হয়।

—কী?

বললাম—পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান।

হাবুল আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে, চমকটা ভেঙে গেলে পর বললে—কখনো ত এরকম হয়নি সাজাহান। তবে, এটা নতুন রকমের হয় বটে। কিন্তু, লোকে নেবে কী?

বলে, একটুক্ষণ থেমে থেকে, আবার নিজেই বললে—অবশ্য সাজাহান পক্ষাঘাতগ্রস্ত কিনা, সেটা কেই বা দেখছে, আর কেই বা জেনে রেখেছে! তা বেশ, আপনার মনে যখন হয়েছে, তখন সেভাবেই করুন।

বললাম—না হে, ব্যাপারটা ওভাবে উড়িয়ে দেবার নয়। এটা ইতিহাসের কাহিনী। লোকে এসব খুবই জানে। তবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, এর সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণও কিছু আছে দেবার মতো।

হাবুল বললে—তবে আর ভয় করছেন কেন? লেগে যান।

লেগে গেলাম। হাবুলের স্মারকতার সাহায্য নিয়ে একা-একাই স্টেজে মহলা দিয়ে নিলাম। ডানদিকটা পক্ষঘাতগ্রস্ত, ওই ভাবটাই রপ্ত করে নিলাম। তারপরে, মহলা যখন শেষ হলো, থিয়েটার ছেড়ে যখন বাড়ি আসছি, তখনো ঐ কথা ভাবছি। রাত্রে শুয়ে শুয়েও ভাবছি, রাতটা কাটল প্রায় অনিদ্রার মধ্য দিয়ে। যদি না করতে হয় ত, বুঝব, বাঁচালেন ভগবান। আর যদি সত্যি সত্যিই নামতে হয় সাজাহান সেজে? তখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভাবটির সপক্ষে যুক্তি কী? আইডিয়াটাকে তেমন

করে যাচাই করে নেবার সময়ও পেলাম না! আমি যখন পুরানো দিনে মেট্‌কাফ হলে—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পড়তে যেতাম, তখন ভারতীয় ইতিহাসও খুব পড়েছি। পড়ার মূলে আর কিছু নয় তখন ঐতিহাসিক নাটকেরই রেওয়াজ চলেছে কি না, তাই মনে হয়েছিল, ইতিহাসের কথা কিছু জেনে রাখা দরকার। ওসব পড়তেও কিন্তু খুব ভালো লাগত! এমন সব ঐতিহাসিক কাহিনী পড়েছি, যা কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয়। দুঃখ হতো এই ভেবে যে, এইসব কাহিনীগুলো নাট্যকাররা কাজে লাগান নি কেন?

শৌখীন অভিনেতা হিসাবে 'সাজাহান' ত বহুবার করেছি; সেইজন্যই দৃষ্টি ছিল চরিত্রটির ঐতিহাসিকতার প্রতি। ইতিহাস তাই পড়েছিলাম যত্ন করে। তাতে, একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, যাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান রূপ দেওয়া চলে। কিন্তু সে-ও হয়ে গেল অনেকদিনের কথা, একেবারে সঠিকভাবে ব্যাপারটা মনে পড়ছে না ত! একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েই গেলাম।

সকাল হলো। বৃহস্পতিবার। তাড়াতাড়ি উঠে খবরের কাগজটা নিয়ে পড়লাম। স্টারের বিজ্ঞাপন দেখতে গিয়ে সত্যিসত্যিই চমকে উঠলাম এবার। 'সাজাহান'-এর পাশে দেখি রয়েছে—আমার নাম। পালে বাঘ পড়েছে। সাজাহান আমাকেই করতে হবে শেষ পর্যন্ত। মোটমাট সেদিন পর্যন্ত ছ'টি নাম বিজ্ঞাপনে বেরুলো, আর কোনো নাম বেরোয়নি। ইন্দু করছে—সোলেমান, আর দুর্গার করবার কথা—মহম্মদ। কিন্তু ও তখন অসুস্থ, ক'দিন ধরেই থিয়েটারে আসছিল না। তাই ওর হয়ে 'মহম্মদ' করলে রাধাচরণ ভট্টাচার্য।

সেদিন একটু সকাল সকালই বেরুলাম বাড়ি থেকে। সোজাসুজি থিয়েটারে না গিয়ে আগে গেলাম চীৎপুরে, আবদুল বারির দোকানে। যখনকার কথা বলছি, তখন বাবুহোসেন মারা গেছেন, তাঁর মুন্সী আবদুল বারি চালাচ্ছেন ব্যবসা, পুরানো বাড়ি ছেড়ে উঠে এসেছেন নতুন বাড়িতে। ওঁর ওখানে গেলাম সাজাহানের চুল আর দাড়ির জন্য! বলা বাহুল্য, বারিসাহেবই তখন আমাদের থিয়েটারে চুল-টুল দিতেন। আগে আগে থিয়েটারে নিয়ম ছিল, চুলওয়ালারা চুল নিয়ে আসবে ভাড়ায়, এবং সপ্তাহ অন্তে সে-সব ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ধোয়া-পাট প্রভৃতি করে দিয়ে যাবে। কিন্তু আর্ট থিয়েটারের আমল থেকে নিয়মটি একটু পালটে গিয়েছিল। পুরানেরা বাঁধা দাড়ি পরতেন, কিন্তু আমরা তা নিতাম না, ও দাড়ি পরলে গালটা আবার একটু ফুলো ফুলো দেখায় এবং কথাও একটু অস্পষ্ট শোনায়। বাঁধা দাড়ি মানে, যে দাড়ির দুই প্রান্ত থাকে ফিতে দিয়ে বাঁধা, দাড়িটা মুখে লাগিয়ে, ফিতের প্রান্ত দুটি কানের ওপর দিয়ে টেনে মাথার পিছনে ফাঁস দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এই ফিতের ওপরে মাথার চুল বসালেই ফিতের আর দৃশ্যমান হবার উপায় থাকে না। আমরা আবার পছন্দ করতাম না ও দাড়ি। নরম ভালো চুলের ক্রেপ স্পিরিট গাম দিয়ে লাগিয়ে দিতো আমাদের মুখে। এছাড়া গোঁফের ব্যাপারও ছিল। পুরানো আর্টিস্টরা নিজেরাই গোঁফ-টোফ লাগিয়ে নিতেন।

শুধু আমাদের—এই নতুনদের কজনকে, দরকার মতো সাহায্য করবার জন্য আসত বারির একজন লোক, এই বন্দোবস্ত ছিল। ওদের কারিগর সেখ ইদুই আসত সচরাচর। তবে কথা হচ্ছে, দাঁড়িগোঁফ তখন আমাদের দরকার হচ্ছিল কই? 'কর্ণার্জুনে' আমাদের কারুর দাড়ি নেই, 'ইরাণের রানী'তেও নেই। পুরানেরা ত বাঁধা দাড়ি পরছেন। কিন্তু এবার? এবার সাজাহান-এ যে লাগবে ওসব! তাই, সরাসরি আমার সেদিন চীৎপুর যাওয়া।

বারিসাহেবকে সব কথা বললাম, উনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন—কেউ কোনো খবর দেয় নি ত!

ভাবলাম খবর দেবেই বা কী? আর যারা যারা করবে, তাদের সবাই সব ঠিক করা আছে, বাকী ছিলেন নরেশবাবু। তা নরেশবাবু যে কী করবেন না করবেন, তা ত জানা ছিল না! তাই, ওঁর কাছে খবর আসে নি।

আমার কাছে সব শুনে ইদু গিয়ে ডেকে আনলো বড়ো মিঞাকে। বড়ো মিঞা স্থবির হয়ে পড়েছেন, হাত কাঁপে থরথর করে, তবু ওঁর উদ্যমের শেষ নেই। ওঁর শিষ্য ইদুই তখন প্রায় সব কাজ করে দেয়। মাথা নেড়ে বড়ো মিঞা বললেন—আপনার মাথার চুল ত নেই!

রীতিমত দমে গেলাম, বললাম—কী হবে?

উনি বললেন—স্প্রিং-টিং করে এঁটে দেওয়া যাবে'খন ভালো করে।

—আর দাড়ি?

বললেন—বাঁধা দাড়ি আছে, তাই দিয়ে কাজ চলে যাবে'খন আজ।

আমার চুল কর্তৃপক্ষ বরাবর অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে নেন। সাধারণ চুল করার নিয়ম হচ্ছে—বাইশ ইঞ্চি। অন্তত বাইশ ইঞ্চির কম কেউ করে না। কিন্তু আমার মাথা আবার ছোট, আমার মাথা ছিল ২১ ইঞ্চি। মাথায় বড়ো বড়ো চুল ছিল আমার, ফলে আরও আধ ইঞ্চি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো সাড়ে একুশ ইঞ্চি। আর চেয়েছিলাম পাতলা কাপড়ের ওপর সেটিং-করা চুল, যার ওপর দিয়ে বেশ হাওয়া খেলে। কিন্তু সেসব কি আর একদিনের মধ্যে হওয়া সম্ভব?

বৃদ্ধ বড়ো মিঞা বললেন—আপনি যান, ইদু যাবে'খন জিনিসপত্র নিয়ে।

এলাম থিয়েটারে। যথাসময়ে ইদু মিঞা এলো। যত্ন আত্তি করে নিপুণভাবেই সে-সব দাড়ি-টাড়ি বেঁধে দিলে। পোশাক-আশাক পরে পূর্ণ রূপসজ্জা নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে দেখা, এই হচ্ছে আমার নিয়ম। বরাবরই দেখেছি, রূপসজ্জার পর আয়নায় নিজেকে দেখে যদি ভালো লাগে, তাহলে অভিনয় সম্বন্ধে আর ভাবতে হয় না, লোকে আমাকে নেবেই। সারাটি জীবন আমার ছিল ঐ ধরন। আর তা না হলে এমন খুঁতখুঁতি থাকে যে ধীর ও প্রসন্ন মনে অভিনয় করতে পারি না। এবারেও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ইদু তার যথাসাধ্য করেছে, কিন্তু মন আমার খুশী হলো না। সোজাসুজি প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম—সাজাহান ত চাপালেন, একবাড়ি বিক্রি,

এদিকে সাজা আমার পচ্ছন্দ হয়নি। একটা কথা ঠিক করে বলুন দেখি, সাজাহান কি বরাবর আমায় করতে হবে? তাহলে সাজবার ব্যাপারটা মনের মতো করে নেই।

উনি বললেন—নিশ্চয়। সাজাহান তোমাকেই করে যেতে হবে।

বললাম—তাহলে দয়া করে একটা হুকুম করিয়ে দিন দেখি। ইন্দুর সঙ্গে একটা মাসকাবারী বন্দোবস্ত করিয়ে দিন। ওর কাজ থাকুক বা না থাকুক, অভিনয়ের দিন ও যেন ঠিক আসে ওর জিনিসপত্র নিয়ে। এই দেখুন না? বাঁধা দাড়ি দিয়ে নামতে হচ্ছে, যা আমি কোনকালে পছন্দ করি না। ক্রেপের ব্যবস্থা করা গেল না।

বুঝলেন প্রবোধবাবু। স্থির হলো, কালই বিজয় মুখুজ্যে গিয়ে বারির সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে আসবে।

অভিনয়কাল ক্রমশ সমাসন্ন হয়ে এলো। দুরু দুরু বুক নিয়ে, ঠাকুর-প্রণাম ও পীঠবন্দনা সেরে সিনে ঢুকলাম গিয়ে। সাজবার ব্যাপার নিয়ে মনটা ভালো নেই, তার ওপরে করতে যাচ্ছি "নতুন রকমের এক সাজাহান,"—কে জানে কী হবে।

এইখানে আরও একটি কথা বলে রাখি।

সেই যে বুধবার, হাবলুকে নিয়ে স্টেজে মহলা দিয়ে নিয়েছিলাম, সেদিন হাবলুকে বলে দিয়েছিলাম, একটা কথা। বলেছিলাম, হাবলু সাজাহানের "দেই লাফ—দেবো লাফ"—কথাগুলো যেখানে আছে, সেই দৃশ্যটি বাদ দিয়ে দাও। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য। সেই আরম্ভ হচ্ছে, আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা! আর কি বাকী আছে?

ও অবাক হয়ে বললে—সে কী! ওটা ভাল সিন। প্রিয়নাথদা ওটা করতেন খুব ভালো। ওটা আপনি বাদ দিচ্ছেন কেন?

বললাম—দেখ, ও সিনটা আমি অ্যামেচারে বহুবার করেছি। কথাগুলো মুখস্থও আছে। তার জন্য নয়। আমি বিবেচনা করে দেখেছি, ওটা একই রসের পুনরাবৃত্তি। সেই ক্ষোভ, মর্মবেদনা আর উন্মাদনার দৃশ্য। উন্মাদ দৃশ্য পরে যেটা আছে, সেই পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে, "দে বেটারা খুব দে"—সেই যে ঝড় কালের দৃশ্য, সেটাই সব থেকে ভালো, সেটা রেখে এটা কেটে দাও। ওটা দর্শকের কাছে একঘেয়ে লাগবে।

হাবুল একটুক্ষণ থেমে থেকে ভাবল ব্যাপারটা। তারপরে বললে—বাদ দেবেন? যদি প্রোগ্রামে ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে—

বললাম—কালই খোঁজ নাও, ছাপা যদি না হয়ে থাকে, ত ওটা কেটে দিয়ে এসো।

ও' তাই করেছিল। প্রোগ্রামে ও'সিনটার উল্লেখ ছিল না।

যাই হোক, শুরু ত হল অভিনয়, একবাড়ি বিক্রি, লোকে লোকারণ্য, যেরকম ভাবে হাততালি পড়তে লাগল, তাতে ত মনে হলো, দর্শক আমায় নিয়েছে। বিশেষ করে, প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে, সেটা

কিনা অঙ্কের ড্রপের সিন, ঐ যে যেখানে মহম্মদ এসেছে পিতৃ-আজ্ঞায় পিতামহকে বন্দী করতে,সেই দৃশ্যের শেষে যখন আমি বললাম—"খধূপের মতো একটা বিরাট জলায় উর্ধ্বে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি", তখন সারা বাড়ি একেবারে প্রচণ্ড হাততালির শব্দে যেন ভেঙে পড়ল। দর্শক উৎগ্রীব হয়ে এসেছিলেন 'সাজাহান' দেখতে, বহুদিনের বহু সুখ্যাতি অর্জন করা এই 'সাজাহান'। আর্ট থিয়েটারে অভিনয়, তার ওপরে যে কম্বিনেশনে অভিনয়টা হচ্ছে!

যাই হোক, প্রথম অঙ্কে এভাবে সাড়া পাবার দরুন, অন্তরে উৎসাহ যেন দ্বিগুণ করে ফিরে পেলাম। বুঝলাম, লোকে আমাকে নিয়েছে। প্রথম প্রথম চুল আর দাড়ি নিয়ে খুঁতখুত থাকলেও, এরপর আর রইল না, সেসব গেলাম ভুলে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে একটা অসুবিধা অবশ্য অনুভব করেছিলাম। ঐ 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত' ভাব দেখানোর জন্যই অসুবিধাটা হলো। সাজাহান যখন দারাকে তাঁর পাঞ্জা দিয়ে আজ্ঞা করলেন রাজ্য শাসন করতে, তখন দারা নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাবার পরই সাজাহান প্রস্থান করলেন। এবং তারপরে দৃশ্যটিতে প্রবেশ করল নাদিরা আর সিপার। দারা, জাহানারা ও তাদের কিছু কথাবার্তা। তারপরে দারাও চলে গেল, ওরাও চলে গেল, সিনে রইল জাহানারা। সেই সময় সাজাহানের আবার 'প্রবেশ' আছে—'দারা চলে গেছে জাহানারা?'

তারপরে, 'তুইও এর মধ্যে কন্যা' ইত্যাদি সংলাপ আছে সাজাহানের। কিন্তু এই যে দৃশ্যের মধ্যে প্রবেশ ও প্রস্থান, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থার জন্য এতে বড়ো কষ্ট হলো, অসুবিধাও হলো। তাই দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকে ও অংশটা এডিট করা হয়েছিল। নাদিরা-সিপার আর ঢুকবে না, প্রোগ্রাম থেকেও ওদের ও' দৃশ্যে আবির্ভাবের উল্লেখ বাদ দেওয়া হলো। আমি বসেই থাকব, দারা অভিবাদন করে প্রস্থান করবেন, এবং আমিও কন্যার দিকে ফিরে শুরু করব—'তুইও এর মধ্যে?"

এইভাবেই অভিনয় করে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছিলাম, দৃশ্যটিও 'কমপ্যাক্ট' হলো। শুধু 'কমপ্যাক্ট'ই নয়, 'এফেক্টিভও' হয়েছিল।

কিন্তু বলছিলাম প্রথম অভিনয়-রজনীর কথা। অভিনয়ে আর কোনো অসুবিধা অনুভব করিনি। কেবল শেষ দৃশ্যে যখন দানীবাবু 'ঔরংজীব'রূপে পিতার কাছে ক্ষমা চাইতে এসে পায়ের উপর পড়লেন, তখন ভিতরে-ভিতরে এমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম যে বলার নয়! এদিকে দানীবাবু এক পুত্র, অন্যদিকে তিনকড়িদা দারা সেজেছেন, উনি এক পুত্র। তার ওপরে আবার কন্যারূপিণী কুসুমকুমারী! বয়সের দিক থেকে মনে হলো, আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি।

যাই হোক, দর্শক খুব নিলে আমাকে, এটা বুঝলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে দারার ভূমিকায় তিনকড়িদা যে খুব ভালো করবেন, আমাদের সবার আশা থাকা সত্ত্বেও উনি সেদিন কেন যে সুবিধা করতে পারলেন না, আমরা বুঝতে পারলাম না। উপরন্তু শেষের দিকে দর্শকদল ওঁকে বিদ্রূপ করে উঠতে লাগল। একটা জায়গায় অবশ্য সত্যি সত্যিই উনি ভুল করে ফেললেন। দিলদারের সঙ্গে দারার সেই যে দৃশ্যটি আছে, চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য। সেই দৃশ্যে দারা-রূপে

তিনকড়িদা কেঁদে ফেলেছিলেন। দারাও দার্শনিক, দারাও বীর, দিলদারের সামনে তার কান্নাটা দর্শক গ্রহণ করতে পারল না।

তিনকড়িদা স্থদক্ষ অভিনেতা, সেদিন তাঁর কী যে হলো! আমাদের সবারই খুব দুঃখ হলো। তিনকড়িদা নিজেও কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। আর উনি 'দারা' করবেন না, এও জানিয়ে দিলেন। আমরা বললাম—তা' কি হয়? ও কি কথা?

আমাদের অনুরোধে তার পরেও উনি নেমেছিলেন, এবং 'দারা'র অভিনয় যথেষ্ট সংশোধন করে নিয়েই নেমেছিলেন, কিন্তু তবু কী যে হলো, দর্শক ওঁকে তেমন নিলো না। উনিও 'দারা' ছেড়ে দিলেন। পরে, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত করতে লাগল ঐ পার্ট।

প্রথম অভিনয়ের রাত্রি, এ' ক্রটিটুকু ছাড়া আর সবই ভালো হয়েছিল। সবাই সুখ্যাতি করছে আমাকে, সবাই ভালো বলছে, এর মধ্যে দেখি, হরিদাসবাবু যেমন প্রতি অভিনয়-শেষে ভেতরে আসেন, তেমনি আসছেন। পরের ব্যাপারে উদার হলেও নিজের জিনিসে উনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে বললাম—আমার কেমন হলো? হাসতে হাসতে উনি বললেন—ভালো যে করেছেন, তাতো নিজেই বুঝতে পারছেন। এখন আমার রাখালদা কী বলেন, কে জানে! মনটা দমে গেল। রাখালদা বিরাট ঐতিহাসিক, 'পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান'কে তিনি সমর্থন করবেন কিনা কে জানে! না জানি এবার তিনি কী লিখে বসেন!

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। সব আনন্দ যেন মুহূর্তে নিভে গিয়েছিল। এমন সময়ও আর নেই যে ইমপীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে বইগুলো দেখে আসি। কাজে কাজেই আমি করলাম কী, পরদিন সেন ব্রাদার্সের দোকান থেকে চার ভলুম মানুচির বই একেবারে কিনেই নিয়ে এলাম। এছাড়া, 'বার্ণিয়ের'-এর বই 'Bernier's Travels in the Moghul Empire" খানা আমার কাছে আগেইছিল। ভালো করে পড়তে আরম্ভ করে দিলাম এসব বই। শনিবার—'কর্ণার্জুন'-এর অভিনয়ের দিন হরিদাস-বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। আমার 'পক্ষাঘাত'-এর সপক্ষে যা সব যুক্তি ও প্রমাণ ছিল, সবই ওঁকে দিলাম।

হরিদাসবাবুকে আমার যুক্তিগুলি দিলাম। তিনি মন দিয়ে সবই শুনলেন, কিন্তু বলে উঠলেন —তা', কথাগুলো ভালোই। তবে যুক্তি থাকে ভালোই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। জিনিসটা ত ভালো হয়েছে? লোককে ত মুগ্ধ করেছেন, আবার কী!

উনি এভাবে ওঁর মন্তব্য প্রকাশ করে গেলেন, কিন্তু মনটা আমার শান্ত হলো না কিছুতেই। আমি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে রইলাম। পরে দেখেছি ও' নিয়ে কেউই কোনোদিন প্রশ্ন করেন নি। অর্থাৎ তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন যে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর কতকগুলি স্বাধীনতা আছে। যে-ভাবের ওপর নাট্যকার চরিত্রটিকে দাঁড় করিয়েছেন সেভাবটা বজায় থাকলেই হলো। ইনি একরকম দেখিয়েছেন, অন্য লোক অন্যভাবে দেখাবেন, ওর আর কী?

কিন্তু আমার জিজ্ঞাসু মন সেদিন অত সহজেই আমাকে রেহাই দেয় নি। কল্পনাকে আশ্রয় করতে পারি, কিন্তু তার ওপরে যদি যুক্তির একটা ছায়াও দেখা যায়, তাতে কতোখানি বেড়ে যায় শিল্পীর মনোবল ? তাই, আমার সব যুক্তিগুলিকে আমার চরিত্র-চিত্রণের ভিত্তি না করে সেদিন ঠিক স্থির হতে পারি নি। এবার বলি, সাজাহানকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেখানোর সপক্ষে যে-সব যুক্তি ছিল, তার সূত্র ছিল এই : প্রথমে মানুচির বই থেকেই তোলা যাক্। তিনি লিখেছেন—

"Shahjahan brought this illness—on himself, for being already an old man of sixty-one, he wanted still to enjoy himself like a youth and with this intent took different stimulating drugs. These brought on a retention of urine for three days, and he was almost at death's door "

(এখানে, তাঁর বয়স যেটা উল্লেখ করা হয়েছে তা' নিয়েই মতভেদ রয়েছে। মানুচির বইখানার যে পৃষ্ঠা থেকে উক্ত উদ্ধৃতিটুকু দেওয়া হয়েছে, সেই পৃষ্ঠার নীচেই বইখানার অনুবাদক ও টিপ্পনীকার উইলিয়ম আরভাইন আই-সি-এস মহাশয় ফুটনোটে মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, যেহেতু সাজাহানের জন্মতারিখ হচ্ছে ১৫ই জানুয়ারী, ১৫৯২, সেই হেতু ঐ সময়, অর্থাৎ ১৬৫৭ সালে তাঁর বয়স হয়েছিল—প্রকৃতপক্ষে—৬৭)।

যাই হোক সাজাহানের উক্ত ধরনের অসুস্থতার কথা বার্নিয়েরও উল্লেখ করেছেন। এবং শুধু তাই নয়, তিনি আবার সাজাহানের ঐ সময়কার বয়স উল্লেখ করেছেন—৭০। তিনি বলেছেন—

"The Mogol, who had passed his seventieth years, was seized with a disorder, the natures of which it were unbecoming to describe : suffice it to state that it was disgraceful to a man of this age, who, instead of wasting, ought to have been careful to preserve the remaining vigour of his constitution."

এলফিনস্টোনও প্রতিধ্বনি ক'রে গেছেন ঐ কথার। এলফিনস্টোন-এর ইতিহাসের ভিত্তি হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহাসিক কাজী খাঁর রচিত ইতিবৃত্ত।

প্রসঙ্গত একথাও বলা যেতে পারে, সাজাহানের লাম্পট্যদোষ-সম্বন্ধে প্রাচীন ঐতিহাসিকরা অনেক কথাই বলে গেছেন। তার সবিস্তার ব্যাখ্যা এখানে অবান্তর, তবে একটি কথা এখানে না বললে প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণাঙ্গ হবে না। সেটি হচ্ছে এই যে, তাঁদের মতে, সাজাহান প্রচুর হাকিমী ওষুধ সেবন করতেন, এবং তার ক্রিয়া হচ্ছে—মূত্ররোধ। এবং ঐ সব করতে করতেই শরীরে ঘটে গিয়েছিল স্নায়বিক বিপর্যয়। একদিকে এই সব প্রাচীনদের সাক্ষ্য, অন্যদিকে, ঐ বিদেশী ঐতিহাসিকদের উক্তি, —'রিটেনশন্ অব ইউরিন'। সাজাহান যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হলেন, এবং সে খবরে তাঁর পুত্রেরা সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন করে তুললেন, ঠিক সেই সময়ে সাজাহানের শারীরিক অবস্থা যে কি ছিল, তা' হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে ঐতিহাসিকদের ঐসব সাক্ষ্য অতীব

প্রয়োজনীয়। 'রিটেনসন অব ইউরিন' বলে যেখানটার কথা ওঁরা বলেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে, যে মূত্রথলি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, তা স্তম্ভিত হয়ে থাকে, এবং তারই ফলে স্নায়ুতে এমন অসাধারণ প্রতিক্রিয়া ঘটে যে, তার ফলে অংশত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। দুটো ব্যাপার হয়। এক, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার দরুণ স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা এবং তারই ফলস্বরূপ ঐ অস্বাভাবিক মূত্ররোধ। দ্বিতীয়ত, উপর্যুপরি এবং অস্বাভাবিক মূত্রস্তম্ভনের জন্য স্নায়বিক বিপর্যয়, আর তার ফলে, আংশিক পক্ষাঘাত। এবং ঐ যে তিনদিনের 'রিটেনশন'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার ফলে উনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন; মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্লাডার র‍্যাপ্চার হয়ে সারা শরীরে বিষ সঞ্চারিত হয়ে সত্যিই মৃত্যু হওয়া সম্ভব হয়ে পড়েছিল। সম্রাট প্রতিদিন প্রাসাদ সম্মুখস্থ 'ঝরুকা'য় বসে প্রজাদের দর্শন দিতেন এই ছিল রীতি। কিন্তু, তিনদিন তিনি তা' করতে পারেন নি বলে, প্রবল গুজব রটে গিয়েছিল এই বলে যে, সম্রাট আর বেঁচে নেই, তিনি মারা গেছেন। তাই, তিনদিন পরে, ঐ অবস্থাতেও যখন তিনি চোখ মেলে মাত্র চাইতে পারছেন, তাঁকে ধরাধরি করে 'ঝরুকা'য় এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে, ঐভাবে বেশ কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি, বলে মন্তব্য করে গেছেন ঐতিহাসিকেরা। তবে, এর মধ্যে একটা কথা আছে। কতদিন ধরে এভাবে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার বিবরণ তেমন অবশ্য খুঁজে পাইনি। কিন্তু তাহলেও, আমার পক্ষে, চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট ছিল বলে মনে করি।

এই যে সব প্রমাণ আর যুক্তি, এ-ই রইল হয়ে আমার বল-স্বরূপ। আর, অভিনয়ের দিক থেকে যে-সব অসুবিধা অনুভব করেছিলাম, দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তা দূর হলো দাড়ি-চুল, যা নিয়ে আমার খুঁতখুঁতির অন্ত ছিল না, তা' সবই ঠিক হয়ে গেল, ইদু মিঞাও আসতে লাগল নিয়মিত। পোশাকও মনের মত করে তৈরি করিয়ে নিলাম। দু' রকমের পোশাক পরতাম 'সাজাহান'-এ। প্রথম দৃশ্যে গয়না-গাঁটি যথেষ্ট ছিল। ছিল অরগ্যাণ্ডির মোগলাই কাবা, তার নীচে একটি বেনারসী ব্রোকেডের জ্যাকেটের মতো, সেটা ছিল—লাল। পা'জামা যেটা পরতাম, সেটাও ছিল লাল। ওপরের কাবাটা ছিল সাদা। বন্দী হবার দৃশ্যে—জ্যাকেট-টা খুলে রাখতাম—তার বদলে পরতাম আরেকটা জ্যাকেট—শাটিনের তৈরী। সেটা ছিল ক্রীম কালারের। আর, শেষের দিকে পরতাম অন্য পোশাক। ভেলভেটের কাবা—ফার-বসানো। রঙ্টা ছিল যাকে বলে—রাসেট কালার—চকোলেট নয়—গোল্ডেন ব্রাউন বলতে পারি। কালো ফার দেওয়া থাকত, আর বাঁধবার জায়গায় ছিল সোনালী ঘুন্টি দেওয়া টাসেল। চারটে টাসেল ছিল, বুকের পাশে ঝুলে থাকত। কোমরবন্ধ ছিল ঐ ভেলভেটেরই, তারও চারটে টাসেল ঝুলত। পা'জামা তখন পরতাম সাদা। কাবাটা বেশ লম্বা ছিল বলে, পাজামার নীচেকার একটু অংশমাত্র দেখা যেতো। পোশাকটিতে এ ছাড়া আর কোনো জাঁকজমক ছিল না।

তারপরে দ্বিতীয় রাত্রি থেকে অভিনয়ও শুরু করা গেল সগৌরবে, দিনও যেতে লাগল কিন্তু কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমাদের রাখালদা কোথাও কোনো সমালোচনা করেন নি। তাঁর সমালোচনার অর্থই ছিল বিদ্রূপ বাক্য, তা' এবার তিনি সমালোচনা না করে বিরাট স্বীকৃতি দিলেন আমাদের 'সাজাহান'-এর, একথা মনে করতে দোষ নেই।

প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলে রাখি। সেই যে' ২৪ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে গত '৫৭ সাল পর্যন্ত যতদিন আমি থিয়েটার করেছি, কতবার কতো থিয়েটারে যে সাজাহান করেছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু ঐ আংশিক পক্ষাঘাত দেখাতে কোনোদিন কোনো ভ্রম হয়নি আমার।

যাই হোক, দ্বিতীয় রাত্রি থেকে জাহানারার পার্ট বদলে গেল। কুসুমকুমারী পার্টটিতে তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। তাঁর বদলে 'জাহানারা' করতে যিনি এলেন, তিনি মনোমোহনে 'জাহানারা' অনেকবার করেছেন, অন্য বহুরকম পার্টও করেছেন। এমনিতে সুন্দরী, কিন্তু, একটু মোটা। এঁর নাম—রানীসুন্দরী। (অমর দত্তের ক্লাসিকে যে রানীসুন্দরী করতেন, ইনি তিনি নন।)

দুর্গাদাস আসবে, মহম্মদ করবে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এ সপ্তাহেও সে এলো না, সে তখনো সুস্থ হয়নি। ভাবা গিয়েছিল, এ সপ্তাহের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠবে, কাজে আসবে, কিন্তু তা আর হলো না। কর্তৃপক্ষ দেখলাম এতে একটু অসন্তুষ্টও হয়েছেন ওর ওপরে।

মনোমোহন থেকে আরও কয়েকটি অভিনেত্রী এসেছিলেন আমাদের থিয়েটারে। যেমন, আশালতা। এ করেছিল জহরৎ। প্রথম রাত্রি থেকেই জহরৎ করছে। আর এসেছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুই বোন, নাচের দলে। ব্যালে গার্ল আরও এসেছিল। নাচের দিক থেকেই আর্ট থিয়েটার ছিল এযাবৎ কমজোরী, এরা নাচে ছিল সুদক্ষা, তাই নাচের দল এবার সবিশেষ পুষ্টিলাভ করল। অর্থাৎ দ্বিতীয় রজনী থেকে সগৌরবে চলতে লাগল—"সাজাহান।"

তিনকড়িদার কথা আগেই বলেছি, তিনি কয়েক রাত্রি করেই ছেড়ে দিলেন 'দারা'। তাঁর পরে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত করতে লাগল, কিন্তু কাগজগুলি তখনো লিখলে—কোনো ইম্প্রুভমেণ্ট হয়নি।

'সাজাহান'-বইটার ব্যাপারে বরাবর একটা জিনিস লক্ষ্য করে এসেছি, সেই চব্বিশ সাল থেকে একেবারে সাতান্ন সাল পর্যন্ত, দীর্ঘকাল কতো থিয়েটার কতোবার করেছে, কতো কম্বিনেশনই না হয়েছে, কিন্তু সবার অভিনয় নিখুঁতভাবে এতে কখনো হয়নি। আর্ট থিয়েটারে আমরা কতো-কতো বই করেছি, সব চরিত্রই নিখুঁতভাবে হয়েছে কিন্তু 'সাজাহান'-এ ঐ গোটা তিন চার বা যে-কোনো পাঁচটি চরিত্র ছাড়া আর কোন চরিত্রই তেমন দেদীপ্যমান হয়ে চোখে লাগবার মতো হতো না।

এর পরে শুরু হলো পত্র-পত্রিকার সমালোচনা। এক-একটি পত্রিকা দুবার-তিনবার করে সমালোচনা করেছে। পত্র-পত্রিকার সেদিনকার সব মন্তব্য কিছু কিছু তুলে সেই যুগের সৌরভ আঘ্রাণ করা যাক। আমি সুখ্যাতিই পেয়েছিলাম, কিন্তু কিভাবে তাঁরা সব সেকালে লিখতেন তার নমুনা

দেখানোর জন্য কিছু কিছু তুলে দিই। বেঙ্গলী ৫ঠা নভেম্বর, ১৯২৪ সালে আমার চরিত্রাঙ্কনকে "স্প্লেণ্ডিড পোর্টেয়াল" আখ্যা দিয়ে লিখেছেন—

"His Interpretation of the old emperor is absolutely tine to life and this must have met a lot of original research and study on the part of that gifted actor. I am certain I cannot be accused of exaggeration when I say that had Shahjehan himself been alive today, he would have been startled at the wonderful impersonation of Mr. Chowdhury and grave doubts would have assailed him as to his identity. He must have paused to think if he was Shahjehan or Mr. Chowdhury's creation of his real self. Nobody could possibly believe that Mr. Chowdhury was a young man, still on the right side of thirty for his mannerism, his mannerism, his utterances, his gait, his expressions (which spoke louder than any words now), his whole body were than of a man much more advanced in years".

ঐ 'বেঙ্গলী' আবারও লিখছেন ১৫ই নভেম্বর তারিখে আমার সম্বন্ধে—

"Was the life-like and never to be forgotten personation of Shahjehan by that gifted and versatile actor."

আরও আছে—

"Beaten all his previous records"—"left no room for improvement."

তারপরে নির্মলেন্দু-সম্পর্কেও লিখছে—

"With his easy and natural gait of movement and speech was a great success".

২৩শে নভেম্বর "ফরোয়ার্ড" কাগজ বিরাট রিভিউ লিখেছেন। আমার সম্বন্ধে তাঁরা যেসব লিখেছেন, তার থেকে একটা অংশ তুলছি এই জন্য যে, এর মধ্যে অভিনয়ের একটা জায়গার একটা বর্ণনাও আছে উৎসুক পাঠকের ভালো লাগতে পারে :

"He gave a new life to this role. When in the pangs of despair at the succession of misfortunes Ahindrababu was snatching the roles off his person, it really reminded us of Lear—"Pray undo this button, Kent !"

ইংলিশম্যান লিখছেন ৬ই ডিসেম্বর আমার সম্বন্ধে—

"Magnificent", "remarkably brilliant and natural", Danibabu···well done". Nibhanani's as Mahamaya was superb. Ascharyamayee's Piyara "excellent" etc.

বসুমতী লিখছেন ১৮ই নভেম্বর :—'প্রতিভাবান অভিনেতা অহীন্দ্রনাথ বয়সে নবীন হইয়াও সাজাহান চরিত্রের সার্থকতা যেভাবে রঙ্গমঞ্চে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা বাঙলার রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাজাহানের চরিত্রচিত্রের ভাবাভিব্যক্তিতে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বস্তুতই মুগ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ, শীর্ণ, রোগাশোকাকীর্ণ সম্রাট সাজাহানের একাধারে স্নেহপ্রবণ অথবা বাদশাহের মর্যাদাগর্ব দীপ্ত হৃদয়ের পরস্পরবিরোধী ঘাত প্রতিঘাত উদ্গত রস-বৈচিত্র্যের সুনিপুণ সমাবেশে অহীন্দ্রনাথ সাজাহান চরিত্রের অভিনয়ে এক প্রাণোন্মাদকর সম্পূর্ণ অভিনব অবস্থা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। আশ্চর্য, অপূর্ব সে অভিনয়।'

'শিশির' লিখলেন ১৫ই নভেম্বর—দানীবাবু সম্বন্ধে : ঔরংজীব চরিত্রে অনেকরকম ভাবের সমাবেশ থাকার দরুন এই অংশের অভিনয়ই দর্শককে আকৃষ্ট করে। একমাত্র দানীবাবুই আজ পর্যন্ত এই উৎকট চরিত্রের অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দারার মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্বাক্ষর করা ও আদেশপত্র জিহনকে দেওয়ার দৃশ্যে যে অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়াছি, তাহার তুলনা হয় না।"

আমার সম্বন্ধে : উত্তম বলিলে সম্পূর্ণ বলা হয় না, অপূর্ব, আশ্চর্য। প্রিয়নাথবাবু 'সাজাহান' চরিত্র অভিনয় করিয়া যশঃলাভ করিয়াছিলেন, সেইটি আজও আমরা ভুলি নাই—কিন্তু এখন যাহা দেখিলাম তাহার তুলনা নাই, একেবারে অতুলনীয়। সাজাহান পঙ্গু, স্থবির, বৃদ্ধ, লোলচর্ম, পলিত কেশ, কিন্তু সাজাহান—সম্রাট—ভারতের ঈশ্বর—এই ভাবটি অহীন্দ্রবাবুর পূর্বে কোনদিনই সাজাহানে ফুটে নাই। অহীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন, তাঁহার দেহের ডানদিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু, অচল, স্থির, হৃদয়খানি একদিকে অপত্যস্নেহে ভরপুর, আবার অন্যদিকে অতীত-গৌরবে সম্রাট-গর্বে ভরিয়া আছে।"

নির্মলেন্দু সম্বন্ধে বলেছেন—"দিলদার চরিত্রের গূঢ় রহস্যটি ধরিতে পারিয়াছেন। দিলদার-অংশের এমন সুন্দর অভিনয় দেখি নাই।"

আত্মসুখ্যাতি প্রসঙ্গত লিখে গেলাম কিছু কিছু, কিন্তু এর একটা কারণ আছে। থিয়েটারে এটাই আমার হলো যাকে বলে—গ্রাজুয়েশন। অর্থাৎ, আমি আজ রঙ্গমঞ্চের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয়ে বি. এ, পাশ করলাম। আমার এই কালটাকে ত বোঝাতে হবে।

'সাজাহান' চরিত্রে আমার কন্‌সেপ্‌শন বা ধারণা যা ছিল, তা এখানে একটু বলি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে সাজাহানকে যা দেখিয়েছেন, তা সমালোচকের পক্ষে এবং চরিত্রাভিনেতার পক্ষে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বলে আমি মনে করি। সেই যে প্রথম দৃশ্যে, যখন জাহানারা তিরস্কার করে বলছে—পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে। তখন সাজাহান বললেন—'আমার হৃদয় এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করব কোন্ প্রাণে জাহানারা?'

তারপর শেষ দৃশ্যে, জাহানারা যখন ক্ষোভের সঙ্গে বলছে—উত্তম অভিনয় ঔরংজেব!

তখনো ক্ষমা করেছেন তিনি, বলেছেন—'কথা কস্‌নে জাহানারা। পুত্র আমার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমাভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি?'

আমার কথা হচ্ছে, এই যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের জন্য সাজাহান-চরিত্রে অনর্গল স্নেহরস বইয়ে দিয়েছেন নাট্যকার, এর স্বরূপটা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতার থেকেও অনেক বড়। অপত্য-স্নেহের উৎসারণ তাঁর অন্য বইতেও আছে, কিন্তু এই বইতে যেন নাট্যকার তাঁর হৃদয়-রস নিংড়ে দিয়ে গেছেন। এক-একবার রাগ আসছে, একবার দৃপ্তভাব, একবার দম্ভ, একবার ক্ষোদোক্তি, কত ভাবেরই না আসা-যাওয়া! কিন্তু, তার মনে যখন জেগে ওঠে সুকোমল পুত্রস্নেহ, তখন—দারা-সুজা-ঔরংজেব—যার জন্যই হোক—সে-সব ভাব যেন বন্যার স্রোতের মুখে তৃণের মত ভেসে যায়! এমন কি, দারার যে হত্যাকারী, সেই ঔরংজীবকে যখন ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে বলতে গেলেন—

—ঔরংজেব!

কিন্তু, পরক্ষণেই, তার কাঁধে হাত দিয়ে নিজের বুকে তার মাথাটি রেখে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে উঠলেন—'না-না—সে-সব কথা আমি মনে করব না! মনে করব না! ঔরংজেব, তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।'

এই যে তাঁর অর্ধোন্মাদ অবস্থা—এই রাগ—এই দম্ভ—এই ক্ষোভ—আবার এই দুর্নিবার স্নেহে ভেসে যাওয়া!—এই-ই ত নাট্যকারের পরিকল্পনা। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা তাঁকে অনেকভাবে বর্ণনা করে গেছেন। উদার-সাহসী-বীর-বিদ্রোহী সম্রাট শিল্পী-কবি-প্রেমিক-ইন্দ্রিয় বিলাসী, আবার স্নেহের সাগর! এ যেন মণিমাণিক্যের মত অনেক পল্ তোলা—এক-একরকম আলোর জ্যোতি এক-একসময় ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! বিপরীতধর্মী এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব—লাম্পট্য ও প্রেম। তাঁর সম্ভোগের ছবি যা পুরাতন ঐতিহাসিকেরা এঁকে গেছেন, তাঁর তুলনা মোগল যুগেও নেই। এক জায়গায় মানুচি লিখেছেন—

"Not satisfied with so many inventions for his inordinate desires he also permitted great liberty to public women, of whom the quarter were dancers and singers."

তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত একটি কাহিনী শোনা যায়। এক উজীর এসে সম্রাটকে একদিন বলছেন—সম্রাট, হারামেই ত রয়েছে বহু সুন্দরীর মেলা, বাজার থেকে আর স্ত্রীলোক নিয়ে আসা কেন, প্রাসাদ-অলিন্দে?

উত্তরে একটু ভেবে সাজাহান বললেন—উজীর, তুমিও যা, তুমি ত খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বললে না। "মিঠাই নেক হরদুকান কি বেশদ"—মেঠাই মাত্রই ভালো তা সে যে-কোনো দোকান থেকেই আনা যাক না কেন!

লজ্জায় উজীরের মাথা হেঁট।

লজ্জায় মাথা হেঁট আমাদেরও, আমরা, যারা সেই সব বিবরণ পড়ছি। ভাবছি—সম্রাটের এ কী রূপ? রূপ যাই থাক আমার মনে হয়, সাজাহান প্রেমকে অতি পবিত্র স্থান দিয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ে। সে

যে আলাদা জিনিস, হৃদয়ের কন্দর-মন্দির মধ্যে রাখতে হয় সেই প্রেমকে। আর, অন্য যে-সব ব্যাপার, সে-সব হচ্ছে নিছক দেহের ক্ষুধা—লালসা। দুটির মধ্যে নারীর স্থান রয়েছে বটে, কিন্তু দুইটি ভিন্ন জগতের, নইলে, মমতাজ-স্মৃতি-বিজড়িত তাজমহলের সৃষ্টি হবে কেন? তাজমহল ত এক দাম্ভিক সম্রাটের মদগর্ব ঐশ্বর্যের প্রতীক নয়—তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস! পূর্ণিমার রাত্রে তাজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে মন যেন মৌন বিস্ময়ে আপনিই এক করুণভাবে ভরে আসে! চোখও আসে সজল হয়ে। ভেবে অবাক হই, এত করুণ রূপ নেয় কেন এই তাজ? তাই ত বলি, হে সম্রাট কবি, তুমি চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেলে। ছড়িয়ে রয়েছে তোমার ব্যক্তিত্বের কত না বিভিন্ন রূপ! তোমার যুগেও, কোন্‌টা তোমার যে আসল রূপ, তা কেউ ধরতে পারেনি। আজ তেমনি তিনশ বছর পরে আমরাও পারছি না—তুমি সত্যিই দুর্জ্ঞেয়!

এগার

১৯২৪—১৯২৫

'সাজাহান' ত এভাবে চলতে লাগল। আমার মনে হয়, কৃষ্ণভামিনী ও দুর্গাদাস যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত আর 'সাজাহান'-এ যদি ভূমিকা গ্রহণ করত, তাহলে 'সাজাহান' বই আরও ভালো হতো। এবং শুধু ওরা দুজন কেন, স্টারে যদি আবার এই সময় ফিরে আসতেন রাধিকানন্দবাবু, তাহলে ত আর কথাই ছিল না! 'দারা' তিনকড়িদা ছেড়ে দেবার ঠিক পরেই নির্মলেন্দু দুরাত্রি 'দারা' করেছিল, এবং বেশ ভালোই হয়েছিল সে দারা, কিন্তু তাহলে 'দিলদার' করবে কে? নির্মলেন্দুর জায়গায় প্রফুল্ল সেনগুপ্ত দিলদার করলে বটে, কিন্তু নির্মলেন্দুর 'দিলদার' ঠিক যে রূপটি নিয়েছিল, সেটি আর পাওয়া যায় না ওর কাছ থেকে? নির্মলেন্দু 'দিলদারে' দু'দিন না নামায়, একটা প্রচণ্ড অভাব অনুভব করা গিয়েছিল নাটকে। অগত্যা প্রফুল্ল গেল 'দারা'য়, নির্মলেন্দু আবার 'দিলদার'। তখন এক একবার মনে হচ্ছিল, তিনকড়িদা 'দিলদার' করলে কেমন হতো? কিন্তু 'দারার' পর এমন ভগ্নমনোরথ হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে, এ-বইতে আর কোনো ভূমিকাই তিনি নিতে চাইলেন না। আর করতে পারতেন অপরেশচন্দ্র। তিনি পুরানো মিনার্ভায় বহুবার করেও ছিলেন 'দিলদার'। কিন্তু তিনি নামলেন না এ-বইতে, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যই এর কারণ। অবশ্য একথাও ঠিক, 'দিলদার'রূপে নির্মলেন্দু যে সাফল্য অর্জন করেছে, তাতে ক'রে 'দিলদার' থেকে তাকে সরিয়ে আনা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

বলছিলাম রাধিকানন্দবাবুর কথা। মডার্ন থিয়েটার থেকে উনি সদলবলে চলে আসবার পর ঐ আলফ্রেড মঞ্চেই তখনকার সুবিখ্যাত শৌখীন সংস্থা—বৌবাজারের 'আনন্দ-পরিষদ' দল ওঁকে বাদ দিয়ে

অহীন্দ্র চৌধুরী (যৌবনে)

রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

'রাজা ও রাণী' নাটকে
কুমার সেন ও ইলা
অহীন্দ্র চৌধুরী ও নীহারবালা

'প্রফুল্ল নাটকে' রমেশ
অহীন্দ্র চৌধুরী

খুলে ছিলেন নবীন সেনের কাব্য "রৈবতক"-এর নাট্যরূপ। এটা হয়েছিল ঐ চব্বিশ সালেরই আগস্টের শেষাশেষি কোনো সময়ে। এই 'আনন্দ-পরিষদ' তখন 'প্রফেশনাল'রূপে 'রৈবতক' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও শৌখীন সংস্থা হিসাবে এরা নাম করেছিলেন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ প্রযোজনা করে। এবং সেইসব নাটক ওঁরা এত যত্নের সঙ্গে, আর নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করতেন যে, প্রশংসা না করে উপায় নাই। পরিবেশ-রচনায় বাস্তবানুগ হবার খুবই চেষ্টা করতেন এঁরা, আর তাতে কৃতকার্যও হয়েছিলেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এঁরা সেযুগে যেরকম মনোযোগ দিতেন, তাতে দর্শকদল অবাক হয়ে যেতেন। চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি নাটকই তখন করেছেন এঁরা। এঁদের কেন্দ্রমণি যিনি ছিলেন, তাঁর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র। 'রৈবতকে' বাসুকীর ভূমিকা ইনি করেছিলেন, এবং খুব ভালোই করেছিলেন বলে শুনেছি। 'দেখতে যাব দেখতে যাব করছি, এর মধ্যে, দুটি সপ্তাহ যেতে-না-যেতে দেখি আলফ্রেড্ মঞ্চে মিনার্ভার পোস্টার পড়ে গেছে!

চম্‌কে উঠলাম। কে কী! কী হলো 'আনন্দপরিষদ'-পরিচালিত 'মডার্ন থিয়েটারের'? শুনলাম, বন্ধ হয়ে গেছে, 'রৈবতক' লোকে নিলো না। মনে দুঃখ হল। এঁরা 'কর্ণার্জুন'-এর জনপ্রিয়তা আর 'সীতা'র সাফল্য দেখেই সম্ভবত অনুপ্রাণিত হয়ে পৌরাণিক নাটক ধরেছিলেন। কিন্তু তা না করে, যদি তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধারার অনুসরণ করে শরৎচন্দ্রের নাটকগুলিই তখন সাধারণ পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরতেন, তাহলে, সৃষ্টি করতে পারতেন এক ইতিহাস! এবং জনপ্রিয়তাও যে আসত না, একথা জোর করে কে বলতে পারে। তবুও একথা বলব, শরৎচন্দ্রের বই একের পর এক অভিনয় করে এঁরা তখন দেখিয়ে দিলেন যে ওঁর বই দিয়ে নাটমঞ্চ থেকে জনচিত্তকে মুগ্ধ করা যেতে পারে। অবশ্য, এটাও ঠিক কথা, এঁদেরও আগে এই স্টার থিয়েটারেই ১৯১৮ সালে গিরিমোহন মল্লিক মশাই লেসি হয়ে শরৎবাবুর বই প্রথম পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করান। বইখানি হচ্ছে "বিরাজ বৌ"। তারক পালিত সাজতেন—নীলাম্বর, কুসুমকুমারী—বিরাজ, ক্ষেত্রমোহন মিত্র—পীতাম্বর।

ওঁদের বদলে আলফ্রেডে এবার এলেন—মিনার্ভা। নাটকের নাম—'জীবন যুদ্ধ'। রিজিয়া-প্রণেতা মনোমোহন রায়ের বই। ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবল'-এর নাট্যরূপ এটি, স্থান-কাল আর পাত্র শুধু বদলে নিয়েছেন তিনি। যেমন, 'জঁা ভলজা'র নাম হয়েছিল এ'নাটকে—'মেঘনাদ'। এ'-ভূমিকায় নেমেছিলেন কার্তিকচন্দ্র দে। ইন্‌সপেক্টর সেজেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দে। 'বিশপ' এ বইতে হয়েছেন 'পুরোহিত'। নেমেছিলেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। এঁদের সঙ্গে এক নবাগত তরুণকেও চোখে পড়ল, নাম, মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। নাটক খুলেছিল ৯ই সেপ্টেম্বর। সেদিনটি মঙ্গলবার ছিল বলে দেখতে গেলাম আমি আর অপরেশচন্দ্র। যে-ধরনের উৎকৃষ্ট গল্প, সেধরনের জমাটি হয়ে দাঁড়ালো না অভিনয়। বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে ছিলেন কার্তিকবাবু, গলার স্বরও খুব গম্ভীর, সেইজন্যই বোধ হয় ওঁকে দেওয়া হয়েছিল মুখ্য ভূমিকাটি। কিন্তু আমার সেদিন মনে হয়েছিল, পার্টটি ওঁকে ঠিক খাপ খায়নি। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও খুব ভালো হলো না। তবে, অভিনয় ওঁরা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ততদিন রাধিকাবাবু-সম্বন্ধে গুজব রটে গেছে, তিনি নাকি আবার নতুন দল সংগঠন ক'রে নতুন থিয়েটার খুলবার চেষ্টায় রত হয়ে পড়েছেন। এ গুজব এতদূর ছড়ালো যে, কাগজে পর্যন্ত মন্তব্য করে বসল, তিনি এসব দিয়ে শক্তিক্ষয় না করে এই যে এতগুলি থিয়েটার চল্‌ছে, এর একটিতে এসে যোগদান করুন না কেন ?

এর পরের ঘটনা, ৯ই নবেম্বর আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর ১৫০ রাত্রি পূর্ণ হবার স্মারক-উৎসব ও অভিনয়। মিনার্ভায় তখন সপ্তাহে একদিন-দুদিন 'জীবন-যুদ্ধ' চলে, অন্যদিনগুলিতে চলছে পুরানো-পুরানো বই। আর, নাট্যমন্দিরে চলচে 'সীতা'। আমাদের ছোটখাটো পরিবর্তনও হয়েছিল। ঐ রাত্রিতে 'পরশুরাম' করলেন দানীবাবুর ভাগ্নে দুর্গাপ্রসন্ন বসু। দুর্গাদাসের 'বিকর্ণ' করলে রাধাচরণ। কৃষ্ণভামিনীর পদ্মা করলে নিভাননী। আর, নিভাননীর দ্রৌপদী করলে—আশালতা। রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মশাই এদিন এক মনোজ্ঞ অভিভাষণ দিয়েছিলেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৫০ রাত্রি একই ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়ার দরুণ ইন্দু মুখোপাধ্যায় আর নীহারবালা দুটি হীরক অঙ্গুরীয়ক পুরস্কার পেলেন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। আমরাও করে গেছি, তবে আমাদের 'ব্রেক্' হয়ে গেছে, কখনো কেউ ছুটি নিয়েছি, কখনো ভূমিকা বদলে গেছে। যেমন, আমি করেছি কর্ণ, দুর্গাদাস করেছে অর্জুন। শুধু ইন্দু আর নীহার ছাড়া আর সবারই ঐরকম কিছু-না-কিছু ঘটে গিয়েছিল।

তারপর আবার ১২ই নবেম্বর হলো 'ইরাণের রানী'র জুবিলী উৎসব—৫০ রাত্রি চলবার জন্য। এদিন অপরেশবাবুর বদলে 'দাউদশা' করলে তিনকড়িদা। কাজী—দুর্গাদাসের বদলে করলে—রাধাচরণ। গুলরুখ—সুবাসিনীর জায়গায় করলে—নীহারবালা। সুবাসিনী তখন স্টার ছেড়ে দিয়েছে। রানী—কৃষ্ণভামিনীর বদলে করলে নিভাননী। আর, দরবারের নর্তকী—নীহারের যায়গায় যে করলে, তার নাম—তারকবালা (লাইট)। আমাদের সেই 'বৃষকেতু' রূপিণী ছোট্ট মেয়েটিকে মনে পড়ছে কি পাঠকদের ? এ হচ্ছে সে-ই। আর্ট থিয়েটারের আমাদের আগে—অপরেশবাবুর আমলে—স্টারের কী একটা বইতে যেন পটলবাবু (পরেশ বসু) একটা ট্রিকসিন করেছিলেন, যাতে, স্টেজে নির্দিষ্ট করা একটা জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে এসে ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়াতো, আর তার গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে আসতো। স্টেজের এক জায়গায় একটা তার ফিট্ করা থাকত, সেইখানে এসে মেয়েটি দাঁড়ালেই, বিদ্যুতের সাহায্যে ওটা জলে উঠত, এই ব্যবস্থাই করেছিলেন পটলবাবু। আর, এটা করবার জন্য বহুবার রিহার্স্যাল দিয়ে নিতে হতো পটলবাবুকে। ছোট্ট মেয়ে ত, এই এখানে আছে, অমনি ছুটতে ছুটতে আবার খেলাচ্ছলে কোথায় বুঝি চলে' গেল ! সেইজন্য পটলবাবু বলে উঠতেন—এই দেখ, লাইট-মেয়েটা আবার কোথায় গেল।

এই 'লাইট-মেয়ে' 'লাইট-মেয়ে' করতে করতেই তারকবালা 'লাইট' হ'য়ে গিয়েছিল আর কী ! বেশ সুন্দর মেয়েটি—গৌরবর্ণ—বড়ো-বড়ো দুটি চোখ,—কথাগুলি বলতো একটু আধো আধো স্বরে—পরবর্তীকালে বেশ নাম-করা অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিল সে।

যাইহোক, 'ইরাণের রানী'র জুবিলীতে বহু সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পত্রিকাগুলি এতে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁরা লিখেছিলেন—থিয়েটারে গুণী সমাগম হওয়া উচিত। এই সময় থেকেই পত্রিকা-সমালোচকেরা আমার সম্বন্ধে একটা কথা চালু করলেন। 'সার্ভেণ্ট' যা লিখেছিলেন ১৪ই নভেম্বর' ২৪ সালে, তার থেকেই বলি "Great expressionist, carries more by expression than words."—এধরনের কথা অনেক বাঙলা কাগজও বলেছে। কিন্তু থাক এসব কথা। সেদিন বহু জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল থিয়েটারে, অনেকেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে যাঁর নাম স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন, স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নাট্যসমালোচনাই ছিল তাঁর আলোচ্য বিষয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন শেষের দিকে, যখন থিয়েটার দেখবার জন্য দর্শকদল একেবারে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিলেন। এটা বুঝেই তিনি বলেছিলেন, তাঁর ভাষণ তিনি খুব সংক্ষেপেই বলবেন এবং একেবারেই বেশী সময় নেবেন না। কিন্তু দর্শকদল ততক্ষণে এত অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ কেউ তাঁর কথার মধ্যেই প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি করে বসলেন। ফলে, আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি মাঝপথেই থেমে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু যেটুকু তিনি বলেছিলেন তাতেই রসজ্ঞ মন মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি ও গুণীজন সেই সব দর্শকদের ব্যবহারে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বিজলী পত্রিকা ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন—"......বিশেষতঃ যখন দর্শকদের মনোভাব বুঝে শরৎবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই তাঁর বক্তব্য শেষ করবেন। কোনো মানীর অসম্মান করে তাঁকে খাটো করা যায় না, নিজেদেরই খাটো হতে হয়, এই সাদা সত্য কথাটা যেন আমাদের দেশবাসী না ভোলেন।" আমার কিন্তু আজও কানে বাজে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর, তাঁর সেই সুললিত ভাষা যেন আজও ধ্বনি তোলে স্মৃতির নিভৃত প্রকোষ্ঠে। আজকাল নানান জায়গায় কথাপ্রসঙ্গে শুনতে পাই, শরৎচন্দ্র নাকি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না। কথাটা কানে আসে আর মনে মনে হাসি, আমার সেদিনকার সেই স্মৃতি যে কখনই মুছে যাবার কথা নয়!

এই 'ইরাণের রানী' ৫২ রজনী একাদিক্রমে অভিনয় করে শেষ করে দেওয়া হলো ছাব্বিশে নভেম্বর। অবশ্য, কিছুদিন কেটে যাবার পর, আবার এ বইকে মাঝে মাঝে দিতে হতো, বইটি সত্যিই জনপ্রিয় হয়েছিল। বইটি তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, বড়দিনে অনেক নতুন বই দিতে হবে বলে। বড়দিনের প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হলো আটাশে নভেম্বর। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা—রূপকুমারী। অপরেশবাবুর লেখা—বন্দিনী। ক্ষিরোদপ্রসাদের—গোলকুণ্ডা। শরৎচন্দ্রের—পল্লী-সমাজ। আরও দুজন সুদক্ষ শিল্পীও এসে যোগদান করলেন এবার। এঁদের একজন হচ্ছেন প্রাচীন স্টারের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন প্রাচীনা অভিনেত্রী—কুমুদিনী। কতগুলি বিশেষ চরিত্রের অভিনেত্রী হিসাবে কুমুদিনী সুবিখ্যাতা

ছিলেন। যেমন, 'প্রফুল্ল'-র জগমণি। এঁর মতো 'জগমণি' আমরা আর কখনো দেখিনি। 'খাসদখলে' আহ্লাদী ঝি-য়ের ভূমিকাতেও ইনি ছিলেন অতুলনীয়া।

পরের বুধবার, অর্থাৎ, ৩রা ডিসেম্বর—'রূপকুমারী' খুলে গেলো। রূপকথার আকারে এটি একটি স্যাটায়ার। তখন থিয়েটারের সমালোচনা করবার জন্য ভুঁইফোঁড় কতকগুলি পত্রিকা গজিয়ে উঠত, কোনটার আয়ু ছিল একটি সংখ্যা, কতগুলি দু'চার মাস পর্যন্ত চ'লে, ধূপের ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেতো। ঐ সব ভুঁইফোঁড় পত্রিকাগুলিকে কটাক্ষ করেই লেখা হয়েছিল এই ব্যঙ্গ নাটিকা। এর মধ্যে মেয়েদের অংশই ছিল বেশী। কলাবতী সেজেছিল নীহার, রূপকুমারী—নিভাননী। ফিরিওয়ালা ও ফিরিওয়ালী সেজে রাধাচরণ ও ফিরোজবালা (নেনী) গাইতো ডুয়েট গান এবং সেই সব গানের মধ্যেই ছিল সেই সব ব্যঙ্গোক্তি।

'রূপকুমারী' ছোট্ট বই, তাই এর সঙ্গে ছিল অমৃতলাল বসুর "খাসদখল"। আগে "খাসদখল" স্টারেই অভিনীত হয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল ১৯১২ সালে। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'মোহিত', কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর 'ঠাকুরদা', আমাদের কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মাইতি' খুব ভালো হতো বলে শুনেছি। আর ভালো হতো নাকি সুশীলাবালার "গিরিবালা"। আমাদের স্টারে এইবার যে খাসদখল খোলা হলো তাতে মোহিত সাজলে—নির্মলেন্দু, মাইতি—ঐ কাশীনাথবাবুই। ঠাকুর্দা—তিনকড়িদা এবং নিতাই—নরেশবাবু। গিরিবালা—আশ্চর্যময়ী। ("ওগো তোমরা বলো না গো ভাতার কেমন মিষ্টি—গিরিবালা-রূপিণী এই আশ্চর্যময়ীরই আশ্চর্য গান। তবে পুরানো দিনে সুশীলাবালাও গানটি খুব ভালো গাইতেন বলে শোনা যায়)। মোক্ষদা সাজল নীহারবালা, আহ্লাদী—কুমুদিনী, আর লোকনাথ সাজলেন—বহুদিন পরে হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, যিনি ছিলেন আমাদের 'কর্ণার্জুন'-এর যুধিষ্ঠির।

এর পরে, ৫ই ডিসেম্বর খুললেন—অপেরাজাতীয় নাটক—ঋষ্যশৃঙ্গ। এ বইটি অমৃতলাল বসুর আমলে স্টারে অভিনীত হতো, রাজকৃষ্ণ রায় মশাইয়ের লেখা। আমাদের সময়ে, ঋষ্যশৃঙ্গ সাজলে—নীহার, নর্মসখা—কাশীবাবু। 'ঋষ্যশৃঙ্গ'-এর সঙ্গে কর্তৃপক্ষ জুড়ে দিলেন, গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'। নামভূমিকায় অবতরণ করলে নির্মলেন্দু, ভিক্ষু—তিনকড়িদা, সাধক—অপরেশবাবু, পাগলিনী—আশ্চর্যময়ী, চিন্তা—রানী সুন্দরী ইত্যাদি। এই বিল্বমঙ্গলের অভিনয়ের খুবই সুখ্যাতি হয়েছিল।

এর পরের ঘটনা হচ্ছে নাট্যমন্দিরের 'পাষাণী' অভিনয়। ১০ই ডিসেম্বর বইটি খোলা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, ১৯০০ সালে প্রকাশিত। এটি আগে কেউ অভিনয় করেনি, চব্বিশ বছর পরে এই বইটি ধরলেন শিশিরবাবু। এতে দুটি বিপরীত ভাবের ভূমিকায়—ইন্দ্র ও গৌতম—নামলেন—শিশিরবাবু। অভিনয় যাই হোক না কেন, নাটক নিয়ে এমন এক প্রবল ঝড় উঠল যে বলার নয়। এবং এই ঝড়ে অভিনয়ের সৌকুমার্য, প্রযোজনার অভিনবত্ব, সব একবারে যেন ভেসে গেল! নাটক নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল পত্র-পত্রিকায়, সে-ও এক ইতিহাস হয়ে রয়েছে। বইটি ১৯০০ সালে

যখন প্রকাশিত হয়, তখনও হয়েছিল প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা। তার প্রত্যুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর "মন্দ্র" কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন ("মন্দ্র"র প্রকাশকাল ১৯০২ সাল) "বাল্মীকির অহল্যা সুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে ; দেবরাজ কিরূপ, জানিবার জন্য কৌতূহল পরবশ হইয়া ("দেবরাজ কুতূহলাৎ") কামরতা হইয়াছিলেন।" শিশিরবাবু অভিনীত "পাষাণী" নিয়ে যখন বাগবিতণ্ডার সীমা পরিসীমা নেই, তখন নব্য সম্প্রদায়ের কাগজগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ উদ্ধৃতিকে অবলম্বন করে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের সপক্ষ যুক্তিজাল। কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯২৪ সালের বাংলাদেশের সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের কথা। দর্শকসাধারণকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি সে সব যুক্তি। "পাষাণী"-র ২য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য—অহল্যা যেখানে ইন্দ্রর সঙ্গে চলে যেতে চাইছে কোনোনিরালয় দ্বীপে কিংবা পর্বতশৃঙ্গে, কারণ, যদিও মহর্ষি গৌতম নেই আশ্রমে, কিন্তু শিষ্যবর্গ আছে ত ? তাতে অবাধ মিলনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। অহল্যা বললেন—চলো যাই। ইন্দ্র বললেন—চলো।

ওঁরা দুজন যখন চলে যাচ্ছেন, তখন অহল্যার পুত্র শতানন্দ ঘুম থেকে জেগে উঠল 'মা-মা' বলে। ইন্দ্র বালককে ধমক দিলেন। কিন্তু শতানন্দ তাতে নিবৃত্ত হলো না। সে বলতে লাগল—"মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ, সঙ্গে ও কে ?"

ইন্দ্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যাবার সময় ছেলেটা আচ্ছা জ্বালাতনে ফেললে ত ? অহল্যা বললেন—কী করব ? ইন্দ্র বললেন—"ওর কণ্ঠরোধ করো"। বালক তখন ক্ষুধার্ত, মায়ের কাছে খেতে চাইছে। তার উত্তরে অহল্যা "তবে দিতেছি মিটিয়ে চিরজীবনের ক্ষুধা" বলে এগিয়ে গিয়ে শিশুর কণ্ঠরোধ করলেন। ইন্দ্র বললেন—"স্তব্ধ হইয়াছে পাপাত্মা জন্মের তরে। শীঘ্র চলে এসো।"

বলে, ওঁরা দুজন পলায়ন করলেন।

আরও একটি জায়গা আছে। তৃতীয় অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে। যখন ইন্দ্র ভোগতৃষ্ণা মিটিয়ে অহল্যাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন অহল্যা ক্ষিপ্ত হয়ে বলছেন—"নির্মম লম্পট ! যাবে ? এই যাও। স্বর্গপতি —যাও, কিন্তু নহে স্বর্গে ফিরি।

[কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রের স্কন্ধে আমূল আরোপণ]"

সত্যি কথা বলতে কী, এই সব দৃশ্য দর্শক সহ্য করতে পারলেন না। ইংরেজী দৈনিক, বাংলা দৈনিক এবং অন্য সব পত্র-পত্রিকা প্রবল আপত্তি জানালেন। সাধারণ বাঙালী কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন বেশী। তাতে আছে, ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে অহল্যাকে ছলনা করেছিলেন। এর পর, গৌতম যখন ফিরে এলেন আশ্রমে, তখন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অহল্যা জানতে পারলেন, কী সর্বনাশ ঘটে গেছে ! গৌতমও জানতে পারলেন ইন্দ্রের কথা। এবং তখনই দিলেন তিনি অভিশাপ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে পড়ে বাঙালীর ছিল ঐ ধারণা। দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী" বাঙালীর এই ধারণার মূলে করল কুঠারাঘাত। বাল্মীকি-কথিত ঐ যে "অহল্যার" দেবরাজ কুতূহলাৎ

আচরণ, সাধারণ বাঙালী তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, সাধারণ বাঙালী বরাবর অনুসরণ করে আসছেন কৃত্তিবাসকে। এমন কী বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অনেকেই মূল রামায়ণের উপর ঘটনাকে ততটা আমলে আনতেন না। প্রমথনাথ তর্কভূষণ মশাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে ভূমিকা লিখেছেন সেই ভূমিকাটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মত হচ্ছে, বাঙালী কবি কৃত্তিবাস বাঙালীর মনের মতো করে মূল রামায়ণ থেকে ভিন্নতর করে লিখে গেছেন তাঁর রামায়ণ। তর্কভূষণ মশাই লিখেছেন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ হচ্ছে "প্রাচীন বঙ্গীয় হিন্দু জীবনের আদর্শ।" তর্কভূষণ মশাই আরও বলেছেন, "খাঁটি বাঙালী সমাজের ছায়া।"

"পাষাণী" নাটকের সমালোচনার আরও একটা দিক ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল যদি বারাঙ্গনা-জীবন, তার বীভৎসতা এবং তার কুফল-প্রদর্শনই করে থাকেন, ত সমালোচক বলছেন, সেটা তিনি আরও বলিষ্ঠভাবে সামাজিক পটভূমিকায় লিখলেন না কেন? পৌরাণিক পরিবেশে এটা করাতেই তাঁদের যতো আপত্তি। মনে রাখতে হবে, সেটা চব্বিশ সালের বাংলাদেশ, একেবারে আধুনিক যুগ নয়। তখনও সাধারণ গৃহস্থজীবনে রামায়ণের পঠন-পাঠন হয়, তখনো ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী দেশে কম নেই!

যাই হোক, এইসব তর্কাতর্কি শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ালো যে, দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কানে গিয়েও পৌঁছেছিল। তিনি তখন অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করবার জন্য দার্জিলিং-এ ছিলেন। স্বরাজ্য পার্টির কোনো কাজকর্মের ব্যাপারে সেখান থেকে তিনি ডেকে পাঠান ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে। 'ফরোয়ার্ড' ছিল দেশবন্ধু বা স্বরাজ্য পার্টির কাগজ, ঐ কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হেমেন্দ্রবাবু। তিনি হেমেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি নাকি ফরোয়ার্ডে ভাদুড়ীর থিয়েটারের বিরুদ্ধে লিখতে?" (এটি ২৫ সালের ১৩ই জুন তারিখের ঘটনা।) হেমেন্দ্রবাবুর "দেশবন্ধু-স্মৃতি"তে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। তিনি লিখছেন—"আমার মনে হইল নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি সমস্ত সত্য প্রকাশ না করিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। আমি উত্তর করিলাম—শিশিরবাবুর অভিনয়-কুশলতার আমি প্রশংসা করিতাম, আমার হিষ্ট্রীতেও করিয়াছি, কিন্তু হিন্দুর প্রাতস্মরণীয় অহল্যাকে রঙ্গমঞ্চে বারাঙ্গনা সাজাইয়া অভিনয় করিবার আমি ভয়ানক বিরোধী ছিলাম।......তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন,—হাঁ, ইহাতে তোমার কোন অন্যায় হয় নাই। হিন্দুর আরাধ্য চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করিতে কাহারও অধিকার নাই, কিন্তু ওরা ত আমাকে এরূপ বুঝায় নাই। তারপরে থিয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন,—থিয়েটার আর্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম ও জাতীয়তা প্রচারে সহায়তা করে, তবেই ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এর বছর চার পাঁচ আগে এই বিষয়বস্তু নিয়েই অবৈতনিক নাট্যসমাজ গীতাভিনয় করেছিলেন। সে নাটকখানির নাম—"আদর্শ ব্রাহ্মণ"। বইটি আমার কাছে আছে। তাতে দেখছি লেখক হিসাবে নাম রয়েছে "শ্রীশ্রীভগবদ্ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণ কৃত।" এটি

অহল্যার কাহিনী হলেও এতে কৃত্তিবাসা ভাবধারারই অনুসরণ ছিল। এ নাটক কিন্তু তখন সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

শিশিরবাবু অভিনীত "পাষাণী" সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত "নবযুগ" লিখলে ২৪শে জানুয়ারী '২৫ সালে—"এক শ্বেতাঙ্গ লরেন্স ফস্টার চরিত্র আছে বলিয়া পুলিসের হুমকিতে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, মুসলমানদের আপত্তিতে আওরঙ্গজেব চরিত্রের জন্য 'রাজসিংহ' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, 'মহম্মদ' নাটকের অভিনয় আরম্ভ না হইতেই তাহা বন্ধ হইতে পারে, 'সৎনাম' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, শিখদের আপত্তিতে 'গুরুগোবিন্দ' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, হিন্দুদের আপত্তিতে 'পাষাণী' অভিনয় বন্ধ হইতে পারে না ?"

যাই হোক, আমি বলব, শিশিরবাবুর এটা একটা 'একস্‌পেরিমেন্ট'। অভিনয়ে শিশিরবাবু উভয় ভূমিকাতেই সুন্দর অভিনয় করেছিলেন, একই নাটকে দুটি বিপরীতধর্মী ভাবের সুষ্ঠু চরিত্রাভিনয়, শিল্পীর পক্ষে নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক। চিরঞ্জীব-রূপী মনোরঞ্জন বাবুও খুব ভালো করেছিলেন। আমি অবশ্য ওঁর পাষাণী দেখিনি, দেখব-দেখব করছি, এমন সময় শুনলাম, 'পাষাণী' শিশিরবাবু বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা তখন আমাদের "বন্দিনী" নিয়ে মেতে আছি। অপরেশবাবুর নাটক। ভার্দি বলে এক সঙ্গীতরচয়িতার অপেরা—ইটালিয়ান অপেরা—মিশরীয় পটভূমিকায় উপস্থাপিত একটি অপেরা-নাটক, নাম—'আইদা', তারই নাট্যরূপান্তর হচ্ছে 'বন্দিনী'।' কাগজে বেরিয়ে গেল—"বন্দিনীর মহলা জোর চলছে, এবার প্রডিউসার অহীন্দ্রকুমার। শুনলুম, তিনি যা নতুন দেখাবেন, তা আজ পর্যন্ত বাঙলায় কেউ দেখেনি। ভালো কথা !"

দায়িত্বটা আমার উপর অনেকখানি চেপেছিল সত্যি কথা, এবং সেটিই আমার জীবনের প্রথম পেশাদারী নাট্য-প্রয়োগের উদ্যম। কিন্তু, কাগজে টিপ্পনী বেরুতে, আমি আরও সচেতন হলাম। অর্থাৎ, ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই আমার হয়ে গেল যাকে বলে, 'আহার-নিদ্রা বন্ধ।' 'বন্দিনী'তে অভিনয় করতে হবে। সুতরাং, খাটুনি যা পড়ল' তা' সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু 'বন্দিনী' নিয়ে যে আভ্যন্তরীণ নাটক গড়ে উঠবে, কাহিনী বলবার আগে মিনার্ভা-সম্বন্ধে একটা সংবাদ দিয়ে নেই। কথায়-কথায় সে ব্যাপারটা বলা হয়নি। অ্যালফ্রেড মঞ্চের মিনার্ভা নতুন বই খুললেন ৮ই নভেম্বর, '২৪ সালে। নাটকটি দুই অঙ্কের হাস্যরসাত্মক নাটক, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা—'জোর বরাত'। এই 'জোর বরাত' মিনার্ভার 'বরাত' খুলে দেয় বলা চলে। নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। দোলগোবিন্দ সেজেছিলেন—মন্মথনাথ পাল (ইন্দুবাবু), আর, ব্যারিস্টার ঘটক সেজেছিলেন—কার্তিকচন্দ্র দে। এ' দুটি ভূমিকা অপূর্ব হয়েছিল। আমোদকুমার-রূপী সত্যেন দে মন্দ নয়। কার্তিকবাবু এই অভিনয়ে খুবই নাম করেছিলেন ; যেমন তাঁর মেক-আপ, তেমনি মুখে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা বলার অপূর্ব ভঙ্গী।

ম্যাস্‌পেরোর "হিস্ট্রি অব ইজিপ্ট" বইখানা ছিল আমার কাছে, সেই বই থেকে ছবি তুলে নিয়ে

প্রথমে লেগে গেলাম পোশাক-আশাক তৈরী করতে। অলংকার কিনে আনলাম ইজিপ্‌শিয়ান প্যাটার্নের আর সিল্ক, শাটিন, ভেলভেট এসব কাপড় কিনে আনলাম পোশাকের জন্য। দরজীকে বসিয়ে দিয়ে নিজেদের তদারকিতে শুরু হলো পোশাকের কাজ। বিজ্ঞাপনে 'বন্দিনী' সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"অপরেশচন্দ্রের নবরসাত্মক গীতিবহুল নাটক।" আগেই বলেছি ইটালিয়ান অপেরা 'আইদা' থেকে এটা নেওয়া ; তার ওপরে ইজিপ্‌শিয়ান পরিবেশের কাহিনী। নৃত্যগীত একটু বেশীই ছিল এতে। তাই, নর্তকীদের ভালো করে সাজাবার জন্য কেনা হলো নানারকম জিনিস। ভিতরে —'টাইট্' বাইরে শিফন। কিন্তু আর এক প্রস্ত পোশাকের জন্য অন্য আর এক বস্তু। এই বস্তুটি কেমন করে সেদিন পেয়েছিলাম, তা বলি। প্রবোধবাবু আর আমি ধর্মতলায় জিনিসপত্র কিনতে গেছি ত? ফুটপাথে দেখি, পিজবোর্ডের বাক্স সাজিয়ে এক নতুন ধরনের গেঞ্জি বিক্রি করছে। খেজুর-পাতা দিয়ে বোনার মতো জিগ্‌জ্যাগ প্যাটার্নে বোনা। প্রবোধবাবুকে দেখিয়ে বললাম —ঐ বেশ হবে, কী বলেন ?

পছন্দ হলো। লোকটির কাছে ও জিনিস যতগুলি ছিল সব কিনে নিলাম। বললাম—আরও দরকার হলে দিতে পারবে ?

সে বললে—কেন পারব না ? আনিয়ে দেবো।

বেশ এফেক্টিভ হয়েছিল এই গেঞ্জির পোশাক। এবার সেটের কথা। সেট-এর দিক থেকে বাস্তবিকই বিরাট ব্যাপার করে তুলেছিলাম আমরা। মঞ্চ-সহায়কদের অমানুষিক পরিশ্রম ছিল তার পিছনে। কাজ করতে করতে আমাদেরও বেশ রাত হয়ে যেতো। এমন বহু রাতই হয়েছে প্রবোধবাবু আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছেন। কিন্তু, এত উদ্যম, এত পরিশ্রমের পরে যে আভ্যন্তরীণ কি নাটকেরই সৃষ্টি হবে, তা' কে জানত ?

প্রথম সেট্‌টাই ত ছিল বিরাট। ডাইনে প্রসিনিয়াম থেকে শুরু করে অর্ধ বৃত্তাকারে মঞ্চের শেষ উইঙ্গস্ পর্যন্ত চলে গেছে কিছুটা উঁচু করা মঞ্চ, ধাপে-ধাপে বসানো আগাগোড়া, কোথাও ছেদ নেই! এই সিঁড়িগুলির ওপরেই লোক দাঁড়াবে। সিঁড়ির ওপরে আবার বিরাট-বিরাট থাম, ভেনেস্তা দেওয়া, তার ওপরের ব্লু ভ্যালস্‌পার রঙ মাখিয়ে দিয়েছিলাম, তার ফলে এমন চকচকে হলো যে, মুখ দেখা যায়। প্রথম প্রসিনিয়ামের পরেই—স্টেজের ডানদিকে একটি ফটক মতন, সেটিও বসানো হয়েছে সিঁড়ির ওপরে। বাঁদিকে রাজসিংহাসন—এ-ও সিঁড়ির ওপরে—সেখানে বসে আছেন মিশররাজ ফারাও ও তাঁর কন্যা। সভার নারীবৃন্দ তাঁদের বেষ্টন করে আছে। সিঁড়ির ওপরে বসে সভাসদ্‌গণ উৎসব নিরীক্ষণ করছেন। সেট্‌টার আর কোনো উইঙ্গস্ ছিল না, সিঁড়ি-দেওয়া মঞ্চ যেন চলে গেছে অন্তরালে—বহু দূরে! প্যাসেজে উইঙ্গস্ না থাকায় সেখান থেকে বাড়্‌তি আলো ফেলা হতো সিংহাসনের ওপরে ; তাতে ভারী সুন্দর দেখাতো।

এই রকম পেল্লায় সেট্ ছিল চারটে। রাজকুমারীর কক্ষ করা হলো, তার বিরাট সিলিং পর্যন্ত

ছিল। আরেকটি ছিল মাটির নীচেকার ঘর, যেখানে সেনাপতিকে বন্দী করে—অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আলোর ব্যবস্থাতেও যে-সব অভিনবত্ব-সৃষ্টির প্রয়াস করা হয়েছিল, তার পিছনেও ছিল প্রচুর অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর। এখনকার মতো উপকরণও তখন ছিল না, ছেলেরা টিন কেটে—টিনের চোঙা তৈরী করে—ভেনেস্তা দিয়ে 'মাস্‌ক্‌' তৈরী করে নিয়ন্ত্রিত আলোক-প্রক্ষেপণ করে—কোথাও তারা দেখাচ্ছে—কোথাও চাঁদ দেখাচ্ছে! লাইট্‌ করবার জন্য লম্বা চোঙা থেকে 'স্লিট্‌' কেটে দিতো। ঝালাইয়ের দোকান থেকে করে এনে দেখাচ্ছে আমাকে, আমি স্টেজে বসে আছি। আর অভিনয়ের দিক থেকে, প্রতিটি ছোট চরিত্রটিকে পর্যন্ত বার বার রিহার্স্যাল করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছোট একটি ভূমিকা ছিল, দূত। ঐ প্রথম দৃশ্যেই—যখন খুব উৎসব চলেছে, তখন সে একেবারে দৌড়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে একেবারে সিংহাসনের সামনে —হাঁটু গেড়ে বসে প্লাটফর্মে মাথা ঠেকিয়ে হাত দুটো তুলে অভিবাদন জানিয়ে, তারপরে মুখ তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠবে তার কথা। দৃশ্যটি হচ্ছে, সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসেছেন সেই উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে, রাজা খুশী হয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে সেনাপতির বিবাহ স্থির করেছেন। ঘোষণা করতে যাচ্ছেন সেই সংবাদ, এমন সময় দূত ঐ ভাবে এসে বলে উঠবে—সম্রাট?

সম্রাট। কে বাধা দিলে?

দূত। সম্রাট! সিরিয়ার রাজা জালুর সীমান্ত-দুর্গ আক্রমণ করেছে।

দূতের এই যে প্রবেশ, এ' একেবারে সময় বেঁধে করতে হবে, অর্থাৎ ঠিক তালে ঢুকতে হবে। যে অভিনয় করছিল, সে তখন নতুন, তরুণ যুবক, স্বাস্থ্যবান, কিন্তু অদ্ভুত তার উদ্যম। যতবার সে আসে, হাঁটুমুড়ে বসে, আর ঠিক ঐভাবে না হওয়াতেই আমি অমনি বলে উঠি—হলো না। আবার করো।

করে যাচ্ছে, হাঁটু ছড়ে যাচ্ছে, তবু একটুও বিরক্তি নেই, পরম উৎসাহে কাজ করে চলেছে। শেষকালে এক সময় "দাঁড়ান স্যার, আসছি,"—বলে আড়ালে চলে গিয়ে দেখি হাঁটুদুটোকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে এসেছে। জিজ্ঞাসা করতেই হেসে বলল—'ছড়ে যাচ্ছে, কতক্ষণে হবে কে জানে, তাই হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিলাম।'

সেদিনকার সেই দূত হচ্ছে আজকের বিখ্যাত অভিনেতা—তুলসী চক্রবর্তী। জিম্‌ন্যাস্টিক করত, বেশ ভালো স্বাস্থ্য, ক্লাবে ক্লাবে ব্যালেন্সীং দেখাতো। ওর মতো চৌখস খুব কম দেখা যায়। গান গাইতে দাও, সং সাজতে দাও, অপূর্ব করবে।

যাই হোক, আমি ত নাটকের পিছনে লেগে রয়েছি, কারণ, যেটা মনের মধ্যে অনুক্ষণ জেগে উঠছে, সে হচ্ছে—আশঙ্কা। এ আমার শুধু অভিনয়ের ব্যাপারই নয়, এ আমার পরীক্ষা বলা যেতে পারে।

বড়দিনের দৈনিক অভিনয় ত চলছেই, তার পরে চলছে এই খাটুনি। ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম

অভিনয় হলো রাত সাড়ে সাতটায়। দ্বিতীয় দিনও তাই হবে, তৃতীয় দিন—২৭ তারিখে হবে ম্যাটিনী। পর পর—বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—তিন দিনই 'বন্দিনী' অভিনয়। বিজ্ঞাপন লেখা হলো—"Mr. Aparesh Chandra Mukherjee's new drama Bandini—New Scenery—New light arrangements under expert supervision."

ভূমিকালিপি হলো :— কিল্লাদার—অপরেশবাবু, আমোসিস (সেনাপতি)—আমি, ফারাও—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, মিতানী-রাজ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, তাবেজ (ক্রীতদাস)—পুরুষের ভূমিকা—আশ্চর্যময়ী, রাজকুমারী আরভিয়া—রানীসুন্দরী, নাহেরেম্—নীহার, বন্দিনী—ফিরোজাবালা, পুরোহিত—ব্রজেন সরকার, দূত—তুলসী চক্রবর্তী।

অভিনয় হচ্ছে ভালো, কিন্তু মুশকিল হচ্ছিল ঐ সব পেল্লায় সেট্‌গুলিকে নিয়ে। এক-একবার কার্টেন পড়ছে, আর সেট্ সরাতে-সরাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। আমি আর অপরেশবাবু পর্যন্ত সেট্ সরিয়েছি। প্রবোধবাবু বহু বাড়তি লোক লাগিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ সব বড়ো-বড়ো থাম, মাটির তৈরি স্ফিংক্স, এসব ত চট্ করে সরানোও যায় না। সিন্ খুলতে দেরি হচ্ছে। গণদেব ভিতরে এসে তাগাদা দিচ্ছে, হরিদাসবাবু এসে পড়ছেন ভিতরে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—কী হলো?

যাই হোক্, অভিনয় ত শেষ হয়ে গেল, কিন্তু অপরেশবাবু গেছেন চটে। সে এক নাটকীয় পরিস্থিতিই বটে! আমিই নীচে আছি, প্রবোধবাবু ওপরে উঠে গেছেন, তালটা পড়ল আমার ওপরেই বলা চলে। অপরেশবাবু ততক্ষণে গর্জাচ্ছেন, বলছেন—কেবল সিন আর সিন! আমার নাটক যে এদিকে গেল। বুড়ো বয়সে কী ঝক্‌মারি!

তারপরে, এমনভাবে চলে গেলেন, যেন, মনে হলো, তিনি থিয়েটারে আর পা দেবেন না!

মনের যে কী অবস্থা, তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের এত পরিশ্রম, এত উদ্যম, সব যেন মুহূর্তে বৃথা হয়ে গেল! ব্যথিত মন নিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলাম অপরেশবাবুর কাছে। দেখি, মুখখানা খুব গম্ভীর করে বসে আছেন, শিফ্‌টাররা দাঁড়িয়ে, স্টেজ ম্যানেজার মানিকও কাছে আছে। আমাদের পার্মানেন্ট স্টেজ-কার্পেন্টারও ছিল। দেখি, অপরেশবাবু ওদের সবাইকে খোরাকীর পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন, আর বলছেন—এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসো সবাই। আরও চার-পাঁচজন ছুতোর নিয়ে এসো। আমি বসে আছি।

মানিককে ডেকে বললেন—যাও, তুমিও যাও।

ওরা সব চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে শুরু করলাম—বকুনিটা আমার ওপরেই হলো। ওই আমার প্রথম প্রযোজনার দায়িত্ব, প্রথমটাই মার খেয়ে গেল!

প্রবোধবাবু বললেন—সব ঠিক হয়ে যাবে। ওরা ফিরে আসুক, সারারাত আজ কাজ হবে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললাম—থাকব?

প্রবোধবাবু বললেন—না, তুমি পরিশ্রান্ত, প্লে করেছ, তুমি যাও। তবে, সকালেই চলে এসো।

ওঁর কথায় কিছুক্ষণ পরেই চলে এলাম বটে, কিন্তু মনটা একেবারে দমে গেল। মনে হচ্ছিল, আজ আমার মস্ত বড় পরাজয়! কারণ, খবরের কাগজে লিখেছিল—'এবার প্রডিউসার অহীন্দ্রকুমার!'

প্রডিউসার কথাটা তখনই নাট্যজগতে নতুন চালু হয়েছে বলা যেতে পারে। এবং ও কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রযোজনা' বলে যে কথাটা হামেশাই শোনা যায়, সে শব্দটাও অপরিজ্ঞাত ছিল সে সময়। শিশিরবাবুর 'সীতা' বইয়ের পরিচয়লিপিতে আছে, "অধিকারী—শিশিরকুমার ভাদুড়ী।' প্রযোজক বা প্রয়োগ-কর্তা বা প্রডিউসার বলে কারুরই নাম নেই। অনেক পরে অবশ্য 'সীতা'র প্রোগ্রামে প্রডিউসার বা প্রয়োগকর্তা হিসাবে নিজের নাম দিয়েছেন। অর্থাৎ, উনি যখন 'সীতা' খুললেন, তখনো 'প্রডিউসার' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করার রীতি আসেনি। গিরীশ বা গিরীশ-পরবর্তী যুগে 'শিক্ষক, অধ্যক্ষ বা নাট্যাচার্য' এসব কথার উল্লেখ দেখা যায়। তাই, যখন অপরেশচন্দ্রের "বন্দিনী" বইতে লেখা আছে দেখা গেল—

শিক্ষক ও আহার্যসংগ্রাহক—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(প্রডিউসার) শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী (ঐ সহকারী)

তখন, একটু অভিনবই ঠেকেছিল ব্যাপারটা!

যাই হোক, অমন মন খারাপ করে ত বাড়ি এলেম। শুয়ে-শুয়ে ঘুম আর আসতে চায় না! মনের মধ্যে কেবল তোলপাড় করছে চিন্তাটা—শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলাম? প্রযোজনার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হলো, কতো শৃঙ্খলার সঙ্গে সবকিছু দেখানো যায়। দৃশ্যগুলি চমৎকার হয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু ঐরকম গুরুভার সেট্ নিয়েই হয়ে গেল প্রধান সমস্যা!

পরদিন সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়েই ছুটলাম থিয়েটারে; পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল—তা প্রায় সাড়ে আটটা হবে—না স্নান, না আহার! ওপরে উঠে দেখি, প্রবোধবাবু ঘরে নেই। কোথায় গেলেন আবার? বারান্দায় এসে উঁকি দিয়ে দেখি বসে আছেন নীচে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম। পৌষ মাসের শীত, প্রবোধবাবু চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে আছেন—একটা ফতুয়া মাত্র গায়ে। তামাক খাচ্ছেন বটে, কিন্তু মুখখানা শুকনো, চুলগুলো উস্কখুস্ক। তখনো কিছু কিছু কাজ চলেছে স্টেজে। প্রবোধবাবুর যে-অবস্থা দেখলাম, তাতে মনে হলো, সারাটি রাত্রিই জাগরণে কেটেছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—এই যে বসো।

বড় বড় সেটগুলো কেটে ছোট করে নিতে হলো, এ ছাড়া আর উপায় কী?

চারিদিকে তাকিয়ে কাঠ-কাঠরার বিধ্বস্ত রূপ দেখেই অবশ্য বুঝতে পারছিলাম সব। মনে একটা ব্যথাও পেলাম। এই সব মনের মত করে গড়ে-তোলা সেট, সব কেটে ফেলেছেন!

কিন্তু উপায়ই বা কী! কাজ চলতে লাগল। বেলা এগারোটা সাড়ে এগারটায় উঠলেন প্রবোধ-বাবু, কাজ তখন শেষ হলো। ছুটি দিলেন সবাইকে, বললেন—ছুটোয় আসবেন কিন্তু। তখন শিফ টিঙ-

এর রিহার্স্যাল হবে। কে কোন্‌টা কখন ধরে সরাবে সে-সব আগে থাকতেই ঠিক করে না নিলে কাজ তাড়াতাড়ি করা যায় না।

ওপরে গেলাম আমরা দুজনে। স্নান-খাওয়া এখানেই সেরে নিলাম। প্রথম অঙ্কের ছিল একটিই দৃশ্য—সেই সিঁড়ির সেট্—সেটা ঠিকই আছে, তবে সরাবার জন্য সিঁড়িগুলির নীচে বল-বিয়ারিং-রোলার ফিট্ করা হয়েছে, ঠেললেই সরে যাবে; আর অতো দেরি হবে না। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ছিল 'রাজপ্রাসাদ, রাজকুমারীর কক্ষ'—সেই সিলিং দেওয়া সেটটা আর কী! এটি ছিল ছ' পাতার সিন, দুটো গান আছে। তার পরেই আসছে দ্বিতীয় দৃশ্য—কেল্লার সামনের ময়দান। এখানে ড্রপ ফেলে সেট্ সরিয়ে নিতে হতো, দেরি হতো। রাজকুমারীর কক্ষের সিলিং-এর জন্য ফ্ল্যাট সিনও ব্যবহার করা যেতো না। তাই, প্রবোধবাবু করেছেন কী, সিলিংটার অর্ধেকটা কেটে ফেলেছেন। এবার দ্বিতীয় দৃশ্যটির জন্য ফ্ল্যাট সিন ফেলা যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু 'কেল্লার সম্মুখ ভাগ'-এর জন্য কেল্লার সেট খাড়া করেছিলাম, এখন করব কী? ফ্ল্যাট সিন কোথায় পাবো? কেল্লা আঁকা কোনো সিন ত আমাদের নেই! আর নতুন করে যে আঁকিয়ে নেবো, সে সময়ও নেই। কী করা যাবে?

প্রবোধবাবু এক সময় বলে উঠলেন—ইউরেকা!

—কী হলো?

বললেন—আমাদের আগ্রা ফোর্টের দেয়াল-আঁকা একটা ফ্ল্যাট সিন আছে না? ওটাই লাগিয়ে দেবো।

বললাম—সেকী! ইজিপশিয়ান পরিবেশে মোগল আর্ট?

—তা হোক। কী আর করা যাবে? পরের সপ্তাহে এঁকে দেবো।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হলো। তৃতীয় দৃশ্য ছিল—উৎসব মণ্ডপ। কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যের ফ্ল্যাট এসে কভার করছে, সেই আসরে রাজকুমারীর কক্ষ সরিয়ে এটি বসিয়ে রাখলেই হলো। এটার পরেই দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ।

তৃতীয় অঙ্কে দেখা গেল, এটিতেও অসুবিধা হচ্ছে না। 'জালুর দুর্গের সম্মুখ ভাগ'—ঐ আগ্রা ফোর্টের ফ্ল্যাট সিনটিই আবার ব্যবহার করার ব্যবস্থা হলো। ভিতরে রইল রাজকুমারীর কক্ষ। তৃতীয় দৃশ্যে—দুর্গ, কারাগার—'ইরাণের রানীর যে কারাগারের দৃশ্য ছিল তার পিছনের ফ্ল্যাটটি সামনে এনে দেওয়া হলো, পাথরের দেয়াল-গাঁথা—ওপরে ঘুলঘুলি আঁকা দৃশ্য বটে, কিন্তু সুন্দর খাপ খেয়ে যায়।

মুশকিল হলো চতুর্থ অঙ্ক নিয়ে। চারটে সিন আছে, তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি হচ্ছে বিরাট। একটি হচ্ছে রাজসভা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ডাবল-সেট্—উঁচুতে এক দৃশ্য—নীচে আরেক দৃশ্য—ওপরে-নীচে ভাগ-করা। নীচে হচ্ছে—মাটির গর্তের কারাগারের সেটের মতো একটা কারাকক্ষ বিশেষ, পুরোহিতের বিচারে এখানেই সেনাপতিকে বন্দী করে রেখে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে

হয়। এইখানে রয়েছে সেনাপতি, আর ওপরে—রাজকুমারীর কক্ষ—বাঁদীদের নৃত্য-গীত। দৃশ্য-পরিকল্পনাটি ছিল এই—নীচে বন্দী সেনাপতি অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে, আর ওপরে রাজকুমারীর ঘটছে চিত্তচাঞ্চল্য, তিনি আর নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছেন না। বাঁদীদের নাচ-গানও তাঁকে আনন্দ দিচ্ছে না। ঐ দুটি ব্যাপারই এক দৃশ্যে পর পর দেখানো হতো। কিন্তু অন্য সেট্ সরিয়ে এই সেট্ লাগাতে সময় নিয়েছিল আধ ঘণ্টারও ওপর। এতে লোকে অধৈর্য ত হয়ে পড়বেই!

অতএব রাজসভা সরিয়ে দিয়ে এটিকে ঠিকমতো তাড়াতাড়ি সেট্ করা সম্ভব নয়। প্রবোধবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। এটি বড়ো সাধের সেট্ ছিল আমার। দোতলা সিন। শেষ মুহূর্তে বন্দিনী আসছে ছুটে সেনাপতির কাছে, দুজনে একসঙ্গে মরছে।

প্রবোধবাবু একটু হাসলেন, বললেন—কী করা যাবে? ওটাকেই বাদ দাও।

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এটা বাদ যাবে কী?

কিন্তু উপায়ও নেই। কারাগারের পিছনকার ফ্ল্যাটটা সামনে দিয়ে—রাজকুমারীর কক্ষটা কভার করে—সেনাপতির সেল-এর দৃশ্য দেখানো যায় কিনা, সেকথাও চিন্তা করা হলো। আমি বললাম—অসম্ভব। ওতে ডেপথ্ কমে যাবে। অমন শেষ দৃশ্যটি, ওতে সমস্ত অ্যাকটিংটা বেশ ভালো করে দেখানো যাবে না।

সেনাপতি সাজছিলাম আমিই।

তাহলে কী হবে? ফ্ল্যাট সিনটা লাগিয়ে কভার করতে পারলে রাজসভা ভাঙতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগত না। তার বদলে—রাজকুমারীর কক্ষ করে রাখতে কতক্ষণ? কিন্তু 'সেল' সামনে আনলে সেনাপতিরও চলছে না। অমন গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য, ওটি অবহেলা করলে চলবে না।

সুতরাং রাজকুমারীর কক্ষের দৃশ্যগুলিই বাদ দেওয়া হোক। শুধু 'সেল'ই থাকুক, দোতলার দৃশ্য উড়িয়ে দেওয়া গেল, রাজকুমারীর অন্তর্বেদনা, বাঁদীদের নাচ ও গান বাদ গেল।

ফল কিন্তু খারাপ হলো না, নাটকটি বেশ গতিলাভ করল। শিফ্টিং-এর ব্যাপারে প্রবোধবাবু বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, বাড়তি লোক পর্যন্ত দিয়েছিলেন কাজটা ত্বরান্বিত করবার জন্য।

আমাকে সেদিন ছাড়লেন বেলা পাঁচটার পর। বললেন—তুমি এবার যাও সাজো গে। তোমার অভিনয় রয়েছে, না?

কিন্তু, কিছু-কিছু কাজ যে এখনও—

বললেন—সে-সব আমি সেরে দিচ্ছি। আমি যখন রয়েছি, তোমার ভয়টা কিসের?

সরে এলাম। একটু পরেই এলেন অপরেশবাবু, মুখখানা থমথম করছে, নাটকে ভূমিকা আছে বলেই এলেন, নইলে আসতেন না, এমন ভাব। এসে, কারুর সঙ্গে কথা নয় কিছু নয়, নিজের চেয়ারটাতে বসলেন, বেশকারী সাজাতে শুরু করল। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার রূপসজ্জা শেষ করে ওঁর পাশে গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলাম, সেট্ নিয়ে আমাদের

সবার সব সব খাটুনির কথা। উনি সব শুনলেন, তারপর সংক্ষেপে বললেন—দেখা যাক, কি হয়।

হলো অদ্ভুত কাণ্ড! নাটকের সময় কমে গেল প্রায় দেড়টা ঘণ্টা। একটি নাটকে দেড় ঘণ্টা সময় কমে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়! দর্শকদল খুশী হলেন, খুশী হলেন আমাদের ডিরেক্টররা; হরিদাসবাবু যখন ভিতরে এলেন, দেখি, ওঁরও মুখে হাসি ফুটেছে। অপরেশবাবুর মনের মেঘ কেটে গেছে, উল্লাস প্রকাশ করে বললেন—এই ত হলো। এটা আগে হলে ত কোনো কথাই উঠত না।

বললাম—শিফটিং-এর ব্যাপারটা আজ ভালোভাবে সবার জানা হয়ে গেছে, কাল দেখবেন সময় আরও দশ মিনিট কমে যাবে।

—ভালো কথা।

ওঁর সেই ইজিচেয়ারটিতে বসে বসেই উনি সাজতেন। সেখানে বসেই 'মেক-আপ' তুলতে তুলতে বলতে লাগলেন—সিনগুলি কিন্তু হয়েছিল ভালো, তবে ও যখন গেছে, তখন পাপ গেছে! বুঝলেন না? আমাদের দেখতে হয় নাটকটা। নাটকের গতি ব্যাহত হচ্ছে কিনা, সেটা লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে বড় কথা।

উদাহরণস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের কথা তুললেন। বললেন—ওঁর পঞ্চাঙ্ক নাটকগুলির কথাই ধরুন না কেন, এমনভাবে লেখা যে, অঙ্কের শেষে শেষে ড্রপ ফেলা সত্ত্বেও মানুষের মন থেকে তা মুছে যায় না। আসল কথা কী জানেন? দর্শকের বিরক্ত জন্মালে সোনার নাটকও চলে না।

তারপরে, কথায় কথায় ছেলেভুলানোর সুরে বললেন—টমাস অট্‌ওয়ে-র "ভেনিস্ প্রিজারভ্‌ড্‌" নাটকটি এবার 'অ্যাডাপ্ট' করব। তাতে নানারকম সব সিন আছে। দেখান, যত কেরামতি দেখাতে পারেন!

টমাস অট্‌ওয়ে ছিলেন সপ্তদশ শতকের এক ইংরেজ নাট্যকার। ১৬৮১ সালে লণ্ডনে অভিনীত হয়েছিল তাঁর "ভেনিস্ প্রিজারভ্‌ড্‌"।

যাই হোক, তার পরদিন ছিল 'বন্দিনী'র ম্যাটিনী শো, সেটিও হয়ে গেল। সবাই খুব খুশীই আছেন। বন্দিনী আবার হলো ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১লা জানুয়ারী। অর্থাৎ পর পর অভিনয় চলছেই। ২রা হলো—সাজাহান, ৩রা—আবার 'বন্দিনী', ৪ঠা—কর্ণার্জুন। এবং এই ৪ঠা তারিখের পর ছুটি পেলাম, বড়দিনের আসরও শেষ হলো।

'বন্দিনী' সম্পর্কে "বৈকালী" লিখেছিল —"বন্দিনীর শিক্ষক এবং প্রযোজকদের সহকারী ছিলেন অহীন্দ্রবাবু। 'বন্দিনী'তে দেখা গেল যে, শুধু তিনি অভিনেতা নন, একজন সুদক্ষ প্রডিউসার। আমরা অপরেশচন্দ্র এবং অহীন্দ্রভূষণের সমবেত চেষ্টায় বাংলার রঙ্গমঞ্চের আমুল সংস্কার দেখতে পাব আশা করি।"

দশই জানুয়ারী 'নবযুগ' লিখলে—"বন্দিনী, দৃশ্য-সৌন্দর্যের খনি বললেই চলে, ইহার দৃশ্যপটাদি

এত অধিক চিত্তাকর্ষক যে, একবার মাত্র ইহার অভিনয় দেখিলে ইহার সৌন্দর্যের সম্যক উপলব্ধি করা যায় না—বেশভূষার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ মৌলিক।……পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ইস্‌কিবল, অ্যামেসিস, মিতানীর রাজা ও তাবেজের ভূমিকায়—অপরেশবাবু, অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাপ্রসন্নবাবু ও আশ্চর্যময়ীর অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নাহেরম—শ্রীমতী নীহারবালা, ইঁহার অভিনয়ে হাস্যরসের সাবলীল ছন্দের সহিত দেশভক্তির গভীর মন্ত্র সুন্দররূপে বাজিয়া উঠিয়াছিল। বন্দিনী ফিরোজবালা, চেষ্টা ও শিক্ষার ফলে একজন সাধারণ অভিনেত্রীও যে সুন্দর অভিনয়ে সক্ষম হন, ইঁহার অভিনয়ে আমরা সেটি সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছি।"

সমালোচনা প্রায় সব কাগজই ভালো করেছিলেন, ২।১টি কাগজ কিছু-কিছু ত্রুটিও বার করেছিলেন, কিন্তু এবারে আমাদের রাখালদা আর বসে রইলেন না, ধরলেন তাঁর কলম। ঐ যে আমরা আগ্রা দুর্গের দৃশ্যটি মিশর যুগে চালিয়ে দিয়েছিলাম, ঐতিহাসিক সে ত্রুটি দেখাতে ছাড়বেন কেন? তবে, ওটি ত আমরা জানতামই। মিশরের কোন্ সময়ের ঘটনা ঐ 'বন্দিনী' এসব নিয়ে উনি এমন কূটতর্ক তুললেন যে বলার নয়। শুধু সমালোচনাই নয়, ইতিহাসের নানান্ কচকচানি! কোন্ বংশের কোন্ রাজত্বকালে, তা কেন নাটকে স্পষ্ট বলা নেই? যদি অমুক হয় ত, তার সময়ে পোশাক-টোশাক ছিল ভারি কম; আর যদি অমুক না হয়ে তমুকের রাজত্বকালে হয়ে থাকে ত পোশাকের হবে আরও পরিবর্তন, ইত্যাদি।

ওদিকে শিশির পত্রিকার সঙ্গে আমাদের কর্তৃপক্ষের কী এক মনোমালিন্যের ফলে কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে শিশির লিখতে শুরু করলেন, সে প্রায় ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কী! তবে, সরাসরি নিজেরা লেখেন নি, চক্ষু-লজ্জা বলেও ত একটা পদার্থ আছে, এক পত্রপ্রেরকের জবানীতে লিখেছিলেন শিশির। এসব ব্যাপার ঐ 'বন্দিনী'র কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। সংবাদপত্রের রীতিই এই, কে যে কখন কার পক্ষে আছেন তা বোঝা সত্যিই মুশকিল।

যাই হোক, যা বলছিলাম। আমরা ত বড়দিনের আসরের শেষে দু'একদিনের জন্য ছুটি পেলাম। নাট্যমন্দিরে তখনো 'পাষাণী' চলছে, মিনার্ভায়—'জোরবরাত'। 'নবযুগ' লিখেছিলেন, ২১শে নভেম্বর তারিখে—"এই ক্ষুদ্র প্রহসনই হয়ত মিনার্ভার আগেকার বরাত আবার ফিরাইয়া আনিবে।"

মিনার্ভা ২৫শে ডিসেম্বর খুলেছিলেন—"কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" ঐ ভূপেনবাবুরই লেখা। 'দেবগণের মর্তে আগমন' বলে যে ধরনের বই আছে, এ বই সেই ধারারই অনুস্মৃতি বলা চলে। যমরাজ কৃতান্ত বাংলাদেশে এসেছেন দেশ দেখতে, বীর হনুমান বা মহাবীর হচ্ছেন ত্রিকালজ্ঞ, তিনি বেঁচেও আছেন তিনকাল, তিনি যমরাজকে দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের অবস্থা বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী ইত্যাদি। বইটি আমি দেখেছিলাম। লোকে বইটি নিয়েওছিল। কৃতান্ত সাজতেন কুঞ্জবাবু, মহাবীর সাজতেন হাঁদুবাবু, আর চিত্রগুপ্ত—যতদূর স্মরণ হয়—কার্তিকবাবু। এতে পটলবাবু একটি অদ্ভুত দৃশ্য

করেছিলেন—বিপুল বন্যা—তাতে মানুষ-গাছপালা-ঘরের চাল-গরুবাছুর সব ভেসে যাচ্ছে! চমৎকার হয়েছিল দৃশ্যটি। একে ত ভাড়া করা স্টেজ, তাতে, রোলার-এর ওপর সিন ব্যবহার করে এটা যে তিনি করে তুলতে পেরেছিলেন, তাতে তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ না জানিয়ে কোন উপায় নেই। ওঁদের স্টেজের নিজস্ব বাড়িও ততদিনে প্রায় তৈরী হয়ে এলো অবশ্য।

চব্বিশ সাল ত এভাবে চলে গেল। এর মধ্যে থিয়েটারের কথাই বলে গেলাম, সিনেমার কথা একটুও বলা হয়নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সিনেমাও করেছি বই কী! সেই যে 'ইরাণের রানী'র সিনারিও-র কথা বলেছিলাম, আমার সেই সিনারিও-কে ভিত্তি করেই ম্যাডানরা ছবি তুললেন 'মিসরের রানী'। কর্নওয়ালিশ মঞ্চে (এখনকার 'শ্রী') আমাদের শুটিং হতো। সেই 'সোল অফ এ স্লেভ'-এর মতো সূর্যকিরণ সম্পাতে নয়, নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাত-এর সাহায্যে ছবি তোলা হচ্ছে। দারা আমিই করছি। 'রানী'-র ভূমিকা করবার মতো কত সুন্দরী সুন্দরী সব মেমসাহেবরা আছে, কিন্তু, কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় ত ওঁরা দেখেছিলেন, তাই ধরে বস'লেন, ঐ ভূমিকা কৃষ্ণভামিনীকে দিয়েই করাতে হবে। 'রানী' তাই কৃষ্ণভামিনীই করছে। ওদিকে দুর্গা ত ম্যাডান-পালানো ব্যক্তি, সে সরাসরি ওদের কাছে এসে বলতে পারছে না ভয়ে, আমাকে এসে ধরলে, যে কোনো একটা পার্ট তাকে দেওয়া হোক, সে করবে। বললে—পয়সা-কড়ি চাই না, একটি পার্ট দাও শুধু।

কী পার্ট দেওয়া যায়? ইন্দু ইয়ুসুফ করত স্টেজে, কিন্তু, দিনের বেলায় তার অফিস রয়েছে, সে ত শুটিং করতে পারবে না, তাই ইয়ুসুফই দেওয়া হলো দুর্গাদাসকে। আমরা তিনজন ছাড়া আর সব ভূমিকাই করলে পার্শী থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। দাউদ শা যিনি করেছিলেন, তাঁর নাম—নসেরওয়ানজী। পার্শী থিয়েটারের ইনি ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা, থিয়েটার এখন আর করেন না, করেন শিক্ষকতা। গিরিশবাবুর খুব ভক্ত ছিলেন। বলতেন—গিরিশবাবুর বাড়িতে কতবার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছি!

শুধু উনি কেন, বাইরে থেকে বহু নাট্য-সেবী ব্যক্তি এসে এসে গিরিশবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, গিরিশবাবুর বাড়ির দোতলার বৈঠকখানার ঘরটি ছিল একটি পীঠস্থান।

ওদিকে মিশরের রানী'র শুটিং চলে স্টেজের ওপরে। স্টেজের ভিতরে আলো দিয়ে সিনেমার ছবি তোলা হচ্ছে, তখনকার দিনের সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার! আরও বিস্ময়ের বস্তু হচ্ছে, তখনকার কর্নওয়ালিশ স্টেজটাই করা হয়েছিল—রিভলভিং স্টেজ। ফ্রামজী ম্যাডান শুধু রিভলভিং স্টেজের মালমশলাই নিয়ে এসেছিলেন তা নয়, বহু নতুন-নতুন জিনিস নিয়ে এসেছিলেন কন্টিনেন্ট থেকে, তার কিছু ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কোনো-কোনো জিনিসের প্যাকিংই খোলা হয়নি। পাশের 'ক্রাউন'-এ বসানো হবে বলে 'রিভলভিং স্টেজ'টা খুলে ফেলা হয়েছিল, তারপর যে সেটা কোথায় গেল, তার আর কেউ হদিশ করতে পারলে না! ওটিই বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম রিভলভিং স্টেজ, তবে দুঃখের বিষয়, এতে কোনো নাটক মঞ্চস্থ হলো না, হলো সিনেমার দৃশ্য গ্রহণ। জিনিসটি খাঁটি ইয়োরোপের

আমদানি বলে ছিল বেশ দৃঢ় এবং মজবুত, আর এর গতিও ছিল দ্রুত ও সাবলীল। দু'ধারে দর্শকের জন্য যে দু'সারি আসন থাকে, তার মাঝের পথে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তোলা হতো, প্রয়োজন মতো, মঞ্চ ঘুরে যাচ্ছে, আবার প্রয়োজন মতো ক্যামেরার মুখে সূক্ষ্মতর লেন্স্ বসিয়ে ক্লোজ-আপ শট্গুলিও তোলা হচ্ছে। ম্যাডানের সেইসব জিনিসপত্রই বা কোথায় গেল ? ম্যাডানের ওখানে যে কতো পুকুর-চুরি হয়েছে, তার কি ইয়ত্তা আছে ? ফ্রামজী ম্যাডান স্ক্রিন আনিয়েছিলেন ইয়োরোপ থেকে, যেটি বিদ্যুৎশক্তিতে চালিত হতো। অর্থাৎ সুইচ টিপলে ওটা নানান্ আকারে খুলে যেতো অথবা বন্ধ হয়ে যেতো নানান্ আকার ধারণ ক'রে। নানান্ আকার ধারণ ক'রে উঠে যেতো, নানান্ আকার ধারণ ক'রে পড়ে যেতো। আর ছিল সাউণ্ড-এর সরঞ্জাম। এটিকে প্রেক্ষাগৃহে বসিয়ে ছবির প্রয়োজন মতো পরিবেশ-সৃষ্টিকারী শব্দের উৎপাদন করা হতো। রেকর্ডিং করা কোন-কিছু নয়, রীতিমত মেকানিক্যাল সাউণ্ড। সেই সাউণ্ডে শোনা যেতো—মেঘগর্জন—বন্যার স্রোতের কলধ্বনি ইত্যাদি। পরে ম্যাডানের চিত্রগৃহে (এখন যেটা এলিট্ সিনেমা) 'বেন্হুর' ছবি দেখানোর সময় ব্যবহার করা হয়েছিল ঐ সাউণ্ডের যন্ত্রটি।

'মিশরের রানী'র শুটিং অধিকাংশই হয়েছিল কর্নওয়ালিশ মঞ্চের ঘূর্ণায়মান স্টেজে, কিছু-কিছু হাওড়া অঞ্চলে—বহির্দৃশ্য-গ্রহণের জন্য। ফ্রামজী নিজেই ছবি তুলেছিলেন। বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়েছিল ছবিখানা, কিন্তু ল্যাবরেটারীর দোষেই হোক, অথবা যে-কোনো কারণেই হোক, ছবির সেড্গুলি বড় বেশী কালো-কালো দেখাচ্ছিল, বইও ভালো হয়নি।

মনে পড়ত আমাদের অত যত্নের 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেটের'-এর কথা। হেম মুখুজ্যের কর্মপরিবর্তন ঘটেছে। ডুকাস সাহেব এখানে বিয়ে করেছেন দ্বিতীয় পক্ষে। তাঁর শিশুসন্তানটির গভর্নেসকে বিয়ে করে বসলেন তিনি। এর ফলে হয়ত এখানে তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কিছু হানিই হয়ে থাকবে, তিনি কারবার গুটিয়ে সস্ত্রীক চলে গেলেন বিলেত। অতএব হেমবাবু হয়ে পড়েছিলেন কর্মহীন। 'হগ্ মার্কেটে'র সামনে—অপেরা হাউসে—খোলা হয়েছে তখন 'গ্লোব সিনেমা।' এর মালিক হয়েছেন দুজন—দুজনেই পার্শী—কুকা আর সিজুয়া। মুখুজ্যেমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ ছিল এঁদের। তারই সূত্র ধরে গ্লোবের ম্যানেজার হয়ে গেলেন হেমবাবু। আমরা সময় পেলে যখন বিলিতি সিনেমা দেখতে যেতাম, ইনি বসিয়ে দিতেন গ্লোবের আসনে। গ্লোবে বসে বসে এঁর কল্যাণে কত সিনেমাই না তখন দেখেছি !

এইরকম অবস্থা। একদিন গ্লোবে গেছি কী এক সিনেমা দেখতে, হেমবাবু বললেন—শুনেছেন, ওদিকে প্রফুল্লকে—বলেই, কথাটা শেষ না ক'রে ঘাড়টা নেড়ে বোঝাতে চাইলেন—চলে গেছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় ?

—ব্যাঙ্গালোর।

—কীরকম ?

উনি বললেন—ব্যাঙ্গালোরে কুকা-সিজুয়ার একটা সিনেমা-হাউস আছে, তার ম্যানেজারের

দরকার ছিল। প্রফুল্লকে বলতে সে বললে—আমি যাব, বসে বসে হিসেবের খাতা লেখার কাজ আর ভালো লাগছে না। তাই, চলে গেল নতুন চাকরি নিয়ে।

মুখে ওঁকে কিছু বলল না বটে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে একটা অভিমান হলো। ভাবলাম, আমি না হয় থিয়েটার নিয়ে মেতে আছি, তা বলে, প্রফুল্ল চলে গেল, যাবার আগে একবার দেখাটাও করে গেল না।

অবশ্য, আমিও তার খবর করিনি, সেজন্য তার মনেও অভিমান হতে পারে!

মনটা খারাপ হয়ে গেল। সিনেমা সেদিন আর দেখলাম না, হেমবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। বললাম—তিনজনে মিলে সেই যে সাধের কোম্পানি করেছিলাম, তার কী হলো? মুমূর্ষু ত ছিলই তবু আশা ছিল, প্রফুল্ল আবার একটা-কিছু আরম্ভ করে ওটাকে উজ্জীবিত করবে, কিন্তু তা আর হলো না, কোম্পানী শেষ পর্যন্ত মরেই গেল! ছবিটা আছে ত?

—তা' আছে।

—ওটা রঙীন করবে হেন-তেন কতকি, সব আশাই নির্মূল হয়ে গেল।

চুপ করে রইলেন হেমবাবু। মনটা সত্যিই ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এই দু'বছরে যদিও থিয়েটার নিয়ে মেতে আছি, কিছু অর্থও পাচ্ছি, নামও হয়েছে, কিন্তু তবু, ওখানে কাজ করে যে আনন্দ পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। গোকুলবাবুতে আমাতে মিলে সেই সব দুরাশার ছবি-আঁকার খেয়ালী দিনগুলিকে মনে পড়ে! পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে মনে হয়নি, এত মাদকতা ছিল কাজে। বন্ধু-বান্ধব মিলে হাতে কাজও করছি, মুখে খোসগল্প, কারণে-অকারণে হেসে উঠছি। যেন হাসির ফোয়ারা রঙীন হয়ে উঠে ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে। এত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎসারণ ছিল সে সব দিনে—সে সব কাজে! সে আনন্দ জীবনে আর কখনো পাইনি বললেও চলে।

বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে বললাম—ফটো প্লে সিণ্ডিকেট্ মরে গেছে।

বাবা একটু চমকে উঠেই প্রশ্ন করলেন—কে মরে গেছে?

একে-একে বললাম বাবাকে। বাবা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললেন—ওটা তোমার মূল্য। শিখতে গেলে দক্ষিণা দিতে হয়, তুমি কিছু দক্ষিণা দিলে আর কী!

তারপরে, ব্যস, ঐটুকুই। যেমন মেতে যাবার তেমনি মেতে গেছি থিয়েটারের কাজে। ৯ই জানুয়ারী—শুক্রবার—'সরলা' খোলা হলো। এই 'সরলা' ছিল ভূতপূর্ব স্টারের বিজয়-বৈজয়ন্তী। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগান্তরকারী উপন্যাস—'স্বর্ণলতা'-র প্রথম অংশটুকু—অর্থাৎ সরলার মৃত্যু দৃশ্য পর্যন্ত অবলম্বন করে এটিকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন—অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' অভিনীত হবার পর হয়েছিল 'সরলার' অভিনয়। ১৮৮৮ সালের কথা। তখন অসাধারণ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্র লেখেন 'প্রফুল্ল'। এমারেল্ড ছেড়ে যখন তিনি আবার স্টারে এলেন, সেই তখন ১৮৮৯ সালে। কিন্তু, 'প্রফুল্ল' নিয়ে হৈ-হৈ করলেও বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রথম

সামাজিক ট্রাজেডী হচ্ছে—'সরলা।' পথিকৃতের সম্মান 'সরলা'কে দিতেই হবে। তখন গদাধরচন্দ্র করেছিলেন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), আর, আমাদের সময়ে করলেন দানীবাবু। এর আগেও যতবার 'সরলা' হয়েছে, 'গদাধরচন্দ্র' উনিই করেছেন, 'গদাধরচন্দ্র' হচ্ছে দানীবাবুর বিখ্যাত ভূমিকা এবং পুরাতন স্টারে বেলবাবু মারা যাবার পর যতবার 'সরলা' হয়েছে, গদাধরচন্দ্র করেছেন কাশীনাথবাবু, দানীবাবু করেছেন তখন অন্য থিয়েটারে। শশীভূষণ করলেন—তিনকড়িদা। নীলকমল —নরেশ মিত্র। বিধুভূষণ—নির্মলেন্দু। রমেশ দারোগা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। ঠানদি—কোহিনুরবালা। শ্যামাঝি—আশ্চর্যময়ী। প্রমদা—রানীসুন্দরী। মুদিনী—ফিরোজাবালা (নেনী)। গদাধরের মাতা—সিন্ধুবালা। এবং নাম-ভূমিকায়—কৃষ্ণভামিনী। কৃষ্ণভামিনী ততদিনে আরোগ্যলাভ করে ফিরে এসেছে। তাছাড়া, অন্যান্য ছোটখাট ভূমিকায় ছিল—সন্তোষ দাস (ভুলো), তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। এতে আমার কোন ভূমিকা ছিল না। আমি বসে বসে অভিনয়টা দেখেছিলাম। দেখে চমকে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় বহুদিন দেখিনি। দানীবাবুর আশ্চর্য অভিনয়ের কথা আর কী বলব, তিনকড়িদার অভিনয়ও যেমন স্বাভাবিক তেমনি সুন্দর, আর চমৎকার করলেন—নরেশবাবু। 'বিজলী' ২৩শে জানুয়ারী বিশদ সমালোচনা করে লিখলেন—"প্রধান ভূমিকা হতে আরম্ভ করে অতি তুচ্ছ ভূমিকা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে অভিনীত দেখে আমরা পরমানন্দ লাভ করেছি।"

কৃষ্ণভামিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে, নরেশবাবু সম্পর্কে বিশেষ করে লিখলেন—"সঙ্গত ও সঙ্গীত বাতিকগ্রস্ত নীলকমলের কথা কহিবার ধরন, বলিবার কায়দা ও ভাবপ্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা পেয়েছি। নির্মলেন্দুর 'বিধুভূষণ'-ও সাফল্য অর্জন করেছিল, কিন্তু আমার কাছে যেটা প্রভূত বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে হচ্ছে—কৃষ্ণভামিনীর 'সরলা'। কৃষ্ণভামিনী এর আগে বড়ো-বড়ো পার্ট করেছে, ভালোভাবেই করেছে, কিন্তু, তাতে যেন একটা শেখানো ভাব থাকত, পূর্বসূরী কোনো অভিনেত্রীর ছাপও পাওয়া যেতো কিন্তু 'সরলা' দেখে মনে হয়েছিল, এ-ওর আরেক মূর্তি! 'সরলা'র মধ্যদিয়ে ওর অভিনয়ের স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। অভিনয় শুধু সাবলালই হয়নি, বলা যায়—স্বতঃস্ফূর্ত—চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম। সরলা গ্রাম্যবধূ—অসীম ধৈর্য—অন্তরে তেজস্বিনী—অথচ নম্র—'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ'র একেবারে যথাযথ প্রতিচ্ছবি! শেষদৃশ্যে, যেখানে সে মৃত্যুপথযাত্রিনী—বিধুভূষণ ফিরে এসেছে—তার সঙ্গে সেই তার শেষ সাক্ষাৎ—সেই দৃশ্যে ওর অভিনয় দেখে আমাদেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল, দর্শকের ত কথাই নেই। এই 'সরলা'র ভূমিকা পুরানো স্টারে করেছিলেন কিরণবালা। অভিনয়-ক্ষমতায় এতদূর উঠেছিলেন যে, প্রখ্যাতা অভিনেত্রী বিনোদিনীর পরেই তাঁর নাম করা হতো তখন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর অভিনেত্রী-জীবন সম্যকরূপে বিকশিত হয়ে ওঠবার আগেই তিনি মারা যান—অল্পবয়সে। এই কিরণবালাই আবার প্রফুল্ল নাটকের প্রথম জ্ঞানদা।

প্রসঙ্গত আরও একটা কথা বলে রাখি। বিনোদিনী তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসতেন।

যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছেন, কিন্তু থিয়েটার দেখবার আগ্রহটা যায়নি। নতুন বই হলে ত উনি আসতেনই, এক কর্ণার্জুন যে কতবার দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। মুখে-হাতে তখন তাঁর শ্বেতী বেরিয়েছে, একটা চাদর গায়ে দিয়ে আসতেন। এসে, উইঙ্গসের ধারে বসে পড়তেন। অমনি, আমাদের মেয়েরা, যে-যেখানে থাকত সবাই আসত ছুটে, একটা মোড়া এনে পেতে দিতো, আর 'দিদিমা' বলে ওঁকে একেবারে ঘিরে ধরত। কথা বলতেন খুব কম। থিয়েটারের সবাই খুব সম্ভ্রম করতেন ওঁকে। আমি দূর থেকে ওঁকে দেখতে দেখতে ভাবতাম, এই কি তিনি, যাঁর কথা এত শুনেছি, সেই দীর্ঘাঙ্গিনী সুন্দরী তেজস্বিনী নায়িকা বিনোদিনীই কি এই বৃদ্ধা মহিলা?

অভিনয়ান্তে কাছে এসে প্রশ্ন করেছি—কেমন দেখলেন মা?

অপূর্ব স্নেহমণ্ডিত মুখখানি, বলতেন—বেশ, বাবা।

বাড়িতে ওঁর নাতি-নাতনী, শুনেছি, বাড়িতে পুজো-অর্চনা লেগেই আছে, তবু থিয়েটার দেখতে ওঁর ঠিক আসা চাই। কৃষ্ণভামিনী 'সরলা' করে এসে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। উনি ওঁকে আশীর্বাদ করলেন। ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলেন, উনি ওঁর কল্যাণ ও শুভকামনাই করলেন। কিন্তু, কৃষ্ণভামিনীর অমন যে সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন, সে-ও একদিন অকালে গেল মিলিয়ে! কিরণবালার মতো কৃষ্ণভামিনীও বেশীদিন বাঁচে নি, অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। কিন্তু, সে বৃত্তান্তও বলা যাবে যথাসময়ে।

এর পরে স্টারে খোলা হলো ক্ষীরোদপ্রসাদের নতুন নাটক "গোলকুণ্ডা"—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫, বুধবার—রাত সাড়ে সাতটায়। পরদিন—বৃহস্পতিবারও ঐ সময়ে হয়েছিল গোলকুণ্ডা। এতে প্রধান ভূমিকা ছিল 'হাসান'—সেটি করলে নির্মলেন্দু। অন্য বড়ো পার্ট মীরজুমলা, সেটি করলেন তিনকড়িদা। ঔরংজেব—আমি। কুতুব সা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। আমীন—সন্তোষ দাস (ভুলো)। সুবাসিনী ততদিনে আবার ফিরে এসেছে স্টারে, সে করলে—সেলিমা। মণিজা—রানীসুন্দরী। আরজমন্দ্—কৃষ্ণভামিনী। অহিরন—নিভাননী। 'বিজলী' লিখলে ২৭শে ফেব্রুয়ারী—"গোলকুণ্ডার' অভিনয়ের কথা বলতে বসে, প্রথমেই মনে পড়ে এর নায়ক হাসানের কথা। এই হাসানের ভূমিকা নিয়েছিলেন নির্মলেন্দুবাবু। সত্যাশ্রয়ী ও ঈশ্বর বিশ্বাসীর নির্ভীক উদাসীন ভাব, মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতের অভিমান ও স্নেহ-পিপাসা, উদার-প্রেমিকের সংযত প্রেম এবং অভিমানী স্বভাবের সাময়িক উত্তেজনা তাঁর সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে দর্শকদের একেবারে তন্ময় করে রেখেছিল। এর পরেই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়। গোলকুণ্ডার ঔরংজেব নিতান্তই অপ্রধান চরিত্র। এই ভূমিকায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাবার অবসর নাট্যকার রাখেন নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অহীন্দ্রবাবু তাঁর শান্ত সংযত অভিনয়ের দ্বারা ছদ্মবেশী ফকির কৌশলী ও কুশাগ্রবুদ্ধি ঔরংজেবের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাহা একান্ত উপভোগ্য।∴অতি অভিনয়ের—ওভার অ্যাক্টিং-এর ঝোঁক কমিয়ে অহীন্দ্রবাবু যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এতে তাঁর শক্তি ও গ্রহণ-সাপেক্ষ মনেরই পরিচয় দেয়। আমরা তাঁর এই সুন্দর নিখুঁত অভিনয় দেখে শুধু বিস্মিতই হইনি, আনন্দিতও হয়েছি।"

'বেঙ্গলী' লিখলে ১লা মার্চ তারিখে—"The principal attractions of the play are the beautiful rendering of the part of Aurangjib by Mr. Ahindra Chowdhury and that of Hasan by Mr. Nirmalendu Lahiri."

আর্ট থিয়েটারে—যখনই যে-পার্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি কখনো না করিনি। 'গোলকুণ্ডা'র ঔরঙ্গজেব-চরিত্রটি ছোট পার্ট, কিন্তু তাহলেও আমি 'না' করলাম না। এবং মনে খুঁতখুঁতিও ছিল না। কারণ, পড়ে দেখলাম, পার্টটি ছোট হলেও, পার্টটি ভালো, পার্টের মধ্যে একটা বিশেষত্ব বিদ্যমান। ঔরঙ্গজেবকে এখানে যেরকম দেখানো হয়েছে, তাতে অদ্ভুত লাগল ভূমিকাটি। গোলকুণ্ডা তিনি জয় করতে চান, কিন্তু পিতার নিষেধ, সেজন্য যুদ্ধাদি করা চলছে না, তাই নিয়েছেন কৌশলের আশ্রয়। ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজ্যের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই ঘটনার প্রক্ষেপনটি ভালো লাগল। প্রথম দৃশ্যেই তাঁর পুত্র মহম্মদকে তিনি যেখানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন গোলকুণ্ডা তাঁর চাই কেন, সেখানকার সংলাপাংশও বেশ ভালো লাগছে। কথায়-কথায় পুত্রকে তিনি বলছেন—"মহম্মদ, ধর্মের জন্য রাজ্য, না, রাজ্যের জন্য ধর্ম ?...মুর্খ, এখনো হাঁ করে মুখের পানে চেয়ে ? খাওয়ার জন্য বাঁচা, না, বাঁচার জন্য খাওয়া ?"

মহম্মদ বললে—বাঁচার জন্য খাওয়া।

ঔরঙ্গজেব বললে—ব্যস, তাহলে ধর্মের জন্য রাজ্য।

ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের এই দিকটাই আমার মনে সাড়া জাগালো বেশী। ধর্মের ভণ্ডামী নয়, ধর্মের প্রতি যথার্থ অনুরাগ ও বিশ্বাস। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ইতিহাস পড়েও একথা মনে হয়েছে, ধর্মের ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবের কোনো ভণ্ডামী ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্মবিস্তারের জন্য রাজ্য-বিস্তারের প্রয়োজন। তাঁর কাছে ধর্ম হচ্ছে শক্তি, আর এই শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে রাজ্যবিস্তারে। ঔরঙ্গজেবের চরিত্রটিকে আমি অন্তত এইভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলাম।

গোলকুণ্ডায় ঔরঙ্গজেবের যতগুলি দৃশ্য আছে, সবগুলিই বিচিত্র রকমের। অভিনেতা-হিসাবে তাতে আমি 'রস' পেয়েছিলাম। যেমন ধরা যাক পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনাটি। ফকিররূপে ঔরঙ্গজেব ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে এসময় চিনতে পেরেছেন কুতুব সা'র লোক। পারসিক রেজাক খাঁ ছিলেন কুতুব সার বিশ্বস্ত অনুচর, তিনি ওঁকে চিনতে পেরে বলছেন—

—সুলতান, আপনি বন্দী।

ঔরঙ্গজেব বললেন—জীবন থাকতে ঔরঙ্গজেব বন্দী হবে না।

—তবে অস্ত্র ধরুন।

ঔরঙ্গজেব বললেন—করুণাপরবশ হয়ে একসময় আমিই যাকে পঞ্চসহস্র সৈন্য ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলুম তার সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্রও ধরব না।

তারপরে, আরও কিছু কথাবার্তার পর রেজাক খাঁ বললেন—তবে প্রস্তুত হোন।

ঔরঙ্গজেব বললেন—একটু ঈশ্বরের আরাধনা করবার সময় দিতে আপত্তি আছে?

—না স্থলতান, আমিও মুসলমান।

তারপরে, বইতে লেখা আছে—"(ঔরঙ্গজেব উপাসনায় বসিলেন)"।

এটা ঔরঙ্গজেবের ভণ্ডামী নয়, মনেপ্রাণে এটা উনি বিশ্বাস করতেন বলে আমার ধারণা, যে, ঈশ্বরের আরাধনাকালীন তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, এবং ঈশ্বরের আরাধনার ফলস্বরূপ আকস্মিক বিপদ থেকে তিনি উদ্ধারও পাবেন। স্যর যদুনাথ ঠিক এধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন তাঁর বইতে। আফগানিস্তানের উত্তরে ছিল 'বাল্‌খ্‌' বা বাহিলক দেশ, সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে, সম্রাট সাজাহান তাঁকে পাঠিয়েছেন সেনাপতি করে। বাহিলকের অধিবাসীরা প্রবল যোদ্ধা ছিল—শক্তিমান ছিল—তার ওপরে পার্বত্য দেশ—কঠিন ও বন্ধুর পথ আজকের দিনে যাকে গেরিলা যুদ্ধনীতি বলে, সেইভাবে যুদ্ধ চালাতো তারা, এদিক থেকে ওদিক থেকে আচম্‌কা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা। স্থতরাং সহজ নয় এদের সঙ্গে যুদ্ধ-চালানোর ব্যাপারটা। অনেক সেনাপতি পাঠানোর পর অবশেষে ঔরঙ্গজেবকে সেখানে পাঠালেন সাজাহান। বলা বাহুল্য, এ-যুদ্ধ তিনি জয়ও করেছিলেন। ভাষান্তরে, দমনও করেছিলেন বাহিলকবাসী বিদ্রোহীদের। তা', এই যুদ্ধবর্ণনার মধ্যেই এক-জায়গায় আছে, যে, যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ ঔরঙ্গজেব দেখলেন—সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। যেই দেখা অমনি তিনি করলেন কী? হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নেমে এসে—কার্পেট পেতে—ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেরই মাঝখানে নামাজ পড়তে শুরু করে দিলেন। দৃশ্যটি এমন অভিনব যে, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে, সবাই যুদ্ধ থামিয়ে অবাক হয়ে—তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে! ঔরঙ্গজেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই, 'ভগবানের নাম যখন করছি তখন বর্ম হয়ে ঘিরে থাকবে আমাকে তাঁর আশীর্বাদ, কেউ আমাকে তখন বধ করতে পারবে না।'

এখন, এই যাঁর একান্ত বিশ্বাস, তাঁকে ধার্মিক না বলে ভণ্ড বলি কী করে?

এটা পড়া ছিল, তাই 'গোলকুণ্ডা'র ঐ দৃশ্যটিতে আন্তরিকভাবেই তিনি নামাজ পড়তে শুরু করলেন। প্রার্থনা করলেন, পরে উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে হলো কী, অতর্কিতে অন্যত্র আরেক বিপদ দেখা দিল, যার জন্য রেজাকের স্ত্রী সেলিনা ফিরেএসে স্বামীকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন। রেজাক বললেন ঔরঙ্গজেবকে—'আমি চললুম আরেকজন ফকিরকে রক্ষা করতে।' চলে গেলেন রেজাক খাঁ।

বর্ণনায় বিস্তারিত কিছু এনে লাভ নেই, মোট কথা, বড়ো শান্তি পেলাম অভিনয়টি ক'রে। হাসান-মীরজুমলা—এসব হচ্ছে বড়ো পার্ট তাদের তুলনায় 'ঔরঙ্গজেব' কিছুই নয়। তবু তাঁর চালচলন—তাঁর মুখের ভাষা—শুধু তাঁর মুখেরই বা কেন, সর্বত্রই সংলাপাংশ অত্যন্ত মধুর—প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল। অভিনয়টা ক'রে মনে একটা কামনা জাগল—ঔরঙ্গজেবের বড়ো পার্ট কি আমি কোথাও করতে পাই না? এমন একখানা বই, যাতে ঔরঙ্গজেবের পার্টটা বড়ো আছে, তাতে যদি অভিনয় করি, ত কেমন হয়?

এ' অভিলাসের ফলস্বরূপ কী হয়েছিল, সেকথা যথাসময়ে বলব, আপাতত 'গোলকুণ্ডা'র ব্যাপারটা শেষ ক'রে নিই। অভিনয় তো ভালোই হয়েছিল, কিন্তু গোলকুণ্ডা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বেধে গেল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ। ইনি যদি সমালোচনা লেখেন, তো উনি দেবেন সে সমালোচনার উত্তর। এইভাবে আবার উত্তর-প্রত্যুত্তরও চলতে থাকে। "অবতার" ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৫)-এ লিখলে—"গোলকুণ্ডা কী? উহা কি নাটক? সন্দেহ হইল। নাটকের উপাদান কবিত্বের সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে; নাটকত্ব ফুটে নাই, কিন্তু ছত্রে-ছত্রে এমন কবিত্ব ফুটিয়াছে, যাহা দুর্লভ। সত্যই ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা এমনই শক্তিময়ী।"

"বৈকালী" লিখলে—ওটা নাটকই নয়, নাটক হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার উত্তরে "শিশির" আবার লিখলে—নাটকটি খুবই ভালো। ইত্যাদি।

"শিশির"কে তৎক্ষণাৎ আবার আক্রমণ করলে "বৈকালী"। তখন "বৈকালী" যেভাবে লিখতেন, তাতে "বৈকালী"কে অনেকে স্টারেরই কাগজ বলে মনে করত। এমন যে 'বৈকালী'—সে-ও হঠাৎ ক্ষেপে গেল। পরস্পরের মধ্যে এইসব চলতে চলতে হঠাৎ দেখি, 'শিশির'ও বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা শেষপর্যন্ত নাটক ছেড়ে স্টারের কর্তৃপক্ষের সমালোচনা শুরু করে দিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল—এ বই রবিবারে ম্যাটিনীতে পড়লে ফুল ফুটে যেতো। কিন্তু তা'হবার আছে কী? অপরেশচন্দ্রের নাটক তো নয়—স্টারে নতুন সব লোকজন এলেন, কতো আশা হ'লো আমাদের, এখন দেখছি সেই পেশাদারী হাতে গিয়েই সব পড়েছে, ওঁরা সে-সব দেখেও দেখছেন না। এর উত্তরে অন্য কাগজ লিখলে—এসব কেন? নাটক দেখ—নাটকের সমালোচনা করো—এসব আলোচনা কেন? আমরা তো দেখছি স্টার সপ্তাহে পাঁচ দিনই অভিনয় করাচ্ছেন, স্টার বারদোষ পর্যন্ত মানছেন না।

এইসব আলোচনা এতদূর শেষপর্যন্ত গড়ালো যে, স্টারের কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে 'শিশির'কে বলে বসলেন—ঘরের কথা তাঁরা যদি এভাবে বলা শুরু করেন ত, তাঁরা বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেবেন।

'শিশির' তাতে গরম হয়ে লিখলে—'বিজ্ঞাপনের জন্য লিখি নাকি? ওঁরা কী মনে করেছেন?' ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত 'নবযুগ' করলে কী, ২৮।২।২৫ তারিখে দুটো কার্টুনই ছেড়ে দিলে। রঙ্গালয়ের দরজার সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাকে দেখে একটি সারমেয় 'অসন্তোষের চীৎকার' করছে। ওপরে ক্যাপশন—বিজ্ঞাপন পাইবার পূর্বাবস্থা। পাশের ছবিটিতে লেখা—বিজ্ঞাপন পাইয়া—তাতে দেখানো হয়েছে—সারমেয়টি মাংসের টুকরো খাচ্ছে। নীচে, ক্যাপশন—'অনুমোদন-জ্ঞাপন।'

ব্যাপারটা তখন ঐ পর্যন্ত গিয়ে গড়ালেও, পরে, 'জনা' অভিনয়ের সময়ে আবার এধরনের বাদ-বিসম্বাদ উঠেছিল উত্তাল হয়ে। সমালোচকে-সমালোচকে সে যুদ্ধ গড়িয়েছিল একেবারে খেউড় পর্যন্ত।

স্টারে ততদিনে নতুন আর কী বই ধরা যায় সেই সব ভাবছেন, ইতিমধ্যে "ফরোয়ার্ড" কাগজে আবার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বেরুলো "গোলকুণ্ডা"র। সমালোচনার নীচে কারুর নাম নেই কিন্তু ইতিহাসের খুঁটিনাটি নিয়ে এমন মাথা ঘামানো—মনে হলো, এ আমাদের রাখালদা না হয়েই যায় না নইলে, ইতিহাসের কচ্‌কচি নিয়ে এসব ব্যাপার আর করবেন কে? দেশে তখন শ্রদ্ধেয় ও প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক অনেকেই রয়েছেন, কিন্তু, নাট্যসমালোচনা করেন—অথচ ঐতিহাসিক—এমনটি রাখালদা ছাড়া আর কে হতে পারেন? তাতে, আমার পাগড়িটা ঠিক হয়নি ইত্যাদি ধরনের সমালোচনাও ছিল। লিখেছেন—

'The author choose the right place for the setting of his story, but he forgot to study the locality. Names of places and persons are delightfully mixed up"

আরও লিখেছেন— 'Aurangzeb himself appears in the garb of a Fakir, a sort of garb which no respectable Musalman Fakir will ever wear···The Fakir usually wears a garment of patchwork called the "Jallah." No Musalman Fakir ties the turban on his head in the fashion in which Mr. Ahindra Chowdhury docs it. His turban reminds one of the first attempts of Behari syces after obtaining their first employment in Calcutta.

এই সময় আরও এক রীতি কাগজে কাগজে দেখা যেতে লাগল খুব, সে হচ্ছে পত্র-প্রেরকদের পত্র ছাপানো। আগেও ছিল, তবে এতটা ছিল না। নালিশ থাকলে পত্রলেখক লিখতেন বই কী! কিন্তু, এখন আর সে-সব নয়, এখন সমালোচনা, এমন কি নিছক পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্যও কেউ কেউ লিখতেন। এঁদের বলা যায়—"ফ্রী লন্সার" সমালোচক। কে কতোটা ইয়োরোপীয় থিয়েটার বুঝেছেন, সে সব জ্ঞানের প্রকাশই থাকত বেশী। এধরনের পত্রপ্রকাশ আগেও ছিল, তবে এবার হলো বেশী। "গোলকুণ্ডা" নাটকের "হাসান" (নির্মলেন্দু) সম্পর্কে প্রত্যেকটি কাগজ একবাক্যে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তবু পত্র আসতে লাগল কাগজে-কাগজে কেউ লিখেছেন —'হাসান' চরিত্রটি বুঝতে পারেনি লোকে। এবং এই বুঝতে-না-পারার প্রসঙ্গ কেউ কেউ আবার পত্রযোগে চরিত্রটা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে বসলেন। সে এক কাণ্ড!

ঐ সময়, তারিখটিও উল্লেখ করতে পারি, ২৫ সালেরই ১০ই মার্চ—ফরোয়ার্ডে বিরাট এক প্রবন্ধ বেরুলো—"আর্টিস্টস্ অফ দি নিউ এরা" শিরোনামা দিয়ে। শিশিরবাবু, আমি ও তিনকড়িদা—এই তিনজনের অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনাই ছিল তার বিষয়বস্তু। এধরনের প্রবন্ধ পরে আরও কতো বেরিয়েছে, কিন্তু, আমাদের নিয়ে সে-ই বেরিয়েছিল প্রথম। লোকের তখন ওসবে লক্ষ্য পড়েছে, এটাই হচ্ছে—খবর। পরে কিছু কিছু অবকাশ মতো তুলে দেওয়া যাবে।

যাই হোক, প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে আবার চলে এসেছি। ১১ই ফেব্রুয়ারী—অসুখ থেকে উঠে—

দুর্গাদাস এসে আবার কাজে যোগদান করলে—'ইরাণের রানী'তে তার পূর্বতন 'কাজী'র ভূমিকায়। ততদিনে কৃষ্ণভামিনীও কাজে যোগ দিয়েছে; সুবাসিনীও ফিরে এসেছে। সবাই পুরনো, একমাত্র 'দাউদশা' গেছে বদলে, 'দাউদশা' এবার করলেন নরেশ মিত্র।

তারপরের দিন—বৃহস্পতিবার—খোলা হলো—বঙ্কিমের "মৃণালিনী"। পুরাতনের মধ্যে নির্মলেন্দু—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত—নীহার যে-যার ভূমিকা করলে, দানীবাবুর 'পশুপতি' এসে হঠাৎ-ই পড়ল আমার ঘাড়ে। 'দিগ্বিজয়' সাজলেন কাশীবাবু। গিরিজায়া সাজলেন আশ্চর্যময়ী (যদিও সুবাসিনী ফিরে এসেছে), মনোরমা—সুশীলাসুন্দরী। এঁর 'মনোরমা' মিনার্ভায় আমি আগেও দেখেছি। আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়ে উনি প্রথম ভূমিকাই করলেন—এই মনোরমা! সুন্দর কণ্ঠস্বর নিখুঁত উচ্চারণ, দেখতেও ছিলেন—দীর্ঘাঙ্গিনী যাকে বলে 'স্টেজ-ফিটিং চেহারা!' ওঁর এইসব গুণাবলীর জন্যই যখন প্রথম এলেন স্টেজে, তখন একেবারে 'নায়িকা'র ভূমিকা নিয়েই দেখা দিয়েছিলেন। সেযুগে—সেই 'মিশর-কুমারী'র যুগে—প্রথমে—এসেই করলেন একেবারে—'নাহরিণ'-এবং অধ্যাপক মন্মথনাথ বসুর শিক্ষকতায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন সুশীলাসুন্দরী এই গুণগুলি থাকার দরুণ। আর্ট থিয়েটারেও পরে ইনি অনেক ভালো ভালো পার্ট করেছিলেন।

পশুপতি—আমার আগে দানীবাবুই করেছেন—মাঝে মাঝে তিনকড়িদাও করেছেন। আমার দানীবাবুর রকমটি পছন্দ হওয়াতে প্রায় সেই-ধরনেরই করলাম। বিশেষ করে, সেই দৃশ্যে, যেখানে অষ্টভুজা মাতৃমূর্তিকে তুলে নিয়ে বিসর্জন দিতে চলেছেন পশুপতি। দানীবাবু সে সময় যেরকম ভাবে বাঁ-হাঁটু পেতে, ডান হাঁটু উঁচুতে রেখে বাঁ-হাতে দেবীর চরণ বেষ্টন করে—ডান হাতে তাঁর কোমর ধরে—আর কাঁধটা প্রতিমার কটিদেশে চেপে রেখে—মুখটা বেঁকিয়ে দর্শকের দিকে তাকিয়ে সংলাপ বলতেন, আমিও সেটা হুবহু করেছিলাম। অবশ্য, এজায়গায় যে-ধরনের সংলাপ আছে, তা ঠিকভাবে বলতে গেলে, আর কোনো ভঙ্গিতে হয় বলে মনে হয় না, তাই গিরিশচন্দ্রের ঐ ভঙ্গিমার যে ছবি দেখেছিলাম—সেটা অনুসরণ করতেন দানীবাবু—তিনকড়িদাও তাই করে গেছেন,—সেই ছবি একেবারে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল মনে, তার থেকে অন্যরকম করবই বা কেমন করে?

আমার সৌভাগ্য দানীবাবুর বদলে আমি নামাতে, দর্শকরা কোনো আপত্তি করেননি এবং কাগজও অখ্যাতি করেননি।

এই নাটকের পর প্রস্তুতি চলতে লাগল বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' অভিনয়ের। এতে আমার ভূমিকা কিছু ছিল না। ৪ঠা মার্চ বুধবার 'বিষবৃক্ষ' খুলে গেল। নগেন্দ্রনাথ—দানীবাবু, শিরীশচন্দ্র—নির্মলেন্দু, হরদেব—ননীগোপাল মল্লিক, ডাক্তার—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, সূর্যমুখী—কৃষ্ণভামিনী, কমলমণি—রানীসুন্দরী, দেবেন্দ্র—আশ্চর্যময়ী—কুন্দনন্দিনী—নীহারবালা, হীরা—সুবাসিনী।

সত্যি কথা বলতে কী, এই বইতে অভিনেত্রীদের অভিনয়ই সব চাইতে সেরা হয়েছিল। বিশেষ করে, সূর্যমুখীর ভূমিকা কৃষ্ণভামিনী যা করলে, তা' এককথায়—অপূর্ব। একদিকে তেজস্বিনী—মহিমময়ী,

স্বামী-সোহাগিনী, অন্যদিকে ঘটনা পরম্পরায়—স্বামীর অনাদৃতা হয়ে যে মলিন মূর্তিতে পরিণত হলেন,—এদুটি অবস্থাই অতি সুন্দররূপে ফুটিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। বিশেষ করে যেখানে কমলমণিকে আসতে লিখেছেন সূর্যমুখী, কমলমণি এসেছে, বৌদিকে খুঁজছে—গোধূলিবেলা—সন্ধ্যা হয়ে আসছে—সে ডাকতে ডাকতে ঢুকছে—আর একটা ঘরে মলিন বেশে ম্লানমুখে তন্ময় হয়ে নিজের অবস্থার কথা নিজের স্বামীর কথা ভাবছেন সূর্যমুখী কমলমণির ডাক তার কানে ঢুকছেও না!

কমলমণি ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেছে, বললে—এ কী বউ, তুমি এভাবে—এখানে?

যে ঘরে সূর্যমুখী বসেছিল, সে ঘরে তার বাস নয়। ভাবটাও সূর্যমুখীর অনুরূপ নয়, কমলমণির তাই বিস্ময়।

সূর্যমুখীর তখন চমক ভাঙ্‌ল, সে তাড়াতাড়ি—"ও-ঠাকুরঝি" ব'লে উঠে, জড়িয়ে ধরলে তাকে দুহাতে, ধরে, তার বুকে মুখ রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

এত ভালো করলে যে, হাততালি পড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে। কৃষ্ণভামিনীর ঐ "ও-ঠাকুরঝি" বলা—আর তারপর সবটাই ত নির্বাক অভিনয়, কিন্তু এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন দর্শক, যে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

আমি বসেছিলাম ভিতরে, ইন্দু উইংসের পাশ থেকে দেখছিল, এসে বললে—দেখলে না? পরে দেখো।

আমি যা ভেবেছিলাম, কৃষ্ণভামিনী উত্তরোত্তর উন্নতি করবে, তাই হলো। ওর সত্যিই প্রতিভা ছিল, তার বিকাশ হচ্ছে পূর্ণ বিভায়!

এইভাবে "বিষবৃক্ষ"-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ হয়ে গেল, তৃতীয় অভিনয় হবে ১৮ই মার্চ। দানীবাবু তখন বিদেশে গিয়েছিলেন। রাঁচীতে ওঁর স্ত্রী ছিলেন—কী যেন অসুখ—আজ মনে নেই—সেখানেই চিকিৎসা চলছিল—রেডিয়াম ট্রিট্‌মেণ্ট না কী—দানীবাবু সপ্তাহে সপ্তাহে যেতেন, সোমবার ফিরতেন। কিন্তু এবার, মঙ্গলবার রাত্রে হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো, দানীবাবু আটকে পড়েছেন, আসতে পারছেন না। কী হবে? কে করবে নগেন্দ্র?—না, ঐত অহীন রয়েছে।

এবারেও সেই "হঠাৎ"। নগেন্দ্র করতে হবে। মঙ্গলবার রাত্রে টেলিফোন করে যে-যে কাগজে পারা গেছে, বিজ্ঞাপনে দানীবাবুর নাম পাল্‌টে আমার নাম দেওয়া হলো, কোনো-কোনো কাগজে দানীবাবুর নামই বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে করতে হলো—"নগেন্দ্র।"

সে সময়ে, দানীবাবুর ভূমিকায় অপরকে নামাতে গেলে মারামারি ব্যাপার হয়ে যেতো। মিনার্ভায় উনি 'শঙ্করাচার্য'তে, নাম-ভূমিকায় নামতেন, একবার ওঁর বদলে অন্যকে নামানোতে হৈ-হৈ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। সেসব ঘটনা জানা ছিল বলেই আমার ভয়ের অন্ত ছিল না। আমাদের আর্ট থিয়েটারেও অনুরূপ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। সরলা-র 'গদাধর' পুরনো স্টার থিয়েটারে করেছিলেন কাশীবাবু, এ ভূমিকায় ওঁর রীতিমত নাম ছিল, কিন্তু আমাদের স্টারে দানীবাবুর বদলে ওঁকে একবার

নামানো হ'লো, কিন্তু দর্শক উঠল হৈ-হৈ ক'রে, কিছুতেই নিলে না। এই নিয়ে সপক্ষে-বিপক্ষে কাগজে খুব লেখালেখিও হলো। কেউ কেউ লিখলেন—ওঁর মতো নামজাদা অভিনেতাকে নামিয়ে এভাবে অপদস্থ করা কেন, ইত্যাদি।

'নগেন দত্ত' সেজে হঠাৎ-ই নামতে যাচ্ছি, রূপসজ্জা সেদিন যতই শেষ হয়ে আসছে, যতই এগিয়ে আসছে 'বিষবৃক্ষ' শুরু হবার কাল, ততই মনে পড়ছে ঐসব কাহিনী, আর ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠছে। প্রবোধবাবুকে যেমন নতুন ভূমিকা করবার সময় প্রণাম করতে যেতাম, আজও গেছি।

বললাম—নামালেন ত, কী যে হবে, জানি না।

বললেন—কিচ্ছু হবে না, নেমে যাও দেখি। সকালে—কাগজে নাম বেরিয়েছে তোমার! তবে আর ভয়টা কিসের?

বললাম—কোনো-কোনো কাগজে বেরিয়েছে, কোনো কোনো কাগজে বেরোয়নি। যারা তা দেখেনি, তারা যদি গোলমাল করে?

বললেন—করে ত দেখা যাবে'খন।

অবশেষে স্টেজে ত নামলাম। নগেন দত্ত করে গেলাম বটে, কিন্তু বেশ ভয়ে ভয়ে। অথচ, আমার পরম সৌভাগ্য, গোলমাল ত হ'লোই না, অভিনয়ের সময় মাঝেমাঝে যে ব্যঙ্গোক্তি বা বক্রোক্তি ভেসে আসলেও আসতে পারে বলে আশা করেছিলাম, তা-ও এলো না। দর্শক নীরবেই শুনে গেলেন আমার 'নগেন দত্ত'।

প্রবোধবাবু বললেন—দেখলে ত? জায়গায় জায়গায় এপ্‌লজ' পর্যন্ত পেয়ে গেছ। গোলমাল ত দূরের কথা।

একটু অবাক হয়েই বললাম—তাইত দেখছি।

প্রবোধবাবু বললেন—তোমার একটা কাজ করা উচিত। প্রেসে নোট দিয়ে ধন্যবাদ জানানো উচিত দর্শকদের।

ওঁর পরামর্শে তা-ই দিলাম। অনেকগুলি ইংরেজি ও বাংলা কাগজে বেরিয়ে গেল আমার ধন্যবাদ-জ্ঞাপন পত্র। "নায়ক" থেকে তুলে দিচ্ছি। ২১শে মার্চ 'নায়ক'-এ বেরিয়েছিল—'নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু'—এই শিরোনামা দিয়ে। 'মহাশয়, আপনার সুবিখ্যাত পত্রের মারফত আমি আমার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতৃগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে গত বুধবার রাত্রে আমি কিছুতেই বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকার অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারিতাম না। নাট্যাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের অসুস্থতার জন্য আমাকে হঠাৎ একরকম অপ্রস্তুত অবস্থাতেই নগেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তবু যে সুধী দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার মূলে তাঁহাদেরই উৎসাহ ও সহানুভূতি। বশম্বদ—অহীন্দ্র চৌধুরী।'

কিন্তু এরও আবার বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল কোথাও-কোথাও। কেউ কেউ বললেন—'এ আবার কি রকম প্রচার-পন্থা!' হয়ত এটা প্রচারই, কিন্তু থিয়েটারের ব্যাপারে প্রচারই যে সব! পোস্টারে পোস্টারে—হ্যাণ্ডবিলে—হ্যাণ্ডবিলে 'অভাবনীয় অভূতপূর্ব' বলে যে-সব লেখা হয়, সে-ও প্রচার, ঘটা করে যেসব নাম দেওয়া হয়, সে-ও ত প্রচার! সেই জন্যই বলছি, যদি এই সুযোগে কর্তৃপক্ষ আমার কিছু প্রচার করে থাকেন ত, সেটা নাটকের জন্যই করেছেন। ব্যবসার জন্য তাঁদের প্রচার করতেই হবে। শুধু গুণ থাকলেই চলবে না, তার প্রচারও চাই। আমি দীর্ঘকাল এই যে অভিনেতা-জীবন যাপন করেছি, তাতে হিসেব করে দেখেছি, বিভিন্ন স্বত্বাধিকারী মিলে আমার প্রচারের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছেন। এটা কেন? স্বার্থ উভয়বিধ। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলা যেতে পারে, তখনকার দিনে ওরকম ধন্যবাদ দিয়ে প্রচার আর দেখা যায়নি। এটা অবশ্য অভিনব।

কিন্তু সে যাই হোক, 'বিষবৃক্ষ'-এর জন্য এ' প্রচারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, এর পিছনে প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল না। 'বিষবৃক্ষ'-এর জন্য বিশেষ প্রচার ছিল অন্য দিক দিয়ে। আর্য থিয়েটার বিজ্ঞপ্তি দিতেন—'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকার সঙ্গীত যুদ্ধ।' এই হিসেবে। ১৩ই মার্চ 'নাচঘর' যে সমালোচনা করেছিলেন, তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টা পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে আশা করি।

"আর্ট থিয়েটার তাঁদের বিজ্ঞাপনপত্রে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকার যে সঙ্গীত-যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাতে মনে হলো যেন জয়মাল্যটা দর্শকেরা সকলেই এই হীরার কণ্ঠেই দুলিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়েছেন। আমরা সেদিনের দর্শকদের সুবিচার সম্পূর্ণ অনুমোদন করতে পারি। সত্য সত্যই সেদিন শ্রীমতী সুবাসিনী সঙ্গীত ও অভিনয় এই দুইয়েরই নৈপুণ্য দেখিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।" 'বিষবৃক্ষ'-এ দেবেন্দ্র দত্তর ভূমিকাতেই গান ছিল বেশী, ঐ পার্টটিই গায়কের পার্ট ছিল। আগে আগে হীরার ভূমিকার জন্য গায়িকার দরকার হতো না। অবশ্য তখনকার দিনের অধিকাংশ অভিনেত্রীই মোটামুটি গান জানতেন, একটি কি দুটি গান ভূমিকায় থাকলে প্রায় সকলেই চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গীতপিপাসু দর্শকের সংখ্যা তখন ছিল বেশী, গায়ক বা গায়িকার সুকণ্ঠ থাকলে তাঁরা তা বেশ বিচার করেই দেখে নিতে পারতেন। নাটকে গানেরও তখন বিশেষ এক স্থান ছিল। সেইজন্য সম্প্রদায়ে ভালো গায়ক বা গায়িকা রাখতেই হতো, নইলে দল চালানো কঠিন হতো। আমাদের স্টারে তখন ছিল রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা—আশ্চর্যময়ী ও সুবাসিনী। আশ্চর্যময়ী সাজলেন দেবেন দত্ত আর সুবাসিনী—হীরা। আগের তুলনায় আমাদের 'হীরা'র মুখে গান ছিল বেশী এবং সেই গানেই সুকণ্ঠী সুবাসিনী জয়মাল্য পরেছে।

দেবেন্দ্র দত্ত-র মুখে যেসব গান ছিল, তার প্রায় সব কটিই ছিল বঙ্কিমের নিজের রচনা; যেমন,—

'শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখব বলে হে, তাই
এসেছিলাম এ গোকুলে'।

'আয়রে চাঁদের কণা, খেতে দিব ফুলের
মধু, পরতে দিব সোনা।'
'কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল।'
'আমার নাম হীরে মালিনী।'
'বয়স তার বছর যোলো, দেখতে-শুনতে
কাল-কোলো,
পিলে অগ্রমাসে মলো, আমি তখন
খানায় পড়ে।'
'মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়—
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়।'

শেষোক্ত গানটি ছিল হীরা ও তার সখী মালতীর ডুয়েট গান। এই দু' লাইনই মাত্র বঙ্কিমের রচনা, বাকিটা নাট্যরূপকার অমৃতলাল বসু রচনা করে দিয়েছিলেন—

'সেই অলঙ্কারের অলঙ্কার
পরবো করে গলার হার
কখনো বা সোহাগ ক'রে
জড়াবো খোঁপায়'—ইত্যাদি।

বইতে হীরার গান হিসাবে দেওয়া আছে—'স্থান দিও চারু চরণে'। তার বদলে হীরা গাইত—'সুখে কি অসুখে আছি।'

আরও একটা গান হীরা গাইত—'বড়ো ঝোড়ো হাওয়া—যায় না সহা—কি জানি কেমন মন করে।' আমাদের 'হীরা'র আরও গান বেড়েছিল। বাড়তি প্রায় সব গানই অমৃতলালের রচনা, তার মধ্যে একটি গান ছিল নিধুবাবুর বলে প্রচলিত—

'ভালোবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমারও স্বভাব প্রিয়ে তোমা বই
আর জানিনে॥'

এই গানটি নাটকে খুব জ'মে যেতো। দেবেন্দ্র এক লাইন গাইছে, হীরা অমনি তার-পরেই যেন গাইছে, যেন দেবেন্দ্র হীরাকে শেখাচ্ছে। এমনি করে করে গানখানি গাওয়া হতো। আর ওদের দুজনের এই গান শুনে দর্শক যেন একেবারে মেতে উঠত। দুজনের দুরকম গলার গান, গানের ভঙ্গিতে এবং তান লয়ে কে কাকে হারালে, তা' এই গান থেকেই দর্শকদল বিচার ক'রে দেখে নিতো। গানখানি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর রচনা বলে চলে গেলেও কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এটিকে শ্রীধর কথকের রচনা বলে মনে করেন। গানটি খুব বিখ্যাত ছিল তখন।

দেবেন্দ্রর মুখে আরেকটি গান ছিল, সেটি আমার বিশ্বাস, অমৃতলালেরই রচনা। এ গানটি লোকে খুব নিতো। গানটির আরম্ভ—

তামাকু হে
তব তুলনা নাহি বঙ্গে।
কত মাধুরী মেশা মরি অই কাল অঙ্গে।'

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এর দশম পরিচ্ছেদে—'বাবু' শিরোনামায় তামাক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করে গেছেন—'হে হুক্কে—হে আল্‌বোলে' ইত্যাদি, এ গানখানি সেই ভাবধারারই অনুস্থতি বলা চলে।

'বিষবৃক্ষ' যখন প্রথম হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে, তখন 'নগেন' করেছিলেন গিরিশচন্দ্র, আর 'দেবেন দত্ত' করেছিলেন সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্ন্যাল। পরে এমারেল্ডে যখন 'বিষবৃক্ষ' হলো, তখন মহেন্দ্র বসু (ট্রাজেডিয়ান অব বেঙ্গল যাঁকে বলা হতো) করতেন 'নগেন' আর সঙ্গীতাচার্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ করতেন 'দেবেন দত্ত।' পুরাতন স্টারে দেবেন দত্ত করেছেন কাশীবাবু। তবে দেবেন দত্ত হিসাবে এঁদের মধ্যে পূর্ণবাবুরই নাম বেশী শুনেছি, তাঁকে নাকি মানাতোও খুব সুন্দর। ঐ সময়ে ওঁদের গাইয়ে 'হীরা'র দরকার হতো না, আমাদের আমলেই 'হীরা' হলো রীতিমত গায়িকা। আমাদের এখানে আশ্চর্যময়ীকে 'দেবেন্দ্র' করায় কোনো-কোনো কাগজে মন্তব্য করা হয়েছিল, তিনকড়িবাবু থাকতে আশ্চর্যময়ীকে 'দেবেন্দ্র' দেওয়া হলো কেন? কিন্তু আশ্চর্যময়ীর অভিনয় ও গান শুনে সেকথা আর বলা চলল না। পরে, আশ্চর্যময়ীর অনুপস্থিতিতে তিনকড়িদাকে 'দেবেন দত্ত' সাজানো হয়েছে, কিন্তু হরিদাসী বৈষ্ণবী সেজে যখন তিনি বেরুলেন, তখন লোকে হেসে উঠল। লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা তিনকড়িদার বৈষ্ণবী মানাবে কেন? পূর্ণবাবুর দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, স্ত্রীলোক সাজালে তাঁকে মানিয়ে যেতো নাকি অপূর্ব সুন্দর।

তখনকার দিনের রেওয়াজের কথা বলেছি, অভিনেত্রী মাত্রেই গান জানত, তবে এদের মধ্যে যাঁরা সুকণ্ঠী, তাঁরা দর্শকমণ্ডলীতে প্রভাব বিস্তার করতেন অতি সহজে। দর্শকও ছিলেন তখন রীতিমত গান-পাগল, ভালো গায়ক বা গায়িকা চিনে নিতে তাঁদের দেরি হতো না। সেই বেঙ্গল থিয়েটারে যেদিন অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার ব্যবস্থা হ'লো, সেদিন থেকেই গাইয়ে অভিনেত্রীদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে বেশী, সমাদরও ছিল তাঁদের খুব। যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী (ভুনী), বিনোদিনী, গঙ্গামণি (গঙ্গাবাঈ), সুকুমারী দত্ত—এঁরা সবাই ছিলেন নামজাদা অভিনেত্রী ও গায়িকা। মধ্য যুগে ছিলেন নরীসুন্দরী, সুশীলাবালা। আমাদের সময়ে স্টারে বিশেষ অভিনয়ের দিনে যখন জলসা হতো, নরীসুন্দরী এসে মাঝে মাঝে গাইতেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর তখন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তখনো রয়েছে রীতিমত মিষ্টি। সুশীলাবালার গান দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অনেকবার শুনেছি, তিনি অকালে পরলোকগমন করলেন ১৯১৫ সালে।

বড়ো গায়িকা বলতে তখন এঁদেরই বোঝাতো, সঙ্গীতাচার্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কথা পরে যথাস্থানে বলব।

'বিষবৃক্ষ'-এর পর ধরা হলো অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা—'শিরী-ফরহাদ।' ২৭শে মার্চ, শুক্রবার খোলা হলো এই বই। শিরী—নীহার, ফরহাদ—আমি। হামজাদ—রাধাচরণ, গুলাম—কৃষ্ণভামিনী।

ফরহাদ সর্বপ্রথম করেছিলেন হাঁদুবাবু। তিনি গাইতে পারতেন। আর আমি? পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, আমার সেই যাত্রার আমলের কথা, যখন আমি রীতিমত দোহারকী করেছি। সে অভিজ্ঞতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহলেও ভাবনার কথা বই কী! একানে গান ছিল আমার একখানা আর ছিল—ডুয়েট। কবরের ভিতর থেকে শিরী গাইবে, আর তার সঙ্গে গাইবে ফরহাদ।

এ' তবু ডুয়েট, কিন্তু একানে গানখানা নিয়ে করব কী?

রাধাচরণকে বললাম—ওটা বাদ দাও, ও' গান পারব না।

রাধাচরণ বললে—আমি আপনাকে ঠিক শিখিয়ে দেবো, আপনি ভাববেন না। কতো আজেবাজে মেয়েকে শিখিয়ে তৈরি করলাম, আর আপনাকে পারব না?

চলল—সঙ্গীত শিক্ষা। তারপরে, অভিনয়ের দিন, সিনটা যখন এলো, গানটা ধরলাম মন্দ নয়, কিন্তু একানে গান ত কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলো, দমে পাচ্ছি না। রাধাচরণ পাশ থেকে চাপা গলায় নির্দেশ দিলে—তুলে গান।

গায়ক ত নই, যা হোক করে কোনগতিকে সে রাত্রে কাজ চালানো গেল। রাধাচরণ উৎসাহ দিয়ে বললে—বেশ হয়েছে।

বললাম—নাহে, শেষ গানটি আর গাইব না। শিরী একাই গাক।

—তা কী করে হয়?

তখন রাধাচরণ করলে কী, আমার হয়ে নিজেই গেয়ে দিলে। আমি কবরের মধ্যে নামতে যাচ্ছি, সেই সময় ঠোঁট নেড়ে গেলাম, আড়াল থেকে রাধাচরণ গেয়ে গেল। যাকে বলে—প্লে ব্যাক।

ফিল্মে ত এরকম প্লে-ব্যাক পরে কতোই না হয়েছে, কিন্তু স্টেজে? তা নীহারকেও বহুবার অনেকের প্লে-ব্যাক করে যেতে হয়েছে।

এই ত গেল 'শিরী-ফরহাদ।' এর পরে মার্চ মাসে প্রাচীরপত্র পড়ল—'জনা'—গিরিশচন্দ্রের 'জনা'। দিন কয়েকের মধ্যেই আবার শুনলাম—শিশিরবাবুও 'নাট্য মন্দিরে' 'জনা' খুলছেন তারাসুন্দরীকে এনে। আমাদের 'জনা' খোলা হবে—৩রা এপ্রিল। আর, ওঁদেরও 'জনা' খোলবার তোড়জোড় চলছে, ওঁরা কবে খোলেন, দেখা যাক।

সুশীলাসুন্দরী ফেব্রুয়ারী মাসে স্টারে এসে যোগদান করেছিলেন। এসেই তিনি করলেন 'মৃণালিনী'তে মনোরমা, আর তারপরে কোনো পার্ট করেননি। মনোরমা অবশ্য তাঁর করা পার্ট, মিনার্ভায়

করেছেন। এখানে মনোরমা করবার পর আর কিছু করলেন না বটে, কিন্তু রোজ আসতেন, এসে অপরেশচন্দ্রের কাছে 'জনা'র নামভূমিকার মহলা দিতেন, এ আমরা লক্ষ্য করেছি।

অতএব বোঝা গেল, 'জনা'য় জনা করবেন সুশীলাসুন্দরী। আর শিশিরবাবুর ওখানে 'জনা' করছেন কে? না, তারাসুন্দরী। শুনলাম, তিনি ওখানে যোগদানও করেছেন। খবরটায় চমক দিল, কারণ তিনি আর মঞ্চাবতরণ করবেন না, এই-ই ত শুনেছিলাম। সুতরাং হঠাৎ যে তিনি মত পরিবর্তন করলেন, এর কারণ কী?

তারাসুন্দরীর ছোট ছেলের নাম—নির্মল। 'খোকা' বলে সবাই ডাকত। ভুবনেশ্বরে ত থাকতেন তারাসুন্দরী। তাঁর ভাল্লুকপাড়ার বাড়ীতে ছেলে, দুই মেয়ে, বড়ো মেয়ের ছেলেমেয়ে এঁদের নিয়েই তিনি থাকতেন। খোকাও থাকত, পড়াশুনা করত, ইদানীং অবশ্য করত না, ছেড়ে দিয়েছিল। সেই ছেলে অর্থাৎ খোকা চব্বিশ সালের শেষের দিকে হঠাৎ মারা গেল—বছর ষোলো হয়েছিল বয়স। এই খোকাকে আমরা খুবই চিনতাম, প্রায়ই আসত আমাদের থিয়েটারে, ওকে আমরা সবাই-ই খুব ভালবাসতাম। খুব মনোযোগ দিয়ে থিয়েটার দেখত, আর যখন সমালোচনা করত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, আমরা তখন ঐটুকু ছেলের সমালোচনার নৈপুণ্য দেখে অবাক হয়ে যেতাম। একেবারে পাকা সমালোচকদের মতো! এটা ওর পূর্বজন্মের সংস্কার, না, কী? ও এলেই আমরা ওকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করতাম—খোকা, কেমন দেখলি বলত?

অমনি ও শুরু করত। আর যা ও' বলত, তাতে যুক্তি থাকত। ছেলেমানুষ বলে ওঁর কথা আমরা উড়িয়ে দিতে পারতাম না।

এ-হেন খোকা ছিল মায়ের বড়ো আদুরে ছেলে। সুতরাং সেই ছেলে যখন চলে গেল, তখন মায়ের মনের অবস্থা যে কীরকম হতে পারে, সে ত সহজেই অনুমেয়। ছেলের অসুখে থিয়েটার-মহলের চেনা ডাক্তারবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তবু রাখা গেল না।

তারাসুন্দরী ছিলেন ঠাকুরের খুব ভক্ত। ভুবনেশ্বরে ঠাকুরের নামে মঠ করে দিয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেই ছিল সেই মঠ। কিন্তু সেখানেও মন নিবিষ্ট হতে চায় না, তাই তিনি ভাবলেন, আবার কাজকর্ম শুরু করবেন, কাজে ডুবে থাকলে যদি সব ভুলে থাকা যায়! ওঁর মনের এই অবস্থাতেই নাট্য মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎকার ঘটে থাকবে, এবং তারই ফলে আকস্মিকভাবে ওঁর ঐ নাট্যমন্দিরে যোগদান!

ওদের মহলা চলছে, আর আমাদের 'জনা' খুলে গেল—৩রা এপ্রিল, ১৯২৫ সাল, শুক্রবার রাত সাড়ে সাতটায়। ভূমিকালিপি ছিল এই—বিদূষক—দানীবাবু। প্রবীর—আমি। অর্জুন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নীলধ্বজ—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। বৃষকেতু—দুর্গাদাস। অগ্নি—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দু। নায়িকা—সুবাসিনী। মদনমঞ্জরী—নীহার। জনা—সুশীলাসুন্দরী।

'জনা'য় রূপসজ্জার ব্যাপারে আমরা খুব যত্ন নিয়েছিলাম মনে আছে। বিশেষ করে আমি

আর দুর্গা নেমেছিলাম খালি গায়ে—হাতে পায়ের মতো বুকে-পিঠে পর্যন্ত রঙ করে। বেনারসী ধুতি পরতুম, আর নিতাম উত্তরীয়। সঙ্গে অলঙ্কারাদি ত ছিলই। যুদ্ধের সময় বর্ম আর তীরধনুক প্রভৃতি। এতে করে সুন্দর দেখাতো। অর্থাৎ প্রায় 'কর্ণার্জুন'এর রূপসজ্জার মতই, তবে ওতে যেমন হাতকাটা বেনিয়ানের মতো জামা পরতাম এতে আর সেটাও পরতাম না, তার বদলে গায়ে করতাম রঙ। প্রথম দিনের অভিনয়ে গাসুদ্ধ রঙ করতে হবে, তাই একটু দেরি হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি সিনে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, উত্তরীয়টি ভুলে নিয়ে আসিনি। আর যাবে কোথায়? কাগজে অমনি সমালোচনা বেরুল। কেউ লিখলেন বোধ হয় নিতে ভুলে গেছে। কেউ লিখলেন, উত্তরীয় না থাকাটা ভালো হয়নি, বিশেষতঃ ঐ দৃশ্যে।

পরবর্তী দৃশ্যে উত্তরীয় নিয়ে বেরিয়েছিলাম ঠিকই। তাতেও সমালোচনা। কেউ কেউ লিখলেন, ও দৃশ্যে উত্তরীয় না থাকলেও চলে। পুজোর সিনেই যখন উত্তরীয় ছিল না, তখন এ দৃশ্যে আবার কেন? ইত্যাদি।

এসব ছাড়া অভিনয়ের সমালোচনাও কিছু কিছু করেছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ দোষ ধরেছিলেন। কেউ কেউ বললেন—আমার 'প্রবীর' নাকি একটু 'আবদেরে' ছেলে হয়ে গেছে। উচ্চ প্রশংসিত হলো দানীবাবুর 'বিদূষক'। আগাগোড়া এত গম্ভীরভাবে হাস্যোদ্দীপক কথাবার্তা বলে গেলেন, যা এক কথায় অপূর্ব! দানীবাবুর 'বিদূষক' হাস্যরস ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে যেভাবে তাঁর প্রভুভক্তি ও দেবভক্তি প্রকাশ করে গেছেন, সে এক রীতিমত শেখবার জিনিস!

এই সময়, আরেকটি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটল। সেটি বলবার আগে আরেকটি সংবাদ দিয়ে নিই। দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবী আমাদের 'বন্দিনী' দেখে গিয়েছিলেন। এ সংবাদ বেরিয়েছিল 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃত-বাজারে' ২৪শে মার্চ।

এবার 'অভূতপূর্ব ব্যাপারটি' কী ঘটেছিল বলি। আর্ট থিয়েটারে অর্থাৎ আমাদের একটি দল আহূত হয়ে চললেন রেঙ্গুনে অভিনয় করতে। ৫ই এপ্রিল জাহাজ ছেড়েছিল আউট্রাম ঘাট থেকে। এ নিয়েও কাগজে টিকা-টিপ্পনী বেরিয়েছিল। ২রা এপ্রিল 'নায়ক' লিখলেন—'এঁরা ব্রহ্মদেশে প্রায় চল্লিশ জন যাচ্ছেন, যশোমুকুট প'রে ফিরে আসুন এই কামনা।' এর আগে অবশ্য আর কোনো দল কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে প্লে করতে যায়নি।

অন্যান্য কাগজে কিছু সমালোচনাও বেরুল এর। দল যাত্রা করবার আগেই তাঁরা লিখতে শুরু করলেন—শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেখানে গেল না কেন?

ওঁরা জানেন না; শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সবারই যাবার দরকার করে না এইজন্য যে, তাঁরা সেখানে অপেরাজাতীয় প্লেই চেয়েছিলেন, গুরুগম্ভীর নাটক নয়।

তাঁরা আরও লিখলেন—'সেইজন্য আশঙ্কা হয় আশানুরূপ সাফল্য তাঁরা নাও লাভ করতে পারেন। অবশ্য মগের মুল্লুকে গিয়ে তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙালীর

অভিনয় গৌরবের নিন্দা ও খ্যাতি তাঁদের এই অভিনয়ের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে বলেই একথা বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি।'

যাই হোক, চল্লিশ জন নিয়ে গঠিত দলটি ত চলে গেলেন। আমার যাওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল, নতুন একটি দেশ দেখব, ইচ্ছা হবে না? কিন্তু ওঁরা আমাকে নিলেন না দলে, সেজন্য আমার খুব অভিমানও হয়েছিল। অবশ্য এদিকে থিয়েটারে ত নিয়মিত অভিনয় চলেছে। দানীবাবু ফিরে এসেছেন, তবু আমি 'নগেন' করছি, এছাড়া চলেছে গোলকুণ্ডা, জনা, ইরাণের রাণী, বন্দিনী, কর্ণার্জুন। সপ্তাহে পাঁচ দিনই অভিনয়। এসব ছেড়ে আমি যা-ই বা কী করে? তবু, মন মানেনি। ওঁরা যেদিন গেলেন প্রবোধবাবুর নেতৃত্বে, সেদিন আমি ওঁদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আউট্রাম ঘাটে পর্যন্ত যাইনি।

অথচ তারপরে যা ঘটল, সে অতি মজার ব্যাপার। রেঙ্গুনে ওঁরা পৌঁছেছেন, সেখানে প্লে শুরু হবে কি হয়েছে, এমন সময় রেঙ্গুন থেকে এলো টেলিগ্রাম—'অহীন্দ্রকে পাঠাও'। সে কী একটা? ঘন ঘন টেলিগ্রাম। অহীন্দ্রকে চাই।

এবার আমিই বসলাম বেঁকে। তখন নিয়ে গেল না, এখন ডাকছে। বলে বসলাম—যাব না।

ব্রহ্মদেশে স্টারের এই যে অভিযান, এর পিছনে একটা আবার ইতিহাস আছে। এবং সেই ইতিহাস গ'ড়ে উঠেছিল আমাকে কেন্দ্র করেই। এই যে ওঁদের রেঙ্গুন যাবার যোগাযোগটা ঘটে গেল, তার হেতু পর্যন্ত আমি। সেটা এবার বলব। বললে, পাঠক আমার অভিমানের কারণটা বুঝতে পারবেন।

বার

১৯২৫—১৯২৫

ঘটনাটি ১৯২৪ সালের। হঠাৎ স্টার থিয়েটারের ঠিকানায় আমার নামে একখানা চিঠি পেলাম, চিঠিটা আসছে রেঙ্গুন থেকে। সময়টা যতদূর মনে পড়ে পুজোর পরই হবে। পত্রপ্রেরক লিখছেন, তাঁকে এক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর এজেন্ট্ হিসাবে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সেইসব কাঠ কলকাতায় চালান আসে। এবং এইসব কর্মব্যপদেশে তাঁকে তখন যেতে হয়েছিল—ফিজি আইল্যাণ্ডে। সেই প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিজি দ্বীপপুঞ্জ যাহার কথা কৈশোরকালে ভূগোলে পড়েছিলাম, নিউজীল্যাণ্ডের অনেকটা উত্তরে, ম্যাপে তখন দেখতাম মনে আছে, পূর্ণবাবু ম্যাপে দেখিয়েছিলেন। তা এই ফিজি আইল্যাণ্ডে পত্রপ্রেরক হঠাৎ একখানা ভারতীয় ফিল্ম দেখলেন—'সোল অফ এ স্লেভ'। পত্রপ্রেরক লিখছেন—'এই ছবিতে যিনি নায়কের ভূমিকায় নেমেছেন, তাঁর নাম—দেখলাম—অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর নামটা পড়ে এবং তাঁর চেহারা দেখে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর

কথা মনে পড়ল, তাঁর নামও অহীন্দ্র চৌধুরী, তাঁর সঙ্গে আমি ছোটবেলায় লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়েছি, ভবানীপুরে তাঁর বাড়ি ছিল! বর্তমানে আমি ফিজি আইল্যাণ্ড থেকে রেঙ্গুনে চলে এসেছি। এখানে কলকাতা থেকে প্রচুর পত্র-পত্রিকা আসে, সে সব পড়ে দেখতে পাচ্ছি, অহীন্দ্র চৌধুরী একজন অভিনেতা, স্টার থিয়েটারে কাজ করেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁর যে-সব ছবির ব্লক ছাপা হয়েছে, তা' দেখেও আমার সন্দেহ দৃঢ়মূল হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি আমার সেই সহপাঠী অহীন্দ্র চৌধুরী? জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। আমার নাম নিতাই বিশ্বাস, আমি কড়েয়ার বিশ্বাস বাড়ির ছেলে।' কড়েয়ার বিশ্বাস-বাড়ি পড়তেই নিতাইকে চিনতে পারলাম। নিতাইয়ের সঙ্গে কতবার ওদের বাড়িতেও তখন গেছি। কড়েয়ার বিশ্বাস-বাড়িরই ছেলে ছিলেন কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস। সুরেশবাবুও পড়তেন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে, এবং খৃষ্টান হয়ে বিলেত যাবার অভিলাষে বাড়ি থেকে পালিয়ে স্কুলেরই হোস্টেলে—যেটি ছিল এলগিন রোডের ধারে, দোতলা বাড়ি—সেখানে এসে লুকিয়ে ছিলেন। অবশ্য এসব ঘটনা ঘটেছিল আমাদের স্কুলে পড়বার অনেক আগে। এ কাহিনী আমরা শুনেছিলাম, এই মাত্র। সুরেশবাবুর বাবাও ছিলেন অত্যন্ত জেদী লোক। তিনি টের পেয়ে ছেলেকে ধরতে আসছেন হোস্টেলে, সুরেশবাবু যখন দেখলেন, বাবা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসছেন তখন তিনি উঠলেন ছাদে। আবার তাঁর বাবা যখন দোতলায় তাঁকে খুঁজে না পেয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরেছেন, সিঁড়িতে বেজে উঠেছে তাঁর বাবার পদশব্দ, অমনি তিনি করলেন কী, সেই দোতলার ওপরকার ছাদ থেকে সোজা মারলেন লাফ একেবারে নীচে, টেনিস্ খেলার মাঠ ছিল ওখানে, একেবারে তার ওপরে। নীচে লাফিয়ে পড়েই—লম্বা দৌড়। তারপরে, তিনি কীভাবে, কোন্ যোগাযোগে একেবারে ব্রেজিল গিয়ে উপস্থিত হলেন, সে কাহিনী আমাদের অজানা। সেখানে ব্রেজিলিয়ানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ ক'রে নিজের নৈপুণ্য ও যোগ্যতা বলে যে ব্রেজিল সেনাবাহিনীর 'কর্ণেল' হয়েছিলেন, এ খবর আর পাঁচজনের মতো আমরাও শুনেছিলাম। আমাদের নিতাই হচ্ছে এ'হেন বিশ্বাস-বাড়িরই ছেলে। একে একে সবই মনে পড়ল। মনে পড়ল কড়েয়ার আরও দুটো ছেলের কথা,—ধীরেন আর ফণী। তারাও আসত কড়েয়া থেকে। যাই হোক চিঠি দিলাম নিতাইকে। লিখলাম—হ্যাঁ, আমিই সেই অহীন্দ্র।

বলা বাহুল্য, এর পরে এলো উচ্ছ্বাসপূর্ণ এক পত্র 'কী করে অভিনেতা হলে? কী করে এত নাম করলে?'—এই ধরনের বহু প্রশ্ন। এরও উত্তর দিলাম। আবার লিখলে নিতাই। তাতে একটি প্রস্তাব ছিল। "রেঙ্গুনে এসে স্টার থিয়েটার কি অভিনয় করতে পারে? স্টারকে তুমি রেঙ্গুনে পাঠাতে পারো কি না? কীরকম খরচ লাগবে? ইত্যাদি।" প্রবোধবাবুকে গিয়ে সব বললাম। প্রবোধবাবু বললেন—এসব কি আর চিঠিপত্রে হয়? এতবড় একটা ব্যাপার! তুমি ওকে আসতে লিখে দাও।

তাই দিলাম। ও-ও অবকাশ বুঝে এক সময় চলে এলো। চাক্ষুষ দেখা হলো নিতাইয়ের সঙ্গে বহুদিন পরে, সে যে কী আনন্দ তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

প্রবোধবাবুর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎকার করিয়ে দিলাম। কথাবার্তা চলতে লাগল। প্রবোধবাবু

বললেন—চালু থিয়েটার আমাদের। আর, দলটাও বিরাট। এখানকার অভিনয় বন্ধ করে সর্বসুদ্ধ ত আর যাওয়া যেতে পারে না, আমাদের এক শাখাদল মাত্র যেতে পারে।

নিতাই একটু ভেবে নিয়ে বললে—তাতেই হবে। বড় বড় নাটক দরকার নেই। বর্মায় বাঙালীও বেশ আছেন বটে, তবে, ওখানকার বণিক সম্প্রদায় হচ্ছে—বোরা মুসলমান সম্প্রদায়—তাঁরাই টাকা পয়সা দেন বেশী—চাঁদা প্রভৃতি ত আছেই, আবার নাচ গান ভালো লাগলে টাকার তোড়া ছুঁড়ে দেন স্টেজে, এসব দেখেছি। তাই মনে হয়, অপেরা জাতীয় নাটকই ওখানে ভালো জমবে।

এর পরে এলো, টাকা পয়সার কথা। প্রবোধবাবু বললেন—স্টার ত বাইরে প্লে করে না। তবে একবার, অনেক ধরাধরিতে পাথুরেঘাটায় সিদ্ধেশ্বর ঘোষ-মশাইয়ের বাড়ীতে একরাত "চন্দ্রগুপ্ত" করেছিলাম, তাতে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে এক হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল। এত দূরে—বিদেশে যাচ্ছি—এর থেকে বেশীই চাওয়া উচিত—তবু, আপনার খাতিরে—ঐ এক হাজারই চাইছি—যাতায়াতের খরচ, থাকার খরচ, খাওয়ার খরচ—এসব বাদে প্রতি শো—এক হাজার টাকা। নিতাই আবার এটা রেঙ্গুনে টেলিগ্রাম করে জানালে। সেখান থেকে কিছু উত্তর-প্রত্যুত্তর চলবার পর নিতাই এসে বললে—দেখুন, ২১ দিন শো হবে সবসুদ্ধ, একমাস থাকতে হবে আপনাদের—ঐ যে যাতায়াত আর খাওয়া থাকার কথা বললেন, সে সব আমাদের। আউট্রাম ঘাটে জাহাজে উঠবেন, সেইখানে আমাদের খরচা শুরু, আবার ফিরিয়ে দেবো আউট্রাম ঘাটে, সেখানে আমাদের খরচা শেষ। এবারে, ঐ এক হাজার টাকার কথা যেটা বলেছেন,' সে বিষয়ে একটু বিবেচনা করুন। ওটাকে কমিয়ে ৭৫০৲টাকায় আনুন।

ডিরেক্টার বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রবোধবাবু শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবেই রাজী হলেন। খুশী হয়ে ফিরে গেল নিতাই। যাবার সময় আমাকে বলে গেল—দেখা হবে একেবারে রেঙ্গুনে, কেমন? সঙ্গে দিন কতক ছুটি নিস, তোকে বার্মার কিছু কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবো।

ঘোরার ব্যাপারে আমার উৎসাহ খুব। অপেরাজাতীয় নাটক যখন হবে, তখন দল গঠিত হল সেই রকম বেছে বেছে টেক্‌নিসিয়ান-সমেত চল্লিশজনকে নিয়ে। শিল্পীদের সবার নাম আজ আর মনে নেই, তবে যাদের কথা মনে আছে, তাদের কথাই লিখি। কথা হলো, আমি যাবো, কাশীবাবু যাবেন, দুর্গা যাবে, হেমেন্দ্র রায় চৌধুরী যাবেন, আর যাবেন রাধারমণ ভট্টাচার্য, ননীগোপাল মল্লিক, ব্রজেন সরকার, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহারবালা, নিভাননী এবং যেহেতু আমাদের দুজন সেরা গায়িকাকেই রেখে যেতে হচ্ছে—আশ্চর্যময়ী ও সুবাসিনী—সেই হেতু রাজবালা বলে একজন গায়িকা অভিনেত্রীকে দলভুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইনি তখন বসে ছিলেন, কোনো থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

তারপরে, ক্রমশ যাবার সময় কাছে এলো। মনটা 'যাবো-যাবো' করে উন্মুখ হয়ে আছে, এমন সময় হলো কী, কর্তৃপক্ষ আমাকেই বাদ দিলেন। তাঁরা বললেন—এতগুলি বই—এত সব পার্ট—ও যাবে কী করে?

এসব কথা আগেই লিখেছি। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ওঁরা যেদিন রেঙ্গুনে পৌঁছলেন, তার ২৷৩ দিন পরেই টেলিগ্রাম করলেন প্রবোধবাবু—অহীনকে পাঠাও। ইরাণের রানী, কর্ণার্জুন করতেই হবে।

সে কী একখানা? টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। ডিরেক্টাররা অগত্যা আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। আগে ঠিক ছিল দুর্গার পার্টগুলো মণি ঘোষ করবে, এবার আমার পার্টগুলোর বিলিব্যবস্থা হলো। 'জনা'য় 'প্রবীর' নামবেন দানীবাবু স্বয়ং, তাঁর বদলে বিদূষক করবেন তিনকড়িদা। 'গোলকুণ্ডা'তে ঔরঙ্গজেব করবেন নরেশবাবু, আর 'বন্দী'তে অ্যামোস্ করবে—নির্মলেন্দু।

সবই ঠিক হলো, কিন্তু দুরন্ত অভিমানে আমি ততক্ষণে বেঁকে বসেছি—যাব না। ওদিকে, শনিবারে 'বন্দিনী' হয়ে তারপরের রবিবার সকালেই জাহাজ ছাড়ছে, ঐদিন, অর্থাৎ ১৯শে এপ্রিল, গোলকুণ্ডা ছিল. সেদিন সকালে উঠে দেখেছিলাম—কোনো কাগজে 'ঔরংজেব'-এর ভূমিকায় আমার নাম বেরিয়েছে, কোনো কাগজে—নরেশবাবুর।

শনিবার রাত্রে 'বন্দিনী' অভিনয় করে ফিরে আসব বাড়ি, দেখি স্বয়ং অপরেশচন্দ্র এসেছেন নিজে আমাকে বোঝাতে। ওঁর কথা ঠেলে ফেলা মুশকিল। বললাম—যদি যাই ত, একা যেতে পারব না।

বললেন—ঠিক আছে। বিজয় যাবে। দু'খানা টিকিটই করা হয়েছে।

বলে, আমাকে গাড়িতে তুললেন। শুধু তাই নয়, গাড়িতে বসে আমাকে বোঝাতে বোঝাতে এলেন—সেই অত রাত্রে—আমার বাড়ি। বললেন—তাহলে আমি গাড়িতে বসে থাকি?

সবিস্ময়ে বললাম—সে কী! গাড়িতে বসে থাকবেন কী! আমি যখন কথা দিলাম আপনাকে, আমি যাবই। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনি চলে যান।

বললেন—বেশ যাচ্ছি। শিবু ড্রাইভার আমাকে পৌঁছে দিয়েই গাড়ি নিয়ে এখানে চলে আসবে। ও গাড়িতে থাকবে বাকী রাতটুকু।

মনে হলো অপরেশচন্দ্র এবার নিশ্চিন্ত হয়েই চলে গেলেন।

আর ত এড়ানো গেল না। পরদিন রবিবার—সকালে উঠে সাতটায় পৌঁছলাম গিয়ে আউট্রাম ঘাটে। দেখি আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন অপরেশবাবু, হরিদাসবাবু, গণদেব—এঁরা।

কিছুক্ষণ পরেই জাহাজ ছেড়ে দিলে।

ধীরে ধীরে ভাগীরথী দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে—দুই তীরে কলকারখানা—সে-সব পেরিয়ে যাচ্ছি—আর দেখছি—জলের মধ্যে মাঝে মাঝেই বাঁশ পোতা রয়েছে। দেখতে-দেখতে চলেছি। এক সময় খেতে দিলে ডাইনিং রুমে। রিভলভিং চেয়ারের মতো দেখতে সব গোলগাল চেয়ার, সবগুলি বল্টু দিয়ে মেঝের সঙ্গে আঁটা। কী ব্যাপার? না, জাহাজ দোল খেতে শুরু করলে চেয়ার-টেবিলগুলি না উল্টে পড়ে যায়!

বসলাম খেতে। আমার পাশেই বসেছেন এক বর্মী ভদ্রলোক। দেখি, তাঁর সামনে প্লেটে করে একটা আস্ত গরুর-জিভ এনে দিলো। এমনভাবে সেদ্ধ করেছে, যাতে প্রকাণ্ড জিভটা অবিকৃতই রয়েছে বলা যায়, মায় জিভের ওপরকার ফুস্কুড়িগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। গ্রেভি দিয়ে মেখে—ছুরি দিয়ে কাটবার পর জিভের রঙ দেখাচ্ছে—মেটে মেটে।

এসব দেখলে কী আর নিজের খাওয়াটা ঠিকমতো হয়? কেমন যেন গা বমি করে উঠছে। ফলে, ভালো খাওয়া হলো না আমার। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনযাত্রী আমি, বাঙালী সহযাত্রী একটিও নেই, বিজয় রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর ডেকে।

বেলা চারটে পর্যন্ত চলে জাহাজ থামল। তীরে, ডায়মণ্ড হারবারে ডাক বাংলোটিকে দেখতে পাচ্ছি ঝাউগাছের আড়ালে। এখানে থামল কেন? শুনলাম ডাক আসছে ট্রেনে করে। এখানে ডাক নেবে জাহাজ। তখন ওভারল্যাণ্ড মেল বা বিলিতী ডাক আসত রবিবার সকালে। প্রসঙ্গত এ কথাটা বলে রাখি। বম্বে থেকে বিলিতী ডাক ও প্যাসেঞ্জার নিয়ে যে গাড়িখানা কলকাতায় আসত, সেখানা আগাগোড়া গাঢ় নীল রং করা ছিল, নাম ছিল "ব্লু ট্রেন"। মাত্র জাহাজের প্যাসেঞ্জারই নিত ট্রেনখানা, অন্য প্যাসেঞ্জার নিত না। পথের মধ্যে থামতও স্টেশন বেছে বেছে; ইঞ্জিন বদল বা জল নেওয়ার দরকার হতো, মাত্র সেই সব স্টেশনেই থামত। আর, চলত অনেকটা নিজের সময় মত, টাইম টেবিলের হিসেবে নয়। মধ্যরাত্রে যদি এসে পৌঁছত ত প্যাসেঞ্জাররা নামত না, ট্রেনেই ঘুমিয়ে থাকত; ভোর হলে নেমে যেত। এই যে ব্লু ট্রেন, এ যেদিন ভোরে এসে পৌঁছত, সেদিন আউট্রাম জেটী থেকেই ডাক তুলে নিতো। আর যেদিন আসত একটু দেরিতে, সেদিন ডাক চলে আসত ট্রেনে ডায়মণ্ড হারবার; এখানে ডিঙি করে সেই ডাক তুলে দেবে জাহাজে। বেশ কৌতূহল হলো। ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, ডিঙি করে সত্যিই ডাক আসছে। ডাকের থলিগুলো দেখতে পেলাম। আর দেখতে পেলাম—এই এতক্ষণ পরে জাহাজের কাপ্টেনকে। জাহাজের একেবারে নীচের দিকে—জলের লেভেলের কাছাকাছি, একটা দরজামতন কী খুলে দিয়ে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ডাক। ক্যাপ্টেন নিজে তদারক করলেন ব্যাপারটা।

জাহাজ আবার চলতে লাগল। উন্মুখ হয়ে আছি গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশেছে, সাদা অথবা ঘোলা জল যেখানে সবুজ হয়ে ক্রমশ নীল হয়ে গেছে, সেখানটা দেখব, কিন্তু তা আর হলো কই? দিনের আলো নিভে এলো, সন্ধ্যার অন্ধকার সব-কিছুকে ঢেকে দিলে। ওদিকে ডাকও পড়ল খাওয়ার। ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে ডিনার খাইয়ে দিলে। দেখতে পেয়েছিলাম শুধু পাইলট নেবার বোট্‌টাকে। আলো ফেলে সে কাছে এলো, জাহাজ থেমে আছে, একটা দড়ির মই নামিয়ে দিয়েছ, সেটা দিয়ে পাইলট নেমে গেল বোটে। পাইলটকে জাহাজ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বোট্ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, আর জাহাজ ধীরে ধীরে চলেছে এগিয়ে, দেখতে মন্দ লাগছিল না।

বিজয় ডেক-প্যাসেঞ্জার, তবু মাঝে মাঝে খবরদারি করতে এসেছে। তাকে ডেকে বললাম—

হ্যাঁ-হে, বিজয়, এযে ছ'টার সময় খাইয়ে দিলে, সারারাত করব কী? গ্রীষ্মের সমুদ্র। ডেক চেয়ারে আরাম করে শুয়ে থাকব। ফুরফুরে হাওয়া, কিন্তু এ হাওয়ায় যে খিদে পায় হে! সারারাত পেটে আর কিছু পড়বে না?

বিজয় বললে—নীচে এসো। দোকান আছে। দিব্যি ফলটল পাওয়া যাচ্ছে, পাঁউরুটি পাওয়া যাচ্ছে। যা' হয় কিনে খাওয়া যাবেখন।

বললাম—না বাপু, ডেক চেয়ারে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছি, এখন আর নড়তে ইচ্ছা করছে না। আর তাছাড়া, ফল-পাঁউরুটি খাবো কী হে? বাজার দেখে আর আমার কাজ নেই।

বিজয় বললে—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখছি।

বলে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো। চুপি চুপি বললে—ভাত খাবে? ভাত?

—ভাত! সেকী!

বললে—খালাসিদের মেসিং আছে। ওরা রাঁধে ত? ওদের বললে ওরা ভাত আর মুরগীর ঝোল খাওয়াতে পারে। বারো আনা করে মাত্র চার্জ করবে।

সোৎসাহে বলে উঠলাম—শীগ্‌গির বলে এসো, আর দেরি করো না।

রাত দশটা-সাড়ে দশটায় কেবিনে এসে একটি খালাসী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাত দিয়ে গেল। দিব্যি সুন্দর সরু চালের ভাত—যাকে বলে টেব্‌ল্‌-রাইস্‌। এ চাল খালাসীরা পেল কোথায় জানি না, জাহাজের চালের স্টক থেকে সরিয়েছে কি না বলতে পারি না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার গিয়ে ডেকে বসলাম। যতদূর দেখা যায়—নিঃসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ল আরেকটি জাহাজ। দূর দিগন্তে প্রথমে তারার মতন মিটমিট করছিল, পরে আরেকটু কাছাকাছি এলে দেখলাম—আলোয় ঝলমল করছে একেবারে! শুধু আমি নই, সব প্যাসেঞ্জারই উন্মুখ হয়ে দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে। এতগুলি আমরা লোক রয়েছি জাহাজে, তবু মনে হচ্ছিল, কেমন যেন নিঃসঙ্গ আমরা, আমাদের যাত্রাপথে আর কোনো পথিক নেই! অবাক হয়ে আমরা জাহাজটির দিকে দেখছি, ওদের ডেকেও সারি সারি ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ, তারাও বুঝি দেখছে আমাদের। মনে হলো এতক্ষণে বুঝি সঙ্গী পেয়েছি! জাহাজটি যাচ্ছে কলকাতারই দিকে। যতক্ষণ জাহাজটি দেখা যায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

রাত কাটল। সকালে উঠে স্নান করলাম। বাথ্‌টবে কাল মিষ্টি জল ছিল, আজ নোনা জলে ভর্তি করে দিয়ে গেছে। তারপর ক্রমশ বেলা গড়িয়ে মধ্যাহ্নের দিকে চলেছে। খাওদাওয়ার পর আবার আশ্রয় করেছি ডেক্‌চেয়ার। মধ্যাহ্নের শান্ত সমুদ্র আর নীল আকাশ। বাড়িতে বাড়া ভাত ঢেকে রাখে যেমন ঢাক্‌নি দিয়ে, দেখে দেখে মনে হচ্ছিল আমাদেরও বুঝি অমনি করে ঢেকে রেখেছে নীল আকাশের ঢাক্‌নি দিয়ে।

আবার একটা জাহাজ চোখে পড়ল। অমনি উন্মুখ হয়ে সেই জাহাজ দেখার পালা। দিনের বেলা ত জাহাজের লোকজন দূর থেকে পরিষ্কারই দেখা গেল। তারাও হাত নাড়ছে—আমরাও নাড়ছি। মালবাহী জাহাজ। নিশান দেখে বুঝছি না কোন্ দেশের জাহাজ—কোথা থেকে আসছে কে জানে—তবু মনে হলো নিঃসঙ্গ পথের মধ্যে আকস্মিক ভাবে এক পথিক পেয়েছি—এখানে জাতির ভেদ নেই—কোনো কিছুরই ভেদ নেই। আমরা মানুষ। তাই পরস্পরের প্রতি হাত নেড়েই এতো আনন্দ। ক্রমশ জাহাজটা আবার চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। আবার সেই ডেকচেয়ারে বসে অলস সময়টা কাটিয়ে দেওয়া! সমুদ্রের হাওয়া বুঝি আয়েসী করে দেয়, বই পড়তেও ইচ্ছা করে না। সন্ধ্যের কিছু আগে ছটা-সাড়ে ছটায় ত খাইয়ে দিলে। তারপরেও, আবার সেই ডেক্। ঘুরতে ঘুরতে বিজয় একসময় আবার কাছে এলো। বললাম—বিজয়, ঘুরছিলে কোথায়?

বললে—ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। ওয়্যারলেসের ঘর দেখে এলাম। কতো-কতো সব জায়গায় ওয়্যারলেস্ যাচ্ছে! দেখবে? পৃথিবীর যেখানে খুশি ওয়্যারলেস্ করা যায়!

বললাম—আচ্ছা বিজয়, এই যে আমরা খাচ্ছি-দাচ্ছি এসব কার খরচ?

ও বললে—কেন? রেঙ্গুন-পার্টির খরচ!

বললাম—একটা কাজ করবে? দাও একটা ওয়্যারলেস্ টেলিগ্রাম করে।

বিজয় অবাক হয়ে বললে—কাকে।

—তাই ত, কাকে করা যায়!—একটু ভাবতে লাগলাম, তারপর বললাম—এক কাজ করো, ঐ প্রবোধবাবুকেই করে দাও—রেঙ্গুনে। আমার ছেলেমানুষীতে ও-ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে! বললে—সে বেশ হবে! কী লিখব?

বললাম—কাগজ আনো লিখে দিচ্ছি।

বিজয় তাড়াতাড়ি কাগজ এনে দিলো। লিখে দিলাম—"সেইলিং অন্ বে।"

তারপরে সেটি নিয়ে দারুণ উৎসাহে চলে গেল ওয়্যারলেস্ ঘরের দিকে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললে—দিয়ে এলাম। খানিকক্ষণ পরেই বেরিয়ে যাবে।

অহেতুক উত্তেজনা, কিন্তু কাজ নেই, কর্ম নেই, তার মধ্যে এ উত্তেজনা মন্দ লাগছে না, তবুও খানিকটা সময় গেল এগিয়ে!

পরদিন ভোরবেলা—বেসিন লাইট্ হাউস্ দেখা গেল। সেখান থেকে পাইলট্ উঠবে। কিন্তু, সেটা আর আমার দেখা হলো না, অতো ভোরে আর উঠতে ইচ্ছে করে নি, শুয়েছিলাম। জাহাজ পাইলট্ নেবার জন্য থামল টের পেলাম, পাইলট্ নিয়ে আবার চলতে লাগল তাও টের পেলাম। জাহাজ তারপরে আরও কিছুদূর এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে রেঙ্গুন-রিভার-এ ঢুকল। এই রেঙ্গুন-রিভারে ঢুকবার পর ধীরে ধীরে চলেছি—বহু দূর থেকে রেঙ্গুনের সুবিখ্যাত 'সোয়ে-ডা-গন-প্যাগোডা'র সুউচ্চ চূড়াটা দেখতে পাচ্ছি! সোনা দিয়ে নাকি চূড়াটা মোড়া—সূর্যের কিরণ পড়ে চিক্ চিক্ করছে!

মধ্যাহ্ন প্রায় পার হয়ে যায়, এমন সময় জাহাজ গিয়ে ঘাটে লাগল। দেখি, জেটিতে প্রবোধবাবু দাঁড়িয়ে, রাধাচরণ দাঁড়িয়ে, থিয়েটারের আরও দু'একজন রয়েছে। আর রয়েছে নিতাই বিশ্বাস, তার সঙ্গে রেঙ্গুনের আরও দু' তিনজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আমাকে দেখেই প্রবোধবাবু মিটমিটি হাসতে আরম্ভ করেছেন। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামামাত্রই বলে উঠলেন—কী, সেইলিং অন্ বে ?

সহাস্যে বললাম—পেয়েছেন তাহলে ওয়্যারলেস্।

—পাব না!—প্রবোধবাবু বললেন—টেলিগ্রাম শুনে প্রথমে ত ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, ভাবলাম, তুমি শেষ পর্যন্ত এলেই না বুঝি!

তারপরে টেলিগ্রাম খুলে দেখি—ওমা! সেইলিং অন বে—অহীন্দ্র!' তখন আর হেসে বাঁচি না!

হাসতে লাগলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকরা বললেন—আপনারা রওনা হোন, মালপত্র আমরা নিয়ে যাচ্ছি।

গাড়িতে উঠে বাড়ির দিকে চললাম। গাড়ি থেকেই শুরু হলো গল্প। প্রবোধবাবুর মুখে শুনলাম, বর্ধমানের রাজা বাহাদুর মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহতাপ মহোদয় সরকারী কার্যব্যপদেশে রেঙ্গুনে এসেছেন। গতকাল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি একটি পার্টি দিয়েছিলেন, তাতে কলকাতা থিয়েটারের কর্মী ও শিল্পীদেরও আমন্ত্রণ ছিল। মহারাজ থিয়েটারের আর কাউকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু কাশীবাবুকে দেখামাত্রই চিনলেন। বললেন—কে ? কাশীবাবু না ?

কাশীবাবুর সেই গালপাট্টা, বড়ো-বড়ো চুল, সুদৃশ্য গোঁফ, বেঁটেখাটো চেহারা,—একবার জানাশোনা হয়ে গেলে ভোলা সহজ নয়! কাশীবাবু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছি।

এই সব নানান গল্প। মহারাজা বার্মিজ পোয়ে ডান্সেরও আয়োজন করেছিলেন। সে-সব ডান্সের বর্ণনাও শুনলাম। এ সব গল্পের জের বাড়িতে এসেও চলেছে। বাসা ছিল দুটো। একটাতে, দলের ভারিক্কী পুরুষেরা—যেমন, প্রবোধবাবু, কাশীবাবু, হেমেনবাবু ইত্যাদি, আর মেয়েরা। আমারও স্থান হলো এখানে। আর সবাই রয়েছে অন্য বাড়িতেই, কাছেই। রাধাচরণ রয়েছে অবশ্য এ বাড়িতেই—নীচের তলায় একটা ঘরে—একেবারে একা। কলকাতা থেকে যে-সব পোস্টার-হ্যাণ্ডবিল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার স্তূপ রয়েছে ওর ঘরে, আর রাখা হতো ভাঁড়ার। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সকালে এসেই রাধাচরণকে ডাকতেন, নিয়ে যেতেন বাজারে, বাজার থেকে হেন ভালো জিনিসটা নেই, যা কিনে আনতেন না। সে-সবেরও ভাঁড়ারী ছিল রাধাচরণ!

যাই হোক, আমি চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—দুর্গা কই ?

শুনলাম, দুর্গার বিছানা অবশ্য এ বাড়িতেই, কিন্তু সে কী বাড়ি থাকবার মানুষ ? কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! সময় মতো—আসবে'খন।

পাঁচতলার প্রকাণ্ড বাড়ি, তার তেতলার ফ্ল্যাটে আমরা আছি, রাধাচরণ শুধু নীচের তলায়।

ঐ দিনই থিয়েটার—কর্ণার্জুন হবে। বিকেলে যাবার ব্যাপারে আমি গাড়িতে গেলাম না, বললাম, আমি একটু আগেই রওনা হচ্ছি, রিকশাতে যাবো, পথে যেতে শহরের যেটুকু দেখা যায়, সেটুকুই লাভ। বেশ চওড়া-চওড়া রাস্তা, ট্রাফিক পুলিস সব পাঞ্জাবী। এক রাস্তার সঙ্গে আরেক রাস্তার সংযোগকারী যে-সব রাস্তা রয়েছে সেগুলি দেখি—নম্বর করা—অত নম্বর স্ট্রীট, এত নম্বর স্ট্রীট, এই রকম। যেতে যেতে বর্মী কম চোখে পড়ল, চোখে পড়ল ভারতীয় আর সিঙ্গাপুরী চিনেম্যানই বেশী। বার্মিজ গার্ডেনে বড়োলোক বর্মীঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলারা বেড়াচ্ছেন দেখলাম। সুন্দর তাঁদের চেহারা—সুগঠিত শরীর—স্বাস্থ্যবতী—পরনে পাত্‌লা ব্লাউজ আর রঙচঙে লুঙ্গী—বেশ পরিপাটি করে বর্মী খোঁপা বাঁধা। আর পায়ে দেখলাম—মল্‌-পরার মতো ওঁরা সোনার গয়না পরেছেন একরকম। আমাদের থিয়েটারের মেয়েরা ওদের দেখাদেখি ঐ রকম খোঁপাবাঁধা শিখে নিয়েছিল—ঐ রকম পোশাক পরাও শিখে নিয়েছিল। ঐ রকম বর্মী পোশাক-আশাকও কিনে নিয়ে এসেছিল সবাই।

এক সময় দেখি—নীচে দিয়ে রেল যাচ্ছে—ওপরে ব্রীজ, সেই ব্রীজের ওপর দিয়ে ওপারে গিয়েই পৌঁছলাম এসে বিখ্যাত "লিউইস্‌ জুবিলী হল"-এ, যেখানে আমাদের থিয়েটার হচ্ছে। এটি একটি মিউনিসিপ্যাল হল-এর মতো ব্যাপার। আসলে বাগান—বাগান পেরিয়ে বিরাট হল্‌—কতো যে লোক ধরে তার ঠিক নেই। গিয়ে শুনলাম, সব আসন বিক্রি হয়ে গেছে আর লোক নিতে পারছেন না তারা —বহু লোককে ফিরে যেতে হবে। ভিতরে গেলাম। সাজঘরের চেহারা দেখে ত অবাক! এত সুন্দর সাজঘর কখনো দেখিনি। আর, স্টেজের মেঝের কাঠ—বর্মা টিক্‌-কাঠে তৈরী, খাঁজে খাঁজে এমন মিলিয়েছে যে অতি কষ্টে রেখা ধরে 'জয়েন্ট' খুঁজে নিতে হয়। কী ফিনিশ! মোম দিয়ে সন্ত মাজা নয়, তবু মনে হচ্ছে, পা বুঝি পিছলে যাবে। সেই এপ্রিল থেকে আমাদের থিয়েটার শুরু হয়েছে, তখনো চলছে। 'কর্ণার্জুন' শুরু হব্যর আগে পর্দা ফাঁক করে দেখি, ওরে বাবা—এত লোক! সব বাঙালী মনে হলো। এত বাঙালী রেঙ্গুনে রয়েছে! ফিক্‌স্‌ড চেয়ার ত নয়, তাই আসন নিয়ে গোলমাল হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে।

যাইহোক, পর্দা ত উঠল। আমি কর্ণ—আমার সামনে সূর্যবন্দনা গেয়ে চলে গেল মেয়েরা। দুর্গা সেজেছে অর্জুন। অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণ সেজেছে বিজয়। সে যখন চণ্ডালকে তেড়ে বেরিয়েছে, দু'তিন লাইন বলবার পরই তার গলা গেল ধ'রে। প্রকাণ্ড হল, বেশ চেঁচাতে হচ্ছে। তার ওপরে এক-একজনের অনেকগুলো করে পার্ট। না শুনতে পেলে দর্শকরা গণ্ডগোল করে উঠবে। শেষ বরাবর আমার পর্যন্ত গলা ধ'রে এলো।

প্লের শেষে নিতাই এলো, স্থানীয় লোকেরা এলেন, বললেন—বহু লোক দেখতে পায়নি, 'কর্ণার্জুন' কি কালও দেবো? বললাম—দাঁড়ান মশাই, এদিকে গলা গেছে।

প্রবোধবাবু বললেন—অন্য বই যা' অ্যানাউন্স্‌ করা আছে, তাই হোক। 'কর্ণার্জুন' পরে একদিন হবে'খন।

আমি ওঁদের বললাম—মশাই, রেঙ্গুনে এত বাঙালী?

তাঁরা বললেন—শুধু কি রেঙ্গুনে? উত্তর বার্মা থেকে বাঙালী এসেছে। ভামো থেকে, মৌলমেন থেকে, পেগু থেকে, হেন-সাদা থেকে, মায় ম্যাণ্ডালে থেকে পর্যন্ত লোক এসেছে।

এই রকম ভিড় হয়?

ভিড়?—তাঁরা বললেন—ভিড় আরও হতো। আরও টাকা উঠত। নাচ-গানের বই চালাবো, এই ত কথা ছিল। কারণ, বোরা মুসলমান হচ্ছে ওখানকার অন্যতম ধনী সম্প্রদায় তারা নাচ-গানে টাকা ঢালে খুব। কিন্তু, আমাদেরই একটা ভুল হয়েছে, এটা রোজা রাখার সময়, কোনো মুসলমান আসবে না। তাই, বাঙালী দর্শকরাই আমাদের ভরসা, এঁরা নাচ-গানের চেয়ে নাটকই বেশী পছন্দ করবেন।

বুঝলাম ব্যাপারটা। ওঁরা ওঁদের বিজ্ঞাপনের একটা কপিও দেখালেন। 'বর্মা সম্মিলনী' নামের স্থানীয় বাঙলা কাগজে বেরিয়েছে—"আগামী বৃহস্পতিবার ৯ই এপ্রিল হইতে হরদম নৃত্যগীত —যাহা কখনও দেখেন নাই—কখনও শুনেন নাই। আজ রেঙ্গুনের বক্ষে বসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। আসুন—আসুন—আসুন।"

বিজ্ঞাপনের ফলও ফলেছে। বাঙালীদের এখানে ধানকল আছে—কাঠ চেরাই করবার কারখানা আছে, অনেকে বাড়ি করে ভাড়া খাটিয়ে অর্থ উপার্জন করছেন। এছাড়া এসব কলে-কারখানায় কাজ করা মিস্ত্রী আছে, বহু বাঙালী। কেরানীকুল আছেন বহু বাঙালী। কোর্ট-কাছারীতে বাঙালী উকিলও আছেন। হেনসাদাতে কোর্ট আছে, সেখানে উকিল আছেন কিছু বাঙালী। আর আছেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। সেন ব্রাদার্স—দে ব্রাদার্স—ফ্রেণ্ড্স্ ইউনিয়ন—বসুমিত্র কোং—কারুর দোকান ডালহাউসী স্ট্রীটে, কারুর মোগল স্ট্রীটে। সি-এইচ-দে এণ্ড কোং-র মালিক চিন্তাহরণ দে মশাই। তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। তাঁর দোকান ফ্রেজার স্ট্রীটে, ব্যবসায়ী ইনি। দে ব্রাদার্সের হচ্ছে ওষুধের দোকান, নীলমণি ডাক্তারবাবু বসেন সেখানে। এঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। সকালে উঠে ওঁর কাছে গিয়ে গলায় ভেপার ইত্যাদি নিলাম। যদিও জানি এতে কিছু হবে না, রেস্ট পেলে গলা আপনই ঠিক হয়ে যাবে। বেরুবার ইচ্ছে রিকশায় করে, কিন্তু প্রবোধ-বাবু দেবেন না, বলেন, ধুলো লাগলে গলা খারাপ হবে।

কী আর করা যায়, বেরুলাম মোটরে। ওঁরা বললেন—আপনারা আসাতে আমাদের ইজ্জত যে কতো বেড়ে গেছে তা জানেন না।

ধীরে ধীরে শুনলাম সব। এখানকার বাঙালী সব দলে-দলে বিভক্ত। মন কষাকষি নয়, এমনিতেই, কাজের ধাক্কায় যে-যেখানে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে মিলবার, এমন কি দেখা হবারও সুযোগ তেমন ঘটে না। দুর্গাপূজা হয়—দুর্গাবাড়ি আছে। কিন্তু, সে-সময়ও যে খুব জমায়েত হয়, তা নয়। তাছাড়া, রেঙ্গুনের বাইরের বাঙালীদের সঙ্গে যোগাযোগের তেমন মাধ্যমই বা কোথায়? ওঁরা

বললেন—আপনারা আসাতে এঁরা সব একত্র হলেন, এতে করে যদি উৎসাহ আসে, যদি নাট্যগীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিজেরা করে, তার মধ্য দিয়ে একটা যোগসূত্র এবার এঁরা গড়ে তোলেন। তা, এখন যা দেখছি তাতে আমাদের আশা পুরবে বলে মনে হচ্ছে।

এসব বাঙালী ছাড়া, কণ্ট্রাক্টারও আছেন কিছু বাঙালী, আর আছেন বাঙালী স্বর্ণকারের দল। আমাদের কাঁসারী পাড়ার বহু লোক এখানে রয়েছেন দেখলাম। কেউ নিজে দোকান করেছেন, কেউ দোকানে কাজ করছেন। এখানকার হাইকোর্টের জজও আছেন একজন বাঙালী—মাননীয় জে. আর. দাশ মহাশয়। এইসব কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছি, সঙ্গে নিতাইও আছে। শুনলাম, বড়লোক বর্মীরা জড়োয়া গয়না পরতে ভালোবাসে, বোরা মুসলমানেরাও। তাই স্বর্ণকারদের এখানে এত সমাবেশ। ওঁরা বললেন, সন্ধ্যের পর ফুটপাথে বাজার বসে, বাজারে বর্মী মেয়েরাই জিনিসপত্র বেচে, স্বামীরা বসে বসে ঝিমোয়। বড়ো-বড়ো বর্মা চুরুট খায় মেয়েরা, এ-চিত্র আমিও দেখেছি। সেদিন গাড়ি করে, কয়েক মাইল দূরে, লেক্ দেখে এলাম—যেখান থেকে রেঙ্গুন শহরে জল আসে। নদীর ওপারে সব বড়ো-বড়ো কারখানা রয়েছে বোধহয় "স-মিল্", সেদিকটা আর যাইনি। গিয়েছিলাম রেঙ্গুনের সুবিখ্যাত 'সোয়ে-ডা-গন প্যাগোডা' দেখতে। কী বিরাট উঁচু! মাথা উঁচু করে নীচে থেকে চুড়োটা দেখবার চেষ্টা করছি, মনে হচ্ছে, ওর যেন আর শেষ নেই! সিঁড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে ওঠবার পর বিস্তৃত পাটাতন—তার ওপরে হচ্ছে প্যাগোডাটি! প্যাগোডার শিল্প-কর্মের বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। আর এড়িয়ে যাবার কথা নয় বুদ্ধ মূর্তিগুলি। নীচে, সিঁড়ির ধারে, মেয়েরা সব ফুল বিক্রি করছে, বাতি বিক্রি করছে, সেসব কিনে নিয়ে এসে বুদ্ধকে প্রণাম জানাচ্ছে সবাই। সে এক সত্যিই অদ্ভুত গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ।

প্রবোধবাবুকে ফিরে এসে বললাম—আপনারা চলে যাবার পর দিনকতক ছুটি দেবেন, নিতাইয়ের সঙ্গে গিয়ে আপার বার্মাটা ঘুরে আসব।

উনি বললেন—ক্ষেপেছ! দল চলে যাচ্ছে আর তুমি একা একা থাকবে! একী একটা কথা হলো!

অতএব, হলো না আপার বার্মা ঘোরা। শুধু পেগুতে গিয়েছিলাম সুবিখ্যাত "শয়ান বুদ্ধ" দেখতে। রেঙ্গুন ছাড়িয়ে প্রথম বড়ো রেলওয়ে জংসনই হচ্ছে পেগু। তবে মূর্তি দেখতে হলে স্টেশন থেকে খানিকটা হাঁটতে হয়। হাঁটা পথ বলে মেয়েদের আর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হলো না।

পেগুতে—আমাদের সঙ্গে মেয়েরা গেল না বটে, তবে পুরুষদের অনেকেই গেল। বাঁশী বাজান যে বৃদ্ধ ক্ষীরোদবাবু, তিনিও চললেন আমাদের সঙ্গে। পেগু-র ছোটখাট কয়েকটা প্যাগোডাও দেখলাম, কিন্তু যেটা দেখে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়, সে হচ্ছে—ঐ "শয়ান বুদ্ধ"। মুক্ত আকাশের নীচেই করা রয়েছে প্রকাণ্ড টিনের শেড্। তার তলায় একটা চাতালের ওপরে শুয়ে রয়েছেন তিনি—প্রস্তর-নির্মিত বিরাট বুদ্ধমূর্তি—একশো ফিট, কি, তারও অনেক বড়ো। চাতালটাও উঁচু কম নয়—

মানুষের মাথার চাইতেও উঁচু। শুনলাম, পূর্বে মুক্ত আকাশের নীচেই মূর্তিটি ছিল, ইংরেজ রাজত্বের আমল থেকে টিনের শেড্ দেওয়া হয়েছে। চারিদিক খোলা, শুধু মাথার ওপরে টিনের শেড্। এছাড়া আরও এক দর্শনীয় বস্তু শুনলাম—পেগুর মিত্তির বাড়ি। বর্মার আগের রাজধানী ছিল পেগু। দু'তিন পুরুষ ধরে এক বাঙালী পরিবার ওখানে বাস করছেন, তাঁরা মিত্তির এবং পেগুতে দীর্ঘকাল বাস করছেন ব'লে, তাঁরা হয়ে গেছেন কী না, পেগু-র মিত্তির। আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল ওঁদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করবার, কিন্তু সেদিন আমার প্লে না থাকলেও অন্য সবার প্লে আছে, অতএব দেরি করলে চলবে না। নির্দিষ্ট ট্রেনটি ছাড়বার সময় হয়ে গেছে, ওটা মিস করলে চলবে না। সুতরাং ফিরে এলাম। সিঙ্গাপুর থেকে লোক এলো আমাদের থিয়েটারকে সেখানে নিয়ে যেতে। আমি ত উৎসাহে জলে উঠেছিলাম, কিন্তু রাজী হলেন না প্রবোধবাবু, বললেন—আমাদের আসল কাজ কলকাতায়। সেটা ব্যাহত হলে ত চলবে না! আর তাছাড়া, আমরা টুরিং পার্টিও নই। নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন সিঙ্গাপুরের লোক। আমরা তারপর রামকৃষ্ণ মিশন, দুর্গাবাড়ী এসবের জন্য চ্যারিটি পারফরম্যান্স করলাম। একদিন 'ইরাণের রানী' হলো। আরেকদিন 'কর্ণার্জুন' করতে পারলে ওঁরা আরও খুশী হতেন, কিন্তু আর পারা গেল না। ২৯শে এপ্রিল আমাদের ফেয়ারওয়েলের দিন—ঐদিন একটা অপেরা প্লেই হলো, সঙ্গে হলো নির্বাচিত দৃশ্যাবলী—ইরাণের রানী থেকে, সাজাহান থেকে, আরও কী-কী নাটক থেকে যেন। সে-রাত্রে আমাদের সোনার মেডেল দেওয়া হলো। বিচারপতি জে. আর. দাস মহাশয় পারিতোষিক বিতরণ করলেন। ২রা মে, ১৯২৫—তারিখে "রেঙ্গুন ডেলী নিউজ" লিখেছিলেন—

"All the actors or actresses of the troupe representing the casts of the play rose to the occasion in displaying the best of their histrionic talents which made the night a highly enjoyable one and the occasion a success. But it must be mentioned here that Mr. Ahindra Chowdhury and Miss. Niharbala excelled all, closely followed by Mr. Durgadas Banerjee and Miss Nivanani. The public of Rangoon expressed their affection by awarding a gold medal to each of the above mentioned players which each of them highly deserved. Babu Radhacharan Bhattacharjee also rendered his part in "Sudama" nicely."

"Everyone who has been to see the play has been delighted ; the acting is very good and the scenery is very beautiful"—"Rangoon Times"—29. 4. '25.

পরে কলকাতায় "নাচঘর" পত্রিকাতেও এইসব উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছিল।

ঐ ২৯শে রাত্রেই প্রীতিভোজের পর আমরা সদলবলে গিয়ে জাহাজে উঠলাম। জাহাজ ছাড়ল ৩০শে এপ্রিল ভোরবেলা। রেঙ্গুন থেকে প্রায় সবাই কিছু কিছু জিনিস কিনেছে। বর্মার সিল্কের

লুঙ্গি চমৎকার—আমিও একখানা কিনেছিলাম। বর্মার কাঠের কাজও ভালো। তার নমুনাও কারুর কারুর কাছে দেখলাম। চিন্তাহরণবাবু, নীলমণিবাবু, নিয়োগীবাবু বলে আরেক ভদ্রলোক, তারপরে—নিতাই, এঁরা সবাই আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন। শেষ হলো আমাদের রেঙ্গুনপর্ব। ওঁদের বললাম—কলকাতা গেলেই দেখা করবেন কিন্তু।

—নিশ্চয়ই যাবো।

বললেন, এই যে বিশদিন ধরে প্লে হলো, এতে কিছু যে আর্থিক লোকসান না হয়েছে এমন নয়, কর্ণার্জুন আর ইরাণের রানী আর একবার করে দিলে টাকাটা উঠে আসত। কিন্তু, এতে কিছু হয়নি, আমাদের প্রেস্টিজ রক্ষা পেয়েছে। কতো যে উপকৃত হলাম, তা বলার নয়। আমি চুপ করে রইলাম। মনে হ'লো, আমারই দোষ। আমার হঠাৎ গলা ধ'রে গেল, আমিই আর পারলাম না পরের দিন 'কর্ণার্জুন' করতে।

এর পরে আবার সমুদ্র। আসবার সময় যেমন শান্ত ছিল, এখন তার বিপরীত। আকাশের এক কোণে হঠাৎ দেখা গেল কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে,অমনি ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল সমুদ্রের ঢেউ, অমনি হাওয়ায় বাড়ল বেগ! দেখতে-দেখতে আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে, শুরু হলো প্রমত্ত ঝটিকা! সে এক ভীতিকর অথচ অপূর্ব দৃশ্য! প্রবলভাবে দুলছে জাহাজটা, একবার এ-কাত হচ্ছে, আরেকবার ও-কাত! মাঝে মাঝে উত্তাল ঢেউ উঠে ডেক্-এর ওপর ভেঙে পড়ছে। ডেক্ এমনি জলে থৈ থৈ, সামাল-সামাল! দেখা গেল, এর বদ্না ওর ঘটি ভাসছে জলের ওপর। ডেকের চারিদিকে কাঠের একটা 'ব্যাণ্ড' দেওয়া থাকে একটু উঁচু করে, ভাতের থালার কানার মতো—যাতে করে ঘটি-বাটি সব বেরিয়ে যেতে না পারে। এসব ঘটনার সঙ্গে মিশে একটি ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে আছে। ঝড়ের প্রথম পর্যায়ের কথা সেটা। বিরাট বিরাট সব ঢেউ আসছে। উঁচু উঁচু ঢেউগুলো কাছে আসবার আগেই ভেঙে যাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ঢেউয়ের মাথাটা যেন হিমসজ্জিত পর্বত-শিখরের মতো হঠাৎ শিখরদেশ থেকে বরফ গলে গলে প্রবল স্রোতে নেমে আসছে উদ্দাম-উত্তাল জলরাশি। স্রোতের ওপরে জলকণার রাশি অল্প-অল্প কুয়াশার সৃষ্টি করেছে! পর্বত-শিখর থেকে অকস্মাৎ বরফ গলে যাওয়া, আর বড়ো-বড়ো ঢেউগুলো হঠাৎ ভেঙে যাওয়া—এ যেন একেবারে একই ব্যাপার! কোনো কোনো ঢেউ এসে ভাঙছে জাহাজের একেবারে ধারে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে জল—সেই জল এক-একবার এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডেক্! সমুদ্রের এই অপূর্ব লীলা কার না ইচ্ছা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে? আমরা বসে বসে তাই দেখছি, কিন্তু দুর্গাদাস বোধ হয় আত্মহারা হয়ে গেছে। সে উঠে গিয়ে একেবারে রেলিং ঘেঁষেই দাঁড়ালো এক সময়। বলে উঠলাম, ওখানে দাঁড়িও না, বিপদ ঘটতে পারে।

ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ঠিক আছে, কী আর হবে!

সম্ভবত বার দুয়েক আমরা বারণ করেছি, আর বার দুয়েক ও কী আর হবে বলেছে। আর

যায় কোথায়? প্রচণ্ড একটা ঢেউ আচম্‌কা উঠে আছড়ে পড়েছে জাহাজের গায়ে, তারই একটি অংশ উঠে এসে একেবারে ওর গালের ওপর। যেন ঠাস্ করে একটা চড় মেরে গেল গালের ওপর।

ও হাত দিয়ে গালটা চেপে ধ'রে তৎক্ষণাৎ সরে এলো আমাদের কাছে। বললে, ওরে বাবা, এরকম লাগে।

তবু ত এ প্রথম পর্যায়ের কথা বললাম। দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন হলো যে, পা রেখে কেউ হাঁটতে পর্যন্ত পারছি না। টপ্ ডেক্-এ একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিয়েছিল আমাদের জন্য। রান্নাবান্না এবার ছিল নিজেদের হাতে। কিন্তু, জাহাজের ঐ ঢুলুনীতে বসে বসে রান্না করবে কী করে লোকে? কোনরকমে ভাত আর আলু ভাতে ক'রে দেওয়া হয়েছিল, তাই দিয়ে ভাত খেতে হবে। আলু ভাতে নুন-লঙ্কা-তেল দিয়ে মেখে গোলা পাকিয়ে এক-একজনের কাছে ক্রিকেট বলের মতো ছুঁড়ে দিতে হচ্ছে, আর সে লুফে নিচ্ছে। কাছে গিয়ে পরিবেশনটুকু পর্যন্ত করা যাচ্ছে না—এমন টলে যাচ্ছে পা।

বাতাসে ততক্ষণে বেড়েছে বেগ। সোঁ-সোঁ শব্দ আর তার সঙ্গে ঢেউয়ের মাতামাতি। দিগন্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে থাকলে বোঝা যায়, জাহাজ এক-এক সময় ঢেউয়ের মাথায় এসে কতোটা উঁচুতে উঠ্‌ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতখানি নাম্‌ছে! শেষ পর্যন্ত একে একে সবাই শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে-প্রথমে বললে—গা গুলোচ্ছে। পরে বললে—গা বমি-বমি করছে। তারপরে একেবারে হড়হড় করে বমি। মাথা তুলতে পারছে না। এরই নাম সি-সিক্‌নেস্। আমি প্রথমটায় শক্ত ছিলাম, একে একে কতজনকে যে নেবুর রস খাইয়েছি তার ঠিক নেই, কিন্তু সন্ধ্যা নাগাত আর পারলাম না, শয্যা আশ্রয় করতেই হলো। জাহাজ তখন ফুল স্পীডে চলেছে স্রোত আর তরঙ্গের গতি-প্রকৃতি বুঝে! নেভিগেশনের সব ব্যাপার জানি না, তবে জাহাজকে যে তখন পূর্ণ গতিতে ছুটতে হয়, এটা শুনেছিলাম।

যাই হোক, সে রাত্রে আর কারুরই খাওয়া হলো না। খাওয়ার দরকারও হলো না। সবাই একে একে শুয়ে পড়েছি। দেহের যা অবস্থা, তাতে খাওয়ার স্পৃহাও আসে না। পরদিন এক সময় আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, তবু কমছে না জাহাজের দুলুনী। খালাসীরা বললে, খাঁড়ির কাছ থেকে জাহাজ যাচ্ছে, জল কম কিনা, তাই এত দুলুনী—

ঐ হলো মাথাভাঙ্গা। এর পরে আবার আছে হাঁড়িভাঙ্গা।

—সে আবার কী?

বললে, বাবু, এখানটায় এমন দুলুনী হয় যে, পাশাপাশি দুটো মানুষ বসলে মাথা ভেঙে যায়, তাই নাম হয়েছে মাথাভাঙা!

—আর, হাঁড়িভাঙা?

বললে, সেটা আছে সামনে। ঢেউয়ের মধ্যে হাঁড়ি ফেলে দিন, ঢেউয়ের বাড়ি লেগে হাঁড়ি ভেঙে যাবে।

দুর্গাদাস শুনে বললে, তা' হতে পারে। যেরকম চড় তখন খেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে, হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয় ঢেউয়ের পক্ষে!

চলতে লাগলো জাহাজ। একে একে সব আমরা মাথা তুলে উঠে বসছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্থির হতে পারছি না। তারপর মাথাভাঙা এলো। মাথাভাঙার পরে আরও খাঁড়ি ছিল, সেগুলি পেরিয়ে সাগরদ্বীপ পেরিয়ে পাইলট নিয়ে গঙ্গা দিয়ে চলতে চলতে যে সময় আউট্রাম ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম, সেটা হচ্ছে পরদিন সন্ধ্যেবেলা। ততক্ষণে সব আমরা সুস্থ হয়ে গেছি।

অর্থাৎ, আবার কলকাতা। আবার থিয়েটার। এসেই শুনলাম, ২৫শে এপ্রিল, 'বন্দিনী'র শেষ অভিনয় হয়ে, 'বন্দিনী' বন্ধ হয়ে গেছে। ২৪শে তারিখে 'বন্দিনী' হবে, অথচ, কী কারণে যেন নির্মলেন্দু 'অ্যামোস্'-এর ভূমিকা করলে না। কিন্তু আমার সাইজের পোশাক-পরিচ্ছদ, ইন্দু বেঁটে লোক, ওকে মানাবে কেন? তবুও প্রাণপণে অভিনয় করে গেছে। স্টারের মুখরক্ষা করেছিল বলা চলে। কিন্তু নির্মলেন্দুর ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েই অপরেশবাবু শেষ পর্যন্ত বন্ধই করে দিলেন 'বন্দিনী।' এর বদলে বই ধরলেন গিরীশচন্দ্রের "বলিদান"—খোলা হলো ২৯শে এপ্রিল। করুণাময় সাজলেন দানীবাবু। দুলালচাঁদ—তিনকড়িদা, রূপচাঁদ—নরেশবাবু, সরস্বতী—সুশীলাবালা, জোবি—আশ্চর্যময়ী, কিরণময়ী—কৃষ্ণভামিনী।

আমি ছিলাম না, অতএব আমার কোনো পার্টও নেই। নির্মলের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বনিবনা হচ্ছিল না, 'অ্যামোস্' সে না-করায় মনোমালিন্য দাঁড়ালো আরও গভীর হয়ে। সত্যি কথা বলতে কী, ভালো পার্ট পাচ্ছে না বলে একটা ক্ষোভ ছিল নির্মলেন্দুর। 'গোলকুণ্ডা'র নায়ক 'হাসান' সে করলে, আমার মতে আর্ট থিয়েটারের আমলে এটাই তার শ্রেষ্ঠ পার্ট। অবশ্য এখানে যতগুলি ভূমিকা সে করেছে, তার মধ্যে সবই ভালো হয়েছে, কতগুলি খুবই ভালো হয়েছে, তবে 'হাসান'-এর তুলনা হয় না। কাগজে কাগজেও 'হাসান'-এর সুখ্যাতি হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এততেও তার ভক্ত বন্ধুরা খুশী হয়নি, তারা কাগজে-কাগজে পত্রাঘাত করেছে। যতটা সুখ্যাতি করা হয়েছে, তার থেকে বেশী সুখ্যাতি করা হয়নি কেন, এই ছিল তাদের অভিযোগ। আরও অভিযোগ ছিল, আর্ট থিয়েটার নাকি গোলকুণ্ডাকে তাচ্ছিল্য করছে, শনি রবিবারে এই বই ফেলা উচিত। ফেল্‌লে সোনা ফলিয়ে দেবে, ইত্যাদি। কোনো পত্র-প্রেরক আবার এ-ও লিখেছেন, গোলকুণ্ডা-তে ঐ একটি পার্টই হয়েছে—হাসান—আর কোনোটাই হয়নি। পত্র-প্রেরকের এ মন্তব্য অবশ্য মানতে রাজী নই। আর কোনো পার্ট হয়নি ত, নাটক চলল কী করে? যাই হোক, আসল কথা হলো, যেসব কারণেই হোক, নির্মলেন্দুর ক্ষোভটা তীব্রতর হচ্ছিল কিছুদিন থেকেই। ঐ যে ২৪শে এপ্রিল 'বন্দিনী'তে প্লে করলে না, তারপর দিন ছিল 'জনা,'—জনাতে ও 'অর্জুন' করতো, কিন্তু করল না। 'জনা' সম্বন্ধেও ওর ক্ষোভ ছিল, আমি রেঙ্গুন চলে যেতে, কর্তৃপক্ষ দানীবাবুকে 'প্রবীর' সাজালেন, কিন্তু ওকে 'প্রবীর' দিলেন না। এইসব নানা কারণেই শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, নির্মলেন্দু স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় যোগদান

করতে গেল। মিনার্ভায় তখন নতুনভাবে দল গঠনের কার্য চলেছে। মিনার্ভা নাট্যমন্দির থেকে তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগেই নিয়েছেন, নিয়েছেন প্রসিদ্ধা গায়িকা আঙুরবালাকে। এবার নিলেন নাট্যমন্দির থেকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে এবং স্টার থেকে নির্মলেন্দুকে। সুবাসিনী মিনার্ভারই পুরানো শিল্পী, তাকেও আবার ফিরিয়ে নিলেন ওঁরা, দলে গায়িকা আঙুরবালা থাকা সত্ত্বেও।

এদিকে হলো কী, যে ফরোয়ার্ড কাগজ আমার 'প্রবীর'-এর সুখ্যাতি করেছে সেই কাগজে রাখালদা এসে লিখতে আরম্ভ করেছেন ছদ্মনামে। দানীবাবুর প্রবীরের অবশ্য খুবই প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করে বসেছেন—'হিস্ট্রিক্সটা চলে গেছে!' এর প্রতিক্রিয়া ঘটল অন্য কাগজে। রাখালদা নিজের নামে যে-সব ইতিহাস-কেন্দ্রিক কূট প্রশ্নাদি তুলে সমালোচনা করতেন, তা নিয়ে কোনো কাগজে বিশেষ মন্তব্য করত না, কিন্তু এবার তিনি ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করায় পত্রিকাগুলি সোজাসুজি প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। ওঁকে "রঙ্গমঞ্চের ভয়াল নাট্যসমালোচক" আখ্যা দিয়ে নাচঘর ২২শে মে লিখলেন—"দানীবাবুর প্রবীর দেখে এসে মনে হলো, মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত সহস্র বৎসরের পুরাতন ভাঁড়-খুরি, জীর্ণ ইষ্টক, চূর্ণ প্রস্তর ইত্যাদি ঘেঁটে ঘেঁটে বোধ হয় তাঁর ঐ ধরনের জিনিসগুলির উপর এমন একটা প্রচণ্ড প্রীতি জন্মে গেছে যে, তিনি (সমালোচক) রঙ্গমঞ্চের উপর আর সজীব তরুণ চঞ্চল নবীন অক্ষত ও সুন্দরের বিকাশ পছন্দ করতে পারেন না। এ প্রবীরে তাঁর মতে হিষ্ট্রিয়া নেই বটে, কিন্তু প্যারালিসিস্ যে সর্বাঙ্গে।" আমাকে নিয়ে টিকা-টিপ্পনী আরও হয়েছে তখন। নির্মলেন্দুর আত্মীয়—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাই-পো মেঘেন্দ্রলাল রায় ৩রা এপ্রিল 'বিজলী'তে লিখে বসলেন—"দানীবাবুর অভিনয়ের দোষ সংবাদপত্রে আলোচিত হয়েছে। শিশিরবাবু নির্মলেন্দুবাবুর অভিনয়ের দোষ সময়ে-সময়ে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত অহীন্দ্রবাবুর কোনো ভূমিকার কোনো অভিনয়ের দোষ আলোচিত হয়নি। এর কারণ কী আমরা তাহা জানি না।" কথাটায় পুরোপুরি সত্য নেই। দোষ ধরেছেন বই কী, তবে আশাতীত সুখ্যাতিও করেছেন। সর্বোপরি আমার ভয়াল রাখালদা ত আছেনই! যখনই লিখেছেন, আঘাত না করে ছাড়েন নি। তবে, এতে আর দুঃখ আর ক্ষোভ করার কী আছে? তাঁরা আমার আপন লোক নন্ যে, কাগজগুলি আমার মুঠোর মধ্যে থাকবে!

কিন্তু যা বলছিলাম। মনোরঞ্জনবাবু ও নির্মল মিনার্ভায় গেলেন, চুক্তিপত্রও সই করলেন। কিন্তু শুনলাম, শেষ পর্যন্ত তাঁরা কার্যত আর যোগদান করলেন না এবং উপেন্দ্র মিত্রমশাইও তাঁদের ছেড়ে দিলেন। খবরটা শুনে অবাকই হয়েছিলাম। কী কারণ জানি না ওঁদের যোগদান না করা দেখে মনে হলো, যেন মিনার্ভা থেকে ওঁরা পালিয়ে বাঁচলেন।

ইতিমধ্যে ম্যাডানে আমি ঠিকে-তে ছবির কাজ করেছিলাম। চব্বিশ সালের পুজোর পর থেকেই শুটিং হচ্ছিল নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে—পরেশনাথ পাহাড় পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। ওতে আমি আর দুর্গাদাস ছিলাম। ময়মনসিংহ-গীতিকার মহুয়ার গল্পটিই একটু ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, নাম

দেওয়া হয়েছিল—প্রেমাঞ্জলি। নদেরচাঁদ ছিলাম আমি, আর, স্বজন ও হুম্‌ড়ো মিলিয়ে এতে যে একটি চরিত্র করা হয়েছিল, সেটি করেছিল দুর্গা। পঁচিশ সালে এই ছবিটি রিলিজড্‌ হয়েছিল। এর পর এলো আরেক ছবির ব্যাপার। অরোরার অনাদি বোস, যাঁর কথা আগে বলেছি, তিনি একদিন বললেন, আসুন আমরা একটা ছবি করি।

বলে, তিনি প্রবোধবাবু ও আমাকে নিয়ে একটা প্রাইভেট কোম্পানীই করে ফেললেন। আমার পরিশ্রম আর ওঁদের দুজনের অর্থ। এই হলাম আমরা তিন অংশীদার। বিজয়রত্ন মজুমদারকে দিয়ে গল্পও লিখে নিয়েছিলাম একটা। তিব্বতী লামার গল্প। দার্জিলিং-ঘুম-মনাস্টারী এইসব পটভূমিকায় উপস্থাপিত। ২৫শে মে আমরা ছবি তুলতে গিয়েছিলাম দার্জিলিং-এ। প্রবোধবাবুর ভায়রাভাই প্রফুল্লচন্দ্র গুহ ছিলেন ওখানে সরকারী কর্মচারী। আমাদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা-ট্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে বিজয়রত্নও ছিল, ছিল অনাদিবাবুর টেক্‌নিশিয়ানরা। স্টারে একটা সপ্তাহ পুরো কামাই করে পরের সপ্তাহে যোগদান করার কথা। সেই হিসেবেই দার্জিলিংয়ের এপাশে-ওপাশে ঘুরে ঘুরে শুটিং করছি, এমন সময়, ৩রা জুন সকালবেলা টেলিগ্রাম এলো—"শীগ্‌গির চলে এসো, তিনকড়িবাবুর অ্যাক্‌সিডেন্ট্‌ হয়েছে।"

সেদিন সকালের শুটিং সেরে এসে দেখি, টেলিগ্রামটা পড়ে রয়েছে। সুতরাং আর কী, বাকী শুটিং বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি রওনা হবার তোড়জোড় করতে লাগলাম। বিজয়রত্ন গিয়েছিল দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর "স্টেপ্‌ এসাইড" নামক বাড়িতে। বললেন—একটু ভালো আছেন দেশবন্ধু। জিজ্ঞাসা করলেন—কে কে এসেছে? নাম করলাম। আপনার নাম শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—অহীন্দ্র ত এল না।

লজ্জা পেলাম। দার্জিলিং আসা ইস্তক চেষ্টা করছি ওঁর কাছে যাবো, কিন্তু কাজের ঝামেলায় আর যাওয়া হয়নি। বললাম—এখন ত তাড়াহুড়া করে যেতে হচ্ছে। ফিরে আসি, এবার নিশ্চয়ই দেখা করব।

কিন্তু হায়রে, সেদিন কি ঘুণাক্ষরে বুঝেছিলাম যে তাঁর সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হবে না!

শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত তখন ছিল মিটার গেজ রেলওয়ে লাইন। তারপরে বড়ো লাইন (অর্থাৎ ব্রড গেজ) একেবারে শেয়ালদা পর্যন্ত। এরও আগে ব্রডগেজ বা বড় লাইন ছিল মাত্র শেয়ালদা থেকে দামুকদিয়াঘাট পর্যন্ত। ওখানে নেমে ফেরী ষ্টীমারে পদ্মা পার হয়ে যেতে হতো ওপারে। সাহেবরা ডিনার খেতেন ঐ স্টীমারেই। ফেরী স্টীমার যেতো বেঁকে-বেঁকে ঘুরে-ঘুরে—সোজাসুজি ওপার যেতে পারত না—ভীষণ তোড় ছিল পদ্মার। এইভাবে সন্তর্পণে গিয়ে স্টীমার লাগত ওপারে, সাড়া ঘাটে। সাড়া ঘাট থেকে শুরু হতো মিটার গেজ (বা মাঝারী লাইন) একেবারে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। এই পারাপারের কথা বেশ মনে আছে। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে একবার দার্জিলিং গিয়েছিলাম এইভাবে। তারপরে তৈরী হলো সুবিখ্যাত "সাড়া ব্রীজ" পদ্মার ওপর দিয়ে।

বড়ো লাইন প্রথম ব্রীজ পেরিয়ে গেলো ঈশ্বরদী পর্যন্ত, তারপরে শান্তাহার পর্যন্ত, তারপরে পার্বতীপুর পর্যন্ত। এই যে ২৫ সালে শুটিং করতে গিয়েছিলাম, তখন ব্রড গেজ এসে গেছে পার্বতীপুর পর্যন্ত।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ৪ তারিখে কর্ণার্জুন অভিনয়। আমাকে নামতে হবে। মে-মাসের ২৮ কি ২৯ তারিখে তিনকড়িদার অ্যাকসিডেন্ট্‌টা হয়েছে। থিয়েটারের পর ইন্দু আর তিনকড়িদা গাড়ি করে ফিরছিলেন—ফোর্ড টুরার গাড়ি। গ্রীষ্মকাল, তাই হুডটা খুলে আসছিলেন দুজনে ওয়েলেস্‌লি দিয়ে। কীভাবে যেন হঠাৎ ধাক্কা খেলেন ফুটপাতে। প্রবল ধাক্কা। ইন্দু ছিট্‌কে পড়ে গেল বাইরে। আর তিনকড়িদা? যখন ওঁকে তুলতে যাওয়া হলো, দেখা গেল, ল্যাম্প্‌ পোস্টে হেলান দিয়ে প্রস্তরখণ্ডের মতো বসে আছেন—নিঃসাড়-নিস্পন্দ! ঠেলা দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল ওঁর। কাঁধের হাড়ে আঘাত লেগেছিল। আট-দশদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল ওঁকে। ইন্দুর অবশ্য হাত-পা ছড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি। ওদিকে, স্টার তখন বিশ্বকবির "চিরকুমার সভা" ধরবার আয়োজন করছেন ভিতরে ভিতরে। তিনকড়িদা 'অক্ষয়' সাজবেন। উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ না হয়ে উঠলে বই যে পিছিয়ে যাবে!

৪টা জুন আমি এসে ত কর্ণ করলাম 'কর্ণার্জুন'-এ। ৩রা জুন নাট্যমন্দিরে শিশিরবাবু খুলে দিয়েছেন জনা। সেদিন, বলা বাহুল্য, আমরা পথে। এসে শুনলাম, বিস্তর কাটাকুটি করে উনি 'জনা' নামিয়েছেন। এটা আমরা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। যখন 'জনা'র প্রথম প্ল্যাকার্ড দিয়েছিলেন ভাদুড়ীমশাই সেই ফেব্রুয়ারী মাসে, তখন "নাচঘর" তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নাটকটিকে কাটাকুটি করে একেবারে ঢেলে সাজিয়ে নিতে। (১৯।২।২৫)। কাটাকুটি করে বই নামানো এই প্রথম নয়। কুঞ্জবাবুর কাছে এ সম্পর্কে বেশ সরস সব গল্প শুনতাম। সেই আগেকার দিনে যখন গভীর রাত করে প্লে ভাঙ্‌ত, তখন দর্শকেরা আপত্তি তুললেন—হয় বারোটায় প্লে ভেঙে দাও, আর নয়ত, সারারাত চালিয়ে ভোরে ভেঙে দাও। মেয়েছেলে নিয়ে অতো রাত্রে আমরা বাড়ি ফিরি কী করে? গভীর রাতের কলকাতা, পথে রাহাজানির ভয় আছে না?

তাই তখন ব্যবস্থা হয়েছিল, ভোর চারটেয় প্লে ভেঙে যাবে। একখানা বড়ো নাটক, সঙ্গে দুটি অপেরা। কর্তৃপক্ষ যত বই চাপায়, এঁরা সময় ঠিক রাখবার জন্য তত কেটেকুটে নেন। এই কাটাকুটির ব্যাপার নিয়ে থিয়েটার-জগতে তখন কয়েকটা কথারই প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। যেমন, কচুকাটা, কুরে কাটা, মুড়ে কাটা, জুড়ে কাটা। সিন যদি পুরো কিংবা অর্ধেক কাটা যেতো, তাকে বলত কচু কাটা। ডায়ালগের মাঝখান থেকে দু'চার লাইন ক'রে ক'রে বাদ দেওয়াকে বলত কুরে কাটা। অভিনেতার মর্জি বুঝে যখন গোটা পাতাই মুড়ে রাখা হতো, তাকে বলত মুড়ে কাটা। জুড়ে কাটাটাই ছিল—শক্ত। যাকে বলে—এডিটিং। লিঙ্ক রেখে-রেখে অর্থ বুঝে বুঝে সামঞ্জস্য করে কাটা, যাতে বইয়েরও তেমন ক্ষতি হলো না, চরিত্রেরও সঙ্গতি বজায় রইল। ভাদুড়ীমশাই 'জনা'কে কীভাবে কেটেছিলেন তার বর্ণনা তখনকার কাগজগুলি যে সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন, তাতেই পাওয়া যায়।

বিশেষ ক'রে 'বিদূষক' চরিত্রটিকে কেটে-ছেঁটে এমন অবস্থায় দাঁড় করিয়েছিলেন যে, অধিকাংশ সমালোচকই তা সহ্য করেন নি। অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখলেন—"বড়ই দুঃখের বিষয়, মনোমোহনে আমরা জনা নাটককে ঐরূপ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় অভিনীত হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। জনার গলায় নির্মম ভাবে ছুরি চালাইয়া ভাদুড়ী সম্প্রদায় যে শুধু গিরীশ-প্রতিভার লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার ফলে তাঁহাদের অভিনয় অনেক স্থলেই জমিবার অবসর পায় নাই।"

'শিশির' লিখলেন ৬ই জুন—"বিদূষককে কাটিয়া-ছাঁটিয়া খোঁড়া করিয়া যেভাবে স্টেজে বাহির করা হইয়াছে, তাহা না করিয়া তাহার ব্রাহ্মণীর ন্যায় তাহাকেও নাটক হইতে একেবারে বিদায় দিলে বরং ভালো হইত।"

১৩ই জুন 'সার্ভেণ্ট্' লিখলেন—

"In the final scene, for instance, 'Jana' commits suicide in Mr. Bhaduri's play, whereas in the original, the goddess Ganga appears from under the water and takes "Jana" into her bosom."

শেষ দৃশ্যে জনা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন, গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বুকে ধারণ করলেন না। আসলে বইটাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করেছিলেন শিশিরকুমার, আসলে এটা ছিল তাঁর একটা এক্স্পেরিমেণ্ট্। কিন্তু তা' সফল হয়নি। নাটকের রচনাই হচ্ছে ভক্তিরস থেকে উদ্ভূত, কোথাও সেটা বাস্তববোধকে আশ্রয় করেছে, কখনো বা রূপককে আশ্রয় করেছে। রূপকও নাট্য-বিন্যাসের একটা বড়ো আঙ্গিক, তাকে বাদ না দিলেও পারতেন শিশিরবাবু। ভক্তিরসে যদি তাঁর বিশ্বাস না থাকে ত, ভক্তিরসের বই ধরা কেন, এই ছিল সেদিনকার সমালোচকদের উক্তির মূল সুর। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় রাখালদা কিন্তু তাঁর সুখ্যাতি করেছিলেন—

"We are perfectly sure that had Girish Chandra Ghosh lived upto the present day and tried to reproduce his "Jana," he would have felt the necessity of recasting the book."

"ফরোয়ার্ড"-এর এই উক্তির প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অচিরেই অন্যান্য কাগজে। প্রবীরকে "spoiled child" বলে প্রশংসা করেছিলেন ফরোয়ার্ড, অন্য কাগজরা প্রশ্ন করলে—প্রবীর 'স্পয়েলড্ চাইল্ড্' কীরকম? এ আখ্যার অর্থ কী?

এইরকম প্রচুর বাদ-প্রতিবাদ। "বাঙলা" ১৯শে জুন লিখে বসলে—"হিন্দু জনা হয়নি, ওটা ব্রাহ্ম জনা হয়েছে।"

'অবতার' ১৮ই জুন স্টার ও নাট্যমন্দিরের "জনা"র অভিনয়ের তুলনা করে একটা তালিকাই বার করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে "জনা"র চরিত্রের তুলনাটাই লক্ষণীয়। তারাসুন্দরীর জনাকে ভালো বলে সুশীলাসুন্দরীর জনারও প্রশংসা করেছেন, এমনকি কয়েক জায়গায় তারাসুন্দরীকেও অতিক্রম করে

গেছে বলে লিখেছেন। তারপর লিখছেন, "তারাসুন্দরীর সঙ্গে যে সুশীলাসুন্দরীর তুলনা করিতে হইতেছে, ইহাই সুশীলাসুন্দরীর পক্ষে গৌরবের কথা।"

নাট্যমন্দিরের 'জনা'র ভূমিকালিপি ছিল মোটামুটি এই :—প্রবীর—শিশিরবাবু, জনা—তারাসুন্দরী। নীলধ্বজ—নরেশ মিত্র, পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শ্রীকৃষ্ণ—রবি রায়। মদনমঞ্জরী—প্রভা। নায়িকা—চারুশীলা। পরে সমালোচনার আধিক্য দর্শনে ৮।১০ রাত্রি পর শিশিরবাবু যখন বিদূষক চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত আবার তুলে আনলেন, তা-ও সবটা না রেখে, কিঞ্চিৎ ছোট করে, তখন নৃপেন বসু (বা নৃত্যবিদ্ নেপা বোস্‌কে) ঐ ভূমিকায় নামিয়েছিলেন। যে ভূমিকায় অবিস্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন স্বয়ং গিরীশচন্দ্র এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর, যে ভূমিকায় পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়ে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন দানীবাবু এবং অপরেশচন্দ্র, সেই ভূমিকা শিশিরকুমার চালিয়ে দিলেন নেপেনবাবুর ওপর দিয়ে। লোকে এতেও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অমরেন্দ্র রায় লিখেছিলেন—"ভাদুড়ীমশাই পৌরাণিক প্রাণ লইয়া 'জনা' কাটাছাঁটা করেন নাই।...কিন্তু, গিরিশবাবু পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকই লিখিয়াছিলেন !"

এঁরা বলতে চান, ভক্তিরসে বিশ্বাস নেই যখন, ভক্তিরসের বই ধরা কেন ? অভিনয়ের অবশ্য সুখ্যাতি হয়েছিল প্রচুর, আবার কিছু কিছু অখ্যাতিও হয়েছিল। অবশ্য এ অখ্যাতির কোনো অর্থ নেই, আমি নিজে না দেখলেও, শিশিরবাবুর 'প্রবীর'-এর যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছিলাম। নিজে না দেখলেও কথাটা আমার বিশ্বাসজনক মনে হয়েছিল। কারণ আমি জানতাম শৃঙ্গার-রসাত্মক অভিনয়ে তখনকার দিনে শিশিরবাবুর তুলনা ছিল না। 'জনা' নাটকের নায়িকার দৃশ্যে তাঁর অভিনয় যে অতুলনীয় হবে, এ আমি বেশ কল্পনা করতে পারি। কেউ কেউ এ দৃশ্যেরও আবার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তা করুন, কিন্তু ঐ যা বললাম, সে সময়ে শৃঙ্গার-রসাত্মক অভিনয় করবার মতো অভিনেতা শিশিরবাবু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। পরে, এ শক্তি অর্জন করেছিলো—আমাদের দুর্গাদাস।

'জনা'র এডিটিং নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বেধে গিয়েছিল তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা। পরস্পরকে দোষারোপ। ফলে হলো কী না, দুই থিয়েটারেই "জনা" জমে গেল, দুই থিয়েটারই প্রচুর অর্থ পেলো "জনা" নাটকে। "প্রতিযোগিতাও যে নাট্যশালার পক্ষে কতো প্রয়োজনীয়, তা সুন্দর প্রত্যক্ষ করা গেল এই জনার অভিনয়ে"—লিখেছিলেন জনৈক সমালোচক।

আর্ট থিয়েটার প্রথমে 'জনার' পোশাক-আশাক আর দৃশ্যপট নিয়ে ততটা মাথা ঘামান নি, নাট্যমন্দির 'জনা' খোলার পরে ওঁরা 'জনা'-র অনেকগুলি দৃশ্য তৈরী করে ফেললেন। শেষ দৃশ্যে—গঙ্গা যেখানে আবির্ভূতা হচ্ছেন—সেখানে ইতিপূর্বে স্টার মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন আঁকা কাপড়-চোপড় দিয়ে, এবারে করলেন সত্যিকার জল দিয়ে। কী করে এটা করেছিলেন, সেটা 'মেবার পতন'-এর সময়ে বলব। দুয়েরই ব্যবস্থা ছিল প্রায় এক, সংস্থাপনা বিভিন্ন।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এইসব চলছে, এমন সময় বাঙলার বুকে নেমে এল আকস্মিক বজ্রপতন—দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করলেন দার্জিলিংয়ে ১৬ই জুন, মঙ্গলবার, ১৯২৫ সালে (২রা আষাঢ় ১৩৩২ সাল) বেলা পাঁচটায়! সেদিন আলফ্রেড মঞ্চে একটি চ্যারিটি হচ্ছিল "কম্বিনেশন" অভিনয় ব্যবস্থায়। মিনার্ভা অভিনয় করছেন একখানা বই—আমরা করব নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়। নরীসুন্দরী, রসরাজ অমৃতলাল এঁরাও এসেছিলেন। দর্শকের পক্ষে বিপুল আকর্ষণ। দানীবাবু আবৃত্তি করলেন গিরীশচন্দ্রের "হলদিঘাট" কবিতাটি। ছোট-খাট আইটেমগুলির সবই হয়ে গিয়েছিল, বাকী ছিল মিনার্ভার নাটকটির অভিনয়। কি নাটক, সেটা আজ আর অবশ্যি মনে নেই। এবং নাটকটি শুরু হয়ে দুটো-একটা দৃশ্য অভিনয় হয়েছিল, কি অভিনয় আদৌ আরম্ভ হয়নি, সেটাও ঠিক স্মরণে আসছে না। এমন সময় টেলিগ্রাম এলো—তিনি আর ইহলোকে নেই। বড়বাজার কংগ্রেস অফিস থেকে খবর পেলাম আমরা। শোকসন্তপ্তচিত্তে দুঃসংবাদটি ঘোষণা করে আমরা অভিনয় বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু এমনও দর্শক কিছু ছিলেন, যাঁরা অন্য সবার মতো উঠতে চাইলেন না, বসে রইলেন। বললেন—অভিনয় দেখব, না হয়ত ঐ টিকিটে অন্যদিন দেখব! অন্যদিন হয় কী করে? চ্যারিটি শো। টাকা ওঠামাত্রই যাদের দেবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, রিফাণ্ড দেওয়া পর্যন্ত যাচ্ছে না। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি। তখন খদ্দর-পরিহিত গান্ধী টুপি মাথায় স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে সার দিয়ে দাঁড়ালেন পাদপ্রদীপের নীচে—দর্শকদের মুখোমুখি। তাঁদের দিকে তাকিয়ে উক্ত দর্শকদল আর দ্বিরুক্তি করলেন না, নীরবেই আসন ত্যাগ করে উঠে প্রস্থান করলেন।

১৭ই জুন, বুধবার, স্টারের প্লে ছিল, বন্ধ হয়ে গেল। ১৭ই তারিখেই শবদেহ রওনা হলো দার্জিলিং থেকে। শেয়ালদায় এসে পৌঁছলো বৃহস্পতিবার, ১৮ই তারিখে সকালবেলা। সেই শবদেহের অনুবর্তী মিছিলের কথা প্রবীণদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে! সে বিশাল শোকমগ্ন জনস্রোত যে না দেখেছে, সে কল্পনাই করতে পারবে না, সে বিশালতার সম্যক অর্থটা কী? ফুলের মালায় মালায় আচ্ছন্ন দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ যেন পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন! যেখান-দিয়ে যেখান-দিয়ে শোকযাত্রা চলেছে—প্রতিটি বাড়ির অলিন্দে-অলিন্দে বারান্দায়-বারান্দায় বাতায়নে-বাতায়নে অজস্র নরনারীর মুখ! গ্রীষ্মের দিন—কতো পাখা লোকের হাতে হাতে—জনতার উদ্দেশে কতো বাড়ি থেকে পাখা ফেলে দিচ্ছে। কতো ফুল যে অশ্রুর মতো এসে ঝরে পড়ছে শবদেহের ওপর তার ইয়ত্তা নেই! ভিড়ের চাপে কতো লোক যে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তারও কি হিসাব আছে? আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি সেদিন দেশের একটি লোকেরও চক্ষু বোধ হয় শুষ্ক ছিল না! দেশবন্ধু সারা ভারতের কতখানি ছিলেন, তার সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস। কিন্তু আমরা জানি, দেশবন্ধু ছিলেন সারা বাঙলার প্রাণস্বরূপ! সেই প্রাণ যেন সমগ্র জাতির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছে।

তের

১৯২৫—১৯২৬

২৯শে জুন দেশবন্ধুর স্মরণে স্টার-মঞ্চে এক মহতী স্মৃতিসভা হয়েছিল। তাতে ছিল কিছু নির্বাচিত দৃশ্য, প্রফুল্ল অভিনয় এবং শেষে বায়োস্কোপের সাহায্যে শবযাত্রার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। সভায় দাঁড়িয়ে নাট্যাচার্য অমৃতলাল দিয়েছিলেন সমগ্র নাটমঞ্চের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ। দেশবন্ধু ফাণ্ডে স্টার সেদিন দিয়েছিলেন দু' হাজার এক টাকা। সেদিনকার বিক্রি। ১লা জুলাই শ্রাদ্ধ উপলক্ষেও অভিনয় ছিল বন্ধ।

নরেশবাবু চলে গিয়েছিলেন, সেকথা আগেই বলছি। তাঁর বদলে এসেছেন রাধিকানন্দ—নরেশবাবুর বিখ্যাত ভূমিকা "শকুনি" করছেন রাধিকাবাবু। জুনের শেষাশেষি—পুরীর রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে আমরা (অর্থাৎ আমরা তিন পার্টনার—আমি, প্রবোধবাবু আর অনাদিবাবু) এক ফিল্ম তুলতে গেলাম পুরীতে। গল্পটা আমারই। হরিদাসবাবুকে দেখিয়ে একটু পরিমার্জিত করে নিয়েছিলাম। নামকরণ তখনো হয়নি। বিদেশিনী একটি মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়—রথের ভিড়ে সে তার তরুণ সঙ্গীটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু বিচ্ছিন্ন নয়, ভিড়ের চাপে মূর্ছিত হয়ে পড়ে বলা যায়। তাকে ভিড় থেকে বাঁচায় আরেকজন। পরে, সেই মেয়েটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে আচারে-ব্যবহারে মার্জিত করে সিনেমায় নামানোর চেষ্টা—একটু রোমান্সও আছে। গল্পের সবটা আজ আমার মনেও পড়ছে না। কিন্তু, রথযাত্রার বিশাল জনতার দৃশ্য এবং ঐ সিকোয়েন্সটুকু ত তুলতে হবে? তাই আমরা দলবল নিয়ে পুরী গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার ফটো প্লে সিণ্ডিকেটের সেই পুরাতন বন্ধু—জ্যোতিষ মিত্রকেও নিয়ে গিয়েছিলাম। উৎসাহী লোক—কাজে সাহায্যও করবে, অভিনয়ও করবে। শুটিং করতে করতে আবার কলকাতায়ও ফিরে এলাম—সাজাহান অভিনয় ছিল। সাজাহান শেষ করে চলে গেলাম চিল্কার ধারে, বালুগাঁও বলে একটা জায়গায়। পুরী থেকে আমাদের পার্টি সেখানে ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে। সঙ্গে এবার নিয়ে গেলাম হরিমোহন বসুকে। আমাদের সেই হরিমোহনবাবু সম্প্রতি স্টারে যোগদান করেছেন। চিল্কার ধারে অপূর্ব দৃশ্যাবলীর মধ্যে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ফের ফিরে আসতে হলো কলকাতায় ৭ই জুলাই তারিখে। কারণ ৮ই জুলাই স্টারে খোলা হচ্ছে আরেকখানা বই—দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন"।

'মেবার পতন' হবে, অথচ রিহার্স্যাল দিতে পারিনি। শুটিং-এর জন্য ব্যস্ত থাকায় মেবার পতনের পার্টটাও দেখে রাখতে পারিনি। আমি করব মহাবৎ খাঁ। তিনকড়িদা—গোবিন্দ সিংহ। দুর্গাদাস—অমর সিংহ। হরিমোহনবাবু—অরুণ সিংহ। সুশীলাসুন্দরী—কল্যাণী, নীহারবালা—

মানসী। এই মেবার পতনে সেই রকম সত্যিকারের জল দিয়ে জলের দৃশ্য দেখানো হলো আবার। জনায় দেখানো হয়েছিল গঙ্গা, মেবার পতনে উদয়সাগর। প্রবোধবাবু করেছিলেন কী, প্রকাণ্ড একটা ওয়াটার-প্রুফের ট্যাঙ্ক অর্ডার দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। আয়তনে সেটি হবে আমাদের স্টেজের আধখানা, অর্থাৎ মঞ্চের একেবারে পিছন থেকে এসে পড়ল মঞ্চের মাঝামাঝি। আর চওড়ায় দু' উইঙ্গসের ভিতরে ঢুকে যেতো। পিছনে ওপর দিকে তিন ইঞ্চি পাইপ ছিল ফিট করা, এই পাইপ দিয়ে তোড়ে কলের জল ছাড়া যেতো ট্যাঙ্কে। কলের জল আর পাইপের অসুবিধে নেই, ফায়ার-ব্রিগেডের জন্য সে ব্যবস্থা আগে থাকতেই করা ছিল। পাইপগুলো রাখা থাকত প্লাটফর্মের কাছে। এবার সেই পাইপগুলো ট্যাঙ্কের সঙ্গে ফিট করে দেওয়া হলো। জল-নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা ছিল বই কী। হোস পাইপের সাহায্যে জল নিয়ে ঢালা হতো, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই যে ম্যানহোলটি ছিল, তার ভিতরে। ঐ যে তোড়ে জল ছাড়ার কথা বলেছি, তাই দিয়ে ঝর্ণা-ফোয়ারা এ'সব দেখানো যেতো। আর উইঙ্গসের ভিতর থেকে প্যাডল্ মতন করে কাঠের পাটি দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে, ফলে ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে ট্যাঙ্কের জলে। এই ঢেউয়ের ওপরে যথাযথ আলোকসম্পাত করলেই স্রোতসলিলা গঙ্গার অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠত। ট্যাঙ্কের পিছনে স্টেজের গায়ে ছিল ট্র্যাপ-ডোর, সেটা খুলে দিলেই সেখান থেকে আবির্ভূতা হতেন গঙ্গা।

মেবার পতনে এই ট্যাঙ্ক দিয়েই উদয়সাগর করা হলো, যেখানে হোলি খেলছে মেয়েরা। জলের ট্যাঙ্কের পিছন দিকটায় এক ফুট চওড়া ক'রে পাশাপাশি আয়না ফিট করা হলো—এক ফুট চওড়া ও লম্বা ছ ফুট সাইজের আয়না পাশাপাশি বসানো। তবে বসানোর মধ্যে একটু বাহাদুরি ছিল। এমনভাবে অ্যাঙ্গল করে বসানো, যাতে করে তার ওপর অডিয়েন্সের ছায়া বা অভিনেতাদের কোনো ছায়া না পড়ে। ফলে মনে হতো জল—জল আর জল—এতদূর চলে গেছে যে সম্যক দৃষ্টি চলে না! এ' বিভ্রম খুবই কার্যকরী হয়েছিল।

'মেবার পতন' অভিনয়ের দিক থেকে কতগুলি পার্ট ভালো হলো, কতগুলি হলো না। মহাবৎ খাঁ করলাম—সেনানী মানুষ—তাই মিলিটারী চালটা বজায় রেখে। স্মরণশক্তিটা ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদ, তাই আমি খুব অসুবিধায় পড়লাম না। অভিনয়ের মধ্যে সুশীলার 'কল্যাণী' খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

এইসব ত হচ্ছে, এর মধ্যে ১২ই জুলাই ঐ পঁচিশ সালেই আমি পুত্র লাভ করলাম। সেদিন রবিবার—তাই নাম হলো ভানু, ভালো নাম প্রীতীন্দ্র। সেদিনটা বেশ মনে আছে—কর্ণার্জুনের ১৯৬ রাত্রি অভিনয় হচ্ছে সেদিন—২৮শে আষাঢ়, ১৩৩২। এরপর ১৮ই জুলাই ঘটল এক ঐতিহাসিক ঘটনা যার কথা একটু আগে থাকতেই শুরু করা দরকার। কিছুদিন থেকেই আমার মনে একটা অদ্ভুত আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে, ক্রমাগত ভাবছি, নতুন নাটক দরকার, নতুন ধরনের নাটক। পঁচিশ সাল পর্যন্ত দেখলাম, সব পুরাতন নাটকেরই ভিড়। দু'-একখানা নতুন যা আসে, তাতে গল্পই নতুন, রচনাশৈলী নতুন নয়। ওসব যেন পুরাতন নাটকেরই অনুসারী। বেশ বোঝা গেল, ১৯১২ সাল থেকে সেই যে গিরিশঅনুসারী

গিরীশোত্তর যুগ চলেছে, তেইশ সালে আমরা এলাম, এখন এই পঁচিশ সাল চলেছে, কিছু ত বদলালো না ! আমার চিরকালের ধারণা, নাট্য অনুশীলনে নাটকই হচ্ছে বড়ো। কিন্তু সেই "নাটক" কোথায় ? মনটা কিছুদিন ধরেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। কী করছি আমরা ? যেন বৃদ্ধার গায়ে সুরুচিপূর্ণ গয়না পরাচ্ছি ! প্রয়োগকৌশলে যতই নতুনত্ব আনা হোক না কেন তা' যেন সত্যিই বুড়ীর গায়ে গয়না-পরানোর মতো হয়ে যাচ্ছে ! কাকে আর মন খুলে এসব কথা বলি। তখনকার "বৈকালী" কাগজের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন শচীন সেনগুপ্ত। ইনি মাঝে মাঝে স্টারে আসতেন, এঁর সঙ্গে ঐ সব গল্প জুড়ে দিতাম। শচীনবাবু তখন খুবই ফিল্ম দেখতেন, কয়েক বছর ধ'রে গিয়েটারও দেখছেন, আসলে সাংবাদিক, নাটক লেখবার ইচ্ছা তখনো ছিল না। এঁকে গর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থস'খানা দিলাম, বললাম—নাটক করুন না মশায় !

তেইশ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার এবং ইটালির এলিনোরা ডুসে ও সম্প্রদায় যখন আমেরিকায় অভিনয় করতে যান, তখন তাঁদের ইম্‌প্রেশারিও ছিলেন মরিস গেস্ট। মস্কো আর্ট থিয়েটার ও এলিনোর ডুসের আমেরিকা পরিক্রমাকে স্মরণে রাখবার জন্য এই মরিস গেস্ট এবং বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ও প্রবন্ধকার অলিভার সেলার—দু'জনে মিলে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন—(১) মস্কো আর্ট থিয়েটার সিরিজ, যাতে পুস্তিকার মতো এক-একখানি করে কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল ; (২) ডুসের ভল্যুম—একটা। আর ছিল পিরানদেলোর দু'ভল্যুম। এগুলো সবই যোগাড় করে নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। আর পড়েছিলাম আঁন্দ্রিভ-এর নাটক। এসব প'ড়ে এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, মনে হতো এসব ধরনের বইতে অভিনয় না করলে আর তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছে না। শচীনবাবুদের বলতাম—তর্জমা করুন না মশাই !

ঐ সময় বার্নস্ ম্যান্টেল যেসব নাটক সম্পাদনা করেছিলেন—"বেস্ট প্লেজ" নামে তার একটা সিরিজ বেরিয়েছিল ২২।২৩ সালে, আরেকটা সিরিজ বেরিয়েছিল ২৩।২৪ সালে। বিশেষ করে ২২ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম আর্চারের "ওল্ড ড্রামা এণ্ড দি নিউ" পড়ে ত মাথাই ঘুরে গেল ! মানসিক উত্তেজনা এমন চরমে উঠল যে, একদিন ডিরেক্টরদের কাছে গিয়ে সোজা বলে ফেললাম আমার মনের কথাটা ! বলার ভঙ্গিতে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়ে থাকবে। আমি ওঁদের সামান্য কর্মচারী, কোথায় ওঁরা আর কোথায় আমি ! এ যেন নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলা। মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক হলেও ওঁরা আচার-আচরণে কখনো তা প্রকাশ করেননি। কতো অন্যায় কতো সময় করেছি, 'চলে যাব' বলে হুমকি দিয়েছি, তবু কখনো ওঁদের ঐ আচরণের অন্যথা ঘটেনি। সেদিন গিয়ে বলেছিলাম—নতুন ধরনের নাটক চাই। তা' না হলে কতদিন থিয়েটার বাঁচাতে পারবেন সন্দেহ আছে। থিয়েটার রাখতে গেলে নাটকের প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় নাটক ? আপনারা ধনী—থিয়েটার গেলে আপনাদের ক্ষতি নেই। কিন্তু এ' হচ্ছে আমাদের অন্ন। নাটকের অভাব হলে আমাদের অন্নেরও অভাব হবে।

মনোযোগ দিয়ে সবই শুনলেন ওঁরা। তারপর বললেন—দেখুন না নাটক, পেলে ত ভালই হয়।

বললাম—আমি কোথেকে পাবো? কাকেই বা আমি চিনি?

হরিদাসবাবুকে বললাম—আপনার কাছে কতো সাহিত্যিক আসেন, আপনি দেখুন না?

সম্ভবত এরই জের। হরিদাসবাবু চুপি চুপি একদিন আমাকে ডেকে বললেন—শুনছেন? খবর পেয়েছি, কবি স্থির করেছেন তাঁর "প্রজাপতির নির্বন্ধ" উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেবেন।

খবরটা খুব সম্ভব হরিদাসবাবু পেয়েছিলেন কবির অন্তরঙ্গ ও স্নেহভাজন শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাইয়ের কাছ থেকে। ঐ বইটাই "চিরকুমার সভা" নাম দিয়ে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৬ সালের বৈশাখ থেকে ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে। তারপরে ১৩১১ সালে হিতবাদী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে উপন্যাসাকারে যখন বেরুলো, তখন আবার নাম হলো—"প্রজাপতির নির্বন্ধ।" পরে এই উপন্যাসটি একক গ্রন্থ হিসাবেও বেরিয়েছিল, তার একটি কপি ছিল আমার কাছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বইটা পড়ে দেখলাম। দেখলাম, নাটকেরই মতন, সংলাপও যথেষ্ট আছে, এমন কি গান পর্যন্ত দেওয়া আছে। যা দরকার সে হচ্ছে একটু এডিট করা মাত্র। হরিদাসবাবুকে গিয়ে বললাম—মন্দ নয়। তবে হাসির বই।

হরিদাসবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—হাসির বই-ই ত ভালো।

আমি কথা বললাম না, আমি তখন সীরিয়স বই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি বেশী। ডিরেক্টরদের কাছে গিয়ে যেভাবে নতুন নাটকের কথা বলেছিলাম, সেভাবে বলেছিলাম অপরেশচন্দ্রের কাছে গিয়েও। জামতাড়ায় কিছু জমি কিনেছিলেন অপরেশচন্দ্র, রামকৃষ্ণ মঠ হবে বলে যে জমি কেনা ছিল, তার লাগোয়া। মঠ তখনো হয়নি, চালাঘর হয়েছে কয়েকটা মাত্র। জামতাড়ার অধ্যক্ষ ছিলেন ভাব-মহারাজ। তাঁকে দেখেছি কখনো-সখনো আসতেন অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। একবার অপরেশচন্দ্র তাঁর বন্ধু নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে রওনা হচ্ছেন ভাব মহারাজের কাছে জামতাড়ায় যাবেন বলে, গাড়িতে আমিও গেছি ওঁদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিতে। অপরেশবাবু বলে উঠলেন—আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে? দিন কয়েক থেকে আসবেন।

সবিস্ময়ে বললাম—সে কী করে হয়! বাড়িতে ভাববে যে!

অপরেশচন্দ্র বললেন—শিবু-ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি ফেরার পথে আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে দেবে।

তাই হলো। কোনো-কিছুই স্থির ছিল না, হঠাৎ গেলাম, ওঁদের সঙ্গে জামতাড়ায় ভাব-মহারাজের কাছে মাটিতে বিছানা করে শোয়া, ভাব-মহারাজ যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন, সে ছবি যেন চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই। ভাব-মহারাজের দুটি তরুণ শিষ্য পরিবেশন করছে। ভাব-মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন—ভিক্ষান্ন খাচ্ছেন কিন্তু।

সবই মনে পড়ে। মনে পড়ে শুয়ে শুয়ে অপরেশবাবুকে বলছি—অপরেশচন্দ্র ও নির্মলশিববাবু—দুজনকেই উদ্দেশ করে বলছি—তর্জমাই করুন না। আধুনিক নাট্যকারদের নাটকই তর্জমা করুন।

অপরেশবাবুর উত্তরটি আজও মনে আছে। বললেন—আমাদের প্রকৃত মনিব হচ্ছে কারা জানেন? ঐ যারা এক টাকা-দুটাকার টিকিট কিনে পিছনের সারিতে বসে। এরা টাকা দিলে তবে আমাদের অন্ন হয়। কাজেই এদের রুচি-বহির্ভূত কোনো জিনিস আমরা করতে পারি না। বিদেশীরা করতে পারে, তাদের নাট্য-অনুশীলন করবার সুযোগ আছে, তাদের এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল থিয়েটার আছে—চাঁদায় চলে—তাঁরা নতুন জিনিস দিতে পারবেন না কেন?

জামতাড়া থেকে যথাসময়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু মনটা তবু তৃপ্তিলাভ করেনি। বন্ধুদের জুটিয়ে "রূপছত্র" নামে একটি প্রতিষ্ঠানও প্রায় গড়ে তুলেছিলাম বলা চলে। ঐ স্টারের মধ্যেই, যেদিন থিয়েটার নেই, সেদিন আমরা করব। সপ্তাহে একটি দিন পেলেই আমরা খুশী। নতুন-নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম এই পরিকল্পনার কথা। তিনি বললেন—আমার আপত্তি কী? তবে, বাইরের লোক নিতে পারবেন না।

সর্বনাশ! বাইরের লোকও ত কিছু আছে! বাইরের এবং অন্য থিয়েটারের। কী হবে? অগত্যা স্টারের লোক নিয়েই 'রূপছত্র' গড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, সপ্তাহে পাঁচদিনের জায়গায় ছ'দিন অভিনয়—অবৈতনিকভাবে করতে আমি বা আমার মতো দু'চারজন রাজী হতে পারি, কিন্তু, আর সবাই রাজী হবে কেন? সুতরাং "রূপছত্র" সূতিকাগারেই মারা গেল।

"রূপছত্র"-ও গেল, এমন সময় হরিদাসবাবু দিলেন "প্রজাপতির নির্বন্ধ'র খবর। আমার পক্ষে উৎসাহিত হয়ে ওঠ্‌বারই কথা। হরিদাসবাবুকে বললাম—কবির রাজা ও রাণী ত আমরা করেছিলাম, তাতে গান কিন্তু ভালো হয়নি। এবার গান যাতে ভালো হয়, তার ব্যবস্থা করুন।

হরিদাসবাবু বললেন—ঠিক:বলেছেন, গানের ব্যবস্থা করছি।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যে-র কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এঁর বাড়ী হরিনাভি গ্রামে, স্বনামখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের বংশধর ইনি। সেই হিসাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতি এঁর মমতা ছিল যথেষ্ট। আমার মনে হয় এঁর মাধ্যমেই হরিদাসবাবু তখন প্রাথমিক যোগাযোগগুলি করছিলেন। সব কিছুই গোপনে হচ্ছিল, তবু কী করে খবরটা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল। ১৮ই জুলাই শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় হবে 'চিরকুমার সভার' প্রথম অভিনয়। আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমাদের পার্ট সব আমরা পেয়ে গেছি, বই অবশ্য নাট্যাকারে তখনো ছাপা হয়ে বেরোয়নি। ঠিক হয়েছিল, কবি যে-সব নতুন গান এতে সংযোজিত করছেন, সেগুলির স্বরলিপি রাধাচরণ গিয়ে-গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। রাধাচরণ তুলে নিয়ে আসবে, আর গানের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখে দেবেন মঞ্চ-ব্যবস্থা—সেট্‌সিন প্রভৃতি। তখনকার থিয়েটারের গানের লোকেরা একটা জিনিস ভালো জানত, সেটা হচ্ছে, যাকে বলে, সর্টহ্যাণ্ড নোটেশন। রাধাচরণও

জানত। সুতরাং গান একবার গাইতেই রাধাচরণ সেটা সর্টহ্যাণ্ড নোটেশনে টুকে নিচ্ছে—আর তারপরই কবিকে বাজিয়ে শোনাচ্ছে। কবিও ব্যাপার দেখে অবাক। শুনেছিলাম, এ ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কবি।

প্রস্তুতি ত চলেছে সবদিক দিয়েই, কিন্তু ব্যাপারটা তবু জানাজানি হয়ে গেল। কবির অন্তরঙ্গ ও স্নেহভাজন গোষ্ঠীর অনেকেরই ইচ্ছা ছিল না যে, উনি পাবলিক থিয়েটারে নাটক দেন। কলকাতায় তখন যে ক-টি রঙ্গমঞ্চ চল্‌ছে সে সংবাদও বোধকরি ওঁরা সঠিক রাখতেন না। সবই ওঁদের কাছে ঐ এক—পাবলিক থিয়েটার। অবশ্য এ'সবই প্রতিবন্ধক হলো না শেষপর্যন্ত। কবি নাটকটি খুশী মনেই দিয়েছিলেন অভিনয় করতে। এ সম্পর্কে প্রভাতবাবু তাঁর "রবীন্দ্রজীবনী"-র তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন—"চিরদিনই দেখা গিয়াছে একটা নিবিড় কাব্য-পর্বের পর গল্প বা কাহিনী বলিবার জন্য কবির মন উৎসুক হয়। এবারও মন কাহিনী সৃষ্টি করিবার জন্য উৎসুক হইতেছিল, কিন্তু নব প্রেরণার বড়ই অভাব। তাই দেখি পুরাতন গল্প লইয়া নাটক রচিবার চেষ্টা। কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরী বিখ্যাত অভিনেতা; তিনি ও তাঁহার দল কবির নাটক অভিনয়ের কথা ভাবিতেছেন। সেই সংবাদ পাইয়া কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নূতন নাটকীয় রূপদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩৩১ চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা শেষ হয়। মূল 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসাকারে রচিত হইলেও নাটকীয় কথোপকথনে অত্যন্ত পূর্ণ। সুতরাং ইহাকে অল্প চেষ্টাতেই নাটক করা সম্ভব হইল। নূতন গান কয়েকটি যোগ করিয়া দেওয়া হয়।" যাঁরা থিয়েটারের সংবাদ রাখতেন তাঁরা জানতেন আমার সম্প্রদায় ছিল না, স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্বাধীনে আমি এক বেতনভোগী সাধারণ অভিনেতা মাত্র। তবে স্টারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে অনেকে মনে করতেন বুঝি বিশেষ সম্বন্ধ কিছু আছে। বিশেষ সম্বন্ধ আর কিছুই নয়, দু-আড়াই বছর ধ'রে থিয়েটারে আছি, থিয়েটারের কাজটা ভালবাসি, সেইজন্য উৎসাহও ছিল প্রচুর। থিয়েটার থেকে বাড়ি এসে সেই যে শুতুম, উঠতুম একেবারে বেলা করে। তারপরে কয়েকঘণ্টা বাড়িতে কাটিয়ে বিকেল হতে-না-হতেই থিয়েটার। কাজের উৎসাহে বহুদিন খাওয়া-দাওয়ার পরই রওনা হয়েছি। এমনকি বহুদিন—অভিনয়ের দিন আর কী—থিয়েটারের টিকিট ঘরে বসে টিকিট-বিক্রির ব্যাপারেও সাহায্য করেছি। হরিদাসবাবু আসতেন একটু দেরি করে আমাকে টিকিট ঘরে দেখেই চমকে উঠতেন, বলতেন—এখনো বাইরে বসে। যান যান—সাজুন গিয়ে—দেরি হয়ে যাবে। দর্শকও দেখেছে আমাকে। এবং সেজন্য নাট্যমন্দিরে যেমন ভাদুড়ী-সম্প্রদায়, তেমনি স্টারে চৌধুরী-সম্প্রদায়,—এরকম একটি কথা চালু হওয়া আশ্চর্যের কথা কিছু নয়। সেইসব শুনেই প্রভাতবাবু ঐরকম লিখে থাকবেন আর কী।

যাই হোক, প্রস্তুতির কাজ ত চলছে। গগনেন্দ্রনাথ এসে স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে সিনটিনগুলো দেখতেন প্রথমটায়। পাবলিক থিয়েটার সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা ত ভালো ছিল না, তাই ভিতরে আসতে দ্বিধা করতেন বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন বুঝলেন, আবহাওয়া আদৌ

আপত্তিকর নয়, তখন উঠেই এলেন স্টেজের ওপরে। দিনেন্দ্রনাথও তাই। কথা ছিল গানের তত্ত্বাবধান করবেন শুধু। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসে উৎসাহের প্রাবল্য লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত নিজেই বসে গেলেন গান শেখাতে। গাড়ি একখানি, তাই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি বাড়ি ফিরে আসতাম। আমি থাকতাম বসে, যতক্ষণ না ওঁর কাজ শেষ হচ্ছে। ফেরার পথে কতই না গল্প হয়েছে ওঁর সঙ্গে! এক সঙ্গে কাজও করেছি, এক সঙ্গে গল্পও করেছি প্রচুর। আর গগনেন্দ্রনাথ? বিশেষ করে চন্দ্রবাবুর ঘরটি যা করে দিয়েছিলেন, তার চমৎকারিত্বের কথা আজও ভুলিনি! একটা সিঁড়ি ছিল, ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে। কিউবিস্ট কম্পোজিশন করেছিলেন ঘরখানির, তাতে দৃশ্যটি এমন হয়েছিল যে, যাঁরা তা' না দেখেছেন, তাঁরা তার মনোরম রূপখানি কল্পনাও করতে পারবেন না।

গগনবাবু-দীনুবাবু পরে কাজে একেবারে ডুবে গিয়েছিলেন বলা চলে। এবং এঁরা এঁদের বন্ধু মহলে চাউর করেছিলেন—পাবলিক থিয়েটারকে যা ভাবতুম তা নয়, এদের শক্তি আছে।

কথা শুনেছি, কবির কানেও গিয়েছিল। দীনুবাবু-গগনবাবু এমন খুশী ছিলেন যে প্রচারপত্রে তাঁদের নাম দিতে পর্যন্ত তাঁরা আপত্তি করেননি। বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো এইভাবে :—"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা। স্বয়ং কবি ও শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সুরলয়ে গঠিত, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিকল্পিত দৃশ্যপটে মহাসমারোহে অভিনয়।" এইবার আমাদের ভূমিকালিপিটি পেশ করা যাক। রসিক—অপরেশবাবু। অক্ষয়—তিনকড়িদা। চন্দ্রবাবু—আমি। পূর্ণ—দুর্গাদাস। বিপিন—রাধিকানন্দ। শ্রীশ—ইন্দু। গুরুদাস—কাশীনাথবাবু। শৈল—সুশীলাসুন্দরী। সুরবালা—রানীসুন্দরী। নীরবালা—নীহারবালা। নৃপবালা—ফিরোজবালা। নির্মলা—নিভাননী। জগত্তারিণী—নন্দরানী।

প্রথম অভিনয়ের তারিখ আগেই জানিয়েছি। কালীবাবু 'গুরুদাস' বলে গানের ওস্তাদের যে ভূমিকা করতেন, তাতে শ্রীশ আর বিপিনকে গান শেখাবার কসরৎ ছিল। কিন্তু প্রথম রজনীর পর ও' দৃশ্যটি আর অভিনীত হয়নি। ওটা পরিত্যক্ত হয়েছিল, সত্যিই খাপছাড়া লাগত ওটা। কিন্তু এ'তো গেল প্রথম রজনী। তার আগে, মহলার ব্যাপারটাও একটু বলা দরকার। পার্ট পাবার পরই মুখস্থ করে ফেলেছিলাম, তাতে আটকাবার কথা নয়। মহলা দিতে গিয়ে দেখা গেল, দাঁড়িয়ে কথা বললেই যে কাজ মিটে যাচ্ছে, তা' নয়। অনেক বাই-অ্যাক্টিং-এর প্রয়োজনও হয়ে পড়ছে। একদিকে দুজনে কথা বলছে, অন্যদিকে অনেক ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে। কথার থেকে এই নির্বাক অভিনয়ই ছিল কঠিন। ঠিক সময়ে জিনিসগুলো হওয়া চাই। তা নইলে সিন ঝুলে পড়বে। অভিনয়ের মহলা দিতে দিতে আরেকটা সত্য হৃদয়ঙ্গম করলাম,—কী চরিত্র সে অভিনয় করছে, এটা যদি সে বুঝতে পারে, এবং যে ঘটনা ঘটছে, তার ওপর যদি তার প্রত্যয় থাকে, তাহলে তার মুভমেণ্ট-এক্সপ্রেশন—এসব আপনিই আসে, অবশ্যি তৈরি অভিনেতাদের পক্ষেই এটা প্রযোজ্য। আমরা চরিত্র বুঝে অপরের সঙ্গে টাইমিংএর ব্যবস্থাগুলি করে নিয়ে মহলা দিয়ে চললাম। ঐ বাইপ্লের টাইমিং-এর

মহলাই ছিল বেশী দামী। অভিনয়-বিদ্যায় সবাই সমান পারদর্শী নয়, কিন্তু দরদ ও নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্মিলিত অভিনয় হয়ে উঠেছিল দেখবার মতো। একের সঙ্গে অপরের অভিনয়ের এমন একটা সূত্র তৈরি হয়ে গেল যে, সেটা ছিঁড়ে গেলে আর ঠিক ঐ সুরটি বেজে ওঠা কঠিন। পরে যখনই 'চিরকুমার সভা' হয়েছে, তখন এই দল থাকলে ভাবনা নেই, কিন্তু কারুর পরিবর্তে অন্য লোক নামলেই মুশকিল। এত যে বলছি, তবু প্রথম রাত্রিতে চলাফেরার টাইমিং-এ একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বই কী! অবশ্য, দ্বিতীয় রাত্রি থেকে আর হয়নি। কতো করেছি এ'বই—কতোভাবে করেছি, অভিনয়ে যেন মগ্ন হয়ে যেতে পারা যেতো, যাকে বলে—স্বতস্ফূর্ত অভিনয়! উৎসাহ-উদ্দীপনারও অবধি নেই। খরস্রোতা নদীর মতো যেন বয়ে চলেছে আপনার বেগে। শনিবার প্রথম রজনীর অভিনয় হয়ে গেল, রবিবারে হলো—'জনা'। পরের সপ্তাহে, অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে—কবি এলেন দেখতে। ২৫শে জুলাই পঁচিশ সাল—বাংলা ৯ই শ্রাবণ শনিবার —রাত সাড়ে সাতটায়। 'রাজা ও রানী'তে আসেননি কবি, তাই একটু ক্ষোভ ছিল, এবার আর সে দুঃখ রইল না। দীনুবাবু-গগনবাবু সুখ্যাতি করে থাকবেন, তাই বোধ হয় এবার এলেন কবি। সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের আরও অনেকে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতবাবু তাঁর বইয়ের ঐ তৃতীয় খণ্ডেই লিখছেন—"বর্ষামঙ্গল-অনুষ্ঠান হইয়া যাইবার পরই কবি কলিকাতায় চলিয়া যান। সেখানে স্টার থিয়েটারে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়। ৯ই শ্রাবণ যে অভিনয় হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। পাবলিক রঙ্গমঞ্চে ইতিপূর্বে কবির 'রাজা ও রানী' ছাড়া আর কোনো নাটক অভিনীত হয় নাই; চিরকুমার সভার নিরবচ্ছিন্ন হাস্যকৌতুক দর্শক-শ্রোতার মনে যে আনন্দ দিয়াছিল, তা' বর্ণনাতীত।" (এই 'রাজা ও রানী' কিন্তু আমাদের 'রাজা ও রানী' নয়, এমারেল্ডে অভিনীত— 'রাজা ও রানী'র কথা)

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ঠাকুর পরিবারের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সে অভিনয়ে। গগনবাবু-দীনুবাবু ছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন। ছিলেন আরও অনেকে। তার মধ্যে রসরাজ অমৃতলালের নামোল্লেখ করা অবশ্যই আমার কর্তব্য। অবনীন্দ্রনাথ অমৃতলালকে 'রসরাজ' বলতেন না, বলতেন —নটরাজ। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতেন, থিয়েটার দেখার আগ্রহ তাঁর কম ছিল না।

কবি ত যথারীতি অভিনয় দেখে চলে গেলেন। সেদিন আর ওঁর সঙ্গে এই নিয়ে কোনো কথা তুলবারই সময় পেলাম না আমরা। স্থির হলো, কবির সঙ্গে কথা হবে কাল। সকালবেলায়। ওঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। যাবেন অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধবাবু।

প্রবোধবাবু আমাকে বললেন—তুমি যদি যাও ত, ভোরবেলা এসো।

তাই হলো। ভোরবেলাতেই হাজির হলাম স্টেজে। সেখান থেকে ওঁদের সঙ্গে জোড়া-সাঁকোয়, কবির সন্নিধানে। গিয়ে সাক্ষাৎকার ঘটতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসলাম

কাছাকাছি। নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই। আমি কাছে যাওয়া মাত্রই ইনি আমাকে দেখিয়ে কবিকে বলে উঠলেন—ইনিই চন্দ্রবাবুর অভিনয় করেছেন।

তখন ঠিক বুঝিনি, কেন ওকথা বললেন চারুবাবু। পরে শুনলাম, কবি ভাবতেই পারেননি যে একটি যুবক চন্দ্রমাধবের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। তাঁর ধারণা হয়েছিল, চন্দ্রবাবু সেজেছে নিশ্চয়ই কোনো প্রবীণ বা প্রৌঢ় অভিনেতা। সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কবি বললেন—বেশ হয়েছে।

ভেবেছিলাম, এইবার কবি শুরু করবেন সমালোচনা। কিন্তু তা' করলেন না, বেশ খুশী-খুশী ভাবই দেখলাম ওঁর। তবে বিরুদ্ধ সমালোচনা মুখের ওপর করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ, শুনেছি কখনো কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না। নেহাৎ যদি সমালোচনা করা আবশ্যক হত ত ঘুরিয়ে বলতেন। বসে আছি ওঁর কাছে, টুকরো টুকরো নানান কথাই হচ্ছে। মোট কথা, কবি আমাদের প্রশংসাই করলেন। অপরেশবাবুর অনুরোধে কবি হেসে বললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, আরও বই দেবো।

এ' প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমরা যে কী আনন্দ বুকে নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলাম, সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আমার নিজের জিজ্ঞাস্য ছিল 'চন্দ্রবাবু' সম্পর্কে। ওঁকে যে সে বিষয়ে খুশী করতে পেরেছি, এই-ই আমার পুরস্কার। কবি এই চরিত্র সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেন মশাইকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—"চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা, কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে।"

কিন্তু আমি ওঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ এবং রাজনারায়ণবাবু, কাউকেই দেখিনি। কবির কল্পনা কী ছিল তাও জানি না, কখনো আলাপও হয়নি এ নিয়ে। আমাকে নির্ভর করতে হয়েছিল, তাঁর বইটি পড়ে আমার যে ধারণা হয়েছিল, মাত্র সেই ধারণার উপরে। চন্দ্রবাবু আমার ধারণায় ব্যস্ত সমস্ত মানুষ, আসল কাজ না হলেও কাজের স্কিম করছেন অজস্র, এবং তা নিয়ে ভাবছেনও প্রচুর। সমাজ সংস্কার ও শিল্পোন্নয়ন, এসবের পরিকল্পনা সবিস্তারে বলে যাচ্ছেন, কাউকে কোনো কথা বলতে দিচ্ছেন না, একেবারে মেতে উঠেছেন বলা চলে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হলো, একটা জরুরী এনগেজমেণ্ট আছে, এখুনি যেতে হবে। এ ছাড়া চন্দ্রবাবুর চরিত্রের আরেকটা দিক, যাওয়া বা আসার ব্যাপারে—সবেগে চলতেন। এক জায়গায় আছে—"অকস্মাৎ চন্দ্রবাবুর সবেগে প্রবেশ।" পাঠকের মনে পড়ছে সেই জায়গাটা? যেখানে সভ্যরা পরামর্শ করছে—সভা অন্য যায়গায় উঠে যাবে এইসব নিয়ে। এমন সময় চন্দ্রবাবু "সবেগে" এসে বললেন—সব ঠিক হয়ে গেল।

শ্রীশ বললে—কী সার?

চন্দ্রবাবু বললেন—অক্ষয়বাবুর ঘরটি বেশ ভালো। কিন্তু সে যাক—

বলে তরুণ সভ্যদের মনের গোপন অনুসন্ধিৎসা এবং আগ্রহের ওপর মুহূর্তে যবনিকাপাত করে

দিয়ে, শুরু করলেন "একটা অপঘাত ঘটলে কিংবা সাধারণ জ্বর-জ্বালায় কী রকম চিকিৎসা করতে হবে"—সে সম্বন্ধে লম্বা স্পীচ!

সভ্যদের কোনো কথা আর কানেই তুললেন না, তারা যে উস্‌খুস করছে, সে দিকে লক্ষ্যও নেই। বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে—"কটা বাজল?" এবং তারপরে আর না দাঁড়িয়ে "আজ আর বসব না, তাড়া আছে" বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর পিছনে পিছনে পূর্ণও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতে, বিপিন প্রশ্ন করে বসল—"পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছেন যে?"

পূর্ণ বললে—সভাপতি মশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি—পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন উত্তর করলে—ঠিক উল্‌টো হবে। তাঁর যে-কটা কথা বাকী আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে, সে কথা ভুলেই যাবেন।

এঁদের এই কথোপকথনের মধ্যে চন্দ্রমাধব চরিত্রটির একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই রকমই মানুষটি চন্দ্রবাবু। ছেলেরা লাঠি কোথায় আছে, সেটা খুঁজে এগিয়ে দিচ্ছে, চাদর এগিয়ে দিচ্ছে। আর গলার বোতাম খুঁজে দিচ্ছে ভাগিনেয়ী নির্মলা। অর্ধেক রাস্তা চলে গেছেন, হঠাৎ খেয়াল হলো, জামায় বোতাম নেই ত! অমনি ফিরে এলেন, ভাগিনেয়ীকে বললেন—বোতাম কই? এমনই ব্যাপার। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কে-কী বলছে, সম্যক বুঝতেও পারছেন না। সাধারণ হিউমারও অনেক সময় বোঝেন না। উনি ওঁর প্রস্তাবে বলছেন—আমাদের সভার মধ্যে দুটি শাখা সভা রাখতে হবে।

জনৈক সভ্য বলে বসলেন—স্থাবর ও জঙ্গম।

কথাটার তাৎপর্য উনি বুঝলেন না, বলে উঠলেন—সে যে নামই হোক।

বলে, অমনি নিজের কথা শুরু করে দিলেন। শুধু যে চোখে কম দেখতেন তা' নয়, কিন্তু কর্মে মনঃসংযোগ এত গভীর ছিল যে, অন্য কিছুই বুঝতে পারেন না। এক কথায়, সামাজিক ব্যক্তি যাদের আমরা সচরাচর দেখি, তাদের থেকে এ' মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। ওঁর এক নিজস্ব কল্পনার জগৎ আছে। সেই জগতে বসে উনি দেশের উন্নতি এবং নানান পরিকল্পনার চিন্তায় নিয়ত ডুবে আছেন। এবং সদা-প্রসন্ন ব্যক্তি উনি। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কবির ঐ যে পত্রটি উল্লেখ করলাম, তার শেষে আছে —"চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছ সারল্যের ছায়া আছে।"

এই শিশুবৎ স্বচ্ছ সারল্য যদি আমার "চন্দ্রমাধব"-এ আমি ফুটিয়ে আনতে পারি, তবেই আমার সার্থকতা। কবি খুশী হয়েছেন, বলেছিলেন—"এ নতুন রকম।"

সত্যি বলতে কী, চরিত্রটি পড়লেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। তার ওপরে যখনই অভিনয় করেছি এটি, তখনি খুব আনন্দ হয়েছে মনে। বিশেষ করে আমাদের স্টারের ঐ ফুল টিমে যখন অভিনয়

'চিরকুমার সভা'য় চন্দ্রবাবু : অহীন্দ্র চৌধুরী

'গৃহপ্রবেশ' নাটকে যতীন : অহীন্দ্র চৌধুরী। দণ্ডায়মান : 'মাসী' : সুশীলাসুন্দরী (বড়)
বসে : (পায়ের কাছে) মণি : সেরাবালা। (বুকের কাছে) হিমি : নীহারবালা

'বন্দিনী' নাটকে : অহীন্দ্র চৌধুরী (সিংহাসন-নিম্নে), প্রফুল্ল সেনগুপ্ত (সিংহাসন পার্শ্বে)

হতো, তখন আমাদের আনন্দ-রস যেন জীবন-পাত্র থেকে উপচে পড়ত! অভিনয় করবার সময়—টেবিলের সামনে বই দেবার দৃশ্য ছিল যেখানে সেখানে, স্টারের যে-সব পুরানো পুরানো খাতা ছিল জমানো হরিবাবুর ঘরে, সেইসব খাতা দিতো এনে। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে বই-পড়ার ছলে ঐ খাতাগুলো পড়তুম। পড়তে-পড়তে ঐ খাতাগুলিও কম চিত্তাকর্ষক মনে হতো না। ১৮৯০ সালের খাতা পর্যন্ত ছিল। সেই কবে থিয়েটার করতে ওঁরা লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তাঁবু খাটিয়ে অভিনয় করেছিলেন, সে সবের খুঁটিনাটি হিসেব পর্যন্ত লেখা রয়েছে। পড়তে-পড়তে মাঝে মাঝে বড়ো কৌতূহল হতো একটা জিনিসের ব্যাপারে। প্রায়ই দেখি, খাতায় লেখা—ওপিয়ম! বেশী নয়, অল্প দামেরই কেনা রয়েছে। কিন্তু প্রায় পাতাতেই। ব্যাপার কী? আফিম লাগত কী জন্য? হরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলে উঠলেন—কী জন্য আবার? খাবার জন্য।

যাই হোক, 'চিরকুমার সভা'য় নিজেকে যেন ঘটনার মধ্যে ছেড়ে দিতাম। মাঝে মাঝে এমন নাটকও আসে, যার ঘটনার সঙ্গে অভিনেতার সঠিক প্রত্যয় থাকে না। যেমন বৃষকেতুর মস্তকচ্ছেদ। এ ব্যাপারে প্রত্যয় আসে কী করে? তাই কঠিন হয় ঐ ব্যাপারটাকে অভিনয় করা। কিন্তু কঠিন হলেও উপায় নেই, সেই "ভাব"-এ অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই বিশ্বাসে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে অভিনয় করতে হবে। তাই অভিনেতার কোনো জাত নেই, কোনো বিশেষ মতবাদ নেই। আমার এ'সব ধারণা 'চিরকুমার সভা'য় এসে পূর্ণাঙ্গ লাভ করেছিল। এবং করেছিল বলেই অভিনয়ে এতো ডুবে যেতে পেরেছিলাম, যাকে বলে পরমানন্দ, তাই লাভ করেছিলাম সেদিন। 'চিরকুমার সভা'য় সকলের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু অভিনয় ছাড়াও আরেকটি আশ্চর্য জিনিস ছিল, সেটি হচ্ছে নীহারবালার গান। কবি অনেকগুলি নতুন গান দিয়েছিলেন। (১) জয়যাত্রায় যাও গো। (২) যেতে দাও গেল যারা। (৩) ও আমার ধ্যানেরি ধন। (৪) জলেনি আলো অন্ধকারে। (৫) না বলে যায় সে পাছে। এছাড়া যা ছিল,—তাত ছিলই। গানগুলি যথাযথ সুরে গাওয়ারই কৃতিত্ব শুধু নয়, গানের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অভিনয় ছিল। উইঙ্গসের পাশে দাঁড়িয়ে বা মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে মামুলি গান গাওয়ার রীতি এতে ছিল না। এতে ছিল গাইতে গাইতে অভিনয়ের অ্যাকশন। মহলার সময় স্টেজে এসে রীতিমত খেটে সে-সব অ্যাকশন আর গান তুলেছিল নীহারবালা। কতদিন লোক পায়নি, আমাকে এসে ধরেছে—দাদা এসো, প্রক্সি দেবে।

এইরকম ভাবে নিজের তাগিদে 'প্রক্সি' ধ'রে ধ'রে নীহার যে সাধনা করেছিল, অভিনয়ে সত্যিই সে পেয়েছিল তার সুফল। পরে আরও চিরকুমার সভা হয়েছে, পর পর আঠারো বছর ধরে হয়েছে, কিন্তু ঐরকম গান—ঐরকম প্রাণবন্ত সুষ্ঠু অভিনয় নীহার ছাড়া আর কেউ করতে পারল না! কিন্তু পরের কথা পরে হবে, আপাতত পঁচিশ সালের কথাই বলে নেই। আজও যখন ভাবতে বসি, সেইসব মুহূর্তগুলি এসে চোখের ওপর যেন স্বপ্নের মায়াজাল বুনে দিয়ে যায়! অপরেশবাবু-তিনকড়িদা-নীহার-ইন্দু-দুর্গাদাস-রাধিকানন্দ-সুশীলাসুন্দরী—কেউ তাঁরা আজ নেই, তবু সব তাঁরা প্রত্যক্ষ।

ঐ ত দেখতে পাচ্ছি 'রসিক'-বেশী অপরেশবাবুকে, সোফায় বসে আছেন—গড়গড়ার নলটি মুখের কাছে ধরা—হাতের লাঠিটি পাশে রাখা আছে—তাঁকে যুবকরা বড়ো জ্বালাতন করত—তাদের মাথা নেড়ে নেড়ে ধীরে ধীরে বলছেন—"আমার একতলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানালা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে—শুক্ল-সন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে, তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো! শুভ্র একটি হংসদূত কোনো বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে—"অলিন্দ কালিন্দীকমল সুরভৌ কুঞ্জ বসতের্বসন্তীং বাসন্তী নবপরিমলোদ্গার চিকুরাং।"

'শ্রীশ'রূপী ইন্দু অভিভূত হয়ে বলে উঠছে—আপনার মধ্যে যে এতো আছে, জানতুম না!

অপরেশবাবু তেমনি হেসে-হেসে বলছেন 'রসিক'-এর সাজে—কী করে জানবেন বলুন? কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন, এ কেউ সন্দেহ করে না।

বলে, টাকে হাত বুলিয়ে নিয়ে,—কিন্তু এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই!

আর মনে পড়ে অক্ষয়রূপী তিনকড়িদাকে। বসে বসে স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন নিবিষ্ট মনে, এমন সময় নীহার চুপি চুপি এসে ওঁকে জ্বালাতন করা শুরু করলে। বললে—মুখুজ্যে মশাই, ওটা কী?

থতমত খেয়ে তিনকড়িদা জবাব দিচ্ছেন—গয়লাবাড়ির দুধের হিসেব।

নীহার কিন্তু বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটা কী। সে চট করে চিঠির প্যাডটা ছিনিয়ে নিয়ে, প্যাডে চোখ বুলিয়ে দুষ্টুমি করে বলে উঠল—এই বুঝি তোমার দুধের হিসেব?

তারপরেই দেখা যেতো, তিনকড়িদা হন্তদন্ত হয়ে নীহারের পিছনে পিছনে ছুটছেন—জ্বালাতন করিসনে, দে-দে।

আর নীহার ছুটে বেড়াচ্ছে স্টেজময়—খিল খিল করে হেসে উঠছে সকৌতুকে। তারপরে তার গান আর হাসি। যেন দুয়ে মিলে এক পাহাড়ী ঝর্ণা এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে উচ্ছল উদ্বেল তরঙ্গে!

কালের বুকে এরা সবাই বিলীন হয়ে আছে, কিন্তু আমার স্মৃতিতে? অপরেশবাবুর সেই জলদ গম্ভীর স্বরে অপরূপ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি, সেই টাক-মাথা নেড়ে নেড়ে হেসে হেসে কথা বলা, তিনকড়িদার গান গাওয়ার ভঙ্গি আর সহজ সাবলীল চলাফেরা, ইন্দু আর রাধিকানন্দর সেই উৎসুক আগ্রহের ভাব, দুর্গাদাসের চুপ করে গিয়ে মুখের কাছে পেনসিলটা তুলে ধরা,—এ বুঝি কোনোদিনই ভুলব না! ওদের সেই "রসিক-অক্ষয়-নীর-নৃপ-শ্রীশ-বিপিন-পূর্ণ" আজ ইহলোক ত্যাগ করে গেলেও আজও অক্ষয় হয়ে আছে—রঙে রসে সমান উজ্জ্বল, সমান দ্যুতিময় হয়ে আছে!

তারপর, শনিবারে-শনিবারে চলতে লাগল চিরকুমার সভা, রবিবারে—জনা। সপ্তাহের অন্যান্য দিন—কর্ণার্জুন, সাজাহান, প্রফুল্ল, ঘুরে ফিরে কখনো বা ইরানের রানী—এই সব বই। চিরকুমার সভা যখন খোলা হলো, কর্ণার্জুন তখন ১৯৭ রাত্রি চলেছে। ২০০ রাত্রি পূর্ণ হলো ৫ই আগস্ট, বুধবার, রাত

সাড়ে সাতটায়। বিশেষ উৎসবে যেমন জাঁকজমক হতো, তেমনি হলো—আলো আর ফুল দিয়ে বাড়ি সাজানো স্মারক-পত্র উপহার দেওয়া, ইত্যাদি। এর পর ৮ই আগস্টের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নতুন বাড়িতে মিনার্ভার শুভ উদ্বোধন নতুন নাটক—মহাতাপচন্দ্র ঘোষ বিরচিত 'আত্মদর্শন' নিয়ে। উপেন মিত্র মশাই নাটকখানি নির্বাচিত করেছিলেন ওর নূতনত্ব লক্ষ্য করে। এ-বিশেষত্বটা চিরকালই ছিল উপেনবাবুর—নতুন কিছু করা, নতুন কিছু দেবার ঝোঁক। আত্মদর্শনে গানও ছিল অনেক। এর রিহার্সাল মাস্টার ছিলেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন—ভূতনাথ দাস, নৃত্যশিক্ষক ছিলেন—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় বা কড়িবাবু। উপেনবাবুর ভাগ্নে,—কালিপ্রসাদ ঘোষ বি এস-সি—বইখানি অভিনয়োপযোগী করে এডিট্ করে দিয়েছিলেন, তিন-চারখানি গানও দিয়েছিলেন লিখে। অভিনয়ে 'মনরাজা' হয়েছিলেন হাঁদুবাবু নিজে। বুদ্ধি—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। অহঙ্কার—অমূল্যচন্দ্র দত্ত (পরে মৃত্যুঞ্জয় পাল)। মদন ও কাম—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রোধ—সত্যেন দে। জ্ঞান—কার্তিকচন্দ্র দে। বিবেক—আঙুরবালা। রতি—সুবাসিনী। কুমতি—শশিমুখী। এই শশিমুখী ছিলেন মনোমোহনের বড়ো অভিনেত্রী, ওখানে বহু নায়িকা-চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সুমতি—আশমানতারা। সুখ—রেণুবালা। এই রেণুবালা 'সুখ' করে এত সুখ্যাতি পেয়েছিলেন যে, ওর নামই হয়ে গিয়েছিল—রেণুবালা (সুখ)। দুঃখ—ভবানীবালা। এই ভবানীবালার মুখখানাই এমন বিষাদমাখানো ছিল যে, অভিনয় না করলেও চলে,তার মুখখানাই দুঃখের এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিল যে, সে-ছাপ দর্শকের মনে মুছে যাবার নয়। মেয়েটি আগে আমাদের আর্ট থিয়েটারেই ছিল—তখন ছিল ছোট মেয়ে,—ব্যালের দলে নাচত। বৈরাগ্যের ভূমিকায় ছিল আরেক রেণুবালা, এ-ও খুব ছোট মেয়ে, ওরও নাম 'বৈরাগ্যরেণু' বলে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। আরেকজনের কথা লেখা হয়নি, সে হলো ঐ পুরনো মিনার্ভারই সন্তোষ দাস (ভুলো)। পুরনো বাড়ি পুড়ে যাবার পর ও চলে এসেছিল স্টারে। এবার ও আবার গিয়ে যোগ দিল ওখানে। কিছুদিন 'লোভ' সাজল, তারপর আবার চলে এসেছিল স্টারে। আত্মদর্শনের অভিনয়ের কথা এইটাই বড়ো করে বলার যে, প্রতিটি চরিত্র, কী হাবভাবে, কী চেহারায়, কী পোশাক-আশাকে, একেবারে অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে হুবহু এক হয়ে গিয়েছিল। এ বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়! একেবারে যথাযথ টাইপ। ক্রোধ একেবারে সর্বক্ষণ রেগেই আছে। অহঙ্কার—একেবারে মত্ত হয়ে আছে অহঙ্কারে। 'বুদ্ধি'রূপে কুঞ্জবাবুকে সত্যি এক 'প্রাজ্ঞ' ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হতো না। 'আত্মদর্শন'-এ গান ছিল যেমন অজস্র, তেমনি প্রতিটি গান গাওয়া হতো অতি সুন্দরভাবে। নাচও ভালো ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল ত্রুটিবিহীন। সেট্ ইত্যাদিতে পরেশ বসুর (পটলবাবু) কাজও চমৎকার। আমি যেদিন দেখি, সেদিন, ড্রপটা উঠে গেল,—কার্টেনটা পড়ে আছে—আর অমনি চারিদিক ভ'রে গেল জুঁইফুলের গন্ধে! তখন বুঝিনি এ-গন্ধ এসেছে কোথা থেকে। খুলে গেল কার্টেন—দেখি, সখিবৃন্দ স্টেজটাকে জুঁই ফুলে-ফুলে একেবারে ছেয়ে দিয়েছে। অর্ধশায়িত রয়েছেন মনরাজা, মেয়েরা তাঁকে লাস্যভরে পরিবেশন করে চলেছে মন্দিরা-সঙ্গীত-মূর্ছনার ছন্দে-ছন্দে।

আমাদের কর্ণার্জুনের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যেখানে শকুনি বেরুতো, সেখানে যে-দৃশ্যটি ব্যবহার করা হতো, শিফটাররা তাকে বলত—'কাদম্বরীর দৃশ্য।' 'কাদম্বরীর দৃশ্য' কেন নাম হয়েছিল, সেটা আগেই বলেছি। আমাদের 'কাদম্বরীর দৃশ্য' ছিল পুরোটা নয়, দুদিক দিয়ে থাম-আঁকা কাটআউট ঠেলে দেওয়া হতো। কিন্তু ওখানে দেখলাম পটলবাবু পুরোটা করেছেন। তাছাড়া আরও অনেকগুলি চমৎকার-চমৎকার দৃশ্য এঁকেছিলেন তিনি। আবার মায়া-দৃশ্যও ছিল। সেটি আলফ্রেডের 'সতীলীলায়' দেখেছিলাম, কিন্তু তখন ব্যাপারটা বুঝিনি। তিরিশ সালে যখন মিনার্ভায় অভিনয় করতে যাই, তখন নিজেকে ঐ সিনে বেরুতে হতো বলে ঐ মায়া-দৃশ্যের মায়া যে কী করে সৃষ্টি হয় তা অনুভব করেছিলাম। সেকথা বলব পরে। 'আত্মদর্শন'-এর গানের স্থান-নির্বাচনের মুনশীয়ানা ছিল অদ্ভুত! কোথাও গানগুলিকে মনে হয়নি যে, প্রক্ষিপ্ত। এর সুখ্যাতি প্রাপ্য হচ্ছে—যিনি এডিট্ করেছিলেন—তাঁর,—কালীপ্রসাদ ঘোষের। আর, তাছাড়া পরিবেশ-উপযোগী সন্নিবেশিত গানগুলি অভিনয়েও যে কতো প্রেরণা-সঞ্চার করে, সে-ও অনুভব করেছিলাম ঐ তিরিশ সালে—মিনার্ভায় আত্মদর্শনে 'মনরাজা'র অভিনয় করতে গিয়ে। একটা কথা এক্ষেত্রে সত্য। কর্ণার্জুনের পরে আবার যেন রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক যুগটা ফিরে এলো। শিশিরবাবু "সীতা" করলেন, "মডার্ণ থিয়েটার" করলেন "রৈবতক", তারপর মিনার্ভা করলেন "আত্মদর্শন"। অবশ্য সাজসজ্জায় বেশ-বাসে পরিবেশে পৌরাণিক-পৌরাণিক মনে হলেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "আত্মদর্শন" এক নুতনত্বের পতাকা বহনকারী নাটক। বইটা জমেও গেল চট্ করে, দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল এটি "মিনার্ভায়"।

এর পরে, ১৮ই আগস্ট শিশিরবাবু করলেন "পুণ্ডরীক" বলে একটি নাটক। ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসুর লেখা—ভিক্টর হুগোর "হঞ্চ্ব্যাক্ অফ নতরদাম" অবলম্বনে। শ্রীশবাবু নিজে ভালো অভিনেতা ছিলেন, পুণ্ডরীকে বিষয়বস্তুও নিয়েছিলেন ভালো, কিন্তু নাটকটি কেমন যেন জমাট হলো না। শিশির-বাবু, তারাসুন্দরী, নরেশ মিত্র, চারুশিলা এঁরা সব অভিনয় করেছিলেন। মুখ্য চরিত্র কুব্জ "কোয়াসিমোদো"র নাম হয়েছিল এ'নাটকে "কাশীমদ",—সে ভূমিকায় নেমেছিলেন গোপালদাস ভট্টাচার্য বলে জনৈক অভিনেতা। "রুস্তানা'' বলে বেদেনী নায়িকা সেজেছিলেন চারুশিলা। এঁদের দুজনের অভিনয় ভালো হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। দৃশ্যপটাদি অঙ্কন করেছিলেন রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবু)। বই তবু ভালো হলো না, চললো না "পুণ্ডরীক"।

২৮শে আগস্ট আমাদের স্টারে শুরু হলো "চন্দ্রশেখর"। "চিরকুমার সভা''র বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় ও বই শনি রবিবারে দিয়ে, শুক্রবারে "জনা" হতে লাগল। "চন্দ্রশেখর"-এর নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—রাধিকানন্দ। "প্রতাপ" করলে দুর্গাদাস, "বিশ্বাস"—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, "নবাব মীরকাশিম" —আমি। শৈবলিনী—সুশীলাসুন্দরী, দলনী—আশ্চর্যময়ী, সুন্দরী—নীহারবালা। আর লরেন্স ফস্টর ছিল—ইন্দু মুখোপাধ্যায়। এ বইয়ের অভিনয় ভালো হয়েছিল, "চন্দ্রশেখর"-এর-নামও হলো খুব। উপরি-উপরি কয়েক রাত্রি চলবার পর "চন্দ্রশেখর" দেওয়া হতে লাগল মাঝে মাঝে। সিনেমার নির্বাক

যুগে আমি "কিস্‌মেৎ" বলে একটি আমেরিকান ছবি দেখেছিলাম, বিখ্যাত অভিনেতা 'ওটিস্ স্কিনা'র-এতে 'হাজ'-এর ভূমিকা করেছিলেন। এই 'হাজ' যখন আমীর হয়েছিলেন, তখন তাঁর প্রাচ্যদেশীয় পোশাক, তাঁর চালচলন, তাঁর গতিভঙ্গী, তাঁর চলাফেরা—সে এক অভিনব জিনিস বলে প্রতিভাত হয়েছিল আমার কাছে। যেন সত্যিকার প্রাচ্যদেশীয় এক আমীর—এক অতি অভিজাত ব্যক্তি। আমি এই ঢং-টা নবাব-চরিত্রে নিয়েছিলাম, এমন কি তার মতো পোশাকও। বড়ো আলখাল্লা আর জোব্বা। ঘুরতে গেলে পোশাকের ঘাঘ্‌রার মতো অংশটুকু একেবারে ফুলে উঠত। উদাহরণ-স্বরূপ দুটি দৃশ্যের কথা বলি। ভুলক্রমে নবাবের অনুচররা 'দলনী' ভেবে শৈবলিনীকে ধ'রে এনেছে, নবাব বিস্মিত হয়ে বলছেন—এ কে? শৈবলিনী জানালে, সে প্রতাপের স্ত্রী, প্রতাপকে অন্যায় করে ইংরেজরা বন্দী করে রেখেছে, নবাব যদি কয়েকজন সৈন্য দেন, তাহলে প্রতাপকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব। নবাব সে অনুমতি ত দিলেনই, দিয়ে, কাছে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি নবাব মিরকাশিম, যদি কখনও বিপদে-আপদে পড়ো, আমাকে স্মরণ ক'রো।

শৈবলিনীর কাছে এগিয়ে গিয়ে কথাটা আমি বলতাম, এবং বলেই এমন দ্রুতভঙ্গীতে আমি ঘুরে চলে যেতাম যে, আমার পোশাকের ঘেরটি অমনি ঘুরে যেতো, এবং দৃশ্যটি বোধহয় ভালো লাগত দর্শকদের, অমনি চড়বড় করে পড়ে যেত হাততালি। আর একটা ছিল লরেন্স-ফস্টারের বিচার-সভা। বিচার চলছে, অমনি এক সময় শোনা গেল প্রবল কামান-গর্জন, বোঝা গেল, অতর্কিতে শিবির আক্রমণ করেছে ইংরেজ। সবাই পালিয়ে গেল, তকী খাঁও পালাচ্ছে, তাকে অম্‌নি সিংহাসন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ব্যাঘ্রের মতো গিয়ে ধরলেন নবাব—তুই কোথা যাস?

তকী খাঁ সাজত বিজয় মুখুজ্যে। ওকে মাটিতে বসিয়ে দিতাম। দিয়ে, সিংহাসনের সিঁড়ির একটা ধাপ থেকে একটা পা বাড়িয়ে দিতাম ওর কাঁধে, তারপরে তরবারি ওর বুকে দিতাম বিদ্ধ ক'রে। তকী খাঁ-কে বধ করবার এই কম্পোজিশনটি দেখাতো সুন্দর। বিখ্যাত ফরাসী মূকাভিনয়-পণ্ডিত দেল্‌সার্তের থিওরী, যাকে বলে—এক্‌সেন্‌ট্রো-একসেনট্রিক্—সেই পদ্ধতিরই এটি প্রয়োগ আর কী! আমাদের রসশাস্ত্রেও এটা আছে, যাকে বলা হয়, "ভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ" ভঙ্গিমা। 'ত্রিভঙ্গ' পর্যন্ত একজন করতে পারে, 'অতিভঙ্গ' ভঙ্গিমায় চাই অন্তত দুজনের সম্মিলিত ভঙ্গিমা। আমাদের দুর্গাপ্রতিমার দুর্গা, অসুর ও সিংহ নিয়ে যে কম্পোজিশন আছে, সেটি 'অতিভঙ্গ' বা 'এক্‌সেন্‌ট্রো-এক্‌সেনট্রিক্রের' সুন্দর নিদর্শন। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ভঙ্গিমার অলঙ্কার অভিনয়ে কতটা কার্যকরী। আমার মনে হয়, দর্শক প্রধানভাবে নাটকে ভাবগ্রাহী হলেও তার সহজাত একটা রূপতৃষ্ণা আছে—সেই তৃষ্ণার প্রতি লক্ষ্য রাখাও অভিনেতার কর্তব্য। 'লোকটা কেমন করলে?' না, ছবির মতো অভিনয় করলে! —দর্শকের এবম্বিধ মতামত আমাদের কানে আসে, কেমন ত? এখন এই 'ছবির মতো' বলতে তাঁরা কী বোঝাচ্ছেন? অলঙ্করণের কথাই এসে পড়ে না কী? তাই বলছিলাম, অভিনয়ে ভাবই প্রধান কিন্তু ভঙ্গিমাও অপ্রধান নয়। ভাবসৃষ্টি এবং রূপসৃষ্টি উভয়ই করতে হবে অভিনেতাকে।

এরপর, ১১ই সেপ্টেম্বর—শুক্রবার আমাদের স্টারে খোলা হলো, গিরীশচন্দ্রের 'গৃহলক্ষ্মী'। এটি একটি গার্হস্থ্য-পরিবেশের নাটক। সংসারে বড়ো ভাই মারা গেছেন, তাঁর বিধবা স্ত্রীই 'গৃহলক্ষ্মী', তাঁর সন্তানের সম-বয়সীই ছিল তাঁর ছোট দেওর—শৈলেন্দ্র। আদরে-আদরে মানুষ। মেজদাদা উপেন্দ্র ছিলেন তার অভিভাবক। কিন্তু, হীরু ঘোষাল নামে এক ব্যক্তির প্ররোচনায় শৈলেন্দ্র গেল বিগ্‌ড়ে। তার স্ত্রীকে নিয়ে সে আলাদা হয়ে গেল পর্যন্ত। তারপর সম্পত্তি নিয়ে ভাগাভাগি মামলা, শৈলেন্দ্রর দুরবস্থা এবং শৈলেন্দ্রকে কেন্দ্র করেই বহু করুণ দৃশ্যের অবতারণা আছে। পেয়াদা এসে শৈলেন্দ্রকে ভাড়াটে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, শৈলেন্দ্র তার স্ত্রীকে নিয়ে পথে দাঁড়াচ্ছে, এইরকম সব করুণ দৃশ্য। শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্র সব জানতে পারলেন, ছোটভাইয়ের অমন দুরবস্থা দেখে, স্নেহপ্রবণ মানুষটি শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেলেন। 'উপেন্দ্র' করেছিলেন—দানীবাবু, শৈলেন্দ্র—আমি, হীরু ঘোষাল—অপরেশবাবু, নীরোদ—রাধিকানন্দ, মন্মথ—দুর্গাদাস, বিরজা—সুশীলাসুন্দরী, কুমুদিনী—আশ্চর্যময়ী, তরঙ্গিনী—রাণীসুন্দরী, ফুলি—নীহারবালা। এ যে ধরনের বই, এতে ভাবসৃষ্টিই প্রধানতম বিষয়। এখানে অলঙ্করণের তেমন প্রয়োজন নেই, এখানে ভঙ্গিমা-নিরপেক্ষ হয়ে ভাব-স্ফুটন করলেই চলবে। শৈলেন্দ্র আমি কেমন করেছিলাম জানি না, কিন্তু, চরিত্রের মূলগত ভাবটাকে ফোটানোই ছিল আমার লক্ষ্য, ভঙ্গিমার অলঙ্কার পরিহারই করেছিলাম বলা চলে। নাটক ও চরিত্র অনুযায়ী এই যে ভাব ও ভঙ্গিমার লীলা, এই যে গ্রহণ ও বর্জন, এর ভারসাম্য বজায় রেখে অভিনয় করার যে রীতি, আমি আজও তার ছাত্র, অবসর গ্রহণ করেও মনে-মনে সেই শিক্ষারই অনুশীলন করে চলেছি।

'গৃহলক্ষ্মী'র পরই পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেল। পুজোয় ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের অভিনয় শুরু হয়ে গেল দু'জায়গায়—স্টারমঞ্চে এবং ভবানীপুরের রসা থিয়েটারে। সে এক দৃশ্যই বটে। প্রথম রাত্রে একটা বই করে 'রসা' থেকে ছোট্-ছোট্—গাড়ি করে 'স্টার।' আবার 'স্টার' থেকে 'রসা'। আমরা সব মাকুর মতো 'রসা-স্টার' 'স্টার-রসা' করে বেড়ালাম দিনকতক। তারও পরে, পুজোর পর স্থির হয়ে গেল, আমরা দার্জিলিং যাবো অভিনয় করতে। দার্জিলিং-এ যেখানে তখন 'স্কেটিং রিঙ' ছিল, এখানো বোধ হয় আছে, সেটি ভাড়া নিয়ে ম্যাডানরা তখন ছবি দেখাতো, নাম দিয়েছিল—'এল্‌ফিনস্টোন পিক্‌চার প্যালেস।' ঠিক হলো, আমাদের অভিনয় হবে ওখানে। রবিবার 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা একটা দল প্রবোধবাবুর নেতৃত্বে দার্জিলিং। ৭ই অক্টোবর, বুধবার 'কর্ণার্জুন' দিয়ে নাট্যাভিনয় শুরু হলো দার্জিলিং-এ। বাকী দল সপ্তাহে পাঁচদিনের অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন কলকাতায়। দার্জিলিং গিয়েছিলাম—আমি, হরিমোহনবাবু, হেমেন্দ্র রায়চৌধুরী, ননীগোপাল মল্লিক ইত্যাদি, এবং নতুনদের মধ্যে সন্তোষ সিংহ ও সুশীল ঘোষ। মেয়েদের মধ্যে নিভাননী, নিহারবালা ত আছেই, আর আছে নীরদাসুন্দরী (স্টারে যোগদান করেছেন সম্প্রতি), আর তারকাবালা (লাইট্)। আমাদের সেই ছোট্ট মেয়ে—বৃষকেতু।

বৃষকেতু এখন বড়ো হয়েছে, অপেক্ষাকৃত বড়ো বড়ো পার্ট করে, দরকার হলে নাচেও। তার বদলে এখন 'বৃষকেতু' করে আরেকটি ছোট মেয়ে,—চারুবালা। আমাদের সঙ্গে, অনেক করে —'দার্জিলিং-এর মতো সুন্দর জায়গা দেখবেন না?' ইত্যাদি বলে-কয়ে দানীবাবুকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উনি দার্জিলিংয়ে নেমেছিলেন 'সাজাহান' ও 'রাণা প্রতাপ'-এ। যাবার পথে শিলিগুড়িতে জনারণ্য—ওঁরা ধরে বসলেন একদিন অভিনয় করে যেতে হবেই। একেবারে নাছোড়বান্দা। অগত্যা, আমরা বললাম —'এখন ত হবে না, ফেরার পথে একদিন করা যাবে।'

দার্জিলিং-এ বুধবার 'কর্ণার্জুন,' বৃহস্পতিবার 'সাজাহান' করে আমি শুক্রবার রওনা হয়ে গেলাম কলকাতায়, সঙ্গে নীহার আর নিভাকে নিয়ে, কারণ, শনি-রবিবারে 'চিরকুমার সভা'র প্লে রয়েছে। শুনেছিলাম, শুক্রবারটা দার্জিলিংএ ওঁদের "অফ্" গেল, শনিবারে করেছিলেন 'শিরী-ফরহাদ' ও 'আলিবাবা', এবং রবিবারে 'রাণা প্রতাপ।', 'রাণা প্রতাপ' করে দানীবাবু চলে এলেন কলকাতায়, আমরা তিনজন আবার রওনা হয়ে গেলাম শিলিগুড়ি। অক্টোবরের সেই প্রচণ্ড শীতে অভিনয় করার কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। অভিনয় শুরু হ'তো আবার রাত্রি ন'টায়, তার আগে দিলে নাকি লোক হবে না! শুধু রবিবারে ম্যাটিনী শো হতো পাঁচটায়। এমন ঠাণ্ডা যে, পা বার করা যাচ্ছে না, ঠক্‌ঠক্ করে পা কাঁপে। অগত্যা কী করা যায়, অতো নিয়ম-টিয়ম মানলে চলবে না—সবাই মোজা পরতো। গাত্রবর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে মোজা কেনা হলো। সেই মোজা পরে কর্ণ, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সবাই নামল। সেই মোজা পরে, দ্রৌপদী পদ্মাবতীও নেমে পড়ল। রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত প্লে হতো, তারপরে, রিক্‌শা-টিক্‌শা পাওয়া যেতো না। দর্শকও হেঁটে বাড়ি ফিরছে, আমরাও হেঁটে বাড়ি ফিরছি। তারপরে, ফিরে এসে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে তিনটে-সাড়ে তিনটে। বাকী রাতটুকু আর ঘুমোতাম না। আমাদের দালানের লাগোয়া ছিল বড়ো ফ্রেঞ্চ-উইনডো—কাঁচের পাল্লা-দেওয়া জানালা। তার সামনে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সূর্যোদয় ত দেখা যেতো না, সূর্যোদয়ের আগে ও পরে আকাশের মেঘে-মেঘে কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমাবৃত শিখরে শিখরে যে অপরূপ বর্ণালী ফুটে উঠত, মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই দিকে আমরা তাকিয়ে থাকতাম। তারপরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ার পালা।

যাই হোক, আমরা সোমবার গিয়ে পৌঁছলাম শিলিগুড়ি, দার্জিলিং থেকে দলও এসে পৌঁছল সন্ধ্যের মুখে। ফাঁকা জায়গায় মঞ্চ তৈরী ক'রে—মাথার ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে অভিনয়ের ভালোই আয়োজন করেছেন স্টেশন-ষ্টাফ্। কথা ছিল 'সাজাহান' হবে শিলিগুড়িতে, তাই আমার সঙ্গে আমার 'ফটো প্লে সিণ্ডিকেট'-এর সেই বন্ধু—জ্যোতিষ মিত্রকে নিয়ে গিয়েছিলাম 'আওরঙ্গজেব' করবার জন্য ; 'আওরঙ্গজেব' ওঁর করা ছিল। অভিনয় আরম্ভ হবে, চেয়ে দেখি, লোকে-লোকে ছেয়ে গেছে, যাকে বলা যায়, 'অভূতপূর্ব জনসমাগম।' তখন সিনেমা ত এতো হয়নি, লোকে থিয়েটারও দেখতে পেতো না। তাই, শিলিগুড়ি কেন, সংবাদ পেয়ে ডুয়ার্স থেকে পর্যন্ত লোক এসেছে। মাটিতে তেরপল পাতা, তার

ওপরে শতরঞ্জি বিছিয়ে আমরা যখন সাজঘরে বসে রূপসজ্জা করছি, এমন সময় গুড়্‌গুড়্‌ করে মেঘ ডেকে উঠল আকাশে। মেঘ-মেঘ আগেই করছিল। এবার ডাক দিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে অল্প-অল্প, তারপরে জোরে-জোরে। অভিনয় চল্‌ছে, বৃষ্টিও পড়ছে—বৃষ্টির আওয়াজও কী কম? দর্শক কী দেখছে কী শুনছে জানি না—নির্বাক বসে রয়েছে ছাতা খুলে। নীচের জমিতে আমরা যে-সব শতরঞ্জি পেতেছিলাম, সেগুলি তুলে এনে মঞ্চের পাশে বিছিয়ে তার ওপর বাক্স-প্যাট্‌রা সব রেখেছি, কারণ, মঞ্চের নীচ দিয়ে তখন রীতিমত জলস্রোত বয়ে চলেছে! মঞ্চের ওপরে যে ত্রিপলগুলি পরস্পর মুখোমুখি বাঁধা ছিল সেই জয়েনিং-এর মুখে জল জমে ফুলো-ফুলো দেখাচ্ছে, এক সময় সেখানটা ফাঁক হয়ে তোড়ে জল নেমে এলো মঞ্চের ওপর। সাজাহান আর জাহানারা তখন প্লে করছি মঞ্চে, জলধারার একদিকে পড়ে গেছি আমি, অন্যদিকে জাহানারা। দৃশ্যটি—"দে বেটারা খুব দে"-ভাষণের দৃশ্যটি কিনা আজ মনে নেই, কিন্তু দর্শকের ওঠবার নাম নেই, সমানে অভিনয় দেখে চলেছে। একটি ছাতায় হয়ত তিনটি মাথা কারুর হয়ত ছাতাও জোটেনি, সমানে দাঁড়িয়ে ভিজছে, তবু নির্বিকার! অভিনয় দেখবার সে আগ্রহ দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই! একেবারে, শেষদৃশ্য পর্যন্ত, ঐভাবে অভিনয় দেখে গেল তারা। তখন শেষ রাত। আমরা ফিরে এলাম শিলিগুড়ি স্টেশনে—আমাদের আস্তানায়। স্টেশনের দোতলা তখন প্রায় তৈরী হয়ে গেছে, দরজা জানালাও বসে গেছে, শুধু মেঝের সিমেণ্ট আর দেওয়ালের পলস্তারা হওয়া বাকী।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যেতে তিনধরিয়া বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে লোকো শেড্‌ আছে, রেল-কলোনী আছে। ছোট রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট আছে, ছোট্ট একটি স্টেজও আছে তার। তাঁরা ধরে বসেছিলেন, সেখানেও একরাত্রি অভিনয় করে যেতে হবে। এ-ও নাছোড়বান্দা ব্যাপার। কথা ছিল, শিলিগুড়ি থেকে তিনধরিয়া—যাতায়াতের ব্যবস্থা করা এবং সর্ববিধ ভারই তাঁদের। রাত্রে থাকবার জন্যে দুখানা বাড়িও দেবেন তাঁরা। তাঁরা রাজী। পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার আমরা গেলাম তিনধরিয়া। এখানে হলো—'ইরানের রানী।' 'দারা' আমি ত আছিই। ইউসুফ করলে—সন্তোষ সিংহ, নর্তকী—লাইট। গুলরুখ—নীহার, রানী—নিভাননী। স্টেজের এমনি হাইট যে, আমি তরোয়াল ওঠানয় সিনের 'ঝালর' কেটে যাচ্ছে। 'মার্ডার সিন-'এ সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করার কিছুটা যে মূকাভিনয় ছিল, সে করতে গিয়ে দেখি, সিঁড়ি কোথায়, একটি বেদীর মতন, বেদীতে ওঠামাত্রই রানী বেরিয়ে পড়ল! এ-সব খামতি হওয়া সত্ত্বেও কী সুখ্যাতি!

মঙ্গলবার প্লের শেষে তিনধরিয়ার বাড়িতে গিয়ে সবে শুয়েছি—অমনি,ভোর হতে না-হতেই ইঞ্জিনের হুইসিলের শব্দ। একেবারে বাসার সামনে গাড়ি এনে দাঁড় করিয়েছে। কী ব্যাপার? না, কার্শিয়াং যেতে হবে, গাড়ি প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, তিনধরিয়া পৌঁছানো মাত্রই কার্শিয়াং-এর লোকেরা এসে হাজির। সেখানেও একরাত্রি করতে হবে। যাতায়াতের ব্যবস্থা এখানেও তাঁদের। সেই মতো, গাড়ি এসে হাজির। আমাদের বিছানা বাঁধারও সময় নেই, যে-যার বিছানা গুটিয়ে ট্রেনে গিয়ে যে-

যেখানে পারল, শুয়ে পড়ল। যা'রা পারল না, তারা বসে বসে ঝিমুতে লাগল। এমনি করে ঝিমুতে-ঝিমুতেই আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম কার্শিয়াং। এখানে গীতি-নাট্য গোছের ছোট-ছোট সব বই হলো। বুধবার কার্শিয়াং-এর পালা শেষ করে, বৃহস্পতিবার আমরা শিলিগুড়ি ছুঁয়ে রওনা হলাম কলকাতা। ক'দিন ভালো করে ঘুম হয়নি, ট্রেনে খুব ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ একসময় ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি, প্ল্যাটফর্মটা নির্জন, গাড়ি একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি নড়ছেও না, চড়ছেও না। তখনো রাত শেষ হয়নি। নামলুম স্টেশনে। কী স্টেশন? দেখি পোড়াদহ জংশন। সেকী! এতক্ষণে ত পোড়াদা পেরিয়ে যাবার কথা! এখানে এমন করে অযথা আটকে আছি কেন? ভোর হয়ে যেতে ব্যাপারটা জানলাম। এর আগে 'হালসী' না কি একটা স্টেশন আছে, সেখানে আপ্ আর ডাউন ঢাকা মেলে ঠোকাঠুকি হয়েছে! আরেকটু বাদে, যখন আমরা চা খাচ্ছি, দেখি, কিছু যাত্রী—সাহেব—কেউ স্যুটকেশ, কেউ বেডিং নিয়ে লাইন ধরে-ধরে এসে স্টেশনে উঠল। তাদের কারুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কারুর জামায় রক্তের দাগ। এরা এ-গাড়িতেই যাবে। অবিশ্যি,আমাদের কামরা ছিল রিজার্ভড,আমাদের কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। এ হলো সেই বিখ্যাত ঢাকা মেলের অ্যাকসিডেণ্টের ঘটনা। গাড়ি ছাড়তে যখন দেরি আছে, তখন আমাদের হালুইকরদের নিয়ে প্ল্যাটফর্মেই আমরা চালে-ডালে খিচুড়ি চড়িয়ে দিয়েছি। খাওয়া-দাওয়া ত করতে হবে। 'তাড়াতাড়ি কর—তাড়াতাড়ি কর—ট্রেন ছেড়ে দেবে।' এই-রকম হুড়োহুড়ি করে রান্না-খাওয়ার পালা শেষ করেছি, তারপরে সত্যিই নড়ে উঠল অজগর,—অর্থাৎ আমাদের ট্রেনটা। যে-জায়গায় অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, সেখানটায় যখন এলাম, তখন গাড়ি যাচ্ছে খুব আস্তে আস্তে—একেবারে আন্কোরা একটা নতুন পাতা লাইন দিয়ে। পাশে, মাটি একেবারে চেঁছে ফেলেছে। ভাঙা দেশলাইয়ের খোলের মতো পড়ে আছে সব কাঠের টুকরো। এছাড়া আর কিছু নেই, সব সাফ করে ফেলেছে। সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ আমরা সম্ভবত পৌঁছেছিলাম কলকাতা। শনিবারে, রবিবারে—যথারীতি—"চিরকুমার সভা"।

এর পরে, আবার ভ্রমণের ব্যাপার। প্লে ঠিক হলো বেনারসে। গেলাম রওনা হয়ে। কাশীতে তখন বাস করছেন মনোমোহন পাঁড়ে মশাই। ম্যাডানের যেখানে বাড়ি ছিল কাশীতে, আমাদের অভিনয় হচ্ছে সেখানে, পাঁড়ে মশাই-ই সব ব্যবস্থাপনা করছেন। এখানেও ভিড় হয়েছিল অত্যধিক। "ইরানের রানী", "কর্ণার্জুন"—এসব করে আমি চলে এলাম। দৃশ্যপটগুলি ভাঁজ করে বাক্সে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল, তাই জায়গায়-জায়গায় রঙ ঝ'রে গিয়েছিল বলে ভিতরের আলো ফুটে বেরুতো। এ-দেখে নাট্যামোদী দর্শকরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কয়েকজন এসে বললেন—আমাদের কাছ থেকে দৃশ্যপট নিলেন না কেন? কাশীতে আমাদের অনেক ক্লাব আছে, দৃশ্যপটের অভাব?

কাশী থেকে দল গেল এলাহাবাদে। স্থানীয় লোকেদের সাহায্যে ফাঁকা জায়গায় মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। প্লে চলতে লাগল এলাহাবাদে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই খবর এলো, এলাহাবাদে বাড়তি অভিনয় হবে। "চিরকুমার সভা"-ই হবে। অতএব, 'চিরকুমার সভা' দল আমরা—'আমি

তিনকড়িদা, অপরেশচন্দ্র, নীহার, নিভা'—আবার ট্রেনে চড়লাম এলাহাবাদ-যাত্রী হয়ে। যেদিন পৌঁছাবো, সেদিন অভিনয় নয়, অভিনয় পরদিন। গাড়িতে আসতে-আসতে, বাইরের ফুটফুটে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে অপরেশবাবুর কী খেয়াল হলো, বললেন—এমন জ্যোৎস্না রাত্রিতে তাজমহল দেখতে গেলে কেমন হয়? যে-কথা সেই কাজ। অপরেশবাবু ও তাঁর বন্ধু ভুবনবাবু আর গণদেব ছাড়া তিনকড়িদারা সবাই নেমে গেলেন এলাহাবাদে, আমি নামলাম না, বললাম—আমি যাবো।

—বেশ ত, চলুন না!

টিকিট ছিল এলাহাবাদ পর্যন্ত, নতুন টিকিট সব কাটিয়ে আনলেন অপরেশবাবু নিজের টাকায়। আমরা চলতে লাগলাম আগ্রার দিকে। টুণ্ডলা ছাড়িয়েছি, এমন সময় অপরেশবাবু বললেন—পকেটে কী আছে দিন দেখি?

ভাবলাম, বোধহয় ট্রেন-ভাড়াটা চাইছেন। উনি বললেন—যা আছে দিন না?

দিলাম, যা ছিল পকেটে। উনি সেটা নিয়ে একটু হেসে বললেন—রাখলাম এগুলো নিজের কাছে। পকেটে আবার পয়সা কামড়ায় ত? আগ্রায় নেমে টুকিটাকি সব কিনতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু, সে-সব ত আর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না, থিয়েটারের মেয়েগুলিই সব কেড়ে নেবে।

আমি আর কিছু বললাম না। স্টেশনে নেমে টাঙা-ভাড়া করে চলে গেলাম তাজমহল। মীনারের ওপরে তখন উঠতে দিতো, আমরা একটি মীনারের উপরে গিয়ে উঠেছি, অপরেশবাবু বললেন—ওরে বাবা, নীচের দিকে চাইতে পারছি না, মাথা ঘুরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবো। চলুন—চলুন—নীচে চলুন।

নেমে এলাম। পরে শুনেছিলাম, কে বুঝি মীনার থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, সেই থেকে মীনারে ওঠা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে—তাজ। চাঁদের আলোয় যে সত্যিই এমন দেখায়, তা ভাবতে পারিনি! এ-এক অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যেতে হয়, বুকের ভিতরটা রুদ্ধ এক আবেগে গুমরে গুমরে উঠতে থাকে। গাইডরা লণ্ঠন হাতে করে সব দেখাচ্ছে। ভিতরেও সব লণ্ঠন ঝুলছে। মোগলাই ঢং-এ তৈরী, জাফরী-কাটা ব্রোঞ্জের তৈরী। শুনলাম, এগুলি নাকি তাজমহলকে উপহার দিয়ে গেছেন লর্ড কার্জন। আরও শুনলাম, কবরের ওপরে যে মূল্যবান আচ্ছাদনটি বিস্তৃত করা আছে, সেটি নাকি উপহার দিয়েছেন বর্ধমানের মহারাজা। আবছা-আবছা আলোয় ভিতরের সব ঘুরে-ঘুরে দেখছি, 'লোবান'—বা গন্ধ-ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে গেছে, সে-এক আশ্চর্য অনুভূতি! 'সাজাহান'-এর ভূমিকা করতে করতে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাজের প্রতি যে এত গভীর মমতা জন্মে গিয়েছিল, সেকি আমি এর আগে কখনো বুঝতে পেরেছিলাম?

তাজমহল দেখে ফিরে ত এলাম স্টেশনে। রিফ্রেশমেণ্ট্ রুমে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রের একটা লোক্যাল ট্রেন ধরে এলাম টুণ্ডলা। জিনিসপত্র আর কেনা হলো না, বাজারের দিকেই যাওয়া হলো না, কেনাকাটা আর হবে কোথা থেকে? ওদিকে প্রচণ্ড শীত। অপরেশবাবু তাঁর ওভারকোটটি

জড়িয়ে ওয়েটিং-রুমের ইজি-চেয়ারে দিব্যি আধ-শোওয়া হয়ে রইলেন, আমরা কিন্তু ঘুরঘুর করছি, শীত যেন আর বাগাতে পারছি না ! ভোরবেলা স্টেশনে এসে একটা গাড়ি দাঁড়াল, সেটা ধ'রে একেবারে এলাহাবাদ। সেদিন সন্ধ্যেতেই ছিল প্লে। প্লে ক'রে পরদিনই আমি চলে এলাম কলকাতায়, কারণ, পূর্বব্যবস্থামতো কলকাতায় মধ্যসপ্তাহের একটি দিন একটা বইতে আমার নামার কথা ছিল। এর পরে, উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮ই নভেম্বর তারিখে গিরীশচন্দ্রের "নসীরাম" খোলা হলো। আমার এতে অবশ্য কোনো পার্ট ছিল না। নসীরাম করলেন দানীবাবু, অনাথনাথ—রাধিকানন্দ, সোনা—ইন্দুবালা। গায়িকা হিসাবে ইন্দুবালার প্রচুর খ্যাতি, তাঁকে এ বইতে আনা হলো গানেরই জন্য। এ-বই তেমন সুবিধার হয়নি। এর পরে, এসে গেল বড়দিনের প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের বিশেষত্ব হলো দুটি নতুন নাটক। একটি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "ঋষির মেয়ে", অপরটি রবীন্দ্রনাথের "গৃহপ্রবেশ"। দুটি নাটকই পড়ল রিহার্স্যালে। এবার রাধাচরণ নেই—সে স্টার ছেড়ে দিয়েছে। সন্তোষ দাস (ভুলো) ছিল ভালো হারমোনিয়াম-বাজিয়ে এবং সঙ্গীতজ্ঞ, সে এলো মিনার্ভা থেকে স্টারে। এক থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটার যদি ডাকাডাকি করে, তাহলে বুঝ্‌তে হবে, তার চাহিদা আছে। যাকে অন্য কেউ ডাকে না, তাকে পড়ে থাকতে হয়, অন্যের থিয়েটারেই, পুরানো মাইনেয়। যাকে অন্যেরা টানল, তারা কিছু বেশি টাকা দিয়েই টানল, এটা বুঝতে হবে। তাকে যদি ফের ফিরিয়ে আনতে হয়, ত, তার থেকেও কিছু বেশি টাকা দিতে হবে। এইভাবে অনেকের মাইনে যেতো বেড়ে। আর, যারা পড়ে আছে, তাদের বেতন যদি বাড়ে ত বুঝতে হবে, মালিকদের মর্জির ওপরে বেড়েছে।

যাই হোক, কবির কাছে গান তোলার ব্যাপারে ভুলোকে নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে আমি। ভুলো ওস্তাদ লোক, কিন্তু, একবার শুনেই যে তুলে নেবে, রাধাচরণের মতো এমন শক্তি তার ছিল না। কবি গাইতেন, ও পারত না, দুম করে বলে বসত—আরেকবার সার !

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতাম। কবি কিন্তু বিরক্ত হতেন না, আবার গানটা গেয়ে শোনাতেন। এ-রকমভাবে একবার-দু'বার কেন, তিনবার-চারবার পর্যন্ত গেয়ে গেছেন কবি। বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

গাড়ি করে যখন ফিরে আসছি ওকে নিয়ে, তখন ওকে বলতাম,—বারবার ওঁকে অমন ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বিরক্ত করো কেন ? ভুলো বলত—বা-রে, তাই বলে ভুল নোটেশন নেবো নাকি ?

কবি কোনদিন বিরক্ত হননি। শুধু গান কেন, আমার পার্টের রিডিং পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছি। বলতাম—ভূমিকা-বণ্টন ত হয়ে গেছে। আমাকে দিয়েছে মুখ্যভূমিকা—যতীন।

আমার দিকে দুটি চোখ মেলে চাইলেন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, মুখে ফুটে উঠত প্রসন্ন হাসি, বলতেন—বেশ ত !

দিনুবাবু গান শেখাতে আসতেন। স্টেজে শতরঞ্চি বিছিয়ে আমরা নাটকের রিডিং দিতুম। এর মধ্যে একটা ব্যাপার হলো। আর্ট থিয়েটারে অবশ্য বরাবরই অবাঙ্গালীরা আসতেন (ভারতীয়

অবাঙ্গালীদের কথা বলছি) এবং ওঁদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাওয়ায় আমরা 'হিন্দী' 'গুজরাটি' কাগজেও বিজ্ঞাপন দিতাম। চিরকুমার সভা'য় দেখা গেল, বহু বিদেশী—অ্যামেরিকান ও ইয়োরোপীয় দর্শক পর্যন্ত দেখতে আসছেন। এইরকম ভাবে, একবার আলাপ হয়ে গিয়েছিল তদানীন্তন অ্যামেরিকান কন্‌সালের সঙ্গে। "চিরকুমার সভা" দেখতে এসেছিলেন। দেখে খুশি হয়ে, ভিতরে এসেছিলেন আলাপ করতে। কথায়-কথায় তাঁকে বললাম—আচ্ছা, অ্যামেরিকায় শেখবার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন আপনি?

বললেন—তা পারি। তবে, ঐ মর্মে আপনি আমাকে একটা চিঠি দিন আগে। চিঠি না হলে ত কোনো কাজ হয় না।

এস্‌প্ল্যানেড ম্যানসনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তখন অ্যামেরিকান কন্‌সালের অফিস। গিয়ে দেখা করলাম। চিঠিও দিলাম। বললেন—পাঠিয়ে দিচ্ছি চিঠি। উত্তর এলেই জানিয়ে দেবো।

তারপরে টাকার অঙ্কটা উল্লেখ করে বললেন—এত খরচা পড়বে। আর সব ব্যবস্থা করে দেবো।

ফিরে এসে প্রবোধবাবুকে সব বললাম। শুনে গেলেন সব, কিন্তু "না" বললেন না। পরের দিন ডিরেক্টরদের সঙ্গে ওঁর কী কথা হলো জানি না, বললেন—ছ'বছরের ছুটিতে যাবে। তোমার খরচা এঁরা পাঠাবেন। যাতায়াতের খরচাও এঁরা দেবেন। ডিরেক্টররা রাজি হয়েছেন, তবে পাঁচ বছরের চুক্তি করতে হবে।

কথাটা খুবই উৎসাহজনক, কিন্তু, তবু একটু চিন্তিত হলাম। ভাবছি, এ'তো হলো, এখন বাড়িতে কী বলা যাবে! তাছাড়া, আজকাল বাড়িতে কিছু সাহায্য করতে হয়। বাবার শরীর ভেঙেছে, আর আজকাল বেরুতেও পারেন না।

তবু যাবার সব ঠিকঠাক হচ্ছে, ইতিমধ্যে হলো কী, একদিন স্টেজে বসে সব মহলা দিচ্ছি, প্রবোধবাবুও আছেন। অবিশ্যি, মহলা শেষ হয়ে গেছে, আমরা সব উঠব-উঠব করছি, অনেকে উঠে চলেও গেছে। প্রবোধবাবুর সঙ্গে বসে বসে আমার আমেরিকা-যাবার কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় নীহার হঠাৎ বলে উঠল—আচ্ছা, তুমি যে এই বিলেত যাবে দু' বছর সেখানে থেকে, ফিরে এসে কী হবে তুমি?

অর্থাৎ ফিরে আসবার পর—আমার পদবৃদ্ধিটা হবে কী? অত্যন্ত সরল প্রশ্ন, কিন্তু শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। ঠিক এ-ব্যাপারটা ত ভাবিনি।

নীহারের প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রবোধবাবু। বললেন—ফিরে এসে ম্যানেজার হবে।

তখন, 'ম্যানেজার'ই ছিল উচ্চপদ—থিয়েটারে। নীহার কথাটা শুনে বললে—ম্যানেজার ত এখান থেকেই হওয়া যায়, তার জন্য বিলেত যাওয়ার কী দরকার?

কথাটা অবশ্য এখানেই চাপা দিলেন প্রবোধবাবু, কিন্তু আমার মনে ওটা কাঁটার মতো বিঁধে রইল। তাই ত, বিদেশ থেকে কী শিখে আসব? যা নিয়ে আমাদের কারবার—তা বাঙলা ভাষা।

ইংরেজী উচ্চারণ, চলাফেরা ওসব কী কাজে লাগবে? ইংরেজী ভাবে যা নকল করে শিখেছি, তাকেই এখন বরং সংযত করার প্রয়োজন। অধিক বিলিতি চাল-চলন শিখে কী করব? তবে, একটা জিনিস শিখে আসা যায়, সে হচ্ছে—দৃশ্যপট, আলোকসম্পাত ইত্যাদি। কিন্তু, অভিনয়? মাটির সঙ্গে অভিনয়-শিল্পের একটা সংযোগ আছে, সেই সংযোগের কথা স্মরণে রেখেই বলতে পারি, বাঙালী ছাড়া বাঙালী-চরিত্রের সুষ্ঠু অভিনয় করবে কে? যতই ওদের যা শিখি না কেন, ঠিক ওদের মতো কেন হবে? খুব যত্ন নিয়ে শিখলেও দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয় হয়ে দাঁড়াবে সেটা। দৃশ্যপটাদির ব্যাপার শিখে এলেও মনঃক্ষোভ যাবে না, কারণ, ওদের সব যন্ত্রপাতি, এখানে পাবো কোথায়? কে আমাকে আনিয়ে দিচ্ছে একরাশ টাকা খরচা করে? এইসব চিন্তা মনকে এমন নাড়া দিয়ে যেতে লাগল যে মনঃস্থির করা গেল না। তারপরে তিন-চার দিন ধ'রে ভেবে-ভেবে অবশেষে এসে পৌঁছলাম সিদ্ধান্তে। প্রবোধবাবুকে বলে দিলাম—না যাবো না। বাড়িতে, বাবার শরীরের ঐ অবস্থা, সংসারে আমাকে আজকাল কিছু সাহায্যও করতে হয়। তাছাড়া, স্ত্রী-পুত্র রেখে হঠাৎ বিদেশে যাই-ই বা কী করে?

কথাটা সত্যিই। আমার ভিতরে চিরকালই এক পরিব্রাজক মন বাস করে, সে খ্যাপার মতো উধাও হয়ে যেতে চাইলেও, তাকে এবার থেকে চাপা দিয়েই রাখতে হবে। আমার নোঙর গেঁথে গেছে সংসারের তটরেখায়, আজ আমি ত স্বাধীন নই!

অতএব থেকে গেলাম। চলতে লাগল 'গৃহপ্রবেশ'-এর মহলা। গগনবাবু করলেন দৃশ্য-পরিকল্পনা। পাশাপাশি দু'খানি ঘর মঞ্চের ওপরে। একখানি যতীনের ঘর, অন্যখানি পাশের ঘর। যতদূর মনে হয়, বাঙলা রঙ্গমঞ্চে একসঙ্গে দুখানি ঘর এইভাবে দেখানো এই প্রথম। প্রথম অভিনয় হলো 'গৃহপ্রবেশ—' ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৫, শনিবার সাড়ে ৭টা। যতীন ত' করছি আমি। ডাক্তার—তিনকড়ি-দা। অখিল—কুমার কনকনারায়ণ। মাসী-সুশীলাসুন্দরী। হিমি—নীহার। মণি—করল একটি নতুন মেয়ে, নাম সেরাবালা। পরের শনিবার দ্বিতীয় অভিনয়ও হয়ে গেল, তৃতীয় অভিনয়-রজনী আসন্ন হয়ে উঠল তারও পরবর্তী শনিবারে—১৯শে ডিসেম্বর। ঐদিন সকালে কাগজে বড়ো করে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—কবি আসছেন 'গৃহপ্রবেশ' দেখতে।

কবি এসেছিলেন সপরিবারে। একেবারে সামনের সারিতে বসলেন। কিছুক্ষণ দেখবার পর একটা বিরতিতে বললেন—আমি এবারে একটু পিছন থেকে দেখতে চাই।

ওপরে, যেখানে 'রয়্যাল বক্স'—সুসংস্কৃত করে "মহিলাদের ড্রেস-সার্কেল" করে রাখা হয়েছিল সেখানে ওঁর বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো।

অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেক্‌আপ্‌ না তুলেই ছুটলাম ওঁর কাছে। বললাম কেমন দেখলেন বলুন?

তেমনি স্মিতহাস্যে ভরে গেল মুখ, বললেন—দেখলাম ভালই, কিন্তু তোমরা কী করে অভিনয়

করো জানি না, আমি হলে পালিয়ে যেতাম। নীচে বসলাম, পায়ের খস্‌খস্‌ আওয়াজ। ওপরে এলাম—এখানে ট্রামের ঘড়ঘড় শব্দ।

কবির এমনই ছিল মনঃসংযোগ। পায়ের আওয়াজেও তাঁর অসুবিধা হয়, ট্রামের শব্দে ত কথাই নেই। আমরা সাধারণ মঞ্চের অভিনেতা, আমাদের ও-সবের থেকেও বড়ো ব্যাঘাত গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু ওঁর সংবেদনশীল মন, আমাদের অসুবিধার কথা, যা কেউ বুঝবে না, বোঝাতে চাইলেও হেসে উড়িয়ে দেবে, ঠিক সেই জায়গাটিতেই রিন-রিন করে বেজে উঠল। ওঁর মনঃসংযোগ এবং একাগ্রতার ত তুলনা হয় না, তার ওপরে আমাদের ওপরেও ওঁর কত সহানুভূতি ও সমবেদনা। এ শুধু ঐ একটি কথাতেই বুঝিনি আরও বহু কথায়, বহু ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। ঐ সময় বললেন—কী? আলোচনা? কাল হবে। কাল এসো। বাড়ি গিয়ে মনে হলো—কতক্ষণে এই 'কাল' আসবে? রাত যেন পোহাতে চায় না। গেলাম পরদিন। আলোচনা করলেন। বললেন—একটু পরিবর্তন করা দরকার। লিখে রেখে দেবো। এসে নিয়ে যেও।

ফের গেলাম। তখন 'গৃহপ্রবেশ'-এর যে ছোট বইখানি পাওয়া যেতো, সেইরকম একটা বইয়ে পৃষ্ঠার পাশে ও ওপরে উনি অতিরিক্ত সংলাপগুলি লিখে রেখেছেন, কোথাও-কোথাও বা এডিট্‌ করে·দিয়েছেন। এই এডিট্‌ করা কপিটি আমার কাছে রয়ে গেছে। কবির স্নেহোপহার। ওটি হাতে করে নিয়ে আবদার করে বলেছিলাম—এটি আর দেবো না, এটি আমার কাছে থাকবে কিন্তু। কবি একটু হেসে সস্নেহে বলেছিলেন—আচ্ছা। এর পরে আরও পরিবর্তন-পরিমার্জনা করেছিলেন। পরে আরও একটু এডিট্‌ করেছেন। বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে বইয়ের পৃষ্ঠার মাপে আমরা সাদা কাগজ দিয়েছিলাম, সেই কাগজে নতুন সংলাপগুলি লিখেছিলেন। এর পরে আবার একটু বদ্‌লালেন। দেখি এবার দুটি নতুন চরিত্রই সৃষ্টি করে দিয়েছেন—একটি কিশোরী মেয়ে টুকৃরি, অপরটি একটি বৈষ্ণবী। টুকৃরির পার্ট আমরা দিলাম ফুল্লনলিনীকে। এই মেয়েটি আমাদের প্রফুল্লতে 'যাদব' করত, এখন একটু বড়ো হয়েছে। আর, 'ঋষির মেয়ে'র চারণী করবার জন্য আনা হয়েছিল গায়িকা রাজলক্ষ্মী (বড়ো)-কে, তাকেই দেওয়া হলো বৈষ্ণবীর ভূমিকা। কবি এইভাবে ৩.৪ বার পরিবর্তন করেছিলেন পাণ্ডুলিপিতে। সপ্তাহান্তে একবার-দুবার ওঁর কাছে যেতাম, খবর দিতাম অভিনয়ের। উনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করতেন, এবং বলতেন—আচ্ছা, পরশু এসো। ওঁর সঙ্গে এইসব যোগাযোগের ব্যাপারে নিযুক্ত থাকতাম আমি। আমি দেখেছি, এইসব ব্যাপ্যারে উনি কতোটা আগ্রহ প্রকাশ করতেন। যথানির্দিষ্ট দিনে দেখি উনি কিছু পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আমি সেই মত এসে মহলা দিয়েছি। নীহারের গানে ছিলেন খুব খুশী। বলতেন—মেয়েটি বড়ো ভালো গায়, ওর গান বাড়িয়ে দিয়েছি। হিমির গান বাড়ল—"বল গোলাপ মোরে বল।" হিমির জন্য আরও একটি গান দিয়েছিলেন, সেটি ওর ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে বলে আমরা টুকৃরি'র মুখে দিয়েছিলাম, আমাদের টুকৃরিও গাইতে পারত ভালো। গানখানি হলো—"সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।" বৈষ্ণবীর

গান ছিল দুখানি। "মনরে ওরে মন তুমি কোন সাধনার ধন" এবং "সে যে মনের মানুষ কেন তারে।" আমরা এক রাত্রি কি দু'রাত্রি গাইয়ে একটা গান বাহুল্য বোধে আর গাওয়াতাম না। প্রথমটি রেখে, দ্বিতীয়টি আর দেওয়া হতো না। আমাকে কবি বলতেন—এই যে সারাক্ষণ শুয়ে-শুয়ে পার্ট করছ, তোমার উঠতে ইচ্ছে করে না ?

বলতাম, না, একেবারেই অসুবিধে হয় না।

বইখানা আমরা তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ মাঝে দু'বার কার্টেন পড়ত। এই ভাগ অনুসারে আমি প্রথমে শুয়ে থাকতাম একটি হ্যারিংটন চেয়ারে, সেটা হচ্ছে আধা-ইজিচেয়ারের মত। পরে, ইজিচেয়ারে। শেষাংশ বিছানায় শুয়ে। প্রথম দিকে যতীন হয়ত দু'একবার উঠতে গেছে, মাসী অমনি বসিয়ে দিয়েছেন তাকে, বলেছেন—উঠো না, উঠো না, বোসো।

যতীন উঠলেই ত গল্পের রস মাটি হয়ে যায়! উঠে, বেরুতে পারলেই ত ধরা পড়ে যায়—সব ফাঁকি! শুয়ে-শুয়ে সে কল্পনায় গড়ে তুলছে নিজস্ব এক জগৎ, সে জগতে গৃহপ্রবেশ আর তার হলো না, এই-ই ট্রাজেডি। এখানে গল্পটি রূপকের মতো হয়েছে। মানুষের অন্তরে যে কবি-মন বা কল্পনাপ্রবণ মনটি সন্তর্পণে বাস করে যতীন যেন তারই প্রতিভূ।

মানুষ বাইরের জীবন—বাস্তব জীবনে বঞ্চিত হয়ে তার সেই অন্তর্নিহিত কবি-মনটিকে লালন করে তাকে তৈরি করে তোলে এক কল্পনার সৌধ। সে সৌধ অসমাপ্তই থেকে যায়, তাতে আর প্রবেশ লাভ ঘটে না, সেইজন্য এর নাম 'গৃহপ্রবেশ'। অভিনয় হতো আমাদের খুবই বাস্তবধর্মী। যদিও আগেই বলেছি রূপকের ভাব একটা টেনে বার করা যায়। কল্পনার সৌধে প্রবেশলাভ মানুষের ঘটে না, কেবল আশা আর আশা। 'গৃহপ্রবেশ'-এ আমরা সাধারণ দর্শক বেশী পাইনি বললেই হয়, এ ট্রাজেডি বোঝা ছিল কঠিন, কবি ও শিল্পীদের মনোভাব নিয়ে না দেখলে শিক্ষিতরাও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্য রূপান্তর করেছিলেন এটি। আমার সৌভাগ্য এই যে, নাটকের সর্ব ব্যাপারে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, কারণ প্রবোধবাবুরা তখন 'ঋষির মেয়ে' নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমি আমাদের 'গৃহপ্রবেশ'-এর অভিনয়ের যে পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কথা উল্লেখ করলাম তার উল্লেখ পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে। এ খণ্ডে নাটকটি মুদ্রিত আছে, আর তার কিছু অংশ আছে পরিশিষ্টে, গ্রন্থ-পরিচয়ে। উভয় পাঠ মিলিয়ে পড়লে সবটা বোঝা যাবে। গ্রন্থ পরিচয়ে পরিবর্ধিত অংশটুকু দেওয়া আছে।

অভিনয় হতো খুব সাবলীল। এ-ঘরে সবাক অভিনয় চলছে, ও ঘরে নির্বাক। অভিনয়ের পরিস্থিতি বুঝে পাশের ঘরে হিমি হয়ত জল গরম করছে, কিংবা সেলাই করছে ইত্যাদি। পাশাপাশি দুটি ঘরে যুগপৎ অভিনয়। একটার আলো নিভিয়ে, অন্যটি আলোকিত করে সে অভিনয়। তা কিন্তু আমরা করিনি 'গৃহপ্রবেশে'। যতীন চরিত্রের দিক থেকে অভিনেতার কঠিন অংশ হলো আগাগোড়া শুয়ে শুয়ে অভিনয়, রোগ-যন্ত্রণার মুখবিকৃতি নেই, থাকলে অভিনয়াংশ সহজ হয়ে আসত। এখানে

সে শুয়ে শুয়ে খালি বুনছে কল্পনার জাল। এখানে সে কবি, এখানে তার রোগ-যন্ত্রণাটা বড়ো নয়, বড়ো তার কবি-মন, বড়ো তার কল্পনার সৌধ-নির্মাণ। এটার ভাব আদ্যন্ত বজায় রেখে যেতে হবে। আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, কারণ চরিত্রের প্রতি আমার সহজেই প্রত্যয় জন্মে গিয়েছিল। যে-চরিত্রটি অভিনয় করবে অভিনেতা, তার প্রতি পূর্ণ প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা থাকা আগে দরকার। তবেই চরিত্রায়ন সহজ ও সাবলীল হয়ে আসে, অভিনয় একটা বাস্তব রূপ পায়। চরিত্রের মানসিকতার সঙ্গে নিজের মানসিকতার পূর্ব সংযোগ হলে ত আরও ভালো! দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। একটি হচ্ছে নাট্য পরিস্থিতির ওপর প্রত্যয় এবং অভিনেয় চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি। এটা লক্ষ্য করেছি, এই যে শুয়ে শুয়ে অভিনয় করতাম, আমার প্রতি সবার একটা অদ্ভুত সহানুভূতি গড়ে উঠত। কার্টেন পড়ে গেছে, দেখি আমার সহকর্মীরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন, হাত ধরে তুলে দিচ্ছেন আমাকে। দর্শকের কথা আগেই বলেছি, দর্শক তেমন হতো না। হরিদাসবাবুর বাড়ির ঠাকুর, সরকার, এঁরা থিয়েটার দেখতে চান। অন্য বই এদের দেখানোর সুবিধা হয় না, এ বইতে তাদের জন্য পাশ লিখে দিলেন হরিদাসবাবু। তারা তাড়াতাড়ি ছুটি করে থিয়েটারে এসেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই উঠে চলে গেল। বাড়ি ফিরতেই সবাই জিজ্ঞাসা করলে—কীরে? এরই মধ্যে চলে এলি?

তারা বললে—আজ থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল।

—কেন?

তারা বললে—গিয়ে দেখি, অহীনবাবুর খুব অসুখ করেছে, তিনকড়িবাবু খুব ব্যস্ত, আর দিদিমণিরা সব ছুটোছুটি করছে। বাড়ি ভর্তি দর্শক থাকলে হয়ত এতটা ভুল তারা করত না, দর্শক ছিল অল্প, তাও সামনের দিকে, ওরা ভেবেছে, বুঝি থিয়েটারের লোকই হবে। ঘটনাটা গল্প বলে প্রচলিত থাকলেও ঘটনাটা সত্যি।

'গৃহপ্রবেশ' পরে এককভাবে না চালিয়ে অন্য বইয়ের সঙ্গে জুড়ে আরও কিছুদিন ধরে চালানো হয়েছিল। বড়দিনের সময় আরও একটা নতুন বই হয়েছিল বলে লিখেছি—'ঋষির মেয়ে'। নরেশ-বাবুর গল্পটির পরিবেশ ছিল একেবারে নূতন এবং অভিনব। অতি প্রাচীন যুগের সেই আপস্তম্ব ঋষির যুগে হিন্দু সমাজের চেহারা কেমন ছিল, কেমন ছিল তার বিচারালয় ও বিচার-পদ্ধতি, তার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় এই নাটকে। নাট্যকার নিজে ছিলেন বড়ো আইনজ্ঞ ব্যক্তি এবং বহু আইন গ্রন্থ প্রণেতা। সেই জন্য আইন ও বিচারালয়ঘটিত চিত্রগুলি ফুটেছে ভারী সুন্দর। সাক্ষী নেবার পদ্ধতি তখনকার দিনে কি ছিল—প্রতিটি গৃহে চিরজাগ্রত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকত, তার বিবরণ। অমাত্য নিয়োগ করতে হলে কতোরকমভাবে কতো কঠোর পরীক্ষা করে তাঁদের নিয়োগ করা হতো, সেইসব চিত্র আছে 'ঋষির মেয়ে'তে। লেখক ভূমিকায় লিখেছিলেন—'অমাত্যের পরীক্ষাবিধি' কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে নেওয়া। বইখানি সত্যিই খুব ভালো এবং নূতনত্বের পরিচায়ক। দৃশ্যপট এঁকেছিলেন চারু

রায়। সুকবি নরেন্দ্র দেব এতে কয়েকখানি গান লিখে দিয়েছিলেন। সুর দিয়েছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জানকীনাথ বসু। অভিনয়লিপি ছিল: আপস্তম্ব—রাধিকানন্দ। অগ্নিবর্ণ—আমি। উগ্রশ্রবা—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। চারু দত্ত—দুর্গাদাস। ইন্দ্রায়ুধ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়। অগ্নিবেশ—সন্তোষ সিংহ। সত্য সেন—তুলসী চক্রবর্তী। সৌধিরক—বিজয় মুখুজ্যে। সুবাহু—মণীন্দ্রনাথ ঘোষ। শাশ্বতী—সুশীলাসুন্দরী। সুদত্তা—নীহার। চারণী—রাজলক্ষ্মী (বড়ো)। বাসন্তিকা—সেরাবালা। 'বাসন্তিকা' অল্প দিনই করেছিল সেরাবালা, পরে এটি অন্য মেয়েরাও করেছে। 'ঋষির মেয়ে'র প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ—পঁচিশে ডিসেম্বর, ১৯২৫ সাল।

ঐ বড়দিনের সময় মিনার্ভাও খুললে নতুন বই—'মিশরকুমারী'র লেখক বরদা দাশগুপ্তের 'সত্যভামা'। এঁদের "সত্যভামা"ও হলো ঐ ২৫ তারিখেই। সুবাসিনী নেমেছিল নাম-ভূমিকায়। পটলবাবু 'আত্মদর্শন' থেকেও জমকালো দৃশ্য করেছিলেন এতে। গানও ছিল ভালো। নাচও ভালো। নাচ-গানে মিনার্ভার ত বরাবরই ছিল সুযশ। কিন্তু এতো করেও এ বই ওদের জমল না। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে শিশিরবাবুরা বড়দিনে নতুন নাটক কিছু করেননি। "সীতা", "জনা"-ই ছিল মূল বড়ো বই, সঙ্গে পুনর্জন্ম, আলিবাবা, চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে—এসব বই দিয়েছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় নভেম্বরের গোড়ার দিকেই হবে, ওরা "আলমগীর"-এর পুনরভিনয় করেছিলেন। এতে উদিপুরী করেছিলেন তারাসুন্দরী। রাজসিংহ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। শিশিরবাবু নিজে ছিলেন নাম ভূমিকায়। আর, বীরাবাঈ—প্রভা। কিন্তু এই বড়োদিনে ওঁরা দিয়েছিলেন কিনা মনে নেই, সম্ভবতঃ দেননি, দিলেও তার কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। বড়োদিনের পরই শিশিরবাবু মনোমোহন ছেড়ে দিলেন। মনোমোহনবাবুর সঙ্গে কিছুদিন থেকেই ওঁর বনিবনা হচ্ছিল না। শুনলুম, বড়দিনেরই কোন সময়ে নাট্যমন্দির লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হলো, ডিরেক্টর হলেন—তুলসীচরণ গোস্বামী, শিশিরবাবু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। নির্মলবাবু আর্ট থিয়েটারেরও ডিরেক্টর ছিলেন, কিন্তু সম-ব্যবসা বলেই সম্ভবতঃ উনি এ ডিরেক্টরশিপ ছেড়ে দিলেন। এঁদের বললেন—শিশির আমার কলেজ-বন্ধু, সে বড্ড ধরেছে, আমাকে ওখানে যেতেই হবে।

আর্ট থিয়েটারে নির্মলবাবুর বদলে ডিরেক্টর হয়ে এলেন—গদাধর মল্লিক মশাই। নাট্য-মন্দিরের মূলধন তোলার কথা ছিল—যতদূর শুনেছিলাম—পাঁচ লক্ষ টাকা। কিন্তু, সে টাকা ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। "সীতা"য় বহু অর্থ পেয়েছেন শিশিরবাবু, 'জনা'র আয়ও ছিল বেশ, তবু অর্থের ব্যাপারে শিশিরবাবুরা ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে যে-ঋণ নিয়েছিলেন, তা বৃদ্ধি পেতেই থাকল। সেইজন্যই লিমিটেড কোম্পানী করে নতুন করে নাট্যমন্দিরের পত্তন। শুনলাম, এঁরা কর্নওয়ালিশ মঞ্চ নিয়েছেন (বর্তমানে "শ্রী"), সেখানেই দ্বারোদ্ঘাটন হবে নাট্যমন্দিরের।

বড়দিনে আমাদের দুখানা নতুন বইয়ের সঙ্গে পুরানো বই ছিল—চিরকুমার সভা, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত আর কর্ণার্জুন। এইভাবে ২৫ সাল চলে গিয়ে এলো ২৬ সাল। 'সরলা'র পুনরভিনয় করা হলো। সঙ্গে—গৃহপ্রবেশ। এ-ও বেশী দিন চালানো হয়নি। ১০ই জানুয়ারী কবির "বশীকরণ"

নামে একটি নাটিকা করা হলো। এতে দুই মুখ্য ভূমিকা করেছিলেন মাতাজী—রানীসুন্দরী, অন্নদা—
—রাধিকানন্দ। আসল বড়ো বই কিন্তু তখন আমাদের "ঋষির মেয়ে।" পয়সা না হলে থিয়েটার চলে না, আর পয়সা পেতে হলে সপ্তাহে অন্তত একখানা নির্ভরশীল বই চাই, বাকীগুলির মধ্যে ২।১ খানা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে। সেইজন্য মাত্র একখানা বই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ঠিক বাস্তব-বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আমাদের তখন মাঝে মাঝে চন্দ্রশেখরও হয়। চন্দ্রশেখরে আমি করতুম নবাব, দুর্গাদাস—প্রতাপ। একদিন হলো কী, দুর্গা এলো না। পরে—আরও ডুব মেরেছে। বলত—প্রতাপ করতে ভাল লাগে না, যত সব বেশী বয়সের নায়িকা দেবে, দূর-দূর!

যাই হোক, সেদিন আমি ত বসে বসে সাজছি, এমন সময় এসে দাঁড়ালেন প্রবোধবাবু, বললেন—ওহে শ্রীমান, শুনেছ, আজ দুর্গা আসেনি। প্রতাপটা আজ তুমিই করে দাও।

—সে কী!

উনি বললেন—নবাবে আর প্রতাপে কোথাও দেখা নেই। ও-দুটোই করে দাও তুমি।

—বলছেন কী!

উনি বললেন—করে দাও। তোমার একটু পরিশ্রম হবে, তা' আর কী করা যাবে। একটা ফাউল রোস্ট্।

'ফাউল রোস্ট্' কথাটা হচ্ছে আমার কাছে প্রবোধবাবুর ব্রহ্মাস্ত্র। ওটা খেতে ভালবাসতুম, বিশেষ করে প্রবোধবাবুর হাতের রান্না হলে ত কথাই নেই—একটা গোটা রোস্ট্ই মেরে দিতাম। যখনই কোনো কাজের ঠেকা পড়ত, তখনই প্রবোধবাবুর ঐ অস্ত্র—ফাউল রোস্ট্। ওঁর নিজের হাতের রান্না-করা 'ফাউল রোস্ট' অবশ্য, এবং সেটা যে কী উপাদেয় বস্তু ছিল তা' যারা খেয়েছে, তারাই জানে! অগত্যা নামলুম। সেদিন নবাবের গোঁফটা করলুম ঠিক মুসলমানী না করে একটু হিন্দু প্যাটার্নের। আর দাড়িটা নিলুম অনেকটা ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ির মতন—জালের ওপরে তৈরী। সেদিন করলাম কী, 'নবাব' করে এসেই দাড়িটা খুলে ফেললাম, আর, পোশাক বদলে পরে নিলাম প্রতাপের পোশাক। দাড়ির নীচে যে স্পিরিট গামের দাগ থাকত, তার ওপরে নরম বুরুশ দিয়ে আল্তো করে পাউডার বুলিয়ে নিতাম। বঙ্কিমবাবুর বইগুলির একটি ব্যাপার ছিল, যে বই ওঁর তখন আমরা নিতাম, খুব পড়তাম, সেইজন্য সংলাপের জন্য সেদিন কিছুটা প্রম্প্টের ওপরে নির্ভর করলেও বড় বড় স্বগতোক্তিগুলো, যা প্রায়শ বঙ্কিমের রচনা থেকেই রাখা হয়েছে, আমার দেখি, মুখস্থই আছে। আশ্চর্য—একেবারেই অসুবিধে হলো না। 'এ কী সেই শৈবলিনী' বলে যে দীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে, তা দিব্যি বলে গেলাম। শেষ দৃশ্যে, যখন রামানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করছেন—তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাসো?

তার উত্তরে প্রতাপের সেই বিখ্যাত উক্তি—'তুমি কী জানবে সন্ন্যাসী' ইত্যাদি। দেখি, সবই মনে আছে।

এ ধরনের আকস্মিক অবতরণ আমার জীবনে যে কতবার ঘটেছে তা মনে নেই। আজ তারিখটা ঠিক মনে নেই, এবং ঠিক কোন্ সালের যে ঘটনা এটা তাও মনে করতে পারছি না, পঁচিশ কি ছাব্বিশ সাল—কি সাতাশ সালও হতে পারে—অপরেশবাবুর কয়েকটি দৃশ্য-সমন্বিত ছোট্ট গীতিনাটিকা "অপ্সরা" হতো মাঝে মাঝে বড় বড় বইয়ের সঙ্গে। অর্জুন-উর্বশীর কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছিল এই 'অপ্সরা'। এতে 'অর্জুন' করতাম প্রথমে আমিই। কাজের চাপ আমার ওপর বেশী পড়ায় প্রবোধবাবু ওটা দিয়েছিলেন দুর্গাদাসকে। একবার, সারারাতের বিশেষ অভিনয়-রজনী ছিল সেদিন, যথারীতি পর পর দুখানা বড় বই করে এসে 'মেক্-আপ' তুলছি, প্রবোধবাবু এসে ঢুকলেন ঘরে। বললেন—রঙ্ তুলছ কী?

—কেন?

—দুর্গা আসেনি, অর্জুন-টা করে দাও।

বললাম—না, আমি আর পারব না! মাপ করুন।

—আহা, রাগ করছ কেন? করে দাও! একটি ফাউল রোস্ট্।

ব্যস্—আমি জল। সাজতে হলো অর্জুন।

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা এই ফাঁকে বলে নেওয়া দরকার। মাঝে মাঝে অবকাশ পেলে মিনার্ভায় যেতাম। ওখানে নাট্যকার ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, আমার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল। ওঁর স্যাটায়ারের হাতটা খুব ভালো ছিল। ওঁর 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা', "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" বড় ভালো লেগেছিল। ওঁর সঙ্গে গল্প করতে বসলে উনি দিতেন খোঁচা দিয়ে, আর আমি বলে যেতাম আমার অধীত বিদেশী নাটকাবলীর কথা। নতুন ধরনের নাটক করুন, এই দেখুন, ওদেশে কীরকম নাটক আজকাল লেখা হচ্ছে, ইত্যাদি ধরনের ভাষণই ছিল আমার প্রিয় ভাষণ। আর আমাকে খুঁচিয়ে দিয়ে ওঁরাও শুনে যেতেন আমার প্রবল বাক্যস্রোত! এইরকম যাতায়াত চলে, উনিও আসেন, দিলওয়ার হোসেনও আসেন (এঁর পরিচয় পরে দেব), হঠাৎ ভূপেনবাবু একদিন বললেন—নতুন বই লিখেছি, যা চাও, তা-ই আছে।

—কীরকম?

উনি বললেন—যে ভূমিকায় অভিনয় করে বিলেতের স্যর হেনরী আর্ভিং জগদ্বিখ্যাত হলেন, সেই ম্যাথিয়াস্ চরিত্রটি আছে যে বইতে, সেই বই বাঙলায় রূপান্তরিত করেছি। মনে পড়ে "দি বেল্‌স্" নাটক?

বইখানা আমার পড়া ছিল, এবং আমার সংগৃহীত নাটকাবলীর এটি অন্যতমও বটে। ফরাসী ভাষা-শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল বইখানা। একই বইয়ে ফরাসী একটি নাটক ছাপা রয়েছে ফরাসী ভাষায় আর সঙ্গে তার ইংরাজী তর্জমা করা নাটকটি—ইংরেজী নাম "দি বেল্‌স্"—ফরাসী নাম "পোলিশ জ্যু"। বিলেতে লাইসিয়াম থিয়েটারে একাদিক্রমে একুশ বছর অভিনয়

করেছিলেন আরভিং। "ম্যাথিয়াস"-এর ভূমিকায় তাঁর যে কী সুনাম হয়েছিল, তা' বলার নয়। 'ম্যাথিয়স'-বেশী আরভিং-এর একটা স্ট্যাচু পর্যন্ত আছে। বইখানা অবশ্য এমন কিছু নয়, একটি সাধারণ মেলোড্রামা। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর শিষ্য স্যার মার্টিন হার্ভে একবার এটি অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তেমন জমাতে পারেননি। যাই হোক, ভূপেনবাবুর "The Bells" নাটকের রূপান্তর আমাকে সেদিন এমন উৎসাহিত করলে যে বলার নয়। উনি বললেন, যা করতে চাও, তাই-ই হবে। তুমি চলে এসো মিনার্ভায়।

বলে, আমাকে প্রায় টানতে-টানতেই নিয়ে গেলেন উপেন মিত্রের কাছে। চিঠির আকারে একটা কনট্রাক্ট দিলেন, তাতে আমি সই পর্যন্ত করে ফেললাম। তার পরদিন দুপুরে উপেনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির মিত্রের বাড়িতে—ওঁদের বাড়ি তখন বিডন স্ট্রীটে—বসল আমার আলোচনা-সভা। ভূপেনবাবু ঐ ইংরেজী নাটক ছাড়া আরও একটি নাটক লিখেছেন, গার্হস্থ্য নাটক—নাম "বাঙালী"। বললেন এটিও মিনার্ভা নিয়েছে। এটি হাঁদুবাবু করছেন। তুমি করো ঐ ইংরেজী নাটকটা। আমি নাম দিয়েছি 'শঙ্খধ্বনি'।

নাটকটি করেছেন উনি রাজপুত পরিবেশে নাথদ্বার মন্দির নিয়ে। আগে আগে থিয়েটারের সঙ্গে আবার কখনো-সখনো একটু-আধটু সিনেমা দেখানোরও রেওয়াজ ছিল। ভূপেনবাবু বললেন, সেই রেওয়াজ আবার চালু করা যাক। রাজপুতানায় গিয়ে আমরা উটের প্রসেশন ইত্যাদির ছবি নিয়ে আসব। কী? নূতনত্ব হবে না?

এইসব আলোচনা চলেছে। এমন সময় নীচে থেকে শোনা গেল মোটরের হর্ন। তারপরেই একজন বেয়ারা উঠে এলো ঘরের দরজায়। সে আমাকেই বললে—গাড়িতে গণদেববাবু বসে আছেন, আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

গণদেব আমার বন্ধু, এবং ভূপেনবাবুরও বিশেষ পরিচিত—ওঁদের সেই "ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব"-এর আমল থেকে। তার নাম শুনে ভূপেনবাবু একটু চঞ্চল হলেন—গণদেব কেন, হঠাৎ?

আমি ভিতরে-ভিতরে হলাম শঙ্কিত। কী জানি, ব্যাপারটা এরই মধ্যে আবার প্রবোধবাবুর কানে যায়নি ত?

ভূপেনবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন,—গণদেবকে আমি ডেকে বলে দিচ্ছি—ও যাচ্ছে একটু পরে।

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম—না-না, থাক। আমিই নীচে গিয়ে বলে আসছি।

—আচ্ছা, যাও।

গিয়ে দেখি, স্টারেরই গাড়ি, ভিতরে গণদেব একাই বসে আছে। সে আমাকে দেখে প্রথমে প্রশ্ন করলে—এখানে কী করছ? তারপরেই গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমার হাতটা ধরে একটু টান দিয়ে বললে—চলে এসো।

বলে, আমাকে একপ্রকার টেনেই ওঠালো গাড়িতে। গাড়ি সোজা গেল প্রবোধবাবুর কাছে। বুঝলাম, এরই মধ্যে কে গিয়ে সব বুঝি লাগিয়েছে প্রবোধবাবুর কানে। তিনি টেলিফোন করে ডেকেছেন গণদেবকে। তারপরে, নিজে আমার কাছে না এসে গণদেবকে পাঠিয়েছেন। আমাকে দেখেই প্রবোধবাবু বললেন—কিছু সই করেছ নাকি?

বললাম। উনি বললেন—ঠিক আছে, ওর ব্যবস্থা করছি! তোমাকে ভাবতে হবে না।

স্টারের সঙ্গে লিখিত কনট্রাক্ট্ পাকাপাকিভাবে আমার সঙ্গে তেমন-কিছু ছিল না। চব্বিশ সালে ওঁরা কনট্রাক্টের মত একটা চিঠি শুধু দিয়েছিলেন, তাতে বাবার নিজের হাতের লেখা কিছু সংশোধন ছিল বটে, কিন্তু সেটা সই করা হয় নি। সেটার জোরে স্টার একটা ইন্‌জাংশন জারী করালেন। উপেনবাবু অবশ্য সে চিঠিকে আর চ্যালেঞ্জ করলেন না, সুতরাং সহজেই মিটে গেল ব্যাপারটা, আমি রইলাম যে স্টারে সেই স্টারে। ২৬ সালের ২০শে মার্চ মিনার্ভা খুললে ভূপেনবাবুর "বাঙালী"। ভূপেনবাবু ছিলেন দেশবন্ধুর খুব ভক্ত। এই বই তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন "কর্মী বাঙালী" বলে। এই "বাঙালী" নাটকের পূর্বরঙ্গ হিসাবে যে-অংশটুকু, লিখেছিলেন, সে-অংশটুকু, নাটক বড় হয়ে যায় বলে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন আগেই। এবং সে-অংশটুকু ইতিপূর্বে আলফ্রেড মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল—"কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নামে। পটলবাবু এতেও 'সিন' করলেন খুব সুন্দর। বাড়ির কর্তা দীনদাস সাজলেন কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। এঁর ধনী ভ্রাতা সুখদাস সাজলেন হাঁদুবাবু। রামলোচন—কার্তিক দে। এছাড়া, অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—সত্যেন দে, অহীন দে, জিতেন ঘোষ, সুরেন্দ্র রায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। রেণুবালা (সুখ) এতে নামলে পুরুষ-ভূমিকায়। বাড়ির ছোট ছেলে সেজেছিল সে। বড়গিন্নী—নগেন্দ্রবালা, ছোটগিন্নী—প্রকাশমণি, ভিখারিণী—সুবাসিনী। এছাড়া ছিলেন—শশীমুখী, আসমানতারা, মনোরমা (কাপ্তেন মনা) প্রভৃতি। আমিও এ-নাটকে পরে অভিনয় করেছিলাম, সে-কথা যথসময়ে বলা যাবে।

মিনার্ভার "বাঙালীতে" ভিখারিণীর গানগুলি হতো চমৎকার। বিশেষ করে দুখানি গান আজও কানে কাজে,—"এ পোড়া বাংলাদেশে বরের নাই বাছবিচার।" আর "ভাবছ কী এমনি যাবে দিন।" বাঙালী-নাটকের চরিত্র-বিন্যাসও অভিনব। গৃহকর্তার সাত ছেলে এক মেয়ে। তার মধ্যে সাত ছেলে সাত রকম। একজন কবি, একজন নাট্যকার, একজন অভিনেতা, একজন মল্লবীর—এইভাবে শুরু করে—ছোটটি আবার যাত্রাদলে 'সখী' সাজে—নাম ললিত। গৃহকর্তা বৃদ্ধ হয়েছেন, তবু তাঁকে নিজে গিয়ে বাজার করে আনতে হয় প্রতিদিন। খুবই দুঃখের জীবন তাঁর। 'বাঙালী'তে আরও একটি চরিত্র ছিল রামলোচন—বিয়ে-পাগলা বুড়ো। টাকার লোভ দেখিয়ে পরিবারের দুঃস্থতার সুযোগ নিয়ে কর্তার একমাত্র মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। পরে আমি যখন মিনার্ভায় যাই, এই 'রামলোচন'-এর ভূমিকা আমিও অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

চৌদ্দ

১৯২৬—১৯২৭

স্টারে ঐ সময় আমরা কবির "বিদায় অভিশাপ"ও করেছিলাম দু'একদিন। রাধিকানন্দ ও সুশীলাসুন্দরী নামতেন 'বিদায়-অভিশাপ'-এ। এর পরে ধরা হয়েছিল অপরেশবাবুর "শ্রীকৃষ্ণ"। কিন্তু সে বৃত্তান্ত বলবার আগে আরেকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলে নিই। উপেন্দ্র মিত্রের ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্র মিত্র ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির মিত্র (৺মহেন্দ্র মিত্রের পুত্র) অ্যালফ্রেড মঞ্চ নিয়ে "মিত্র থিয়েটার" খুললেন বরদা দাশগুপ্তের "শ্রীদুর্গা" নাটক দিয়ে ২রা এপ্রিল ১৯২৬ সালে। এখানে এলেন অনেক নতুন লোক। পৌরাণিক নাটকের যুগ চলেছে বলে এঁরাও নামলেন প্রথমে পৌরাণিক নাটক নিয়ে। তারাসুন্দরী ছিলেন শিশির সম্প্রদায়ে, কিন্তু শিশিরবাবুর নতুন "নাট্যমন্দির" তখনো খোলেননি বলে, উনি চলে এলেন মিত্র থিয়েটারে। 'শ্রীদুর্গা'র নাম ভূমিকায় নামলেন তারাসুন্দরী। কুসুমকুমারী হলেন—কামকল্যা। সে যুগের একজন নাম-করা শৌখীন অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক ছিলেন প্রকাশ মুস্তফী। তিনিও এলেন মিত্র থিয়েটারে, নামলেন এই নাটকে, 'ইন্দ্র'র ভূমিকায়। আমাদের আর্ট থিয়েটার ছেড়ে নিভাননীও গেলো ওখানে। সে সাজল শচী। হাস্যরসাভিনেতা ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি-জি) ইণ্ডো-বৃটিশ কোম্পানীর হয়ে ছবি করার পরে চলে গিয়েছিলেন হায়দারাবাদে তাঁর ভাইয়ের কাছে। সেখানেও 'লোটাস ফিল্ম' নামে একটি ফিল্ম কোম্পানীর পত্তন করে তিন-চারখানা ছবি তুলেছিলেন। তার মধ্যে "লেডী টিচার" ও "বিজয় বসন্ত" উল্লেখযোগ্য। "লেডী টিচার"-এর নাম ভূমিকা অর্থাৎ স্ত্রী ভূমিকায় নেমেছিলেন তিনি নিজে। এসব করার পর তিনি আবার ফিরে এলেন কলকাতায়, এসে যোগ দিলেন মিত্র থিয়েটারে। 'শ্রীদুর্গা'য় 'কুটুস' নামের একটি হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। বাকী রইল প্রধান পুরুষ ভূমিকা—মহিষাসুর। নির্মলেন্দু লাহিড়ী আর্ট থিয়েটার ছাড়লে পর তাঁকে আবার দেখা গিয়েছিল, ২৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর অ্যালফ্রেড-মঞ্চে যে স্বল্পায়ু "বেঙ্গল থিয়েটার লিমিটেড" খুলেছিল সুধীন্দ্রনাথ রাহা-বিরচিত "মহারাষ্ট্র" নাটক নিয়ে, তাতে সদাশিবের ভূমিকায়। সঙ্গে ছিলেন কুসুমকুমারী—গোপিকাবাইয়ের ভূমিকায়। কয়েক রাত্রি মাত্র চলেছিল এ-বই। এদের পরে, ২৬ সালে হলো 'মিত্র থিয়েটার'-এর আবির্ভাব। এঁদের "শ্রীদুর্গা"'য় 'মহিষাসুর' হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল নির্মলেন্দু। বই জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু ঐ সময় কলকাতায় লেগে গিয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, আর অ্যালফ্রেড মঞ্চ ছিল কুখ্যাত গুণ্ডা-পল্লীতেই সেইজন্য আকস্মিকভাবে বিক্রি কমে গেল 'শ্রীদুর্গা'র।

স্টারের 'শ্রীকৃষ্ণ' খোলা হয়েছিল ১৫ই মে শনিবার সাড়ে সাতটায়। তবে জাঁকজমক এত ছিল, এবং দৃশ্যপট ও পোশাক-আশাকের সমারোহ এত হয়েছিল যে, এতে 'বন্দিনী'র চাইতেও খরচ

হয়ে গিয়েছিল বেশী। চোখ-ধাঁধানো সব জিনিসপত্র। অনেক ট্রিকসিন বা মায়াদৃশ্যও ছিল এতে। সে সবও আবার অনেকদিন ধ'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে, তারপরে সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়েছিল। এসব প্রস্তুতির পিছনেও কম পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় ছিল না! এইসব মায়াদৃশ্য ক'রে তুলবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে যে কতো লোক এসেছিল, তার ঠিক নেই! তবে এ বইতে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে, বহুদিন পরে নতুন এক নাটকে অবতীর্ণ হলেন দানীবাবু। "শ্রীকৃষ্ণ"তে তিনি হলেন ভীষ্ম।

অন্যান্য ভূমিকাগুলি ছিল, শ্রীকৃষ্ণ—তিনকড়িদা। বলরাম—মণীন্দ্র ঘোষ। কংস ও ব্যাসদেব —প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। বসুদেব ও জরাসন্ধ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। দ্রোণাচার্য—ব্রজেন্দ্র সরকার। অশ্বত্থামা —প্রফুল্ল রায়। সাত্যকী—সন্তোষ দাস (ভুলো)। কৃতবর্মা, মন্ত্রী, বিদুর—তুলসী চক্রবর্তী। অনিরুদ্ধ—বিজয় মুখুজ্যে। দুর্যোধন—আমি। শিশুপাল—রাধিকানন্দ। যুধিষ্ঠির—কণকনারায়ণ। ভীম—ননীগোপাল মল্লিক। অর্জুন—দুর্গাদাস। সহদেব—সন্তোষ সিংহ। অক্রুর, বৃদ্ধ যাদব— বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (হাবুল)। প্রাপ্তি—সুশীলাসুন্দরী। অস্তি—নীহার। দেবকী ও দ্রৌপদী—রানীসুন্দরী। ইন্দু আর হরিমোহনবাবু এই বইতে ছিলেন না, এই ২৬ সালেরই এপ্রিলের পর থেকে তাঁদের সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের আর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। 'শ্রীকৃষ্ণ'তে সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন জানকীনাথ বসু। নৃত্যশিক্ষক—ভুপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দৃশ্যপটাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথার কিরীট, অস্ত্রশস্ত্র, গহনা—এ সবেরই পরিকল্পনা করেছিলেন শিল্পী চারু রায়। শ্রীকৃষ্ণ নাটকের পরিবেশ চারুবাবু 'ঋষির মেয়ে'র মতো করেননি। 'ঋষির মেয়ে'তে ছিল সম্পূর্ণ বৈদিক পরিবেশ। 'ঋষির মেয়ে'র যেসব দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, তাতে তার ঘরবাড়িগুলি এঁকেছিলেন—রংচঙে পাথরের নয়—কাঠের। কী কুটির, কী আঁকা ঘরবাড়ির আভাষ, সব যেন কাষ্ঠ নির্মিত বলে মনে হয়। কথায় কথায় 'ঋষির মেয়ে'র কথা যখন এসে পড়ল, তখন 'ঋষির মেয়ে'র একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করি। একটি দৃশ্যে ছিল —চারুদত্ত ও সুদত্তা (আপস্তম্ব ঋষির কন্যা) নদীর ওপরের একটি গ্রাম্য সেতু দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তখনকার পরিবেশে যে ধরনের সেতু থাকা সম্ভব বলে কল্পনা করা যায়, সেই রকম অবিকল গাছের ছাল-পাকানো দড়ির সেতু করা হয়েছিল। অবশ্য দৃশ্যত দড়ি দেখালেও আসলে ছিল মোটা লোহার তার। নীচে থেকে পটভূমিকা পর্যন্ত—নদী ও নদীর পরিবেশ এঁকে দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে বাঁদিকে স্টেজের দ্বিতীয় উইংসটি থেকে ডানদিকে একেবারে পিছন পর্যন্ত (রাইট আপস্টেজ পর্যন্ত) মোটা একটা লোহার তার দেওয়া হয়েছে শক্ত করে টাঙিয়ে স্ট্রেনার দিয়ে (টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো যে সব তার দিয়ে স্ট্রেনারে আটকে সোজা টান করে দাঁড় করানো থাকে, তেমনি তার আর কী) এবং আর একটি তার বুকপ্রমাণ উঁচুতে অনুরূপভাবে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তার দুটির ওপরে শিল্পী এনেছিলেন গাছের ছাল দিয়ে তৈরী দড়ির বিভ্রম। এ' দুটির সাহায্যে চারুদত্ত আর সুদত্তা— দুর্গাদাস ও নীহার—পালিয়ে যেতো নদীর এপার থেকে ওপারে।

চারুবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর বন্ধু প্রফুল্ল রায় মনোমোহনের নাটমন্দির থেকে। প্রফুল্ল রায় অনেকদিন ওখানে 'সীতা'তে 'শম্বুক' করেছিলেন। তারপরে হিমাংশু রায়ের নির্বাক ছবির জন্য এঁরা দুজনেই চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে যোগদান করলেন স্টারে—'ঋষির মেয়ে'তে। প্রফুল্ল রায় 'শ্রীকৃষ্ণ'তে কিছুদিন যাবৎ করেছিলেন 'অশ্বত্থামা'।

দৃশ্যপটাদি তো চমৎকার হলো, গোল বাঁধল কতগুলি মায়া-দৃশ্য নিয়ে। চারু রায় হচ্ছেন শিল্পী, মায়া-দৃশ্যের কলাকৌশল ওঁর তেমন জানা নেই। একটি মায়া-দৃশ্য ছিল—শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে শিশুপালের ওপরে ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন, এবং চক্র এসে শিশুপালের কণ্ঠচ্ছেদ করলো। এ' কাজ পুরনো স্টেজের লোক ছাড়া হবে না। প্রবোধবাবু পটলবাবুকে ডেকে এনে পরামর্শ করলেন, কিন্তু হলো না। তখন আমাকে ডেকে প্রবোধবাবু বললেন—দীনশা ইরানীকে একবার ডাকো না? আমি তখন ম্যাডানের মাইনে-করা স্থায়ী চিত্রাভিনেতা। কাজ যেদিন নেই, তখনো যখন এক একদিন দুপুরের দিকে—মাইনে আনতে কিংবা কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম ওঁদের অফিসে, তখন কর্তারা হয়ত একটু ব্যস্ত কিংবা মাইনে দিতে একটু দেরি আছে। আমি করতাম কী, কোরিন্থিয়ান মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসতাম, বসে বসে অন্য সব সহকারী বা জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতাম। ম্যাডানদের কোরিন্থিয়ানের একটা ব্যাপার ছিল। শুক্রবার থাকতো পুরো ছুটি, সেদিন অভিনয়ও হতো না, কিন্তু এছাড়া এবং রবিবার ম্যাটিনী শো থাকত বলে, রবিবার ছাড়া, সপ্তাহের বাকী সবদিনই প্রত্যহ সকাল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত রিহার্স্যাল চলতো। আমি বসে বসে ওদের নাচ, গান ও অভিনয়ের মহলা দেখতাম। আর দেখতাম পার্শ্ববর্তী পশ্চিমের বারান্দায় বসে কাজ করে চলেছে অক্লান্তকর্মী—দীনশা ইরানী। বহু সহকর্মী তার। তাদের নিয়ে বারান্দায় সে একমনে কাজ করে চলেছে। আমার থেকে যদিও বয়সে বড়ো, কিন্তু অপূর্ব সদানন্দ প্রকৃতির মানুষ। দু'তিনবার আলাপ হবার পর আলাপ একটু জমলেই আলাপী লোকটি হয়ে যাবে তার 'ইয়ার'—দোস্ত, বন্ধু। তখন তার সঙ্গে তার কথার মাত্রাই হবে—'আরে ইয়ার'। ওর কাজের ধরণটি, বলা বাহুল্য, আমাকে খুব আকর্ষণ করত। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাজও দেখতাম মাঝে মাঝে। এবং এক সময় ওর 'আরে ইয়ার' পর্যায়েও এসে গেছি। দীনশা ছিল আসলে বম্বেতে—চিত্রশিল্পী, 'পেইণ্টার', কিন্তু স্টেজ যে তাকে কী করে আকর্ষণ করল জানি না, স্টেজ-এ এসে ক্রমে ক্রমে স্টেজ-এর সেট-সেটিং-এ হয়ে উঠলো রীতিমত পারদর্শী। পার্শী থিয়েটারে দীনশার আগে ট্রিক-সিন বা মায়া-দৃশ্য করত পার্শী ম্যাজিশিয়ানরা। এরকম একজন পার্শী ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল। যাই হোক, দীনশাকে ত ডেকে আনলাম। সে সব-কিছু দেখে শুনে বললে,—এক কাজ করো, সারা স্টেজটা জুড়ে একটা লোহার হুইল বানাও, বানিয়ে ওটা স্টেজের মাথায় খাটাও। হুইলটির ব্যালান্স ঠিকমতো হওয়া চাই। হ'লে ওটা থেকে চক্র ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে এসে ঠিক

পড়বে যথাস্থানে। তবে হ্যাঁ, লোহার হুইল বানাবার আগে, একটা কাঠের ডামি হুইল তৈরি করে নিয়ে বসাও। ব্যালান্সিং হয় কিনা দেখ।

তাই হ'লো, কাঠের হুইল করা হ'লো। কিন্তু ব্যালান্সিং আর কিছুতে হ'লো না। ওটা ঘুরতে ঘুরতে বারবার কাত হয়ে পড়ে। কার্যকরী হ'লো না ইরানীর পরামর্শ। তাই প্রবোধবাবু সেটা বাতিল করে দিলেন। আমাদের স্টারের ডাইরেক্টরদের অন্যতম ছিলেন কুমারকৃষ্ণ মিত্র মশাই। এঁর ছিল অভ্রের ব্যবসায়। সেই সূত্রে ইনি মাঝে মাঝে ইয়োরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বেরিয়ে প'ড়তেন। ইনি এক সময় বিলেতে থাকাকালীন, আলাপ হয় তাঁর বাঙালী ম্যাজিশিয়ান রাজা বোসের সঙ্গে। রাজা বোস তখন বিলেতে একটা ভ্যারাইটি শোতে কিছুক্ষণের জন্য ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন। বিলেত থেকে দেশে ফিরে রাজা বোস দেখা করেছিলেন কুমারবাবুর সঙ্গে। আমাদের সমস্যার কথা শুনে কুমারবাবু এই রাজা বোসকে খবর দিলেন। এলেন রাজা বোস—স্টারে। ইনি 'মায়া-দৃশ্যে'র ব্যবস্থা যা ক'রলেন, তাতে সুন্দর ফল পাওয়া গেল। দুটি পুলি দিয়ে টানা দুটো দড়ি স্টেজের ওপরে দর্শকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্যে টাঙানো হলো। আর চক্রটি ছোট চাকা লাগানো অবস্থায় দড়িতে ঝুলতে লাগল। দড়ি রইল ডবল পুলিতে স্টেজের একটা ঝারির পেছনে। একটা পুলি, স্টেজের বাঁদিক থেকে ডানদিকে টানছে চক্রটিকে। আরেকটি পুলি চক্রটিকে একটু-একটু করে নামিয়ে আনছে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে গেরো দেওয়া আছে, যেন তার বেশী চক্রটি না নেমে যায়! দড়ি চলাচলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাই হলো। এখন চক্রটাকে না হয় পুলির সাহায্যে টেনে যথাস্থানে আনা হ'লো, কিন্তু চক্রটি ত ঘোরাও চাই? ঘুরবে কী করে? ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক টেবিল ফ্যানের মোটরে চক্রটিকে ফিট করা হলো, এবং চক্রটির কিনারায় বসিয়ে দেওয়া হলো সারি সারি ছোট-ছোট বাল্ব; এ-অবস্থায় মোটর চললেই মনে হবে—জ্বলন্ত চক্র। এ-গেল যান্ত্রিক দিক। এই ব্যবস্থার সঙ্গে অভিনয়ের কার্যকালের একটা সামঞ্জস্য হওয়া দরকার। পোটোদের হেলপার একটি ছেলে ছিল, তাকে শিশুপালরূপী-রাধিকাবাবুর ডামি তৈরি করা হ'লো। যেমন ক'রে আমাদের বৃষকেতুর মস্তকচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়েছিল, অনেকটা তেমনি ব্যবস্থাই হ'লো আর কী। ছেলেটি অবিকল রাধিকাবাবুর পরিচ্ছদ-কিরীট-তরবারি এসব ধারণ করলে। তার মাথার ওপরে শিশুপালের কিরীট-শোভিত নকল মুণ্ড। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ আর ওদিকে শিশুপাল সহ অন্যান্য রাজগণ। শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে সুদর্শন আহ্বান করলেন, আর এদিকে শিশুপালসহ অন্য রাজগণও চঞ্চল হয়ে উঠলেন—এই সুযোগে রাজারা আসল শিশুপালকে তাদের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে 'নকল শিশুপাল'কে এগিয়ে দিতো। চক্র নেমে আসতে লাগত কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। এরই মধ্যে ঘটে যেতো ঘটনাটা। চক্র এসে মস্তকচ্ছেদ করত "ডামী শিশুপাল"-এর, শিশুপাল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে সব—আর 'নকল মুণ্ডটা' ছিটকে পড়ে গেছে। আর ছেলেটা দু'টি হাত নাড়ছে আর যথাযোগ্য অঙ্গবিক্ষেপ প্রদর্শন করছে। দর্শকদের বিপুল করতালির মধ্যে নেমে আসত ড্রপ।

আরও একটি মায়া-দৃশ্য ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ'তে। বসুদেবের কারাগৃহ। বসুদেব ও দেবকী। স্টেজের বাঁ পাশে থাকত কারাগারের 'সেল'-এর মতো—সামনে লোহার গরাদ দেওয়া। তারই ভিতরে বসে দেবকী ও বসুদেব বিলাপ করতেন। কংসবধ করবার ঠিক আগের ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদে ঢুকে কারাগার থেকে যখন মুক্ত করতে যাচ্ছেন পিতামাতাকে, ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠছেন 'পিতা-পিতা' বলে আর পরিচয় পেয়ে বসুদেব হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বঞ্চিত পিতৃহৃদয় সন্তানকে বুকে ধারণ করতে পারছে না, বুকে লাগছে কারাগৃহের লৌহদণ্ড, তাই তিনি বলছেন—

"ওরে, লৌহদণ্ড কী কঠিন ব্যবধান—
এই প্রসারিত বক্ষ—বাহু—
কিন্তু স্পর্শিতে না পারি তোরে,
ওরে মোর আনন্দ-বিগ্রহ !"

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—পিতা! কোথা লৌহ?

পিতৃস্নেহে পাষাণে প্রবাহ বহে
হের, লৌহদ্বার ধরিয়াছে বাষ্পের আকার!

ট্রিকের দরকার হতো এখানেই। দুটি লৌহদণ্ড বাষ্পের আকার ধারণ করে অদৃশ্য হবে, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন বসুদেব ও দেবকী। লোহার গরাদ যে রকম মোটা করা হ'তো কাঠ দিয়ে রঙ করে, ঠিক তেমনি আকারের দু'টি রবারের নল লাগানো থাকত—অবিকল গরাদগুলির মতো। স্টেজের নীচে প্লাটফর্মে থাকত ছিদ্র করা—যা দিয়ে নল দু'টি দরকার মতো অদৃশ্য হতে পারে। পাটাতনের নীচে নলের সঙ্গে ফিট করা কিছু ওয়েট বা ভারবস্তু থাকত, যার ফলে ইচ্ছামতো নল দু'টিকে মুহূর্তে ছিদ্র মধ্য দিয়ে নীচে অদৃশ্য করে দেওয়া সম্ভব হ'তো। এবারে বাষ্পের ব্যবস্থা। ঐ যে গরাদগুলি লাগানো আছে, তাতে রবারের নল দু'টির ঠিক নীচে কাঠের আড়ালে রাখা হ'তো একটা টিনের চোঙা, যাতে রাখা হতো ফ্ল্যাশ পাউডার। এর সঙ্গে ইলেকট্রিক তারের থাকত সংযোগ। সুইচ টিপে দিলেই বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটত, আর সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্ল্যাশ' হতো, তারপরে ধোঁয়া। ঐ মুহূর্তে পুলির সাহায্যে নল দু'টি ঠিক ছিদ্র দিয়ে নীচে চলে গেছে, যা লোহা দিয়ে প্রথমে চেষ্টা করা হয় কিন্তু তা'তে কাঠ বা লোহা একটু বেঁকে গেলেই আটকে যাচ্ছিল, কিন্তু রবারে আর কোনো অসুবিধা রইল না। এতে ফল যা পাওয়া গেল তা চমৎকার! এও করেছিলেন রাজা বোস। এতেও প্রবল করতালি উঠত দর্শকবৃন্দের মধ্যে।

'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকটি ছিল—'শ্রীকৃষ্ণ'কে কেন্দ্র করে পুরো মহাভারতখানা বললেও চলে। বেশ বড়ো বই। চরিত্রও ছিল বহু। অভিনয় হতো ভালো। ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপাল, দুর্যোধন, অর্জুন, প্রাপ্তি, অস্তি,—এসব চরিত্রগুলি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। অভিনয়ের দিক থেকে আমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার আছে। 'ঋষির মেয়ে'তে আমি করেছিলাম

'অগ্নিবর্ণ', সেই থেকেই এ পর্যায় আমার শুরু হয়েছে বলা চলে। 'কস্টুম প্লে'তে আমার অভিনয় সম্পূর্ণ সাবলীলতা লাভ করল ঐ 'অগ্নিবর্ণ' থেকে বলে আমার ধারণা। এর আগে আগে যে ভঙ্গিমারীতির আমি অনুসরণ করতাম, যার চমকটা তরুণদল গ্রহণ করেছিলেন বিস্ময়করভাবে এবং অনেক সময় আপত্তি করতেন প্রাচীনপন্থীরা, ঐ সময় সেটা আমি মনে মনে সবিশেষ বিচার করে দেখতে আরম্ভ করলাম। শুরু হয়েছিল আমার আত্মবিশ্লেষণ। যে 'প্যাণ্টোমাইম প্রিন্সিপল' ছিল আমার 'কস্টুম-প্লে'গুলির অঙ্গসঞ্চালনের ভিত্তিমূল, মনে হলো, তা' ঠিক আমাদের দেশের নিজস্ব জিনিস নয়। প্রতীচ্য দেশীয় ব্যক্তি হাত নাড়েন 'সোলডার জয়েণ্ট' বা কাঁধের মূল থেকে, পদক্ষেপের মূল গতিভঙ্গী আসে 'হিপ-জয়েণ্ট' থেকে। আমাদের তা নয়, আমাদের হস্ত সঞ্চালন শক্তি আসে কাঁধের মূল থেকেই বটে, কিন্তু বাহুমূল বা 'এলবো-জয়েণ্ট' থেকে তার প্রেরণা আসে। আপনার সঙ্গীকে দূরের একটা জিনিস দেখান। হাত দিয়ে দেখালেন ত বটেই, কিন্তু বাহুমূল বা 'এলবো-জয়েণ্ট'টা একটু ভাঙা। আপনার হাতটা বাহুমূল বা এলবো-জয়েণ্ট একটু কোণ তৈরি করেছে, তাই নয় কী? কিন্তু একজন সাহেবকে দেখুন। সে যখন আপনাকে হাত দিয়ে কিছু দেখাচ্ছে, তখন হাতটা সে সম্পূর্ণ সোজা করেই দেখাচ্ছে স্কন্ধমূল থেকে অঙ্গুলি পর্যন্ত যেন একটি সরলরেখা। আর পদসঞ্চারে আমরা জোর দেই হাঁটুর ওপরে বেশী, ওরা দেয় 'হিপ-জয়েণ্ট'-এ। গতিভঙ্গীর দিক থেকে এ' দু'টি প্রধান ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমাদের সঙ্গে ওদের চরিত্রগত তফাত। যেখানে সামাজিক বইয়ের অভিনয়, সেখানে ত' এ' প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু 'কস্টুম প্লে'র আবহাওয়া যখন অতীতের অথবা পুরাণের মানুষগুলিকে আপনি দেখাচ্ছেন, তখন তাদের চলন-বলনে একটি 'গ্রেস' বা 'সুষমা' আনলে ক্ষতিটা কী? হস্তবিক্ষেপে স্কন্ধমূল বা 'সোলডার জয়েণ্ট' এবং পদবিক্ষেপে 'হিপজয়েণ্ট' এই 'গ্রেস' সৃষ্টি করতে বিশেষ কার্যকরী। দেলসার্তের মতে—স্কন্ধ বা সোলডার হচ্ছে—"Thermometer of sensibility."

দেলসার্তের মতাবলী বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত সমালোচক 'মবার' বলছেন—"All gestures whether hand, wrist or elbow, must be carried from the shoulder. It is at the shoulder that all gestures join on with body."

আমি নিজে এই মতাবলম্বী ছিলাম, এবং তাতে ফলও পেয়েছি যথেষ্ট। আমার ধারণা 'গ্রেস' বা 'সুষমা' অভিনয়ের একটা মস্ত জিনিস। 'ছবির মতো সুন্দর করলে'—দর্শকদের এই উক্তি আমার মন থেকে কোনদিনই মুছে যায়নি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অভিযোগের কথা। ৩।৪।২৫ তারিখে 'বিজলী'তে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করে লিখেছিলেন—"অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে intellectuality-র প্রভাব বড়ই বেশী এবং emotional appeal or দরদের অভাব বড়ই প্রবল। অহীন্দ্রবাবুর অধিকাংশ অভিনয়ে আমাদের মনে হয় যে, অহীন্দ্রবাবু কী সুন্দর কী চমৎকার অভিনয় করছেন; কিন্তু আমরা তাঁর অস্তিত্ব ভুলতে পারিনি।"

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন, অভিনেতার ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে লীন হয়ে যায়নি। অভিযোগ যে ঠিক অসত্য, তা বলব না। ব্যক্তিত্ব ডুবিয়ে দিয়ে অভিনয় করার শক্তি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আমার অর্জন করা হয়নি। তার পরে, এই একটি বছর ধ'রে এ নিয়ে অনুশীলনও করেছি। তারই ফল পেয়েছিলাম—অগ্নিবর্ণে। অগ্নিবর্ণের বিলাসী এবং চরিত্রের মহিমান্বিত ভাব ও দরদ, অন্যদিকে সে শক্তিমান। দু'য়ে মিলে খানিকটা বেপরোয়া ভাব। 'অগ্নিবর্ণ'-র পর পেলাম 'দুর্যোধন' —মহামানী দুর্যোধনকে। এই দুই ভূমিকায়, বিশেষ করে দুর্যোধনের ভূমিকায়—'অহীন্দ্র চৌধুরী'র ব্যক্তিত্ব অনেকটা ডুবে গিয়েছিল বলে মনে হয়। যাঁরা সেদিনের অভিনয় আজও মনে রেখেছেন, তাঁরা বোধহয় এর সাক্ষ্য দিতে পারবেন। ততদিনে বুঝেছিলাম, অঙ্গভঙ্গী, ভাবাভিব্যক্তি প্রভৃতির সিলেকশনটাই হচ্ছে বড়ো কথা। কতখানি দেখাবো আর কতখানি দেখাবো না, এ' বিচারের শেষ নেই, এ' শিক্ষারও শেষ নেই। কথাতেই বলে—"We know that nature is not Art; Selection from nature is Art."

কাজেই এই যে সিলেকশনের সাধনা, এটা অভিনেতাকে সারাজীবনই করতে হয়।

যাই হোক, 'শ্রীকৃষ্ণ' চলতে লাগল শনি-রবিবারে, 'ঋষির মেয়ে' এলো মধ্য-সপ্তাহে। তারপরে জুন মাসে শিশিরবাবু 'কর্ণওয়ালিশ' মঞ্চে দ্বারোদ্ঘাটন করলেন 'নাট্যমন্দির লিমিটেড'-এর। জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত—এই ছ'মাস তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এর মধ্যে তিনি করছিলেন কর্নওয়ালিসের গৃহসংস্কার—বসবার আসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, ইত্যাদি। এতে কোম্পানীর যে টাকা উঠেছিল, তার অনেকখানিই ব্যয় হয়ে গেল। শুনেছিলাম, লক্ষ টাকার ওপর খরচা হয়ে গিয়েছিল এতে। ২৬শে জুন শনিবার রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' দিয়ে নাট্যমন্দিরের চলা হলো শুরু। এর আগে অবশ্য বুধবারে ২৩শে জুন আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করা হলো—'সীতা' দিয়ে। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি শিশিরবাবু নিজে। রাজা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। নক্ষত্র রায়—নরেশ মিত্র। জয়সিংহ—রবি রায়। রানী—চারুশীলা। অর্পণা—ঊষাবতী (পটল)। কৃষ্ণচন্দ্র দে সেজেছিলেন একটি অন্ধ ভিক্ষুক —তিনি গান গেয়েছিলেন। কিন্তু 'বিসর্জন' তেমন জমল না। পরে ওঁতে নরেশবাবুতে পার্ট বদলে বদলেও 'বিসর্জন' করেছেন। উনি করেছেন জয়সিংহ, নরেশবাবু রঘুপতি। কিন্তু এতেও বিশেষ কিছু হলো না। সম্ভবত এর পরের সপ্তাহে কিংবা তার কিছু পরেও হতে পারে—সঠিক মনে পড়ছে না —মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে খুললেন গিরীশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এতে শিশিরবাবু প্রথমে 'ভীম-শ্রীকৃষ্ণ-ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি পার্ট করলেও পরে বরাবর 'ভীম ও ব্রাহ্মণ'—পরস্পরবিরোধী এই দু'টি ভূমিকা করতে লাগলেন। এঁর সঙ্গের তখন 'কীচক' করতেন মনোরঞ্জনবাবু। অভিমন্যু —গায়ক ধীরেন দাস। দ্রৌপদী—প্রভা। উত্তর—চারুশীলা। উত্তরা—শেফালিকা (পুতুল)। বৃহন্নলা—রবি রায়। এ অভিনয় ওঁদের ভালো হ'লো। বিশেষ ক'রে 'ভীম ও ব্রাহ্মণ'-এর ভূমিকায় শিশিরবাবু চমৎকার অভিনয় করলেন। এ নাটকের প্রযোজনাতেও উনি সবিশেষ পরিশ্রম

করেছিলেন এবং তার ফলও হয়েছিল খুব ভালো। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

এই সময় আমি আবার অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। যখন 'শ্রীকৃষ্ণ' খোলা হয়, তখন থেকেই। 'অরোরার' অনাদিবাবু এসে বললেন—একখানা বই করে দিন এবার।

বললাম—দুখানা ছবি ত অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, আর কেন ?

উনি বললেন—ও যৌথ কারবারের কথা ছেড়ে দিন। কে কবে টাকা বার করবে, তারপরে ছবি হবে, সেসব অনেক দূরের ব্যাপার। আমার লোকসান নেই। যেসব শট তুলে এনেছিলেন আপনারা দার্জিলিং থেকে, পুরী থেকে, আর চিল্কা থেকে,—ও'সব ঠিক দেখবেন একদিন কাজে লেগে গেছে।

তা' হতে পারে। অনাদিবাবু তখন বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্গত কতকগুলি প্রচার ছবি তুলেছিলেন. কতগুলি ছবি ত আমিই করে দিয়েছি। অভিনয় করিনি অবশ্য। সেই ধরনের কোনো বইতে ওসব সত্যিই কাজে লেগে যেতে পারে।

ওঁর কথায় ভাবতে বসলাম। কী বই করা যায়। উনি পরামর্শ দিলেন—'কৃষ্ণ-সুদামা' করুন। আপনাদের 'কৃষ্ণ-সুদামা' ত দেখেছিলাম,—বেশ হবে। আমি তখন ম্যাডানের মাইনে করা অভিনেতা। তাই অভিনয় ত করতে পারব না, ডাইরেকশন দিতে পারি। অতএব অবিলম্বে শুরু হলো স্ক্রিপ্টের কাজ। অপরেশবাবুর 'সুদামা' থেকে সিনারিও করে দিলাম। আর্ট থিয়েটারেরই নবীন দলকে কাজে লাগিয়ে ছবি তোলা হলো। সন্তোষ সিংহ—সুদামা। ব্রজেন সরকার—শ্রীকৃষ্ণ। সুশীল ঘোষ—বণিক। তারকবালা (লাইট), ফিরোজাবালা, সরস্বতী—এরাও ছিল। স্টুডিওতে ত তোলা হয়নি, দাগার বাগান, গদাইবাবুর বাগান, সুরেনবাবুর বাগান—এসব জায়গায় কিছু তোলা হয়েছিল, আর কিছু তোলা হ'লো ঘাটশিলায়। ঘাটশিলার কতো কথাই না মনে পড়ে। ওখানে গিয়ে গিয়ে কতো ছবি তুলেছি! অনাদিবাবুকেও এক-একবার টেনে নিয়ে গেছি ঘাটশিলায়। কলকাতায় রাত্রে বসে-বসে 'এডিট' করেছি। ক্যামেরাম্যন ছিল দেবী ঘোষ। তার অ্যাসিস্টাণ্ট জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে বড়ো ক্যামেরা-ম্যান হয়েছিলেন। এখন আছেন তিনি ম্যাডানে—বিরাট প্রযোজকরূপে। অনাদিবাবুর ল্যাবরেটরী ছিল তখন রাজবল্লভ স্ট্রীটে। এখানেই রাত্রে বসে বসে এডিটিং চলত। এঁরাও রাত জাগতেন, অনাদিবাবু বারোটা বাজলেই শুতে যান—ওঁর হাঁপানীর টান ধরে। গাড়ি রেডি থাকত, আমার কাজ শেষ হ'তে হতে হ'তো আড়াইটে-তিনটে, তারপরে বাড়ি এসে শুয়ে পড়তাম। এই ভাবে হলো সেই ছবি। নির্বাক ছবি ত, তাই বাংলার বাইরেও বহু জায়গায় চলেছে—সমাদৃত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণ' চরিত্রে যে রকম অলকাতিলকা এঁকে দেবার নিয়ম, তেমনি দিয়েছিলাম। পাঞ্জাব থেকে নালিশ এলো—এত কেন ? একটিমাত্র বৈষ্ণবী তিলক—এই হচ্ছে তাঁদের নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে অতো আঁকা কেন ?

ছবি অবশ্য অনেক পয়সা এনে দিয়েছিল অনাদিবাবুকে। অনাদিবাবুর খুব আস্থা ছিল আমার ওপরে। আমিও খেটেই করে দিয়েছিলাম ছবিটা।

ওদিকে স্টারে আবার নতুন বই। ৭ই জুলাই মঞ্চস্থ হ'লো—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'লাখ টাকা।' অ্যাটর্নী 'রক্তবীজ' করলাম আমি। ফক্কারাম—রাধিকাবাবু। লক্কারাম—তুলসী চক্রবর্তী। ভুজঙ্গিনী—নীহার। চঞ্চলা—সুশীলাসুন্দরী। এই নাটকের অভিনয়ও বেশ জমেছিল। আমি একটি অভিনব মেক-আপ করতাম 'রক্তবীজ'এর ভূমিকায়। রক্তবীজ লোকটি স্থূলকায় কল্পনা করে নিয়েছিলাম। তাই তার গাল ফুলো—মোটা নাক। ক্যাভেণ্ডিস মর্টনের একটি মেক-আপের বই তখন পাওয়া যেতো, তাতে সেক্সপিয়রের সৃষ্টি বিখ্যাত চরিত্র 'ফলস্টাফ'-এর মেক-আপের বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। ছবি এঁকে এঁকে মেক-আপটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, কী-কী দ্রব্যের প্রয়োজন হতো, তার বর্ণনাও দিয়েছিলেন। আমি সেই ধাঁচের মেক-আপের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে 'রক্তবীজ'-এর পরিকল্পনা করলাম। সেটি এবার বলা যাক।

'রক্তবীজ' চরিত্রের মেক-আপের কথা বলছিলাম, তাই না? সাদা আর ঘন সিল্কের কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'মাস্ক' বা মুখোশের মতো করলাম। নাক-চোখ আর মুখের ফুটো রেখে ওটা বসিয়ে দিলাম মুখমণ্ডলে। ভিতরে-ভিতরে পুরে দিলাম বরিক তুলোর প্যাড। স্থূলকায় মুখমণ্ডল—ফুলো ফুলো গাল হলো দেখতে। কোলবালিশ আর তাকিয়ায় যেমন ওয়াড় পরানো হয় ফাঁস এঁটে, তেমনি ফাঁস তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল মাস্‌কৃটায়। সেটা গলার কাছে আটকে নিলাম ভালো করে। এর উপরে মাথায় চুল আর ঠোঁটের ওপরে বড় গোঁফ পরলেই হয়ে গেল। নোস্‌ পট্টির ওপর ব্রাউন রঙের কাছাকাছি একটা রঙ্‌ টেনে নিলাম। মোটা নাক, ফুলো গাল—তার ওপরে মাথায় চুল আর ঠোঁটের ডগায় গোঁফ—চেহারার ভোল একেবারে পাল্‌টে গেল। বুকেও অমনি তুলোর প্যাডিং নিয়েছিলাম, হাত দু'টোতেও—অম্‌নি সিল্কের দস্তানা ব্যবহার ক'রে। আঙলগুলো মোটা মোটা দেখাচ্ছে। অভিনয়ের সময় ফাঁক ক'রে রাখতাম আঙুলগুলো, হাতে একটা লাঠিও ব্যবহার করতাম মনে আছে।

আমাদের 'লাখ টাকা' হচ্ছে, ওদিকে মিনার্ভাতে ঐ জুলাই মাসেই নতুন বই খোলা হলো—অমৃতলাল বসুর লেখা নতুন নাটক 'ব্যাপিকা বিদায়'। অমৃতলাল বসু মশাই ওঁদের জন্য শুধু যে নতুন বই-ই লিখে দিলেন তা নয়, নিজে পরিচালনায় পর্যন্ত অবতীর্ণ হলেন। বইখানি হাস্যরসাত্মক বই-ই বটে, কিন্তু ওঁর সুষ্ঠু পরিচালনায় ও শিক্ষকতায় বইখানি অভূতপূর্ব সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করল। অমৃতলাল পুরোনো স্টেজের লোক, ভয়ানক 'স্ট্রিক্ট' প্রডিউসার বলা চলে। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওঁর তীক্ষ্ণনজর, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। মহলা দিয়ে বই ঠিক মতো তৈরি না হলে বা ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যা যা প্রয়োজন সব মনের মতো না হওয়া পর্যন্ত বই খুলতেই দেবেন না উনি। ফলে, অদ্ভুত সাফল্যলাভ! 'ব্যাপিকা বিদায়' দিয়ে মিনার্ভার আসর সরগরম করে তুললেন অমৃতলাল। 'ব্যাপিকা' কথাটার অর্থ কী বলব? ইংরাজীতে যাকে বলে 'শ্রু'। বাংলায় চঞ্চলা, প্রগলভা, ধিঙ্গী, এসবও বলা যায়। এই ব্যাপিকার ভূমিকায় নগেন্দ্রবালা নাকি অদ্ভুত অভিনয় করেছিলেন। আমি দেখিনি, কিন্তু

প্রচুর সুখ্যাতি শুনেছি। সঞ্জীব চৌধুরী সেজেছিলেন কুঞ্জবাবু, ঘনশ্যাম—হীরালাল চাটুজ্যে। লিলি—সুবাসিনী। এঁরাও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন, আঙুরবালাও একটি চরিত্রে খুব নাম করেছিলেন। মোটকথা, 'ব্যাপিকা বিদায়' দেখতে দেখতে এমন জমে গেল যে, সমস্ত থিয়েটারকেই বেশ চঞ্চল করে তুলল। শুনলাম, শিশিরবাবু চেষ্টা করছেন অমৃতলালকে নেবার জন্য। স্টার থেকে গেলেন প্রবোধবাবু। তবে বই নেবার জন্য, দলে নেবার জন্য নয়। কারণ দলে আনতে গেলে—কী পদে আনা যায়? নাট্যাচার্য রয়েছেন দানীবাবু, ম্যানেজার রয়েছেন—অপরেশবাবু। ওঁর জন্য ওঁর সম্মানের উপযুক্ত পদমর্যাদা চাই ত? তাই শুধু বই নেবার জন্যই গেলেন প্রবোধবাবু। উনি বললেন—আচ্ছা, দেবো বই। কিছুদিন পরে আবার তাগাদা দিতে গেলেন প্রবোধবাবু। রসরাজ আশ্বাস দিয়ে বললেন—দেবো-দেবো।

অমৃতলালকে নিয়ে থিয়েটারে থিয়েটারে এই যে টানাপোড়েন চলেছিল, সে সম্পর্কে তখন 'বঙ্গ রঙ্গালয়' বলে একটি পত্রিকা ১০ই ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল তারিখে (২৭শে আগস্ট, ১৯২৬) একটি মন্তব্য করেছিলেন, সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি,—"রসরাজ অমৃতলাল বুড়ো বয়সে 'ব্যাপিকা বিদায়' লিখিয়া এবং অভিনয় করাইয়া নূতন করিয়া যে নাম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আর্টের দলের অনেকেরই দেখিতেছি দম বেদম হইবার যোগাড় হইয়াছে। চক্ষু টন টন করিতেছে—বুক চড়চড় করিয়াছে—সর্বনাশ! আর্টের যে মান যায়—স্বয়ং 'নাচঘর' পর্যন্ত 'ব্যাপিকা বিদায়'কে সার্টিফিকেট দিয়েছে। জোড়াসাঁকোর সাহায্য না লইয়াই মিনার্ভা জোড়াসাঁকোকে উঁচাইয়া গিয়াছে—অতএব—ছোট বুড়ার কাছে, নাও বুড়াকে আর্টের দলে টানিয়া। কিছুকাল হইতে অমৃতলালের বাড়ির রোয়াক থিয়েটারের কর্তাদের আনাগোনার চোটে ক্ষয় হইয়া গেল। টানাটানির চোটে বুড়ার বুঝি এবার প্রাণ যায়! এ যে দেখিতেছি "গুণ হইয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।"

ইতিমধ্যে ২৩শে জুলাই, শুক্রবার, আমাদের আরেকখানি নতুন বই খুলে গেল—বিশ্বকবির 'শোধবোধ'। 'কর্মফল' বলে ওঁর যে গল্প ছিল, 'শোধবোধ' তারই নাট্যরূপান্তর। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, নথিপত্রের সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায়, 'শোধবোধ' 'গৃহপ্রবেশ'-এর আগের রচনা। অভিনীত হ'ল গৃহপ্রবেশের পরে। 'শোধবোধ'-এর উদ্বোধন যখন হয়, কবি তখন বিদেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। 'গৃহপ্রবেশ'-এর পর থেকেই ওঁর সঙ্গে নতুন নাটক নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। মে-মাসে কবি ইয়োরোপ যাত্রা করেন। মার্চের গোড়ায় তিনি পূর্ববঙ্গ সফর শেষ করে কলকাতায় এসেছেন, প্রবোধবাবু গেলেন দেখা করতে। আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম তারই পরের দিন। 'শোধবোধ'-এর ভূমিকালিপি বললাম। বললাম—সতীশের মেসোমশাই শশধরের পার্ট করছি আমি। আর—আমার কথায় বাধা দিয়ে কবি বলে উঠলেন—না—না তুমি মেসোমশাই করবে কী? জোয়ান ছেলে তুমি। তুমি করবে সতীশ।

অতএব, ওঁর আজ্ঞায় 'সতীশ'ই শেষ পর্যন্ত করলাম আমি। রাধিকাবাবু করছিলেন মিঃ

নন্দীর পার্ট, শশধর আমি না করায়, উনি দুটো পার্টই করতে লাগলেন—শশধর ও মিঃ নন্দী। মন্মথ করলেন দুর্গাপ্রসন্ন বসু। মিঃ লাহিড়ী—কনকনারায়ণ। মাসী সুকুমারী হ'লো সুশীলাসুন্দরী। নলিনী বা নেলী হলো—নীহার। চারুবালা—সরস্বতী।

কবি আমাদের 'শোধবোধ' দেখেছিলেন অনেক পরে—ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে। 'শোধবোধ'-এর মহলার ব্যাপারে একটা অভিনব অধ্যায় হয়েছিল, সেটা হচ্ছে—ড্রেস রিহার্স্যাল। এর আগে থিয়েটারে রিহার্স্যাল অনেক রকমই হয়েছে, ফুল রিহার্স্যালও হয়েছে, কিন্তু, যতদিন আমি স্টেজে ঢুকেছি, ততদিনে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে পূর্ণ মহলা দেওয়া, এ কখনো হতে দেখিনি এর আগে। সপ্তাহে যে-সব দিনে আমাদের অভিনয় হতো তারই একটি দিন অভিনয় বন্ধ রেখে ড্রেস-রিহার্স্যাল দেওয়া হলো 'শোধবোধ'-এর। অভিনয় কেমন হয়েছিল তার একটু খবর সেদিনকার 'নাচঘর' পত্রিকার সমালোচনা থেকে শোনানো যাক। 'নাচঘর'এ ১০-৯-২৬ তারিখে হেমেন্দ্রকুমার রায় (তখন সম্পাদক নন) একটি সমালোচনা প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, সতীশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় তেমন উচ্চশ্রেণীর হয়নি। আমি এ মত সমর্থন করি না। সতীশের ভূমিকার অভিনয় যেমনধারা হওয়া উচিত, অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় হয়েছে ঠিক সেইরকমই। সকল ভূমিকাতেই চমকদার অভিনয়ের প্রত্যাশা করা রসিকের লক্ষণ নয় এবং সতীশের ভূমিকার উপরে অহীন্দ্রবাবু যে অতিরিক্ত রং চড়াননি, এতে তাঁর সূক্ষ্ম কলাকুশলতাই প্রকাশ পেয়েছে।"

হেমেন্দ্রবাবু রাধিকানন্দর দ্বৈত ভূমিকারই খুব প্রশংসা করেছিলেন, কনকনারায়ণের প্রশংসা করেছিলেন, আর করেছিলেন বিশেষভাবে নীহারবালার ভূমিকা। লিখেছিলেন—"তিনি অভিনয়ের দ্বারা নলিনীর ভূমিকাটি চোখের সামনে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর গানের ভাবাভি-ব্যক্তিও হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে কঠিন ভূমিকাভিনয়ে এই অভিনেত্রী সম্প্রতি যে অপূর্ব যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন, সেজন্য মুক্তকণ্ঠে তাঁর সুখ্যাতি না করে পারা যায় না।" সাধারণভাবে আরও একটি মন্তব্য করেছিলেন হেমেন্দ্রবাবু। লিখেছিলেন—'এ' নাটকাভিনয়ের শিক্ষাগুরু কে তা জানি না, কিন্তু তিনি যিনিই হোন, নিশ্চয়ই পাকা লোক। তাঁর শিক্ষাদান সার্থক হয়েছে।"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে জানানো দরকার, আর্ট থিয়েটারে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে, তাতে বিশেষ কেউ যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা নয়, নাট্যকার রিডিং দিয়ে দিয়েছেন, সেই রিডিং ছিল আমাদের কাছে ভিত্তি। আবার, মেয়েদের আলাদাভাবে রিডিং দিয়ে দিতেন অপরেশবাবু। তাদের পার্টগুলো দুরস্ত করিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের এইসব নাটকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এমন কেউ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের রিডিং-ও আলাদা-ভাবে প্রয়োজন হতো না, অভিনয়ের সমস্ত মুভ্‌মেণ্ট ও কম্পোজিশন আমরা নিজের চেষ্টায় ও

পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া দ্বারা গঠিত করে নিতাম। 'শোধবোধ'এর রিহার্স্যাল যথেষ্ট হয়েছে, ড্রেস-রিহার্স্যাল পর্যন্ত হয়েছে, তাই 'শোধবোধ' প্রথম রাত্রি থেকেই হলো—'পারফেক্ট।' আমার দিক থেকে একটা অসুবিধা বোধ করেছিলাম—শেষ দৃশ্যে। এই দৃশ্যে—বাগানে—সতীশ পিস্তল নিয়ে প্রবেশ করল—অফিসের তহবিল তছরূপ করেছে—তারই প্রতিক্রিয়ায় আত্মহত্যা করা তার অভিলাষ। এ দৃশ্যের উপস্থাপনা যেভাবে আছে, তাতে প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, অতি নাটকীয় না হয়ে যায় অভিনয়টা! কারণ, যেভাবে আগের দৃশ্যগুলি এসেছে, তার তুলনায় এই দৃশ্যটি মেলোড্রামাটিক্। সেজন্য, কবির কাছ থেকে দুদিন আমি রিডিং নিয়ে নিলাম। এই রিডিং আমার অভিনয়ের আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, অভিনয় কোথাও অতি-নাটকীয় হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি। অবশ্য শোধবোধের এই শেষ দৃশ্যটির জন্যই অনেক নাট্যরসিক এটিকে উচ্চাঙ্গের নাটক বলেন নি।

'শোধবোধ'-এর পর ৫-৮-২৬ তারিখে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গিরীশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' হলো স্টারে। ভীম করলেন দানীবাবু, শ্রীকৃষ্ণ—রাধিকাবাবু। কঞ্চুকী—তিনকড়িদা। দণ্ডী—দুর্গাদাস। ঘেসেড়া—কাশীবাবু। সুভদ্রা—সুশীলাসুন্দরী (বড়ো)। উর্বশী—রাণীসুন্দরী। ঘেসেড়ানী—নীহারবালা। কিন্তু 'পাণ্ডব গৌরব' ভালো জমল না। উপরি উপরি কয়েক সপ্তাহ অভিনয় হবার পর, এটি নিয়মিত আর হতো না, দানীবাবু থাকলে মাঝে মাঝে হতো, তখন ভূমিকালিপি বদলে যেতো অনেক। শুক্রবারের জন্য খোলা হলো বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরানী'—২০শে আগস্ট ঐ ২৬ সালেই। হরবল্লভ করলেন অপরেশবাবু। ব্রজেশ্বর—কনকনারায়ণ। ক্যাপ্টেন ব্রেনান—রাধিকাবাবু। প্রফুল্ল (দেবী)—রাণীসুন্দরী। দিবা—ফিরোজাবালা। নিশা—নীহারবালা। ঝি—কুমুদিনী (বেঁটে কুমুদ) আর ভবানী পাঠক—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় রাত্রি থেকে অবশ্য অন্য ভূমিকালিপি দেখা যেতে লাগল। হরবল্লভ সাজলেন তিনকড়িদা, ব্রেনান—ব্রজেন সরকার। আর সব যা ছিল, তা-ই রইল। এতে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। তবে এই বই ভালো হয়েছিল, চলেছিল অনেকদিন। এর পরে খোলা হলো—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' নামে একটি প্রহসন ২রা সেপ্টেম্বর। সত্যসিন্ধু—তিনকড়িদা, অলীকবাবু—রাধিকানন্দ, গদাধর—আমি, প্রসন্নময়ী—সুশীলাসুন্দরী (বড়ো), হেমাঙ্গিনী—নীহার।

এই অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতবাজার ১২ই সেপ্টেম্বর লিখলেন—

"Radhikananda Babu's success has been great and it would have been still greater had he not over-acted his part on some occasions. Tinkari Babu well represented "Satya Sindhu"—the frank old father of Hemangini. As for Ahin Babu's different impersonation of Godadhar, Natubhai, the Chinaman and Jagadish, the second proved by far the greatest success both in point of make-up and acting. But his drowsiness in the third role deserves special mention."

ওদিকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর—শিশিরবাবু খুললেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' ও সঙ্গে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা গীতিনাট্য—'মুক্তার মুক্তি'। মিত্র থিয়েটার 'শ্রীদুর্গার' পর ক্ষীরোদপ্রসাদের নতুন বই 'জয়শ্রী' ও ভূপেনবাবুর নতুন বই 'ডার্বি টিকিট' করলেন, জমল না। তাই পুরানো বই করছিলেন। অমৃতলালকে নিয়ে এসে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নাট্যরূপ 'ভ্রমর' খুললেন। এ হচ্ছে সেপ্টেম্বরের গোড়াকার কথা। কৃষ্ণকান্ত করলেন অমৃতলাল। গোবিন্দলাল—নির্মলেন্দু। রোহিণী—তারাসুন্দরী। হরিয়া চাকর—নৃপেন বোস। ভ্রমর—কুসুমকুমারী। এ বই চলা উচিত ছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ ভূমিকা-বণ্টনের জন্যই ভ্রমর চলল না। তারাসুন্দরী কুসুমকুমারীদের কি আর যুবতী নায়িকার ভূমিকায় মানায়? ভেবেছিলেন, ওঁদের নামে চলবে, কিন্তু তা চলল না।

নাট্যাচার্য অমৃতলালের কাছে আমরা যে বই চেয়েছিলাম, তা আর হলো না দেখা যাচ্ছে। তিনি রয়েছেন মিত্র থিয়েটারে—বই লিখলে ওদেরই দেবেন, আমরা ওঁর কাছ থেকে আর বই পাই কী করে?

ইতিমধ্যে হলো কী, ঐ যে অরোরার হয়ে ছবি করেছিলাম, 'কৃষ্ণসখা' (সুদামা) তারই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনাদিবাবু এসে বললেন—আরেকখানা করুন। 'নবযৌবন' বইখানা আমাকে দিয়েছিলেন সিনারিও করতে। সিনারিও করতে করতে দেখি, গল্পটি ত মন্দ নয়! সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত পরের কালটি বেছে নিয়েছেন নাট্যকার, উত্তর প্রদেশের তালুকদারদের নিয়ে গল্প, হাসির ফোয়ারা, এ গল্প সারা ভারতেই চলবে। বই পুরানো, কিন্তু সিনারিওর জন্য কাটছাঁট করতে গিয়ে মাথায় হঠাৎ একটা আইডিয়া এলো। প্রবোধবাবুকে গিয়ে বললাম—অমৃতলালের বই খুঁজছিলেন, নবযৌবনটা করলে কেমন হয়?

প্রথমটায় শুনে তেমন উৎসাহিত বোধ করেন নি। বললেন—ও-বই মিনার্ভায় হয়েছিল, জমেনি। ও বই করে কী হবে? আমি বইটায় যেরকমভাবে এডিট্ করেছি, সেটা এনে ওঁকে দেখলাম। প্রচুর কাটাকুটি করেছি, সিনের অদলবদলও করেছি। উনি দেখেশুনে শেষ পর্যন্ত বললেন—আচ্ছা,করো।

প্রবোধবাবু উৎসাহিত হয়ে পোস্টারও লাগালেন। এইসব হতে হতে—পুজো এসে গেল। পুজোর সময় স্টারের প্রোপ্রাইটারদের জন্য একটা 'বেনিফিট্ নাইট্' দেওয়া হতো। সেটা এবার হলো ২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার—পুরো নাটক হলো চন্দ্রগুপ্ত, সঙ্গে নির্বাচিত দৃশ্যাভিনয়। এর মধ্যে 'ওথেলো' নাটকের একটি দৃশ্যও অভিনীত হলো। দেবেন্দ্রনাথ বসু যে ওথেলোর অনুবাদ করেছিলেন, সেটিরই একটি দৃশ্য। আমি করলাম—ওথেলো, দুর্গাদাস—ইয়াগো। এই বই পুরো অভিনয় হয়েছিল এই স্টারেই—১৯১৯ সালে মার্চ মাসে—প্রবোধবাবুই প্রডিউস্ করেছিলেন। ওথেলো করেছিলেন তারক পালিত, ইয়াগো—অপরেশচন্দ্র, ডেস্‌ডিমোনা—তারাসুন্দরী। আমাদের অভিনয়ের দিন আরও সব নির্বাচিত দৃশ্যাবলী ছিল—তাজ্জব ব্যাপার, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি। আমাদের 'ওথেলো' কিন্তু লোকে খুব নিয়েছিল। সেইজন্য উৎসাহিত হয়ে পরের সপ্তাহেই—এক বিশেষ অভিনয় রজনীতে—ম্যাকবেথ-এর নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করা গেল। ঐদিন—বুধবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর—

গিরীশচন্দ্রের মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ অভিনয় আমাদের স্টারে। গিরীশচন্দ্রের মূর্তিটি প্রস্তুত হয়ে এসে সাহিত্য পরিষদে পড়ে ছিল, দেশবন্ধু গিরীশচন্দ্রের নামে 'গিরীশ পার্ক' নামও রেখে গেছেন, অথচ, মূর্তি আর বসানো হয় না, অর্থের দরকার। সেইজন্যই ঐ বিশেষ অভিনয়। গিরীশচন্দ্রের 'শাস্তি-কি-শান্তি'র পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা হলো। ওতে আমার কোন ভূমিকা ছিল না, তাই পূর্ণ উৎসাহে 'ম্যাকবেথ'-এর একটি দৃশ্য অভিনয় করা গেল, 'ম্যাকবেথ'ও গিরীশচন্দ্রের অনুবাদ। আমি করলাম- ম্যাকবেথ আর সুশীলাসুন্দরী (বড়ো)—লেডী ম্যাকবেথ। 'ওথেলো'র পোশাক পড়ে ছিল ওই স্টারেই, তাই 'ওথেলো'র পোশাক নিয়ে ভাবনা ছিল না, কিন্তু 'ম্যাকবেথ?' তৈরি করে নেওয়া হলো। জালি ডাস্টার পাওয়া যেতো একরকম, তাই এনে ব্রোঞ্জ রঙ্ করিয়ে দিয়ে—প্রবোধবাবু তৈরি করিয়ে দিলেন বর্ম। মেক্-আপের জন্য ভাবনা নেই। স্যর হারবার্ট বীরভোম ট্রি-র 'ম্যাকবেথ'-রূপে ছবি ছিল আমার কাছে, সেটিকে অনুসরণ করে—সেইরকম চুল—সেইরকম গোঁফ—সবই করেছিলাম। "শাস্তি কি শান্তির" ভূমিকালিপি ছিল সেদিন—দানীবাবু—প্রসন্নকুমার। তিনকড়িদা—পাগল। রাধিকানন্দ—প্রকাশ। প্রফুল্ল সেনগুপ্ত—ঘেঁচি। ননীগোপাল মল্লিক—সর্বেশ্বর। সন্তোষ দাস (ভুলো)—হেবো। মনীন্দ্র ঘোষ—মিঃ বাসু। সন্তোষ সিংহ—ম্যাজিস্ট্রেট। নীহার করতেন—হরমণি। রাণীসুন্দরী—ভুবন। সরস্বতী—প্রমদা। নন্দরাণী—চিত্তেশ্বরী। কোহিনূরবালা—পার্বতী। এ বইয়ের অভিনয় কিছুদিন চলেছিল।

৫ই অক্টোবর হলো—আর্টিস্টদের 'বেনিফিট নাইট'। পুজোর সময়—অল্প বেতনভুক শিল্পী ও কর্মীবৃন্দের জন্য। অর্থাৎ, একশো টাকার মধ্যে যাদের বেতন, টাকাটা তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এদিন 'চন্দ্রশেখর' ছিল, এর সঙ্গে খুলে দেওয়া হলো—'নবযৌবন'। এ বই প্রথম অভিনীত হয়েছিল—৫ই পৌষ, ১৩২০ সালে—মিনার্ভায়। ১৯১৩ সালের বড়দিনের আগে আর কী! বসন্তকুমার—অমৃতলাল নিজে। দর্পনারায়ণ—প্রিয়নাথ ঘোষ। ফুলচাঁদ—মিঃ পালিত। তিলকচাঁদ—অপরেশচন্দ্র। ভজনরাম—অহীন্দ্র দে। অলকা—তারাসুন্দরী। সুকুমারী—সরোজিনী (নেড়ী)। এই সরোজিনীই হচ্ছেন চন্দ্রগুপ্তের সর্বপ্রথম 'হেলেন'। অনেক বড়ো বড়ো পার্ট করেছেন ইনি, ভালো অভিনেত্রী ছিলেন। তুলসী করেছিলেন—হেমন্তকুমারী। সুর-সংযোজনা—দেবকণ্ঠ বাগচী। নৃত্য—সাতকড়ি গাঙ্গুলী (কড়িবাবু), দৃশ্যপটাদি—কালীচরণ দাস। ইনি বহুদিনের স্টেজ-ম্যানেজার। পুরোনো মিনার্ভা থেকে মনোমোহন যতদিন ছিল, ততদিন ছিলেন উনি ঐ স্টেজ-ম্যানেজার। 'নবযৌবন'-এ আমাদের ভূমিকাবন্টন হলো এইভাবে: দর্পনারায়ণ—আমি। ফুলচাঁদ—রাধিকাবাবু। তিলকচাঁদ—কনকনারায়ণ। ভজনরাম—কাশীবাবু। অলকা—নীহার। সুকুমারী—ফিরোজাবালা। তুলসী—রাণীসুন্দরী। বসন্তকুমার (নায়ক) সাজল—সুশীলাসুন্দরী। মিনার্ভায়ও অসুবিধে, এখানেও অনেকটা তাই। সেখানে সাজতে হয়েছিল বৃদ্ধ অমৃতলালকে, এখানে উপযুক্ত নায়ক না পাওয়ায় একটি মেয়েকে। সুশীলা অভিনয় করেছিল ভালো, কিন্তু আমরা সেদিন অনুভব করেছিলাম

দুর্গাদাসের অনুপস্থিতি। এই ভূমিকাটি যেন ওরই জন্য লিখিত। ওকে যদি পাওয়া যেতো ত সোনায় সোহাগা হতো। মিনার্ভায় অবশ্য এ নাটক না জমবার কারণ আছে। এতসব দীর্ঘ স্বগতোক্তি ও সংলাপ আছে যে, সে-সব বলতে গেলে মূল ঘটনাই হারিয়ে যায়। অমৃতলাল নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। বইতে সবই তিনি ছেপে দিয়েছেন, কিন্তু ভূমিকাতে লিখেছেন—অভিনয়কালে কিছু কিছু অংশ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। পাঠকরা জানেন, আমার সেই বান্ধবসমাজ থেকেই এডিট্ করা অভ্যাস ছিল। বহু বই-ই তখন এডিট্ করেছি, তার মধ্যে গিরীশচন্দ্রের রামায়ণ সংক্রান্ত যাবতীয় রচনার একীকরণ করে একটি সংকলন করেছিলাম, সেটাই ছিল তখনও আমার তৃপ্তির কারণ, যদিও ওটি আর আসরে গাওয়া হয়নি।

এডিটিং যতপ্রকার আছে কচুকাটা, কুরে কাটা, জুড়ে কাটা—সবগুলিই 'নবযৌবন'-এ লেগেছিল, একমাত্র 'মুড়ে-কাটা'টা বাদে। তার বদলে কচুকাটাই করেছি। চার অঙ্ক—১৬টি দৃশ্য ছিল, আমি কেটে চার অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্যে নাটকটিকে দাঁড় করিয়েছিলাম। সেট্ ছিল মাত্র তিনটি। একটি দর্পনারায়ণের উদ্যান। একটি দর্পনারায়ণের দ্বিতলবাটির অলিন্দ, অলিন্দ দিয়ে সিঁড়ি নেমে এসেছে। তার একদিকে চাতাল—এখানে বসে বসে তিনি রামায়ণ শোনেন। আর একটি দৃশ্য ছিল, সেটি হচ্ছে —মেলার দৃশ্য। দর্পনারায়ণের ঠাকুর-প্রাঙ্গণে একটি গ্রাম্য মেলা বসে, তার দৃশ্য। হিমালয়ান ফুট্ হিল্‌সে যতরকম পাখি পাওয়া যায়, তার সবগুলিই যোগাড় করেছিলেন প্রবোধবাবু। পায়রা থেকে শুরু করে, বৌ-কথা কও, চোখ গেল, ময়ূর, কোন্‌টা বাদ গেছে? খাঁচা-ভর্তি পাখি, পা-বাঁধা ময়ূর, অন্যদিকে নাচ, ম্যাজিক, এমন কি সার্কাসের তাঁবু পর্যন্ত। তুলসী চক্রবর্তী ড্রাম বাজিয়ে লোক ডাকছে—নাকের উপর লাঠি বসিয়ে ব্যালান্স দেখাচ্ছে, বল লোফালুফি করছে। তুলসী না জানত এমন কাজ নেই! জিমন্যাস্টিক—পেশাদারী যাত্রা—গান গাওয়া—মন্দিরা বাজানো—কী নয়? প্রবোধবাবু আবার স্টেজ-এ পায়রা-ওড়ানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন। মেলায় গানও ছিল কিছু। পায়রাউলীদের গান। কৃষকবধূদের গান পায়রাউলীরা গাইছে—

"পায়রা পুষেছি হামি রকমরকম—
পায়ে নূপুর ঘুঙুর বাজে চোলে
ঝম্ ঝম্ ঝম্।"
মনে পড়ে কৃষক বধূদের সেই গান—
"কার সুখ দেখে চোখ-জলে তোর
গিয়েছিল প্রাণ—
তাই চোখ গেল—চোখ গেল—শিখলিলো
—এই জালার গান।"

কিম্বা—

"বুঝি বৌ কয়নি কথা অভিমানে
তাই জ্বালা জুড়িয়েছিল জীবনদানে
মরেছিল সাধ রেখে বাকী—
এসে জন্ম নিল হয়ে পাখি,
বলে 'বৌ কথা ক'—বৌ কথা ক'—
চেয়ে করুণ চোখে শূন্যপানে।"

এইরকম বহু নাচ-গানই ছিল 'নবযৌবন'-এ। 'নাচঘর' ৮ই অক্টোবর (২৬ সালে) লিখলে—"প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে নবযৌবনের অভিনয়ে স্টার থিয়েটার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মিনার্ভায় অভিনীত 'ব্যাপিকা বিদায়' ছাড়া অমৃতলালের আর কোনো নাটকের অভিনয়ে পূর্বে কখনো সেরূপ হয়নি। নবযৌবনের অপূর্ব দৃশ্যপটও নয়নাভিরাম। সাজসজ্জা 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর মঞ্চ-মাধুর্যকে সর্বরকমে পরাস্ত করেছে দেখা গেল। বিশেষভাবে এই নাটকের অভিনয়ে যে মেলার দৃশ্য দেখানো হয়েছে, বাঙলা রঙ্গমঞ্চের জন্ম হয়ে পর্যন্ত কখনো এ-দেশের কোনও রঙ্গালয়ে সেরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়নি। সারি সারি হোগলার ঘর বাঁধা বিরাট মেলাক্ষেত্র। কোথাও পাখির হাট, কোথাও চিত্রিত হাড়ি-কলসী বিক্রি হচ্ছে, কোথাও ফলমূল বিক্রয় হচ্ছে, কোথাও চানাচুরওয়ালা বসে গেছে, কোথাও সাপুড়ের খেলা চলেছে, কোথাও খেমটাওয়ালীদের নাচগান হচ্ছে, কোথাও মাদল বাজিয়ে সাঁওতালদের দল চলেছে, কোথাও সেই 'বালক কৃষ্ণ' সেজে ছেলেরা নেচে গেয়ে ভিক্ষা, করছে, পানের দোকানও বসেছে, নানা জাতের নানা রকমের দর্শক ও যাত্রীদের জনতায় মেলাস্থান পরিপূর্ণ। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর চমৎকার দৃশ্য। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগ কৌশলের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। দর্পনারায়ণের প্রাসাদতুল্য দ্বিতল অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনয় সকলের চেয়ে ভালো করেছেন অলকার ভূমিকায়—নীহারবালা। শ্রীমতী ফিরোজার সুকুমারীও সুন্দর হয়েছে। রাণীসুন্দরীর তুলসীও চমৎকার। দর্পনারায়ণের ভূমিকায় মেক্-আপের রাজা অহীন্দ্রবাবুর রূপসজ্জা যেমনি সুন্দর হয়েছিল, তাঁর অভিনয়ও ততোধিক চিত্তাকর্ষক। ফুলচাঁদের ভূমিকায় রাধিকা-বাবুর অভিনয়ও ভালো হয়েছে।"

বেঙ্গলী লিখেছিলেন, ১০ই অক্টোবর তারিখে—

"The role of Rai Darpanarayan, as portrayed by Mr. Ahindra choudhury is a character study well worthy of the talent of this brilliant star Alike in make-up, speech, gait, movements and expressiveness Mr. Choudhury likes the role. No wonder Amritalal himself, who came down to see his own play, was struck by Mr Chowdhury's characterisation and congratulated him as he desired,

in unmeasured terms...Mr. Radhikananda Mukherji interpreted the character of Phollchand, friend of Rai Darpanarayan to nicety. Unlike the Rai Sahib, he has suceeded in preserving his youth—at least externally. His weakness for women is well illustrated at the "Mela" whence he had literally to be dragged away."

আমার অভিনয়ের বর্ণনা পাওয়া যাবে অমৃতবাজারের সমালোচনায়। অমৃতবাজার ৩১।১০।২৬ তারিখে আমার ও রাধিকানন্দবাবুর সম্বন্ধে লিখেছেন—

—"The representation of Darpanarayan, an old man suffering from gout and infirmity, found always in flannel for fear of catching cold, dragging his heavy legs very painfully, leaning on his stick was made very life-like by Ahindra Babu. His usual voice also underwent complete change and the audience heard the hoarse voice of an old man, interrupted very much with coughing... Fulchand was a man full of vivacity and he showed that a man becomes old not in years but in his mind."

'নবযৌবন'-এর প্রযোজনা এবং কতকগুলি ভূমিকা সত্যিই সুন্দর হয়েছিল, কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর বলতে পারি না শুধু এইজন্য যে, 'তেজবাহাদুর' চরিত্রটি ম্রিয়মাণ মনে হয়েছিল, আর ভজনরাম—কাশীবাবু—অভিনয়ে একটু বাড়াবাড়িই করেছিলেন বলতে হবে। অবশ্য নাচ-গান মিলিয়ে পার্ট-টি ভাঁড়েরই পার্ট, করেও ছিলেন সেই-রকম, তবু একটু আতিশয্য ছিল। যেমন, একটা জায়গাতে, জমিদারকে নিয়ে মেলায় এসেছে ভজনরাম, সঙ্গে একটি মোড়া। যেখানে-যেখানে মেলা দেখবার জন্য দাঁড়াচ্ছেন দর্পনারায়ণ, সেখানে-সেখানে তাঁর জন্য চেয়ার পেতে দিচ্ছে বরকন্দাজরা, আর ভজনরাম করছে কী, মোড়াটা চেয়ারের পাশে রেখে নিজেও বসে পড়ছে। এই মোড়াটা উনি করেছিলেন কী, কোমরে বেঁধে নিয়েছিলেন, মোড়াটা ঝুলে থাকত ওঁর পশ্চাৎদেশে, লেজের মতো। যেখানে যেখানে বসবার দরকার, অমনি কোমর থেকে নামিয়ে দিচ্ছেন, আর বসছেন তার ওপরে। এটা না করে মোড়াটা হাতে করে রাখলেও পারতেন। কোমরে বাঁধার ফলে হাসির হুল্লোড় পড়লেও, রসিক দর্শকের কাছে ওটা ছিল আতিশয্য।

নায়ক বসন্তকুমারের ভূমিকায়—সুশীলাসুন্দরীর অবতরণের কথা পূর্বেই বলেছি। বসন্তকুমার খুব বড়ো ঘরের ছেলে—রাজকুমার—কিন্তু বাড়ি থেকে একটা ব্যাপারে অভিমান করে পালিয়ে এসে রয়েছেন দর্পনারায়ণের উদ্যানে—ছদ্মবেশে—মালী সেজে। সেখানে অলকা বলে আরও একটি মেয়ে এসে রয়েছে—পরিচয় না দিয়ে। ঐ মেয়েটিও উচ্চবংশসম্ভূতা। মালীর সঙ্গে হলো তার প্রেম। মন টানছে, অথচ দ্বিধা, শেষপর্যন্ত জীবনে গ্রহণ করতে হবে এক মালীকে? মালির দিক থেকেও তাই। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে হবে পরের বাড়িতে আশ্রিতা এক মেয়েকে? জনৈক রাজাবাহাদুরের ছেলে

সে, ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। অলকাকে ভালবেসেছে, মন টানে তার দিকে অথচ দ্বিধা যাচ্ছে না। এদের দুজনেরও ইতিহাস আছে। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এদের অভিভাবকদ্বয় এদের দুজনের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু, কেউ কাউকে না দেখে বিয়ে করবে না বলে, দুজনেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এবং এসেছে কোথায়? না, একই বাড়িতে। শেষপর্যন্ত দৈবযোগে সেই অভিভাবকদ্বয় আবার এসে উঠলেন এই বাড়িতেই—দর্পনারায়ণের অতিথি হয়ে। এখানেই সব রহস্য ভেদ হয়ে গেল। ফলে, দুজনের প্রেমের পরিণতি—বিবাহ। নায়কের ভূমিকায় সুশীলাবালা ভালো করলেও, মেয়েছেলে ত? লোকে নেবে কেন? আগেই বলেছি, দুর্গাদাসের অভাব কীভাবে আমরা সেসময় অনুভব করেছিলাম। দুর্গাদাস তখন অসুস্থ—থিয়েটারে নেই। অমৃতলাল অবশ্য ভুয়সী প্রশংসা করেছিলেন আমাদের 'নবযৌবন'-এর। 'বঙ্গদর্শন' বলে একটি পত্রিকা ১লা নভেম্বর লিখেছিলেন—"সেদিন নবযৌবনের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার স্বয়ং অমৃতবাবু আমাদের কাছে অহীন্দ্রবাবুর ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "অহীন্দ্রবাবু আমার দর্পনারায়ণের পরিকল্পনাকেও অভিনয়গুণে উঁচাইয়া গিয়াছেন।" অহীন্দ্রবাবু ইতিপূর্বে রবিবাবুর সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আজন্ম নাট্যকার, আজন্ম অভিনেতা, আজন্ম থিয়েটার-ম্যানেজার অমৃতবাবুর এই সুখ্যাতিকে আমরা আরও মূল্যবান বলিয়া মনে করি।"

এই নবযৌবনের এডিটিং-এর ব্যাপারে প্রবোধবাবু আমাকে শ্যামবাজার নিয়ে গিয়ে অমৃতলালের সঙ্গে যখন আলাপ করিয়ে দিলেন, তখন, যেমন তখনকার বৃদ্ধদের রীতি ছিল, তেমনি করে প্রশ্ন করলেন—কোথায় বাড়ি? বাবার নাম কী?

বললাম—বাড়ি ভবানীপুর। বাবার নাম—শ্রীচন্দ্রভূষণ চৌধুরী।

তামাক খেতে-খেতেই মুখ তুললেন তিনি, চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে, বললেন ভূষণবাবু?

—হ্যাঁ।

দুবার ঘাড়টা নেড়ে বললেন—তুমি আমার পরিচিত। তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের সেক্রেটারী। ঐ স্কুলে—তাঁর বাড়িতে—এর পর কতবার যে গেছি তার ঠিক নেই, সেই থেকে আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সেই যে আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ হয়ে পড়েছি, আজও পর্যন্ত তা অটুট আছে। আজও তাঁর নাতি নাতনীদের আমরা পরমাত্মীয়।

অমৃতলাল অপরেশবাবুকে স্নেহ করতেন—'অপরেশ' বলে ডাকতেন। সেদিন অভিনয় দেখে এত আনন্দিত হলেন যে, ওঁকে ডেকে বললেন—অপরেশ, তোমাদের বই দেবো।

সেইসময় কলকাতা কর্পোরেশনের একটা ইলেকশন আসন্ন ছিল। তখন থেকেই 'ভোট্ ভোট্' চীৎকার শুরু হয়ে গেছে। ঐ ভোটযুদ্ধকে ব্যঙ্গ করে—ভোটের ব্যাপারটা যে কতো অন্তঃসারশূন্য

—সেটা বুঝিয়ে—একটি নাটক লিখলেন অবিলম্বে, এবং সেটি মিত্র থিয়েটার বা মিনার্ভা নয়, দিলেন আমাদের। নাটকটির নাম 'দ্বন্দ্বে মাতনম্'।

ইতিমধ্যে ২৭শে অক্টোবর বুধবার রাধিকাবাবুর পরিবারে এক দুর্ঘটনা ঘটায় তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। ঐদিন ছিল 'শাস্তি-কি-শান্তির' অভিনয়, তিনি করতেন 'প্রকাশ' তিনি আর নামতে পারলেন না। অভিনয়ের দিন সকালেই থিয়েটারের আহ্বান এলো আমার কাছে। কী? 'প্রকাশ' করতে হবে, রাধিকাবাবুর বাড়িতে কে যেন মারা গেছেন, তিনি আজ নামতে পারছেন না। আকস্মিকভাবে কোনো ভূমিকায় নেমে যাওয়া নতুন নয় আমার পক্ষে, এবারেও তাই হলো। পরের দিন ২৮ তারিখে হলো 'কর্ণার্জুন'-এর ২৫০ রাত্রি। যেমন সমারোহ হয়, তেমনি হয়েছিল, তেমনি আলোকসজ্জা, তেমনি স্মারকপত্র ইত্যাদি। ৩১শে ডিসেম্বর হয়ে গেল আবার, 'শ্রীকৃষ্ণ'র পঞ্চাশৎ রাত্রি। যেমন মেডেল-দানের ব্যাপার হতো এবারেও তেমনি হলো। এদিন ছ'জন মেডেল পেয়েছিলাম আমরা। দানীবাবু, তিনকড়িদা, আমি, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, সুশীলাসুন্দরী ও নীহার। তারপরে শুরু হয়ে গেল "দ্বন্দ্বে মাতনম্"-এর প্রস্তুতি-পর্ব। অমৃতলাল নিজেই আমাকে পার্ট দিয়েছিলেন—'বাজ বাহাদুর।' বলেছিলেন—এ পার্টটা তুমি করবে।

বলে, চরিত্রটিও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শোভাবাজারের রাজবাড়ির একজন ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু ছিলেন—অসীমকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। এই 'অসীমকৃষ্ণ'-এর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই তাঁর বাজ বাহাদুর চরিত্রটির পরিকল্পনার মূল। কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে, চানাচুর কিনে খাচ্ছেন, কেমন হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে কথা বলছেন মাঝে মাঝে, আর কেমন সব বলছেন তাঁর উদ্ভট গবেষণার কথা, সে-সব বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অমৃতলাল। 'বাজ বাহাদুর' পণ্ডিত লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু পড়াশুনা করেও উদ্ভট সব ধারণা তাঁর। ইতিহাসের 'ই' যে বোঝে না তাকেও ডেকে-ডেকে ইতিহাস বোঝান তিনি। একটা জায়গার কথা বললেই চরিত্রটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন পাঠক। গুরুচরণ ভট্টাচার্য নামে জনৈক পুরুতঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করতে করতে বলছেন—"বেদ! বেদের বুঝেছেন কি? বেদ পড়েছেন ভালো করে? বেদ ত সেদিনকার লেখা, অদিতি চক্রবর্তীকে জিগগেস করুন গে; ফাইললজি ত জানেন না, তা বুঝবেন কী? বেদে যা সংস্কৃত আছে তা' বিক্রমাদিত্যের ঢের পরে।

গুরুচরণ ॥ আপনি যখন বলছেন।······

বাজ বাহাদুর ॥ আমি বল্‌ছি কি? একখানা ভন্‌গ্রাফ্‌বেজ্ঞীগালের বই আনান, আনিয়ে দেখুন। আরবদের ভেতর বেদুইন বলে একটা জাত ছিল; তারা যে গান গেয়ে লুট করতে যেতো, সেই গানগুলো জড় করে ব্যাসেৎ বলে একজন ইহুদি প্রথম পাবলিশ করে। বেদে সবিতা বলে একটা কথা আছে তো?

গুরুচরণ ॥ হ্যাঁ, সূর্যের আরেকটি নাম।

CALCUTTA.

রসরাজ ৺অমৃতলালের হস্তলিপি

'লাখটাকা' নাটকে রক্তবীজ : অহীন্দ্র চৌধুরী

রাজবাহাদুর॥ সূর্য! সূর্যি ছিল কোথায়? সিরিয়া থেকে সুরীয়, ক্রমে বাংলায় সূর্যি দাঁড়িয়েছে। ঐ সবিতা রাশিয়ার সোভিয়েট কথা থেকে হয়েছে, তা জানেন?"

যে ধরনের চলন-বলন মেক-আপ, অমৃতলাল বলে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি করেছিলাম। এই ছাব্বিশ সালেরই দশই নভেম্বর বুধবার সাড়ে সাতটায় প্রথম অভিনয় হলো "দ্বন্দ্বে মাতনম"-এর। ছোট বই, তাই বড়ো বইয়ের সঙ্গে দেওয়া হতো। প্রথমে এটা, তারপরে বড়ো বই। এদিন ছিল—কপাল-কুণ্ডলা। 'দ্বন্দ্বে মাতনম' সপ্তাহের প্রতি অভিনয়-রজনীতেই নানান বড়ো বইয়ের সঙ্গে হয়েছে। বুধবার কপালকুণ্ডলার সঙ্গে হলো, পরদিন—বৃহস্পতিবার ১১ই নভেম্বর হলো 'চন্দ্রগুপ্ত'-র সঙ্গে। 'চন্দ্রগুপ্ত'-র কথা প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, এইদিন 'চাণক্য' করেই দানীবাবু সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই শরীর তাঁর ভালো ছিল না, কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছিলেন ছুটি নেবার। এবার পেলেন ছুটি এবং স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে চলে গেলেন কলকাতার বাইরে—পশ্চিমেই কোথাও হবে—ঠিক মনে নেই। ফিরে এলেন অভিনয়-জগতে ছ'মাস পরে, ১৯২৭ সালে ২৫শে মে। কিন্তু সে-সব কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

"দ্বন্দ্বে মাতনম' সারা নভেম্বর ত চলে ছিলই, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্তও চলেছিল। সারা শহরও তখন মেতে গেছে ভোটরঙ্গে, আর আমাদের বইটাও জমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভোটের ব্যাপার নিয়ে এর আগে একটি মাত্র নাটক লেখা হয়েছিল। লিখেছিলেন গিরীশচন্দ্র। নাটক নয়, নাটিকা, রঙ্গনাট্য, নাম—ভোট মঙ্গল (বা 'সজাব পুতুল নাচ')—২২শে আশ্বিন ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে। ১৮৮২ সাল হবে আর কী।

এতে, গিরীশচন্দ্র নিজে "নাচওয়ালা" সাজতেন। ছোট বই, তবে অনেক গান ছিল এতে।

কিন্তু, যা বলছিলাম। 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' দেখবার জন্য অমৃতলাল অসীমবাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বলেছিলেন—দেখে এসো হে, অহীন্দ্র তোমার পার্টটা কেমন করছে।

অসীমবাহাদুর নিজে আসেননি, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর ছেলেরা এসেছিলেন থিয়েটার দেখতে। দেখে তাঁরা বুঝি অমৃতলালকে বলেছিলেন—পাঠালেন ত থিয়েটার দেখতে, কিন্তু কই, অহীন্দ্রবাবু ত নামেননি।

কথাটা মিথ্যে নয়। তখন কাজের চাপ বেশী পড়ায়, আমি দিনকতক আর 'দ্বন্দ্বে মাতনম'-এ নামছিলাম না। তখন আবার বেশী রাত্রিতে থিয়েটার ভাঙাটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিযোগিতায় সব থিয়েটারই দুখানা করে বই দিতে শুরু করলেন। আমাদের থিয়েটারও তাই। এ সম্পর্কে "নাচঘর" পত্রিকার একটি উক্তি তুলে দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ২৪।১২।২৬ তারিখে "নাচঘর" লিখলে—"নাট্যজগতে কি আবার ক্লাসিক থিয়েটারের যুগ ফিরে এলো? আবার যে প্রায় প্রত্যেক থিয়েটারেই এক রাত্রে দু'খানি করে বড় বড় নাটক অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে দেখছি।"

"দুর্মুখ" বলে একখানা কাগজ ত রাত বারোটার পরে আর যাতে অভিনয় না চলে, তার জন্য জোর গলায় দাবি জানিয়েছে।

পরিস্থিতি এর থেকেই বেশ বোঝা যায়। বড় বড় নাটক দু'খানা করে প্রতি অভিনয়-রজনীতে, অর্থাৎ বুধ থেকে রবিবার পর্যন্ত, ক্রমাগত করে যাওয়া, এর পরিশ্রম কি কম? তাই ছেড়ে দিয়েছিলাম 'বাজ বাহাদুর'। শুনে অমৃতলাল এতদূর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যে আমাকে সরাসরি একটি পত্র লিখলেন—"স্নেহাস্পদ অহীন্দ্রনাথ, যৌবন-সহচর তোমার পূজনীয় পিতার সম্পর্কে আমার তোমায় স্নেহসম্ভাষণে কথা কইবার অধিকার আছে তাই এই পত্র লিখছি, নচেৎ থিয়েটারের কোনরূপ কর্তামি করবার বা পরামর্শ দেবার স্পর্ধা আমি রাখি না। বাজ বাহাদুর আমি তোমার জন্য লিখেছি, দেড় লাইন পার্ট হলেও ওটি একটি ক্যারাকটার টাইপ্। শুনছি, তুমি আর ও পার্ট করছ না। কেন প্রাচীন পিতৃবন্ধুর প্রাণে এ ব্যথা দিচ্ছ? —সাং শ্রীঅমৃতলাল বসু।"

এ পত্র পাওয়ার পর আর দ্বিরুক্তি করিনি। পরিশ্রমের কথা না ভেবে, পার্টটি যথারীতি করতে লাগলাম। ছোট পার্ট বলে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না, কারণ ছোট হলেও পার্টটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে, আমার সাজতে ভালোই লাগত। এবং সত্যি কথা বলতে কী, পার্টটি তৈরি করতে আমি অবহেলাও করিনি। আর, উপরি-উপরি কয়েক রাত্রি এ অভিনয়টা চলার দরুন, পার্টটা আমার সহজেই খুব রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। চরিত্রটিতে প্রত্যয়ও আমার যেমন ছিল, অভিনয়ে সাবলীলতাও আনতে পেরেছিলাম। যে-কোনো পরিবেশে এই চরিত্রটি আমি করে আসতে পারতাম।

'দ্বন্দ্বে মাতনম' ছোট বই। রঙ্গনাট্য, বেশী দিন চলবার কথাও নয়, তবু এর প্রযোজনায় স্টার থিয়েটার কোনো কার্পণ্য করেননি। ভোটের সব বড়ো-বড়ো পোস্টার, স্টেজের ওপর রিক্সা, এমন কি, মোটর পর্যন্ত। মাটি থেকে ঢালু তক্তা দিয়ে মোটরকে দড়ি দিয়ে টেনে স্টেজে ওঠানো হতো একেবারে "সিন-ডক্"-এর কাছে। এবং সেখান দিয়ে স্টেজে চলে আসত মোটরটা, আষ্টেপৃষ্ঠে ভোটের পোস্টার লাগিয়ে। অভিনয়, প্রযোজনা ও সর্বোপরি নাটকটির প্রশংসাও হয়েছিল প্রচুর। তখনকার পত্র-পত্রিকাগুলির সপ্রশংস সমালোচনায় এর সাক্ষ্য মিলবে। আমি শুধু 'অমৃতবাজার' থেকে একটি উক্তি তুলে দিচ্ছি। ১৩ই নভেম্বর অমৃতবাজার লিখছেন—

"The booklet is a masterly production with clever and pointed touch of pathos and humour without the venom in its interpretation—with regard to the present 'election phobia.'"

থিয়েটারের দিন ত এইভাবে কাটছে, এই ভাবে ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে। দুর্গাদাসের কথা ত আগেই বলেছি--শরীর খারাপ—তাই অভিনয় করছিল না। হঠাৎ একদিন থিয়েটারে কানাঘুষায় শুনতে পেলাম—দুর্গাদাস মারা গেছে। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে কী! একী কথা! তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলাম প্রবোধবাবুর ঘরে। উনি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন—কী ব্যাপার?

বললাম—হ্যাঁ মশাই, দুর্গার কী খবর বলতে পারেন?

ইচ্ছা করেই কি কামাই করছে, নাকি সত্যিই শরীর খারাপ, সঠিক জানতাম না। প্রবোধবাবু তার কথায় একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—তার গতিবিধির খবর আর কে রেখেছে বলো?

কেমন যেন খট্‌কা লাগল। দুঃসংবাদ হলে কি আর প্রবোধবাবুর কানে এসে পৌঁছতো না? আর তিনি জানলে কী আর আমার কাছে চেপে যাবেন?

তাড়াতাড়ি নীচে এসে ড্রেসার কুঞ্জকে ডাকলাম। কুঞ্জকে দুর্গা খুব ভালবাসত। বললাম—ওরে, কাল দুর্গার খবর নিতে বেড়িয়ে পড়্ দেখি।

সে বললে—যে আজ্ঞে।

বললাম—যেরকম করে হোক, যেখানে গিয়ে হোক, খোঁজটা নিবি, বুঝলি? শালকিয়াতে ওর শশুরবাড়ী, সেখানেও যাস।

—আচ্ছা।

তারপরে, কুঞ্জর কাছ থেকে সত্যিই জানা গেল দুর্গার সংবাদ। কুঞ্জও খুঁজতে খুঁজতে ঠিক ওর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে হাজির। ওকে দেখে দুর্গা ত অবাক। বললে—কীরে, তুই হঠাৎ?

সে আর কিছু ভাঙছে না। শুধু বললে—এই আর কী, আপনাকে দেখতে এলাম।

কিন্তু দুর্গা চতুর লোক, সে ওকে জেরা করে করে কথায়-কথায় সব জেনে নিলে। এ-ও জেনে নিলে যে, কুঞ্জকে ওর খোঁজ করতে পাঠিয়েছি আমি। তাই কুঞ্জর হাত দিয়ে আমাকে সে একখানা চিঠিও পাঠিয়ে দিল। লিখেছে—"মাইডিয়ার অহীন, শ্রীমান কুঞ্জর মুখে আমার পরমায়ু বৃদ্ধির কথা শুনিলাম। থিয়েটারের সকলে ইহাতে আনন্দাশ্রু ফেলিয়াছিলেন তাহাও শুনিলাম, শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। যাই হোক আগামী সপ্তাহে একদিন সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আশা করি তোমরা ভালো আছ। আমি এখনও বড়ই দুর্বল। আমার স্বহস্তে লিখিত এই পত্র পাইলে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। ইতি ১২।১২।২৬—ইওর অ্যাফেক্‌সনেট্‌লি—শ্রীদুর্গাদাস শর্মণঃ।"

দুর্গাদাসের নাম-সইয়ের জায়গায় "শর্মণঃ" শব্দটির ব্যবহার পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। দুর্গাদাস যে ব্রাহ্মণ, এই বিষয়ে তার বেশ সচেতনতা ছিল। ঠাকুর দেবতার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে সে গায়ত্রী জপ করে নিচ্ছে, এ দৃশ্য তখন বহুবার দেখেছি।

এই ঘটনার আগে আমরা অপরেশবাবুর "রাখীবন্ধন" খুলে দিয়েছিলাম পয়লা ডিসেম্বর তারিখে—বুধবারে। ঐতিহাসিক কালের রাজপুত পরিবেশের গল্প। চন্দাবৎ কুম্ভ সিংহ করলাম আমি। বীরমল—রাধিকাবাবু। তেজসিং—কণকনারায়ণ। ধারা—সুশীলাসুন্দরী। রমা—নীহারবালা। অমৃতবাজার ২৬।১২।২৬ তারিখে প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"Ahinbabu scored a huge success." রাধিকাবাবুকে বলেছিলেন—'প্রেটি ওয়েল।' এ বই আমাদের আগে পুরানো স্টারে প্রথম হয়েছিল। তখন কুম্ভ সিংহের ভূমিকা করেছিলেন—মিঃ পালিত, আর 'বীরা'—তারাসুন্দরী।

১৮ই ডিসেম্বর—শ্রীকৃষ্ণের ৫৬ তম রজনীর অভিনয়ে আমাকে আমার নিজের পার্ট 'দুর্যোধন' ছাড়া আরও একটি ভূমিকা করতে হয়েছিল, সেটি হচ্ছে—'বসুদেব'-এর ভূমিকা। দুর্গাপ্রসন্ন বসুর অসুখ করায় তাঁর বদলে নামতে হয়েছিল আমাকে। সেই প্রবোধবাবুর চিরাচরিত আচরণ। —'শ্রীমান, ফাউলরোস্ট্' ইত্যাদি।

তারপরে এসে গেল বড়দিনের আসর। অনেকগুলি বইয়ের মধ্যে অপরেশচন্দ্রের "চণ্ডীদাস" ছিল নতুন বই। প্রথম অভিনয় হলো—২৫শে ডিসেম্বর। এতে আমার কোনো পার্ট ছিল না।

বড়দিনে অন্যান্য থিয়েটারেও অভিনয়ের আয়োজন কম ছিল না। ২৪শে ডিসেম্বর 'মিনার্ভা' খুললেন ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ব্যঙ্গনাট্য—"যুগমাহাত্ম্য"। মিত্র থিয়েটার তখন অ্যালফ্রেড-মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে মনোমোহন মঞ্চে এসে আসর জমিয়েছেন। এখানে এসে ওঁরা বহু পুরানো নাটকেরই পুনরভিনয় করতে লাগলেন। নিজেদের বই ছাড়াও, পুরানো মনোমোহনের বইগুলি। বড়দিনের সময়ে করলেন—"দেবলাদেবী।" "বঙ্গেবর্গী" প্রভৃতি বই-ও করতে লাগলেন। আর নাট্যমন্দির পয়লা ডিসেম্বর খুললেন নতুন বই—ক্ষীরোদপ্রসাদের "নর-নারায়ণ।" বড়দিনের আসরে ওঁরা এই বই এবং ওঁদের অন্যান্য পুরানো বইগুলিই করতে লাগলেন। প্রযোজনা করলেন শিশিরবাবু 'কর্ণর' ভূমিকাও করলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। সূর্য ও সাত্যকী—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তরুণ অভিনেতা, এর পর থেকেই খ্যাতিলাভ করতে শুরু করলে। ইন্দ্র ও বিদুর—অয়স্কান্ত বক্সী। অয়স্কান্ত অনেকদিন পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন এবং পরে নাট্যকার রূপেও পরিচিত হয়েছিলেন। এঁদের কথা পরে আসবে। পরশুরাম ও অর্জুন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে। যুধিষ্ঠির—যোগেশ চৌধুরী। হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী নামলেন 'ঘটোৎকচ'-এর ভূমিকায়। এই তার প্রথম অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এবং সম্ভবতঃ এই শেষ। কারণ, তারপরে, মঞ্চে তাঁর আর কোনো অভিনয় দেখছি বলে ত মনে পড়ে না। দ্রৌপদী করলে —চারুশীলা। পদ্মা—কৃষ্ণভামিনী। মঞ্চশিল্পী ছিলেন রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেবু)। মঞ্চাধ্যক্ষ হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়। শালকিয়ার লোক ইনি, খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, 'নাট্যপীঠ' সিনেমা করেছিলেন, আমাদের ছিলেন—'গোপালদা।' সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে। নৃত্য-শিক্ষক —ব্রজবল্লভ পাল।

"নরনারায়ণ"-এ ক্ষীরোদ প্রসাদের ভাব ও ভাষা এককথায় চমৎকার—নাট্যকাব্য বলা চলে। কর্ণার্জুনের মতো কর্ণের জীবনী নিয়েই লেখা—কর্ণের গোবধ ও অভিশাপ থেকে শুরু ও কর্ণের মৃত্যু পর্যন্ত সবই আছে। কিন্তু 'কর্ণার্জুন'-এর মতো গতিশীল নাটক নয়। এর আগে 'কর্ণার্জুন' হয়ে যাওয়ার দরুন নাট্যকারের পক্ষে একটা ব্যাঘাতও সৃষ্টি হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। কর্ণার্জুনে ছিল যে-সব নাট্যক্রিয়া বা যাকে আমরা বলি 'জমাট সিন', সে-সব এড়িয়ে গিয়ে কথায় ও কাব্যে তা প্রকাশ করতে হয়েছে 'নরনারায়ণ'-এ। তারপরে, 'কর্ণার্জুন' প্রায় ২৬০ রাত্রি চলার পর একই

বিষয়বস্তু নিয়ে দেখা দিলো 'নরনারায়ণ'। আয়োজন খুবই হয়েছিল। তবু দীর্ঘদিন চলল না, যদিও সবাই সুখ্যাতি করেছে এ বইয়ের। ভাব ও ভাষা এত চমৎকার যে বলার নয়, কিন্তু উপবুক্ত নাট্যিক ক্রিয়া বা 'জমাট সিন' তেমন না থাকায়, 'কর্ণার্জুন' যেরকম সগৌরবে চলেছিল সেই অনুপাতে দর্শক টানতে পারেনি "নরনারায়ণ।" অভিনয় সুন্দর হয়েছিল, বিশেষ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, শিশিরবাবু, চারুশিলা আর কৃষ্ণভামিনী। এ-বইতে নাট্যমন্দিরের প্রায় সবাই অভিনয় করেছিলেন শুধু ললিতমোহন গোস্বামী ছাড়া। তিনি ইতিমধ্যে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, এবং সত্যি বলতে কী, ইনি গত হওয়ায় সমগ্রভাবে নাট্যজগতের ক্ষতি হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে শিশিরবাবুরও ক্ষতি হয়েছে। শিশিরবাবু এঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসে ঘটেছিলো ললিতবাবুর মৃত্যুর ঘটনা।

এবার আমাদের 'চণ্ডিদাস'-এর কথা। নামভূমিকায় নামলেন তিনকড়িদা। চণ্ডিদাসের ভাই 'নকুল' করলেন সন্তোষ সিংহ। হারাধন—সন্তোষ দাস (ভুলো)। দীনু—বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। "কেশবের সন্তান" 'নফর মামা' করলেন—ননীগোপাল মল্লিক। রাজনগরের রাজা সুচেৎ সিং—কনকনারারণ। জমিদার দুর্লভ রায়—রাধিকাবাবু। রামী—নীহারবালা। চাঁপা—সরস্বতী। নিত্যা—সুশীলাসুন্দরী (ছোট)। অভিনেত্রী হিসাবে দেখা দিলো এই সুশীলাসুন্দরী মেয়েটি—এই প্রথম। এর অনেকদিন আগে মিনার্ভায় নর্তকী ছিল। আমাদের সুশীলাসুন্দরী এর পর থেকে অভিহিত হতে লাগল—সুশীলাসুন্দরী (বড়ো), আর এই সুন্দরী তরুণীটি হলো—সুশীলাসুন্দরী (ছোট)।

"চণ্ডিদাস" কিন্তু খুব জমে গেল। তিনকড়িদা ও নীহারের গানই শুধু নয়, ব্রাহ্মণকুমার চণ্ডীদাস, তার প্রণয়িনী—রজকিনী রামী, এই অসবর্ণ প্রেম তরুণ দর্শকবৃন্দের কাছে এক মুখরোচক বস্তু হয়ে দেখা দিলো। তদুপরি গানের আকর্ষণ ত ছিলই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে জয়দেবের রচনাও কিছু ছিল। তারপরে, সত্যিকথা বলতে কী, অভিনয়ও হয়েছিল নিখুঁত। প্রত্যেকটি ছোট-বড়ো ভূমিকা হয়েছিল সু-অভিনয়। ততদিনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নাটক দাঁড় করাতে হলে শুধু বড়ো-বড়ো পার্টগুলিই ভালো হলে চলবে না, ছোট-ছোট পার্টগুলিও সমান ভালো হওয়া দরকার। নইলে, নাটক জমে ওঠে না।

'চণ্ডীদাস'-র প্রধান ভূমিকাগুলির কথাই এতক্ষণ পর্যন্ত বলছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা কর্তব্য, অপ্রধান ছোট ছোট চরিত্রগুলিও কম শক্তির পরিচয় দেয়নি। কাহিনী ত বীরভূমের পাট-ভূমিকায় বীরভূমবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিকে চলায়-বলায়, অঙ্গসজ্জায় একেবারে মূর্ত করে তুলেছিলেন তুলসী চক্রবর্তী, প্রবোধ দত্ত, নরেন সেন, শরৎ সুর, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। যে চাকরটি তামাক সেজে নিয়ে এসে দিচ্ছে, তার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। আর সম্পদ ছিল গানের দিক থেকে। চণ্ডীদাস-বিরচিত পদাবলী ও চণ্ডীদাসরূপে তিনকড়িদা সেই যে গাইতেন—"সজনী, ও বন্দী কে কহ বটে। গোরোচনা গৌরী নবীনা কিশোরী নাহিতে দেখিনু ঘাটে।..... চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' পরাণ সহিত মোর। সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ জ্বরে ভোর।"

—আজও যেন কানে বাজে। ঐ গানটি তখন জনপ্রিয়ও হয়েছিল বেশ। বিশেষ করে নীচের দুটি গান ত মুখে-মুখে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমার মতো প্রবীণ যাঁরা আছেন, তাঁরাই স্মরণ করতে পারবেন। চণ্ডীদাসরূপী তিনকড়িদা গাইছেন—

"শুন রজকিনী রামী,
ও' দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

এই গানের প্রত্যুত্তরে রামীরূপিণী নীহারবালা গেয়ে উঠত—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে, জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি।"

সেই তিনকড়িদাও ইহলোকে নেই, নীহারও নেই, কিন্তু ওঁদের গাওয়া এই দুটি গান যেন আজও অক্ষয় হয়ে আছে মরণের তটভূমিকায়। রামীর আরও একটি গান জনপ্রিয় হয়েছিল—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে—
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু, তিতায় তিতিল দে।"

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ইতিপূর্বে বাংলা নাটকে বৈষ্ণব পদকর্তাদের বহু পদাবলী বাহির করা হয়েছে, চণ্ডীদাসেরও বহু পদ স্থান পেয়েছে অন্যান্য নাটকে, যাঁরা কেবল নাটকই দেখেন বা পড়েন, তাঁদের কাছেও মহাকবি চণ্ডীদাস একটি বহুশ্রুত নাম। সুতরাং সেই চণ্ডীদাসের জীবনী নিয়ে নাটক যেমন হলো এই প্রথম, তেমনি এর একটি আকর্ষণও ছিল সেই দিক থেকে।

চণ্ডীদাস নাটকে চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাড়াও বিদ্যাপতির পদ ছিল। দেবদাসীদের মুখে ছিল বিদ্যাপতির এই পদ :—

"মাধব, কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহ তথি বেরিবেরি
অব জীউ করব সমাধা॥"

জয়দেবের রচনাও ছিল। যেমন—

"শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিত বনমাল জয় জয়দেব হরে।"

এবং—

নিন্দীত চন্দনসিন্দুকিরণমনুবিন্দতিখেদমবীরং
ব্যঙ্গনিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং।"

অপরেশচন্দ্রের নিজের রচনাও ছিল। নিত্যার মুখের গান—

"রুনু রুনু রুনু নূপুর বাজে—
আসে যশোদাদুলাল ঐ রাখাল সাজে।"

নিত্যারূপিণী 'ছোট সুশীলা' খুব ভালো গাইয়ে ছিল তা নয়, তবে চেহারা যেমন মিষ্টি, কণ্ঠটিও ছিল মধুর। আমার বেশ মনে আছে, নিত্যা করবার জন্যে প্রথম ওকে নিয়ে আসা হলো, গ্রীনরুমের এক ঘরে বসে ওকে ঐ 'রুনু রুনু' গানটি তোলানো হলো, আমরা বসে আছি বাইরে—স্টেজের ধারে। অপরেশবাবু কান পেতে শুনলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—হুঁ, দরদ আছে। অবশ্যি তা না হলে কি আর অতো পয়সা করতে পারে!

ছোট সুশীলা সত্যিই ঐশ্বর্যশালিনী মেয়ে। নিজের বাড়ি, গয়না-গাঁটি ঐ বয়সে করেও ফেলেছে প্রচুর। কী করে করেছে? ধনীলোকের সেবা করেই ত ঐ অর্থসম্ভার! দরদ না থাকলে সেটা সম্ভব হয় কী করে? গানেও দরদ আছে, অন্তরেও দরদ আছে।

যাই হোক, 'চণ্ডীদাস' নাটকের যে নাট্যপরিবেশ, তাতে গ্রাম্য চরিত্রের কিছু সমাবেশ করতে হয়েছে। এদিক দিয়ে অপরেশবাবুর অভিজ্ঞতাও ছিল কম নয়। বীরভূম অঞ্চলে বহুবার গেছেন অপরেশবাবু। নাট্যকার নির্মলশিববাবু তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন। নির্মলশিববাবুর বাড়ি ছিল লাভপুরে। এই লাভপুরে অপরেশবাবু বেড়াতে গেছেন। নির্মলশিববাবু ছাড়া বীরভূমনিবাসী আরও এক বন্ধু ছিল অপরেশবাবুর। তিনি হচ্ছেন—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন। ইনিও অপরেশবাবুকে অনেক সাহায্য করেছেন। সাহিত্যরত্ন থিয়েটার ভালোবাসতেন, আসতেন প্রায়ই থিয়েটারে, গল্প করতেন এসে অপরেশবাবুর সঙ্গে। সরল লোক, বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।

'চণ্ডীদাস' নাটকের অভিনয়ে, বিশেষ করে রামী আর হারাধন—নীহার আর সন্তোষ (ভুলো) অভিনয় করত খুবই উচ্চাঙ্গের। একজন সমালোচক ঐ নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা খাঁটি কথা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, সচরাচর যে ধরনের নাটক আমরা রঙ্গালয় থেকে পাই, পয়সা উপার্জনের জন্য জমাটি নাটক—ঐ নাটকটি পড়ে মনে হলো, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের নাটক এটি। এটা যেন কোনো যথার্থ ভক্ত লেখকের রচনা, লেখক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই যেন রচনা করেছেন চণ্ডীদাস। বোধ হয় আগে বলেছি, তখনকার দিনে অভিনয়ে খুশী হয়ে বিশিষ্ট দর্শকরাও অনেক সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পুরস্কৃত করতেন। 'চণ্ডীদাস'-এর ব্যাপারে পুলিনবিহারী সেন বলে এক ভদ্রলোক সন্তোষ দাস (ভুলো)-কে 'হারাধন'-এর জন্য পুরস্কার দিয়েছিলেন একটি সোনার রিস্টওয়াচ, আর নীহারকে রামীর জন্য মুক্তোর নেকলেস। এই সব পুরস্কারের ব্যাপার নিয়ে আমরা থিয়েটারে বসে খুশীমনে বাক্যালাপ করছি, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় মশাই আমাদের কথা শুনতে শুনতে বলে উঠলেন—'আজকাল আর গয়না দেবার রেওয়াজ কই? কালে-ভদ্রে হচ্ছে। ধনী কমে আসছে কি না। নইলে আগে আগে খুবই দিতো।'

—কীরকম ?

বললেন—তাহলে শুনুন। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গেছেন ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মশাই —ইনি খুব দানশীল ছিলেন—থিয়েটারেরও ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক, সব থিয়েটারেই যেতেন। তা সেদিন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে—'মৃণালিনী'। অভিনয় দেখে কালীকৃষ্ণবাবু খুব খুশী। ম্যানেজার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মশাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন ? কালীকৃষ্ণবাবু বললেন—গিরিজায়া বড়ো ভালো করছে। অভিনয় শেষে ওকে একবার নিয়ে আসবেন, কেমন ? ওপরের বক্সে বসে অভিনয় দেখছিলেন কালীকৃষ্ণবাবু। অভিনয় শেষ হবার পর বিহারীবাবু নিয়ে এলেন ওঁর কাছে গিরিজায়াকে। গিরিজায়া করছিলেন সুকুমারী দত্ত বা গোলাপসুন্দরী। গোলাপ-সুন্দরী গিরিজায়ার সাজ-সজ্জাতেই এসে দাঁড়ালেন ওঁর কাছে। কালীকৃষ্ণবাবু ওঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে বললেন—কি চাও ? গোলাপসুন্দরী ওঁকে প্রণাম করে বললেন—'আপনাদের মতো সুধীসজ্জন ব্যক্তিকে আনন্দ দান করতে পেরেছি এতেই আমি কৃত-কৃতার্থ। কিছু দিতে চাইছেন, এর থেকে বেশী সৌভাগ্য আমার আর কী থাকতে পারে ? দুটো হীরের দুল দিন, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি কানে পরে থাকব। কালীকৃষ্ণবাবু পড়েছিলেন বিপদে। ঐ অতো রাত্রে হীরের দুল পাওয়া যায় কোথায় ? দোকান-টোকান সব গেছে বন্ধ হয়ে। তখন তিনি করলেন কী, পকেট থেকে দুখানি পাঁচশো টাকার নোট বার করে বিহারীবাবুর হাতে দিলেন, বললেন—আজ এ-নোট দুখানি গিরিজায়ার কানে ঝুলিয়ে দিন, কাল ঐ হাজার টাকা দিয়ে হ্যামিল্টনের বাড়ি থেকে হীরের দুল আনিয়ে দেবেন।

মনোযোগ দিয়েই আমরা সব শুনেছিলাম সেদিন অবিনাশবাবুর গল্প। এরকম একটি নয়, আরও বহু কাহিনী মাঝে মাঝে বলতেন অবিনাশবাবু, আজ সব ঠিক স্মরণে নেই। তবে প্রসঙ্গ শুনে বলতে পারি, এই সব টুকরো টুকরো কাহিনীগুলিকে জড়ো করে পরে বই বার করেছিলেন অবিনাশবাবু—'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা।' যাই হোক, আমাদের থিয়েটারের ঐ যে পুরস্কার, সেদিন তা দাতার হয়ে গ্রহীতাদের হাতে দিয়েছিলেন সেযুগের নবীন সাহিত্যিকদের মন্ত্রগুরু প্রমথ চৌধুরী মশাই। প্রমথবাবু সেদিন প্রেক্ষাগৃহে বসে 'চণ্ডীদাস' দেখছিলেন। চণ্ডীদাসের তখন সত্যি সত্যিই জয়-জয়কার। প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা। এই চণ্ডীদাস দীর্ঘদিন চলবে, এটা জানা কথা। শনিবারে-রবিবারে আমি ছুটি পেতে লাগলাম, তাই করলাম কী, শনি-রবিবারে খুব থিয়েটার দেখে বেড়াতে লাগলাম। বিশেষ করে মিত্র থিয়েটারে আমার আড্ডা ছিল খুব বেশী। জ্ঞানেন্দ্র মিত্র, যিনি ও-থিয়েটারে 'ছোটবাবু' বলে সমধিক খ্যাত, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল যথেষ্ট। শিশির মিত্র, শিশির বোস, মাঝে মাঝে আসতেন নাট্যকার ভূপেনবাবু, এঁদের সঙ্গে রীতিমত হৃদ্যতা গড়ে উঠল। ওঁরা যখন আলফ্রেড-মঞ্চে ছিলেন, তখনো গেছি, যখন মনোমোহনে এলেন, তখনো গেছি। মনোমোহনে ওঁদের ইদানীংকার অভিনয়গুলি বসে বসে দেখতে দেখতে মনে হতো, সেই তেইশ সালের মার্চ মাসে, অর্থাৎ আর্ট থিয়েটার সংগঠিত হবার আগে, স্টারের যে অবস্থা হয়েছিল, ঠিক সেই রকম অবস্থা হয়ে আসছে

মিত্র থিয়েটারের। ওপরের বক্স থেকে নীচে উঁকি দিয়ে দেখতে হয় যে, লোক আছে, কি নেই। ক্ষেত্রমোহন মিত্র মশাই এ-থিয়েটারে যোগ দেবার পর থেকে তাঁর সু-অভিনীত ভূমিকা-সম্বলিত পুরানো পুরানো নাটকগুলিই হ'চ্ছিল, রাণী 'দুর্গাবতী' থেকে শুরু করে বাজীরাও পর্যন্ত। 'দেবলাদেবী' আর 'বঙ্গেবর্গী' ত আছেই। আমাদের ইন্দু তখন কাজ করছে মিত্র থিয়েটারে। স্টারের পর কিছুদিন বসে থেকে এখানে এসেছে ইন্দু মুখোপাধ্যায়। হরিমোহনবাবু স্টার থেকে বেরিয়ে আর এখানে আসেননি অবশ্য; আসতে পারতেন, কিন্তু আসেননি। মিত্র থিয়েটারের এই সব দিনের অভিনয় দেখতে দেখতে দুঃখ হ'তো বেচারী নির্মলেন্দুর জন্য। অভিমন্যুর মতো তাকে যেন এসে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে পুরাতন রথীরা, তার ওপরে দুই পাশে দুই বর্ষীয়সী নায়িকা—তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারী। আমি ত ভাবতেই পারি না, 'ভ্রমর'-এ গোবিন্দলাল সে করেছিল কেমন করে? যেখানে রোহিণী—তারাসুন্দরী, আর ভ্রমর—কুসুমকুমারী?

যাই হোক, নিজের কথায় ফিরে আসি আবার। জ্ঞানবাবু ত ওদিকে আমার জন্য দিন গুনছেন। সেই যে একবার স্টার ছেড়ে মিনার্ভায় আমার আসার ব্যবস্থা হতে যাচ্ছিল, গণদেবকে পাঠিয়ে প্রবোধবাবু আমাকে ধরে আনলেন? সেই থেকে কন্ট্রাক্টের তারিখ পিছিয়ে কবে পর্যন্ত হয়েছে, আমার তা খেয়াল না থাকলেও, ছোটবাবুর খেয়াল ছিল বিলক্ষণ! হিসেব করে তিনি জেনেছেন, চৈত্র মাসেই আমার কন্ট্রাক্ট শেষ হবে স্টারে। তাই বললেন ছোটবাবু—চৈত্র মাসের পরই তোমাকে চলে আসতে হবে এখানে।

শুধু ছোটবাবু কেন, ওখানকার সব বন্ধুরাই আমার ওপর চাপ দিতে লাগলেন—বেরিয়ে এসো ওখান থেকে।

মিত্র থিয়েটারে যখন যেতাম কথাপ্রসঙ্গে যদি রাত্রি হয়ে যেতো, তা'হলে থিয়েটারের পর, থিয়েটারের গাড়িতেই ছোটবাবু আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেতেন। তবে এটাও ঠিক, মিত্র থিয়েটার ক্রমেই অচল হয়ে আসছিল। মিনার্ভায় 'যুগমাহাত্ম্য' তেমন সুবিধে করতে পারল না, তাই 'মিনার্ভা' তখন গেল মফঃস্বলে ঘুরতে। অবশ্য, মফঃস্বলে ঘুরবার পক্ষে সেইটাই ছিল সময়। মিত্র থিয়েটারও মাঝে মাঝে ঘুরছিলেন। আমরাও স্টার থেকে গিয়েছিলাম আসানসোল। মিত্রের তখন বিপর্যয়। অমৃতলাল বসু ছেড়ে গেলেন। ছেড়ে গেলেন তারপরে একে একে—ধীরেন গাঙ্গুলী, ইন্দু মুখার্জি, আশ্চর্যময়ী। একদিকে এই ভাঙন, অন্যদিকে নতুন বইও নেই, মিত্র একেবারে নাজেহাল।

স্টারের আমরা আসানসোল গিয়েছিলাম জানুয়ারীর মাঝামাঝি। যতদূর মনে পড়ে আসানসোলে সেই সময় যে জলের কল বা ওয়াটার ওয়ার্কস তৈরি হচ্ছে তার জন্য নাগরিকবৃন্দ যে তহবিল ওঠাবার চেষ্টা করছেন, তারই জন্য আমাদের অভিনয় হয়েছিল রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে। অভিনয় হয়েছিল এক সপ্তাহব্যাপী। কর্ণার্জুন হয়েছিল দু'দিন, আর হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেব, সাজাহান প্রভৃতি।

ফিরে এলাম আসানসোল থেকে। সেই সময় কাগজে পড়লাম এক দুর্ঘটনার খবর। আমাদের

সেই 'বেঁটে কুমুদ' বা কুমুদিনী—খ্যাতনামা পুরাতন চরিত্রাভিনেত্রী—মারা গেছে। ২৩শে জানুয়ারী, ১৯২৭—বেঙ্গলী কাগজে লিখলে বড়ো বড়ো করে 'জগমণি নো মোর'—আর সঙ্গে ছাপলে 'জগমণি-' রূপিণী কুমুদিনীর একটি ছবি।

আর এক খবর হচ্ছে শিশিরবাবু সম্পর্কে। নাট্যমন্দিরে 'নরনারায়ণ' চলছে, তবু বড়দিনের সময় থেকেই লক্ষ্য করছি, 'ষোড়শী'র পোস্টার পড়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' অবলম্বনে 'ষোড়শী' নাটক। কিন্তু 'নরনারায়ণ' যখন খোলা হয়, তখন থেকেই শিশিরবাবুর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন, অভিনয়ে বাধা পড়তো, এক-একদিন এমন হতো যে, অভিনয় শেষ করাই হতো না। চালু বইয়ের পক্ষে এ-ব্যাপারটা ক্ষতিকর, সন্দেহ নেই। অবশেষে, ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি শুনলাম, শিশিরবাবু ছুটি নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় 'কর্ণ' করতে লাগল—রবি রায়। কিন্তু, নাট্যমন্দির মানেই হচ্ছে—শিশিরবাবু। সেই শিশিরবাবুই যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহলে লোকের আকর্ষণ থাকে কতখানি? জমা বই অনেকটা নষ্ট হয়ে গেল, 'নরনারায়ণ-এর কর্ণ' হিসাবে রবি রায়-কে লোকে নিলে না। যদিও 'নাচঘর' শিশিরবিহীন নাট্যমন্দিরের অভিনেতাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন এই মন্তব্য করে যে, যাঁরা আছেন নাট্যমন্দিরে তাঁরাই বা কম কী? শিশিরবাবুকে ছাড়াই তাঁরা চালিয়ে নিতে পারবেন; অন্যান্য থিয়েটার পারছে না? কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, নাচঘর-প্রদত্ত উৎসাহ ফলপ্রসূ হলো না।

দোসরা ফেব্রুয়ারী বিশ্বকবি আমাদের 'শোধবোধ' দেখতে এলেন। 'শোধবোধ' খোলার সময় তিনি বিদেশে ছিলেন, সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু তিনি 'শোধবোধ' দেখতে আসার আগেই একটা ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় হৈ হৈ পড়ে গেছে, সেটা এক্ষেত্রে বলা দরকার। সেটা হচ্ছে—জোড়াসাঁকোয় বিশ্বকবির 'নটীর পূজা' অভিনয়। শুরু হবার তারিখ হচ্ছে ২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৭ (১২ই মাঘ, ১৩৩৩)। আমরাও একদিন গিয়ে 'নটীর পূজা' দেখে এলাম। নাটকে শ্রীমতীর নাচ ছিল, 'শ্রীমতী' সেজেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী। তিনি—"ক্ষম হে ক্ষম—নমো হে নম—তোমায় স্মরি হে নিরুপম, নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে" গানটির সঙ্গে যে-নৃত্য প্রদর্শন করলেন, তার একটা বিশেষত্ব ছিল। আমাদের রঙ্গালয়গুলিতে যে-সব নাচের প্রচলন ছিল, এ নাচ সে-ধরনের নয়, এ দেখলাম, একেবারে অন্য। রঙ্গালয়ের প্রচলিত নাচের ঢং ছিল যে-শ্রেণীর, সে হচ্ছে উত্তর-ভারতীয়—খানিকটা 'কথক'-ঘেঁষা। কিন্তু, নটীর পূজা-র নাচের পরিকল্পনা ছিল ভিন্নতর। আমাদের সঙ্গে নীহার গিয়েছিল দেখতে, সে ঐ নাচ দেখে-দেখেই মনে-মনে তুলে এনেছিল অনেকটা। সে পরিচয় পেয়েছিলাম আমরা পরে। নীহার পরে আমাদের দেখিয়েছিল 'নটীর পূজা'র নাচের ধরন কিছু-কিছু। কিন্তু, সে যাক্। আমাদের আরেক অভিজ্ঞতা হলো এ ব্যাপারে, মঞ্চে ভদ্রমহিলার নাচ দেখলাম আমরা সেই প্রথম। অন্তত তার আগে মঞ্চে কোনো ভদ্রমহিলার নাচ দেখেছি, একথা মনে পড়ে না। কথাটা বলার তাৎপর্য এই যে 'জোড়াসাঁকো'র সেই দিনের সেই

অভিনয়, বিশেষ করে ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে প্রকাশ্যে নৃত্য-পরিবেশন—নবীনেরা হৈ-হৈ করে উঠলেন, প্রশংসায় স্বতঃস্ফূর্ত। আর, প্রবীণেরা হয়ে উঠলেন নিন্দায় মুখর। এ-সব সামাজিক নিন্দা-প্রশংসার বাইরের লোক আমরা। আমরা সেদিন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম—অভিনয়ের অমন অনাড়ম্বর পরিবেশ। অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্যে যে অমন স্থক্ষরুচির অভিনয় দেখব, এ যেন কল্পনাও করতে পারি নি! মনে এক সুগভীর ছাপ রেখে গেল সেদিনকার 'নটীর পূজা!'

প্রবোধবাবু কবির কাছে প্রায়ই তখন যেতেন নতুন বইয়ের তাগাদায়। আমিও মাঝে মাঝে গেছি। এবং সত্যি কথা বলতে কী ওঁর 'গোড়ায় গলদ' নাটকটি পাওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল আমাদেরই। এটা পাবার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু ওদিকে ছিলেন আরেকজন। তিনি হলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—কবির স্নেহভাজন ব্যক্তি—অবনীন্দ্রনাথের জামাতা—কবির ওপর মনিবাবুর প্রভাবও ছিল কম নয়। তাঁর মাধ্যমে 'বিসর্জন' ত শিশিরবাবু আগেই পেয়েছিলেন, এবারে 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষরক্ষা' পেলেন তিনিই। আমাদের বলেছিলেন—তোমরা 'নটীর পূজা' কর।

আমাকে বলেছিলেন—'রক্তকরবী' আমরা করে নিই, তারপরে তোমরা করবে।

প্রবোধবাবু কিন্তু তোড়জোড় করতে লাগলেন 'নটীর পূজা' খোলবার। কাগজে-কাগজেও তখন বেরিয়ে গেল—আর্ট থিয়েটার করছে 'নটীর পূজা'। 'শোধবোধ' কবি যেদিন দেখলেন, তারপরে যথারীতি আমরা দেখা করতে গেলাম ওঁর সঙ্গে। অনেক রকম আলোচনা হলো, নতুন নাটক —অর্থাৎ—নটীর পূজা-র কথাও হলো। কথা প্রসঙ্গে বললেন—'তোমাদের অসুবিধে ঐ মেয়েদের নিয়ে।'

একথা উনি নাকি প্রবোধবাবুকে আগেও বলেছিলেন। কথাটা ঠিক বুঝলাম না। বার দুয়েক বললেন। আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের মেয়েদের নিয়ে অসুবিধেটা কী? যা-ই শেখানো যাক না কেন, আমাদের মেয়েরা ত চটপট সব তুলে নিতে পারে! তবে আর অসুবিধে কিসের?

মনে-মনে পর্যালোচনা করে পরে বুঝতে পেরেছিলাম কথাটার তাৎপর্য। যে-শ্রেণী থেকে আমরা অভিনেত্রী সংগ্রহ করি, সেটি ছিল সামাজের দিক থেকে অপাংক্তেয়। সেদিন ওঁর কাছ থেকে বাড়ি ফিরে আসবার পথে এই কথাই মনে আলোড়ন তুলছিল,—বাংলা থিয়েটারের সামাজিক মর্যাদাই যে শুধু নটীকুলের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা নয়, নটীর সংস্পর্শ থাকার দরুন, বাংলার দুজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ—এঁদের প্রত্যক্ষ করস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ নটী না হলে বাংলা থিয়েটার দাঁড়াতেই পারত না।

যাই হোক, স্টারে শেষ পর্যন্ত 'নটীর পূজা' হলো না। এতে সবই প্রায় মেয়েদের ভূমিকা, পুরুষদের ভূমিকা নেই বললেই চলে,—এ অবস্থায় এ-বই পাবলিক থিয়েটারে চলবে কি না, এসব ভেবে ডাইরেক্টররা গেলেন পিছিয়ে। কবি তখন তার বদলে দিয়েছিলেন আমাদের 'পরিত্রাণ' নাটক। সে-কথাও যথাসময়ে বলা যাবে।

স্টারে—এসব ঘটনার আগে থাকতেই—প্লাকার্ড পড়ে আসছিল—'রাজসিংহ'-এর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পুরাতন নাট্যরূপ এটি, করেছিলেন অমৃতলাল বসু, সেই অমৃতলাল মিত্রের আমলে, অভিনয় হয়েছিল পুরাতন স্টারে। অমৃত মিত্র মশাই নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, 'রাজসিংহ'রূপে, বিশেষ খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন তিনি। আমাদের স্টারে রাজসিংহ করলেন কনক-নারায়ণ, ঔরংজেব—আমি, মুবারক—দুর্গাদাস, মাণিকলাল—রাধিকানন্দ, অনন্ত মিশ্র—তিনকড়িদা। জেবউন্নিসার ভূমিকায় নামানো হলো একটি নতুন মেয়েকে। নাম তার—মণিমালা, মেয়েটি ছিল সত্যিই সুন্দরী। দরিয়া সাজলে—নীহার। চঞ্চলকুমারী—ছোট সুশীলা; নির্মলকুমারী—বড় সুশীলা। পানউলী-র ভূমিকায় ছিল গান—সেজেছিল তারকবালা (লাইট্)। বই খোলা হলো ৯ই মার্চ, বুধবার সন্ধ্যা সাতটায়। অভিনয়ে মেয়েদের মধ্যে খুব নাম করেছিল বড়ো সুশীলা আর নীহার। জেবউন্নিসা ভালো করতে পারেনি। কিন্তু, সব থেকে বড়ো কথা, নাটকে নায়কই ফেল করলে। কনকবাবুকে চেহারায় সুন্দর মানিয়েছিল, কিন্তু অভিনয়ে, বীর নায়কের উপযুক্ত চরিত্র-চিত্রণ উনি উপযুক্তভাবে করে উঠতে পারলেন না। ভূমিকাটি অমৃত মিত্র করতেন বলে বড়ো-বড়ো স্বগতোক্তি ছিল। বিশেষ করে, 'আবার দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অবতারণা' বলে স্বগতোক্তিটিই ছিল ছাপানো বইয়ের আড়াই পৃষ্ঠারও কিছু বেশী। তার অনেকটা কেটে-কুটে দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও যা ছিল, তা-ও সবটা ভালো বলতে পারলেন না। তিনকড়িদা হলে ভালো হতো, কিন্তু উনি নিলেন না এ ভূমিকা, নিলেন একটি ছোট্ট ভূমিকা—অনন্ত মিশ্র। অবশ্য, অনন্ত মিশ্রটা উনি খুব ভালোই করেছিলেন। পুরুষদের মধ্যে রাধিকাবাবুর মাণিকলাল, দুর্গাদাসের মুবারক আর আমার ঔরংজেবের খ্যাতি হয়েছিল। আমার অভিনয় 'গোলকুণ্ডা'র ঔরংজেবের মতোই গ্রহণ করেছিলেন দর্শক। এ-ঔরংজেবের বেশভূষা অবশ্য ভিন্ন—ফকিরের বেশ নয়—এ হচ্ছে—সম্রাট্ আলমগীর। তবে আলমগীর নাটকের নাম-ভূমিকায় যে রূপসজ্জা নিয়েছিলাম, সেটাও এতে নিই নি। পরনে রাজবেশ হলেও এ ছিল এত সাধারণ যে, তাঁকে রাজা বলে চিনতেই পারা যায় না। নির্মলকুমারী যখন তাঁকে প্রথম দেখে, তখন ত চিনতেই পারে নি? 'বনাসী' নামক খোজার সঙ্গে নির্মলকুমারী আলাপ করছে, এমন সময় দুরে ঔরংজেবকে দেখে হঠাৎ-ই পালিয়ে গেল 'বনাসী'। অবাক হয়ে নির্মল বলছে—এ লোকটা কে? এ বুড়োটাকে দেখে খোজাটা পালালো কেন?

তারপরে, যখন ঔরংজেব এসে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, তখন নির্মল বলছে—আপনি কে, তা জানলে, আমি সকল কথা আপনাকে বলব।

ঔরংজেব তখন উত্তর দিলেন—'হিন্দুস্থানের লোকে আমাকে আলমগীর বাদশা বলে।'

'রাজসিংহ'-এর ঔরংজেবকে আমি বিশ্লেষণ করেছিলাম কুচক্রীরূপে। যদিও 'গোলকুণ্ডা'য় তাঁর ডিপ্লোমেসীর অন্ত ছিল না, তবুও তাঁকে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখিয়েছিলেন অন্যভাবে। এতে—বঙ্কিম দেখাচ্ছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। কন্যা জেবউন্নিসাকে রাজনীতি বোঝাচ্ছেন ঔরংজেব—'রাজনীতির

প্রথম সূত্র হচ্ছে, কাকেও বিশ্বাস করবে না। দ্বিতীয় সূত্র—কোনো কাজ সোজা পথে করবে না। কেবল—চক্রান্ত—চক্রান্ত—চক্রান্ত।'

সমালোচনায় 'অমৃতবাজার' বললেন—'As for the players, we once more found Mr. Chakravarty in his usual vein. Babu Radhikananda Mukherjee as 'Maniklal', was fair success which Durgadas Babu as Mubarak did quite well more specially in one of his scenes with Rajsinha when he was greatly appreciated by the audience. But the greatest hit of the evening was made by Mr. Chowdhury in the role of Aurangzib. Though the actor had a few scenes to act, yet he did marvellously well. Special mention may be made of IV-3, where Ahin Babu showed a brilliant scene of which any first class artist may be proud."

অমৃতবাজার ঐ যে চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্যের কথাটা উল্লেখ করেছেন, সেটি হচ্ছে বিখ্যাত 'অবরোধের দৃশ্য', উপত্যকায় অতর্কিতে বন্দী হয়ে পড়েছেন ঔরংজেব, বঙ্কিম-বর্ণিত সেই অত্যদ্ভুত দৃশ্য! বেগম বন্দী—নিজে বন্দী—পিপাসার চরমে পৌঁছে কাতর হয়ে পড়েছেন, কাতর হয়ে উন্মাদের মতো এক বান্দাকে বললেন—'একটা হাতীর পেটে ছোরা মার্, রক্ত পড়ুক, আমি দু'হাতে করে গিলে খাই!' শেষ পর্যন্ত পায়রা উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব জানাতে বাধ্য হলেন ঔরংজেব।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, 'রাজসিংহ' ও 'আলমগীর' নাটকের ঘটনাকাল প্রায় একই। ঘটনাক্রমও প্রায় এক। সেই রূপনগরের রাজকন্যার বিবাহ নিয়ে জটিলতা, 'আলমগীর' নাটক শেষ হ'য়েছে—আলমগীরের শোচনীয় অবরোধে, 'রাজসিংহ'-তে আরেকটু বেশী, এখানে নায়ক—রাজসিংহ, আলমগীর ন'ন। তবে দুই নাটকের তুলনায়, বঙ্কিমের ঘটনা উপস্থাপনা-কৌশলে, পরিবেশ'-সৃষ্টি আর অপূর্ব ভাষাভঙ্গী,—এর আবেদন অনেক মহৎ, অনেক গভীর!

'রাজসিংহ'-এর পরবর্তী ঘটনা হলো, স্টারের জলপাইগুড়িতে অভিনয় করতে যাওয়ার ঘটনা। ১৪ই মার্চ থেকে আমাদের অভিনয় হবে ওখানে, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু, আমার শরীর হয়ে পড়ল অসুস্থ, বলে দিলাম—আমি যেতে পারব না।

কী আর হবে, দল চলে গেল জলপাইগুড়ি, প্লে হচ্ছে বান্ধব সমাজে, কদমতলা, জলপাইগুড়ি।

আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনে ছোটবাবু (জ্ঞানবাবু) আসেন দেখা করতে। সময়টা তখন ফাল্গুনের শেষাশেষি। বলেন—চৈত্র শেষ হলেই আসতে হবে—আর একটি মাস।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি থেকে হঠাৎ একদিন প্রবোধবাবু এসে হাজির। বললেন—তোমায় যেতে হবে।

শরীর খারাপ যে!

বললেন—কিছু ভাবনার নেই। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে ওখানে। সেখানে থাকবে তুমি। মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খাবে, কিছু ভাবনার নেই!

শুনলাম, বিশেষ করে দু'একখানা বইতে দর্শক আমাকে বিশেষভাবে দাবি করছেন। বিশেষত, 'শ্রীকৃষ্ণ', 'কর্ণার্জুন' এইসব নাটকে। অগত্যা যেতে হলো। আমাকে তাঁর সেই আত্মীয়ের বাড়িতেই নিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি তুললেন প্রবোধবাবু। ধনী ব্যক্তি, চা-বাগানেরই ব্যবসা, তাঁর নামটা আজ আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু যত্ন-আত্তির আতিশয্যের কথাটা কখনো মন থেকে যাবে না। যত্নের ভারে অস্থির হয়ে উঠলাম। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যত বলি, এত প্রয়োজন নেই, শরীর সুস্থ নেই, তবু, তাঁরা নানারকম আয়োজন করছেন।

যাই হোক, আমার অভিনয় হয়ে যেতে চলে এলাম জলপাইগুড়ি থেকে। বোর্ডে তখন আমাদের 'চণ্ডীদাস' হচ্ছিল, সুতরাং চণ্ডীদাসের স্টাফ্ যারা জলপাইগুড়ি এসেছিল, তারা যথাসময়ে কলকাতায় আসছে, আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যাচ্ছে, এই রকম টানা-পোড়েন তাদের চলেছিল আর কী! অবশ্য, এরকম টানা-পোড়েন থিয়েটারের পক্ষে—আগে এবং পরে অনেকবারই হয়েছে। ইতিমধ্যে মার্চের শেষে—নাট্যমন্দিরে—'প্রতাপাদিত্য' খোলা হয়েছিল—পুরানো বইটার পুনরভিনয় আর কী—পুরানো স্টারে হয়েছিল—সেই ১৯০৩ সালে। নাট্যমন্দিরে তখন অবশ্য শিশিরবাবু ছিলেন না—স্বাস্থ্যোদ্ধার করে তিনি তখনো ফিরে আসেননি নাট্যমন্দিরে।

যাই হোক, কলকাতায় ফিরে আসবার পর আমার জীবনে তখন এমন এক আকস্মিক ঘটনা ঘটে বসলো যে, তা' আমার জীবনকে আরেক ভিন্নতর স্রোতে প্রবাহিত করে দিলো। কিন্তু সেকথা বলবার পূর্বে একটু আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। চার বছর আমি এই যে স্টারে কাটালাম, এর মধ্যে আর যাই হোক, সমগ্র নটগোষ্ঠীর একজন যে হয়ে গেছি, এ বিষয়ে ভুল নেই। সব থিয়েটারের সব লোকেরই সঙ্গে যেন অলক্ষ্যে একটা নাড়ীর টান জন্মে গেছে; ঈর্ষা-বিদ্বেষ এসবও আছে সত্যি; সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ভালোবাসাও আছে, নইলে তাদের কাউকে নিন্দা করতে গিয়ে মানুষ যখন সমগ্র নট-গোষ্ঠীকে ধরে টান দেয় তখন বুকের ভিতরটা এমন তীব্র বেদনায় মোচড় দিয়েই বা ওঠে কেন? আমরা যখন প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গজগতে এলাম, তখন এক স্রোতের মতোই এসেছিলাম, ভেবেছিলাম, গ্লানি যা' কিছু আছে, নিন্দনীয় যা' কিছু চোখে পড়ে, সব আমরা তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবো! কিন্তু এই চার বছরে যা দেখলাম আমাদের এই নব্য-গোষ্ঠীর, তাতে অভিনয়-শিল্পের উৎকর্ষ যা হবার হোক না কেন, নৈতিক দিক থেকে অগ্রগতি লাভ করতে পেরেছি কী? বিশেষ করে নট-সম্প্রদায়ের মধ্যে পানদোষ এমন বেড়ে গেছে যে, সমগ্র নাট্যশিল্প তখন এক সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা হচ্ছিল। পাবলিক থিয়েটার খোলবার আদিযুগে যে-সব ব্যাপার ছিল বলে শুনেছিলাম, আমাদের রঙ্গজগতে প্রবেশের সময় সে সবের ধারা ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, ক্রমশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবারই কথা! তখন প্রকাশ্যে মদ্যপান একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। ক্রমে ক্রমে দেখি, সে-ধারা আবার হঠাৎ বেগবতী হয়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে এমন হলো যে, পানদোষ অভাবনীয়রূপে বেড়ে গেল। গোপনে, প্রকাশ্যে শেষ পর্যন্ত সর্বসমক্ষে বুক ফুলিয়ে চলতে লাগল। এমনকি, মদ্যপান

করে স্টেজে ঢুকে দর্শকদের সঙ্গে বাদানুবাদ পর্যন্ত চলতে লাগল, এ-ও দেখতে লাগলাম। পুরাতন দলের কাছে আমরা যে-মহিমায় বিরাজ করব বলে আশা করেছিলাম, সে-মহিমা হয়ে গেল ধূলিসাৎ; আমরা তাঁদের কাছে হার মেনে গেলাম, আমাদের অবস্থা দেখে তাঁরাও হাসতে লাগলেন মুখ টিপে টিপে। তিরিশ বছর ধরে এই-ই চলে আসতে লাগল। নবীন যারা আসতে লাগল, তাদের ধারণা হতে লাগল, এইটেই রীতি, মদ্যপান না করলে বুঝি বড়ো অভিনেতা হওয়া যায় না! এটা তারপরে একটা স্টাইল বা রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যাক, আবার ফিরে আসি আত্মকথায়। ঐ যে আকস্মিক ঘটনা বললাম, সেটা হচ্ছে আমার জীবনের এক ভুল অঙ্কপাতের কথা। হঠাৎ আমি ঐ সময়ে এক প্রচণ্ড ভুল করে বসলাম। চার বছর হলো, স্টারে এসেছি—এসেছিলাম এক অজ্ঞাতনামা শৌখিন অভিনেতা। সেদিন আমার খ্যাতি হয়েছে, দেশ-বিদেশে আমার নাম হয়েছে পরিব্যাপ্ত, যশ পেয়েছি, বন্ধু পেয়েছি—সমগ্র নটগোষ্ঠীর মধ্যে আমি তখনই এক বিশেষভাবে-চিহ্নিত ব্যক্তি। পত্র-পত্রিকায় আমার গুণাবলীকে বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। 'নটরাজ' পত্রিকায় ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৭ সালে নির্মলকুমার রায় বলে এক ভদ্রলোক স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধ লিখলেন—আমার শিল্পী-জীবনের ক্রমবিবর্তন নিয়ে। কিন্তু সেই আমি যে স্টারে এই চার বছর মুখে রক্ত তুলে খেটেছি—পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে জ্ঞান করিনি—সেই স্টারের কথা চিন্তা না করে—নিজের খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা না করে—হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম গভীর অন্ধকারে। চৈত্র মাসের প্রথম দিকেই হবে সময়টা। এমনি একটা ব্যাপার, বাড়িতে গিয়ে যে জানিয়ে আসব, তারও অবসর নেই, তখখুনি গাড়ী ধরে বেরিয়ে পড়লে ভালো হয়। কিন্তু, বাবার শরীর তখন ভালো নয়, কাজকর্ম দেখতে বেরুতে পারেন না। বয়সও হয়েছে তো! তাই, তাঁকে না জানিয়ে এ-ভাবে যাই-ই বা কী করে? সুতরাং, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম। এসে সব বললাম বাবাকে। বললাম—যাচ্ছি। চিন্তা কোরো না। ভালোই থাকব।

মা বললে—এইভাবে যাবি? দুটি মুখে দিয়ে যা অন্ততঃ।

মার কথা ঠেলতে পারলাম না, চট্ করে আহার পর্বটা সেরে নিলাম, ওদিকে দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে!

বাড়িতে, যদি ও চাকর-বাকর-দরওয়ান রয়েছে, কিন্তু তারা সব নতুন লোক, আমি থাকছি না, কে কেমন ওঁদের দেখাশোনা করবে কে জানে? আমাদের সরকার-মশাই যিনি ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বয়সে বাবার থেকেও বড়ো, কাজকর্ম আর দেখতে পারেন না, অবসরই নিয়েছেন, তবে মাঝে মাঝে আসেন, খোঁজ খবর নেন, এই যা! আর ছিল সেই তারাপদ। সে তখন দেশেই থাকে, মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসে, বিশেষ করে আমার মেয়ে আর ছেলের মায়া সে কাটাতে পারে না। আমার ছেলে-মেয়ে উভয়ই তখন শিশু। বেশ মনে পড়ে, তারাপদ তখন এক-একবার করত কী,

মেয়েকে কাঁধে চড়িয়ে, তার একটি পা ধ'রে নিজের গালে একটু ঘসে নিতো, আর বলত,—দেখেছ, কী নরম তুলতুলে পা,—যেন মাখনের মতো !

তারাপদর কথা মনে করতে গিয়ে কী জানি কেন, এই ছবিটা আমার বড্ড মনে পড়ে যায় ! কথাগুলো যখন সে বলত, মুখখানি হয়ে উঠত হাস্যোজ্জ্বল, চোখ দুটি দিয়ে ঝ'রে পড়ত যেন অপরিসীম স্নেহ !

কিন্তু, তারাপদ ত বেশী দিন এক নাগাড়ে থাকতে পারবে না, দেশে তার ভাইপোরা রয়েছে, তাদের সংসার রয়েছে ! তাই, সে আসে আর চলে যায়। আর রইল আমার ভাই—পঙ্কু। কিন্তু সে-ও আবার ওই সময়ই চলে গেছে বিলেত—সিনেমাটোগ্রাফী শিখে আসতে। সুতরাং, বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ছোট বোন, স্ত্রী আর দুটো অপোগণ্ড শিশুকে রেখে আমি এমনি করে সেদিন পা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম অনির্দিষ্ট পথে ! বাড়ি ছেড়ে বন্ধুবান্ধব—পরিচিত সবাইকে ছেড়ে রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা হবে—এক প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বসলাম—হাওড়ায়। হাওড়া ছেড়ে গাড়ি চলতে লাগল আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে, পিছনে পড়ে রইল কলকাতার আলো, আর সামনে—অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমি ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম। এ যেন নাটক শেষ হবার আগেই আকস্মিক যবনিকা পতন। কখন, কবে যে আবার এই যবনিকাখানি উঠবে, কে বলতে পারে !

সেদিন—কোথায় যে আমার গন্তব্যস্থল তা' জানতাম না—আমার সঙ্গী তা' আমাকে জানতেও দেয় নি। পরিচিত জগৎ ছেড়ে, শিল্পের জগৎ ছেড়ে,—সেদিন ভিন্ন এক পরিমণ্ডলে আমি হারিয়ে গেলাম ! আবার কবে যে নিজেকে—নিজের মতো ক'রে খুঁজে পাবো, কে জানে !

নির্ঘণ্ট

অক্রুর সংবাদ ১৭৬
অতুলবাবু ১৬৬
অতুল মিত্র ২৪৮, ৪৪৫
অতুলানন্দ রায় ২৫১
অনঙ্গমোহন হালদার ২৫২
অনাদি বোস ১৭৭, ২১২-৩, ২৫১, ৩৭৯, ৪৭৫, ৫১৭
অন্নপূর্ণা থিয়েটার ১৩৬-৭
অপরাধী কে ২৫৪
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১২, ২৫২, ২৫৪, ২৮৮, ২৯৫-৬, ২৯৯, ৩১৫, ৩২৯, ৩৩৪, ৩৬৩, ৩৮৭, ৪০৪, ৪২৫, ৪৩৭, ৪৬১, ৪৮২, ৪৮৬, ৪৯১
অবনী ঠাকুর ২১৭
অবিনাশ কর ৩৯২
অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ২৫০-১, ৩২৮, ৩৮৫
অভিমন্যু বধ ১৪৫, ১৫৫
অমর বসু ৯০
অমর রায় ২৪৮
অমর সিংহ ৫৩
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮, ২৬, ২৯, ৩৪, ৭৪, ১২৯-৩২, ১৫৩, ১৬৬, ২০৫, ২৪৭, ৪২০
অমৃত বাজার পত্রিকা ৩২৫, ৫৪২
অমৃতলাল বসু ১৪০, ২০৫, ২৪৭, ২৯০-১, ৪২৮, ৫৩৭
অমৃতলাল মিত্র ১৮, ২৯, ১২৪-৬, ২৯১, ৩৭৫, ৩৮১, ৩৯৪, ৪০৫, ৪৪২, ৪৫৩, ৫১৯, ৫২২, ৫২৬
অযোধ্যার বেগম ২৫২, ৩২৯, ৩৫৯
অরুণা আসফ আলী ২৪৩
অরোরা ফিল্মস ২১২, ৪৭৪
অর্ধেন্দু মুস্তফী ১৮
অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ২৬০, ২৬২, ২৭১
অলিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৬০, ২৬২, ২৭১
অলীকবাবু ৫২১
অশোক মিত্র ১৭৬-৭, ১৯৬
অশ্বিনী বিশ্বাস ২৭৪
অষ্টম এডোয়ার্ড ২৫৬
অসীমকৃষ্ণ দেব ৫২৮
অহল্যা উদ্ধার ১৪৭
আই. এফ. এ. শীল্ড ৪০
আঁধারে আলো ২৮৪
আত্মদর্শন ৪৯১
আদর্শ ব্রাহ্মণ ৪৩০
আনন্দ পণ্ডিত ১২২, ১৩৩
আনন্দ পরিষদ ৩৯৮, ৪২৪
আনন্দ বাজার পত্রিকা ৩৬৮
আমলেত্তো নভেলি ২৩৫, ৩৩৭
আর্ট থিয়েটার ১৫৪, ৪০২, ৫৩৯
আলফ্রেড থিয়েটার ৪২৫
আলমগীর ২৫৩, ২৫৫, ২৬১, ৩১৭, ৫৪১
আলিবাবা ২৯
আলেকজাণ্ডার ৩৮০

আশা থিয়েটার ১৬৬
আশুতোষ ৬১
আশু বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭
আশুবাবু ১১১, ১৪৭
আশ্চর্যময়ী ২৪৯, ৪১১, ৫৩৭
অ্যালবার্ট ভিক্তর ২৫
অ্যাসটন ১২৩
ইংলিশম্যান ৭২, ২৩৩, ৩২৫, ৪২১
ইউনিভারসাল ফিল্ম কোং ২২৯
ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট ২৪৭
ইউনিয়ান ক্লাব ১০১
ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ ৩৩৭
ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ২১
ইণ্ডো-ব্রিটিশ কোং ২৪৩-৪, ২৫৯
ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৮, ১৪৪-৫, ১৬২, ১৭৬-৮, ১৯৬, ২৮৯, ৪০৪, ৪১৩, ৪৭৫, ৫৩৭, ৪৯০
ইভনিং ক্লাব ২৪৫, ২৭৩, ৩৯৮
ইমদাদ রসুল ৬৩
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ১৫৩, ১৮২
ইরাণের রাণী ৩৫৫, ৩৬১, ৩৭৯, ৪০৪, ৪০৮, ৪৭০, ৪৯০
ইলিয়ট শীল্ড ৪০, ৪৩, ৪৬
উইর্থ (মিসেস) ২৬৫
উইর্থ, উইলসন ১৭১, ২৪২, ২৬৮
উইলিয়ম জোনস ১৫৪
উলিয়াম আর্চার ৪৮১
উত্তর রামচরিত ৪০১
উপেন্দ্রনাথ মিত্র ২৫২, ৫০৮
উপেন্দ্রনাথ বসু ১৪৩
ঋষির মেয়ে ৪৯৯, ৫০২
ঋষ্যশৃঙ্গ ৪২৮
এইচ. মুখার্জি ২২২, ২৩৮, ২৭২, ২৭৮, ২৮১, ৪৩৯-৪০
এক্সপ্রেশন এ্যাণ্ড ক্যারকেচার ২৪৩
এমডেন ১৭৪
এমারেল্ড ৩৩৮
এলফিনস্টোন ৪৯, ৯৮
ওথেলো ২৫২, ৫২২
ওয়েস্টার্ণ স্টুডিও ২৩২
ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি ২৬০, ৩৩২
কংগ্রেস ৩১-৩
কপালকুণ্ডলা ১০০, ৩৮২, ২৮৯
কর্ণার্জুন ২৯৬, ৩২৯, ৩৫৭, ৩৮১, ৪০৪, ৪১২, ৪৬৬, ৪৭৫
কল্যাণী ৫২
কল্লোল ২৩০, ২৪৭, ২৬০
কামিনীকুঞ্জ ৩৯১
কারমাইকেল ৭৩
কার্তিক দে ২৪৮
কালপরিণয় ১৬৬
কালীপ্রসন্ন পাইন ৩৩৫, ৩৩৮
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৫৩, ৩২৭
কাশীনাথ মিত্র ১৫৮
কিংসফোর্ড ৩৭
কিন্নরী ২৫২
কুচবিহার কাপ ৪৮
কুসুমকুমারী ২৬, ২৯, ৩৪, ২৫৩, ৩৭৯, ৪১০, ৫৩৭
কুমারকৃষ্ণ মিত্র ৫১৩

কুরুক্ষেত্র ১৫৬
কুঞ্জলাল চক্রবর্তী ২২, ২৪৯, ৩৮৬, ৪৯১
কুহকী ২৫২
কৃতান্তের বঙ্গদর্শন ৪৩৯
কৃষ্ণচন্দ্র দে ৩৭০, ৪০৩
কৃষ্ণভামিনী ২৫৩, ২৫৫, ২৯৩
কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় ৭৮
কেতকী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬
কেলোর কীর্তি ২৪৮
কোহিনুর ৭৪-৫, ১২৯
ক্যালকাটা ক্লাব ৪১
ক্রীড ২০৮, ২২২, ২২৮-৯, ২৩২-৩, ২৩৯, ২৪০, ২৬০-২, ২৬৫, ২৭০, ২৮০-৩, ৩৩২
ক্লাসিক ১৮,২৬, ২৯
ক্লিওপেট্রা ২৪৫, ২৫০
ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ২৯, ৬০, ১৯০, ২৫০-৫২, ৪২৭
ক্ষুদিরাম ৩৭
ক্ষেত্রমোহন মিত্র ১৫৬, ৪২৫
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৬২
খাসদখল ১৪৩, ৪২৮
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৮৩
জগদানন্দ ৩৬৬
গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৬, ২৭৪, ৩৬১, ৩৩৫, ৫৩৭
গদাধর মল্লিক ৩৫৪, ৫০৫
গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স ৪০, ৪১
গিরি মল্লিক ২৫২
গিরিন সেন ২৭৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮, ২৬-৯, ৪৬, ৭৪-৬, ১৩৯, ১৫২-৫, ২৪৭, ২৯১, ৩২৪-৮, ৩৩৪, ৩৮২, ৩৮৬, ৪৩৮, ৪৯৪
গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ৭৪, ২৪৫
গৃহপ্রবেশ ৫০১
গৃহলক্ষ্মী ১৪২, ১৫২, ৪৯৪
গোকুলচন্দ্র নাগ ২৩০, ২৩৯-৪০, ২৪৩-৫৮-৬২, ২৬৫-৭, ২৭০, ২৮০, ২৮৭, ৩৩২, ৩৪৩, ৩৪৭-৮
গোপালচন্দ্র নাগ ১৩৪-৬
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৯১
গোপাল লাল শীল ২৯১
গোলকুণ্ডা ৪৪৪
চণ্ডীচরণ ঘোষ ২২৫
চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয় ১৫, ১৮, ২৮
চন্দ্রগুপ্ত ৬০, ১১২-৫, ১৩৬, ১৬৬, ২৪১, ২৪৫-৭, ২৬১, ২৭৪, ৩০৩, ৩৪২, ৩৮৯, ৩৯২
চন্দ্রভূষণ চৌধুরী ২৫, ৫২৭
চন্দ্রশেখর ২১২, ৪৯২
চারুচন্দ্র নায়েক ৬২
চারুচন্দ্র বসু ২৫১
চারুচন্দ্র মিত্র ২৪৫, ২৪৭
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৮৩, ৪৮৭
চারুচন্দ্র রায় ৪০২
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) ৪০৩, ৪১৭, ৪৭৪, ৪৮৭-৯

চিরকুমার সভা ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৮৯, ৪৯৭, ৫০০
চুণীবাবু ২৪৯, ২৫৫
চুণীলাল দেব ২১২
চ্যাপম্যান ১৫৫
ছিন্নহার ২৫২
জগদীন্দ্রনাথ রায় ৩৮১
জগদীন্দ্র নারায়ণ ২৭৪
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৬৬
জনা ৪৫৫, ৪৭২, ৪৭৫
জয়দেব ১৪৪, ৩৫০, ২৫৫
জলধর সেন ২৮১
জহুর আলী ২৫২
জানকীনাথ বসু ৩০৭
জালিয়ানওয়ালাবাগ ২৫৬
জাহাঙ্গীর ম্যাডান ২৭৬, ২৭৮
জিতেন মুখোপাধ্যায় ২৮-৯, ৩৪, ৫২, ১৪৪
জুন রিচার্ডস ২৪১, ২৮২
জুলিয়াস সিজার ২৫২
জীবন-যুদ্ধ ৪২৫
জোর বরাত ৪৩১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২১
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৪
জ্যোতিষ মিত্র ১৫০, ২৩০, ২৬৩-৪, ২৬৭-৮, ৪৭৯
জ্যোতিষ সরকার ২৪৩-৪, ২৬০, ২৭৮, ৩৩০
ট্রেডস কাপ ৪০
ডালহৌসী ৪১
ডিউক অব কনট ৯, ২৫৭
ডেভিড গ্যারিক ২৩৪
তপোবন ৫৭
তরুবালা ১১১-২
তারকবাবু ৮৩, ৮৯
তারক পালিত ২৫২
তারকচন্দ্র দাস ৮০, ৮৯
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭, ৫২, ৪৪২
তারাপদ কোঙার ১২, ১৬-৯, ২১, ২৯, ৩৪, ৩৭, ৫২-৪, ৯৫, ১০৫, ১১৭, ৫৪৩-৪
তারাসুন্দরী ২৫৪, ২৯৯, ৩০৬, ৪৫৬, ৫৩৭
তিনকড়ি চক্রবর্তী ৫৮, ৬৩, ৭৯, ৮১, ২৪৬-৭, ২৭৩, ২৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৭-৭, ৩০৫, ৩১৭, ৩৩৭, ৪১৭, ৪৬১, ৪৭৪, ৪৭৬, ৫২৪
তিনকড়ি মিত্র ১৬২, ১৭৭-৮
তুফানী ১৮৩, ২১৩
ত্রিপাণ্ডেশ্বর ১৭৬
দানীবাবু ১৮, ৫৪, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ১৩৯-৪২, ২৪৫, ২৪৮, ২৫১, ২৮৬, ৩৯২, ৩৯৪-৬, ৪০৭, ৪৪৩
দিলীপ রায় ৩৭১
দীনেশরঞ্জন দাশ ২৬০, ২৬৫-৭, ৩৩১
দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৮৩, ৪৯৯
দুটি প্রাণ ২৯২
দুর্গাদাস ৬৪-৫
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫, ২৮৪, ৩০৩, ৩৪২-৩, ৪৪৯, ৪৬৫, ৪৭০

দুর্গাপ্রসন্ন বসু ৪২৬
দেবেন্দ্র বসু ২৫২, ৫২২
দেবলাদেবী ২৪৯-৫০
দেবেশ্বর ৭৯, ৮০, ৯০, ১২২, ২৪৬
দ্বারকানাথ মিত্র ১২৭
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৫৩, ৬৪, ২৪৪, ২৫০-৫১
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩৭৭-৮
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৩, ২৫৯
ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৭, ৬০
নগেনবাবু ৬৫, ১৯১
নগেন গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৩
নগেন ঘোষ ৩০৬
নটীর পূজা ৫৩৯
ননী সান্যাল ২৮৪
ননীলাল ৭৭-৮, ৮২, ৯২, ৯৫
নন্দলাল বসু ৫১, ৩৩২
নফরচন্দ্র কুণ্ডু ১৫-৬
নবযুগ ৪৩৯, ৪৪৭
নবীন সেন ১৫৫, ৬৯৭, ৪২৫
নরেন বসু ২৭৫, ৩৮১, ৪০৮
নলদময়ন্তী ৩৪, ২১৬
নসীরাম ৪৪৩
নাচঘর ৪৫২, ৪৭৫, ৩৯৩
নাজিমোভা ২০৮
নাট্যমন্দির ৩৬৬, ৪৭৫
নাট্যমন্দির (পত্রিকা) ১৫৩
নাদির শাহ ২৪৮
নারায়ণ বসাক ৪৭
নরেশ মিত্র ২৬১, ২৭৫, ২৮৪, ৩০৩, ৩২৩, ৩৩৭, ৪৭৯, ৪১০
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৯৯
নিতাই ভট্টাচার্য ২৪৬
নিতাই বিশ্বাস ৪১৯
নির্মলেন্দু লাহিড়ী ১৪
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭, ৪৮৫
নীতিশ লাহিড়ী ২৪৩
নীল উৎসব ১০-২
নীহারবালা ২৫৩, ২৯৩, ২৯৭, ৪০৫-৬, ৪২৬, ৪৮৯
নুটবিহারী বসু ২৫
নৃপেন্দ্রনাথ বসু ২৫, ৭৮, ২৫৩
নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ৩৭৩, ৪০৩
নেসফিল্ড ১০৪
ন্যাশান্যাল ৫২
পঙ্কজ গাঙ্গুলী ১৪৩
পঙ্কজভূষণ রায় ১৬২
পঞ্চম জর্জ ২১, ৫১, ৭০, ২৪৪, ২৫৭
পঙ্গু ১০৫, ১৭০, ৫৪৪
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৬০
পরদেশী ২৫২
পরিত্রাণ ৫৩৯
পরেশ বসু ৩০৩, ৪২৬
পল্লীসমাজ ২৯২
পাণ্ডব গৌরব ২৯, ৩০, ১৩০
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ২৫২
পাঁচুগোপাল ১২২
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ৫২৬
পারসিং ১৬৯
পার্থ প্রতিজ্ঞা ১৫৫, ১৫৮, ১৮০, ১৮২
পাষাণী ৪২৮

পি. এন. দত্ত ২৪৪
পুলিন চাটার্জি ৬৩
পূর্ণচন্দ্র হালদার ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩
পেসেন্স কুপার ২৭৭
প্যারেরা ২৮৩
প্যালারামের স্বাদেশিকতা ৫০৭
প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪৮৩
প্রতাপাদিত্য ২৮০
প্রফুল্ল (নাটক) ২৬, ২৯, ৪৩৪-৮
প্রফুল্ল ঘোষ ২৬, ২৮-৯, ৭৭-৮, ১৯২, ২৩৮, ২৬৩, ২৬৫, ২৭০, ২৮০, ২৮১, ২৮৭, ৩৩০, ৩৪১, ৪০৪, ৪৪২, ৫১১
প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬, ৫৭, ৭৭, ৯৯, ১১১, ১৪০, ১৪৩
প্রফুল্ল চাকী ৩৭
প্রফুল্ল বিশ্বাস ৩৭
প্রফুল্ল সেনগুপ্ত ৩৫৪, ৪২৪
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ৭৮-৯, ৯৯
প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
প্রবোধ বসু ২৫২
প্রবোধচন্দ্র গুহ ৮৮, ১৫৪, ২৭৫-৬, ২৮৮, ২৯০, ২৯৫, ২৯৭-৯, ৩০২-৪, ৩১৪, ৩৩৪, ৩৬১, ৩৬৬, ৩৯৯, ৪০৭, ৪১১, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৫১, ৪৫৯, ৪৬৫-৬, ৪৬৮, ৪৮৬, ৫০০, ৫৩৯
প্রভা ৪০৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৮৪
প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৬, ৯৯
প্রমথনাথ তর্কভূষণ ৪৩০
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ২৪৪-৬, ২৫০
প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২১০
প্রিয়নাথ ঘোষ ৬৫, ২৪৯
প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ৩৭৯
প্রিয়নাথ মল্লিক ২১২, ২৬৭
প্রিয়শঙ্কর ১১০, ১১৫, ১৪২
প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৬৭, ১৭১
প্রেসিডেন্সি কলেজ ৪৩-৪
ফটো প্লে সিণ্ডিকেট ২৩০, ২৮২, ৩৩০, ৪৯৫
ফরোয়ার্ড ৪২১, ৪৩০, ৪৪৮, ৪৭৩
ফেডাবারা ২৩৭
ফোক ১৬৯
ফ্রামজী ২১৪, ২২০
ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ক্লাব ১৭৭, ৫০৮
বক্তিয়ার শা (প্রিন্স) ১৩৪
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৭৯-৮০, ৩৮৫
বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১১
বঙ্গনারী ৩৩৫
বঙ্গভঙ্গ ৩০, ৫১, ৭১
বন্দিনী ৪৩১, ৪৭২
বরদা দাশগুপ্ত ২৪৮
বরদা সেন ২৪৬
বসন্তকুমারী ২৪৯
বসন্ত ঘোষ ১৯৩-৪
বসন্তলীলা ৩৭০
বসুমতী ৪২২
বাংলার মসনদ ২৫০
বাঙালী ৫০৯

বামন গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৩
বার্নস ম্যান্টেল ৪৮১
বাসন্তী ৩২৬
বাসন্তী দেবী ৪১৭
বি. কে. ঘোষ ২৮৪
বিজয় বসন্ত ১৮২
বিজয় ভাদুড়া ৪৪
বিজয় মুখোপাধ্যায় ৩৫২-৩
বিজয়কুমার বসু ২০১
বিজয়চন্দ্র মহাতাপ ৪৬৫
বিজয়রত্ন মজুমদার ৪৭৪
বিজলী ৩২৬, ৪৭৩, ৫১৫
বিদায় অভিশাপ ৫১০
বিদ্যাসুন্দর ১৬১
বিবাহ-বিভ্রাট ৩৭৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৭৮-৯, ৯৯
বিরহ ১৮২
বিরাজ বৌ ৪২৫
বিলাত ফেরত ২৫৯, ২৭৩
বিল্বমঙ্গল ২৯, ১৩০, ৪২৮
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (হাবুল) ৩০৬, ৩৩৪-৫, ৪০৪, ৪১২
বিশ্বরূপা ৩২৩
বিষবৃক্ষ ৪৪৯
বিসর্জন ২০৫, ২০৯, ২১৬-৭
বি. সি. ঘোষ ২৮৪
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ২৫
বীরাষ্টমী উৎসব ৭৮
বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় ১৪৫
বৃন্দাবন বিলাস ১৪৫, ১৫৮
বেঙ্গল ক্লাব ৯
বেঙ্গল থিয়েটার ২৫-৬, ২২৬
বেঙ্গলী ৪০৯, ৪২১, ৪৪৫, ৫২৫
বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোং ২৪৭, ২৫৩
বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট (৪নং)
বেণীমাধব গাঙ্গুলী ২৪৬, ২৫৩
বেদৌরা ২৯
বেলস্ (দি) ৫০৭
বৈকালী ৩৬৪, ৩৯৩, ৪৩৮
বৈকুণ্ঠের খাতা ৩০৭
ব্যাণ্ড ম্যানস ভ্যারাইটী শো ২৪১
ব্যাপিকা বিদায় ৫১৯
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৩০
ব্রজবল্লভ পাল ৪৩৩
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৫
ব্রজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৩৯
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড ৯৭
ভবানী থিয়েটার ১৬৬
ভবানীপুর বান্ধব সমাজ ১৪৫, ১৪৭
ভাব মহারাজ ৪৮২
ভার্বিনা ক্লাব ১৪৩-৪
ভারতী সিনেমা ১৬৫
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী) ৯, ২৫
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৮২, ২৫৭
ভীষ্ম ১৯০, ১৯২
ভুজঙ্গভূষণ রায় ১০০-১, ১৩৯, ১৪২, ১৫৫, ১৬২
ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯
ভূতনাথ দাস ৭, ২৫৫, ৩০৮
ভূতনাথ সিং ৫৬-৭, ৬০, ৭৫-৬

ভুপেন আচার্য ৫৮
ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডিরেক্টার) ১৭৭, ২৪৮, ২৭৩, ২৮৮-৯, ২৯১, ২৯৮, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৫৫, ৫০৭
ভুপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (নাট্যকার) ১২৯-৩১, ১৭৭, ২৪৮, ৪৩১
ভেলুবাবু ৭৮
ভ্রমর ১৩০
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৩৫৪
মণীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২১৬, ৩৭০
মথুর সা ১৬০
মনোমোহন ১৮২, ২৪৯, ৪২০
মনোমোহন পাণ্ডে ২৫১
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ৪০২-৩, ৪৭৩, ৪৭৭
মনোমোহন রায় ৪২৫
মন্মথ রায় ১১৯, ৩৭৭
মন্মথমোহন বসু ৪৪৯
মরিস-ই ব্যাণ্ডম্যান ২৪১
মহাতাপচন্দ্র ঘোষ ৪৯
মহাত্মা গান্ধী ২৫৬
মহেন্দ্র মৈত্র ২৭৩
মহেন্দ্রলাল বসু ৩৯৪
মাইকেল মধুসূদন ৫২
মাখন ৮৯
মানদা সুন্দরী ১১৯
মানভঞ্জন ২৮৫
মাহুচী ৪২৩
মামা ওয়ারেরকর ৩৩৩
মার্চেণ্ট অব ভিনিস ১২৯
মার্শাল ফোরু ১৬৯
মিনার্ভা ১৮-৯, ৪৬, ৫৪, ৬৪, ৭৪, ১২৯, ১৩২, ১৬৬, ২৭৯-৮০, ৪৭৩, ৪৯১
মিশরকুমারী ২৪৮
মৃণালিনী ২৪৯
মেঘনাদবধ কাব্য ৫২, ২১২, ২৫২
মেঘেন্দ্রলাল রায় ৪৭৩
মেটকাফ হল ১৫৩
মেবার পতন ৫৩-৪, ৪৭৯
মেরী পিকফোর্ড ২৩৪
মোগল-পাঠান ১৪৯-৫০
মোহনবাগান ৪১-৬, ৬০
ম্যাকবেথ ২৮০
ম্যাডান ২১২, ২৪৭, ২৫৩-৪, ২৭৭, ২৮৫, ৩৩১
যতীন্দ্রমোহন সিংহ ১৬২
যতীশ সেনগুপ্ত ২৬৫-৭
যতীশচন্দ্র নাথ ৪৬
যশোদানন্দন ২৫৯-৬০
যামিনী রায় ৩৬৬, ৫৯৭
যুগ্মমাহাত্ম্য ৫৩৭
যুগলকিশোর বসু ১৬২
যোগীন মামা ১৩৪-৫
যোগেশ চৌধুরী ৩৬৬, ৪০২-৩
রক্তকরবী ৫৩৯
রঘুবীর ৫৮, ২৬১
রঞ্জাবতী ৬০-১
রত্নাকর ২১২
রবি রায় ৪৭৭

রবীন্দ্র-জীবনী ৪৮৪
রবীন্দ্রনাথ ৩০, ৩৩, ৪৬, ১০৫, ১৫৫, ২০৫, ২৪৩, ২৮৫-৬, ৩৪০, ৫২০, ৫৩৯
রমণবাবু ৪৭
রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪০২
রমেশ মিত্র ১৭৬
রয়্যাল ক্লাব ১৩৮, ১৪৪-৫
রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটার ২৫
রাইডার হ্যাগার্ড ২৪৫
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩০, ৩৬৩, ৪১৭, ৪৭৩, ৪৭৬
রাখীবন্ধন ৩০, ২৫২
রাজকৃষ্ণ রায় ৪২৮
রাজসিংহ ৫৪০-১
রাজা বোস ৫১৩
রাজা ও রাণী ৩৩৮, ৩৪২
রাণা প্রতাপ ৫৪, ৮০
রাধাচরণ ভট্টাচার্য ২৫৫, ২৭৯, ৪৬৫, ৪৮৩
রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৬১, ৩৬৬, ৪২৪
রামকৃষ্ণ ২৯৭
রামতারণ সান্যাল ৪৫৪
রামনিধি গুপ্ত ৪৫৩
রামমূর্তির সার্কাস ৪৭
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৬
রাসবিহারী ঘোষ ৩১
রুস্তমজী ধুতিওয়ালা ২১৩
রূপচন্দ্র ৪৮৩
রূপম ২৬২
রিজিয়া ৮০-২, ৯৯, ১০৩-৪, ২৪৬
রিফর্মড থিয়েটার ২২১
রেঙ্গুন ডেলি নিউজ ৪৬৯
রেঞ্জার্স ৪১
রেণুবালা ৪৯৬
রৈবতক ৩৯৬, ৪২৫
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫৮, ২৫৩, ২৫৫
লণ্ডন মিশনারী স্কুল ২৪, ৪০, ৪৩, ৬২, ১২০, ১২৩, ১২৫
লর্ড কার্জন ৭৩
লর্ড মিণ্টো ৩৬, ৭৩
লর্ড হার্ডিঞ্জ ৭২-৩
ললিত মুখার্জি ১৩৬
ললিতমোহন গুপ্ত ৩৮১
ললিতাদিত্য ৩৮০
লাখ টাকা ৫১৮
লীগ অব নেশন্স্ ১৭১, ১৪৭
লুসিটানিয়া ১৬৮
শকুন্তলা ১৫৪
শঙ্করাচার্য ৫৭
শচীন সেনগুপ্ত ৩৩৩
শরৎচন্দ্র ঘোষ ২৫
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২৭,২৪৫,২৮৪
শরদিন্দু মজুমদার ২৬৭
শান্তি থিয়েটার ১৬৫-৬
শান্তি ১৩৯, ৫২৩
শিবরাত্রি ২১৫
শিরী ফরহাদ ৪৫৫

শিরীষ বসু ২২৩, ২২৫, ২৫২
শিশির (পত্রিকা) ৩২৫, ৩৩৭, ৩৮৪, ৩৯২, ৪২২, ৪৩৯, ৪৪৭
শিশিরকুমার ভাদুড়ী ২৪৪, ২৪৬-৭, ২৫৩-৬, ২৬১, ২৭৪-৫, ২৮০, ২৮৪, ২৯২, ৩৬২, ২৬৫-৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০২, ৪২৯, ৪৩৫, ৪৭৫, ৫১৯
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২১০
শৈলেন্দ্রনাথ বিশী ৩৯২
শোধবোধ ৫১৯, ৫৩৯
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৫৪
শ্রীকৃষ্ণ ১৬৩, ১৬৬, ৫১৩-৪
শ্রীধর কথক ৪৫৪
শ্রীশচন্দ্র বসু ৪৯২
সওদাগর ১২৯, ১৩১-২
সঙ্গীত সমাজ (ভারতীয়) ২৪৭
সত্যভামা ৫০৫
সতীশ ঘোষ ৭৭
সতীশ সেন ২৮৮
সনৎ মুখোপাধ্যায় ৪০২
সন্তোষকুমার দাস ২৪৮
সন্ধ্যা ৩০-১
সপ্তম এডোয়ার্ড ৯, ২৫
সরলা ১৭, ২৬, ৫২, ১৮৩, ২১৩, ৪৪২
সাজাহান ৫৪, ৯৮-৯, ১০১, ১০৪, ১০৯-১০, ১৩২, ১৩৬, ২৬১, ৪২০, ৪২৪
সারা বার্নাড ২৩৪
সার্জেন্ট ৩২৫, ৩৪০, ৩৮৩, ৪১০
সীতা ৩৬২, ৩৭১, ৪০২
সীতাহরণ ১৭৬, ১৮০, ১৯০
সুকৃতীশ্বর ভট্টাচার্য ১২২
সুদামা ২৯৩
সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী ৩১
সুবাসিনী ২৪৯
সুধীর চাটার্জি ৪০, ৪২, ৪৪, ৫৭, ৬৩, ১২১-২
সুরেন কুমার ১৫৪
সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ৩৩, ২৪৯, ২৪১, ৩৮০
সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ৩২
সুরেশ বিশ্বাস ৪৫৯
সুশীলা ৪৭৬
সুশীলা সুন্দরী ২৫৯
সেক্সপীয়ার ৬৭
সেন্টজেভিয়ার ৪৪
সেরাবালা ৫০১
সোফিয়া ২৪৯-৫০
সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৩, ৩৭৩
সোল অফ এ স্লেভ ২৩৮, ২৫৬, ২৭৭, ২৮১, ২৮৫, ২৯৭, ৩৩০, ৩৩২-৩
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৪৭, ৫১৮
স্টার ১০, ১৮-৯, ৬৪, ১২৯-৩০, ১৫৩, ৪০২, ৪৭৯, ৫৩৮-৪২
স্টেট্সম্যান ১০৪-৫
স্বর্ণলতা ১৭, ৫২
হরনাথ বসু ২০৫, ৩৬৮
হরমুশজী তাস্ত্রা ২৪৪
হরিচরণ বসু ১৭১

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ২৪৫, ২৮৮, ৩২৪, ৩৩৮, ৩৭৪, ৩৯৮, ৪১৭, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৬১, ৪৮২
হরিপদ ৩৫০
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ২৫০
হরিপ্রসাদ ১০০, ২৫০, ৪০৪
হরিমোহন বসু ৫৮, ১৪৮-৯, ১৭৭-৮, ১৪৫-৬, ১৪৯
হরিশ্চন্দ্র ২৪৪
হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন ১৭০
হানিফ সাহেব ২৭১-২
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৪২৬
হার্বার্ট বিরহোম ট্রি ১৬৮, ২৩৪
হিজ ম্যাজেস্টি থিয়েটার ১৬৮
হিন্দা হাফেজা ২৪৮
হিন্দুবীর ২৫১
হিরালাল চট্টোপাধ্যায় ৭৪
হীরালাল সেন ২৪৬, ২৫১, ২৫৯
হুগো ; লে মিজারেবলস্ ৫০
হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৬৪-৫, ২৮৩, ৩২৬, ৩৪৯, ৪০৩
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৪৩০, ৩৪৩, ৩৭৬
হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ৪২৮
হেনরি আরভিং ১৫৪, ১৬৮
হ্যামলেট ২৫২